

ISSN 1813-0402

RESEARCH JOURNAL

Volume 37 ■ June 2024



Faculty of Arts

University of Rajshahi
Rajshahi-6205, Bangladesh

RESEARCH JOURNAL

Volume 37 ■ June 2024



Faculty of Arts
University of Rajshahi

Research Journal

Volume 37 □ June 2024



Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 37
June 2024

Published by
Professor Dr. Muhammad Belal Hossain
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Kadirgonj, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 500.00 \$ 6

Contact Address
Chief Editor, *Research Journal* (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Muhammad Belal Hossain
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Dr. Nilufar Ahmed
Chairman
Department of Philosophy

Professor Dr. Ferdousi Khatun
Chairman
Department of History

Rubaida Akhter
Chairman
Department of English

Professor Dr. Shahid Iqbal
Chairman
Department of Bangla

Professor Dr. Mohammad Fayek Uzzaman
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Dr. Mohammad Sabirul Islam Hawlader
Chairman
Department of Arabic

Professor Dr. Md. Ashraf- Uz- Zaman
Chairman
Department of Islamic Studies

Shaila Tasmeen
Chairman
Department of Music

Professor Dr. Mir Mehbub Alam
Chairman
Department of Theatre

Professor Dr. Md. Shafiullah
Chairman
Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Sheikh Md. Nuruzzaman
Chairman
Department of Sanskrit

Professor Dr. Muhammad Shahidul Islam
Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 37th volume of A Research Journal, Faculty of Arts, is being published with as many as 40 research articles contributed by the faculty members of Philosophy, History, English, Bengali, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Music, Persian Language & Literature, Sanskrit and Urdu Departments.

The articles are of diverse nature and it is our expectation that they will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts. As the Chief Editor I am thankful to all of the contributors for choosing our journal to be their publishing outlet, and let me also congratulate them on their valuable publications.

The publication of the journal is the outcome of collective efforts of all the scholar members of the editorial board as well as the learned reviewers. They have ungrudgingly helped me in its publication, and I remain grateful to them for their cooperation.

Last but not least, I thank the concerned officers and other supporting staffs of the Faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Muhammad Belal Hossain
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205, Bangladesh.

সূচিপত্র

ড. আফরোজা সুলতানা	ইহুদী ও ইসলামী বিধানে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার : একটি পর্যালোচনা	৭
Sharmin Akhter	A Study of the Concept of Politics in ELT at the Tertiary Level English Language Education in Bangladesh	১৯
Md. Mahmud Hasan Chowdhury	Modernity and Spiritual Crisis in T.S. Eliot's Poetry: A Multifaceted Exploration	৩১
জাকিয়া রহমান	শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজন: বিদ্রোহীসত্তার স্বরূপ সন্ধান	৩৯
ড. সুমাইয়া খানম	মুনীর চৌধুরীর ত্রয়ী একাঙ্কে ইতিহাস ও নগরজীবন	৪৭
মুঞ্জু রানী দাস	প্রমিত বাংলা এবং কিশোরগঞ্জের উপভাষা: ব্যঞ্জনধ্বনি বিচার ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ	৫৫
এ টি এম রফিকুল ইসলাম	রংপুর জেলার জমিদারি স্থাপত্য : নির্বাচিত উদাহরণের আলোকে একটি সমীক্ষা	৬৭
ড. মো. ফজলুল হক	সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আরব বসন্তের প্রভাব	৯৭
ড. জিয়াউর রহমান খান	উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার বিকাশ: একটি পর্যালোচনা	১১১
ড. মো. সাজিদুল হক		
ড. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম	আব্বাসীয় যুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে আল-জাহিয এর অবদান	১২৫
ড. মো. কামারুজ্জামান	বাংলাদেশে আরবী ভাষা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৩৫
ড. মোঃ মতিউর রহমান	মু'আল্লাকার শব্দালংকার: একটি পর্যালোচনা	১৪৭
ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান ১	সাহাবিগণের কবিতায় উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা	১৫৭
ড. মো. আবু বকর	সংলাপ পদ্ধতিতে রচিত আরবী গদ্যসাহিত্যের রূপরেখা	১৭৩
ড. মো. আভোয়ার রহমান	সুদি অর্থব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন: পরিশ্রেক্ষিত রাসুল সা.-এর জীবনাচার	১৮৩
ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী		
ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা	তুলনামূলক সাহিত্যে আরব-ধারা ও প্রকৃতি	১৯৩
ড. মো. সেতাইর রহমান	মারুফ আর-রুসাফীর 'আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ' কবিতায় সমাজচিত্র	২০৩
মুকাররম হুসাইন	হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগত মূল্যায়ন	২১৩
হাশেম আলী	বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী কাব্যচর্চা	২২৫
মো: হাদিউজ্জামান	আরবী মাছাল সাহিত্যে হাদীসের প্রভাব	২৩৯
মোহাম্মদ উল্লাহ	কবি আল-আখতাল ও উমাইয়া খলীফাদের প্রশংসায় তাঁর কাব্যচর্চা	২৪৭
জুনাইদ আহমদ	আহমাদ আমীন-এর সাহিত্যকর্ম: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	২৫৭
মো: আসাদুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলামের গানে মূল আরবী শব্দের ব্যবহার	২৬৯
ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ১	আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী-পুরুষ সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা	২৮৫

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনীর রচনাবলি : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	৩০৩
মোঃ মাহবুবুর রহমান	ইহুদী ধর্মে একত্ববাদের স্বরূপঃ একটি পর্যালোচনা	৩২৩
গুলশান আকতার	জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইবনুল হায়ছামের অবদান	৩৪১
মোঃ আবু তোরাব	হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে বিবাহ উৎসব: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	৩৫৭
মো. মোস্তফা নূর ইসলাম	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর রচনাবলি : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	৩৭১
মো. আশরাফুল ইসলাম	ইসলামের আলোকে যাকাত আদায়ের প্রতিদান ও অনাদায়ের পরিণতি: একটি বিশ্লেষণ	৩৮৯
ড. সোনিয়া শারমিন খান	উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঘরানার সূত্র	৪০৭
ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ	খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির আধ্যাত্মিকতা	৪২১
ড. রিজওয়ানা ইসলাম সান্মী		
ড. মো. ওসমান গনী	শেখ সাদির কাব্যে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধ	৪৩৩
ড. মো. কামাল উদ্দিন	হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানির <i>লাবখান্দে আনার</i> গল্পগ্রন্থে নৈতিক মূল্যবোধ	৪৩৯
ড. তাহমিনা বেগম	চিরায়ত ফারসি কাব্যে ইসলামি ভাবধারা	৪৪৭
মাহফুজ উল্লাহ	নজরুল কাব্যে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা	৪৫৫
ড. জয়শ্রী দাশ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনের জিজ্ঞাসা ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর: একটি পর্যালোচনা	৪৬৩
মোসা: নাহিদা আক্তার	শিবলী নুমানী ও উর্দু কাব্য সাহিত্য: একটি পর্যালোচনা	৪৭৩
মো. নূর মোহাম্মদ	সাদাত হাসান মাস্টো ও তাঁর ছোটগল্প	৪৮৫
ড. জুয়েলী বিশ্বাস	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব	৪৯৩

ইহুদী ও ইসলামী বিধানে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার : একটি পর্যালোচনা [Economic Rights of the Wife in Jewish and Islamic Law: A Comparative Study]

ড. আফরোজা সুলতানা*

[Abstract: Economic rights is one of the crucial rights of a wife in her family life. Because this rights guarantees her a safe life. This assurance not only secures her life but also establishes her social status as an individual. This article provides a clear explanation of the primary economic security of Jewish and Muslim wives. It also identifies the sources from which a wife generally gets economic rights in the family. Initially a wife gets financial security through dowry and gifts received at the time of marriage. After the married life, the wife briefly gets property rights from the husband. A wife also acquires economic rights as a child by way of the share of her father's property. Then in the article, the extent to which the wife derives rights from these specific sources in religious ordinances and customary law is highlighted. This analysis sheds light on the extent to which wives are entitled to property as heirs in religious law.]

Keyword: Marriage Dowry, Marriage Contract, Succession, Widow, Property, Spouse.

১. ভূমিকা

বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর পারিবারিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। বিয়ের আগে সাধারণত তাকে বাস করতে হয় পিতা-মাতার পরিবারে এবং বিয়ের পর স্বামীর পরিবারে। সুতরাং একটি মেয়েকে অবস্থার প্রেক্ষাপটে দু'টি পৃথক পরিবারের সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়। এই দু'টি পরিবারে কন্যা, জায়া এবং জননীরূপে প্রধানত তিনটি অবস্থা তাকে অতিক্রম করতে হয়। বাস্তব জীবনে পরিবারের সদস্য হিসেবে একজন স্ত্রী তার জীবনের নিশ্চয়তা, দায়-দায়িত্ব সর্বোপরি অর্থনৈতিক অধিকার কতোটা প্রাপ্ত হয়েছে এবং সময়ের বিবর্তনে তা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। সেই লক্ষ্যে ইহুদী এবং ইসলাম ধর্মের প্রেক্ষাপটে একজন নারীর কন্যা থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মাতা রূপে প্রত্যেকটি পর্যায়ে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আইনে তাদের প্রাপ্য অধিকার বিশেষকরে অর্থনৈতিক অধিকার কি পরিমাণে অর্জন করতে পেরেছে তা মূল্যায়ন করা এই প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয়।

ইহুদী ও ইসলাম ধর্মের আলোকে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার আলোচনা করার পূর্বে 'অর্থনৈতিক অধিকার' বিষয়ে কিছু আলোকপাতের প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অধিকারকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কেননা এর মধ্যে অনেকগুলো অধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনার সমন্বয় রয়েছে। যেমন- সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার, দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) পূরণের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি।^১ এখানে সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারের মধ্যে বর্তমানে যে সম্পদ রয়েছে সেটির মালিকানা পাওয়া এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো নিকট থেকে বৈধভাবে সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা উভয় বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অধিকার বলতে একজন মানুষের বর্তমান অবস্থায় এবং ভবিষ্যতে সম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করার পাশাপাশি মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তাকে বোঝায়। প্রবন্ধে একজন নারী হিসেবে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি ইহুদী এবং ইসলাম ধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করা হল:

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

২. ইহুদী ধর্মে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইহুদী সমাজে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব নারীর ওপর বর্তায় না, এটি হচ্ছে পুরুষের একক দায়িত্ব। বিয়ের পূর্বে নারীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব পিতা, ভ্রাতা বা অন্যকোন অভিভাবকের ওপর, আর বিয়ের পরে এটি পুরোপুরিভাবে বর্তায় স্বামীর ওপর। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর দৈনন্দিন প্রয়োজন যেমন- থাকা, খাওয়া, পোশাক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়িত্বও স্বামীর। পরিবারে স্ত্রীর প্রতিপালন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব স্বামী হিসেবে পুরুষের হলেও নারীর স্বাভাবিক এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজস্ব সম্পত্তি অর্থাৎ সম্পত্তিতে তার মালিকানা থাকা প্রয়োজন। ইহুদী বিধানে সম্পত্তির মালিকানার মধ্য দিয়ে এবং বিয়ের সময় স্বামীর নিকট থেকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাওয়ার মধ্য দিয়ে একজন স্ত্রী খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে অর্থনৈতিক অধিকার প্রাপ্ত হয়। এভাবেই ইহুদী ধর্মানুসারী একজন স্ত্রী বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্ত অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করে।

২.১ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রাপ্য অধিকার

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে একটি সম্পর্কের সেতু রচিত হয়। শুরু হয় দাম্পত্য জীবনের সুদীর্ঘ পথ চলা। এই পথ চলাতে পরস্পরের ওপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়। ইহুদী বিধান অনুসারে দাম্পত্য জীবনের সূচনা পূর্বে আরোপিত এই দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদান যা ইহুদী আইনে 'কিতুবাহ্' (kitubah) নামে পরিচিত। তবে 'কিতুবাহ্' দ্বারা বর কর্তৃক কনেকে প্রদত্ত উপহার সামগ্রী বোঝানো হলেও শব্দটি অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কখনো কিতুবাহ্ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে নির্দেশ করে আবার কখনো এটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কে নির্দেশ করে। ইহুদী আইনানুসারে বিয়ের সময় স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে কিতুবাহ্ হিসেবে মূল্যবান সামগ্রী উপহারস্বরূপ (marriage dowry) প্রদান করবে। ইহুদী আইনে কিতুবাহ্ পরিমাপের সর্বচ্চ বা সর্বনিম্ন কোনো সীমা নির্ধারণ করা নেই। এটির পরিমাণ নির্ভর করে স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা, যোগ্যতা এবং অবস্থানের ওপর। স্ত্রী হিসেবে নারী এর দ্বারা সম্পদের একটি বিশেষ অংশের অধিকারী হয় যার ওপর কারো কোনো এখতিয়ার নেই, এটি তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পদ।^২ কিতুবাহ্ আইনানুসারে স্বামী স্ত্রীকে স্থাবর অথবা অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি প্রদান করতে পারে। তবে উল্লেখ্য যে, অস্থাবর সম্পত্তি স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত যা কোনো কারণবশত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও ফেরতযোগ্য হয় না। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও এটির ওপর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার বহাল থাকে।^৩ কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা স্বামীর মৃত্যুতে স্থাবর সম্পত্তি স্বামীর পরিবারের নিকট ফেরত দিতে হয়। এই জন্য এই ধরনের সম্পত্তিকে কখনও কখনও 'iron sheep' বা 'iron flock' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। দাম্পত্য জীবনে এই সম্পত্তি স্ত্রী তার প্রয়োজনমত যথেষ্ট ব্যবহার করার অধিকার রাখে বলে এটিকে 'sheep' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে বা তার অবর্তমানে সম্পত্তিটি বা এর সমমানের অর্থ ফিরিয়ে দিতে হয় বিধায় এটিকে 'iron' বলা হয়। আর বর্তমান সময়ে (ফেরত দেওয়ার সময়) সম্পত্তির মূল্যমান কমে গেলেও পূর্বের মূল্যেই (গ্রহণের সময়ের মূল্য) সেটি পরিশোধ করতে হবে। উল্লিখিত নিয়মানুসারেই একজন নারী স্ত্রী হিসেবে বিয়ের মাধ্যমে আর্থিক অধিকার লাভ করে এবং শর্তসাপেক্ষে স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে।

ইহুদী বিধানে স্ত্রী বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে যেসকল অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে তন্মধ্যে অন্যতম হলো স্বামীর নিকট হতে ভরণপোষণের খরচ প্রাপ্তি। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয়ভার স্বামীর ওপর অর্পিত হয়।^৪ স্ত্রী যদি সাবলম্বীও হয় অথবা অটেল ধন-সম্পদের মালিকও হয় তথাপি স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনার বিষয় নয়। ইহুদী আইন অনুসারে স্বামী বিত্তবান বা দরিদ্র যাই হোক না কেনো স্ত্রীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ বহন করা স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব।

২.২ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার

ইহুদী বিধানে স্ত্রী বিয়ের মাধ্যমে কিছুটা অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করলেও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। কেননা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণনাকৃত উত্তরাধিকার বিধানে নারীকে খুবই সীমিত আকারে সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হয়েছে। বাইবেলের গণনা পুস্তক ৩৬:৩-১০, ৩৬:২, ২৭:৭-৮, ২৭:৩-৪, আদিপুস্তক ১৯:৩১-৩৬, প্রবচনমালা ৩৬:১-১৬ এর বর্ণনাতেও কন্যা, স্ত্রী এবং বিধবার সম্পত্তি প্রাপ্তির একটি আংশিক চিত্র ফুটে উঠলেও একজন স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে উল্লেখ নেই। উপরন্তু সেই মালিকানাতে নানাবিধ শর্তও আরোপিত হয়েছে। শর্তযুক্ত এই উত্তরাধিকার বিধানে সম্পত্তির মালিকানার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকার কারণে স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেজন্য সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে উদাহরণ হিসেবে বাইবেলের পাশাপাশি ইসরাইলে বসবাসকৃত ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য আইনের ব্যাখ্যা দেখানো হয়েছে। কেননা উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান এবং সেই সেই ধর্মানুসারীদের জন্য প্রণীত রাষ্ট্রীয় আইনের সমন্বয় করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ইহুদী ধর্মাবলম্বী নাগরিকের জন্য উত্তরাধিকার বিধান নেই বিধায় ইসরাইলীয় আইনের আলোকে নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির বিষয়টিকে তুলে ধরা হল।

২.২.১ স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার

ইহুদী বিধান অনুযায়ী বিয়ের পরে স্ত্রীর সমস্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তায়। স্বামী তার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। এই রীতিতে স্ত্রী তার ভরণপোষণের জন্য স্বামীর নিকট থেকে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জন করলেও স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত থাকে। অবশ্য ইহুদী বিবাহ রীতিতে স্বামী বিয়ের সময় কিছুবাহ্ হিসেবে কোন মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হলে তার নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ স্ত্রীকে প্রদান করতে পারে যা অস্থায়ীভাবে কিছুবাহ্ হিসেবে বিবেচিত হয়।^৭ এই সম্পত্তির পরিমাণ স্বামীর পুরো সম্পদের অর্ধেক বা তার বেশীও হতে পারে।^৮ ইহুদী বিবাহ রীতির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কিছুবাহ্ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সেই নির্ধারিত স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকার লাভ করে। কিছুবাহ্ পরিশোধ হয়ে গেলে স্থাবর সম্পত্তি পুনরায় স্বামীর নিকট ফেরত যায়। বিবাহ রীতির বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রী সম্পত্তির এরূপ অধিকার লাভ করলেও বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির এরূপ কোনো অধিকার পায় না কেননা স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা স্বামীর অবর্তমানে তার অর্থাৎ স্বামীর পরিবারের নিকট ফেরত যায়। অন্য কথায়, উত্তরাধিকার আইনে বিধবা তার স্বামীর নিকট থেকে কোনো সম্পত্তির অংশীদারিত্ব পায় না।^৯ ইহুদী আইনে এভাবেই স্ত্রী খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করে।^{১০} অর্থাৎ স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী স্থাবর-অস্থাবর উভয় সম্পত্তির অধিকারী হলেও স্বামীর অবর্তমানে কেবলমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির অংশীদার হয়। ইহুদী উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর স্থাবর সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার কোনো অধিকার না পেলেও স্বামীর ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্রটি দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রচলিত ইহুদী রীতিতে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বামীর পূর্ণ অধিকার থাকে।

২.২.২ কন্যাসন্তানের প্রাপ্ত অংশীদারিত্ব

সম্পত্তি প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে একজন স্ত্রী প্রধানত দুইটি উপায়ে অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে। প্রথমত স্বামীর নিকট থেকে এবং দ্বিতীয়ত সন্তান হিসেবে পিতার সম্পত্তি থেকে। ইহুদী বিধানানুযায়ী পিতার জীবদ্দশায় কন্যার সমস্ত ভরণপোষণের খরচ প্রদান করা যেমন পিতার অন্যতম দায়িত্ব তেমনিভাবে পিতার মৃত্যু হলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের প্রতিপালন খরচ বহন করাও একইভাবে প্রযোজ্য।^{১১} পরবর্তীতে কন্যার এই অংশ নির্ধারিত হওয়ার পরে বাকী অংশ থেকে পুত্র বা কন্যার মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বন্টন করা হয়।

ইহুদী উত্তরাধিকার বিধানে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রসন্তান না থাকলে সেক্ষেত্রেই কেবলমাত্র কন্যাসন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে এক্ষেত্রেও কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যেমন- ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনায় কন্যাসন্তানকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অংশীদার হতে হলে তাকে নিজ গোত্রের

মধ্যেই বিবাহ করতে হবে অন্যথায় সম্পত্তির মালিকানা হতে বঞ্চিত হতে হবে।^{১০} কন্যাসন্তানের উত্তরাধিকার বিষয়ক বিধানটি ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণনা করা আছে এভাবে:

ইসরাইল সন্তানদের (কন্যা সন্তান) অন্য কোন গোষ্ঠীর মধ্যে কারও সঙ্গে যদি তাদের বিবাহ হয় তবে তাদের পৈতৃক উত্তরাধিকার থেকে তাদের উত্তরাধিকার কাটা হবে।... এইভাবে ইসরাইল সন্তানদের উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে যাবে না; ইসরাইল সন্তানেরা প্রত্যেকে যে যার পিতৃগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারভুক্ত থাকবে। ইসরাইল সন্তানেরা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ পৈতৃক উত্তরাধিকার ভোগ করে, এজন্যই ইসরাইল সন্তানদের কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকারিনী প্রত্যেকটি মেয়ে নিজ পিতৃগোষ্ঠীর গোত্রের মধ্যে কোনো এক পুরুষের স্ত্রী হবে। এইভাবে উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে যাবে না।^{১১}

ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত উপরোক্ত উত্তরাধিকার বিধানে দেখা যায় পিতার মৃত্যুর পরে তার সম্পদের প্রথম অংশীদার হবে পুত্র।^{১২} আর কেবলমাত্র পুত্রসন্তান না থাকলেই কন্যাসন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে। বাইবেলে বর্ণিত উত্তরাধিকার আইনে পুত্রসন্তানের অবর্তমানে কন্যার উত্তরাধিকার হওয়া প্রসঙ্গে ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকরকম ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে মিশনাহর^{১৩} (mishnah) বক্তব্য অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। মিশনাহ এর ব্যাখ্যা অনুসারে বাইবেলে বর্ণিত ‘পুত্র’ বা ‘sons’ বলতে শুধুমাত্র ছেলেকে নির্দেশ না করে ছেলের সন্তানাদি অর্থাৎ নাতি-নাতনিদেরকেও ইঙ্গিত করে। আর পুত্রসন্তান না থাকলে কন্যাসন্তানের পরিবর্তে পুত্রের কন্যা (নাতনী) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবে।^{১৪} এভাবে কন্যাসন্তান পিতার সম্পত্তিতে শর্ত সাপেক্ষে স্বত্বাধিকার হলেও মাতার সম্পত্তিতে সন্তান হিসেবে কন্যার উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আসে না, কেননা নারী হিসেবে মাতা সরাসরিভাবে স্থায়ী কোনো সম্পত্তিই ধারণ করে না। আধুনিক ইহুদী ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, তাওরাতে পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের মালিকানার কথা উল্লেখ থাকলেও সরাসরিভাবে মাতার সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেটির কোনো বর্ণনা নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইহুদী বিধানে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে ভরণপোষণসহ কিতুবাহ এর নিয়মানুসারে কিছু অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে। তবে স্বামীর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব একেবারে পায় না বললেই চলে। অধিকন্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারী হলেও সেটিতে আবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এভাবে একজন ইহুদী ধর্মাবলম্বী স্ত্রী বিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভরণপোষণ, কিতুবাহর অর্থ, বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অধিকার লাভ করে যার মাধ্যমে মানবেতিহাসের প্রাচীনতম সেমিটিক ধর্মীয় বিধানে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার

অর্থনৈতিক দিক থেকে স্ত্রীকে পরিবারের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে না হলেও প্রয়োজনে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে অথবা কঠিন কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে সেই জন্য ইসলাম স্ত্রীসহ সকল নারীকে দিয়েছে বহুবিধ নায্য অধিকার, দিয়েছে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার।^{১৫} এমনকি তারা উপার্জিত অর্থের স্বাধীন মালিকও হতে পারে, এই মালিকানার ওপর অন্য কারও কর্তৃত্বের অধিকার নেই।^{১৬} ইসলাম এভাবে স্ত্রীকে তার জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অধিকার প্রদানের পাশাপাশি সম্পত্তি নির্বিঘ্নে বন্ধক ও ইজারা দেয়া কিংবা অন্য কাউকে দান করে দেয়ারও অধিকার দিয়েছে। এক্ষেত্রে কারো সাথে তার পরামর্শ করারও প্রয়োজন নেই।^{১৭} এছাড়া নারী বিয়ের সময়ে তার স্বামীর নিকট থেকে এক ধরনের বিশেষ উপহার পেয়ে থাকে; যাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দেন-মোহর বলা হয়। এটি পুরুষের জন্য অবশ্যই পালনীয় একটি দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে; “আর তোমরা দিয়ে দাও স্ত্রীদের মহর সন্তুষ্ট চিত্তে।”^{১৮} অর্থাৎ বিয়ের সময় প্রাপ্ত দেন-মোহরের অর্থও স্ত্রীর জন্য অন্যতম আর্থিক নিরাপত্তা। ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে প্রথমত: দেন-মোহর, দ্বিতীয়ত: বৈষয়িক সকল প্রয়োজনীয় জিনিস বা খোরপোশ পাওয়ার অধিকার, তৃতীয়: সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার। স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য কুরআনে বর্ণিত বিধান এবং উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হল।

৩.১ দেন-মোহর

শরীয়াহ্ আইনের দৃষ্টিতে দেন-মোহর স্ত্রীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার। বিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থনৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে দেন-মোহর হচ্ছে মুসলিম বৈধ বিবাহের জন্য অবশ্য পালনীয় শর্ত। পবিত্র কুরআনে বিয়ের সময় স্ত্রীকে প্রদেয় দেন-মোহর- এর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত ৪ : ৪, ২৪-২৫ নং আয়াতে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার হিসেবে দেন-মোহর প্রদানের জন্য স্বামীকে কাঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ আইন অনুসারে বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে উপহারস্বরূপ যে মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করা হয় সেটি ‘দেন-মোহর’ হিসেবে পরিচিত। এটি বিয়ের অনুষ্ঠানে স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। মূল্যবান সামগ্রী হিসেবে দেন-মোহর স্বর্ণালংকার, অর্থ, সম্পত্তি এমনকি অস্থাবর যে কোনো বস্তুও বিবেচিত হতে পারে।^{১৯} বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ যে দেন-মোহর পেয়ে থাকে তা স্ত্রীর একান্তই ব্যক্তিগত সম্পদ। এটির ওপর কারও কোনো অধিকার নেই। এমনকি তার পিতা-মাতা বা পরিবারের কোনোরূপ এখতিয়ার নেই।^{২০} তবে স্ত্রী তার দেন-মোহরের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ অংশ মাফ করে দিতে পারে। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যদি স্ত্রী মৌখিকভাবে মাফ করে দেয় এবং আন্তরিকতার সাথে এটি না করে, তবে তা মাফ হবে না। আবার স্বামীকে মাফ না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ীও সে এটি খরচ করতে পারে।^{২১} অর্থাৎ দেন-মোহর স্ত্রীর প্রাপ্য কিন্তু স্বামী কোনো কারণে এটি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে দায়মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে সমঝোতা ব্যতীত কোনোরূপ চাপ প্রয়োগের সুযোগ নেই আর সমঝোতার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অগ্রহই মুখ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর তোমরা দিয়ে দাও স্ত্রীদের তাদের মনের সন্তুষ্ট চিন্তে; তবে তারা খুশি হয়ে মনের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তা তোমরা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে ভোগ কর।”^{২২} উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেন-মোহর আদায় করতে হবে সদিচ্ছা সহকারে এবং স্ত্রীদের জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নিয়ামত। তবে জাহেলিয়াতের যুগে দেন-মোহর ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন হত এবং এটি বাবদ যা কিছু আদায় হত তার সবটুকুই মেয়ের অভিভাবকবৃন্দ করায়ত্ত করত, মেয়ে পুরোপুরিভাবে এটি থেকে বঞ্চিত হত। বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ইসলামে দেন-মোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটিকে একমাত্র মেয়েদের প্রাপ্য ও তাদের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকারের বস্তু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়াতে দেন-মোহরের পরিমাপ কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কোনো অকাট্য নির্দেশ নেই, এমনকি এর পরিমাপটিও নির্দিষ্টভাবে বলা নেই। তবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে দুই পক্ষের সাথে বসে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া। আধুনিক ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, দেন-মোহরের পরিমাপ এমন হওয়া উচিত নয় যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য ও উদ্ভিগ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে অথবা তা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) একদা একজন গরীব সাহাবীকে বললেন, “কিছু না কিছু দিতে চেষ্টা কর। আর কিছু দিতে না পারলে দেন-মোহর বাবদ অন্তত লোহার একটি আংটি দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করবে। সেই নিঃস্ব দরিদ্র সাহাবী তাও দিতে পারে নি, তখন নবী (সঃ) তাকে বলেছেন; “কুরআন শরীফের যা কিছু তোমার জানা আছে, তা তুমি তোমার স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে। এর বিনিময়েই আমি মেয়েটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।”^{২৩} এভাবেই নবী করীম (সঃ) দেন-মোহরের নির্ধারিত মান সামর্থ্য অনুযায়ী মধ্যম পর্যায়ে আনার চেষ্টা করেছেন। শরীয়াতে সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ পরিমাণ কোনোটিই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি যার পক্ষে যতটুকু আদায় করা সহজসাধ্য সে ততটুকুই করবে।^{২৪} আসলে বিয়েতে দেন-মোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য অর্থনৈতিক অধিকার এবং নিরাপত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইসলামী শরীয়াতে দেন-মোহর নারীর এমন একটি অর্থনৈতিক অধিকার যা স্বামী কখনও ফিরিয়ে নিতে পারবে না এমনকি তালাক হয়ে গেলেও ফিরিয়ে নিতে পারবে না। মুসলিম বিয়ের এই নির্ধারিত দেন-মোহর স্বামী বিয়ের অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে পারে আবার বিয়ের পরেও করতে পারে। শুধু তাই নয়, কোনো কারণে তালাক হয়ে গেলে সেই সময়েও দেন-মোহর প্রদান করা যায়।^{২৫} অর্থাৎ দেন-মোহর প্রদান স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। এই বাধ্যবাধকতার নিয়ম নারীর নিরাপত্তার জন্যেই প্রদান করা হয়। তবে আল্লাহর

পক্ষ থেকে নির্ধারিত এই বিধান স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য, ভালবাসা, বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে দেন-মোহরকে ইসলামে এতোটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ের পরে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই তালাক হয়ে গেলে সেক্ষেত্রেও স্ত্রীকে দেন-মোহর প্রদান এবং সম্পত্তির মীরাস দেয়ার বিধান রয়েছে।^{২৬} বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ীও দেন-মোহর প্রদানে স্বামী বাধ্য থাকবে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে : “যেখানে নিকাহনামা বা কাবিননামায় দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই উল্লেখ নাই, সেখানেও স্ত্রী এইটি চাহিবামাত্র স্বামী সমগ্র অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।”^{২৭} সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, দেন-মোহর হচ্ছে নারীর জন্য এমন একটি অর্থনৈতিক অধিকার যা প্রদান করতে স্বামী সর্বাবস্থায় বাধ্য থাকে।

৩.২ খোরপোশ

ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীর আরো একটি অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার হলো, স্বামীর নিকট হতে খোরপোশের বা ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ পাওয়া। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য অনুপাতে খোরপোশ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী এই অধিকার লাভ করে বিবাহ নামক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। স্ত্রীর খোরপোশ বা ভরণ-পোষণের প্রসঙ্গে ইসলামের ব্যাখ্যা হলো পুরুষেরা নারীদের উপর এই কারণে কর্তৃত্বশীল যে তারা স্ত্রীর জন্য নিজেদের অর্থ ব্যয় করে।^{২৮} এখানে পুরুষেরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে- একথার অর্থ হচ্ছে তারা নিজেদের স্ত্রীর খোরপোশ প্রদান করে। বিয়ের পরে স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। স্ত্রী অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হলেও এই সকল চাহিদা পূরণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। ইসলামী বিধান হচ্ছে যে লোককে অর্থ-সম্পদের স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য হচ্ছে সামর্থ্য অনুসারে স্ত্রী-পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয় পরিমিত তার ক্ষেত্রে সেভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের ওপর তার আর্থিক সক্ষমতা অনুসারে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন: “বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে; আর যাকে সীমিত রিজিক প্রদান করা হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি বোঝা তিনি কারো উপর চাপান না। কষ্টের পর আল্লাহ অবশ্যই স্বস্তি দেবেন।”^{২৯} অন্যত্র বলা হয়েছে: “তোমরা তাদের কিছু খরচ দিবে, বিত্তবান তার সাধ্যমত দিবে এবং বিত্তহীন তার সাধ্য অনুযায়ী দিবে। বিধিমত খরচ প্রদান সৎকর্মশীলদের উপর কর্তব্য।”^{৩০} উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে হবে। স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোনো পরিমাপ শরীয়তে নির্দিষ্ট করা নেই, বরং তা বিচার-বিবেচনার ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রচলিত নিয়মানুসারে দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কেবল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়াই স্বামীর পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে সঙ্গে স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত হাত খরচও স্ত্রীকে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য; যেন স্ত্রী নিজ খেয়াল-খুশি মত খরচ করতে পারে।^{৩১} ইসলামী শরীয়ত অনুসারে স্বামীর সংসারে প্রবেশের পর থেকেই স্ত্রীর খোরপোশের সমস্ত-দায়িত্ব স্বামীর ওপর আসে। আবার স্ত্রীর অসুস্থতার সময় এমনকি স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেও শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিলে বা বার্ষিক্যজনিত কারণ দেখা দিলেও স্ত্রী খোরপোশের অধিকারী হবে। স্ত্রীর খোরপোশের অধিকার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তবে তার আগে তালাক হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

৩.৩ তালাকপ্রাপ্ত এবং বিধবা স্ত্রীর খোরপোশ

ইহুদী বিধানে একজন স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্তির মাধ্যমে যেমন অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে তেমনি কোন কারণে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে গেলেও একজন স্ত্রী ইসলামের বিধানানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খোরপোশপ্রাপ্ত হয়। তালাকের পরে ইহুদের^{৩২} সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী খোরপোশ পাবে।^{৩৩} তালাক হয়ে যাওয়ার পরে স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর খোরপোশ প্রদান করবে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর খোরপোশ পাওয়ার সময়-সীমা এবং অর্থের পরিমাণ কোনটিই কুরআনে নির্দিষ্টভাবে ধার্য করা নাই কারণ এদুটি বিষয় নির্ভর করবে স্বামীর আর্থিক সচ্ছলতা এবং সমসাময়িক কালের বাস্তবতার ওপর। তবে অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদ কুরআনের ২:২৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অনুসারে খোরপোশের সময়-সীমা ইহুদকালীন সময় পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন যা

ভারত উপমহাদেশের দেশগুলোতে অনুসরণ করা হয়। এভাবেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাওয়ার পরেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বামীর নিকট থেকে খোরপোশ পাওয়ার অধিকার ইসলামে রয়েছে। এমনকি বিধবা স্ত্রীও ইসলামী বিধানানুসারে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খোরপোশ পেয়ে থাকে। বিধবা স্ত্রীকে খোরপোশ প্রদান এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা আছে এভাবে: “আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তারা (মৃত্যুর পূর্বে) স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে দিয়ে তাদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের অসিয়ত করে যাবে। কিন্তু যদি তারা নিজেরা বেরিয়ে যায় তবে বিধিমত তারা নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না...”^{৩৪} ইসলাম এভাবে বিধবাদের জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। অধিকন্তু ইসলাম বিধবাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থার বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়েছে। যেমন- দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতিপালনের বিষয়টি খোরপোশের অন্তর্ভুক্ত। বিধবার বিশেষ অবস্থা অর্থাৎ গর্ভবস্থা অথবা দুগ্ধদানকালীন অবস্থায় স্ত্রীর খোরপোশ নির্ধারণের বিষয়ও পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত রয়েছে : “...আর তাহারা যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যয়ভার বহন কর সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাহাদের গর্ভ প্রসব হয়। পরে সে যদি তোমাদের জন্য (বাচ্চাকে) স্তন্য দেয়, তবে উহার পারিশ্রমিক তাহাদিগকে দাও...”^{৩৫} উল্লেখ্য যে, শিশুকে দুগ্ধ দান করার পারিশ্রমিক বলতে আসলে দুগ্ধ দান জনিত কারণে মাতার শরীরের যে ক্ষয়সাধন হয় তা পূরণের জন্য যে পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন হয় সেই ব্যয় মাতা যাতে বহন করতে পারে এখানে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে খোরপোশের ব্যাপারে স্ত্রীকে যেমন অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিয়েছে একইভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনও নারীকে এই অধিকার প্রদান করেছে। স্ত্রীর খোরপোশ প্রদানে স্বামী অবহেলা করলে তার জন্য কি ব্যবস্থা গৃহীত হবে সে সম্পর্কে বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে,

কোনো স্বামী তাহার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত ভরণপোষণ দানে ব্যর্থ হইলে অথবা একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদিগকে সমান ভরণ পোষণ না দিলে স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণ অথবা যে কোনো স্ত্রী আইন অনুসারে অপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন এবং তখন চেয়ারম্যান বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি সালিশী পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত সালিশী পরিষদ স্বামী কর্তৃক ভরণপোষণ হিসেবে প্রদেয় টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করত: একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবেন। স্বামী অথবা স্ত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও নির্ধারিত ফিস জমা দিয়া ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সহকারী জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো আদালতেই প্রশ্ন করা চলিবে না।^{৩৬}

উল্লিখিত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, শরীয়তের সীমার মধ্যে স্ত্রীর যেমন পুরোপুরি খোরপোশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে সে অধিকার আদায়ের সুযোগও ইসলামী আইন তাকে দিয়েছে। এমনকি ঐ অধিকার প্রদানে স্বামী অবহেলা করলে বা ব্যর্থ হলে তা আদায়ের ব্যাপারে রাষ্ট্র কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার রাখে।

৩.৪ স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর মালিকানা

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে স্ত্রী হিসেবে একজন নারী সম্পত্তি লাভের অধিকারপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর এই অংশীদারিত্ব ইসলামী বিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার পর একজন স্ত্রী যেমন কোনো কাজ করে অর্থোপার্জন করার অধিকার রাখে তেমনিভাবে সেই উপার্জিত অর্থের মালিক হওয়ার এবং নিজের ইচ্ছানুক্রমে তা ব্যয় বা ব্যবহার করার এখতিয়ারও রাখে। স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে দেন-মোহর, খোরপোশ এবং স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশের মালিক হবে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে এভাবে : “...তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে...”^{৩৭} অনেক সময় দেখা যায়, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় বর দেন-মোহর হিসেবে তার সম্পত্তির কিছু অংশ স্ত্রীর নামে লিখে দেয়। সেক্ষেত্রে এই সম্পত্তিও স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। বিয়ের পরে স্ত্রী এভাবেই স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। শরীয়াহ্ আইনের দৃষ্টিতে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী মোট

সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অংশীদার হয়। যদি স্বামীর বংশধর (পুত্র/কন্যা) থাকে তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে মোট সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ। আর মৃত ব্যক্তির একের অধিক স্ত্রী জীবিত থাকলে তারা সবাই সম্পত্তির সমান অংশীদার হবে।^{৭৮} অর্থাৎ এক স্ত্রী হলে যে সম্পত্তি পাওয়ার কথা একাধিক স্ত্রী হলেও তারা একই পরিমাণ সম্পত্তি পাবে এবং পরবর্তীতে ঐ সম্পত্তি তাদের নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। যেমন- যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তখন তার স্ত্রী ১/৮ অংশ পাবে; এখন তার দুই স্ত্রী হলে তারাও ১/৮ অংশ সম্পত্তি পাবে এবং তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নিবে। অর্থাৎ ১/৮ কে দুই ভাগ করলে দাঁড়ায় ১/১৬ এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেক স্ত্রী ১/১৬ অংশ করে পাবে।

কুরআন এবং বাংলাদেশের মুসলিম আইনের ব্যাখ্যাতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিধানটি স্পষ্ট। অর্থাৎ স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হচ্ছে স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার। সে নিজে যতো ধন-সম্পদের মালিকই হোক না কেনো এই অধিকার সর্বাবস্থায় বহাল থাকে।

৩.৫ পিতার সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব

ইসলামী বিধানে একজন স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ন্যায় পিতার সম্পত্তিতেও অংশীদারীত্ব লাভ করে যার মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী শরীয়তে কন্যাকে পুত্রসন্তানের ন্যায় পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার করে দেওয়া হয়েছে। কেননা কুরআনে কন্যা ও পুত্র উভয় সন্তানের সম্পত্তির অংশই সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা আছে। ফলশ্রুতিতে ইসলামী আইনে সন্তানের প্রাপ্ত নির্ধারিত অংশ একটি কুরআনিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। আর পবিত্র কুরআনে বর্ণনাকৃত এই উত্তরাধিকার বিধানানুসারে মৃত পিতার স্বাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পুত্র ও কন্যার মধ্যে বন্টন করা হয়। এই বিধানানুযায়ী এক পুত্র সন্তানের অংশ হবে দুই কন্যার অংশের সমান। এ প্রসঙ্গে কুরআন এ বলা হয়েছে: “আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের আদেশ করেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। তবে যদি শুধু কন্যা থাকে দুজনের অধিক তাহলে তাদের জন্য ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক...”^{৭৯} উল্লিখিত আয়াতে কন্যাসন্তানকে ছেলের সন্তানের ন্যায় সম্পত্তির অংশীদার করে দেওয়া হয়েছে। অথচ জাহেলিয়া যুগে নারী ও কন্যাসন্তানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে পঙ্গু করে রাখা হত। তাকে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হত না।^{৮০} নারীকে উত্তরাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে মীরাসের মাল মনে করা হত এবং পুরুষরা তাদের নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিত। কিন্তু ইসলাম নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করে তাদের অবমাননাকর জীবনের অবসান ঘটিয়েছে।

৩.৬ সন্তানের সম্পত্তিতে মাতার স্বত্বাধিকার

ইসলাম ধর্মাবলম্বী স্ত্রী তার সন্তানের সম্পত্তিতেও মাতা হিসেবে স্বত্বাধিকারী হয়। বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে যেসব সদস্যকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে তন্মধ্যে মাতা অন্যতম। নারী হিসেবে মাতা মৃত সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার রাখে। যখন মৃত ব্যক্তির সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকবে অথবা তার দুই বা ততোধিক ভাই-বোন থাকবে, তখন মৃত ব্যক্তির মা মোট সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির যখন কোনো সন্তান থাকবে না এবং মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনের সংখ্যা তিন-এর অধিক হবে না, তখন সেই মৃতের মা মৃতের সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে।^{৮১} আবার যখন মৃত ব্যক্তির পিতা এবং স্বামী বা স্ত্রী (spouse) জীবিত তখন স্বামী বা স্ত্রীকে দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে মা। অর্থাৎ যখন মৃত ব্যক্তির পিতা এবং তার জীবন-সঙ্গী জীবিত থাকে তখন আগে জীবন-সঙ্গীকে সম্পত্তি দিতে হবে এবং তাকে দেওয়ার পর যে সম্পত্তি থাকবে তার ১/৩ অংশ মাকে দেওয়া হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মৃতের মাতা মৃতের মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে না, মৃতের জীবন-সঙ্গীকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশ মাতা পাবে।^{৮২}

৪. তুলনামূলক আলোচনা

ইহুদী ও ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্য অধিকারের মধ্য দিয়ে যেখানে তার পুরো জীবনের ব্যয়ভার বহনের নিশ্চয়তা রয়েছে। এছাড়া তাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে সম্পত্তির মালিক

হিসেবে বিবেচিত হওয়া। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে কখনও সন্তান আবার কখনও স্ত্রী হিসেবে নারীকে অধিকার দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমনকি তাদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে ধর্ম দুইটির মধ্যে আইনগত দিক থেকে কিছু বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আইনী ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদানের বিষয়ে ইহুদী এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায়।

ইহুদী ও ইসলাম উভয় ধর্ম মতেই অর্থনৈতিক দিক থেকে নারী সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। কেননা ধর্ম দুইটি অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পুরুষের ওপর দিয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তার দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করবে পুরুষ। বিয়ের পূর্বে কন্যা হিসেবে তার ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে পিতা আর বিয়ের পরে পালন করবে স্বামী। অধিকন্তু ইহুদী আইন অনুসারে স্ত্রী প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হলেও স্বামী তার দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে পারে না। ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামীর সামর্থ্য বিবেচ্য বিষয় নয়।^{৪৩} ইসলাম ধর্মেও স্ত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার স্বামীকেই বহন করতে হয়।^{৪৪} স্ত্রীর এরূপ ভরণপোষণের অধিকার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তবে তালাকের ক্ষেত্রে আইনটির ভিন্নতা দেখা দেয়। উত্তরাধিকার সূত্রে স্ত্রীর সম্পত্তি প্রাপ্তির বিষয়ে ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট উভয় পুস্তকে পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকারের বিষয়টি লক্ষ করা যায়।^{৪৫} আর কুরআনে বর্ণিত বিধানে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে।^{৪৬} এবং উত্তরাধিকার আইনে কন্যাকে যাবিল ফুরুজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু কন্যা সন্তানের প্রাপ্ত অংশকেই ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে পুত্রের অংশ নির্ধারণ করার নির্দেশনা কুরআনে রয়েছে।

ইহুদী ও ইসলামী বিধানে স্ত্রীকে বিয়ের সময় আবশ্যিকভাবে মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদানের প্রচলন রয়েছে। ইহুদী কিতুবাহ বিধানানুযায়ী স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মূল্যবান সামগ্রী উপহারস্বরূপ প্রদান করবে। এটি ইহুদী স্ত্রীর একান্তই ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হয়, যার ওপর কারো কোনো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও এটির ওপর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার বজায় থাকে।^{৪৭} এদিকে ইসলামী বিবাহ রীতিতেও বিয়ের সময় স্ত্রীকে অনুরূপ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের বিধান রয়েছে যা দেন-মোহর হিসেবে বিবেচিত।^{৪৮}

অন্যদিকে বিধবা স্ত্রীকে ভরণপোষণ প্রদানের বিধান ইসলাম ধর্মে রয়েছে কিন্তু ইহুদী ধর্মে এরূপ বিধান লক্ষ করা যায় না। ইসলাম ধর্মে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে গেলেও ভরণপোষণের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এমনকি স্বামীর অবর্তমানে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও স্ত্রী ইন্দতকালীন সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ বাবদ খরচ পায়।^{৪৯} এমনকি ইসলাম ধর্মাবলম্বী নারী বিধবা হিসেবে ভরণপোষণ বাবদ খরচ পাওয়ার জন্য আদালতে আইনী সহায়তার জন্য ধর্মীয় বিধানের আনুকূল্য পায়। কিন্তু ইহুদী ধর্মানুসারী বিধবার ভরণপোষণ প্রদানের বিধান ওল্ড টেস্টামেন্টে পরিলক্ষিত হয় না।^{৫০} এছাড়া সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে ইহুদী বিধানে বর্ণিত উত্তরাধিকার আইনে সন্তান হিসেবে কন্যার মালিকানার বিষয়ে অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যদিকে কুরআনের সূরা আল-বাকারা এবং আন-নিসার বৈশিষ্ট্য কতগুলো আয়াতে স্ত্রীসহ অন্যান্য নারীর সম্পত্তির অংশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার একটি বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৫. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইহুদী ও ইসলাম ধর্ম দুইটির মধ্যে যেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। ধর্ম দুইটি যেহেতু সময় বা কালের এক বড় ব্যবধানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কালের বিবর্তনের সাথে সভ্যতাও ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হচ্ছে কাজেই কিছু বিষয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর সম্পত্তি প্রাপ্তির বা সম্পত্তির মালিক হওয়ার যত মাত্রায় সম্ভাবনা রয়েছে ইহুদী বিধানে তা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু ইসলামী বিধানে একজন স্ত্রী সম্পত্তি প্রাপ্তির বা সম্পত্তির মালিক হওয়ার যত মাত্রায় সম্ভাবনা রয়েছে সেই সমস্ত দিক থেকেই নারী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, ইহুদী ও ইসলাম ধর্মের আলোকে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে ইহুদী বিধান থেকে ইসলামী বিধানে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে ও অধিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে বর্তমান

বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইসলামী বিধান নারীকে অধিক মর্যাদাবান করলেও প্রচলিত সমাজে নারী বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যেমন- নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারগুলোতে নারীকে বিবাহকালীন দেনমোহর প্রদান একটি কাণ্ডজে প্রথায় পরিণত হয়েছে। উপরন্তু কন্যার পিতাকেই বর বা পাত্রকে যৌতুক প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ ধর্মের বিধান এবং সমাজের বাস্তবতার মধ্যে অনেক ব্যবধান লক্ষ করা যায়। ফলশ্রুতিতে নারী পারিবারিক সম্পত্তিতে তাদের অধিকার হতে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ Carmine Gorga, Towards the Definition of Economic Rights, *Journal of Market & Morality* 2, no.1, Spring 1999, pp.88-101.
- ^২ কিতুবাহ্ এর মাধ্যমে ইহুদী নারী খুব বেশী পরিমাণে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে না একথা সত্য কিন্তু সামান্য পরিমাণে হলেও নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ^৩ Louis H. Feldman and Salo Wittmayer Baron, *Maimonides*, Encyclopaedia Britannica, 25 August, 2024.
- ^৪ JSIJ- Jewish studies, an Internet Journal-1, 2002, pp. 69-107, <http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/isijj/.html1>.
- ^৫ Israel Law.Rev. 287.290-91, 1988.
- ^৬ Mary F. Radford, *The Inheritance Rights of Women Under Jewish and Islamic Law*, (23 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 135, 2000), p.172.
- ^৭ *Ibid*, pp. 171-173.
- ^৮ Rabbi Ari Marburger, *Estate Planning, wills and Halachah: A. Practical Guide to Hichor Yerusha*. Leshkowitz Law, PLLC.cf., <http://www.2011-aba-rpte-pp-v25-4-July-august-akhavan.authchckdajewish.law.pdf>
- ^৯ Bais Din Maysharimhttp, *Residential Lease: Halachic Form*, Bais Din Maysharim, (625 Forest Avenue, Lakewood, NJ, 08701).
- ^{১০} গণনা পুস্তক, ৩৬:৭-৯। “বনি-ইসরাইলের সম্পত্তি প্রাক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে যেতে পারবে না। প্রত্যেকে ইসরাইলদের তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া গোষ্ঠীর সম্পত্তি ধরে রাখতে হবে। বনি-ইসরাইলদের প্রত্যেকে যাতে পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তির মালিক থাকতে পারে সেইজন্য ইসরাইলীর গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মেয়ে ওয়ারিশকে তার পিতার গোষ্ঠীর কাউকে বিয়ে করতে হবে। সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয়।”
- ^{১১} গণনা পুস্তক, ৩৬ : ৩-৯। (এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত বাইবেল-এর উদ্ধৃত উক্তিগুলো বাংলায় অনুদিত বাইবেল হতে নেওয়া হয়েছে। পবিত্র বাইবেল: জুবিলী বাইবেল, ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ১৯৯৯)।
- ^{১২} তাওরাতে নির্দেশ রয়েছে পিতার মৃত্যুর পরে বড় পুত্রসন্তান দ্বিগুণ অংশীদারিত্ব পাবে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ : ১৭।
- ^{১৩} প্রাচীন ইহুদী সমাজের কতিপয় ইহুদী ধর্মতত্ত্ববিদ।
- ^{১৪} *The Inheritance Rights of Women Under Jewish and Islamic Law*, p. 173.
- ^{১৫} মো: আলতাফ হোসেন, *ইসলামী সমাজ চিন্তায় ন্যায়পরতা* (অপ্রকাশিত পিএইচডি গবেষণা পত্র), (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ২০১২), পৃ. ১৬৫।
- ^{১৬} Syed Abdul Ghaffar Bukhari, “Role of Women in the Development of Islamic Civilization”, *Jihat Al-Islam* Vol. 5, January-June, 2012, No- 2. p. 14.
- ^{১৭} Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam* (New York: ST. Martin's Press Inc., USA, 1998), p. 7.
- ^{১৮} সূরাহ আন-নিসা: ৪। (এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কুরআন-এর উদ্ধৃত আয়াতগুলো কুরআনের বঙ্গানুবাদ হতে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন শরীফ, অনু. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৯)।
- ^{১৯} Hamudah abd al Ati, *The family Structure in Islam* (Planifield : American Trust publications, USA, reprinted 1995), p. 64.
- ^{২০} Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (London: C.Hurst & co.ltd.1992), p. 111.
- ^{২১} *The family Structure in Islam*, p. 64.
- ^{২২} সূরাহ আন-নিসা: ৫।
- ^{২৩} *Jame at Tirmizi*, Translated and edited by Muhammad Musa, Vol. II (Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, First edition, 1996) p. 291-292, hadith no, 1049.

- ২৪ তবে সহজসাধ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, দেন-মোহরের পরিমাণ এতোটাই সামান্য হবে যে, মনে হবে সে ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে। মূলত শরীয়তে এই দেন-মোহর যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার পরিমাণটাও তেমনি গণনার যোগ্য হওয়া উচিত।
- ২৫ *The Rights of Women in Islam*, p. 113.
- ২৬ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৩৬।
- ২৭ মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১, ধারা- ১০।
- ২৮ সূরাহ আন-নিসা: ৩৪।
- ২৯ সূরাহ আর-তালাক: ৭।
- ৩০ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৩৬।
- ৩১ *The Rights of Women in Islam*, p. 116.
- ৩২ ইদত বলতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে বোঝায়। ইসলামী বিধানানুযায়ী নারীকে ইদত পালন করতে হয় দুই অবস্থায়। এক, তালাকপ্রাপ্ত অবস্থা এবং দুই, গর্ভবতী বৈধব্য। তালাকপ্রাপ্ত হয়ে কোনো নারী পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাকে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার সময় থেকে তিন ঋতুস্রাব অথবা চারমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা অথবা গর্ভবস্থায় বিধবা হয়ে কোনো নারী পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাকে গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময়কে ইদতকাল বলে। (Md. Akhtar Ali, *Moral codes in Islam and Christianity: A Comparative study* (Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2017), 129-130.
- ৩৩ Mohammad Ali Sayed, *The Position of Women in Islam: A Progressive View* (State University of New York Pr, 2004), p. 91.
- ৩৪ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৪০।
- ৩৫ সূরাহ আর-তালাক: ৫।
- ৩৬ মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১, ধারা- ৯। বিস্তারিত দেখুন, ডি. এফ. মুন্না, (অনূ) শেখ মতলুব আহমদ, *মুসলিম আইনের মূলনীতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭), ধারা: ২৭৭-২৭৮, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪।
- ৩৭ আন-নিসা: ১২।
- ৩৮ ডি.এফ. মুন্না, ধারা: ৬৩ (গ), পৃ. ১০২।
- ৩৯ সূরাহ আন-নিসা: ১১।
- ৪০ *The Rights of Women in Islam*, p. 3.
- ৪১ মো: আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন-কানুন*, ১ম খণ্ড (রাজশাহী: আনাম পাবলিকেশন্স, ১৯৮৩), পৃ. ৮।
- ৪২ তদেব, পৃ. ৯।
- ৪৩ *The Inheritance Rights of Women Under Jewish and Islamic Law*, p. 158.
- ৪৪ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৩৫।
- ৪৫ গণনা পুস্তক, ২৭: ৮-১১, ৩৬:২।
- ৪৬ সূরাহ আন-নিসা: ১১।
- ৪৭ Louis H. Feldman and Salo Wittmayer Baron, *Maimonides*, Encyclopaedia Britannica, 25 August, 2024.
- ৪৮ সূরাহ আন-নিসা: ২৪-২৫।
- ৪৯ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৩৩। বিস্তারিত দেখুন, মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১, ধারা-৯।
- ৫০ *The Inheritance Rights of Women Under Jewish and Islamic Law*, p. 171.

A Study of the Concept of Politics in ELT at the Tertiary Level English Language Education in Bangladesh

Sharmin Akhter*

[Abstract: The ideas, theories and practices of ELT developed in the countries known as BANA and these countries exported it to non-Western countries. The BANA promoted one global model for all contexts. Many applied linguists, for example, Phillipson (1992), Pennycook (1994), Canagarajah (1999) among others, consider this an act of methodological imperialism. Studies suggest that the same method does not work equally well in every situation, as learning cultures are significantly different, learning styles, strategies, beliefs and expectations also vary individually including syllabus, materials and testing. But the syllabus, materials, methods and testing in Bangladesh are top-down in nature. The objectives of this paper are to examine the politics in ELT, and to find out to what extent it is operative in ELT syllabus, materials and methodology. The findings of this study indicate that educational institutions are influenced by Western educational policies and rules. This paper also includes recommendations regarding the ways of resisting imperialism at the tertiary level in Bangladesh.]

Keywords: Imperialism, Politics in ELT, Culture-Sensitivity, Critical Pedagogy.

1. Introduction

The professional discourse of ELT is accurately dominated by the voice of the native speaker. The knowledge of the dominant groups is forced through the institutions and this knowledge serves to justify the status quo. The curricula are not based upon, nor does it focus on the local needs, wants and demands. Rather, a top-down Anglo-American package is forced upon them. The materials used in far non-BANA countries are also mostly centrally produced materials. They focus on Western values and Western teaching-learning culture. In fact, they do not consider the local contexts, history, culture, value, art and literature, person, places and things. Consequently, third world education including ELT totally lost their voice, individual identity and power of thinking.

However, these days there is a paradigm shift in education. The focus has shifted from the centre to the periphery, from the global to the local, and from a global model for all to a culture- and context- sensitive approach. Local values, religion, class, culture, gender issues and such play a vital role in language education. It is important to re-examine culture and shape an identity that is free from the colonial mentality and is imbued with local values, history and culture is the need of the time. English that is needed in the periphery should be more of ESP focus, for academic and professional purposes, and also for awareness. So, the purpose of English education today is far different from what it has been so far. This study examines the elements of politics in ELT in the particular context of Bangladesh through a formal systematic analysis. The study examines how far the Western models of ELT curricula, materials, methods are still used in Bangladesh and how far those cater for what is locally needed today.

2. Statement of the Problem

Educational institutions in Bangladesh are not free from Western social and cultural

* Ph.D Fellow, Department of English, University of Rajshahi, Rajshahi-6205.

influences. Teachers rarely explore non-Western ways of knowing. Importantly, non-Western ways of knowing promote culture- and context- sensitive practices and these practices can counteract politics in ELT. But teachers hardly explore the local needs of the learners. Institutions, communities and subjects should employ a relative autonomy to deal with dominating discourses. Importantly, the traditional education system does not make learners aware of justice and social equality. Besides, teachers cannot successfully educate racially, ethnically, culturally and linguistically diverse students. Again, teacher education programs hardly focus on culturally responsive practices. But these have emerged as core issues to both teachers and students in recent times. It is now essential to free ELT from imperialistic model and a culture- and context- sensitive, bottom-up or home-grown model should be developed and used.

3. Theoretical Developments in Politics in ELT

3.1 Imperialism and ELT

Imperialism is a silent process that is advanced by the cultural influences of dominating countries. In fact, imperialism has transcended from explicit military might to economic, educational, cultural and linguistic aspects. Moreover, the foundation of cultural imperialism is linguistic imperialism. ELT profession is enormously connected with global spread of the language. Mahboob propounds, “English is not only a language. There are a range of commercial, economic, and industrial interests that are affiliated to it”¹. Phillipson mentions, there is “the relationship between the scholarship of ELT and its function as an instrument of national policy in the post-colonial period”². The discourses of English as an international language and ELT acquire from the colonial expansion of English and Anglo-American imperialism. There are many institutions and agencies involved in the policy-making process. ELT is mainly funded and organized by the State in the Centre and Periphery. He adds, “it was the Centre’s perception of the periphery’s needs that served as the justification for the expansion of ELT...The architects of ELT considered the whole world as their laboratory”³. Canagarajah emphasizes that the assumptions motivating dominant pedagogical practices fail to accommodate the type of questions arising in the periphery educational context⁴. White states the relationship between ELT and business explicitly: “ELT is a service industry, supplying people with a service English language teaching- and a commodity- the English language”⁵.

3.2 Centrally-Produced Materials

Central ELT professional organizations, such as TESOL and IATEFL, for instance, are greatly influenced by the materialistic interests of publishing and research institutions. Again, many of the centre textbooks are increasingly produced and marketed to satisfy all the needs of the course. Periphery teachers are also dependent on the pre-packaged, ready-to-use materials freely provided by Western cultural agencies. In most foreign and second language situations, course books and textbooks, their contents, illustrations, pictures, maps, charts, graphs and even languages are chosen from the circumstances and situations of native English speaking countries. But tasks and materials should be taken from real-life. According to ELT norms, materials should be authentic. But what is authentic for native speakers is not authentic for non-native speakers. Additionally, a native-like accent is an impractical ambition.

3.3 Developing Learners’ Critical Thinking and Reshaping Teachers’ Role

ELT, as an important area of education, has its other important aims like helping learners develop their capability to think, analyze, interpret and evaluate; develop their critical

thinking; shape their ideology and value and to produce good citizens with cultural and historical awareness. Language education divorced from all these serious purposes proves to be a machine-like and superficial skills-training only, which is, of course, a part of it, but not the whole. Sociological, cultural and anthropological factors greatly influence language education of the time. Freire's (1970) 'liberating pedagogy'⁶, Holliday's (1994) 'appropriate methodology' or 'culture- and context- sensitive pedagogy'⁷, Kumaravadivelu's (2003) 'post method pedagogy'⁸ now dominate ELT theory and practice. Unfortunately, none of these ideas are reflected in ELT practices-syllabus, materials, methods and testing in Bangladesh. It is, therefore, critically important to resist linguistic imperialism in ELT.

In fact, teachers should be transformative intellectuals. Giroux defines a transformative intellectual as "one who exercises forms of intellectual and pedagogical practice that attempt to insert teaching and learning directly into the political sphere by arguing that schooling represents both a struggle for meaning and a struggle over power relations"⁹. Critical educators should learn to hear their students. As a critical pedagogy of English is concerned with helping students find, develop and create voices in English, a teacher should know both how to understand those voices and how to make those voices pedagogically attainable.

3.4 Decentring ELT

Though geographically we are free from the Western world, there is still colonization in various forms. In fact, there has been no perfect decolonization. Emotionally, we are slaves to the West. Said (1979) comments, "The West is the actor, the Orient a passive reactor. The West is the spectator, the judge and jury, of every facet of Oriental behavior"¹⁰. Decentring ELT has the aim of identifying, publicizing, and supporting ways in which English language educators can work locally and collaboratively to develop activities that respond to their specific circumstances. It is not about proposing new teaching methods, or changes in education policy. It is about recognizing contextually-situated, insider expertise and creativity in actual practice that supports teachers and groups of teachers in realizing and extending practices that are effective for them. In fact, teachers should develop contextually appropriate thinking and action (on methodology, materials design, curriculum development, teacher education, etc.) in relation to the needs of their local contexts. Local teachers' understanding of classrooms in their recent contexts helps focus workshop content on the needs and experiences of participants. Teachers should be supported to carry out organized exploratory action research in to address their practical concerns, deepening their understanding of issues and working out practical ways of addressing them. They should take responsibility for understanding and solving their problems. Nonetheless, there is the possibility that renewed centring can be carried out in the form of decentring. However, the crux of the decentring issue is a change in frame of mind. We should change the mindset first that everything foreign or imported is better than local. Changing mindset can direct teachers to develop confidence in their capacity to establish locally appropriate classroom practice. Actually, there is appropriateness of local literary texts over native speaker ones. Alam comments, "Such texts allow students to engage with material issuing from the world around them and help learners develop their confidence in their ability to use the language and to write back through it"¹¹.

3.5 Promoting Critical Pedagogy as a Way of Resisting Imperialism

The transfer of English is not an one-way process and attest to the agency found in local contexts. There is the need to 'decolonize our minds' with a view to critical

understanding of how ELT is conditioned by political and cultural forces. Pennycook theorizes that a critical practice in English language teaching must start with ways of critically exploring students' cultures, knowledge and histories in ways that are both challenging and supportive¹². ELT comprises a number of fundamentally unbalanced and discriminatory power relations. Critical pedagogy should be developed in order to enable teachers and learners to become aware of and resist the hegemonic influences associated with learning English. Waters comments, "in the interests of social justice, PC (Political Correctness) regards it as essential to support the cause of those in society who are perceived to be less powerful, and to oppose the more powerful party"¹³. Pennycook propounds, "one can start to develop a critical form of pedagogy that addresses the marginalizations and exclusions of schooling by encouraging students to develop their own voice"¹⁴. Akbari comments that critical pedagogy can provide the needed insight for learners so that they can transform the lives of the marginalized and help them attain better economic and social conditions¹⁵. In fact, critical pedagogy is influential in promoting agency and counter-discourses that are essential in creating conditions of possibility. This pedagogy must grasp a concept of resistance that will allow teachers to construct pedagogical practices that resonate with their students' experiences. Teachers should therefore attempt to critically question the hidden curricula of their courses, connect learning with the larger socio-political actualities.

4. Research Objectives

The objectives of the paper are to examine the politics in ELT; find out to what extent it is operative in ELT syllabus, materials and methodology; examine the prevailing teaching-learning culture of tertiary level in Bangladesh; and suggest measures to resist imperialism at the tertiary level of our country.

5. Research Methodology

The focus of the empirical investigation of the study is on the tertiary level English language teaching classrooms. Two major techniques of the survey method-questionnaire survey and interview were used for data collection. So, the methods of data collection include: 1) Teachers' questionnaire survey, 2) Teachers' interview, 3) Students' questionnaire survey, and 4) Students' interview. The survey was conducted in eight universities in Bangladesh. Entire Bangladesh is the area of study. As it is impossible to deal with this huge area, two districts- Dhaka and Rajshahi were selected. The cluster-sampling method was used for the selection of the universe of the empirical investigation. Kothari holds that if the total area of interest happens to be a big one, a convenient way in which a sample can be taken is to divide the area into a number of smaller non-overlapping areas and then to randomly select a number of these smaller areas (usually called clusters), with the ultimate sample consisting of all (or samples of) units in these small areas or clusters¹⁶. In Bangladesh, almost a homogeneous state prevails in the universities and educational institutions because similar educational programs are offered in higher educational institutions. An identical syllabus, textbooks and teaching materials are used in all the universities. Additionally, the teaching-learning practices in terms of the teaching method, the examination system and the evaluation criteria in these institutions are very similar. So it can be concluded that a homogeneous state prevails in the universities of Bangladesh. Therefore, the selected institutions can be taken as a microcosm of its type in the whole country. The institutions in the two districts represent the whole country. Samples are collected from Dhaka University, BRAC University, Daffodil University, Green University, Rajshahi University, Rajshahi University of Engineering and Technology, Varendra University and Bangladesh Army

University of Engineering and Technology. 24 teachers and 240 students (from departments of English) were selected for questionnaire survey. Besides, 8 teachers and 40 students were selected for interview.

There were 10 statements in teachers' questionnaire and 3 open-ended questions in teachers' interview. Again, there were 10 statements in students' questionnaire and 3 open-ended questions in students' interview. A five-point rating scale has been used for the convenience of collecting, processing, analyzing and evaluating data. The data of questionnaire survey were analyzed using SPSS software and the data of interview were analyzed qualitatively.

6. Results of the Empirical Investigation

6.1 Analysis of the Results of the Teachers' Questionnaire Survey

There were ten closed-ended statements in the teachers' questionnaire survey. The results are presented in the following table.

Table 1
Results of the Teachers' Questionnaire Survey

SL. No	Statements	Mean	Standard Deviation
1	Institutions maintain the status quo by making certain that existing social and economic relations remain constant.	3.61	0.73
2	Educators should be concerned about social inequality and social inequality should be eliminated.	4.40	1.07
3	EFL teachers should decide on their teaching strategies and techniques based on learners' specific features (e. g., age, gender, needs, and interests).	4.29	1.08
4	Educational institutions are influenced by Western educational policies and rules.	3.88	1.23
5	Environmental, social, and political issues are suitable topics to focus on in EFL classroom.	3.65	0.89
6	I relate content and instructional strategies to the cultural background of my students to help make learning meaningful.	2.80	0.90
7	Ideal ELT teaching materials are those which are designed locally and in the light of learners' real-life.	3.81	0.94
8	The syllabus should be negotiated and appropriated.	4.13	1.03
9	English language teaching beliefs, practices and materials are never neutral.	3.78	0.87
10	English language is linked to inequality and injustice.	4.09	1.18

Out of 10 statements 4 statements (nos. 2, 3, 8 and 10) have 'Very High' mean scores (between 4.0 and 5.0) in the questionnaire survey. Besides, 5 statements (nos. 1, 4, 5, 7 and 9) have 'High' mean scores (between 3.0 and 3.99). However, 1 statement (no. 6) has 'Low' mean score (between 2.0 and 2.99).

The results indicate that educational institutions are influenced by Western policies and rules. Teachers believe that institutions maintain the status quo by making constant the existing economic relations. Again, they believe that English language teaching beliefs, practices, materials are never neutral. Rather, English language is highly linked to inequality and injustice. Moreover, teachers do not relate content and instructional strategies to the cultural background of their students. According to the teachers, educators should be concerned about social inequality and it should be eliminated. They think that EFL teachers should decide on their teaching strategies and techniques based on learners' specific features such as age, gender, needs, interests etc. Again, the syllabus should be negotiated and appropriated. Importantly, teachers believe that ideal ELT teaching materials should be designed locally in the light of learners' real-life.

6.2 Analysis of the Results of the Teachers' Interview

There were three open-ended questions in the teachers' interview. The responses are analyzed and presented in the section below:

Question no. 1: Do you think that the current English language educational system at the tertiary level in Bangladesh fosters commoditization of education?

To some extent, the system fosters commoditization of education. It is expected as well as desired that tertiary level education will nurture intellectual growth and critical thinking. But unfortunately the market-infused approach to education regards knowledge as a commodity and institution as a marketplace where knowledge is sold in exchange of monetary value. One teacher propounds, "Yes, I think that many aspects of the approaches and practices prevalent currently in the English language education at the tertiary level in Bangladesh are contributing towards commoditizing the education itself". For one teacher, "Public universities are still struggling to impart knowledge and engage the students in intellectual pursuits". However, another teacher states, "It may be partially true but my university does not uphold this policy". Again, another teacher emphasizes, "Yes, most educational institutions are doing education business. They are selling education at a high price to the certificate-hungry consumers turning education into a commodity. In most cases the quality of the commodity is not taken into consideration".

Question no. 2: How can you deimperialize Syllabus, Materials and Methodology for English language teaching in Bangladesh?

According to the teachers, English Language Teaching in Bangladesh has very much a globalized framework. In our secondary and higher secondary levels, culture-sensitive syllabus and materials have been designed and are being taught in a traditional way. But promotion of English language teaching and learning at the tertiary level still bears the testimony of imperialism. Some teachers think that imperialistic flavour in education is not that harmful. Yet if it is essential to deimperialize, focus should be on context- and culture-based learning, creating a liberal learning environment for learners and teachers so that they are at ease with the English language. Besides, local EFL materials have to be developed. One teacher states, "Instead of using imported materials and methods, we should produce and use our home-grown materials which are suitable in Bangladeshi contexts and promote our national interest". Other teacher comments,

I do not believe that the wholesale rejection of anything British in particular and western in

general would serve the purpose of decolonizing our syllabus, materials and methods. It is rather imperative that we take the route of glocality, eclecticism and empathic vision.

Another teacher mentions, “We should use local contents along with the global and ignore the myths of Standard English”. Moreover, another teacher propounds,

Instead of blindly following the Western or the traditional syllabus, materials, and methodology, we need to adapt to the demand of the time. Evaluating our needs, goals, infrastructure, facilities, resources, students’ background, and their abilities we need to devise our own syllabus, materials, and methodology, which might require drawing both on the local and alien ideas.

Another teacher emphasizes,

I think this is a vital issue in English education system at the tertiary level in Bangladesh. First we need to identify the factors that are responsible for imperializing syllabus, materials and teaching methodology in Bangladesh. Education policy makers, syllabus designers and teachers must discern how strong these factors are. Finally, effective measures should be selected and implemented to deimperialize Bangladeshi syllabus, materials and teaching methodology.

Question no. 3: How can re-orientation of ELT towards local culture help boost learning?

For the teachers, it is a common belief as well as assumption of ELT course designers that as English is the language of the Western world, the representation of their culture is essential. As a result, the focus is more on their culture. But at least with the write-ups of the school textbooks our culture is presented in such a way that the students feel more comfortable with them. The local culture in ELT facilitates students to learn English in a familiar context. As they have a better understanding of the local culture, it boosts up their learning. Familiarity with the contents can be motivating. They are at ease with the language learning as unfamiliar things tend to make people tense and anxious that hampers learning. For them, language teaching should provide an individual growth, helping develop the faculty to think, analyze, interpret and evaluate. Teachers should promote social commitment and develop love for their own country. They need to try to develop individuals as good human beings with broader humanistic view and attitude to life and good ethical standard, honesty, integrity etc. They should produce skilled manpower to contribute to progress and development of the society. Besides, they should teach social conformity for the wellbeing of society. However, there has been little effort to synthesize them in the curriculum. Again, educators refuse to accept any social purpose whatever. But the aim of education should be to prepare learners for survival skills, social rules, ethical norms, traditions and customs. One teacher mentions, When the students will be able to relate the things they are learning in their ELT classrooms to the events and elements they are familiar with, this will of course help them engage in the learning process more spontaneously and enthusiastically.

6.3 Analysis of the Results of the Students’ Questionnaire Survey

There were ten closed-ended statements in the students’ questionnaire survey. The results are presented in the following table.

Table 2
Results of the Students' Questionnaire Survey

SL. No	Statements	Mean	Standard Deviation
1	People should be free from foreign social and cultural influences.	3.20	0.73
2	Your teacher should not only explore the Western ways of knowing but also explore non-Western ways of knowing.	4.58	1.11
3	Language presents people with different ways of expressing their views.	4.32	0.95
4	The syllabus of English should not be presented to students as something fixed.	3.77	1.06
5	Local teaching-learning is determined by theories and methods from Western countries.	3.47	0.99
6	Teachers in Bangladesh use Western teaching methodology.	3.05	0.81
7	English is used exclusively as the medium of classroom instruction.	3.28	1.07
8	Teachers must know about your experiences, culture, and interests as an individual.	4.10	0.88
9	I like the topics or contents of my English language/literature courses that are related to English speaking people's culture and society.	3.48	0.77
10	I believe that I learn better when I learn something in relation to my cultural contexts.	3.97	0.92

Out of 10 statements 3 statements (nos. 2, 3 and 8) have 'Very high' mean scores (between 4.0 and 5.0) in the questionnaire survey. Again, 7 statements (nos. 1, 4, 5, 6, 7, 9 and 10) have 'High' mean scores (between 3.00 and 3.99).

The results of the empirical study suggest that local teaching-learning is determined by theories and methods from Western countries. Besides, English is used exclusively as the medium of classroom instruction. But students believe that people should be free from foreign social and cultural influences. Again, language presents people with different ways of expressing their views. Students think that teachers should not only explore the Western ways of knowing but also explore non-Western ways of knowing. They must know students' experiences, culture, and interests as an individual. Moreover, students believe that the syllabus of English should not be presented to students as something fixed. Importantly, they believe in learning something in relation to their cultural contexts.

6.4 Analysis of the Results of the Students' Interview

There were three open-ended questions in the students' interview. The responses are analyzed and presented in the section below:

Question no. 1: What do you think about fixed curriculum?

According to the students, fixed curriculum refers to a standardized and predetermined set of learning objectives, contents, and assessments that all students must follow. It has advantages like consistency and equity, accountability and quality assurance, continuity and progression. It has also disadvantages like lack of flexibility, limited relevance and

engagement, one-size-fits-all approach.

However, some students prefer fixed curriculum. For them, it is very important as curriculum reflects the education system. It sets goals and missions of our education. So, it should be fixed in education and it is essential for study. Importantly, few students add that it should be fixed by qualified people.

One student comments,

Curriculum is the main book where we can find the rules and instructions of our study. A fixed curriculum provides clear expectations and guidelines for what students should learn and the skills we should develop. It gives us the sense of assurance and academic barriers that we need to overcome. It gives a precise knowledge about what to read.

On the other hand, majority of the students think that the curriculum should not be fixed. Following a fixed curriculum makes the learning process boring. At present, different types of changes are seen in world and people are getting digitalized. So, we should change curriculum corresponding to them. Again, the students express that curriculum should be student-friendly. It is not convenient as it makes the student sceptical and stops them to think out of the box. Another student mentions,

A fixed curriculum limits us to one extend, whereas we should be more open to learn new dimensions in our education. It may limit a teacher's flexibility and creativity in designing lessons and activities that are engaging and relevant to their students. Fixed curriculum is a method to confine ourselves within a fixed syllabus which creates hindrances in our learning process. But the opportunity to explore a subject needs to be provided.

However, students think that different sorts of curriculum should be experienced to learn more. Fixed curriculum is needed to achieve academic accomplishments. But there should be vast contents without boundaries. There should be some level of flexibility. To sum up, curriculum should be a mixture of fixed and open topic.

Question no. 2: What do you think about fixed teaching method?

For the students, fixed teaching methods follow a set curriculum or approach without much deviation. These methods are often used in traditional education settings. Teaching methods help students master the content of the courses and learn how to apply them in particular contexts.

Very few students comment that fixed teaching method is appropriate. However, they add that it should be fixed by qualified people in a good way. On the contrary, majority of the students express that there is no room for fixed teaching method in modern age. Teaching method should not be like 'one size fits all'. It is backward and not a really enjoyable way of teaching. There should be diversity in teaching method. One student expresses,

Fixed method seals off the opportunity to explore. Students find fixed teaching method unhelpful and rigid. Teaching should be fluid and dynamic. It is to confine ourselves within a certain teaching system. It reduces the scope of learning new things. It is never helpful as the teaching method cannot be constant because different contexts require different approaches.

Actually, there should be changing method in teaching with the passage of time. Versatile and inclusive methods need to be acquired. Teachers should implement efficient and engaging methods of teaching. Post-method pedagogy should be followed. Differentiated instruction, personalized learning, and a variety of instructional strategies can help tailor

teaching to the diverse needs of students and promote engagement and effective learning.

Question no. 3: Should the learners develop opportunity to connect content knowledge with personal experiences/contexts?

Majority of the students comment that there should be opportunities to implement knowledge in our practical life. They talk about the benefits of connecting content knowledge with personal contexts. Learning by relating personal experience enhances the teaching and learning method. The knowledge connected to personal experience is more fruitful in learning. It would provide practice of students' learned theories. Gathering knowledge by experience would be more practical. It will be remembered for a long time and make them able to use knowledge in real-life. Bookish knowledge is important. But not all those bookish knowledge can be implemented in real-life. People explore and learn many things from their personal experiences. By using personal experiences, others can know new facts about the situation. And they can take extra preparations beforehand. One student comments, Learners should connect content knowledge with personal experiences as it is interesting. They should do it to share their experiences and various ideas. It enhances the knowledge. We can call it self-education and it is needed for better life. Knowledge is always best when relatable. It would enlighten us in the use of knowledge. It is an effective way for learners to better understand and retain information. But the environment of educational institutions in Bangladesh is not friendly about this. However, very few students express that there should be no connection between content knowledge and personal experiences. The propriety of the actual content should remain intact.

7. Discussion and Implications of the Findings

Teachers do not employ a variety of resources and teaching techniques. Students' ways of making meaning of the world and their own histories are not given importance. But students learn better when they learn something in relation to their cultural contexts. In fact, they should have the opportunity to connect content knowledge with personal experiences/contexts. Again, it is important to develop students' critical thinking ability which is an essential component of education. Teachers should make learners aware of power and how power relations work in a society. Acquiring critical awareness about the surroundings is supposed to help learners to the extent that they would be able to shape their individual identities. Besides, teachers should develop personal theories based on their contextual knowledge. They should reflect on their classroom practice, observe and analyze them. The 'eclectic' approach to syllabus design will be suitable and appropriate to address the needs of the learners. Again, the teaching materials should be designed by taking into account some culturally-specific traditions of teaching and learning in Bangladesh. Application of the eclectic method will facilitate the learning process and promote learners' autonomy. In fact, teachers should have massive training to develop a culture-sensitive approach to teach English language. Imperialism can be resisted at the tertiary level of our country if teachers and students become aware of the politics in ELT and promote culture sensitive practices.

8. Recommendations

On the basis of theoretical discussion and findings of the empirical study of the research work, the researcher would like to recommend the following means and measures that would be helpful in resisting imperialism at the tertiary level in Bangladesh. At first, Western educational policies and rules should be critically analyzed and teachers should

exercise a relative autonomy by promoting culture- sensitive practices. Established practice should be challenged through critical reflection and students should be empowered to understand and transform their current realities. Importantly, teachers should be concerned about social inequality and find ways to eliminate it. Besides, they should raise learners' awareness of the power relations present in society. Moreover, teachers should explore non-Western ways of knowing along with Western ways of knowing. They should focus on students' experiences, culture, and interests as an individual. They should use teaching strategies based on learners' specific features. Culturally relevant curricula, contents and instructional strategies should be used in order to be free from foreign social and cultural influences. ELT instruction books should be designed in accordance with Bangladeshi learners' real-life. Again, teachers should give importance in understanding home culture. Learners should learn something in relation to their contexts. They should encourage students to use their native languages when necessary. They should develop critical consciousness of students by examining their own culture and society. Examples should be chosen from students' everyday lives. Furthermore, teachers should encourage students to consider alternative views and bring about social justice and equality. There should be equal opportunity for all students. Besides, the syllabus of English should be dynamic, negotiable, flexible and appropriated. In fact, teachers need to develop contextually appropriate thinking and action in relation to the needs of their local contexts.

9. Conclusion

In the present context of Bangladesh when an important issue is identity shaping and forming values and ideologies, a home-grown, culture- and context- sensitive model is the need of the time. We should develop a model that proves culture- and context-sensitive, matches with the teaching-learning realities, classroom conditions, beliefs and expectations, style and strategy preferences and also takes into consideration the teacher and student resourcefulness, along with other factors. But the reality is that universities in Bangladesh hardly focus on culturally responsive practices. Local teaching-learning is determined by theories and methods from Western countries. However, teachers and students believe that ideal ELT teaching materials need to be designed locally in the light of learners' real-life. Though teachers believe in the importance of culturally responsive practices, they do not teach according to students' interests and learning preferences. In the context of tertiary level English language teaching in Bangladesh, there is a huge gap between realities and necessities of context-sensitive teaching. The recommendations made in this paper on the basis of the research findings can be of great help in developing culture- and context- sensitive model at the tertiary level in Bangladesh. Such a model will hopefully produce a better learning outcome in the country and better graduates whose identity and value will be shaped after the present realities of local diversity and global connectedness.

Notes & References

1. Mahboob, Ahmar. "English: The Industry", *Journal of Postcolonial Cultures and Societies*, vol. 2, no. 4 (2011), p. 46.
2. Phillipson, Robert. *Linguistic Imperialism* (Oxford: Oxford University Press, 1992), p. 76.
3. *Ibid*, p. 179.
4. Canagarajah, Suresh. *Resisting Linguistic Imperialism in English Teaching* (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 13.

5. White, Ronald. *The ELT Curriculum: Design, Innovation, and Management* (Oxford: Blackwell, 1988), p. 221.
6. Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed* (New York: The Continuum International Publishing Group, 1970).
7. Holliday, Adrian. *Appropriate Methodology and Social Context* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
8. Kumaravadivelu, Bala. "A Postmethod Perspective on English Language Teaching", *World Englishes*, vol. 22, no. 4 (2003), pp. 539-550.
9. Giroux, Henry. *Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning* (South Hadley, MA: Bergin Garvey, 1988), p. 174.
10. Said, Edward. *Orientalism* (New York: Random House, 1979), p. 109.
11. Alam, Fakrul. "Using postcolonial literature in ELT". *Imperial Entanglements and Literature in English* (Dhaka: writers.ink., 2007), p. 381.
12. Pennycook, Alastair. *The Cultural Politics of English as an International Language* (Harlow: Longman, 1994), p. 311.
13. Waters, Alan. "ELT and 'the spirit of the times'", *ELT Journal*, vol. 61, no. 4. (Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 2.
14. Pennycook, Alastair. *Critical Applied Linguistics* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers, 2001), p. 130.
15. Akbari, Ramin. "Transforming Lives: Introducing Critical Pedagogy into ELT Classrooms", *ELT Journal*, vol. 62, no. 3 (2008), p. 281.
16. Kothari, C. R. *Research methodology: Methods and techniques* (New Delhi: Wishwa Prakashan, 1990), p. 65.

Modernity and Spiritual Crisis in T.S. Eliot's Poetry: A Multifaceted Exploration

Md. Mahmud Hasan Chowdhury*

[Abstract: T.S. Eliot's poetry serves as an enthralling lens that examines the complexities of modernity and spiritual crisis. This article provides a concise overview of an extensive exploration of Eliotian views of modernity and spiritual crisis in Eliot's seminal works, especially *The Waste Land*, *Ash-Wednesday*, *Journey of the Magi*, *The Four Quartets*, *The Hollow Men*, and *The Love Song of J. Alfred Prufrock*. In a time marked by post-war disillusionment and cultural turmoil, Eliot's poetry vividly illustrates the collapse of traditional values, spiritual crisis, and the absence of ethical and religious values that give rise to perennial anguish, disquiet, and chaos. Drawing from a diverse array of critical perspectives, including existentialism, modernism, religiosity, and historical context, this study aims to unravel the multi-layered intricacies of Eliot's response to the challenges presented by the modern world. By scrutinizing modern humanity's core issues, this study illuminates how Eliot's poetry acts as a poignant reflection of the human condition amid a rapidly transforming world, offering enduring insights into the eternal struggle for meaning in the face of modernity's upheaval.]

Keywords: Modernity, spiritual crisis, modern humanity, existentialism, T.S. Eliot's poetry.

1. Introduction

The poetry of Eliot stands as a literary testament to the profound shifts and disorienting changes that characterized the early 20th century. Amidst the tumultuous backdrop of modernity, Eliot's verses echo the complex and often contradictory relationship between the individual and a rapidly evolving society. One of the central themes that permeates Eliot's work is the exploration of modernity and the accompanying spiritual crisis that afflicted his era. Through the lens of his poetry, Eliot grapples with the disintegration of traditional values, the fragmentation of human experience, and the ever-present avidity for spiritual meaning in an increasingly secular world. Exploring modernity and the spiritual crisis in Eliot's poetry involves delving into the complex interplay between the poet's work and the socio-cultural context of his time.

Eliot, an eminent figure in the realm of English literature, distinguished himself as a modernist poet, traditionalist, philosopher, and mystic.¹ Born in 1888 and coming of age during the early 20th century, Eliot witnessed the aftermath of World War I,² the rise of industrialization, the collapse of traditional values, and the questioning of established beliefs.³ Because the tormenting effects of the war shattered people's beliefs, they gradually adopted modernity as an alternative to spirituality.

The term *modernity* refers to the period characterized by rapid technological advancements, urbanization, and a departure from traditional norms and values.⁴ Eliot's poetry reflects a deep engagement with the challenges and disorientations brought about by modernity.⁵ His work is often seen as a response to the fragmentation and alienation experienced by individuals in the face of a rapidly changing world⁶ where everyone seems to find inner peace beyond religious belief. However, Eliot grapples with the

* Ph.D. Fellow, Department of English, University of Rajshahi, Rajshahi-6205.

impact of modernity on identity, morality, and the human condition, and his poetry serves as a lens through which the complexities of the modern era are explored.

At the core of Eliot's poetic exploration lies the theme of an intense spiritual crisis. This crisis seemingly has its origin in the human spirit.⁷ It means that the spirit is the core section of humans that can give psychological comfort to a man. Conversely, the upheavals of modernity led to a profound sense of disconnection and a loss of spiritual grounding for many individuals.⁸ Eliot, a deeply religious thinker, addresses this crisis by delving deep into issues of faith, existential angst, and the search for meaning in an increasingly secular and fragmented world.⁹ His poetry reflects a tension between the desire for spiritual transcendence and the harsh realities of a modern society marked by disillusionment and decay.¹⁰ Furthermore, the study will draw on relevant literary criticism, historical context, and Eliot's essays to provide a comprehensive understanding of how the poet navigates the complexities of modernity while simultaneously exploring avenues for spiritual renewal and redemption in his poetry.

The motive of this multifaceted exploration is to untie the intricate connections between the concept of modernity and the spiritual crisis as manifested in the poetry of Eliot. In delving into Eliot's work, the study aims to discern how the poet grapples with the profound transformations brought about by modernity, examining the impact on individual identity, societal values, and the broader human experience. By closely analyzing Eliot's poems, such as *The Waste Land*, *The Love Song of J. Alfred Prufrock*, *The Hollow Men*, *Ash-Wednesday*, *Journey of the Magi*, and *The Four Quartets* the study seeks to uncover the nuances of his response to the disorienting effects of modernity on the spiritual and existential dimensions of life. Additionally, the study endeavors to elucidate how Eliot's exploration of a spiritual crisis serves as a thematic anchor in his poetry, offering insights into the tensions between tradition and innovation, faith and doubt, and the quest for meaning amidst the chaos of the modern world. Moreover, the research aims to contribute to the broader discourse on literary modernism and its engagement with the socio-cultural challenges of the early 20th century. By contextualizing Eliot's poetry within the larger framework of modernist literature, the study seeks to enrich our understanding of how the poets of contemporary Western civilization reacted to the seismic shifts of their time. Through this exploration, the research aspires to provide scholars, students, and readers with a nuanced interpretation of Eliot's poetic responses to modernity and the spiritual crisis, shedding light on the enduring relevance of his work in navigating the complexities of contemporary existence.

2. Literature Review

Many scholarly inquiries have focused on Eliot's exploration of modernity and the spiritual crisis in his poetry. Numerous critics and scholars have offered diverse perspectives on Eliot's works and discussed the impact of modernity on literature and the poet's response to the spiritual challenges of his time. Besides, several authors have also emphasized Eliot's deep engagement with the cultural and intellectual currents of the early 20th century.

In his seminal work, *The Waste Land*, Eliot weaves a tapestry of fragmented voices and cultural allusions that capture the disintegration of traditional values¹¹ in the aftermath of World War I. Literary critic Leila Bellour in her article "The Religious Crisis and the Spiritual Journey in TS Eliot's *The Waste Land*" argues that Eliot's poem stands as a profound diagnosis of the spiritual malaise of the modern world, reflecting the fragmentation and loss of meaning experienced by individuals in the face of social and cultural upheavals.¹² Bellour highlights the lack of religious principles of the

contemporary modern man in their approach to life as the main issue creating anarchy, desperation, and social disintegration in her discussion on *The Waste Land*. The denunciation of religion is at the core of modernity, as Bellour views it in her article.

The spiritual crisis in Eliot's poetry is often seen through the lens of his religious and philosophical perspectives. Critics like MK Von Bergen have explored Eliot's Quartets. The poetry in the Quartets undergoes a parallel purifying process intended to replace linguistic error with a purposeful exploration of spiritual experience. Von contends that Eliot's exploration of spiritual themes in *The Four Quartets* represents a journey toward Christian mysticism and a search for a transcendent spiritual reality amid the chaos of modern existence.¹³ The insightful speculation on *The Four Quartets* by the scholar profoundly presented two contradictory themes in a mutual bond of mysticism and spiritual barrenness that translucently introduced modern problems.

Moreover, Gillis discusses spirituality in his article "The Spiritual Status of T. S. Eliot's Hollow Men." In his analysis, *The Hollow Men* commences with a recognizable portrayal of a desert setting where a chorus proclaims their spiritual condition as that of Hollow Men- mere straw effigies trapped in a state of rigid immobility.¹⁴ Here, the critic visualizes the terrible spiritual insipidity of the modern man compared to that of the Hollow Men. "This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper" suggests a resigned acceptance of a gradual decline rather than a dramatic culmination.¹⁵

Additionally, scholars such as Menand have delved into Eliot's poetry, examining the idea of modernity as a catalyst for feelings of alienation and disillusionment, as discussed in his article entitled *T. S. Eliot and Modernity* placing Eliot within the broader context of Modernist literature and contending that Eliot's poetry reflects a tension between a nostalgic yearning for a pre-modern past and an acknowledgment of the inevitability of progress and change.¹⁶ As the observation goes, Eliot desperately endeavors to make a bridge between poetry and belief. Sometimes poetry is like a piece of chalk that is used to rectify fragmented beliefs. The scholar Mendad tried to show Eliot's poetry as a rectifier of the modern people that helps them to overcome their spiritual crisis.

In addition to traditional literary analysis, the exploration of Eliot's works has benefited from interdisciplinary approaches. Cultural critic and theorist Amélie Ducroux's *The Feeling of Thought: TS Eliot's Programmatic Poetry* investigates the political and cultural dimensions of Eliot's response to modernity, examining how the poet negotiates between conservatism and a recognition of the need for cultural renewal.¹⁷ Cultural restoration signifies the decay of basic spiritual constituents- such as religiosity as scholars like Liela Bellour believed that the rejection of religion is the root of all problems in modern man.

The multifaceted exploration of Eliot's poetry in the context of modernity and spiritual crisis is further enriched by feminist perspectives. Feminist scholar Costello Virginia has interrogated Eliot's portrayal of women in his works, particularly in *The Waste Land*, highlighting the gendered aspects of the spiritual and societal disintegration depicted in the poem.¹⁸

In summary, the extended literature review reveals a rich tapestry of critical insights into Eliot's exploration of modernity and spiritual crisis in his poetry. Scholars have approached the subject from various angles, including formalist analysis, religious interpretation, political and cultural critique, and feminist perspectives. The multifaceted nature of this exploration underscores the enduring relevance and complexity of Eliot's poetic engagement with the challenges and crises of his tumultuous era. In the existing

literature on Eliot's poetry scholars seem to explore modernity and spiritual crisis to a reasonable extent. Still, they lack a comprehensive examination of the nuanced intersections and interrelation between these core thoughts of spiritual vacuity and modernity, affirming a more in-depth and multifaceted exploration.

3. Methodology

This multifaceted exploration of the concept of modernity and spiritual crisis in Eliot's poetry used a comprehensive methodology that combines close textual analysis, historical contextualization, and interdisciplinary engagement. The study began by meticulously examining Eliot's major poetic works through the approach of existentialism and a close reading approach to discern the intricate ways in which the poet grapples with the challenges of modernity and articulates responses to the spiritual crisis of his time. Concurrently, historical contextualization was applied to situate Eliot's works within the socio-cultural milieu of the early to mid-20th century, drawing on relevant historical events and cultural shifts. Additionally, this interdisciplinary methodology aims to uncover the layers of meaning in Eliot's poetry and contribute to a more profound comprehension of the intricate relationship between literature, modernity, and spirituality in his oeuvre.

4. Discussion

The discussion of this multifaceted exploration of modernity and spiritual crisis in Eliot's poetry reveals a profound engagement with the challenges of the modern era and a nuanced response to the accompanying spiritual crisis. In *The Waste Land*, Eliot employs a fragmented and allusive style to mirror the disintegration of cultural and spiritual values Post-World War I.¹⁹ In the famous opening lines (1-4) of *The Burial of the Dead*, in *The Waste Land* Eliot shows us the catastrophic result of the loss of spiritual values.²⁰

“April is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.”²¹

These lines vividly depict an abysmal spiritual emptiness amidst an apparent resurgence. The poem captures a figurative surge of pessimism concerning the state of modern humanity. While April conventionally symbolizes rejuvenation, love, hope, and growth in European traditions, Eliot paradoxically presents it as the harshest and most heartless month, renewing sorrow and melancholy. The aftermath of World War I has stripped April of its positive connotations, and Eliot's intricate structure and inter-textual references reflect his endeavor to confront the fragmented nature of contemporary existence. “Breeding Lilacs out of the dead land”²² is a satirical statement because there remains no hope of having any living things in a dead land. This critical assertion provides us with the crystalline image of modern society- false hope of escaping death. The modern people reject the afterlife cool bloodily and express the affirmation of spiritual peregrine in quest of salvation.

Similarly, *The Love Song of J. Alfred Prufrock* captures the essence of Eliot's exploration of the modern individual's internal struggles. Eliot intensely depicts the complexities of the modern world through Prufrock's inconsistent psychology.²³ Prufrock's hesitations and anxieties reflect a personal spiritual crisis, emblematic of the broader societal unease during this period.²⁴

“I have heard the mermaids singing, each to each
I do not think that they will sing to me.”²⁵

These lines encapsulate the isolation and disconnection that permeate Eliot's portrayal of the modern soul and illustrate the absolute vacuity of modern life resulting in an intense spiritual crisis. Moreover, the lines are so absurd that seem to reduce the appeal of life and connect to the features of modernism, existentialism, nihilism, and absurdity. These features belong to the meaninglessness and self-depiction of life.²⁶ Throughout the poem the author presents self-vision, revision, fantasies, chaos, and futility of life which illustrates modern men's spiritual emptiness. However, it would be only fair to say that modern man's dilemma and confusing state of mind echo so vividly in the split personality of Prufrock to illustrate the spiritual crisis of a modern man like him living in the modern Western civilization.

In *The Hollow Men* Eliot presents the distinct characteristics and the spiritual state of a modern man. In the poem, the speaker says:

"This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they receive ..."²⁷

Here, the "stone" serves as an allusion to a passage in *The Waste Land*, where Eliot draws a connection between the refuse of contemporary humanity and the enduring nature of the stone. Moreover, Eliot uses a lot of allusions as a literary device to reflect the concept of modernism in contemporary society. The concept of modernism leads society into spiritual vacuity. Eliot illustrates spiritual emptiness in *The Waste Land*, drawing parallels with *Heart of Darkness*, where Mr. Kurtz's so-called qualities ultimately lead him into a state of complete spiritual hollowness. The title of this poem- *The Hollow Men*- indicates and reflects the emptiness of life resulting in spiritual infertility. Eliot suggests that modern individuals have become callous as nihilism and emptiness overrule their existence. Eliot's writings pay considerable attention to the uncertainties of contemporary life, with his poems comprised of fragments that vividly portray this ambiguity. Indeed, the poem highlights the challenges faced by those lacking faith, possibly aiming to communicate Eliot's belief that many individuals grapple with identity confusion. He conveys the notion that modern culture struggles to nurture spirituality and belief, resulting in a prevailing confusion among people about their true selves.

The study also delves into *The Four Quartets*, where Eliot synthesizes his reflections on time, divinity, and human experience. One of the quartets, *Burnt Norton* shows a meditative exploration of spiritual redemption with lines (62-63) like -

"At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is"²⁸

Here, Eliot represents a profound search for spiritual equilibrium in the face of temporal disarray.²⁹ Moreover, he asserts the world as a place of inhumanity to show the subtle changes of modern people and visualizes the eternity of God.

In *Ash-Wednesday* there is a new austere humility. There Eliot encapsulates a thematic essence of turning away from the worldly realm and directing one's focus toward God. Eliot's dissatisfaction with the tangible, contemporary world is palpable, driven by a profound sense of sickness and decay that he perceives as intrinsic to modern life.³⁰

"Because I do not hope to turn again
Because I do not hope."³¹

There are 'hopes' to avert from worldly desire.³² In these lines the poet expresses his disappointment to see the contemporary situation of the modern age which is full of materialistic components. Besides, this poem also reflects upon the sterility and the

erosion of spiritual significance in the face of societal decay, portraying Eliot's yearning for a transcendent connection and a departure from the disillusionment prevalent in the materialistic and spiritually depleted aspects of the modern era. Basically this poem focuses on repenting for the past and searching for spiritual aid on behalf of sinful mankind. The presence of Andrews's sermon in *Ash Wednesday* is the indicator of praying to God for forgiveness from sin.³³ However, this is the most significant appeal of Eliot to the modernist society to "turn" to their spiritual asset.

In other lines (213-214) of this poem, the poet ventilates his sincere desire to establish a harmonious bond with God that seems absent in this contemporary world.

"Even among these rocks
Our peace in His will."³⁴

The 'rocks' symbolize the desolate landscapes of contemporary civilization. Our peace in His will, a concept borrowed from Dante's *Divine Comedy*, conveys that true joy is discovered through surrendering to God's will. In this expression, the poet aspires to revive a sense of spirituality amid the present day, referring to it as a religious transition. In *Journey of the Magi*, Eliot also talks about modernism and the modern crisis of this era.

"There was Birth, certainly,
We had evidence and no doubt, I had seen birth and death."³⁵

In this poem, Eliot seems to border on the domain of the existentialistic crisis of the modern world.³⁶ Existentialism asserts the "absurdity of the human condition,"³⁷ with Heidegger contending that this signifies a Godless universe.³⁸ Here words like "birth", "death" and "no doubt" are induced to back up the religious belief. As modern people keep themselves aside from their religious faith, the poet reflects on their present situation and calls them back to restore their faith.

Through these textual references and close analysis, the study attempts to illuminate Eliot's multifaceted response to the spiritual crisis within the context of modernity. The poet's intricate use of language, symbolism, and intertextuality reveals a rich tapestry of meaning that contributes to a deeper understanding of the complex relationship between literature, spirituality, and the challenges of the modern age in Eliot's poetry. In exploring the root causes of the modern psyche's meaninglessness and spiritual paralysis, Eliot delves deeply into the complexities of the modern age and envisions how the tormented soul, in its quest for freedom, can achieve spiritual tranquility amidst the chaos.

5. Conclusion

In conclusion, this multifaceted exploration of modernity and spiritual crisis in Eliot's poetry unveils a complex interweaving of themes that captures the essence of the poet's response to the tumultuous early to mid-20th century. Eliot's poetic works serve as poignant reflections on the disintegration of traditional values, the existential angst of individuals grappling with the challenges of modernity, and the profound search for spiritual renewal. Through a close examination of these texts and the contextualization within historical and cultural shifts, the study has illuminated Eliot's nuanced exploration of identity, morality, and the human condition. The incorporation of interdisciplinary perspectives, including literary criticism, cultural studies, and theology, has enriched our understanding of the intricate relationship between literature, modernity, and spirituality in Eliot's poetic oeuvre. Ultimately, Eliot's poetry emerges as a profound testament to the enduring human quest for meaning and transcendence in the face of a rapidly changing and often disconcerting world. This exploration contributes to the scholarship on T.S. Eliot and provides valuable insights into the broader challenges and aspirations of individuals navigating the complexities of the modern era.

Notes & References

1. Anna Mukamal, "Creative Impulse in the Modern Age: The Embodiment of Anxiety in the Early Poetry of TS Eliot" (Durham: Duke University, 2017), p. 1. <https://hdl.handle.net/10161/14271>
2. Michael Bell and Scott Freer, eds., *Religion and myth in TS Eliot's poetry* (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016), p. 65.
3. Gwenda Koo, "A Fragmented Poetic Consciousness in TS Eliot's The Waste Land", *Postgraduate English: A Journal and Forum for Postgraduates in English*, no. 42 (Durham: Durham University, 2021), p.2. <https://postgradenglishjournal.awh.durham.ac.uk/ojs/index.php/pgenglish/article/>
4. Victoria Nicole Kortess Papp, *Ritual in TS Eliot's longer poems* (Canada: Université Laval, 1997), p.12.
5. Raghukul Tilak, *T.S. Eliot: The Waste Land and other Poems* (New Delhi: Rama Brothers, 2004), pp. 2-4.
6. Francis Joseph Smith, *The Idea of Tradition in the Writings of TS Eliot* (Chicago: Loyola University, 1948), p.16.
7. Reinhard Bendix, "Tradition and modernity reconsidered", *Comparative studies in society and history*, vol.9, no.3 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), p.294. <http://www.jstor.org/stable/178351?>
8. Muhammad Ehsan et al., "Modernism in the Eyes of TS Eliot: Break from Traditional Writings with Literary Forms and Movements", *Studies in Literature and Language*, vol.13, no.6 (Quebec City: Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture, 2016), pp. 66-70. <http://dx.doi.org/10.3968/9093>
9. Laurie B. Agrimson and Lois B. Taft, "Spiritual crisis: a concept analysis", *Journal of Advanced Nursing*, vol. 65, no. 2 (New Jersey: Wiley, 2009), p. 455. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04869.x>
10. Thaif Ahmed Mahmood and Mohammed Salih Obaid, "Loss of identity in TS Eliot's poems selected poems", *Journal Educational Verkenning*, vol.4, no.1 (Limpopo province: Hoedspruit Development Publication, 2023), p. 46. <https://doi.org/10.48173/jev.v4i1.186>
11. Mariwan Nasradeen Hasan Barzinji, *The image of modern man in TS Eliot's poetry* (Bloomington, Indiana: Author House, 2012), p. 114.
12. Leila Bellour, "The religious crisis and the spiritual journey in TS Eliot's The Waste Land", *Arab World English Journal (AWEJ)*, vol.7, no. 4 (Kuala Lumpur: AWEJ Group, 2016), pp. 422-438.
13. Megan Kimberly Von Bergen, "Spiritual meaning and the prophetic mode in TS Eliot's Four Quartets" (Kanas: Kansas State University, 2010), pp. 1-60. <http://hdl.handle.net/2097/4147>
14. Everett A Gillis, "The Spiritual Status of TS Eliot's Hollow Men", *Texas Studies in Literature and Language*, vol. 2, no. 4 (Texas: University of Texas Press, 1961), pp. 464-475.
15. *Ibid*, p. 467.
16. Louis Menand, "T. S. Eliot and Modernity", *The New England Quarterly*, vol. 69, no. 4 (Cambridge: MIT press, 1996), pp. 554-579. <https://doi.org/10.2307/366554>
17. Amélie Ducroux, "The Feeling of Thought: TS Eliot's Programmatic Poetry", *Transatlantica, Revue d'études américaines, American Studies Journal*, vol. 2 (Paris: Association française d'Etudes Américaines, 2014), pp. 1-14. <https://doi.org/10.4000/transatlantica.7054>
18. Virginia Costello, "Limiting the Maternal in TS Eliot's The Waste Land", *Studies in Practical Philosophy*, vol. 5, no.1 (Virginia: Philosophy Documentation Center, 2005), pp. 26-40. <https://doi.org/10.5840/studpracphil2005517>
19. David Kingsley, "Greening The Waste Land: Weaving TS Eliot's carpet into environmental literary criticism's patchwork quilt" (Arizona: Northern Arizona University, 2012), p. 49. <https://www.proquest.com/openview/0c1c8be1b17f695145145ba69f94b365/>

20. Mohammad Ali Alaeddini and Mojtaba Jaihouni, "Eliot's The Waste Land: A Touchstone of Modernity", *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, vol. 3 no. 3 (Cairo: TextRoad Publishing, 2013), p. 1079.
21. Thomas Stearns Eliot, *Collected Poems 1909-1962* (London: Faber and Faber, 2009), p. 43.
22. *Ibid*, p. 44.
23. Samet Güven, "A Modernist Approach to TS Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock", *Journal of History Culture and Art Research*, vol.4, no.2 (Karabük: Karabuk University, 2015), p. 81.
24. C. R. Mittal, *Eliot's Early Poetry in Perspective* (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributor, 2001), p. 15.
25. Thomas Stearns Eliot, *Collected Poems 1909-1962* (London: Faber and Faber, 2009), p. 8.
26. B. C. Southam, *A Guide to the selected poems of T. S. Eliot* (London: Faber and Faber, 1994), p. 43.
27. Renu Singh, "A Study of Dilemma in The Hollow Men of TS Eliot." *Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal*, vol.2, no.3 (Maharashtra: Managing Editor Madhuri Bite, 2013), p. 6.
28. George Kilcourse, "Review of Redeeming Time: TS Eliot's Four Quartets." *Spiritus: A Journal of Christian Spirituality*, vol.8, no.2 (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2008), p. 238. <https://doi.org/10.1353/scs.0.0024>
29. Adam Parkes, *Varieties of Modernist Impersonality* (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2013), p.668.
30. Ramji Lall, *TS Eliot: An Evaluation of his Poetry* (New Delhi: Surjeet, 2008), p. 20.
31. Thomas Stearns Eliot, *Collected Poems 1909-1962* (London: Faber and Faber, 2009), p. 75.
32. Hind Ahmed Kareem, "Spirituality in TS Eliot's Ash Wednesday" (Qadisiyyah Province: University of Al-Qadisiyah, 2017), p. 2. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29081.31840>
33. B. C. Southam, *A Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot* (London: Faber and Faber, 1994), p. 146.
34. *Ibid*, p. 148.
35. Temure Kobakhidze, "Quest for Sacred Time in TS Eliot's 'Journey of the Magi'", *New Pilgrimages* (Beijing: Tsinghua University Press, 2015), p. 216.
36. Simon Gikandi, "Preface: Modernism in the World", *Modernism/modernity*, vol. 13 no. 3 (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2006), pp. 419-424. <https://doi.org/10.1353/mod.2006.0061>
37. Martin Heidegger, *History of the concept of time: Prolegomena*, vol. 717 (Bloomington: Indiana University Press, 1992), p. 278.
38. Shanthanu Siuli, "Existentialism and stark note of Alienation in the Modern Literature-A detail analysis in terms of Post Modern Literature," *Research Journal of English Language and Literature*, vol. 5, no. 1 (Guntur/Vijayawada: KY Publications (p) Ltd, 2017), p.335.

শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজন: বিদ্রোহীসত্তার স্বরূপ সন্ধান [Shawkat Ali's Pradoshe Prakritjan: Exploring the Nature of Rebel Being]

জাকিয়া রহমান*

[Abstract: The novel *Pradoshe Prakritjan* by the fiction writer Shawkat Ali (1936-2018) is written about the general cycle of the society during the Pradoshe period of Bengal history. At that time, the common people were fed up with the chaotic life system under the tyranny of the feudal lords. The protest in their minds in the hope of liberation soon turned into rebellion. In the novel, along with the change of political pot, some characters have become rebels due to social injustice, exploitation, discrimination, murder and death. Not everyone becomes a rebel against the exploitation of social injustice and injustice regime. Only those who are uncompromisingly defiant of injustice are ignited in rebellion. All these characters don't even talk about God if necessary. They can make people aware of their rights. Can awaken their human values, self-strength and courage. The discussion article explores the rebellious nature of the characters in *Pradoshe Prakritjan*'s novel which makes them uncompromising and by holding this rebellious nature they become self-aggrandizing.]

Keywords: Shawkat Ali, Pradoshe Prakritjan, Exploring the nature, Rebel being, Rebellious.

১. ভূমিকা

কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর(১৯৩৬-২০১৮) প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসটি বাংলার ইতিহাসের প্রদোষকালীন সমাজের সার্বিক আবর্ত নিয়ে রচিত। সেই সময়ে সামন্ত রাজাদের দৌরাত্ম্যে বিশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মুক্তির প্রত্যাশায় তাদের মনে সঞ্চিত বিক্ষোভ একসময়ে বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিল। উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক অন্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, হত্যা-মৃত্যুর বিভীষিকায় কিছু চরিত্র বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সামাজিক অন্যাচার, অবিচার, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। কেবল অন্যাচারের সঙ্গে আপোষহীন প্রতিবাদী সত্তাই বিদ্রোহে জ্বলে ওঠে। এই সকল চরিত্র প্রয়োজনে ঈশ্বরকেও ছেড়ে কথা বলে না। তারা মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলতে পারে। জাগিয়ে তুলতে পারে তাদের মানবিক মূল্যবোধ, আত্মশক্তি ও সাহস। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে বিদ্রোহী সেই সত্তার স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে যা তাদেরকে করেছে আপোষহীন এবং এই বিদ্রোহী সত্তাকে ধারণ করে তারা হয়ে উঠেছে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

২. শওকত আলীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) সাতচল্লিশ পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নাম। তিনি ব্রিটিশ ভারতের দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত রায়গঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধ প্রভাবশালী ও প্রগতিশীল পরিবারের ছায়াতলে শওকত আলী আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। যা পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও লেখকসত্তার বিকাশে সৃষ্টির নিয়ামক হয়ে উঠেছিলো। শওকত আলীর ছেলেবেলায় দাদী মেহজাবিন বেগম মুখে মুখে গল্প বানিয়ে শোনাতেন। এই সকল গল্পের চরিত্রদের তিনি পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে অনায়াসে তাদের মনস্তত্ত্বকে উপস্থাপন করতেন। একই রাজার ঔরসে জন্ম নেওয়া রাণীর ছেলে এবং দাসীর ছেলের জীবন যাপনের বৈচিত্র্য, বৈষম্য, অপ্রাপ্তি, হতাশা কিভাবে নিষ্পাপ মনে লোভ ও ক্রোধের জন্ম দেয় তা মেহজাবিন বেগম অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে বর্ণনা করতেন। শওকত আলীর লেখকসত্তা তখন থেকেই যেন একটু একটু করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। দাদীর কাছে থেকে গল্প শুনেই তিনি লেখক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকে লেখক হতে

* এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

চেয়েছিলাম। দাদির বানানো রূপকথা আমাকে নানাভাবে প্রভাবিত করছিল। আমি আমার ভাষার মানুষের কষ্টের দ্রোহের ও সংগ্রামের গল্প বলব।^{১৩} পরিণত বয়সে তিনি *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩), *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪), *সম্মল* (১৯৮৬), *ওয়ারিশ* (১৯৮৯), *পতন* (১৯৯২), *এক ডাইনীর গেণ্ডুয়া খেলা* (২০০১), *নাড়াই* (২০০৩), *বসতসহ* (২০০৫) অসংখ্য উপন্যাসের কাহিনীতে দ্রোহের গল্প সংযোজন করেছেন। রচিত সাহিত্যে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে তিনি অন্যান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও সংগ্রামী চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

৩. বিদ্রোহীসত্তার প্রাসঙ্গিকতা

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে চলে আসেন। সঙ্গত কারণেই তিনি ১৯৪৭ সালের পূর্ব এবং পরবর্তী দুই প্রজন্মের সাক্ষী। পূর্ব পাকিস্তানে আসার পরে সংগঠিত ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্তাল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও তিনি অন্যায়ে, অসাম্য ও শোষণের সঙ্গে কখনো আপোষ করতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনি সম্পৃক্ততার কারণে জেলে ছিলেন এবং এরই জেরে বেশ কিছুদিন তিনি স্থানীয় পুলিশের নজরদারিতে ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ সামাজিক, পারিবারিক সকল ক্ষেত্রেই মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে শওকত আলীর লেখকসত্তা সচেতন ভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। জীবনের নানা অনাকাঙ্ক্ষিত বিরূপ পরিস্থিতি মানুষকে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বিদ্রোহী করে তোলে। বিদ্রোহীসত্তা কখনো অন্যান্যের কাছে মাথা নত করে না। শক্ত হাতে বলিষ্ঠ চিত্তে অন্যান্যের প্রতিবিধানে রুখে দাঁড়ায়। শাসন-শোষণ তথা অন্যায়ে ও জুলুমের বিপক্ষে শিল্প সাহিত্যে প্রকাশিত বিদ্রোহের আহ্বান পাঠক মনে সচেতনতার জন্ম দেয়। সঙ্গত কারণেই উপন্যাসে বিদ্রোহীসত্তার উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক বলেন,

যুগের হতাশা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়, কর্মহীন রোমাটিকতার অকারণ যন্ত্রনা আর মৈথুন- উৎসবের চিত্র নয়- আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস, যেখানে আছে দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা। অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের অন্ধকারের অতল গহবরে নিমজ্জনের কাব্যিক বর্ণনা নয়, আমরা চাই উত্তরণের কথামালা। ভীকৃত্য, কাপুরুষতা, আর রমণপ্রিয়তার চিত্র নয়- আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস যেখানে আছে নাম জানা না- জানা হাজার-লক্ষ বীর শহীদের রক্তদান-মহোৎসবের কথা। আমরা বিশ্বাস করি, সমাজচৈতন্য ও ব্যক্তিসংবেদনার অন্তর্মূল থেকে উৎসারিত, প্রার্থিত সেই উপন্যাসটি আমাদের উজ্জীবিত করবে উজ্জ্বল উত্তরণের লক্ষ্যে, নতুন চেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠবে নষ্ট জীবনের আরাধনার তরুণ সমাজ-হয়ে উঠবে তারা রক্তমুখী, সূর্যমুখী, স্বপ্নমুখী।^{১৪}

৪. বিদ্রোহীসত্তার স্বরূপ সন্ধান

কথাসাহিত্যিক শওকত আলীও তার রচনায় অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠায় এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে সৃষ্ট চরিত্রদের সোচ্চার করে তুলেছেন। সঙ্গত কারণেই রচিত গল্প এবং উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্রে বিদ্রোহীসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়ে ওঠে।

শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪) উপন্যাসে সেন শাসনের অন্তিম সময়ে তুর্কি মুসলমানদের বঙ্গদেশ আক্রমণের ভয়াবহতাকে প্রেক্ষাপট হিসেবে নেওয়া হয়েছে। উপন্যাসটিকে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ধারকও বলা যায়। কখনো শাসনিক অর্থে আবার কখনো ভাবব্যঞ্জনার গুঢ়তত্ত্বে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সমাজচিত্র এবং ধর্মমত এই উপন্যাসের আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সময়ে নির্যাতিত বৌদ্ধভিক্ষু এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে থেকেছে এবং এই অবস্থাতেই তারা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সীমাহীন ষেচ্ছাচারী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের মনের ধূমায়িত বিক্ষোভ ক্রমেই ফুসে উঠে চরিত্রের সত্তাকে বিদ্রোহে উদ্ভুদ্ধ করে তুলেছে। আলোচকের মতে,

প্রদোষকালীন এই জটিল আবর্তটি আরো জটিলতর হয় তৎকালীন রাজনৈতিক অরাজকতা, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা, সামন্তপ্রভুদের নানাবিধ উৎপীড়ন, ধর্মীয় সংস্কার, সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যদিয়ে। এই নির্যাতন, উৎপীড়ন, সংগ্রাম, সংঘাত, বিশৃঙ্খলা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের যাতাকলে প্রতিনিয়ত পৃষ্ঠ হতে থাকে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর সহজ সাবলীল জীবনযাত্রা। তারা এই জটিলতা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে শুরু করে, হয়ে ওঠে অধিকার সচেতন। জাতীয় জীবনে সৃষ্ট প্রদোষকাল থেকে

উত্তরণের চেষ্টায় তারা সংগ্রামী হয়ে ওঠে। খুঁজতে থাকে মুক্তির পথ। কিন্তু কোনো সঠিক পথ ও উত্তরণের উপায় তারা সহজে পায় না।... এই পথ খুঁজে পাওয়া সেইদিন অসম্ভব ছিলো। কারণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সবদিক থেকেই তৎকালীন সমাজব্যবস্থা হয়ে পড়েছিলো পঙ্গু। এই পঙ্গু সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী সেইদিনের সেই অরাজকতা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু মনে মনে তারা হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী।^৩

৪.১ পুরুষ চরিত্র

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রয়েছে শ্যামাঙ্গ, মিত্রানন্দ, বসন্তদাস এবং নিরঞ্জন। উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামাঙ্গ পেশায় মৃৎশিল্পী। শিল্প নির্মাণে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রসঙ্গে গুরু বাসুদেবের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। একপর্যায়ে শিল্পকে ত্যাগ করার ঘোষণা দিয়ে বাসুদেবের গৃহ ত্যাগ করে পথে বের হয়ে আসে। প্রথমাবস্থায় শিল্পী এবং শিল্পের স্বাধীনতার যে দাবী শ্যামাঙ্গের মনে উথিত হয়েছিল তাতে এই চরিত্রটিকে স্বাধীনচেতা চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা গেলেও বিদ্রোহী চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কেননা উপন্যাসের কাহিনি পরিক্রমায় পরবর্তীসময়েও এ চরিত্রের আর কোন বিদ্রোহী রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। বসন্তদাসের বিদ্রোহীসত্তা বন্ধু মিত্রানন্দের চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেও এই উপন্যাসে মিত্রানন্দ অপেক্ষা বসন্তদাসের বিদ্রোহীসত্তা অধিক সক্রিয়। ‘তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, চাহিদার সাথে সকলের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা স্বপ্ন মিলে যায়। কিন্তু বসন্তদাস জীবন-সমাজ-রষ্ট্রকে যেভাবে উপলব্ধি করে সেভাবে সবাই করতে পারেনি। তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের যে সুযোগ হয়েছিল তা সবার হয়নি। কাজেই বসন্তদাস বাঙালির সংগ্রামের যে রূপটি প্রত্যক্ষ করে মিত্রানন্দ তা করতে পারে না।’^৪ উপন্যাসে মহাসামন্ত শাসক এবং আগত যবনদল একই সময়ে, একই স্থানে, একই রকম পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে লুটপাট এবং ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে। এমনতর প্রতিমূহূর্তের ধ্বংসযজ্ঞের বিভীষিকা ও মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পরিত্রাণের পথ অন্বেষণে বিদ্রোহীসত্তা কখনো নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। ক্রমে বিদ্রোহীসত্তার ব্যক্তি বিদ্রোহ ছড়িয়ে গিয়ে সমষ্টিবদ্ধ বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে। উপন্যাসের মিত্রানন্দ এবং নিরঞ্জন চরিত্রে তেমনি দাবানলসম প্রভাববিস্তারী বিদ্রোহীসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। সমূহ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে তারা বসন্তদাসের সচেতন সত্তায় বিদ্রোহী চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছে। ‘বসন্তের আহ্বানে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের চেতনা সঞ্চারিত হয় প্রাকৃতজনের মাঝে।’^৫ বসন্তদাসের অন্তর্গত সুপ্ত বিদ্রোহকে উস্কে দিতে মিত্রানন্দ বলেছে,

বসন্তদাস, আমি জানি না, আপনি কী চিন্তা করেন। কিন্তু নিজের জীবনের কথা কখনও ভেবেছেন? আপনার, আপনার পিতার, আপনার পিতামহের? মনে হয় না কি আপনি পুরুষানুক্রমে দাস? সামন্তপতির দাস, কায়স্থের দাস? আপনার কি ভগবান আছে? আপনি ভগবানের পূজা করতে পারেন? চণ্ডালদের কথা চিন্তা করুন, ডোম হাড়িদের কথা চিন্তা করুন। নিম্নশূদ্রে কত বর্ণ ভেবে দেখেছেন? শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ, একে অপরের ওপর লাঞ্ছনা করে, শোষণ করে, লুণ্ঠন করে। আপনি কি লুণ্ঠিত হননি, বলুন? সামন্তপতি যে আপনার সমস্ত কিছু অপহরণ করল, তার প্রতিকার কোথায়?^৬

সঙ্গত কারণে বসন্তদাসের মনে উথিত অসংখ্য কেন জিজ্ঞাসা রেখে গেছে। তার মনে হয়েছে,

জীবনের ধ্বংস প্রক্রিয়া কি এতোই দ্রুত অগ্রসর হয়? সময় এতো বৈরী কেন? মানুষ কি সামান্য কিছুকালও ধৈর্য ধারণ করতে পারে না? বলাধিকার থাকলেই তো প্রয়োগ করতে হবে? তার কিছুতেই বোধগম্য হয় না একজন বয়স্ক, বুদ্ধিমান, সম্ভ্রান্ত ও সামাজিক মানুষ কীভাবে অন্যের ধনসম্পদ, সংসার, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হরণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতে পারে। এ কি শুধুই লোভ? শুধুই জিঘাংসা? তোমার পুত্র তোমার নয়, সে আমার দাস হবে। তোমার সুন্দরী স্ত্রী তোমার নয়- সে আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে। তোমার ধনসম্পদ কেন থাকবে তোমার অধিকার? তা থাকবে আমার অধিকারে।^৭

বসন্তদাস উপলব্ধি করেছিলো সংঘবদ্ধ জনশক্তি অত্যাচারী, শোষক রাজার সকল শক্তিকে পরাস্ত করতে অবশ্যই সক্ষম হয়ে উঠবে। তবে এই মনোশক্তি, এই বোধ সাধারণের থাকে না। দুর্বলচেতা মানবসত্তা সাধারণত শক্তিমানের তৈলমর্দনকারী হুকুমের দাসে পরিণত হয়। দাসত্ববৃত্তিই হয় তাদের পরিণতি। পক্ষান্তরে বিদ্রোহীসত্তার অন্তরের অসীম সাহস তাকে দাসত্ববৃত্তিকে অস্বীকার করতে শেখায়। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন করে তোলে। যা জুলুমকারীর জন্য এক তীব্র অনুকম্পা সৃষ্টি করে। এই বোধ থেকেই বিদ্রোহী বসন্তদাসের মনে হয়েছে,

কতোকাল মানুষ কেবলি দাসত্ব করে যাবে? মনুষ্যজন্মের অর্থই কি দাসত্ব? ভয় আর সন্তাস কি চিরকাল মানুষকে দাস করে রাখবে? এরা কি বারেকের জন্যেও সংঘবদ্ধ হতে পারে না? বোঝে না কি যে সংঘবদ্ধ বাহুবল কি বিপুল ও প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করতে পারে? ... রাজশক্তি প্রজাপীড়ণ ছাড়া অন্য কাজে কোথাও ব্যবহৃত হয় না। এই রাজশক্তি যে প্রকৃতপক্ষে দুর্বল, এ সত্য কেউ স্বীকার করে না। তারা শুধু মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী এবং পদাতিকের সংখ্যাটি দেখতে পায়, আর কিছু দেখতে পায় না।^৮

সামন্তবাদী মহাসামন্তদের অত্যাচার নির্যাতন সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছালে বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ সাধারণ মানুষ, এমনকি মন্দিরের দাসীরাও এই অত্যাচার ও স্বৈচ্ছাচারী জুলুম বন্ধ করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। ‘কঠিন দারিদ্র্য, সীমাহীন বৈষম্য, চরম শোষণ-পেষণ যে সমাজে আছে সেই সমাজের সমাজবাস্তবতার অতি অবশ্য অংশ দারিদ্র্য, বৈষম্য, শোষণ-পেষণ বা যেখানে এইসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছে সেখানে এই বিদ্রোহ বা সংগ্রাম বাস্তবতারই অংশ...’^৯ মিত্রানন্দ সংকটময় পরিস্থিতির বিপরীতে মুক্তির লক্ষ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংঘবদ্ধ করেছে। তাদের বিদ্রোহী মন্ত্রে দীক্ষিত করে জীবন প্রক্রিয়ার পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখেছে। মিত্রানন্দের বিদ্রোহের সহযোগী বসন্তদাসের বিদ্রোহ শুধুমাত্র পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বসন্তদাস পুরাতন ধ্বংসের মাধ্যমে নতুন আশানুরূপ প্রাপ্তির নিশ্চিত প্রত্যাশায় বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সেন শাসনের স্থানে যবন শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্রাত্যজনের দুর্বিসহ জীবনপ্রক্রিয়ার শেষ হয়নি। সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের মাধ্যমে পুরাতন ব্যবস্থার বিলুপ্তির প্রসঙ্গে মিত্রানন্দের করা প্রশ্নের জবাবে বসন্তদাস বলেছে,

না, আমি প্রচলিত ব্যবস্থায় তুষ্ট নই, ব্যবস্থায় তুষ্ট নই, বসন্তদাস জানায়। বলে, আমি জানি এই ব্যবস্থা আমার ধনার্জনের পথ উন্মুক্ত রাখেনি, আমাকে বিদ্যার্জন করতে দেয়নি- এমনকি, আমার মতো একজন সাধারণ মানুষও যে নিরুপদ্রব সংসার জীবনযাপন করবে, তারও কোনো সুযোগ সৃষ্টি করেনি-আমি প্রচলিত ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করতে চাই-কিন্তু এও আমি জানতে চাই যে, পরিবর্তে আমি কী পাবো।^{১০}

মিত্রানন্দ এই বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী চরিত্র হওয়ায় চরিত্রটি সামগ্রিক বিদ্রোহী চেতনাকে বক্ষে ধারণ করে অন্য চরিত্রগুলোকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তবে উপন্যাসে এ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই বা কাহিনিতে এই চরিত্রের সক্রিয় উপস্থিতিও অনেক কম। স্বল্প সময়ের জন্য তার যে উপস্থিতি তাতেই চরিত্রটি নতজানু দাসত্বের জড়তাশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের বিকাশের প্রয়োজনে বসন্তদাস এবং নিরঞ্জনর সং, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন সত্তাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। মিত্রানন্দের সঙ্গে পরিচয় এবং আলাপচারিতার শেষে বসন্তদাস সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, ‘বসন্তদাস এখন অন্য মানুষ। গৃহ ত্যাগের সময় যে বসন্তের মনে চিন্তা ছিল কি উপায়ে সে ধনী বণিক হবে, এখন সেই বসন্তের মনে ভিন্ন চিন্তা। তার দৃষ্টি এখন মানবজীবনের লাঞ্ছনা, অপমান এবং দাসত্বের দিকে। মনে এখন জ্বালা ও বেদনা। সেই সঙ্গে আর একটি নতুন ভাব জন্ম নিয়েছে মনে। অসহায় মানুষ দেখলে সে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও করুণার্দ্র হয়ে ওঠে।’^{১১} বিদ্রোহীসত্তা চরিত্রটিকে যে ক্রমপরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে সেখানে সে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বসন্ত দাসের বিদ্রোহীসত্তার স্বরূপ পাঠককে আন্দোলিত করতে সক্ষম। এই উপন্যাসের অপর বিদ্রোহী পুরুষ চরিত্রের নাম নিরঞ্জন। সে মন্দিরদাসী ছায়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিদ্রোহী ভিক্ষুদের মধ্যে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বিতর্ক সৃষ্টি হলে নিরঞ্জন অতীশ দীপঙ্করের প্রসঙ্গে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সকলকে সশস্ত্র বিদ্রোহী চেতনায় অন্তিভাবাদী করে তুলেছে। নিরঞ্জন বলে:

আমি আপনাদের দীপঙ্কর অতীশের কথা স্মরণ করিয়ে দিই-তিনি তিব্বতে বলেছেন, ধর্মকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সংঘকে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, সংঘই হবে সমস্ত কিছু নির্ধারক। প্রয়োজনবোধে সে-ই রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ঘটাবে।... তথাগত বাণীর কথা চিন্তা করুন, বোধিসত্ত্বের কথা চিন্তা করুন। আমার বিশ্বাস, মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের বাণী সকল দেশের সন্ন্যাসীদের জন্য অবশ্যই পালনীয়-বিশেষত এই দেশে-কারণ এদেশ তাঁর জন্মভূমি।^{১২}

নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে লীলাবতী, কুসুম ডোমনী, মন্দিরের দাসী কৃষ্ণা এবং অজ্ঞাতনামা এক বৃদ্ধার মধ্যে বিদ্রোহীসত্তার অন্তিভূ উপলব্ধ হয়ে ওঠে। বহুমাত্রিক কারণে কেন্দ্রীয় চরিত্র লীলাবতী কখনো নীরব আবার কখনো সরব বিদ্রোহে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনির নানা বাঁকে লীলাবতীকে বহুমাত্রিক কারণে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখা যায়। লীলাবতী এই উপন্যাসের প্রধানতম বিদ্রোহী

নারী চরিত্র। লীলাবতীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মসম্মানবোধ এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার ক্ষমতা তার বিদ্রোহীসত্তার পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। কিশোরী লীলাবতী ফুলশয্যার রাতে উন্মাদ বিকারগ্রস্ত স্বামীর অস্বাভাবিক আচরণ ও উদ্ভট প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। লীলাবতীকে সন্দেহ করে বাসর রাতে অভিমন্যু দাস বলে ওঠে, ‘বিবাহে বিশ্বাস হয় না, নারীতে বিশ্বাস হয় না, তোমাকে বিশ্বাস হয় না।... তাহলে আমার অনুমান সত্য-বলো? প্রথমে সেই ব্রাহ্মণ কিশোরটি, তাই না? সেই উপবীতধারী তরুণ গৌরোজ্জ্বল ব্রাহ্মণ বালক, তাই না? অতঃপর পিতার প্রভুপুত্রটি, তাই না? নাকি প্রতিবেশী কেউ?’^{১৩} সেই মুহূর্তে, ‘সে স্বামীর প্রলাপ শুনছিল এবং প্রতি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল-হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যতবার প্রশ্ন ততবার হ্যাঁ।’^{১৪} ফুলশয্যার রাতে নববধূ লীলাবতীর স্বামী অভিমন্যু দাসের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্বীকারোক্তিমূলক জবাববন্দীই এ চরিত্রের প্রতিবাদী চেতনাকে, বিদ্রোহীসত্তাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। চলমান সন্দেহে নারীত্বের চরমতম অপমানের অসহনীয় পর্যায়ে লীলাবতী অভিমন্যু দাসকে ত্যাগ করে পিড়ালয়ে ফিরে এসেছে। একপর্যায়ে অভিমন্যুর স্বামীত্বকে অস্বীকার করেছে। সামন্ত রাজের প্রতিনিধি অভিমন্যু দাস প্রাণরক্ষায় পলায়নপর গ্রামবাসীদের উপর অতর্কিত হামলা করলে লীলাবতীর বাবা আহত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ অবস্থায় খাপখোলা তরবারি হাতে অত্যাচারী অভিমন্যু দাসকে দেখে লীলাবতী ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। চিরাচরিত বাঙালি নারীর মতো শুধুমাত্র স্বামী বলেই অভিমন্যু দাসের সকল অপরাধকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে নি। এখানেই লীলাবতী চরিত্রের বিশেষত্ব। লীলাবতী সাধারণ নারী থেকে আলাদা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন বিদ্রোহী নারী চরিত্র। কাহিনি পরিক্রমায় সন্তানসম্ভবা লীলাবতীর মাতৃত্ব তাকে ধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী করে তুলেছে। সন্তানের পিতৃ-পরিচয়ের প্রয়োজনে, মাথা উঁচু করে বাঁচার প্রয়োজনে কেবল জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মকে সে আঁকড়ে বাঁচতে চায় নি। লীলাবতীর জীবনের সকল অপ্রাপ্তি, শূন্যতা, বর্ণ বৈষম্যের পীড়ণ সবই তার দুর্ভাগ্যের নামান্তর। এই দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের অন্তরায় অনুধাবনেই সে ধর্মাস্তরিত হয়ে আশ্রয়দাতা যবনদের ধর্মে দীক্ষিত হতে চেয়েছে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ, বঞ্চিত লীলাবতীর ধর্মাস্তরিত হওয়ার অভিপ্রায়ের মধ্যেই তার বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে। লীলাবতীর এ বিদ্রোহ যেন স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, যেন তার দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে, ধর্মের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে। ধর্মীয় এবং সামাজিক নিয়ম-রীতি, আইন সবকিছুই মানুষের জীবনকে সুন্দর সুশৃঙ্খল করার জন্য তৈরী হয়। এগুলোই যখন মানুষের সুষ্ঠু স্বাধীন জীবনযাপনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখনই মানুষ হয়ে ওঠে অসহায়। এই অসহায়ত্ব থেকে সহজে বেরিয়ে আসা যায় না। বেরিয়ে আসতে হলে তাকে অসীম সাহসী হয়ে প্রথাগত ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়। ধর্মীয় আবরণে ও সামাজিক নিয়মের নামে যা মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করে তুলেছে। লীলাবতীর সাহসীসত্তা সেই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। একজন নারী হয়ে লীলাবতী যে বিদ্রোহ করেছে সচরাচর একজন পুরুষও তা সহজে করতে পারে না। লীলাবতীর বিদ্রোহীসত্তাই তাকে জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মকে ত্যাগ করে অন্যায়সে যবনদের ধর্মানুসারী হতে আগ্রহী করে তুলেছে। তার এই বিদ্রোহীসত্তা সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলের নিগড়ে আটকে থাকা সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। সঙ্গত কারণেই সে বলতে পেরেছে, ‘আমার ধর্ম কোথায়? আমি তো বুঝি না, সত্য সত্যই আমার ধর্ম বলে কোন বস্তু কখনো ছিল কি না। যদি ছিল ধরে নিই, তাহলে সে ধর্ম আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এমন বিবাহ দিয়েছে, যা আমি চাইনি-সে ধর্ম আমার জীবনকে বিপন্ন করেছে, সে ধর্ম আমাকে পিতৃহীন করেছে-বলো, তাকে আমি ধর্ম বলবো?’^{১৫} লীলাবতীর বয়ান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে ধর্ম আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে- অর্থাৎ লীলাবতীর বিদ্রোহ এখানে ধর্মের প্রতারণার বিরুদ্ধে। এমন বিয়ে দিয়েছে যা আমি চাইনি-বাক্যের এই অংশে দেখা যায় বিয়ে লীলাবতীর জীবনকে বিধ্বস্ত করেছে। প্রাচীন বাংলার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় বিধান মতে হিন্দু নারীর দ্বিতীয় বিয়ের নিয়ম ছিলো না। কেননা হিন্দু ধর্মে বিধবা নারীর বিয়ে বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীর দ্বিতীয় বিয়ের রীতি সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। যদি ধর্মে দ্বিতীয় বিয়ের নিয়ম থাকত তাহলে হয়তো লীলাবতী নিজের জীবনকে সাজিয়ে নিতে পারত। লীলাবতীর এ অংশের বিদ্রোহ যেন হিন্দু ধর্মে নারীর দ্বিতীয় বিয়ের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে। ধর্মীয় আক্রোশে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের যে অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন তাতে লীলাবতী হয়েছে পিতৃহারা, উন্মুল, উদ্বাস্ত। লীলাবতীর বিদ্রোহ এখানে বর্ণবাদ, অসাম্য এবং যথেষ্ট নারী অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে।

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসে লীলাবতী একমাত্র নারী চরিত্র যে বহুমাত্রিক কারণে সরব বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে। ‘শওকত আলীর নায়িকারা নির্বিকার চিন্তে গোটা পরিস্থিতি মেনে নেয় না।’^{১৬} অন্যদিকে কুসুম ডোমনী, মন্দিরের দাসী কৃষ্ণাসহ অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধাকে কেবল সামন্তবাদী শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখা যায়। উপন্যাসের কাহিনি জুড়ে লীলাবতীর বিদ্রোহ প্রকাশ পেলেও কুসুম ডোমনী, কৃষ্ণা এবং অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধার বিদ্রোহ কাহিনিতে সল্পপরিসরে স্থান পেয়েছে। সামন্তবাদী মহাসামন্তদের অমানবিক অত্যাচার নির্যাতনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে ফুঁসে ওঠা বিদ্রোহে মন্দিরের দাসীরাও একাত্ম হয়েছে। জীবন বাজি রেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অত্যাচারের অবসান প্রত্যাশায় এসব দাসীরাও অন্তরে ধারণ করেছে অপ্রতিরোধ্য বিদ্রোহ। উপন্যাসে কৃষ্ণা চরিত্রের চোখে মুখে সে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে দেখা যায়। বসন্তদাস রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে পিছিয়ে আসতে চাইলে কৃষ্ণা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে, বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছে। কৃষ্ণা যেন বসন্তদাসের বিদ্রোহী চেতনাকে উস্কে দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করেছে। বসন্তদাসকে কৃষ্ণা বলেছে:

আমরা মন্দিরদাসী, আমাদের গৃহ নেই, সংসার নেই, ভবিষ্যৎ নেই-তথাপি আমাদের মনে হয়েছে, অনাচারের অবসান হওয়া প্রয়োজন, অত্যাচার দূর হওয়া উচিত, মানুষের অপমান এবং লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। যদি আমাদের নিষ্ফল জীবন মানুষের জন্য কল্যাণময় ভবিষ্যৎ এনে দিতে পারে, তাহলেই মনে করব জীবন আমাদের সার্থক হয়েছে। কল্যাণ ও মঙ্গলময় সেই ভবিষ্যৎ আমাদের হবে না, হবে তোমাদের, যাদের গৃহ আছে, সংসার আছে-তথাপি আমরা মনে করব, আমাদের জীবন জগতের কাজে লাগল।^{১৭}

ঘটনাক্রমে কুসুম ডোমনী হাটের কর দেওয়া প্রসঙ্গে সামন্তসেনা বজ্রসেনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে। ভীতসন্ত্রস্ত সংকটময় সময়ে মহাসামন্তের কর আদায়কারী সেনার সঙ্গে নির্ভয়ে উঁচু গলায় প্রত্যুত্তর করা এবং বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া এ চরিত্রের সাহসীকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠার পরিচয় প্রদান করে। পরবর্তীসময়ে ‘এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে সামন্ত হরিসেন কুসুম ডোমনীকে ভয়ানক শাস্তি দেয়।’^{১৮} নিম্নশ্রেণির মানুষের অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অস্তিত্ববাদী চেতনার জাগরণ নির্দেশ করে। ‘প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে, লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে সামন্ত-মহাসামন্তদের অত্যাচার-অবিচার, অস্বাভাবিক-প্রাকৃতজনের প্রতিরোধ আর তুর্কিদের বঙ্গ-বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজে-সংস্কৃতিতে উঠেছিল যে উর্মিল আলোড়ন-সেই দূরায়ত ধূসর ইতিহাসের শিল্পিত-ভাষ্য এ উপন্যাস। আজকের মতো, ইতিহাসের সেই প্রদোষকালেও, প্রাকৃতজনেরা প্রতিনিয়ত শোষিত হয়েছে, তবু কখনো কখনো তাদের মধ্যে জেগেছে প্রতিরোধ-চেতনা; সামন্তশাসক আর বহির্শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠেছে অন্ত্যজেরা, বৌদ্ধেরা-নতজানু দাসত্ব থেকে তারা চেয়েছে মুক্তি।’^{১৯} হয়ত অত্যাচার নির্যাতনের পূর্যদন্ত এবং আশাহত অবস্থায় অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রমেই বিস্তৃত ক্ষোভ বিদ্রোহী চেতনায় মহীরুহ লাভ করেছিলো। এই বিদ্রোহে পরাধীন জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম তথা গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিহিত ছিল। বিদ্রোহে চরিত্রের সক্রিয়তা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক বলেন,

জীবনের অনুষ্ণেই শিল্পের বিষয় ও প্রকরণ নবতর তাৎপর্য লাভ করে। উপন্যাসের মতো ঘটনা, চরিত্র ও ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিল্প-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই ধরণা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। সকল মানুষ রাজনীতি-সক্রিয় নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সকল মানুষের ভবিতব্য সেই অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্রিয়াশীলতার ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে, জনসাধারণ, মানুষ বা চরিত্রই হচ্ছে সবকিছু নিয়ামক।^{২০}

৫. উপসংহার

বিদ্রোহী চেতনা সমৃদ্ধ মানুষই তাদের ব্যক্তি বিদ্রোহের একত্রীকরণের মাধ্যমে গণবিদ্রোহের সূচনা করতে পারে। প্রয়োজনে বিপ্লবের ডাক দিতে পারে। মুহূর্তে জীবনের সকল সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সচেতনতাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ একজন আধুনিক মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের লেখক হিসেবে কথাসাহিত্যিক শওকত আলীও সাহিত্যে এই সকল আধুনিক মানুষের উপস্থিতি তথা বিদ্রোহী চরিত্রের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সঙ্গত কারণেই প্রাচীন জন-জীবন কেন্দ্রিক রচিত প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসেও তিনি সচেতনভাবেই বিদ্রোহী চরিত্রের

উপস্থিতি দেখিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্যের এই বিদ্রোহী চরিত্ররাও সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। জাগিয়ে তুলতে পারে তাদের মানবিক মূল্যবোধ, আত্মশক্তি ও সাহস। প্রকৃতপক্ষে শোষণ-বঞ্চণামুক্ত সমাজ বিনির্মাণে, মানুষের অধিকার আদায়ে, নারীর মানুষ পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সর্বপরি ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধকে জাহত রাখতে উপন্যাসে বিদ্রোহী চরিত্রের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায় না।

টীকা ও টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শওকত আলী, *অবিদ্বত স্মৃতি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১০১।
২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ, মে ২০১৮, পৃ. ১৩৭ ও ১৩৮।
৩. ড. মনোরমা ইসলাম, ‘শওকত আলীর উপন্যাসে বিধৃত অধিকার সচেতন মানুষের কথা’, প্রফেসর ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), ‘সাহিত্যিকী’, প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল স্মরণ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, জুন ২০১৯, পৃ. ৭৩।
৪. মোসা. শামসুন নাহার, *উপন্যাসে প্রাচীন বাংলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৬, পৃ. ৩০৯।
৫. রাজিব সরকার, ‘প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন ও প্রদেশে প্রাকৃতজন’, আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), ‘কালি ও কলম’, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০।
৬. ড. মোহাম্মদ হাননান (সম্পাদিত), *শওকত আলী রচনাসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, জুন ২০১৫, পৃ. ১৭২।
৭. *তদেব*, পৃ. ৯১।
৮. *তদেব*, পৃ. ৭৭।
৯. হাসান আজিজুল হক, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, কথাপ্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৪১।
১০. ড. মোহাম্মদ হাননান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩।
১১. *তদেব*, পৃ. ১৭৪ ও ১৭৫।
১২. *তদেব*, পৃ. ১৯৪ ও ১৯৫।
১৩. *তদেব*, পৃ. ৫৪।
১৪. *তদেব*, পৃ. ৫৪।
১৫. *তদেব*, পৃ. ২১৪।
১৬. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ১৯৮১, পৃ. ১১৪।
১৭. ড. মোহাম্মদ হাননান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯।
১৮. মোসা. শামসুন নাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭।
১৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।
২০. রফিকউল্লাহ খান, *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২ ও ১৩।

মুনীর চৌধুরীর ত্রয়ী একাঙ্কে ইতিহাস ও নগরজীবন [History and Urban Life in Munier Chowdhury's trio of One-act Dramas]

ড. সুমাইয়া খানম*

[Abstract: Munier Chowdhury (1925–1971) was a confident dramatist of the sixties. His creative spirit flourished as his rational sensibilities and sensitive personality were exposed to the conformities and incongruities of his time. The plays of the writer, politician, and language activist, Munier Chowdhury, reflect the conditions of his times. His one-act dramas have set him apart. Kobor (1953), Dando (1966), and Dandodhor (1966) are three of his unique one-act plays, whose essence reflects the Bengali way of life. An urban writer Munier Chowdhury has described the history of the struggle for Bengali nationality and existence in the context of his 1952 play, Kobor. He has also comically presented the portrait of post-war modern urban dwellers in his plays Dando and Dandodhor. While on one hand his subject, dialogues, and characters bring a new flavor to his plays, much diversity can also be found in the new and innovative techniques used to stage these plays. This essay will discuss various aspects of history and urban life in the aforementioned trio of plays by Munier Chowdhury; the paper will simultaneously discuss the difficulties of reality and also present the complexities of the human psyche. This analysis of the aforementioned trio of plays in light of the different aspects of one-act dramas will open a new horizon for eager readers.]

Keywords: মুনীর চৌধুরীর ত্রয়ী একাঙ্ক, ইতিহাস ও নগরজীবন।

১. ভূমিকা

ষাটের দশকের দৃঢ়প্রত্যয়ী নাট্যব্যক্তিত্ব মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)। যুক্তিধর্মী চেতনা ও সংবেদনশীল ব্যক্তিসত্তায় তিনি ভাস্বর। তৎসময়ের সংগতি ও অসংগতির সংস্পর্শে এসে তাঁর শিল্পীমানস ঋদ্ধ হয়েছে। লেখক, রাজনীতিক, ভাষাসংগ্রামী মুনীর চৌধুরীর নাটক সমকালের প্রতিভাসে বিচ্ছুরিত। নাট্যাঙ্গনের বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত তাঁর একাঙ্ক তাঁকে বিশেষায়িত করেছে। কবর (১৯৫৩), দণ্ড (১৯৬৬), দণ্ডধর (১৯৬৬) তাঁর রচিত বিশেষ তিনটি একাঙ্ক, যার মর্মমূলে অনুরণিত হয়েছে বাঙালির জীবনবোধ। আরবান লেখক মুনীর চৌধুরী বাঙালি-জাতিসত্তা ও অস্তিত্ব-সংগ্রামের ইতিহাসকে যেমন তুলে এনেছেন ১৯৫২ সালের প্রেক্ষাপটে কবর নাটকে, তেমনিই পাক-ভারত যুদ্ধ-পরবর্তী আধুনিক শহরে মানুষের চালচিহ্ন কৌতুকাশ্রয়ে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর দণ্ড ও দণ্ডধর নাটক দুটিতে। একদিকে যেমন বিষয়, সংলাপ, চরিত্র নাটকে নতুনত্বের স্বাদ দেয়, পাশাপাশি মঞ্চব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নবকৌশল সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মুনীর চৌধুরীর উল্লিখিত ত্রয়ী একাঙ্কে ইতিহাস ও নগরজীবনের নানাদিক আলোচিত হবে। যা একইসাথে বাস্তবতার কঠিনরূপ যেমন তুলে ধরবে তেমনি কৌতুকাশ্রয়ে মানুষের মনোজগতের নানান জটিলতা এতে উপস্থাপিত হবে। অঙ্গিকের ভিন্নতায় একাঙ্কের অবয়বে ত্রয়ী নাটকের বিশ্লেষণ সাহিত্য্যমুদী পাঠকের কাছে নব দিগন্তের উন্মোচন করবে। নাটকে পঞ্চাশের দশকে মুনীর চৌধুরীর যে পর্যবেক্ষণ তা এ দশকের জীবনবোধে পরিপাট্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করবে।

২. নাট্যাবয়ব

‘নাটক’ শব্দটি অতি প্রাচীন। বস্তুত মানুষের জন্ম, জীবন, জীবিকার সাথে নাটক জড়িত। প্রাচীনকালে মানুষ জীবন-জীবিকার নিমিত্তে যখন শিকার করেছে তখন-ই উৎপত্তি নাটকের। ‘আর্টে নাটক বা থিয়েটার প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতমুনির কাল থেকেই নাটকের চর্চা হয়েছে। নাটক ও অভিনয় মানুষের জীবনের সঙ্গে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

সম্পর্কিত।” নাটক শব্দের উৎপত্তি ‘নট’ থেকে, যার অর্থ ‘নড়াচড়া’ বা ‘অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ’ সঞ্চালন। অনুকরণ করার প্রয়াস থেকেই ‘নট’ বা ‘নাটক’ এসেছে। যার উৎপত্তি ছিল প্রাচীন গ্রীসে বৈদিক যুগে। টরেন্টো গুহায় যখন মানুষের ভাস্কর্য আবিষ্কার করা হয়, সেখানে নাটকের বীজ লুকায়িত ছিল। ভারতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত নাটকের যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা সংস্কৃত নাটকের স্বর্ণযুগই বটে। যা গ্রীস-নাটক দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আধুনিক যুগে নাটক এক নতুন মোড় নেয়। সময় ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় নাটক রচনা ও উপস্থাপন-কৌশল। আধুনিক ভারতে নাট্যচর্চার এক নতুন ধারা শুরু হয় ঔপনিবেশিক আমল থেকে।

২.১ নাট্যাক্ষ

সাধারণত কাঠামোগত সৌষ্ঠবে নাটক পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট। কালপরিক্রমায় অঙ্ক বিভাজনে নাটক একাঙ্কের অবয়বে নবরূপ পরিগ্রহ করে। বলা যায় একাঙ্কের সূত্রপাত ঘটে ১৭৫৫ সালে ইউরোপীয় Di Judes- (দি-জুস) নাটকের মধ্য দিয়ে। এ বঙ্গে সে ধারায় নাটক রচছেন মুনীর চৌধুরী। নাটকের পরিবৃত্তে সংযত রেখা টেনেছেন। একাঙ্ক বা একাঙ্কিকাকে ইংরেজিতে বলা হয় One act Drama। এখানে মূলত জীবন, সমাজ, সময়ের একটিমাত্র ঘটনা উপস্থাপিত হয় সংক্ষিপ্ত অবয়বে। একাঙ্কে অবিচ্ছিন্নতা অনিবার্য, আয়তন পরিমিত। Dramatic Situation এবং Effete এর Singleness এর মূল লক্ষণ। মূলত একাঙ্ক বাহুল্য বর্জিত হবে, চরিত্র বা বাক সংক্ষিপ্ত হবে, Climax থাকবে একটি এবং এর যাত্রা শুরু হবে From the very initial sentence দ্বারা। মূলত পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্কে খুব বেশি পার্থক্য নেই। শুধু উপস্থাপন-কৌশল ভিন্ন, যার মূল কথা what ever done must be quickly.

২.২ একাঙ্ক ও মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী একাঙ্ক বা একাঙ্কিকা রচনায় অনন্য একজন নাট্যকার। তিনি সার্থক একাঙ্ক রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মোট ২২টি একাঙ্ক রচনা করেছেন। প্রথম ১৯৪৩ সালে ‘নওজোয়ান কবিতা মজলিস’ নামে একাঙ্কিকা রচনা করে এপথে যাত্রা শুরু করেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় রচনা করেন কবর, দণ্ড, দণ্ডধর একাঙ্ক। যা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

প্রগতিবাদী চেতনালব্ধ মুনীর চৌধুরী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর মানস গঠনে পাশ্চাত্যের শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬), ভিক্টর হুগো (১৮০২-১৮৮৫), চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০), তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), বার্নার্ড শ (১৮৫৩-১৯৫০); প্রাচ্যের দেব প্রসাদ (১৮৯৪-১৯৮৫), রবি গুহ (১৯১৮-১৯৭৬), সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪) প্রমুখ বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এসকল ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক মতাদর্শে মুনীর চৌধুরী নিজে থেকে শাণিত করেছেন। নাটক রচনাতেই তিনি ছিলেন খ্যাতিমান। একাঙ্ক রচনায় মুনীর চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্যিকতা পরিলক্ষিত হয়। বিষয়বস্তু নির্ধারণে আধুনিকতা ও নাগরিকচেতনা তাঁকে নাট্যসাহিত্যের নতুন ধারা গঠনে অনুরাগ জুগিয়েছে। উল্লেখ্য, ‘আত্ম জিজ্ঞাসা, বিশ্ব প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য মানুষকে অনাদি অতীত থেকেই বিমোহিত করে এসেছে। তার এই বিমোহিত উপলব্ধি সে প্রকাশ করেছে বিভিন্ন ভঙ্গি ও আঙ্গিকে।’^২ সেই সাথে বাঙালির প্রাতিষ্মিক মাইলফলক ভাষা-আন্দোলনের সংগ্রাম তাঁকে উজ্জীবিত করেছে। ফলশ্রুতিতে তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে কারাভোগ করেন। জাতীয় আদর্শকে ধারণ করে কারা-প্রকোষ্ঠের অন্তরালে বসে ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে রচনা করেছেন একাঙ্ক কবর নাটক।

৩. কবর

ত্রয়ী নাটকে প্রথম আলোচ্য কবর একাঙ্ক। কবর ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত বিখ্যাত নাটক। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন বাঙালি জাতির অবিনাশী চেতনার উদ্গাতা, স্বাধীনতার প্রস্তুতি পর্ব। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের নিমিত্তে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা বাঙালি তরুণের যে আত্মহুতি, তা ক্রমান্বয়ে আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মহীর্ন সৃজন করে। ‘যার সূত্রপাত ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার অভিমত প্রকাশ করলে ডক্টর মুহম্মদ

শহীদুল্লাহর প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রতিবাদ। যেখানে উপস্থাপিত হয় বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।^{৩০} জাতি এই আত্মত্যাগের মহিমা থেকে পেয়ে যায় সামনে এগিয়ে যাবার সার্বিক নির্দেশনা। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেনি, উন্নত জাতিসত্তার উন্নীলনেও নিরঙ্কুশ ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা-আন্দোলনের চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনের বহুমুখী স্তরে দেদীপ্য হয়ে উঠেছে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৪৮-১৯৫১ পেরিয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলনের একসূত্রিক আদর্শে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সংগঠিত হয়েছিল; সেটিই ছিল বাঙালি জাতির প্রথম ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী উন্নীলন। এরপর থেকেই ৫৪র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ৬২র ছাত্র-আন্দোলন, ৬৪র নির্বাচন, ৬৫র রেলশ্রমিক আন্দোলন, ৬৬র স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, ৬৯এর গণ-আন্দোলন সর্বোপরি ৭১এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রস্রবণ থেকেই উদ্গত। একুশের চেতনা আমাদের শুধু স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অস্তিত্বের দিশারি হিসেবে কাজ করেনি, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুস্থ উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও সন্দীপনা প্রদান করেছে। তাই বাঙালির জাতীয় জীবনের এই বিশেষ অধ্যায় বাজ্রয় হয়েছে মুনীর চৌধুরীর কবর একাঙ্কে।

স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত মুনীর চৌধুরী একজন সচেতন রাজনীতিক ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী হন। জেলখানায় অভিনীত হবার যোগ্য নাটক লেখার অনুরোধ করেন রাজবন্দী রণেশ দাশগুপ্ত। শুধু আঙুঠাপালনের নিমিত্তে নয় দেশপ্রেমে সচেতন মুনীর চৌধুরী ভাষা-আন্দোলনের মতো জাতীয় প্রেক্ষাপটকে তুলে আনেন নাটকে। রচনা করেন নাটক কবর। জেলখানাতেই নতুন আঙ্গিকে অভিনীত হয় কবর ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে। ঘটনা ও চরিত্রের বাহুল্য এখানে নেই। আছে শুধু নিপাট অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিত বাঙালি তরুণপ্রাণের আত্মাহুতি।

৩.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও কবর

কবর নাটকে একরাতের ঘটনা বর্ণনায় পুরো ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা উঠে এসেছে। একদল সাহসী-বীর বাঙালি তরুণদের ভাষার জন্য আত্মত্যাগের কাহিনি চিত্রল হয়েছে। কিছুটা পাশ্চাত্য স্টাইলে আলো-আঁধারির রহস্যময়তায় অতি-প্রাকৃতর সন্ধান মেলে এখানে। নাটকের বর্ণনা, ‘কিছু না স্যার! এসব কিছু না। গোরস্থানে এরকম কত কিছু হয়।’^{৩১} এখানে গোরস্থান হয়ে ওঠে অনবদ্য প্রেক্ষাপটের আকর স্থান। আর মদ্যপ ইঙ্গপেক্টর ও নেতার বিপক্ষে বলিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ানো মুর্দা ফকির জাতির বিবেক হয়ে ওঠে।

সাবলীল বর্ণনায় কবর নাটকে ভাষা-আন্দোলনে নিহত একদল তরুণের লাশ গুম করার কাহিনি উঠে এসেছে। কিন্তু মূল সুরে ভিন্ন অঙ্গুলি-সংকেত আছে। কবর থেকে উঠে আসা একদল ছায়ামূর্তির প্রতিবাদই যেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রতিবাদ। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহিদ দিবস উদযাপনের অন্যতম স্বাক্ষর এই নাটক।

একরাতের শেষ ৩-৪ ঘণ্টার প্রেক্ষাপটে কবর নাটক রচিত। ‘নাটকের পরিসর স্বল্প। কিন্তু শক্তিশালী আঙ্গিকে আধুনিক বার্তা পরিপুষ্ট হয়েছে।’^{৩২} নাটকে ভাষা-আন্দোলনের পাশাপাশি ১৯৪৩এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭এর দেশভাগ, ১৯৪৮এর বুদ্ধিজীবী-মহলের ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ১৯৫২র ভাষা-আন্দোলন চিত্রল। মাত্র ৫টি চরিত্র নেতা, হাফিজ, মুর্দা ফকির, গার্ড ও ছায়ামূর্তি প্রমুখ এলেও প্রতিটি চরিত্র সারা বাংলার নানাশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। নেতা, হাফিজ, গার্ড শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি। মুর্দা ফকির দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সকল প্রতিবাদী মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ছায়ামূর্তিগুলো ভাষা-সৈনিক, যাঁদের আত্মত্যাগে বাঙালি জাতি পেয়েছে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মান।

৩.২ অ্যাবসার্ডিটি ও কবর

অন্যদিকে মঞ্চকৌশল, চরিত্র ও সংলাপ রচনার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের কাতারে উত্তীর্ণ করেছেন মুনীর চৌধুরী। অ্যাবসার্ডিটির উপস্থাপনেও পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে এখানে। ‘Absurdity বোধের জন্ম জীবনে বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে।’^{৩৩} কবর নাটকের সাথে আমরা সাদৃশ্য পাই Bury the Dead (১৯৩৬) নাটকের সংলাপ ও ভৌতিক পরিবেশের। ইবসেনের সামাজিক বাস্তবতা, বার্নাডশ-এর শ্রেষাত্মক জীবনী, পিরান্দেলো, বেকটের শিল্পাঙ্গিকের নতুনত্ব, হ্যারল্ড পিণ্টার ও এডওয়ার্ড এ্যালরি

নাট্যমঞ্চায়নের কৌশল মুঞ্চ ও প্রভাবিত করেছিলো মুনীর চৌধুরীকে। স্বীকৃতিস্বরূপ সমালোচকের মন্তব্য, ‘মুনীর চৌধুরী ছিলেন স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের নাটকের অন্যতম সফল নির্মাতা। নাটকের বিষয়, আঙ্গিক ও মঞ্চায়নগত উৎকর্ষ বিবেচনায় তাঁর শ্রমনিষ্ঠ আন্তরিক অবদান শ্লাঘনীয়।’^৭

৩.৩ ভাব-সংক্ষেপ উপস্থাপন

আলোচনার স্পষ্টীকরণে কাহিনির ভাব-সংক্ষেপ উপস্থাপন আবশ্যিক। রাতের শেষপ্রহর, ভয়াবহ, রহস্যময় পরিবেশে গোরস্থানের প্রেক্ষাপট উন্মোচন। নেতা ও হাফিজ মদ্যপ, কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ, উদ্ভিন্ন। গার্ডের অপ্রস্তুত ছোটালুটি, কারণ অল্প সময়ে কিছু লাশ মাটি চাপা দিতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন-বর্জিত একাজ করতে হবে ভাষা-সৈনিকদের নিশ্চিহ্ন করার নিমিত্তে, গুম করার লক্ষ্যে। যাতে ভাষা-আন্দোলনের লেলিহান শিখা আর প্রজ্বলিত না হয়। নেতার কণ্ঠে:

পুঁতে ফেল। দশ পনেরো-বিশ-পঁচিশ হাত যত নিচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে পুঁতে ফেল। কোনদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্রোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাচাতে ভুলে যায়।^৮

৪৩এর দুর্ভিক্ষে স্ত্রী-সন্তানসহ সব হারানো মূর্দা ফকির এর প্রতিবাদ জানায়। খাবারের অভাবে পরিবারের সকলকে মরতে দেখে পাগল হয়ে গোরস্থানেই সে থাকে আর সকল মূর্দার মুখে খাবার গুঁজে দেয়। ভাষা-আন্দোলনের মিছিলে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা দলাপাকানো লাশগুলোকে কবর দিতে দেখে প্রতিবাদে উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে। তার সোচ্চার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়:

তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়, তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি, গুলি হবে ফুঁটি করে উঠে আয় সব। কোথায় গেলি? সব উঠে-আয়, মিছিল করে আয় এদিকে, আজ গুলি-গুলি হবে আজ! কবর খালি করে সব উঠে আয়।^৯

ছায়ামূর্তিদের প্রতিবাদ, ‘আমরা মরিনি, আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না।’^{১০}

এই ছায়ামূর্তিরাই ভাষা-সৈনিক সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা সকল শহীদ। যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল। এখানে ইতিহাস-প্রচ্ছন্ন চরিত্র মূর্তমান, যাদের গুম করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক তথ্য মতে:

২১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত গভীররাতে সশস্ত্র পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী একযোগে হামলা চালিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের-এক মর্গ থেকে শহীদদের কাটা লাশ নিয়ে গিয়েছিল, তার কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি। তাই সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঠিক কতজন নিহত হয়েছিল-তাই প্রাসঙ্গিকভাবে সাহিত্যেও তবে সন্ধানী মেলে না।^{১১}

৩.৪ বহুমাত্রিকতায় কবর

এই নাটকে অ্যাবসার্ডরীতিতে ভাষা-শহীদরাই ছায়ামূর্তিরূপে উপস্থাপিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। লেখকের কলমে রচিত হয়েছে আবহমানকালের গ্রামবাংলার মায়ের উদ্বেগ, ‘মা হলে জানতি, মার কষ্ট কি! মার বুক খালি হলে, মার কেমন লাগে?’^{১২} আরও উঠে এসেছে দারিদ্র্য, ‘কাঁদিসনে মিন্টু। তোর বাপ কি কম চেষ্টা করেছে? দুট্ট মুদী কিছুতেই মাসের শেষ কালে এক রত্তি বার্লি বাকি দিল না। বেতন নেই দেড় মাস।’^{১৩}

ধর্মীয় অনুশাসনও নাটকে মিশ্রিত হয়েছে, ‘কাভি নেহি। বলে কিনা মুসলমানের মূর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই। জানাজা নেই। তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হতে পারে না।’^{১৪} চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ রচনা, মঞ্চকৌশল প্রভৃতিতে মুনীর চৌধুরীর মুন্সীমানার পরিচয় মেলে। ‘সুগভীর জীবনবোধে উদ্ভীষ্ট মুনীর চৌধুরী সংলাপের তীক্ষ্ণতায় ও পরিপাটে ‘কবর’ নাটিকাকে রহস্যময় ও ব্যঞ্জনাময় করেছেন।’^{১৫}

এভাবেই মুনীর চৌধুরী বাঙালির জাতীয় ইতিহাসকে নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। অধ্যাপক আবুল কাশেম তমুদ্দিন মজলিস নামক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।^{১৬} মুনীর চৌধুরীর ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সূতিকাগার যেন সেটিই। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ’র (১৮৮৫-১৯৬৯) উত্তরসূরী হিসেবে মুনীর চৌধুরীর কবর নাটক এক অভিনব সৃষ্টি। এক রাত্রির শেষ কণ্ঠস্বর কাহিনিতে বহুদূর সঞ্চরী বিষয়বস্তুর ভাবগাভীর উপস্থাপনে এক ক্লাসিক সৃষ্টি কবর। ‘ভাষার ইতিহাস রচনার সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার একটি সম্পর্ক আছে।’^{১৭} সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী কবর নাটকের মাধ্যমে সেই ইতিহাস

রচনা করেছেন পুনরায়। যা আমাদের মনে ইতিহাসের গুরুত্বকে জাগ্রত করে এবং প্রজন্মান্তরে সেই উপলব্ধি সঞ্চারিত করার তাগিদ অনুভূত হয়।

৪. দণ্ড ও দণ্ডধর-এর প্রাক্কথন

আরবান নাট্যকার এই অভিধায় স্বীকৃত মুনীর চৌধুরীর বিশেষ দুটি আধুনিক একাঙ্ক দণ্ড (১৯৬৬) ও দণ্ডধর (১৯৬৬)। মুনীর চৌধুরীর নাট্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন অভিন্ন বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর প্রাথমিক জীবনভাবনাকে রূপায়িত করেছেন তাঁরই নাটকে। 'নাট্যকলার সংমিশ্রণে আধুনিক জীবনের এই কাল পরিসরের নাট্যচর্চাকেন্দ্র দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন সমালোচকগণ। এক ঢাকা শহরকেন্দ্রিক, দুই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাকেন্দ্রিক।'^{১৮} বলা যায়, মুনীর চৌধুরীর দণ্ড ও দণ্ডধর সম্পূর্ণই ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নাটক।

শহুরে জীবনের চালচিত্র রূপায়িত হয়েছে দণ্ড ও দণ্ডধর এই দুটি নাটকে। মুনীর চৌধুরীর শিক্ষকতা জীবনের নানান অভিজ্ঞতা নাটকরূপে সজ্জিত হয়েছে। এই নাটক দুটির ভূমিকায় মুনীর চৌধুরীর ভাষ্য, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কোমল-কঠিন করে উৎসর্গকৃত দণ্ড ও দণ্ডধরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জীবননির্ভর কাহিনিই দৃশ্যমান।'^{১৯} আধুনিক শিল্পদৃষ্টি-সম্পন্ন মুনীর চৌধুরীর কবর এবং দণ্ড ও দণ্ডধর নাটক দুই বিপরীত প্রকৃতির। কবর ইতিহাস সম্বলিত নাটক আর দণ্ড, দণ্ডধর আধুনিক মানুষের প্রেমাসক্তিজনিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় মুখর। তবে উপস্থাপনরীতিতে কমেডি বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্য, 'হাস্যরসের প্রাধান্য সত্ত্বেও নাট্যকারের সংযম, সহানুভূতি ও সার্থক জীবনবোধই সুস্পষ্ট।'^{২০} মাত্র স্বল্পকিছু চরিত্রের সন্নিবেশ, কাহিনির সংক্ষিপ্ত পট উপস্থাপন, একরৈখিক সমস্যার প্রকাশ, সংলাপের পরিমিতবোধ- প্রভৃতির সার্বিক উপস্থাপনের নির্মিতিতে দণ্ড ও দণ্ডধর একাঙ্কদ্বয় মুনীর চৌধুরীর সার্থক একাঙ্কের পরিচায়ক।

৪.১ দণ্ড

দণ্ড (১৯৬৬) নাটকে স্বামী, স্ত্রী ও নেপথ্যে থাকা চোর এই তিন চরিত্র ও একরাতে একটি প্রহর বর্ণিত হয়েছে। প্রেমজনিত অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ থেকে কলহের পথে যাত্রা এবং চোরের দণ্ডের মাধ্যমে সে পথযাত্রার অবসানে প্রেম ও বিশ্বাসই জয়ী। উকিল স্বামীর মক্কেল সুরাইয়া খানম এবং স্ত্রীর গলায় বিদ্ধ মাছের কাঁটা নিরসনে নিযুক্ত ডাক্তার দুজনই সন্দেহের কেন্দ্রে থেকেছে। সুকৌশলে সে সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন নাট্যকার চোরের দণ্ডের মাধ্যমে। সন্দেহের কেন্দ্রে ডাক্তারের ডায়রি এবং সুরাইয়া খানমের ছবি। সন্দেহের অবসানে মুখ্য হয়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও বিশ্বাস। নাটকের সংলাপে, 'স্ত্রী: ওগো তোমার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও। লাঠি ছেড়ে দাও। আমি সব বিশ্বাস করব যা বলবে সব একিন যাব।'^{২১}

নাটকে চোরের প্রস্থান এবং বিশ্বাসের পুনরাগমনে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে দ্বন্দ্বের শেষে শান্তি বিরাজমান। স্বামীর সংলাপে যেন পাঠকমনেও প্রশান্তি নামে, 'চুরি গেছে, বেশ হয়েছে। এখন শোবে না কি বোলা, বাতিটা নিবিয়ে দি।'^{২২} আধুনিক জটিলতামুখর জীবনে মানুষ যেন প্রতিনিয়ত প্রশান্তির ছায়াসন্ধানী। তারই প্রমাণ মুনীর চৌধুরীর এই একাঙ্ক কমেডি দণ্ড। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা অথবা বিষ দিয়ে বিষক্ষয়ের মতো নেতিবাচকতার প্রতীক দণ্ড দিয়ে অস্থিরতর, নেতিবাচক নগরজীবনে শান্তির সমাধান এনেছেন মুনীর চৌধুরী। কল্পনার বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে নিরেট বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়েছে এখানে। বলা যায়, 'কল্পনার পাখায় ভর করে আমরা যেন অনেক পিছিয়ে গেছি।'^{২৩} তাই বাস্তবে ফেরা অনিবার্য।

৪.২ দণ্ডের কমেডি

কমেডি একাঙ্কে সংলাপ বিশেষ ভূমিকা রাখে। দণ্ড একাঙ্কে কিছুটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ সংলাপ পরিলক্ষিত। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে মুনীর চৌধুরী সংযম, বৈদগ্ধ্য এবং স্বামী-স্ত্রীর শিল্পীত সংলাপে সার্থক জীবনবোধই উপস্থাপন করেছেন। খণ্ডচিত্র:

স্ত্রী: ভদ্রমহিলা বিধবা হলেও তুমি হাজী নও। তোমার- মহসীন বনে যাবার আমি কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না।^{২৪}

স্বামী: ভয়-কি জাতকেউটের ফণাও তোমার তেজের সামনে নেতিয়ে পড়তে বাধ্য।^{২৫}

চোর: ধর, ধর! এই ল তোর প্যাটফোলা ব্যাগ। লইয়া কালিজা ঠাণ্ডা কর। প্যাটফোলা, পোটফোলিও।^{২৬}

এরই পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করি মুনীর চৌধুরী ঢাকার আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। আর গাণিতিক সিমেন্টিক ঢং-এ সংলাপ রক্ষা করেছেন। কিছুটা স্যামুয়েল বেকটের Waiting for Godo-এর সাযুজ্যে:

এস্ট্রাগন: এখানে আসো।

পোজো: কেন?

এস্ট্রাগন: এলে দেখবে।

পোজো: তুমি চাও যে আমি উঠি?

এস্ট্রাগন: কুইক! [পোজো উঠে দাঁড়ায়, এস্ট্রাগনের কাছে যায়। এস্ট্রাগন ওদিকে আঙুল দেখিয়ে] দেখ

পোজো: [চোখে চশমা পরে নিয়েছে]। ওহ, কী কাণ্ড!

এস্ট্রাগন: সব শেষ।...

পোজো: শান্ত হয়ে-আসছে। [চারপাশে তাকিয়ে] বস্তুতপক্ষে সবাই শান্ত হয়ে আসছে। মন্ত এক প্রশান্তি নেমে আসছে। [হাত তুলে] শোনো! প্যান ঘুমুচ্ছে।^{২৭}

এভাবেই আমরা ছোটছি প্রশান্তির সন্ধানে।

৫. দণ্ডধর

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একদল অস্থির ছাত্র-ছাত্রী প্রেমে, বিশ্বাসে স্থির হতে চাইছে দণ্ডধর (১৯৬৬) নাটকে। যেকথা সমাজজীবনের নিগূঢ় বাস্তবতায় সহজে বলা যায় না, সেকথা নাটকের নাটকীয়তার আড়ালে বলেছেন মুনীর চৌধুরী। দণ্ডধর নাটকে মনের গোপন প্রেম প্রকাশ করে একসাথে মিলেছে জাহানারা-সেলিম এবং আমিনা-রোকেয়া। নির্ধারিত সংলাপের বাইরে নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ায় নাটকের মাঝের নাটক বলিষ্ঠ হয়েছে। নাটকে সঙ্গতি এনেছে দণ্ডধরের দণ্ড ও সংলাপ। বাবার কড়া শাসনের ভয়, সামাজিক বাস্তবতার কশাঘাতের ভয় সবকিছু ভেঙে আমিনার প্রেমের কাছে রোকেয়ার এবং সেলিমের প্রণয়ের কাছে জাহানারার সমর্পণ। আমিন ও জাহানারার সংলাপে সেলিমের তীব্র প্রেমের কথা জেনেছে পাঠক:

সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে এই সেকেন্ড ইয়ার এম.এ. ক্লাস পর্যন্ত তোমার উপেক্ষা সে গায়ে মাখেনি।

করুণায় অপমানিত বোধ করেনি। প্রত্যাখ্যানে দমে যায়নি। ওর সৌরভগতে তুমিই একমাত্র জ্যোতিষ্ক। ওকে

আর দক্ষে মেরো না। ধরা দাও। সুখী হও।^{২৮}

আমিন রোকেয়ার কথপোকথনে তাদের প্রেমও স্পষ্ট, 'এবার ঢাকা যাবার আগে তুমি আমাকে স্পষ্ট বলে দিয়ে যাবে যে তোমার বিয়ের কথাবার্তা এখন থেকে আমি চালাতে পারি কিনা?'^{২৯} দণ্ডধর নাটকে একে অপরের প্রতি প্রেম প্রকাশে সংকোচের অবসান ঘটিয়েছে সেলিমের মায়ের হার চুরির ঘটনা এবং নাটকের মাঝে নাটক। প্রেম, দুঃখবোধ, সামাজিক জটিলতা, পিতার-আবহমানকাল ধরে চলে আসা কড়া শাসন, নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রভৃতি উপস্থাপনে দণ্ড ও দণ্ডধর নাটক দুটিতে আধুনিক জন-জীবনের প্রতিচ্ছবিই মূর্ত হয়েছে। অনুষঙ্গে পুরাণও উঠে এসেছে আধুনিক জীবনের প্রেম বয়নে:

তোমাকে ভালবাসি বলে এই মর্ত্যভূমির বাদবাকী সকল ভদ্রমহিলারা আমার চোখে নিতান্ত হিড়িম্বা, শূর্ণনখা

সদৃশ মনে হচ্ছে এমন কথা স্বপ্নেও ভেবো না। তোমার জাহানারা আপা আজ আমার সঙ্গে যত নিঃসম্পর্কিত

হন না কেন। আমি তাকে রূপবতী গুনবতী বলে শ্রদ্ধা জানাতে কোন সময় কার্পণ্য করব না।^{৩০}

৫.১ গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশে দণ্ডধর

এই নাটকে নাটকের ভেতর নাটক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সমাজ-জীবনের নৈমিত্তিক কথোপকথনে বলতে না পারা কথাগুলো নাটকের আড়ালের নাটকে সহজে প্রকাশ করেছেন- মুনীর চৌধুরী। নাটকের পরিসমাপ্তিতে জীবনের এক গূঢ় তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন- জীবন গতিশীল এবং কালের আবহমানতায় পূর্ণতা-সন্ধানী। অতৃপ্ত হৃদয়-আত্মার পিপাসিত জিজ্ঞাসা নিয়ে এগিয়ে চলা আমাদের। প্রম্পটার ও অধ্যাপকের উক্তি:

প্রম্পটার: শেষ পর্যন্ত নাটকটা কেমন হবে মনে করেছেন স্যার?

অধ্যাপক: শেষ পর্যন্ত না দেখে কিছুই বলা যাচ্ছে না। আচ্ছা চলেন এখন।^{৩১}

যেন বলা যায় না কখনো সে কথা। রবীন্দ্রনাথের মত বলে উঠতে হয়, 'পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে?'^{৩২}

অথবা সেলিম আল দীনের সন্ধানী যাত্রা:

চল চল
সূখ্য হেলে।
চল মন গুরুতোলা
চল যাই কিন্ননখোলা।^{৩৩}

যেন উৎপল দত্তের ছায়া-নাটকের সতিশ-লতার নিরুদ্দেশ যাত্রায় সন্ধানী চোখ [মনোজ ধীর পদক্ষেপে স্টুডিও ছেড়ে চলে যান। ওদিকে আবার গুটিং আরম্ভ হয়েছে] :

অজিত ।। Going for a take !
বসাক ।। হিমাদ্রিবাবু শুনছেন! হিমাদ্রিবাবু!
অজিত ।। Artistes ready? Rack Over?
অরূপ ।। Yes
অজিত ।। Start sound (Buzz!)
বসাক ।। Sequence 4, Scene 6/2/4/z !
অজিত ।। Action!^{৩৪}

কিংবা নজরুলের নাটকের ভাষায়:

চিত্রা : হাত ধরো। কোথায় যাবে বন্ধু?
চিত্রকর : যে পথে পৃথিবীর কোটি কোটি ধূলিলিপ্ত সন্তান নিত্যকাল ধরে চলেছে সেই
দুঃখের, সেই চির বেদনার পথে। (প্রস্থান)
(ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেই হাতে চুম্বন করে)।^{৩৫}

১৯৪২-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চায় মুনীর চৌধুরী ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনামূলক গ্রন্থ, গবেষণা গ্রন্থ, অনুবাদমূলক গ্রন্থ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তবে নাটকে তাঁর সপ্রতিভ দক্ষতা তাঁকে শক্তিমান স্থপতির আসনে বসিয়েছে। সমালোচকের ভাষায়, “তিনি এ দেশের আধুনিক নাটকের শ্রেষ্ঠতম নির্মাতা এবং সুষ্ঠু নাট্যচর্চার প্রতীক।”^{৩৬} মুনীর চৌধুরীর রচনা-কৌশলের বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্রতার পরিচয় মেলে। বলা যায়, তাঁর নাটক শিল্পসফল ও কালোত্তীর্ণ।

৬. উপসংহার

প্রবন্ধের শেষকথনে বলা যায়, মুনীর চৌধুরীর কবর, দণ্ড ও দণ্ডধর এই ত্রয়ী নাটকে শিল্পসম্মত বিষয়োপযোগী বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে সামাজিক দায়বদ্ধতায় নিপুণ কারিগরের ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৫২ ও ১৯৬৬ সালের জীবনভাবনার বহমানতায় এখনও সমাজজীবন একই গতিতে প্রবাহমান, পরিবর্তন এসেছে শুধু দৃষ্টিভঙ্গি। নাট্য-নিরীক্ষার কৃতিত্বে তাঁর জীবনভাবনা ঋদ্ধ। ত্রয়ী নাটকের অবকাঠামোয় একইসঙ্গে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেম চিরন্তন রূপাঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। বিদ্যমান চরিত্র ও বিশদ মনস্তত্ত্ব, কমেডির অন্তরালে বাস্তবতা প্রভৃতির সমন্বয়ে একাঙ্কত্রয়কে কালোত্তীর্ণ করেছেন। চেতনায় জাজ্বল্যমান থেকেছে জাতীয় আন্দোলন, ইতিহাস-চেতনা ও নগরের আধুনিক জীবন-জটিলতা। বাঙালি জাতি হিসেবে এবং উত্তরাধুনিক যুগের জটিল জীবনবোধে মুনীর চৌধুরীর ত্রয়ী একাঙ্কের বিচার-বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য। কেন না নাটক সামগ্রিক চেতনার উদ্বোধন ঘটায়। পরিবর্তিত ও বিকশিত করে মানস ও সমাজ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা (১৯৪৭-২০২১)* (কলকাতা: যাপনচিত্র ফাউন্ডেশন, ২০২১), পৃ. ১১।
- ^২ মিনতি কুমার রায়, *সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্ব* (ঢাকা: প্রবাহ প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ১।
- ^৩ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ১৯।
- ^৪ মুনীর চৌধুরী, *কবর* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৫), পৃ. ৬৪।
- ^৫ শহীদ ইকবাল, পৃ. ৭১।

-
- ৬ ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-বিবেক (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪), পৃ. ২৪৯।
- ৭ মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ২১।
- ৮ মুনীর চৌধুরী, কবর, পৃ. ৫৪।
- ৯ তদেব, পৃ. ৬৪।
- ১০ তদেব, পৃ. ৫৯।
- ১১ এম. আর. আখতার মুকুল, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১১৭।
- ১২ মুনীর চৌধুরী, কবর, পৃ. ৬১।
- ১৩ তদেব, পৃ. ৬২।
- ১৪ তদেব, পৃ. ৫১।
- ১৫ সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২৯২।
- ১৬ এম এ বার্নিক, ভাষা আন্দোলনের সারগ্রন্থ (ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ৯।
- ১৭ মনসুর মুসা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ৩।
- ১৮ সুকুমার বিশ্বাস, পৃ. ২১৬।
- ১৯ মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, দণ্ডকারণ্য, উৎসর্গপত্র।
- ২০ মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, পৃ. ৭০।
- ২১ মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, দণ্ডকারণ্য, পৃ. ২০৯।
- ২২ তদেব, পৃ. ২১১।
- ২৩ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনার কথা (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী, ২০০০), পৃ. ৩।
- ২৪ মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, দণ্ডকারণ্য, পৃ. ২০৫।
- ২৫ তদেব।
- ২৬ তদেব, পৃ. ২০৯।
- ২৭ কবীর চৌধুরীর অনুবাদ, ওয়েটিং ফর গডো (ঢাকা: ফ্রেণ্ডস বুক কর্পার, ২০০৬), পৃ. ১৯।
- ২৮ মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, দণ্ডকারণ্য, পৃ. ২২১।
- ২৯ তদেব।
- ৩০ তদেব, পৃ. ২২৪।
- ৩১ তদেব, পৃ. ২৩৫।
- ৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান (ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯৩), পৃ. ১৭০।
- ৩৩ সাইমন জাকারিয়া সংকলিত, সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৮১।
- ৩৪ শোভা সেন ও সৌভিক রায় (সম্পা.), উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৯৪), পৃ. ৬৪।
- ৩৫ মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন নবী (সম্পা.), নজরুল সমগ্র (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৬), পৃ. ৬১।
- ৩৬ মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, পৃ. ১০৮।

প্রমিত বাংলা এবং কিশোরগঞ্জের উপভাষা: ব্যঞ্জনধ্বনি বিচার ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ
[Colloquial Bengali and Dialects of Kishoreganj: Consonant Judgment
and Distinctiveness Instruction]

মুণ্ডু রানী দাস*

[Abstract: Dialects are informal structure of language which is used in different regions. Like colloquial Bengali dialects also have their own consonant sounds. Kishoreganj dialect is no exception. However, there are both parallelism and differences in the Kishoreganj dialect by means of standard Bengali. As in 'Bongali' dialectical area due to phonological features, the aspirated sounds are not supposed to exist. But this dialect has the use of the aspirated sound /p^h/. The fricative pronunciation of plosive sound, the presence of labiodental sound like English also create awareness about this dialect. It is essential to give consideration to this dialect for its distinguishable structures. This research paper is written with the purpose of discriminate specialties from standard Bengali. To fulfil this research-work in field level data collection there were followed participatory observation and interview method.]

Keywords: দত্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি, আন্তর-দন্ত্য ধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি, তাড়নজাত ধ্বনি এবং শিসধ্বনি।

১. ভূমিকা

বাংলা ভাষায় ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায় ৩৩টি^১। য়, য, ৭, ৭, ৭, ছাড়া বাকিগুলো বাংলা ভাষায় উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনি। বঙ্গালী উপভাষা অঞ্চলের মধ্যে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র সভ্যতাখ্যাত কিশোরগঞ্জ উপভাষাঞ্চলটি পূর্ববঙ্গে অবস্থিত বঙ্গালী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত। নদী, হাওর এবং সমতলভূমির সমন্বয়ে সৃষ্ট বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত ঢাকা বিভাগের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই জেলার উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি প্রমিত বাংলা থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিশোরগঞ্জের উপভাষা বিশ্লেষণে প্রমিত বাংলার ৩৩টি ব্যঞ্জনধ্বনির সবগুলো পাওয়া যায় না। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয় মোট ২৪টি তবে ব্যঞ্জনধ্বনিমূল ২২টি। /৭/ এবং /য/ ব্যবহৃত হলেও এগুলো ব্যঞ্জনধ্বনিমূল নয়। উপভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনিএকটি তালিকা নিচে প্রদান করা হলো:

উপভাষা	সংখ্যা	ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনি IPA চিহ্নসহ							
কিশোরগঞ্জ উপভাষা	২৪টি	ক	গ	ঙ	চ	জ	ঞ	ট	ড
		k	g	ŋ	tʃ	dʒ	n	t̪	d̪
		ণ	ত	দ	ন	প	ফ	ব	ম
		n	t	d	n	p	pʰ	b	m
		য	র	ল	শ	ষ	স	হ	য়
		ɔ̃	r	l	ʃ	ʂ	ʂ	h	y

২. উচ্চারণ-স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি বিচার:

২.১ ওষ্ঠ্য ও দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি (Labial & Labiodental Sound): দুই ঠোঁটের সংস্পর্শে সৃষ্টি হয় ওষ্ঠ্য বা Labial Sound এবং ঠোঁট উপর পাটির দাঁত স্পর্শ করে সৃষ্টি করে দন্তোষ্ঠ্য বা Labiodental sound। দুই ঠোঁট শ্বাসবায়ুকে বদ্ধ করে মজ্জা হয়ে ওষ্ঠ্য ধ্বনি গঠিত হয়। দন্তোষ্ঠ্য ব্যঞ্জন সম্পর্কে সভাষ ভট্টাচার্য বলেন,

* পিএইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

‘দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনির উচ্চারণে দাঁত ও নীচের ঠোঁটের সংযোগ ঘটে।’^{১২} সুকুমার সেনের মতে, ‘উচ্চারণকালে ওষ্ঠ্য স্পর্শ করিলে ধ্বনিকে বলে বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (bilabial)। আর উপরের দাঁত স্পর্শ করিলে দন্তোষ্ঠ্য (Labiodental) বা (Dentilabial)।’^{১৩} বাংলা ভাষায় প-বর্গীয় ধ্বনিগুলো ওষ্ঠ্যধ্বনি। প্রমিত বাংলায় দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনির অস্তিত্ব নেই। ইংরেজি ভাষায় f এবং v দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় তিনটি ওষ্ঠ্যধ্বনির ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলো হলো- প, ব, ম। উদাহরণ স্বরূপ: নিকানো<লেইপ্যা [leipæ], লজ্জাহীন<বেশরম [beʃɔɾɒm], কুমির<কুমুর [kumbur], কোমর<মাজা [madʒa], বাতাবিলেবু<জামুরা [dʒambura] প্রভৃতি। দুই ঠোঁটের স্পর্শের মাধ্যমে উচ্চারিত হয় বলে ওষ্ঠ্য ধ্বনিগুলোকে দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। প্রমিত বাংলার ফ [p^h] এবং ভ [b^h] ধ্বনি কিশোরগঞ্জের উপভাষায় না পাবার দ্বিবিধ কারণ বিদ্যমান। অল্পপ্রাণীভবনের কারণে ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন: ভাজি [b^hadʒi]<বাজি [badʒi], ভুনা [b^huna]<বুনা [buna] শব্দদ্বয়ের প্রারম্ভেই অবস্থিত /ভ/ ধ্বনি /ব/ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে উচ্চারণের কারণে। শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্ত্যে সমভাবে এই প্রক্রিয়া কার্যকর। যেমন:

আদিস্থান	মধ্যস্থান	অন্ত্যস্থান
ভাটি<বাডি [baɖi]	হাভাতে<আবাইত্যা [abaitæ]	লোভ<লুব [lub]
ভেড়া<ব্যারা [bæra]	স্বভাব<স্ববাব [ʃbɔbab]	সৌরভ<সৌরব [ʃourɔb]

প্রমিত বাংলার ‘হাভাতে’ থেকে ‘আবাইত্যা’ নতুন শব্দরূপ সৃষ্টি করলেও অর্থের কোন স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে না। প্রমিত বাংলায় দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনির অস্তিত্ব না থাকলেও ইংরেজি /f/ এবং /v/ ধ্বনির মতো নিচের ঠোঁট এবং উপর পাটির দাঁতের সংস্পর্শে উপভাষাঞ্চলে /ফ/ ধ্বনির উচ্চারণ হয়ে থাকে। জীনাত ইমতিয়াজ আলীর বক্তব্য অনুসারে ‘বাংলায় দন্ত-ওষ্ঠ ও আলজিভ থেকে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয় না।’^{১৪} প্রমিত বাংলার ক্ষেত্রে এই বক্তব্যটি যথার্থ। কিন্তু কিশোরগঞ্জের উপভাষায় /ফ/ ধ্বনি দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনির স্বরূপ বহন করে। কারণ এই উপভাষাঞ্চলে /ফ/ ধ্বনিটি প্রমিত বাংলার ন্যায় দুই ঠোঁটের পরিপূর্ণ সংস্পর্শে উচ্চারিত হয় না। উপভাষায় /ফ/ ধ্বনির উচ্চারণ স্থান নিচের ঠোঁট এবং উপর পাটির দাঁত। নিচের ঠোঁট ভেতরের দিকে সামান্য প্রবেশ করে উপর পাটির দাঁতের অগ্রভাগ স্পর্শ করে। ফলে একে ওষ্ঠ্য ধ্বনির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করে দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনির তালিকাভুক্ত করতে হয়। মিঠামইন, ইটনা, পাকুন্দিয়া এবং কটিয়াদি উপজেলার উপভাষা-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিশোরগঞ্জের উপভাষাঞ্চলে দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি /ফ/ এর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত: পথঘাট<ফতগাট [p^hɔtɡat], জামা<ফিরান [p^hiran], ছিদ্র <ফুডা [p^hudɑ], পিসি<ফিসি [p^hiʃi] প্রভৃতি। ইংরেজিতে শব্দগুলোর উচ্চারণ বিশ্লেষণ করলে ফ /p^h/ ধ্বনিটি /f/ এর মতো শোনায। যেমন: পথঘাট [pothg^hat]<ফতগাট [p^hɔtɡat]। ইংরেজি উচ্চারণীয় ধ্বনিসমূহ দাঁড়ায় ফতগাট [fɔtɡat]। শ্রেণি বা সমাজ-সম্প্রদায় ভেদেও কিছু দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনিযোজক শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন: পিসি<ফিসি [p^hiʃi] শুধুমাত্র হিন্দুসমাজে ব্যবহৃত শব্দরূপ। পাকুন্দিয়া এবং কটিয়াদি উপজেলার মুসলিম সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত এরকম শব্দরূপ হলো: খরের স্তূপ<ক্যারের ফুঞ্জি [kærer p^hundʒi], পোলাও<ফোলাবাত [p^holabat], পকেট<ফগাট [p^hɔɡat], তেলের পিঠা<ফাকান ফিডা [p^hakan p^hida] ইত্যাদি। কামরূপী উপভাষায়ও /প/ ধ্বনি দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনির রূপপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চারিত হয়।

২.২ দন্ত্য ধ্বনির অবস্থান: জিভের ডগা বিস্তৃতভাবে উঁচু হয়ে উপর পাটির দাঁত স্পর্শ করে দন্ত্য ধ্বনির সৃষ্টি করে। সচেতনভাবে উচ্চারণ করলে দুপাটির দাঁতই স্পর্শযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রমিত বাংলায় ত-বর্গীয় চারটি ধ্বনি দন্ত্য ধ্বনি। যেমন: /ত/, /থ/, /দ/, /ধ/। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় অল্পপ্রাণীভবনের প্রবণতার কারণে শুধুমাত্র দুটি দন্ত্য ধ্বনির অবস্থান রয়েছে। /থ/ এবং /ধ/ মহাপ্রাণীভবন বৈশিষ্ট্যশূন্য হয়ে অল্পপ্রাণ /ত/ এবং /দ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। যেমন: থাকুক<তাক্গা [takɡa], থুবড়া<তুতুরা [tuttura], কোথায়<কুন্নঅ/কুতায় [kunno/kutay], ধুতুরা<দুতরা [dutra], ধুনুচি<দুপ্তি [dupti], অগাধ<লাইজ্যেরতা [laidʒɔɖerta], সাধক<সাদক/সাদু [ʃadok/ʃadu] প্রভৃতি। প্রমিত বাংলার শব্দের আদি মধ্য ও অন্ত্য

সর্বাবস্থায় ব্যবহৃত /থ/, /ধ/ ধ্বনিদ্বয় উপভাষায় অল্পপ্রাণীভবনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে ত-বর্গীয় দন্ত্য ধ্বনি /ত/ এবং /দ/ তে পরিণত হয়েছে। দৃষ্টান্তের ‘থুবড়া’ শব্দের মহাপ্রাণ /থ/ ধ্বনি /ত/ তে, ওষ্ঠ্যধ্বনি /ব/ ধ্বনি ত-বর্গীয় /ত/ ধ্বনির দ্বিত্ব এবং তাড়নজাত /ড/ ধ্বনি কম্পনজাত /র/ তে পরিণত হয়েছে। দৃষ্টান্তে প্রদত্ত দ্বিঅক্ষর বিশিষ্ট ‘অগাধ’ তিন অক্ষর বিশিষ্ট রূপমূলে পরিণত হয়েছে। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় দন্ত্য ধ্বনির ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হলো: খোঁজ করা<তুককাইয়া [tukkaiyæ], পুকুর<তালাব [talab], অশৌচ<চইত্যা [tʃɔittæ], শরীর<গতর [gɔtor], দুর্নাম<দুন্নাম [dunnam], চুষে ফেলা<আরাবান্দা [arabanda], ছাদ<চাদ [tʃad], অপরাধ<অফরাদ [ɔpʰɔrad] প্রভৃতি। ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে দন্ত্য ধ্বনি ব্যবহারে তারতম্য লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তে প্রদত্ত শব্দগুলো মূলশব্দে দন্ত্য ধ্বনি বিহীন। কিন্তু উপভাষায় সম্পূর্ণ নতুন শব্দ দন্ত্য ধ্বনি সহকারে উচ্চারিত। ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন হাওরঅধ্যুষিত মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, ইটনা এবং কুলিয়ারচর অঞ্চলসমূহে প্রমিত বাংলা ‘পুকুর’ শব্দটি ‘ফুকুন্নী/ফুকুণ্ডী’ রূপে ব্যবহৃত। অন্যান্য অঞ্চল হতে একেবারেই ভিন্ন শব্দ ‘তালাব’ হুসেনপুর থানার দক্ষিণ চৌফুন্দী এলাকার মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ‘চইত্যা’ এবং ‘গতর’ শব্দগুলো মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, ইটনা থানার বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শব্দ। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় প্রমিত বাংলার সম্পূর্ণ পরিবর্তনে যেমন দন্ত্য ধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে অন্যদিকে বঙ্গালি উপভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সাতক্ষীরার উপভাষায় মূর্খনীভবনের কারণে দন্ত্য ধ্বনি লোপের প্রবণতা দেখা যায়। কাজী মুহম্মদ আলিউল্লাহ তাঁর *সাতক্ষীরার উপভাষা: স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য* গ্রন্থে এই বিশেষত্বটি তুলে ধরেছেন।^৭ বৃহত্তর নোয়াখালীর অন্যান্য অঞ্চলে /ধ/ ধ্বনির ব্যবহার হয়। চট্টগ্রামে কেবল /দ/ ধ্বনিরই ব্যবহার হয়। রবীন্দ্র কুমার দত্তের বক্তব্য: ‘নোয়াখালীতে ‘দ’-কে ‘ধ’-এর মুক্তবৈচিত্র্য বলা যায়। চট্টগ্রামীতে কিন্তু ‘দ’-কেই মূলধ্বনি হিসেবে গণ্য করতে হয়।’^৮ কিশোরগঞ্জের উপভাষায় চট্টগ্রামী উপভাষার ন্যায় দন্ত্য ধ্বনি /দ/ কে মূলধ্বনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২.৩. আন্তর-দন্ত্য ধ্বনির অবস্থান: দন্ত্য ধ্বনি চারটি /ত/, /থ/, /দ/, /ধ/ জিভের ডগার সঙ্গে উপর পাটির দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয় কিন্তু আন্তর-দন্ত্য ধ্বনি উচ্চারণে জিভের পাতা সামনের দিকে এগিয়ে এসে দুই পাটি দাঁতের মধ্যভাগে প্রবেশ করে। ইংরেজি ভাষায় T উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্যের দরুন এই ধ্বনির সৃষ্টি। উচ্চারণ স্থানের তারতম্যের জন্য একে স্থানভ্রষ্ট উচ্চারণীয় ধ্বনির পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রমিত বাংলায় আন্তর-দন্ত্য ধ্বনির কোনরকম অস্তিত্ব নেই। ইংরেজি ভাষায় কিছু শব্দে এই ধ্বনির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন: Thin [thin], Think [think] ইত্যাদি। প্রমিত বাংলায় এই ধ্বনির অস্তিত্ব না থাকলেও কিশোরগঞ্জের উপভাষায় /ত/ ধ্বনির উচ্চারণীয় পরিবেশ এবং উচ্চারণের মানসিক অবস্থাভেদে আন্তর-দন্ত্য ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন: ‘কাইতাম নি কিচতা? দিবানি?’^৯ [kaiɪtam ni kitʃta? dibani?] উপভাষাঞ্চলের দৃষ্টান্তে ‘কাইতাম’ শব্দের প্রথম /ত/ ধ্বনিটি আন্তর-দন্ত্য ত /t/ এবং দ্বিতীয়টি দন্ত্য। কেননা প্রথমটিতে জোর প্রদানের মাধ্যমে উচ্চারণের কারণে জিহ্বা এগিয়ে দুপাটির দাঁতের মাঝে প্রবেশ করে উচ্চারিত হয়। তৎক্ষণাৎ আবার ভেতরে প্রবেশ করেই দন্ত্য ধ্বনি ত /t/ গঠন করে। সাধারণত কোন শব্দে অতিরিক্ত জোর প্রদান, ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রে উপভাষায় আন্তর-দন্ত্য /ত/ ধ্বনির উচ্চারণ হয়ে থাকে। এই ধ্বনি ব্যবহারের উদাহরণ: বেশি/সীমার বাইরে<বততা [bɔtta], অস্পৃশ্য<চইত্যা [tʃɔittæ] বিরানভূমি<ফইত্তা [pʰɔittæ], কতোটুকু<কত্তানি [kɔttani]। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় শব্দের প্রথমে এবং শেষে আন্তর-দন্ত্য ধ্বনির ব্যবহার হয় না। শব্দমধ্যে /ত/ ধ্বনির দ্বিত্ব প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম /ত/ ধ্বনিটির উচ্চারণ আন্তর-দন্ত্য ধ্বনিরূপে। সেক্ষেত্রেও বাক্যের অভ্যন্তরীণ শব্দের জোর প্রদানের মানসিকতাকে মান্য করে সৃষ্টি।

২.৪. দন্তমূলীয় ধ্বনির অবস্থান: উপর পাটির দাঁতের মাড়ি যেখানে শুরু এবং দাঁতের পশ্চাতের শেষাংশ অর্থাৎ দাঁতের মূল যখন জিভের ডগা দ্বারা স্পর্শ পায় ও ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেগুলোকে দন্তমূলীয় ধ্বনি বলা হয়। প্রমিত বাংলায় /স/ /ন/ /র/ /ল/ ধ্বনিগুলো দন্তমূলীয় ধ্বনি। মহাম্মদ দানীউল হক /ড/ /ন/ /ট/ ধ্বনিগুলোকে দন্তমূলীয় ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৮ কিন্তু এগুলো তালু, দন্তমূল ও জিভের ডগার স্পর্শে

উচ্চারিত বিধায় এগুলোকে তালব্য-দন্তমূলীয় বলাই সম্ভব। তাই প্রমিত বাংলায় দন্তমূলীয় ধ্বনি হলো চারটি। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় দন্তমূলীয় ধ্বনি হলো তিনটি: /ন/ /র/ এবং /ল/। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় /স/ ধ্বনিটি প্রায়ই তালব্য-দন্তমূলীয় /চ/ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: খেয়েছিস<কাইচিস [kaiʃiʃ]<কাইচচ্ [kaiʃotʃ]। এখানে উপভাষার ‘কাইচচ্’ রূপমূল /স/ এর পরিবর্তিত রূপ। বিশেষত ক্রিয়াবাচক রূপের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন: গেছিস<গ্যাচচ্ [gætʃotʃ], লইচস্<নিচচ্ [nitʃotʃ], ভরেছিস<বরচ্ [bortʃotʃ] ইত্যাদি। ক্রিয়াবাচক এই রূপমূলগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় সাধারণত এরকম রূপ ধারণ করে থাকে। উপভাষায় দন্তমূলীয় ধ্বনি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত: খর<বনের তুফা [bɔner tʊpʰa], শীত<জার [dʒar], তরকারি<চান [tʃan], জা<বুজান [budʒan], বরবটি<লইব্বা [loibba], বিষ্টা<ল্যাডা [læda], র্যাক<ফায়লার ওগার [pʰaylar ogar] ইত্যাদি। দৃষ্টান্তে প্রদত্ত অধিকাংশ শব্দই প্রমিত বাংলা থেকে ভিন্ন তবে অর্থের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলার অনুগামী। তন্মধ্যে জার, চান, বুজান, কালফর, ফায়লার ওগার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শব্দবিশেষ।

২.৫.তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনির অবস্থান: জিভের সম্মুখভাগ সামান্য উল্টে গিয়ে উঁচু হয়ে অনেকটা সজোরে তালু এবং দন্তমূল স্পর্শ করে তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনিগুলো সৃষ্টি হয়। প্রমিত বাংলায় /ট/, /ঠ/, /ড/, /ঢ/, /ড়/ তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি। কিন্তু কিশোরগঞ্জের উপভাষায় কেবল দুটি তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেই দুটি ধ্বনি হলো /ট/ এবং /ড/। প্রমিত বাংলার /ঠ/ এবং /ড়/ উপভাষায় অল্পপ্রাণীভবনের প্রভাবে /ট/ এবং /ড/ ধ্বনিতেও পরিণত হয়। আবার ট-বর্গীয় ধ্বনি /ট/ এবং /ঠ/ এর /ড/ ধ্বনিতেও পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া এই উপভাষার সাধারণ প্রবণতা। যেমন: ঠেলা<টেলা [tɛla], ঠিকানা<টিহানা [tihana], ঢেপসা<ড্যাপসা [dæpʃa], নেংটি<ল্যাংডি [læŋdi], কাঠামো<কাডাম [kaɖam] প্রভৃতি। প্রমিত বাংলার তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি /ড়/ উপভাষায় /র/ ধ্বনির রূপ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ: লেজুড়<ল্যাঙ্গুর [læŋgur], হাতজোড় করা<আতজুর [atdʒur], হাড়গিলা<আরগিলা [argila]। স্বতঃসিদ্ধভাবে কোন কারণ ব্যতীত তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হলো: সাপোর্ট<সাপুট [ʃapʰut], মাথায় ঠোকা দেওয়া<টাল্লা [talla], পাতিল<ডেকসি [dekʃi], অতিশয় স্বাস্থ্যবান (ব্যঙ্গার্থে)<ডাউশ [daʊʃ], জোয়ান<টাগরা [tagra], তামাশা<হুটকারি [hutkari] ইত্যাদি। প্রমিত বাংলার একাধিক শব্দ যেমন: ‘মাথায় ঠোকা দেওয়া’, ‘অতিশয় স্বাস্থ্যবান’ প্রভৃতি শব্দগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে সমার্থবোধক কেবল একটি শব্দে পরিণত হয়েছে উপভাষাধ্বনে। নতুন শব্দটিতে তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে যা প্রমিত বাংলা শব্দের অনুগামী নয়। তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনিগুলো উপভাষায় স্থান পরিবর্তন করেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা প্রথমেই দৃষ্টান্তে দেখানো হয়েছে। /ট/ ধ্বনির স্থানে /ড/ ব্যবহারের প্রবণতাই বিশেষত চোখে পড়ে।

২.৬.তালব্য ধ্বনি: প্রশস্ত আকৃতি নিয়ে জিভের সম্মুখভাগ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে তালব্য ধ্বনি বলা হয়। রফিকুল ইসলাম তাঁর ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থে প্রথম পর্বে /c/, /j/ কে তালব্য স্পৃষ্টধ্বনি এবং দ্বিতীয় পর্বে /s/ বা /z/ রূপে শিষজাত ধ্বনি হিসেবে দেখিয়েছেন।^৯ প্রমিত বাংলায় তালব্য ধ্বনিগুলো হলো: /চ/, /ছ/, /জ/, /ঝ/, /ঝ/, /শ/। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় /চ/, /জ/, /শ/ এই তিনটি তালব্য ধ্বনির অবস্থান লক্ষণীয়। মহাপ্রাণীভবনহীনতার কারণে /ছ/, /ঝ/ ধ্বনিগুলোও /চ/, /জ/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ: শুটকি<চ্যাফা [tʃæpʰa], চিংকার<চিক্কাইর [tʃikkair], খেয়েছেন<কাইচুন [kaiʃun], এসেছেন<আইচুন [aitʃun], অনেক<জবর [dʒɔbor], বুঝেছেন<বুজ্জইন [budʒdʒoin], খুঁজেছেন<কুজ্জইন [kudʒdʒoin], সুবিধা-অসুবিধা<জায়-জামেলা [dʒay dʒamela], ডিম দিয়ে তৈরি পিঠা<আণাশা [andʒaʃa], কিছু<কিছু [kitʃitʃu] প্রভৃতি। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় তালব্য ধ্বনি ব্যবহারে অন্যান্য পূর্ববঙ্গীয় অঞ্চল হতে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্তে প্রদত্ত ‘ছেন’ যুক্ত পদ ‘খেয়েছেন’, ‘এসেছেন’ শব্দদ্বয়ের /ছ/ তালব্য ধ্বনি /চ/ তে পরিণত হয়েছে এবং ‘উন’ রূপমূলের প্রয়োগ হয়েছে। ‘ছেন’ যুক্ত পদের /ছ/ তালব্য ধ্বনি /জ/ এর রূপলাভ করে এবং পাশাপাশি দুবার প্রয়োগ হয়। দৃষ্টান্তে প্রদত্ত

‘বুজজইন’ এবং কুজজইন এ জাতীয় শব্দ। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হলে এবং যুগ্মীভবনের ক্ষেত্রে /চ/ ধ্বনির প্রয়োগ ঘটে। যেমন: বাচ্চা [batʃʃa] < বাইচ্চা [baitʃʃa], চাচ্চু [tʃʃatʃʃu] < চাচ্চু [tʃatʃʃu], কেচ্চা [ketʃʃa] < কিক্চা [kitʃʃa] ইত্যাদি।

২.৭. জিহ্বামূলীয় ধ্বনির অবস্থান: জিহ্বার মূল অর্থাৎ পশ্চাৎভাগ উঁচু হয়ে নরম তালুর সংস্পর্শে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো হলো জিহ্বামূলীয় ধ্বনি। এই ধ্বনি উচ্চারণে সক্রিয় উচ্চারণক হলো জিহ্বামূল এবং নরম তালু। প্রমিত বাংলায় পাঁচটি জিহ্বামূলীয় ধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন: /ক/, /খ/, /গ/, /ঘ/, /ঙ/। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় /ক/, /গ/, /ঙ/ জিহ্বামূলীয় ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হলেও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার অল্পপ্রাণীভবন প্রক্রিয়ার সক্রিয়তার কারণে /খ/, /ঘ/ ধ্বনির অস্তিত্ব নেই। উপভাষায় জিহ্বামূলীয় ধ্বনির দৃষ্টান্ত: প্রেম<কাতির [katir], কুয়াশা<কষা [kʌʃa], পায়ের হাড়<গঙা [ɡɔnda], গর্ত<ফাগার [pʰagaɾ], দ্বিতীয় বিবাহিত<হাঙ্গা [haŋga], বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক বা প্রেমিক<লাঙ [laŋ] প্রভৃতি। উপভাষায় প্রমিত বাংলার মতো ‘প্রেম’ শব্দটির প্রচলন থাকলেও কিছু কিছু এলাকায় ‘কাতির’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন: কিশোরগঞ্জ সদর। কিশোরগঞ্জের উপভাষাঞ্চলে জিহ্বামূলীয় ধ্বনি দিয়ে গঠিত শব্দগুলো প্রতিবেশ এবং বক্তার মানসভেদে পার্থক্য প্রদর্শন করে। যেমন: প্রমিত বাংলার ‘প্রেম’ [prem] উপভাষায় সাধারণ অর্থে ‘কাতির’ [katir] শব্দটি ব্যবহৃত হয় কিশোরগঞ্জ সদরের বৌলাই ও আশপাশের এলাকায়। কিন্তু একই উপভাষাগত এলাকায় নিন্দার্থে ‘প্যাট লাগানি’ [pæt laɡani] শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। একইভাবে ‘দ্বিতীয় বিবাহিত’ [dbitiyo bibahito] শব্দটি নিন্দা ও তুচ্ছার্থে ‘হাঙ্গা’ [haŋga] ব্যবহৃত হলেও সাধারণভাবে ‘দুইভাবর’ [duittabor] শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

২.৮. কণ্ঠনালী ধ্বনির অবস্থান: কণ্ঠনালী এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জিহ্বার মূল বা গোড়া আন্দোলিত হয়ে কণ্ঠনালীর মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাতাস প্রবাহের দ্বারা যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেগুলো কণ্ঠনালী ধ্বনি। ইংরেজি ভাষায় /p/ /t/ ও /k/ ধ্বনিগুলো যদি পাশাপাশি বসে তবে এগুলো কণ্ঠনালী ধ্বনির রূপ ধারণ করে। প্রমিত বাংলায় একমাত্র কণ্ঠনালী ধ্বনি হলো ‘হ’। উপভাষায় কণ্ঠনালী ধ্বনি হিসেবে ‘হ’ ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে উষ্ম-দন্ত্য ধ্বনি ‘স’ তালব্য ধ্বনি ‘শ’, জিহ্বামূলীয় /ক/ /খ/ ধ্বনির স্থানেও এই ধ্বনি ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ: শৌল<হইল [hoil], ফকির<ফহির [pʰohir], সজাগ<হজাগ [hɔɖʒag], সাধাসাধি<হাজজ্যা [hadʒɖʒæ], আরকি<আরহি [arhi] ইত্যাদি। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় উষ্ম, দন্ত্য, তালব্য এবং কণ্ঠনালী ধ্বনি প্রমিত বাংলার মূল হতে তিরোহিত করে কণ্ঠনালী ‘হ’ ধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা তৈরি করে। পূর্ববঙ্গে এই প্রবণতা থাকলেও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে গুণ্যধ্বনি /প/ /ফ/ স্থানে কণ্ঠনালী ‘হ’ ধ্বনির ব্যবহার প্রবণতা দেখা যায়।

উচ্চারণ স্থান অনুসারে প্রমিত বাংলা এবং কিশোরগঞ্জের উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহারের রূপভেদ নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

উচ্চারণ স্থান	প্রমিত বাংলার ধ্বনি	উপভাষার ধ্বনি
গুণ্য	প [p] ফ [pʰ] ব [b] ভ [bʰ] ম [m]	প [p] ব [b] ম [m]
দন্তোষ্ঠ্য		ফ [pʰ]
দন্ত্য	ত [t] থ [tʰ] দ [d] ধ [dʰ]	ত [t] দ [d]
আন্তর-দন্ত্য		ত [t]
দন্তমূলীয়	ন [n] র [r] ল [l] স [ʃ]	ন [n] র [r] ল [l]
তালব্য-দন্তমূলীয়	ট [tʃ] ঠ [tʰ] ড [d] ঢ [dʰ]	ট [tʃ] ড [d]
তালব্য	চ [tʃʃ] ছ [tʃʰ] জ [dʒ] ঝ [dʒʰ] শ [ʃ]	চ [tʃʃ] জ [dʒ] শ [ʃ]
জিহ্বামূলীয়	ক [k] খ [kʰ] গ [ɡ] ঘ [ɡʱ] ঙ [ŋ]	ক [k] গ [ɡ] ঙ [ŋ]
কণ্ঠনালী	হ [h]	হ [h]

৩. উচ্চারণরীতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি বিচার:

৩.১. স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্ঠধ্বনি (Plosive or Stops): প্রমিত বাংলায় স্পৃষ্ঠধ্বনির সংখ্যা মোট ২০টি। কিন্তু কিশোরগঞ্জের উপভাষায় সবগুলো স্পৃষ্ঠধ্বনি পাওয়া যায় না। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় মোট ১০টি স্পৃষ্ঠধ্বনির ব্যবহার হয়ে থাকে। একটি তালিকার সাহায্যে বাংলা ভাষা ও কিশোরগঞ্জের উপভাষায় উপস্থিত স্পৃষ্ঠধ্বনিগুলো দেখানো হলো:

বাংলা স্পৃষ্ঠধ্বনি	IPA	কিশোরগঞ্জের উপভাষায় স্পৃষ্ঠধ্বনি	IPA
ক খ গ ঘ	k k ^h g g ^h	ক গ	k g
চ ছ জ ঝ	tʃ tʃ ^h dʒ dʒ ^h	চ জ	tʃ dʒ
ট ঠ ড ঢ	t t ^h d d ^h	ট ড	t d
ত থ দ ধ	t t ^h d d ^h	ত দ	t d
প ফ ব ভ	p p ^h b b ^h	প ব	p b

৩.২. নাসিক্যধ্বনি (Nasal Sounds): প্রলম্বিত কিংবা Continuant ধ্বনি হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে নাসিক্য ধ্বনি। কারণ ফুসফুস হতে নির্গত বাতাস মুখবিবর ও ঠোঁটের বন্ধ অবস্থা সৃষ্টি করে এবং কোমল তালুর পথ তথা নাসাপথ মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে একে ইচ্ছে অনুসারে প্রলম্বিত করা সম্ভব। বায়ুপথে অবরুদ্ধ অবস্থায় কোমল তালু নিচের দিকে নেমে এসে নাসিকা গহ্বর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তা-ই হলো নাসিক্য বা nasal sounds। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘এগুলির উচ্চারণ-কালে মুখের অভ্যন্তরে বা ঠোঁটে ঠোঁটে স্পর্শ ঘটিয়ে থাকে এবং মুখ-বিবরস্থ বায়ু, মুখ-পথ দিয়া বাহির হইতে না পারিয়া, নাসিকা দিয়া নিঃসৃত হয়।’^{১০} ব্রুমফিল্ডও একইরকম কথা বলেছেন তাঁর *An Introduction to the study of language* গ্রন্থে। তিনি বলেন : ‘In a few, such as m[m] or n[n], however, the breath escape entirely through the nose, the velum being lowered; such sounds are called nasals.’^{১১} প্রমিত বাংলা এবং উপভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার সমপর্যায়ভুক্ত। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন ‘...আমাদের বাংলা ভাষায় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি আছে তিনটি; যথা- ‘ন’, ‘ম’, ‘ঙ’; কিন্তু এদের অতিরিক্ত হরফ দেখি ঞ, ণ এবং ঙ।’^{১২} এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম পৌনঃপুনিক ধ্বনি হলো ‘ম’ [m] এবং বেশি পৌনঃপুনিক ধ্বনি ‘ঙ’ [ŋ]। চলিত বাংলার ন্যায় কিশোরগঞ্জের উপভাষায় এইসব নাসিক্য ধ্বনিরই ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ: আমাদের<আমরার [amrar], মুখ<মুক [muk], তিনি<তাইনে [taine], বোন<বইন [boin], আঙুল আঙ্গুল [angul], নদী<গাঙ [gan], হরিণ<অরিণ [orin], পুকুর<ফুল্লুঙী [p^huskundi], পিঞ্জর<পিঞ্জুর [pindʒur], পাঞ্জাবি<ফাঞ্জাবি [p^handʒabi], বীরনোয়াকান্দি<বীন্না কান্দি [binnakandi], পূর্ণিমা<ফুল্লি [p^hunni], ঢং<ডং [dɔŋ] প্রভৃতি। প্রমিত বাংলার নাসিক্য ধ্বনি কিশোরগঞ্জের উপভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিকৃত রয়েছে। তবে প্রমিত বাংলায় যেখানে একটিমাত্র নাসিক্য ধ্বনির ব্যবহার হয়েছে সেখানে ব্যঞ্জন সংকোচনের দ্বারা নাসিক্য ধ্বনির দ্বিত্ব প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন: বীরনোয়াকান্দি [birnoakandi] শব্দটি ‘র’ ‘য়’ ধ্বনি তিরোহিত হয়ে ‘বীন্না কান্দি’ [binnakandi] রূপটির সৃষ্টি করেছে। তেমনিভাবে বানিয়া [baniya]<বাইন্না [bainna], চোরনি [tʃorni]<চুন্নি [tʃunni], ফকিরনী [p^hokirni]<ফুল্লি [p^honni] ইত্যাদি। অন্যদিকে উপভাষাগুলো বিশেষ্যবাচক শব্দের শেষ নাসিক্যধ্বনি ন [n] থাকলে তুচ্ছভাবে বা তুচ্ছার্থে সম্বোধনে ন [n] ধ্বনিটির দ্বিত্ব ঘটে। যেমন: তপন [tɔpon]<তফইন্না [tɔp^hoinna], স্বপন [ʃɔpon]<সফইন্না [ʃɔp^hoinna]। প্রমিত বাংলার রেফ (ʾ) উচ্চারণ সহজীকরণের জন্য তিরোহিত হয় এবং ‘ন’ তে পরিণত হয়। যেমন: ঘূর্ণি [g^hurni]<গুন্নি [gunni], চূর্ণ [tʃurno]<চুন্নি [tʃunno], বর্ণ [borno]<বন্নি [bonno] ইত্যাদি। নাসিক্য ব্যঞ্জন ঙ [ŋ] যুক্ত শব্দগুলো ঙ [ŋ] এর সঙ্গে গ [g] ব্যঞ্জন সংযুক্তি একটি সাধারণ প্রবণতা। যেমন: ঠেঙে [t^henge]<ট্যাঙ্গে [tænge], চাঙারি [tʃaŋari]<চাঙ্গারি [tʃaŋgari]। অনেক ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলার গ [g] ধ্বনির পূর্বে উপভাষার শব্দে

স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ও [ŋ] নাসিক্য ধ্বনির আগম হয়ে থাকে। যেমন: বেগুন [begun] < বাইঙ্গন [baingon], আগলানো [aglano] < আগা [anga] ইত্যাদি। প্রমিত বাংলার সকল নাসিক্য ধ্বনিই উপভাষায় উপস্থিত থাকলেও উচ্চারণের প্রক্রিয়ায় এং [ŋ] ধ্বনি ন [n] তে পরিণত হয় কখনো এবং /ৎ/ প্রায়শই /ঙ/ রূপ ধারণ করে। ফলে এই উপভাষায় মূল নাসিক্য ধ্বনিগুলো হলো: ম [m], ন [n], ঙ [ŋ], এবং ণ [ɳ], ৎ [ɳ] অতিরিক্ত হরফ এছাড়া এং [ŋ] দ্বৈত বৈশিষ্ট্যসূচক।

৩.৩. পার্শ্বিক ধ্বনি (Lateral sound) : ভাষা ব্যবহারে অনেক সময় জিভ উঁচু হয়ে উপর পাটির দাঁত স্পর্শ করে অবরুদ্ধ বাতাস মুখবিবর দিয়ে সরাসরি না বেরিয়ে জিহ্বার দুপাশ দিয়ে চোয়াল ঘেষে বেরিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় যে ধ্বনি গঠিত হয় তাকে বলা হয় পার্শ্বিক ধ্বনি। চোয়ালের দুপাশ বা এক পাশ দিয়ে উথিত বাতাসে সৃষ্ট ধ্বনিই হলো পার্শ্বিক ধ্বনি। Lateral sound বা পার্শ্বিক ধ্বনির উপস্থিতি পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই রয়েছে। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় /ল/ পার্শ্বিক ধ্বনির ব্যবহার আধিক্য বিদ্যমান। কম্পনজাত ধ্বনি /র/ নাসিক্য ধ্বনি /ন/ এর স্থানে /ল/ ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে। উদাহরণ: শরীর < শইল [ʃɔil], নাড়ু < লারু [laru], রাত < লাইত [lait], রোদন < লুদন [ludɔn] ইত্যাদি। এছাড়া প্রমিত বাংলা শব্দে ব্যবহৃত ল ধ্বনি কিশোরগঞ্জের উপভাষায় রক্ষিত আছে। যেমন: লেখা < ল্যাখা [læha], লম্বা < লাম্বা [lamba], পুটলা < হুটলা [huʈla], আলাদা < আলগা [alga], বোতল < বুতল [butɔl], আল (ক্ষেতের মাঝে রাস্তা) < লাইল [lail]। এছাড়াও পরিমাণবাচকতা বা সংখ্যাবাচক শব্দের মাঝে আ স্বরের আগে পার্শ্বিক ধ্বনির ব্যবহার হয়ে থাকে: পাঁচটা < পাচলা [patʃla], দুইটা < দুইলা [duila], কতগুলো < কতলা [kotla], অল্প < দুইলা [duila] এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশে শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হয় যেমন: বড়জন < বরলা [borɔla], ছোটজন < চুড়লা [tʃudula] প্রভৃতি। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় প্রমিত বাংলায় অবস্থিত শব্দের আদিব্যঞ্জন এবং অন্ত্যব্যঞ্জন ধ্বনি 'র' [r] স্থানে পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল' [l] ব্যবহারের প্রবণতা বিদ্যমান। বিশেষত মিঠামইন, নিকলী, অষ্টগ্রাম, ইটনা, কিশোরগঞ্জ সদর, পাকুন্দিয়া, হুসেনপুর থানার মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চারণে পার্শ্বিক ধ্বনির এই ব্যবহার অধিক। নাসিক্য ব্যঞ্জন ন [n] স্থানে ল [l] ব্যবহার কিশোরগঞ্জ উপভাষার অষ্টগ্রাম এলাকায় দেখা যায়। যেমন দৃষ্টান্তে প্রদত্ত প্রমিত বাংলা শব্দ নিই [ni] < লই [loi], নীল [nil] < লীল [lil]। এই পরিবর্তন অষ্টগ্রাম উপজেলার উচ্চারণীয় প্রবণতা। পরিমাণবাচকতা ও সংখ্যাবাচকতায় 'টা' এর পরিবর্তে 'লা' ব্যবহারের দ্বারা উপভাষায় প্রমিত বাংলার ট [t] ধ্বনি পার্শ্বিক ল [l] তে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশেও 'জন' শব্দাংশের পরিবর্তে পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল' [l] এর সঙ্গে আ [a] যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন: কোনজন [kondʒon] < কুনলা [kunla], বড়জন [borɔdʒon] < বরলা [borɔla], মেজোজন [medʒodʒon] < ম্যাজুলা [mædʒʊla] প্রভৃতি। এই বিশেষত্ব কমবেশি সমগ্র উপভাষাঞ্চলেই বিদ্যমান।

৩.৪. তাড়নজাত ধ্বনি ও কম্পনজাত ধ্বনি : জিভের সম্মুখ অংশ বা ডগা উত্তোলিত হয়ে দন্তমূল বা মাড়ি স্পর্শ করে সংকীর্ণ বায়ুপ্রবাহের পথ সৃষ্টি করে। 'জিভের স্থিতিস্থাপকতার জন্যে তার পূর্বাভাস ফিরে আসে এবং একই প্রক্রিয়া কয়েকবার পুনরাবৃত্ত হয়।'^{১৩} কিশোরগঞ্জের উপভাষায় তাড়নজাত ধ্বনিদ্বয়ের অস্তিত্ব নেই। 'কুমিল্লায় তাড়ন/কম্পন বৈষম্য অল্প, অতএব সমপেক্ষ। ফলে র→ড় অর্থাৎ (র~ড়) ও (ড়~র) স্বাধীন ব্যবহার বা মিশ্রণ চলে।'^{১৪} আলোচ্য উপভাষায় তাড়নজাত ধ্বনিগুলো কম্পনজাত /র/ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন: জোড় < জুর [dʒur], বেড়ি < ব্যারি [bæri], আমড়া (ফল) < আমরা [amra], কড়াই < কারাই [karai], টেঁড়শ < ড্যারশ [dæɔʃ], তাড়াতাড়ি < তার্তারি [tartari] প্রভৃতি। এছাড়া প্রমিত বাংলায় /র/ ধ্বনির ব্যবহার কিশোরগঞ্জের উপভাষায় অপরিবর্তিত আছে। যেমন: রংধনু < রংদনু [rɔɳdonu], কামরাঙা < কারেঙ্গা [karenga], লেকচার < ল্যাকচর [læktʃɔr], দুনিয়ার < দুইন্যার [duinAr] এর দৃষ্টান্ত। প্রমিত বাংলার /ড়/ ধ্বনি জিভের নমনশীলতার দরুন কেবল কাঁপুনি দিয়ে আওয়াজ বের করে। আবার উচ্চারণের দ্রুততার কারণে /ড়/ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন: তাড়াতাড়ি [taratari] < তাত্তারি [tattari]। 'তাত্তারি' রূপমূলে প্রমিত বাংলার প্রথম /ড়/ ধ্বনি বিলুপ্ত হয়েছে এবং শেষ /ড়/ ধ্বনি /র/ তে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রমিত বাংলায় রেফ

(') যুক্ত শব্দের রেফ উঠে গিয়ে র [r] ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন: স্বর্ণা [ʃborna] < সরণা [ʃorona], ঝর্ণা [dʒʱorona] < জর্ণা [dʒorona] ইত্যাদি।

৩.৫. ঘর্ষণজাত বা শিসধ্বনি: বায়ুপথের সংকীর্ণ অবস্থায় বাগযন্ত্রের ঘর্ষণের ফলে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিধায় ঘর্ষণজাত ধ্বনি হিসেবে পরিচিত। ইংরেজিতে এগুলোকে fricative sound বলা হয় fricat বা ঘর্ষণের দ্বারা উচ্চারিত বলেই। মুহম্মদ আবদুল হাই^{১৫} এবং আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ^{১৬} উচ্চারণ প্রকৃতির ভিত্তিতে চারটি ঘর্ষণজাত বা শিসধ্বনির উল্লেখ করেছেন। যেমন: /শ/, /ষ/, /স/, /হ/। কিন্তু তালু থেকে /শ/, মূর্ধার স্পর্শে /ষ/, দন্ত থেকে /স/ এবং কণ্ঠ থেকে /হ/ ধ্বনি উচ্চারিত হলেও প্রতিটি ধ্বনিরই উচ্চারণ প্রক্রিয়া একইরকম। ঘর্ষণের মাধ্যমে আওয়াজ বের হয় এবং শ্রুতিতে শিসের মতো আওয়াজ শোনায। প্রমিত বাংলায় তাই শিসধ্বনি হলো চারটি: /শ/, /ষ/, /স/, /হ/, কিশোরগঞ্জের উপভাষায় Plosive Sound /ফ/ ঘর্ষণজাত ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। নিচের পাটির ঠোঁট এবং উপরের দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারণের সময় /হ/ ধ্বনির মতোই শিষের মতো আওয়াজ শোনায এবং বাগযন্ত্রে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। তাই কিশোরগঞ্জের উপভাষায় প্রমিত বাংলার চারটি শিসধ্বনিরই উপস্থিতি বিদ্যমান এবং এর সঙ্গে /ফ/ ধ্বনিসহ মোট পাঁচটি ঘর্ষণজাত ধ্বনির অস্তিত্ব রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: সম্ভার < সম্বাস [ʃɔmbaʃ], শিশির < উষ [uʃ], টাহর করে < দিশ কইরা [diʃ koira], ছড়ানো < রাষ্ট্র আইসে [raʃto aise], অপরিষ্কার < হিঙ্গাইল্যা [hingaiʃ], রান্না করা < হিজাই [hidʒai], শ্রবণ প্রতিবন্ধি < হাটকাল [haʃkal], অহেতুক কথা < বেস্তি কতা [beʃti kota], গন্ধ শুকে < ফুইক্যা [pʰukæ], পাব < ফায়াম [pʰayam], তেলের পিঠা < মাফলা [mapʰla] শব্দগুলোর উল্লেখ করা যায়। উপভাষাগুলো কিছু শব্দ একাধিক শিসধ্বনি দিয়ে গঠিত। যেমন: শুকানোর [ʃukanor] < শুহানির [ʃuhanir], শাখা [ʃakʰa] < শাহা [ʃaha], শুক্ত [ʃukto] < শুহত [ʃuhot] ইত্যাদি। উপভাষাগুলো /ষ/ ধ্বনির ব্যবহার অনেক কম এবং ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রমিত বাংলার শব্দ থেকে উপভাষাগুলো /হ/ ধ্বনির ব্যবহার বেশি। উপভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যা সমগ্র উপভাষাগুলোর নয়। বরং নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় প্রচলিত। যেমন: ফুজি [pʰudʒi], মাফলা [mapʰla], হরুর হাগ [hɔrur hag] এই শব্দগুলো কেবল কিশোরগঞ্জ সদরের বিল্লাটি, কটিয়াদি থানার বীরনোয়াকান্দি, এবং তাড়াইল থানার মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচলিত শব্দ।

উচ্চারণরীতির দিক হতে প্রমিত বাংলা এবং কিশোরগঞ্জের উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো:

উচ্চারণরীতি	প্রমিত বাংলার ধ্বনি	উপভাষার ধ্বনি
স্পৃষ্ঠধ্বনি	ক [k] খ [kʰ] গ [g] ঘ [gʱ] চ [tʃ] ছ [tʃʰ] জ [dʒ] ঝ [dʒʱ] ট [t̪] ঠ [t̪ʰ] ড [d̪] ঢ [d̪ʱ] ত [t̪] থ [t̪ʰ] দ [d̪] ধ [d̪ʱ] প [p̪] ফ [p̪ʱ] ব [b̪] ভ [b̪ʱ]	ক [k] গ [g] চ [tʃ] জ [dʒ] ট [t̪] ড [d̪] ত [t̪] দ [d̪] প [p̪] ব [b̪]
নাসিক্যধ্বনি	ঙ [ŋ] ঞ [ɲ] ণ [ɳ] ন [n] ম [m]	ঙ [ŋ] ন [n] ঞ [ɲ] ণ [ɳ] ম [m]
পার্শ্বিক	ল [l]	ল [l]
তাড়ন	ড় [ɽ]	
কম্পন	র [r]	র [r]
ঘর্ষণ/শিসজাত	শ [ʃ] ষ [ʃ̪] স [s] হ [h]	শ [ʃ] ষ [ʃ̪] স [s] হ [h] ফ [pʰ]

৪. স্বরযন্ত্রের ভূমিকা অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান: স্বরযন্ত্র ধ্বনি গঠনে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় বাকপ্রত্যঙ্গ। স্বরযন্ত্রে অবস্থিত স্বরতন্ত্রী কার্যক্রমের ভিত্তিতেই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনিতে বিভাজিত হয়ে থাকে।

৪.১. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি: প্রমিত বাংলায় বাতাসের প্রবাহের জোরের ভিত্তিতে অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির অস্তিত্ব রয়েছে। প্রমিত বাংলার বর্ণের দ্বিতীয় চতুর্থ ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণ। কিন্তু কিশোরগঞ্জের উপভাষায়

অল্পপ্রাণ ধ্বনির অস্তিত্ব থাকলেও কেবল মহাপ্রাণীভবনের জন্য প-বর্গের ফ [p^h] মহাপ্রাণ ধ্বনিটিই রয়েছে। মহাপ্রাণহীনতা এবং মহাপ্রাণীভবন প্রক্রিয়া ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনে দেখানো হলো নিচে। স্বরযন্ত্রের ভূমিকা অনুসারে প্রমিত বাংলা এবং উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো হলো:

প্রমিত বাংলা				উপভাষা			
অঘোষ	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অঘোষ	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
ক খ	গ ঘ	ক গ	খ ঘ	ক	গ	ক গ	-
চ ছ	জ ঝ	চ জ	ছ ঝ	চ	জ	চ জ	-
ট ঠ	ড ঢ	ট ড	ঠ ঢ	ট	ড	ট ড	-
ত থ	দ ধ	ত দ	থ ধ	ত	দ	ত দ	-
প ফ	ব ভ	প ব	ফ ভ	প ফ	ব	প ব	ফ

নূন্যতম শব্দজোড়ের সাহায্যে কিশোরগঞ্জের উপভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনির স্বতন্ত্র অবস্থান চিহ্নিত করা যায়।

যেমন: কাল = ক+আ+ল [kal] (খাল) → ক/ গাল [gal] = গ+আ+ল (গাল) → গ

বাচ [batʃ] = ব+আ+চ (বাছবিচার) → চ/ বাজ [badʒ] = ব+আ+জ (বিদ্যুৎ চমকানো) → জ

চটি [tʃɔʈi] = চ+অ+ট+ই (জুতো) → ট/ চডি [tɔʃdi] = চ+অ+ড+ই (বাঁশের কঞ্চি) → ড

তান [tan] = ত+আ+ন (স্থান) → ত/ দান [dan] = দ+আ+ন (দান) → দ

সাপ [ʃap] = স+আ+প (সাপ) → প/ সাফ [ʃap^h] = স+আ+ফ (পরীক্ষার) → ফ

বন [bon] = ব+ও+ন (খর) → ব / মন [mon] = ম+ও+ন (মন) → ম

বারি [bari] = ব+আ+র+ই (বাড়ি) → ব/ শারি [ʃari] = শ+আ+র+ই (শাড়ি) → শ

বাষা [baʃa] = ব+আ+ষ+আ (ভাষা) → ষ/ বাসা [baʃa] = ব+আ+স+আ (ভাসা) → স

অয়ন [ɔɣon] = অ+য়+অ+ন (নামশব্দ) → য/ হন [ɔhon] = অ+হ+অ+ন (এখন) → হ

নমাজ [nɔmadʒ] = ন+অ+ম+আ+য (নামাজ) → য/ সমাজ [ʃɔmadʒ] = স+অ+ম+আ+জ (সমাজ) → জ

কনা [kɔna] = ক+অ+ন+আ (বল না) → ন/ কণা [kɔna] = ক+অ+ণ+আ (বিন্দু) → ণ

ব্যাঙ [bæŋ] = ব+এ্যা+ঙ (ব্যাং) → ঙ/ ব্যাগ [tæg] = ট+এ্যা+গ (বেগ) → গ

লারা [lara] = ল+আ+র+আ (নাড়ানো) → র/ লালা [lala] = ল+আ+ল+আ (লালা) → ল

বিজ্ঞান [bidʒnan] = ব+ই+জ+ঞ+ন (বিজ্ঞান) → ঞ/ বিজান [bidʒan] = ব+ই+জ+আ+ন (ভিজান) → আ

৪.২. অঘোষ ও ঘোষধ্বনি (Voiceless and Voiced Sound): স্পৃষ্ঠধ্বনিগুলোর দুটি পর্যায় আছে।

স্বরতন্ত্রী কম্পনের/ঘর্ষণের ভিত্তিতে এই বিভাজন হয়ে থাকে। বহির্গামী বাতাসে চাপ সৃষ্টির ফলে Vocal cords দুটি একত্র হয়ে উন্মুক্ত ও অবরুদ্ধ হয়। ফলে কম্পন সৃষ্টি হয়। এই কম্পন যেসব স্পৃষ্ঠধ্বনিতে অনুভূত হয় সেগুলো হলো ঘোষধ্বনি বা Voiced sounds। অঘোষ স্পৃষ্ঠধ্বনি গঠনে স্বরতন্ত্রীতে এই কম্পন সৃষ্টি হয়না বলে একে voiceless sounds বলা হয়। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিতে নাসিক্য ধ্বনিগুলো বাদ দিলে ঘোষ ধ্বনি ১০টি এবং অঘোষ ধ্বনি ১০টি। কিশোরগঞ্জের উপভাষায় ঘোষধ্বনি পাওয়া যায় ৫টি এবং অঘোষধ্বনি ব্যবহৃত হয় মোট ৬টি। এর তালিকা নিচে দেওয়া

বাংলা			কিশোরগঞ্জের উপভাষা		
অঘোষ	ঘোষ	IPA	অঘোষ	ঘোষ	IPA
ক খ	গ ঘ	k k ^h g g ^h	ক	গ	k g
চ ছ	জ ঝ	tʃ tʃ ^h dʒ dʒ ^h	চ	জ	tʃ dʒ
ট ঠ	ড ঢ	t t ^h d d ^h	ট	ড	t d

বাংলা			কিশোরগঞ্জের উপভাষা		
ত থ	দ ধ	t t ^h d d ^h	ত	দ	t d
প ফ	ব ভ	p p ^h b b ^h	প ফ	ব	p p ^h b

কিশোরগঞ্জের উপভাষায় অঘোষ ধ্বনির ব্যবহার নিচে দেখানো হলো:

অঘোষ /ক/: কি<কিতা [kita], বুদ্ধি<আক্লি [akkol], মাইক<মাইক [maik] অঘোষ /চ/: চামড়া<চাম [tʃam], খেয়েছি<কাইচ [kaiʃtʃ], খচ্ছচ্<কচ্চক [kɔʃkɔʃ], অঘোষ /ট/: কচি আম<টিগরা আম [tɪɡra am], কাঠবাদাম<কাটবাদাম [kaʈbadam], ভোট<বুট [buʈ] অঘোষ /ত/: তরমুজ<তরমুজ [ʈormudʒ], অপরাজিতা<অর্গজিতা [ɔrgɔʈʒita], ভাত<বাত [bat] অঘোষ /ফ/: পিসা<ফিসা [pʰiʃa], কপাল<কফাল [kɔpʰal], গল্প<গফ [ɡɔpʰ] অঘোষ /প/: পড়ন<পিন্দন [pindɔn] পুষ্প<ফুষ্প [pʰuʃpo] ধ্যান<জপ [dʒɔp] ।

কিশোরগঞ্জের উপভাষায় ঘোষ ধ্বনির ব্যবহার নিচে নির্দেশ করা হলো:

ঘোষধ্বনি /গ/: গগরুটে<গাওরা [gaora], জোরাজুরি<ব্যাগারতা [bægarta], খাগ<কাগ [kag] ঘোষধ্বনি /জ/: বোল<জুল [dʒul], খেজুর<কাজইর [kadʒoir], কাগজ<কাগজ [kagodʒ] ঘোষধ্বনি /ড/: ঢাকনা<ডানহা [dʌnha], কোনটা<কুনডা [kunda], মাঠ<মাদ [mad] ঘোষধ্বনি /দ/: দেশ<দ্যাশ [dæʃ], বানর<বান্দর [bandor], স্বাদ<স্বাদ [ʃad] ঘোষধ্বনি /ব/: বেয়ান<বিয়াইন [biyain], দুর্বা<দুৰ্বা [dubba], ভাব<বাব [bab] ।

বৈশিষ্ট্য ছাঁচের সাহায্যে কিশোরগঞ্জে উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি স্বাতন্ত্র্য নিচে নির্দেশ করা হলো:

[illegible]

৫. উপসংহার

কিশোরগঞ্জ উপভাষাধ্বলে ঘোষিভবনের ক্ষেত্রে বর্গীয় ধ্বনি /ট/ স্থানে /ড/ ব্যবহারের আধিক্য রয়েছে। এছাড়া /ক/ স্থানে /গ/ ব্যবহারের কিছু প্রবণতা রয়েছে। প্রমিত বাংলা থেকে কিশোরগঞ্জের উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহারে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই নিশ্চিতরূপে আলোচনায় চিহ্নিতকরণ হয়েছে। প্রমিত বাংলা অপেক্ষা যেখানে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দণ্ডায়মান সেখানেই এই উপভাষার বিশেষত্ব। স্পৃষ্ঠধ্বনি /ফ/ এর রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি হিসেবে /ফ/ ধ্বনির অবস্থান, বাংলায় আন্তর-দন্ত্য ধ্বনির অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও আন্তর-দন্ত্য ধ্বনি /ত/ এর অস্তিত্ব, স্পৃষ্ঠধ্বনি /ফ/ এর ঘর্ষণজাত রূপ ধারণ, নাসিক্যধ্বনি /ঞ/ এর দ্বিধারিক অবস্থান, তাড়নজাত ধ্বনির অনুপস্থিতি এবং তাড়নজাত ধ্বনিরই কম্পনজাত ধ্বনিতে পরিবর্তন এর স্বতন্ত্রতার চিহ্ন। ধ্বনির এই অবস্থানের কারণে প্রমিত বাংলার শব্দের সঙ্গে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য দেখা যায় আবার কোথাও উপভাষায় একেবারে নতুন শব্দেরও প্রয়োগ লক্ষণীয়। বিশেষত মিঠামইন, অষ্টগ্রাম এবং ইটনায় যে ধ্বনিগত সাদৃশ্যমূলক শব্দ পাওয়া যায় তা পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, তাড়াইল অঞ্চলসমূহে গিয়ে অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে উপভাষাধ্বলে। ধ্বনিগত এই অবস্থান কিশোরগঞ্জের উপভাষাকে প্রমিত বাংলার থেকে স্বতন্ত্র এক রূপ দান করেছে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনের প্রতীক হিসেবে ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলা ধ্বনিমূল নির্ধারণে হানা রুখ টমসন যে ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা দিয়েছেন সেখানে মোট ৩৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে। যথা: প ত ট চ ক ফ থ ঠ ছ খ ব দ ড জ গ ভ ধ ঢ ঝ ঘ ম ন ণ ঞ ঙ ও ড় ঢ় ল স শ ষ এবং হ। দ্রঃ হানা রুখ টমসন, *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ*, অনুবাদ: স্বরোচিস সরকার, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২১খ্রি.), পৃ. ৪৪
- ^২ সুভাষ ভট্টাচার্য, *ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা*, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৫৭
- ^৩ সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৭
- ^৪ জীনাৎ ইমতিয়াজ আলী, *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২৩ খ্রি.), পৃ. ৪৭
- ^৫ কাজী মুহম্মদ অলিউল্লাহ, *সাতক্ষীরার উপভাষা: স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য*, (ঢাকা: হাতেখড়ি, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৯
- ^৬ রবীন্দ্র কুমার দত্ত, *নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের উপভাষা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ*, (কলকাতা: প্রত্নেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭৫
- ^৭ বেবা রানী বৈষ্ণব, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪০, তারিখ: ১৭.০৯.২০২২, সময়: ১২.০০-২.০০ দিবাগত রাত, ঠিকানা: মিঠামইন উপজেলা, গ্রাম: বড়হাটি, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ০২
- ^৮ মহাম্মদ দানীউল হক, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৬১
- ^৯ রফিকুল ইসলাম, *ভাষাতত্ত্ব*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৯৫
- ^{১০} সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, (কলকাতা: রূপা, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৪২
- ^{১১} Leonard Bloomfield, *An Introduction to the Study of Language*, (New York: Jone Benjamins Publishing Company, 1983), p. 27
- ^{১২} মুহম্মদ আবদুল হাই, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬৮
- ^{১৩} আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৩
- ^{১৪} মনিরুজ্জামান, *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৬৮
- ^{১৫} *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, পৃ. ৮৩
- ^{১৬} *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, পৃ. ২৪৩

রংপুর জেলার জমিদারি স্থাপত্য : নির্বাচিত উদাহরণের আলোকে একটি সমীক্ষা [The Zamindari Architecture of Rangpur District : A Survey in the Light of Selected Examples]

এ টি এম রফিকুল ইসলাম*

[Abstract: The revenue agents or collectors in the land revenue system of medieval and colonial Bengal are widely known as the *zamindar*. After the permanent settlement in 1793, the *zamindars* started dwelling in the district headquarters by making for themselves palatial buildings incorporating many other auxiliary erections of both secular and religious nature, which are collectively recognized as *zamindarbari*. These *zamindarbaries* exhibit the assimilation of Indo-European traditions now popularly termed as ‘Colonial Architecture’. The essence of Colonial architecture is to be looked upon not in the individual character of architectural components but in their fusion, which gave rise to a new style. A number of *zamindarbaries* built in the greater district of Rangpur are some of the best examples of Colonial architecture in Bengal. A few of these buildings are still in a good state of preservation, while many of them have either been completely ruined or in dilapidated conditions. The present paper, written mainly on the basis of an extensive field survey, aims at making the architectural details of the extant selected examples available to the public along with the genealogical history of the *zamindars* of the district.]

Key word: রংপুর, জমিদারি, তাজহাট, মন্ডনা, ডিমলা, ইটাকুমারী, দেওয়ান

১. ভূমিকা

জমিদারি প্রথা সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ভূমির পরিভাষায় রায়তদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দানকারী ব্যক্তি সাধারণ অর্থে জমিদার নামে পরিচিত। তার নিয়ন্ত্রিত এলাকা জমিদারি অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। সুতরাং জমিদার ও জমিদারির ইতিহাস পরস্পরের সম্পূরক। রংপুর জেলার জমিদারদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাংলার বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলের জমিদার শ্রেণির ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরই অংশবিশেষ। এতদঞ্চলের যে সব জমিদারি বংশ ইতিহাসে সুপরিচিত তাদের অধিকাংশের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল মোগল-নবাবী ও পরবর্তী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের অব্যবহিত পরে। বৃহত্তর রংপুর জেলায় উপর্যুক্ত শাসনামলে সৃষ্ট অসংখ্য ছোট-বড় জমিদারির সন্ধান পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট-১)। আলোচ্য অঞ্চলের জমিদারি ইতিহাস রাজশাহী, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার মতো নয়; বরং ঐসব অঞ্চলে এক বা একাধিক বৃহৎ জমিদারি বংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।^১ আবার নবাবী ও ব্রিটিশ শাসনামলে দিনাজপুর, রাজশাহী, বর্ধমান ও নদীয়ার ন্যায় বৃহৎ জমিদারির বিপরীতে রংপুর এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের জমিদারি বংশের অস্তিত্ব দেখা যায়।^২ তাছাড়া রংপুর এলাকার জমিদারি ব্যবস্থা ঢাকা ও মেদিনীপুরের জমিদারি প্রথা থেকেও ভিন্নতর। উল্লিখিত অঞ্চলে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে তালুকদার নামক মধ্যস্থত্বভোগীর উপস্থিতি লক্ষণীয়।^৩ আবার চট্টগ্রামের জমিদারি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতদঞ্চলে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে জমিদার উপাধি নিয়ে শত শত ভূস্বামীর উপস্থিতি দৃশ্যমান, যা রংপুর অঞ্চলের জমিদারি ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র।^৪ প্রসঙ্গত রংপুর জেলার জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ গোত্রভুক্ত।^৫ মধ্যযুগীয় ও ঔপনিবেশিক আমলে সরকারিভাবে এসব জমিদার ‘রাজা’, ‘রাণী’, ‘মহারাজা’, ‘মহারাণী’, ‘রায় বাহাদুর’, মুসলমান হলে ‘খান বাহাদুর’, ‘খান চৌধুরী’ প্রভৃতি খেতাবে অলংকৃত হতেন।^৬ বাংলার অন্যান্য

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

জমিদারদের ন্যায় আলোচ্য অঞ্চলের জমিদারবর্গ অনুরূপ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মোগল আমলে একজন জমিদারের জমিদারি এলাকা কোনো একটি নির্দিষ্ট সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিভিন্ন সরকার ব্যাপী তাদের ভূ-সম্পত্তি ছড়িয়েছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়।^৭ তবে কোম্পানি আমলে তারা জেলাভিত্তিক পরিচয় নিয়ে বিকশিত হয়।

২. রংপুর জেলায় জমিদারি স্থাপত্য

রংপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা একদা কামরূপ-কোচবিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হান্টারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রংপুর প্রকৃতপক্ষে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং করতোয়া নদী তৎকালীন বাংলা ও কামরূপ সাম্রাজ্যের সীমানা নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত হতো।^৮ গুজিয়ারের বিবরণীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। মোগলরা বারংবার চেষ্টা করেও আলোচ্য জেলাকে স্থায়ীভাবে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম বাংলার সঙ্গে এতদঞ্চলের স্থায়ীভাবে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত নবাব মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে (১৭১৭-১৭২৭) সমগ্র বাংলাকে তেরোটি চাকলায় বিভক্ত করা হয়^৯, যার মধ্যে ঘোড়াঘাট ও কুড়িবাড়ি (কোচবিহার ও আসাম) চাকলার অন্তর্গত অঞ্চলে রংপুর জেলার সমগ্র ভূ-ভাগ বিস্তৃত ছিল। কোম্পানি আমলে রংপুর কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠাকালে চাকলা ঘোড়াঘাটের অধীনে চারটি পরগণা যেমন- কুণ্ডি, পাতিলাদহ, স্বরূপপুর ও রোকনপুর এবং চাকলা কুড়িবাড়ির অধীনে ছয়টি পরগণা যথা- কাকিনা, ফতেপুর, কাজিরহাট, পাটগ্রাম, পূর্বভাগ ও বোদা রংপুর জেলার অধিভুক্ত ছিল।^{১০} তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো কুড়িবাড়ির নিয়ন্ত্রণাধীনে উপর্যুক্ত ছয়টি পরগণার প্রথম তিনটি ১৬৮৭ সালে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও কোচরাজার রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে নিযুক্ত প্রাক্তন ভূস্বামীদের মধ্যে সেগুলো পুনর্বন্টন করে দেয়া হয় এবং ১৭১১ সালে অবশিষ্ট পরগণাগুলো দখলপূর্বক মোগল কর্তৃত্বাধীনে কোচরাজার জায়গির হিসেবে রক্ষিত হয়।^{১১} রংপুর জেলার জমিদারি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য অঞ্চলে পাঁচ ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন- ক) কোচবিহার রাজার জায়গিরদার হিসেবে সৃষ্ট আধা-সামন্ত জমিদারি, খ) বংশ পরম্পরায় কোচ রাজার কর্মচারী হিসেবে সৃষ্ট উপ-সামন্ত জমিদারি (পরবর্তীতে মোগল অভিযানের সময় তাদের পক্ষাবলম্বন করে তারা স্বীয় জমিদারি বজায় রাখতে সক্ষম হয়), গ) দখলিস্বত্বের দলিলে উল্লিখিত অধিকার ভোগী নব্য খরিদকৃত জমিদারি, ঘ) রাজার অধীনস্থ হলেও কার্যত স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় বড় জমিদারি এবং ঙ) বৃহৎ জমিদারি থেকে বিচ্ছিন্ন তালুকদারিতে রূপান্তরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারি।^{১২} ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রংপুর অঞ্চলে গড়ে উঠা মোটামুটি পাঁচাত্তরটি জমিদারির মধ্যে কমবেশি আঠারোটি জমিদারি বংশের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। অত্র এলাকার অধিকাংশ জমিদারি বংশ কোচবিহার রাজার ইজারাদার কিংবা রাজস্ব আদায়কারী থেকে জমিদার হিসেবে বাংলার ইতিহাসে সমাসীন হয়েছিলেন বলে জানা যায়। রংপুর জেলা সুদীর্ঘকাল ধরে কামরূপ-কোচবিহারের অংশবিশেষ ছিল বিধায় প্রায় সকল জমিদার ছিলেন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গোত্রের অনুসারী। তবে মহীপুর জমিদারির উদাহরণ টেনে বলা যায় যে, এতদঞ্চলে মুসলমান জমিদারির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আরিফ মোহাম্মদ চৌধুরী। আর হিন্দু জমিদার পরিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লালমনিরহাট এলাকার কাকিনা জামিদার, রাজারহাটের পান্ডা জমিদার, উলিপুর-চিলমারি অঞ্চলের বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ জমিদার, ডিমলা জমিদার, রংপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত তাজহাট জমিদার, পীরগাছার মছনা জমিদার, ইটাকুমারী জমিদার, দেওয়ান জমিদার প্রভৃতি। সুদীর্ঘ সময় ধরে তারা এতদঞ্চলে স্বীয় জমিদারি পরিচালনায় অনন্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

রংপুর জেলার জমিদারবর্গ স্বীয় জমিদারি পরিচালনার সুবিধার্থে নির্মাণ করেছেন জমকালো বিশাল প্রাসাদসম জমিদারবাড়ি এবং এসব জমিদারবাড়ি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অফিস, কাছারিবাড়ি, খাজাঞ্চিখানা, অতিথিশালা ও অন্যান্য ধর্মীয় ইমারত। তবে এদের মধ্যে তাজহাট ব্যতীত অন্যান্য জমিদারবাড়ি বর্তমানে ভগ্নদশাশ্রিত ও জরাজীর্ণ অবস্থায় নিপতিত। এসব জমিদারবাড়ির অভ্যন্তরে কিংবা জমিদারবাড়ি সংলগ্ন ধর্মীয় উপাসনার উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির এবং অন্যান্য লৌকিক স্থাপনার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষণীয়। তবে কোনো কোনো জমিদারবাড়ি সংশ্লিষ্ট দু-একটি মন্দির কিংবা অন্যান্য লৌকিক ইমারত ভগ্নাবস্থায় টিকে আছে। অথচ প্রতিটি জমিদারবাড়ির সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় স্থাপনা মন্দিরের পাশাপাশি লৌকিক শ্রেণিভুক্ত ইমারত যেমন- কাছারিবাড়ি, খাজাঞ্চিখানা, কর্মচারী ও পূজারীদের আবাসস্থল, বাগানবাড়ি, হাতিশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল।

কিন্তু কালের পরিক্রমায় সেগুলোর অধিকাংশই আজ স্বীয় ঐশ্বর্য্য হারিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তাজহাটসহ যে দু-একটি জামিদারবাড়ি ও তৎসংশ্লিষ্ট ইমারত অক্ষত কিংবা অর্ধভগ্ন অবস্থায় অদ্যাবধি টিকে রয়েছে নিম্নে সেগুলোর জমিদারি ইতিহাসসহ সচিত্র স্থাপত্যিক বিবরণ জনসম্মুখে তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধের কলেবরের কথা চিন্তা করে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় টিকে থাকা কতিপয় দৃষ্টিনন্দন জমিদারবাড়ি ও তৎসংশ্লিষ্ট ইমারত নির্বাচন (some selected zamindarbaries) করত লিখিত উৎস পর্যালোচনাপূর্বক মাঠজরিপের উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২.১ তাজহাট জমিদারি

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মান্নালাল রায় কর্তৃক এ জমিদারি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী ক্ষত্রিয় বংশের শিখ ধর্মের অনুসারী।^{১৩} আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সশ্রুট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখদের সংঘাতের সময় তিনি আত্মরক্ষার্থে রংপুরে প্রত্যাগমনপূর্বক মাহীগঞ্জে এসে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলেন। এখানে তিনি হীরা, জহরৎ ও স্বর্ণ ব্যবসা শুরু করেন। প্রসঙ্গত মাহীগঞ্জের যে এলাকায় তিনি হীরা, মাণিক্য, জহরৎ বিক্রি করতেন সে অঞ্চলটি তাজহাট নামে পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য আরেকটি মত প্রচলিত আছে যে, তাজহাট এলাকায় প্রতি বছর মহরমের তাজিয়া মেলা বসতো বলে এলাকাটি তাজহাট নামে সুবিদিত। যাহোক মান্নালাল স্বীয় ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা অর্জনপূর্বক মহাজনী কারবার শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি রংপুর অঞ্চলের মাহীগঞ্জ এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক ও বহু জায়গির খরিদ করতে থাকেন। এভাবেই তাজহাট জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৩০ সালে মান্নালাল রায়ের মৃত্যু পরবর্তী দু প্রজন্মের ইতিহাস অনেকটাই অজ্ঞাত। তবে তার পৌত্র ধনপত রায় তাজহাট জমিদারির মালিক হন। তিনি পাঞ্জাব থেকে আগত বিহারের দুমকা জেলায় বসবাসকারী রতনলাল রায়ের জ্যেষ্ঠ নাতনিকে বিবাহ করেন। প্রসঙ্গত রতনলাল ১৮৫৫-১৮৫৭ সালে বিহারে সংঘটিত সাওতাল বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের সহায়তার প্রতিদান স্বরূপ কিছু তালুক লাভ করেছিলেন।^{১৪} অতঃপর ১৮৬৫ সালে ধনপত রায় মৃত্যুবরণ করলে তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় তাজহাট জমিদারি সরকারি তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত হয়। এমতাবস্থায় বাংলার প্রাদেশিক সরকারের বিচার বিভাগে নিযুক্ত মুন্সেফ ও জজিসূত্রে মামা গিরিধারী লাল উপর্যুক্ত জমিদারির উত্তরাধিকার দাবি করে কোর্টে মামলা করেন এবং এ মামলার রায় তার পক্ষে আসে। ফলে তিনি তাজহাট জমিদারির মালিক হন।^{১৫} তার সময় তাজহাট জমিদারি রংপুরের পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও বগুড়া জেলা ব্যাপি বিস্তৃত ছিল।

গিরিধারী লালের কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি গোবিন্দলালকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ সালে গিরিধারী লালের মৃত্যুর পর তদীয় দত্তক পুত্র গোবিন্দলাল জমিদারি লাভ করেন। দানশীলতা ও প্রজাবৎসল্য জমিদার হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে ১৮৮৮ সালে ‘রাজা’, ১৮৯২ সালে ‘রাজা বাহাদুর’ ও ১৮৯৬ সালে ‘মহারাজা’ উপাধিতে ভূষিত হন।^{১৬} তিনি তাজহাটে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যা ১৮৯৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর অন্তর্ধানকালে (১৮৭৭) স্বীয় পুত্র গোপাল লাল রায়ের (জন্ম ১৮৮৭) বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় পৈতৃক জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ন্যস্ত হয়। কিন্তু ১৯০৮ সালে সাবালক হওয়ার পর তিনি জমিদারি লাভ করেন। তার সময় তাজহাট জমিদারির বার্ষিক খাজনার পরিমাণ ছিল ৩,৫০,০০০/=, যার মধ্যে সরকারি জমার পরিমাণ হলো ৬৭,২৯৬ টাকা।^{১৭} তিনি পিতার মতো একজন প্রজারঞ্জক, সচ্চরিত্র ও উদারচেতা জমিদার হিসেবে ব্যাপক সমাদৃত হন। তাছাড়া তিনি খেলাধুলা, শিকার করা, মোটর সাইকেল চালানো এমনকি অশ্বারোহণে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। এতদ্বিভিন্ন তিনি তাজহাট হাইস্কুল ও মাহীগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ইতিহাসে অমরীয় হয়ে আছেন।

১৯০৮-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত স্বীয় জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯১৪-১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি রঙ্গপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি রঙ্গপুর জেলা বোর্ডে সদস্য হিসেবে তিন বছর দায়িত্বে রত ছিলেন। তিনি রঙ্গপুর জমিদার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বঙ্গীয় জমিদারি সভা ও ভারতীয় জমিদারি সভার সদস্য ছিলেন। এমনকি তিনি কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান

এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কারমাইকেল কলেজের গোপাললাল (জিএল) হোস্টেল, রঙ্গপুর বার কাউন্সিল লাইব্রেরী ও জি. এল. রায় রোড নির্মাণ করেন। এমনিভাবে ১৯১০ সালে বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধকরণের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের জমিদারদের নিয়ে যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়, রাজা গোপাল লাল রায় উল্লিখিত সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।^{১৮} আর এসব জনহিতকর কর্মকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তিনি ১৯১২ সালে ‘রাজা’ ও ১৯১৮ সালে ‘রাজা বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত হন।^{১৯}

২.২ তাজহাট জমিদারবাড়ি (ভূমি নকশা-১)

তাজহাট জমিদারবাড়ি রংপুর শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বর্তমান কৃষি ইনস্টিটিউটের পার্শ্বে অবস্থিত। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জমিদারবাড়ির নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় রংপুরের অন্তর্গত মাহীগঞ্জস্থ তাজহাট জমিদারবাড়ির স্থাপত্যিক ঐতিহ্য সর্বশেষ গুরুত্বের দাবিদার। রংপুরের আলোচ্য জমিদারবাড়ি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নাজিমুদ্দিন আহমেদ বলেন, “A fairly large number of eminent Zamindars families had their landed estates and beautiful palaces such as Tajhat, Dimla, Kankina, Manthana, Pirganj, Bardhankot etc. in the district of Rangpur. Among these the Tajhat palace in the town and Bardhankot palace in south Rangpur are famous”।^{২০} তাজহাট জমিদারবাড়ি স্বীয় কারুকার্যময় স্থাপত্যিক এবং অনুপম আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই মূলত সমাদৃত ও নন্দিত একটি প্রত্ন-নিদর্শন। এ রাজবাড়ি সম্পর্কিত অপর একটি মন্তব্য হলো, “The Tajhat Zamindar palace is one of the outstanding archacological monuments in Rangpur district”।^{২১}

তাজহাট জমিদারবাড়ির প্রাসাদভবনটি ইংরেজি U পরিকল্পনায় রচিত ও দ্বিতলাকৃতি সম্পন্ন (আলোকচিত্র-১)। আলোচ্য প্রাসাদের সম্মুখভাগের বিভিন্ন অংশে করিছরী ও ডোরিক স্তম্ভের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ভবনের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪৪.২০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৬.৫৮ মিটার। দক্ষিণ দিকে রয়েছে একটি সুউচ্চ সিঁড়িসোপান। দ্বিতলাকৃতির এ সিঁড়ির নিম্নভাগে রয়েছে একটি গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দার সাথে সংযুক্ত রয়েছে তিনটি অভিগমন পথ। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী অভিগমন পথটি অপেক্ষাকৃত বড়। এসব অভিগমন পথের সাথে রয়েছে টানা সিঁড়িসোপান এবং সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ সুন্দর মসৃণ সাদা ও ধূসর রঙের মর্মর পাথরে মোড়ানো। বারান্দার পশ্চাতে ১৮.২৯ × ১৩.৭২ মিটার পরিমাপের একটি আয়তাকার হলঘর বিদ্যমান, যার পশ্চিমে দুটি এবং পূর্বে পার্শ্বে একটি কক্ষ রয়েছে। পশ্চিমের দুটি কক্ষের মধ্যে দক্ষিণেরটি প্রাসাদের সিঁড়িঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং উত্তরের কক্ষকে বিভাজক দেয়াল দিয়ে দুটি ছোট ছোট কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। হলঘরের দক্ষিণ বাহুতে রয়েছে পাঁচটি প্রবেশপথ এবং একই অক্ষ বরাবর পূর্ব বাহুতে অনুরূপ পাঁচটি প্রবেশপথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আর পশ্চিম দিকের কক্ষের সাথে তিনটি প্রবেশপথের মাধ্যমে হলঘরের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম তলার ছাদ নির্মাণে মজবুত কড়ি-বর্গার (লোহার বীম ও লোহার ফালি) ব্যবহার লক্ষণীয়। নীচতলায় রয়েছে মোট চৌদ্দটি কক্ষ। এদের মধ্যে পশ্চিম বাহুতে চারটি এবং পূর্ব বাহুতে চারটি বিভিন্ন পরিমাপের কক্ষ বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় হলঘরের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে ইংরেজি U আকৃতির একটি টানা বারান্দা দৃশ্যমান। বারান্দার খিলানগুলো সেগমেন্টাল (segmental arch) আকৃতি সম্পন্ন। পশ্চিম বাহুর দক্ষিণ প্রান্তের ১ নম্বর কক্ষের বহিষ্ত্রে দেয়ালে ২টি, বারান্দা সংশ্লিষ্ট ২টি এবং অর্ধ-বৃত্তাকার অভিক্ষিপ্ত অংশে ৩টি মোট ৭টি প্রবেশপথ রয়েছে এবং ২ নম্বর কক্ষের বহিষ্ত্রে দেয়ালে ৩টি ও বারান্দা সংশ্লিষ্ট ৩টি মোট ৬টি প্রবেশপথ বিদ্যমান। আর ১ ও ২ নম্বর কক্ষের মধ্যবর্তী দেয়ালে ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের মধ্যদিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া ২ নম্বর কক্ষের উত্তর দেয়ালে ২টি প্রবেশপথ নির্মাণপূর্বক বারান্দার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। আবার ৩ নম্বর কক্ষের পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে ২টি করে এবং দক্ষিণ বাহুতে বারান্দা সংশ্লিষ্ট ২টি প্রবেশপথ লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে ৪ নম্বর কক্ষের পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে ২টি করে এবং উত্তর বাহুতে ২টি মোট ৬টি প্রবেশপথ লক্ষ্যণীয়। আর ৩ ও ৪ নম্বর কক্ষের মধ্যবর্তী দেয়ালে ২টি প্রবেশপথ বিদ্যমান। পূর্ব বাহুর সকল প্রবেশপথ বারান্দার সাথে সংযুক্ত। ঠিক একইভাবে পশ্চিম বাহুর চারটি কক্ষের পরিমাপ, বিন্যাস ও প্রবেশপথের সংখ্যা এক ও অভিন্ন। প্রাসাদের উত্তরমুখে ১৭টি সেগমেন্টাল খিলান বিশিষ্ট ইংরেজি U আকৃতির একটি টানা বারান্দা সংযুক্ত

(আলোকচিত্র-২)।

প্রাসাদের দ্বিতীয় তলার কক্ষের সংখ্যা ও কক্ষ বিন্যাস প্রথম তলার ন্যায় একই ধরনের। দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য লৌহ নির্মিত নকশাকৃত ঝুলন্ত মজবুত সিঁড়িসোপান রয়েছে। সিঁড়ির ব্যালাস্ট্রেডযুক্ত (balustrade) রেলিং সুন্দর লোহার তৈরি ফুলগাছের ন্যায় দৃশ্যমান। এ ধরনের সিঁড়িসোপানের ব্যবহার সমকালীন বাংলার অন্যান্য জমিদারবাড়িতেও দেখা যায়। এ প্রাসাদে সর্বমোট আটাশটি কক্ষ রয়েছে, যার মধ্যে চৌদ্দটি নীচ তলায় এবং অপর চৌদ্দটি উপর তলায় অবস্থিত। এদের মধ্যে রয়েছে অভ্যর্থনা কক্ষ, গ্রন্থাগার, অতিথিশালা, হলঘর, শয়ন কক্ষ, ভাণ্ডার কক্ষ (storehouse) প্রভৃতি। কক্ষগুলো একাধিক দরজা ও জানালাবিশিষ্ট। দরজাসমূহ নানা ধরনের বিষয়বস্তু সংবলিত কাঠ খোদাই নকশায় বিশেষভাবে অলংকৃত। তবে দরজার কপাট (door leaf) হিসেবে কাঠের ফ্রেমের মধ্যে কাঠ ফলকের পরিবর্তে কাঁচের ব্যবহার প্রাসাদ অভ্যন্তরে আলো সঞ্চালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। প্রাসাদের দ্বিতীয় তলার উত্তর দিকে নীচতলার ন্যায় ইংরেজি U আকৃতির একটি টানা বারান্দা সন্নিবেশিত এবং এ বারান্দার খিলানগুলো অর্ধগোলায়িত। বারান্দাটি মূলত প্রতিটি কক্ষের সংযোগস্থাপক পথ হিসেবে বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। বারান্দায় কাঁচযুক্ত জানালা বিদ্যমান। প্রাসাদের বহির্মুখী দরজা সদৃশ উল্লম্ব জানালাগুলো কাঠের খড়খড়িযুক্ত। কোনো কোনো জানালায় ভেনিসীয় খড়খড়ি, কীটোনে সংযুক্ত ও ব্রাকেটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বারান্দা ও কক্ষসমূহের মেঝে সাদা, কালো, হলুদসহ নানা রঙের টাইলসে বাঁধানো। প্রাসাদের সম্মুখভাগের উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান আয়তাকার অংশটি এর প্রধান আকর্ষণ। তবে ডানদিকের অংশ পূর্ব-পশ্চিম দিক সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত।

প্রাসাদের দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য গাড়ি বারান্দার উপরে মসৃণ সাদা প্রস্তরে আচ্ছাদিত বাইশ ধাপবিশিষ্ট সিঁড়িসোপান রয়েছে। সিঁড়িটি পর্যায়ক্রমে তিনটি স্তরে সম্পাদিত। প্রথম স্তরটি ষোলো ধাপবিশিষ্ট। আর দ্বিতীয় স্তরে উঠার সময় একটি চৌকি (landing) অতিক্রম করতে হয়। অতঃপর চৌদ্দটি ধাপ পাড়ি দিয়ে প্রথম তলার ছাদের সাথে সংযুক্ত একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন আয়তাকার বেদিতে পৌঁছা যায়। একে সিঁড়ির তৃতীয় স্তর হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। সিঁড়িটি ভূমি থেকে প্রথম তলার ছাদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিনন্দন এবং মসৃণ সাদা-কালো পাথরে মোড়ানো। এ ধরনের গাড়ি বারান্দাযুক্ত সুউচ্চ সিঁড়িসোপান ঢাকার আহসান মঞ্জিলেও (১৮৭২) দেখা যায়। বৃহদাকৃতির এ সিঁড়ির পরিমাপ সূচনালগ্নে ১৯.২০ মিটার হলেও উপরের দিকে তা ১০.০৬ মিটার ধারণ করেছে। অর্থাৎ সিঁড়ির প্রশস্ততা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১০.০৬ মিটারে উপনীত হয়েছে। সিঁড়িটি ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত ৯.১৪ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন। প্রাসাদের হলঘরের সম্মুখভাগে সংস্থাপিত পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান টানা বারান্দার পূর্ব প্রান্তে নির্মিত অপর একটি সিঁড়িপথ ছাদ পর্যন্ত উঠিত। এ ধরনের একাধিক সিঁড়িসোপানের ব্যবহার বাংলার অপরাপর জমিদারবাড়িতেও পরিলক্ষিত হয়। সিঁড়িসোপান নির্মাণে সাদা মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। একদা সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে দোতলা পর্যন্ত মার্বেলের ধ্রুপদী রোমান রীতির দেব-দেবীর মূর্তি ছিল বলে জানা যায়। এ ধরনের মানব মূর্তির উপস্থিতি নওগাঁ জেলার দুবলহাটি, রাজশাহী জেলার পুঠিয়া ও নাটোর রাজবাড়িতেও দেখা যায়। তাছাড়া এ সুদীর্ঘ সিঁড়িপথের প্রথম স্তরের রেলিংয়ে উভয় পার্শ্বে আলোর বন্দোবস্থকরণের লক্ষ্যে টেবিল টেবের আকৃতিবিশিষ্ট শোভাবর্ধনকারী লোহার তৈরি দণ্ডাধার ব্যবহৃত হয়েছে। আর রেলিংয়ের মধ্যভাগে ব্যালাস্ট্রেডের ব্যবহার দৃশ্যমান। দ্বিতীয় স্তরেও একই উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত অনুরূপ ত্রুসাকৃতির দুটি দণ্ডাধার এখনো লক্ষ্য করা যায়। প্রাসাদের সম্মুখভাগের উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুটি করে সুউচ্চ গোলাকার স্তম্ভ রয়েছে, যাদের শীর্ষদেশ সর্পফণার ন্যায় অ্যাকাহুস (acanthus) পত্র নকশায় সুশোভিত। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় তলার সম্মুখস্থ উভয় কোণে সংস্থাপিত কক্ষের প্রত্যেকটিতে দুটি করে ঝুল বারান্দা লক্ষণীয়। বারান্দায় রয়েছে প্রস্তর নির্মিত ছোট ছোট স্তম্ভ এবং উপরিভাগে সুন্দর ফুলেল অলঙ্করণ শোভাবর্ধন করে আছে। উল্লিখিত কোণস্থিত কক্ষদ্বয়ের উপরিভাগে একটি করে ত্রিকোণাকার কক্ষ বিদ্যমান, যা কিউপোলা আকৃতিবিশিষ্ট ছাদে আচ্ছাদিত। এ কক্ষের বাইরের দিক ডোরিক স্তম্ভের উপরে অ্যাকাহুস পত্র নকশা এর সার্বিক সৌন্দর্য সৃজন করেছে। প্রাসাদের হলঘরের উপরিভাগে অপর একটি অষ্টভুজাকৃতির ক্ষুদ্র কক্ষ রয়েছে। কক্ষটি শিরালো রোমান গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত, যা দেখতে অনেকটা ফুটানো ছাতার ন্যায়। গম্বুজ শীর্ষে একটি দীপাধার (lantern) শোভাবর্ধন করে আছে, যার উপরিভাগে রয়েছে একটি শীর্ষদণ্ড। এরূপ দীপাধার সংবলিত গম্বুজ শীর্ষদণ্ড ভারতীয় স্থাপত্যে মোবারক শাহ সৈয়দের সমাধিতে

(পনেরো শতক) লক্ষ্য করা যায়, যা বহির্ভারতীয় স্থাপত্যে মাযার আস্তানা বাবার উবেদা ও জুবোদা সমাধি সৌধের গম্বুজ শীর্ষদণ্ডের সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।^{২২} আলোচ্য ক্ষুদ্র কক্ষটি হয়তোবা রাজা-রাণীদের বিনোদন কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রাসাদের ছাদ ব্যালাস্ট্রেডযুক্ত বপ্রে (parapet) ঘেরা এবং তার নিচে একসারি দন্ত নকশা প্রাসাদের আলংকারিক সৌকর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া বপ্রে শীর্ষভাগে নির্দিষ্ট ব্যবধানে কলসযুক্ত হুঁকার দণ্ডের ন্যায় শীরোচূড়া প্রাসাদের সার্বিক নান্দনিকতা অনেকাংশেই বৃদ্ধি করেছে।

পর্যবেক্ষণ: রংপুর জেলার জমিদারবাড়িগুলোর মধ্যে তাজহাট জমিদার কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদটি এতদাঞ্চল তথা বাংলার এক অনন্য আকর্ষণীয় স্থাপত্যিক নিদর্শন। কারণ তাজহাট প্রাসাদের স্থাপত্যশৈলী ও অলংকরণ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাসাদটিতে দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণ উপকরণ ও উন্নত নির্মাণশৈলীর ব্যবহৃত হওয়ায় স্থাপত্যকর্মটি এখনো অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের পূর্বে বাংলার জমিদারদের নির্মিত প্রাসাদ বা রাজবাড়িসমূহের নিদর্শন প্রায় নিশ্চিহ্ন। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে, দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণ উপকরণ ও উন্নত নির্মাণকৌশল ব্যবহার না করায় এসব প্রাসাদসম জমিদারবাড়ি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাজহাট জমিদারবাড়ি স্বতন্ত্রের দাবিদার। এ প্রাসাদের স্থাপত্যশৈলী ও জাঁকজমকপূর্ণ অলংকরণ শুধু রংপুর জেলার জামদারি স্থাপত্যের ইতিহাসেই নয়, বরং বাংলার প্রাসাদ স্থাপত্যের ইতিহাসে একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রাসাদটিতে স্থাপত্যের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ইন্দো-মুসলিম ও ইউরোপীয় স্থাপত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন- করিহ্নীয় ও ডোরিক স্তম্ভের ব্যবহার, অর্ধ-বৃত্তাকার খিলান, রোমান গম্বুজ, ভেনিসীয় খড়খড়িযুক্ত উল্লম্ব দরজা-জানালা, ব্যালাস্ট্রেডযুক্ত বপ্রে, পেডিমেন্ট, সুদীর্ঘ সিঁড়িসোপান, মানব আকৃতি ভাস্কর্যের উপস্থিতি প্রভৃতি ইউরোপীয় রেনেসা স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে গম্বুজ শীর্ষে দীপাধার শীর্ষদণ্ড, কলস শীরোচূড়া, ঝুলবারান্দা, পলন্তারার অলংকরণ ও দন্ত নকশার ব্যবহার ঐতিহ্যবাহী ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কথাই স্মরণ করে দেয়। ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত তাজহাট জমিদারবাড়ি বাংলার প্রাসাদ স্থাপত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যার স্থাপত্যিক ও নান্দনিক মাহাত্ম্য অপরিসীম।

২.৩ মছনা জমিদারি

মছনা জমিদারিবাড়ি পীরগাছা থানায় অবস্থিত। আলোচ্য জমিদারির মছনা নামকরণ সম্পর্কে নিম্নরূপ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

“জৈনক কোচারাজার রাজত্বকালে সকল রাজকর্মচারীদের জমিদারি বা জায়গিরদারি দেয়ার পর মছনার জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ জিতু মিশ্র কোচ রাজার কাছে জমিদারির জন্য আবেদন জানান। জিতু মিশ্রের সে আবেদনের প্রেক্ষিতে ফতেহপুর চাকলার সমস্ত জমিদারদের কাছ থেকে কিছু কিছু জমি কর্তন করে তাকে প্রদান করা হয় বলে পীরগাছা জমিদারি মছনা নামে পরিচিতি লাভ করে”।^{২৩}

উপর্যুক্ত কিংবদন্তির কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, মছনা জমিদারির আদি পুরুষ বৈষ্ণব মিশ্র কোচারাজার দ্বার-পুরোহিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ। এ জমিদারি বংশের কথিত প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ জিতু মিশ্রের পূর্ব পুরুষ অনন্তরাম রায় কোচবিহার রাজ পরিবারের একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। তিনি আঠারো শতকের প্রারম্ভে কোচবিহারের মহারাজা রূপ নারায়ণের শাসনামলে ১৭০৩-১৭০৪ সালে রংপুরের পীরগাছা এলাকায় একটি ছোট তালুক লাভ করেন। তিনি বরেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মোগল সরকারের নিকট থেকে ‘রায় চৌধুরী’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।^{২৪} অনন্তরাম রায় পীরগাছায় যে জায়গির লাভ করেন তাই মছনা জমিদারির একমাত্র আয়ের উৎস। অনন্তরাম রায়ের মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র রায়বেন্দ্র নারায়ণ মছনা জমিদারির দায়িত্ব লাভ করেন। অতঃপর তার পুত্র নরেন্দ্র নারায়ণ রায় পৈতৃক জমিদারির মালিক হন। কিন্তু ১৭৬৫ সালে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী জয়দুর্গা দেবী প্রায় তিন দশক মছনা জমিদারির কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রসঙ্গত তাকে ‘দেবী চৌধুরাণী’র সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়।^{২৫} জয়দুর্গা দেবীর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি রাজেন্দ্র নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁর দু-পুত্র হলেন যথাক্রমে হরেন্দ্র নারায়ণ ও ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ। রাজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু পরবর্তী ভাতৃ কলহের কারণে তাঁর জমিদারি বড় তরফ ও ছোট তরফে বিভক্ত হয়ে যায়। বড় ছেলে হরেন্দ্র নারায়ণের নেতৃত্বে বড় তরফ ১৯ নম্বর তৌজি (touzi means rent roots) এবং ভৈরবেন্দ্র নারায়ণের নেতৃত্বে ছোট তরফ

২ নম্বর তৌজি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।^{২৬} বড় তফের বার্ষিক আয় ১,৮৬,০০০/= হলেও ছোট তরফের বার্ষিক আয় ছিল ৮৬,০০০ টাকা।^{২৭}

২.৩.১ মছনা জমিদারবাড়ি (ভূমি নকশা-২)

মছনা জমিদারবাড়ি রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার অন্তর্গত পীরগাছা রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। জমিদারবাড়ির মূল ভবনটি ৫ একর ২২ শতাংশ জমি নিয়ে পরিব্যস্ত। কিন্তু বাংলা ১৩০২ সালে মূল ভবনটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারবাড়িটি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে পূর্ব নকশানুযায়ী নতুন করে নির্মিত হয়। এ রাজবাড়ির বিশাল এলাকা জুড়ে একদা অসংখ্য সহযোগী ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত নির্মিত হয়েছিল, যেগুলো আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে জমিদারবাড়ির মূল ভবনটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এর অবকাঠামো অনেকটা অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে (আলোকচিত্র-৩)। উত্তরমুখী এ ভবনের একটি সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে আয়তাকার একটি বারান্দায় উঠতে হয়। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান এ বারান্দার পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৭.৯০ মিটার ও প্রস্থে ২.৮০ মিটার। বারান্দার উভয় পার্শ্বে রয়েছে একটি করে দুটি কক্ষ এবং কক্ষগুলোর পরিমিতি ২.৮০ × ২.৩০ মিটার। ভবনের সম্মুখভাগ পাঁচটি আয়তাকার স্তম্ভ দ্বারা ছয়টি খিলানপথে উন্মুক্ত এবং খিলানগুলো অর্ধ-বৃত্তাকৃতির। প্রতিটি খিলানপথের পরিমিতি ২.৩০ মিটার। ভবনের সম্মুখভাগের ন্যায় পশ্চাৎভাগে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান একই ধরনের একটি আয়তাকার বারান্দা রয়েছে, যার পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৩.০০ মিটার ও প্রস্থে ২.৮০ মিটার। পশ্চাৎ বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিমে একটি করে ৫.০০ × ২.৮০ মিটার পরিমাপের কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের কক্ষে ৪টি ও পশ্চিমের কক্ষে ৩টি প্রবেশপথ এবং উভয় কক্ষে ১টি করে জানালা বিদ্যমান। সম্মুখভাগের বারান্দার ন্যায় পশ্চাৎভাগের বারান্দা চারটি আয়তাকার স্তম্ভ দ্বারা পাঁচটি খিলানপথে উন্মুক্ত। তবে উভয় পার্শ্বের সর্বশেষ খিলানপথ অপেক্ষা মাঝের তিনটি খিলানপথ তুলনামূলকভাবে বড়। সম্মুখ বারান্দার পশ্চাতে রয়েছে প্রাসাদের তিনটি মূল কক্ষ। এসব কক্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি করে বারান্দা সংযোজিত। তিনটি কক্ষের মধ্যে মাঝেরটি বর্গাকার পরিকল্পনায় রচিত, যার পরিমাপ ৪.৫০ × ৪.৫০ মিটার। কিন্তু উভয় পার্শ্বের কক্ষ দুটি আয়তাকার পরিসরে নির্মিত, যাদের পরিমিতি যথাক্রমে ৬.০০ × ৪.৫০ মিটার। আর উভয় পার্শ্বের বারান্দার পরিমিতি ৪.৫০ × ২.৮০ মিটার। উভয় প্রান্তের কক্ষ দুটির পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে দুটি করে প্রবেশপথ নির্মাণ করে বারান্দার সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় ও পার্শ্ববর্তী কক্ষের মধ্যে বিভাজক দেয়ালে একটি করে প্রবেশপথ তৈরি করায় পরস্পরের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রতিস্থাপন করেছে।

২.৩.২ মছনা জমিদারির খাজাঞ্চিখানা (ভূমি নকশা-৩)

মছনা জমিদারবাড়ির পার্শ্বে একটি উচু বেদির উপর সংস্থাপিত খাজাঞ্চিখানা নামক অপর একটি ইমারত বিদ্যমান, যার পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২০ মিটার ও প্রস্থে ৭.১০ মিটার। আলোচ্য ভবনের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত জুড়ে রয়েছে ইংরেজি L আকৃতির একটি টানা বারান্দা। সম্মুখ বারান্দার পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১৯.২৪ মিটার ও প্রস্থে ২.১০ মিটার। বারান্দাটি চৌদ্দটি বর্গাকার স্তম্ভ দ্বারা ১৫টি খিলানপথে উন্মুক্ত। তবে পূর্ব দিকের ৩টি ও পশ্চিম দিকের ১টি খিলানপথ দক্ষিণ দিকের ১০টি খিলানপথ অপেক্ষা বড়। স্তম্ভগুলোর পরিমিতি ০.৩৮ × ০.৩৮ মিটার এবং দক্ষিণ দিকের এক একটি প্রবেশপথের পরিমাপ ১.৬০ মিটার। সম্মুখভাগে সংস্থাপিত একটি সিঁড়ি বেয়ে এ বারান্দায় উঠতে হয়। দক্ষিণ দিকের বারান্দার পশ্চাতে রয়েছে তিনটি কক্ষ। কক্ষগুলো একই পরিমাপের অর্থাৎ ৫.৬০ × ৪.০০ মিটার এবং সম্মুখভাগের একটি করে পৃথক পৃথক দরজার মাধ্যমে প্রতিটি কক্ষের সাথে বারান্দার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। মধ্যবর্তী কক্ষে ৪টি জানালা থাকলেও উভয় পার্শ্বের প্রতিটি কক্ষে ৬টি করে মোট ১২টি জানালা রয়েছে। ভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি আয়তাকার ক্ষুদ্র কক্ষ বিদ্যমান, যার দক্ষিণ দিকের একটি প্রবেশপথ বারান্দার সাথে সংযুক্ত। কক্ষটি হয়তোবা শৌচাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা যায়।

২.৩.৩ মছনা জমিদারির কাছারিবাড়ি (ভূমি নকশা-৪)

মছনা কাছারিবাড়ি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। কাছারি ভবনের সম্মুখে ২৫.০০ × ৩.০০ মিটার পরিমাপের একটি বারান্দা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। বারান্দার সম্মুখে অর্ধ-বৃত্তাকার একটি উদগত অংশ রয়েছে,

যার গভীরতা ৩ মিটার। তাছাড়া বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ৩টি করে এবং উদগত অংশে ৬টি মোট ১২টি প্রবেশপথ রয়েছে। অনুরূপভাবে বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ১টি করে প্রবেশপথ বিদ্যমান। প্রতিটি প্রবেশপথ অর্ধ-বৃত্তাকার খিলানযুক্ত এবং খিলানগুলো আয়তাকার স্তম্ভ থেকে উঠিত। বারান্দার পশ্চাতে রয়েছে বিভিন্ন পরিমাপের চারটি কক্ষ। পশ্চিমের ১ নম্বর কক্ষের পরিমাপ ৬.৫০×৪.০০ মিটার এবং ২ নম্বর কক্ষের পরিমাপ ৫.২০×৪.০০ মিটার। অনুরূপভাবে পূর্বের ৪ নম্বর কক্ষের পরিমাপ ৬.৫০×৪.০০ মিটার হলেও তৎসংলগ্ন ৩ নম্বর কক্ষের পরিমাপ ৫.২০×৪.০০ মিটার। অর্থাৎ ভবনের মধ্যবর্তী দুটি কক্ষ সমপরিমাপের হলেও উভয় প্রান্তের কক্ষ দুটি আয়তনের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা বড়। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের কক্ষদ্বয়ে ৩টি করে এবং মধ্যবর্তী দুটি কক্ষের প্রতিটিতে ২টি করে প্রবেশপথ সম্মুখ বারান্দার সাথে সংযুক্ত। আর পূর্ব প্রান্তের ৪ নম্বর কক্ষের পূর্ব দেয়ালে ২টি এবং প্রতিটি কক্ষের উত্তর দেয়ালে ২টি করে প্রবেশপথ বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি কক্ষের বিভাজিত দেয়ালে প্রবেশপথ নির্মাণ করে পরস্পরের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের মধ্যবর্তী দুটি কক্ষ বরাবর পিছনে একটি বারান্দা রয়েছে, যার পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৬ মিটার ও প্রস্থে ৩ মিটার। উপর্যুক্ত বারান্দার পূর্ব প্রান্তে একটি সিঁড়ি বিদ্যমান এবং এ সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠা যায়। আর বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে একটি কক্ষ রয়েছে, যার অভ্যন্তরে একটি কুপের চিহ্ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধারণা করা যায় যে, কক্ষটি ভবনের শৌচাগার সমেত গোসলখানা কিংবা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে (রেখাচিত্র-১)।

২.৪ ভবতারিণী কালিমন্দির (ভূমি নকশা-৫)

রংপুর জেলার পীরগাছা থানার মছনা জমিদারবাড়ির পূর্ব পার্শ্বে আলোচ্য মন্দির অবস্থিত। এটি ভবতারিণী কালিমন্দির নামে পরিচিত। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে মছনা জমিদারের পত্নী ভবসুন্দরী দেবী মন্দিরটি নির্মাণ করেন বলে এর নামকরণ হয়েছে ভবতারিণী (দেবী দুর্গা) কালিমন্দির। কেননা ভবের অপর নাম কালী। আঠারো শতকের প্রারম্ভে এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে মাঠজরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে জানা যায়।

মন্দিরটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এবং এর সম্মুখে একটি বারান্দা সংযুক্ত। বারান্দাসহ আলোচ্য এ মন্দিরের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৭.০০ মিটার ও প্রস্থে ৪.৭০ মিটার এবং উচ্চতা ৩ মিটার। মন্দিরটি ২ মিটার উচ্চ বেদির উপর সংস্থাপিত। এর অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৬.০০×২.০০ মিটার। বারান্দার পরিমাপ ৭.০০×১.৫০ মিটার এবং বারান্দার সম্মুখে রয়েছে চারটি আয়তাকার স্তম্ভ, যা তিনটি প্রবেশপথের সৃষ্টি করেছে (আলোকচিত্র-৪)। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ উভয় পার্শ্বের প্রবেশপথ অপেক্ষা বড়, যার পরিমাপ ১.৮০ মিটার এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের সামনে রয়েছে একটি সিঁড়িসোপান। বারান্দার কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর মন্দিরের দক্ষিণ বাহুতে একটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং এর উভয় পার্শ্বে দুটি জানালা বিদ্যমান। অনুরূপভাবে মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে একটি করে জানালা। এর চারকোণায় রয়েছে চারটি কোণস্থিত বুরুজ। মন্দির গায়ে জোড়া স্তম্ভ সংযোজনের মধ্যদিয়ে এর সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পলস্তারায় রচিত লতাপাতা ও ফুলের নকশা এর সার্বিক অলংকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে (রেখাচিত্র-২)। মন্দিরের প্রধান নির্মাণ উপকরণ হলো ইট এবং জোড়ক মসলা হিসেবে চুন-সুরকির ব্যবহার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটি অদ্যাবধি সুরক্ষিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। তবে সংরক্ষণের জন্য আরো সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৫ ত্রিবিগ্রহ মন্দির (ভূমি নকশা-৬)

ত্রিবিগ্রহ মন্দিরটি মছনা জমিদারবাড়ির মূল ভবন হতে উত্তর দিকে ছোট তরফে অবস্থিত। এতে কোনো শিলালিপি না থাকলেও জনশ্রুতি হতে জানা যায় যে, মন্দিরটি আঠারো শতকের প্রারম্ভে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। দেড়শ বছরের পুরানো আলোচ্য ত্রিবিগ্রহ মন্দিরটি জমিদার বৈরিবেন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক নির্মিত এক অপূর্ব কারুকার্যময় স্থাপত্যিক নিদর্শন (আলোকচিত্র-৫)। মন্দিরের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে অল্পপূর্ণা বিশ্বেশ্বর, শিব ও হরিহর — এ তিনটি বিগ্রহ একই মন্দিরে পাশাপাশি কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে, যা বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ২ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন বেদির উপর মন্দিরটি অবস্থিত। দক্ষিণমুখী আলোচ্য মন্দির একতলা বিশিষ্ট একটি স্থাপত্যিক ইমারত। মন্দিরটির বহিঃ পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ১১.৬০ মিটার এবং

উত্তর-দক্ষিণে ৮.০০ মিটার। ভূমি নকশা অনুযায়ী এটি দুটি অংশে বিভক্ত। সম্মুখ থেকে প্রথম অংশে দৈর্ঘ্যে ৯.০০ মিটার ও প্রস্থে ২.৭৫ মিটার পরিমাপের একটি প্রশস্ত বারান্দা সন্নিবেশিত। বারান্দার সম্মুখভাগে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ উভয় পার্শ্বের প্রবেশপথ অপেক্ষা বড় (রেখাচিত্র-৩)। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের পরিমাপ ১.৫০ মিটার হলেও উভয় পার্শ্বের প্রবেশপথের পরিমাপ যথাক্রমে ১.২০ মিটার করে। প্রতিটি প্রবেশপথে অর্ধগোলায়িত খিলানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া বারান্দার পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি প্রবেশপথ, যার পরিমাপ ০.৭৫ মিটার। বারান্দার পশ্চাৎভাগে অবস্থিত মূল মন্দির তিনটি কক্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি কক্ষের সাথে একই পরিমাপের (১.৫ মিটার) একটি করে প্রবেশপথ বারান্দার সাথে সংযুক্ত। কেন্দ্রীয় কক্ষের পরিমাপ ২.৭ × ২.৩০ মিটার হলেও উভয় পার্শ্বের কক্ষ দুটির পরিমাপ যথাক্রমে ২.৩০ × ২.৩০ মিটার করে। অর্থাৎ উভয় পার্শ্বের দুটি বর্গাকার কক্ষের তুলনায় কেন্দ্রীয় কক্ষটি কিঞ্চিৎ বড়। মন্দিরটি পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে শিখর পর্যন্ত ৬.১০ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন।

সমতল ছাদ বিশিষ্ট আলোচ্য মন্দিরের কার্নিস বক্রাকারে রচিত। তবে সমতল ছাদের উপর সংস্থাপিত হয়েছে তিনটি শিখর। কেন্দ্রীয় শিখরটি অপর দুটি শিখর অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বড়। অষ্টভুজাকৃতির এ শিখরগুলো ছাদ থেকে ৩.৫০ মিটার উচু। তিনটি শিখরই একটি করে সুউচ্চ পিপার উপর সংস্থাপিত এবং পিপার পরিধি ৭.৩২ মিটার। আর প্রতিটি শিখরের চারকোণায় ছোট ছোট শিখর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ২.৪৪ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন শিখরের উত্থান বিন্দুতে বদ্ধমার্জন নকশা শোভা বর্ধন করে আছে। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় শিখরের চূড়াগুলো ভেঙ্গে পড়েছে। মন্দিরটি নির্মাণে ইট এবং জোড়ক মসলা হিসেবে চুন-সুরকির ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য মন্দিরে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ যথাক্রমে ১.৩৭ × ০.৪৬ মিটার (রেখাচিত্র-২)। সমগ্র মন্দিরে তেমন কোনো অলংকরণ নেই। তবে সুউচ্চ তিনটি শিখর, অর্ধ-গোলাকার খিলানসারি, বদ্ধমার্জন নকশার ব্যবহার মন্দিরের সার্বিক অলংকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিচর্যার আভাবে রাজবাড়ির এ মন্দির আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। যথাযথভাবে সংস্কার করা হলে এটি ভবিষ্যতে একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসেবে গুরুত্ব লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

২.৬ ডিমলা জমিদারি

উড়িয়া থেকে আগত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ হররাম সিংহ আঠারো শতকের মধ্যভাগে এ জমিদারি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আলীবর্দী খানের সময় (১৭৪০-১৭৫৬) তিনি ডিমলা এলাকার রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত হন এবং ১৭৭০-১৭৮২ সাল পর্যন্ত দেবী সিংহের সহকারী ইজারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।^{২৮} ১৭৭৩ সালের পর তিনি কোচবিহার রাজার রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং মাহীগঞ্জে এসে বাসতি গড়ে তোলেন। ডিমলায় তাঁর একটি কাছারিবাড়ি ছিল। দেবী সিংহ ও তার অত্যাচারে রঙ্গপুরে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিলে কাজিরহাট পরগণার বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ ডিমলা কাছারিবাড়ি আক্রমণ করত অপর রাজস্ব সংগ্রাহক গৌরমোহন চৌধুরীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাছাড়া উল্লিখিত পরগণার অন্যান্য কাছারিবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

হররাম সিংহের মৃত্যুর (১৭৭২) পর তাঁর পুত্র রামজীবন জমিদারি লাভ করেন। অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে রামজীবনের নামে উপর্যুক্ত জমিদারি বন্দোবস্ত দেয়া হয়।^{২৯} তিনি দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করে ১৮০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। রামজীবনের মৃত্যুর পর জয়রাম সেন পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ডিমলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁর সময়ে ডিমলায় একটি রাজবাড়ি নির্মিত হয়। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও দানশীল জমিদার ছিলেন। জয়রাম সেন নিঃসন্তান হওয়ায় নীলকলম নামীয় এক পুত্র সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর নীলকলম ডিমলার জমিদার হন এবং ১৮৪২ সাল পর্যন্ত তিনি জমিদারি পরিচালনা করেন। কিন্তু নীলকলমের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় তার স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী চৌধুরাণী পরোক্ষভাবে জমিদারি লাভ করেন। অর্থাৎ দত্তক পুত্র জানকী বল্লভ সেনের নামে ইজারা গ্রহণ করে তিনি দশ বছর জমিদারি পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি সরকারের পাওনা কর প্রায় ৩,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে সক্ষম হন।^{৩০} পরবর্তীতে ১৮৫২ সালে শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যুর পর জানকী বল্লভ জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। ১৮৯১

সালে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন।^{১১} অতঃপর ১৯১০ সালে তিনি দত্তক পুত্র যামিনী বল্লভকে রেখে মারা যান। অথচ ১৯০৮ সালে ডিমলা জমিদারি দেবোত্তর ও মুজকুরি নামক দুটি তালুকে বিভক্ত হয়ে যায়। একদা ডিমলা জমিদারি দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলা ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এ জমিদারির মোট আয় ২,৩৮,০০০/=, যার মধ্যে সরকারি জমার পরিমাণ ছিল ৩৫,৫০০ টাকা।^{১২}

২.৬.১ ডিমলা জমিদারবাড়ি

ডিমলা জমিদারবাড়ির সকল ইমারত সময়ের বিবর্তনে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু স্থাপনার ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন অদ্যাবধি লক্ষ্য করা যায়। যেমন ডিমলা জমিদারবাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত অন্দর মহলের ভগ্নদশাখ্রু একটি কক্ষ এখনো বিদ্যমান। অর্ধভগ্ন এ ভবনটি দেখে অনুমিত হয় যে, রাজবাড়িটি নির্মাণে ইট ও চুন-সুরকির ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া ইমারতের দরজা ও জানালার অর্ধ-বৃত্তাকার খিলানগুলো ভূঁসোয়া পদ্ধতিতে তৈরি। মূল ভবনের সাথে দুর্গারাগী নামক পূজা মণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল, যা বর্তমানে একটি দেয়ালের অংশবিশেষ ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। অনুমিত হয় যে, মূল ভবনটি প্রায় ২২ একর ২৫ শতাংশ জমি নিয়ে বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন সময়ে জমিদারবাড়ি সংলগ্ন ৮টি পুকুর ও ২২টি ইঁদারা খনন করা হয়েছিল। উত্তর দিকের পুকুরের নাম রাণী অন্দরবাড়ি, পূর্বেরটি রাণী সাগর, দক্ষিণেরটি গোয়ালবাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে বাগানবাড়ি, পূর্বে তালতলা পুকুর, কোলা দিঘি ও ধোপার দিঘি অবস্থিত এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কালিসাগর নামক অপর একটি পুকুর বিদ্যমান। জমিদারবাড়ির মোট ২২টি ইঁদারার মধ্যে দুটি ইঁদারার অস্তিত্ব এখনো লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমে অবস্থিত ইঁদারার গভীরতা ১০.৯১ মিটার ও ব্যাস ১.০১ মিটার এবং পূর্বের ইঁদারার গভীরতা প্রায় ১২.১৯ মিটার ও ব্যাস ০.৯২ মিটার।

২.৬.২ ডিমলা কালিমন্দির (ভূমি নকশা-৭)

মাহীগঞ্জের দক্ষিণে মাহীগঞ্জ-পায়রাবন্দ সড়ক সংলগ্ন ডিমলা কালিমন্দিরটি অবস্থিত। এটি রংপুর রেলস্টেশন থেকে পূর্ব দিকে এবং মাহীগঞ্জ থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বড় রংপুর মৌজায় অবস্থিত। ১৯১৬ সালে ডিমলার তৎকালীন জমিদার জানকী বল্লভ সেনের স্ত্রী বৃন্দারাগীর অনুদানে সুবৃহৎ ও সৌকর্যময় এ মন্দিরটি নির্মিত হয়। জানকী বল্লভ সেন ছিলেন ডিমলার জমিদার নীলকমলের বিধবা স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীর দত্তক পুত্র। ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিদান হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে তিনি 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা জানকী বল্লভ সেনের (মৃত ১৯১০) পৃষ্ঠপোষকতায় রংপুর শহরের শ্যামাসুন্দরী খাল, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর পৌরসভা ভবন ও জেলা পরিষদ ভবনসহ অসংখ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।^{১৩}

ডিমলা কালিমন্দিরটি এক কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতলাকৃতির একটি ইমারত এবং ইট ও চুন-সুরকি সহযোগে অষ্টভুজী পরিকল্পনায় নির্মিত (আলোকচিত্র-৬)। এ মন্দিরের কেন্দ্রীয় অষ্টভুজী কক্ষকে বেষ্টন করে আছে একটি অষ্টভুজী ঘোরানো বারান্দা এবং বারান্দার প্রতিবাহুর পরিমিতি ৫.৩০ মিটার। ভূমি নকশার দিক থেকে আলোচ্য মন্দির নাটোরের তারেকেশ্বর শিবমন্দির, রাজশাহী জেলার শিরোইল মঠপুকুর শিবমন্দির ও ঘোড়ামারা শিবমন্দিরের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। উল্লিখিত মন্দিরসমূহ কেন্দ্রীয় অষ্টভুজাকৃতি কক্ষকে ঘিরে অষ্টভুজী বারান্দা বেষ্টিত পরিকল্পনায় নির্মিত।^{১৪} প্রসঙ্গত অষ্টভুজী ঘোরানো বারান্দাকে প্রদক্ষিণ পথের সাথে তুলনা করা যায়, মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে যার প্রথম বিদ্যমান উদাহরণ হলো জেরুজালেমের কুব্বাত আস-সাখরা (৬৯১)। পরবর্তীকালে উল্লিখিত রীতি মুসলিম সমাধি স্থাপত্যে বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি (১৩৭০) এ রীতির প্রথম বিদ্যমান উদাহরণ।^{১৫} পরবর্তীকালে এরই ধারাবাহিকতায় মুবারক শাহ সৈয়দের সমাধি (পনেরো শতক), মুহাম্মদ শাহ সৈয়দের সমাধি (১৪৪৫), সিকান্দার লোদীর সমাধি (১৫১৭) এমনকি শেরশাহের সমাধি (১৫৪৫) নির্মিত হয়। আলোচ্য মন্দিরের কেন্দ্রীয় কক্ষের প্রতি বাহুর পরিমিতি ২.৩০ মিটার এবং এর দক্ষিণ দিকে ১.৫০ মিটার পরিমাপের একটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর পশ্চাৎভাগে ০.৮০ মিটার পরিমাপের অপর একটি প্রবেশপথ বিদ্যমান। মন্দিরটি পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ০.৯১ মিটার উচ্চ অষ্টভুজী বেদির উপর সংস্থাপিত। মন্দিরের প্রথম তলার প্রতি কোণে রয়েছে একটি করে

কোণস্থিত বুরুজ, যেগুলো অষ্টভুজী পরিকল্পনায় রচিত এবং কার্নিস থেকে উপরে উত্থিত। কার্নিসের উপরিভাগে ঢেউ খেলানো বথ সংস্থাপিত এবং কোণস্থিত বুরুজের শীর্ষভাগ অ্যাকাছাস পত্র নকশায় বিশেষভাবে অলংকৃত। এমনকি প্রথম তলার শীর্ষভাগ কঙ্জিপত্র পল্লবে সুশোভিত (রেখাচিত্র-৩)।

মন্দিরের প্রথম তলার স্তম্ভের শীর্ষদেশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিষ্ণু, শিব, কালি, বামন, বরাহ, নারায়ণ প্রভৃতি দেব-দেবী প্রতিকৃতি সংস্থাপিত রয়েছে। আলোচ্য মন্দিরের প্রতিটি বাহুর বর্হিভাগের দেয়ালে বহুখাঁজ বিশিষ্ট একটি করে খিলানপথ রয়েছে, যা আয়তাকার কাঠামো বেষ্টিত। তবে দক্ষিণ দিকের খিলানপথটি বর্তমানে মন্দিরের একমাত্র প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অন্যান্য প্রবেশপথগুলো লোহার ছিল দ্বারা বন্ধ। মন্দিরের প্রবেশপথের সম্মুখে বহুখাঁজ বিশিষ্ট সিঁড়ি রয়েছে এবং এর সমগ্র মেঝে শ্বেত মার্বেল পাথরে বাঁধানো। মন্দিরটি সমতল ছাদে আচ্ছাদিত, যার উপরিভাগে বিগ্রহ কক্ষের সম-পরিমাপের মন্দিরের দ্বিতীয় তলা নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় তলার প্রতি বাহুতে অর্ধ-বৃত্তাকার খিলানযুক্ত একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে, যেগুলো সার্সি (কাঁচের জানালা) দিয়ে বন্ধ। তাছাড়া এ তলার স্তম্ভের নিচে প্রতিটি কোণায় পাখির ডানা সংবলিত মনুষ্য আকৃতি ভাস্কর্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরূপ ভাস্কর্যকে বিষ্ণুর বাহন হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে এটিকে বিষ্ণু মন্দির হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারে। মন্দিরটি অষ্টবাহু বিশিষ্ট পিড়ামিড সদৃশ গম্বুজে আবৃত এবং গম্বুজের উপরিভাগে দীপাধার ও তার উপরে অনুরূপ অষ্টভুজী ক্ষুদ্র কিউপোলা সংস্থাপিত। এর শীর্ষদেশে কলস ও ত্রিশূল শোভা বর্ধন করে আছে। ধারণা করা হয় যে, পরবর্তী পর্যায়ে মন্দিরের শীর্ষদেশে ইম্পাতের এ গম্বুজ স্থাপন করে তার উপরে তিনটি পিতলের কলস এবং একটি ত্রিশূল স্থাপন করা হয়েছে। ভূমি থেকে গম্বুজ শীর্ষভাগ পর্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১৫.২৪ মিটার। এর অষ্টভুজী স্তম্ভগুলো নির্মাণে যে ইট ব্যবহার করা হয়েছে তার পরিমাপ ২৫.৪০ × ৭.৬২ সেন্টিমিটার। ইটগুলো মোড় করে গাঁথুণীর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি খিলানপথ বহু খাঁজবিশিষ্ট, যা মন্দিরের সার্বিক সৌন্দর্য বর্ধনে দারুণ আবহ সৃষ্টি করেছে। আর জোড়ক মসলা হিসেবে চুন-সুরকির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লোক মুখে প্রচলিত আছে যে, একদা আলোচ্য কালিমন্দিরটি ডিমলা জমিদারবাড়ির কেন্দ্রীয় মন্দির হিসেবে বিবেচিত হতো। কালিমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে জমিদারবাড়ির পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ডিমলা জমিদারি বংশের হারানো স্মৃতির নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

২.৭ ইটাকুমারী জমিদারি

পীরগাছা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তরে ইটাকুমারী জমিদারবাড়ি অবস্থিত। প্রাচীন ফতেহপুর চাকলার একাংশ নিয়ে এ জমিদারি গড়ে উঠেছিল। জমিদারিবাড়িটি তিনআনা ফতেহপুর পাগণার ৪১৩.৮৮ একর বিশিষ্ট একটি গ্রাম।^{১৬} ইটাকুমারী জমিদারি নরোত্তম নামীয় বৈদ্য বংশীয় জৈনক ব্যক্তি কোচ মহারাজার একজন কানুনগো ছিলেন। তিনি মোগল অভিযানের সময় ফতেপুর চাকলার ছয়আনা অংশের মালিক হন। তার পুত্র রঘুনাথ ও তদীয় পুত্র সুখদেব নন্দী এবং তার পুত্র রাজা রায় উক্ত পরগণার জমিদার হিসেবে বংশ পরম্পরায় দায়িত্ব পালন করেন।^{১৭} ফতেপুর পরগণার জমিদার হিসেবে রাজা রায়ের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি রংপুর অঞ্চলের বিখ্যাত লোক কবি রতীরাম দাসের জগের গান থেকেও জানা যায়।

জমিদার রাজা রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রায় পৈতৃক সূত্রে উপর্যুক্ত জমিদারির মালিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই ছিলেন ইটাকুমারী জমিদারবাড়ির নির্মাতা। তিনি আঠারো শতকের শেষ চার দশক ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে এ জমিদারি পরিচালনা করেন। রাজা শিবচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর পুত্র নবকুমার রায় তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন এবং যথেষ্ট সফলতার সাথে জমিদারি পরিচালনা করেন। কিন্তু তার কোনো পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিল না। বিধায় তার মৃত্যুর পর স্বীয় স্ত্রী কালিপারী নামীয় একজনকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তিনিই পরবর্তীতে উপর্যুক্ত জমিদারির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। উনিশ শতকের শেষের দিকে কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ইটাকুমারীর একজন জনপ্রিয় জমিদার হিসেবে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তার কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় স্ত্রী সারদাময়ী দেবী চৌধুরাণী যতীন্দ্র রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। তার সময় আলোচ্য জমিদারির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং চরম উন্নতি সাধিত হয়। তার তিন পুত্র সন্তান হলেন যথাক্রমে যোগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, গিরীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ও শচীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী। পিতার মৃত্যুর

পর জমিদারি প্রথা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী জমিদারি লাভ করেন। তার দু-পুত্র সন্তান উপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ও নৃপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী যথাক্রমে ইটাকুমারী জমিদারির মালিক হন। তবে জমিদারবাড়ির কূপের গায়ে খোদিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে গিরীন্দ্র রায় চৌধুরী বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর ইটাকুমারীর জমিদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যাহোক ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তিনি ভারতে গমন করেন এবং ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বাতিলের পূর্বেই এ জমিদারির পতন ঘটে।

২.৭.১ ইটাকুমারী জমিদারবাড়ি (ভূমি নকশা-৮)

রাজবাড়িটি মোগল ও ঔপনিবেশিক স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে তৈরি। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এ রাজবাড়ি নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ঐতিহাসিক পুরাকীর্তির অমূল্য স্মৃতি নিদর্শন এ রাজবাড়ি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে (আলোকচিত্র-৭)। একদা রাজবাড়িটি প্রাচীর বেষ্টিত থাকলেও বর্তমানে তা আর নজরে পড়ে না। অসংখ্য কক্ষ সংবলিত এ রাজবাড়ির দরজা-জানালা আজ আর নেই। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রাজবাড়ির কাছারিঘর আজ ভগ্নদশগ্রস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান। তাছাড়া নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত ইট ও পাথর সবই খসে পড়ছে। কাছারিঘরের সম্মুখে রয়েছে একটি বারান্দা এবং বারান্দার সম্মুখে রয়েছে ০.৬৭ মিটার পরিমাপের সাতটি প্রবেশপথ। প্রতিটি প্রবেশপথ আবার অর্ধ-বৃত্তাকার খিলান আকৃতি সম্পন্ন। বারান্দার পরিমাণ ১৮.৫০ × ২.৭০ মিটার এবং এর পশ্চিম প্রান্তে দোতলায় উঠার জন্য রয়েছে একটি সিঁড়িসোপান। ভবনের প্রথম তলায় রয়েছে বিভিন্ন পরিমাপের মোট ৮টি কক্ষ। অর্থাৎ বারান্দার পশ্চাৎভাগের মধ্যবর্তী সারিতে রয়েছে ৪টি কক্ষ এবং কেন্দ্রীয় আয়তাকার কক্ষের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৭.৫০ মিটার ও প্রস্থে ৪.৬০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বর্গাকার কক্ষদ্বয়ের পরিমাপ যথাক্রমে ৪.৬০ × ৪.৬০ মিটার। তাছাড়া মধ্যবর্তী সারির সর্ব পশ্চিমের কক্ষের পরিমাপ ৩.৬০ × ৪.৬০ মিটার। মধ্যবর্তী সারির পশ্চাৎভাগে রয়েছে আরো ৪টি কক্ষ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় কক্ষের পরিমাপ ৭.৫০ × ২.৭০ মিটার এবং কক্ষটি ডাইনিং হল (dining hall) হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা যায়। আলোচ্য কেন্দ্রীয় কক্ষের উভয় পার্শ্বের কক্ষসমূহের পরিমাপ ৪.৬০ × ২.৭০ মিটার। এর মধ্যে পূর্বেরটি রান্নাঘর এবং পশ্চিমেরটি বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে অনুমিত হয়। অনুরূপভাবে শেষ সারির সর্ব পশ্চিমে ৩.৬০ × ২.৭০ মিটার পরিমাপের একটি কক্ষকে বিভাজক দেয়াল দিয়ে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণেরটি শৌচাগার ও উত্তরেরটি গোসলখানা হিসেবে একদা ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভবনকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রসঙ্গত প্রতিটি কক্ষের সাথে ০.৬০ মিটার পরিমাপ বিশিষ্ট দরজাসমূহের মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হয়েছে। আর ভবনের পূর্ব প্রান্তে দৈর্ঘ্যে ১১.৭৫ মিটার ও প্রস্থে ৩.২০ মিটার পরিমাপের একটি সুরঙ্গপথ রয়েছে। এ পথ দিয়ে ভবনের পশ্চাতে যাওয়া যায়। এরূপ সুরঙ্গ পথ থেকে ধারণা করা যায় যে, একদা ভবনের পশ্চাতে কোনো আবাসিক স্থাপনা ছিল। কিন্তু ভবনগুলো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেবল ফাঁকা উন্মুক্ত চত্বর পড়ে রয়েছে।

কাছারিবাড়ির মধ্যবর্তী কক্ষটি বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে অনুমিত হয়। এ বৈঠকখানার দক্ষিণে ৩টি ও উত্তরে ৩টি প্রবেশপথ রয়েছে এবং প্রতিটি প্রবেশপথের পরিমিতি ১.০০ মিটার। এর পূর্ব দিকে দুটি ও পশ্চিমে একটি কক্ষ বিদ্যমান। পূর্বের কক্ষ থেকে পশ্চিমের কক্ষে যাওয়ার জন্য একটি পথ (passage) এবং পূর্ব ও পশ্চিমে একটি করে দরজা ব্যবহৃত হয়েছে। দরজাসমূহ একই অক্ষে অবস্থিত হওয়ায় ভিতর ও বাইরে ভবনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সবই দৃশ্যমান। ধারণা করা যায় যে, এ ধরনের আক্ষিক প্রবেশপথ নির্মাণের ফলে ভবনের অভ্যন্তরে বাতাস সঞ্চালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সিঁড়ি বেয়ে ভবনের দোতলায় উঠা যায়। ভবনের দোতলার পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে ৩টি কক্ষ (ভূমি নকশা-৯)। কেন্দ্রীয় কক্ষের পরিমাপ যথাক্রমে ৫.২০ × ৪.০০ মিটার এবং এর পূর্ব ও পশ্চিমে ৩টি করে আক্ষিক প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথের খিলানগুলো অর্ধ-গোলাকার। কেন্দ্রীয় কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত কক্ষটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত, যার পরিমিতি ১.৫০ × ৪.০০ মিটার এবং উত্তরে অবস্থিত কক্ষটিও অনুরূপ আয়তাকার পরিকল্পনায় তৈরি, যার পরিমাপ ৪.০০ × ৩.২০ মিটার। উভয় কক্ষের সম্মুখভাগে একটি করে প্রবেশপথ বিদ্যমান। দ্বিতল ভবনের কক্ষগুলো হয়তোবা খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ভবনের পশ্চিমাংশের দেয়ালে বাতির প্রজ্জ্বলনের উদ্দেশ্যে কুঠরী নির্মিত হয়েছে

(আলোকচিত্র-৮)।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইটাকুমারী রাজবাড়ি নির্মাণ করা হয় বলে অনুমেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, ঠিক একই সময়ে ইটাকুমারী রাজবাড়ির এ কাছারিঘর নির্মিত হয়েছিল। চুন-সুরকি ও ইট-পাথর সহযোগে আলোচ্য কাছারিবাড়ি নির্মিত হওয়ায় অদ্যাবধি তা অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে। রাজবাড়ি সংশ্লিষ্ট আরো কিছু স্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন এ বাড়ির উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে রয়েছে নজরকাড়া পাঁচটি বিশাল দিঘি। এর পূর্বদিকে পদ্ম পুকুর, দক্ষিণে প্রতিমা বিসর্জনের পুকুর, পশ্চিমের পুকুরটি চাততা নামে পরিচিত। এ ধরনের পুকুরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপরের ফুল বাগানের নিচে পুকুর বিদ্যমান থাকে। পূর্ব-দক্ষিণে দুটি ধোপার পুকুর ছিল বলে জানা যায়। রাজবাড়ির অন্তর মহল থেকে দক্ষিণে একটি ফটক ছিল। এ ফটক দিয়ে উত্তরে অবস্থিত ফুল বাগানে প্রবেশ করা যেত। এ বাগানবাড়ির পূর্বে আদায়কৃত খাজনা টাকা রাখার জন্য একটি গুপ্তঘর এবং একটি বিষ্ণু মন্দির ছিল। এ মন্দিরের পূর্ব দিকে ছিল শিবমন্দির ও একটি ইন্দিরা। পূর্বে সাতটি ইন্দিরা থাকলেও বর্তমানে তিনটির অস্তিত্ব দেখা যায়। এর একটি অন্তর মহলে, অপরটি কাছারিঘরের সম্মুখে এবং তৃতীয়টি একটি শিবমন্দিরের পাশে অবস্থিত। রাজবাড়ি থেকে ৫০০ গজ দূরে কাছারিঘরে একটি কালিমন্দির আছে। আর দাতব্য চিকিৎসালয় ও পোস্ট অফিস কাছারিঘর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত। একদা জমিদারবাড়ির পূর্ব দিকে নাট ও দুর্গা মন্দির ছিল। উল্লেখ্য যে, দেবী চৌধুরাণীর পরামর্শক্রমে রাজা শিবচন্দ্র রায় ১৭৮৩ সালে এ বাড়ির নাট মন্দিরে রংপুর এলাকার জমিদার ও প্রজাদের সম্মেলন আহ্বান করেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় ও দেবী চৌধুরাণী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে পীরগাছায় নাপাইচন্ডির মেলা প্রান্তরে শহীদ হন। প্রসঙ্গত কৃষক বিদ্রোহের পীঠস্থান ঐতিহাসিক এ জমিদারবাড়ি সংস্কারপূর্বক একটি দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

২.৮ রামেশ্বর শিবমন্দির

রংপুর সদর উপজেলা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার অদূরে মাহীগঞ্জ বাজার থেকে পূর্ব দিকে মাহীগঞ্জ-নবীগঞ্জ সড়কের উত্তর পার্শ্বে গোলাবাড়ি এলাকায় রামেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। রংপুর জেলার জমিদারি ইতিহাসে গোসাঞীবাড়ি জমিদার ছিল অন্যতম। মাহীগঞ্জ গিরি গোসাঞী তালুকের (estate) প্রতিষ্ঠাতা শীতলগিরি উত্তর ভারতের গিরি সম্প্রদায়ের শৈল সন্ন্যাসী শাখার লোক ছিলেন। তিনি গয়াবাড়িতে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন এবং নিজেই তার মোহন্ত (প্রধান উপাসক) নিযুক্ত হন। একটি ব্যতিক্রমধর্মী তালুকের অধিকারী হিসেবে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অপরাপর সন্ন্যাসীদের নিয়মিতভাবে উপর্যুক্ত আশ্রমে আসতে দেখা যায়।

অচিরেই রংপুরের মাহীগঞ্জে তার জমিদারির প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করে সেখানে ১২৪৭ বঙ্গাব্দে রামেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ করেন। গোসাঞীবাড়ি তালুকে রামেশ্বর শিবমন্দির, নন্দীমন্দির ও কালিমন্দির ছাড়া লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির, হনুমান মন্দির, দুর্গা মন্দির, নাগা সন্ন্যাসীদের কবর প্রভৃতি সবই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের দেবোত্তর সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য থেকে সন্ন্যাসী তালুক সম্পূর্ণরূপে আলাদা চরিত্রের অধিকারী। শৈলেন্দ্রগিরি পর্যন্ত মাহীগঞ্জ গিরি তালুক তার দেবোত্তর বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রাখলেও সুমেরু গিরির সময় হতে তা বিলিন হতে শুরু করে। মোহন্ত মহারাজাদের বিলাসী জীবনযাপন এবং দেবোত্তর সম্পত্তির অমিত্যব্যয়ী ব্যবহার কিংবা সে সম্পত্তি গ্রাস করার জঘন্য মানসিকতা এর অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত মাহীগঞ্জ মঠের সম্পত্তি পরিচালনা এবং ১৯৫০-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সত্য নারায়ণ গিরির ও আশুতোষ গিরির মধ্যে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মন্দির গাত্রের প্রবেশপথের উপরে একটি শিলালিপি এখনো সংযোজিত রয়েছে। শিলালিপি সূত্রে জানা যায় যে, গোসাঞীবাড়ি জমিদারি তালুকের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মুলিচন্দ্র মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রামেশ্বর শিবমন্দিরটি একরত্ন বিশিষ্ট এবং অষ্টভুজী পরিকল্পনায় নির্মিত। এর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ২.১৩ মিটার এবং প্রতি কোণে কার্নিশ পর্যন্ত উত্থিত একটি করে সর্ব বুরুজ সংযোজিত। মন্দিরের চূড়াও অনুরূপ অষ্টভুজী আকৃতিতে তৈরি। এ মন্দিরের শীর্ষদেশ কলস দ্বার সুশোভিত। এর দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশপথ বিদ্যমান, যার পরিমিতি প্রস্থে ০.৭৯ মিটার এবং উচ্চতা ১.৭১ মিটার। মন্দিরের চূড়াটি বাইরের দিকে অষ্টভুজাকৃতি হলেও অভ্যন্তরে অর্ধগোলাকার গম্বুজ আকৃতি সম্পন্ন। চূড়াসহ মন্দিরের উচ্চতা ৭.৬২ মিটার।

মন্দির গাত্রের প্রতি বাহুতে একটি করে আয়তাকার প্যানেল বিদ্যমান এবং প্রতিটি প্যানেল অভ্যন্তরে মনুষ্য আকৃতির ভাস্কর্য উৎকীর্ণ রয়েছে। আলোচ্য মন্দির নির্মাণে ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। মাহীগঞ্জ গোসাঞীবাড়ি জমিদারির রামেশ্বর শিবমন্দিরটি নাটোর চৌধুরাম রাজবাড়ির শিবমন্দিরের অনুরূপ বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত দুটি মন্দিরের ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় মন্দিরের গর্ভগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত ছাদ অষ্টভুজাকৃতির শিরালো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাছাড়া মন্দিরের কার্নিস বক্রাকারে রচিত এবং এর চূড়ার শীর্ষদেশে একটি লৌহদণ্ড শোভা বর্ধন করে আছে। তাছাড়া উভয় মন্দিরের প্যানেল নকশা প্রায় একই রকম। বর্তমানে মন্দিরটি অযত্ন-অবহেলায় ভগ্নদশাগ্রস্থ অবস্থায় বিদ্যমান।

২.৯ হনুমানজির মন্দির (ভূমি নকশা-১০)

হনুমানজির মন্দিরটি রামেশ্বর শিবমন্দির থেকে প্রায় ৩০০/৪০০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে মাহীগঞ্জ-নবীগঞ্জ সড়ক সংলগ্ন অবস্থিত। স্থানীয় সূত্র মতে, গোসাঞীবাড়ির আলোচ্য মন্দির হনুমানজির মন্দির নামেও পরিচিত। হনুমানজির মন্দির গাত্রে কোনো শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকাল সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে আলোচ্য মন্দিরটি রামেশ্বর শিবমন্দিরের সমসাময়িক অর্থাৎ ১২৪৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

মন্দিরটি ক্ষুদ্র পরিসরে নির্মিত এবং এর চারদিকে মাটি ভরাট করায় অনেকটা খর্বাকৃতির দেখা যায়। এটি একরত্ন বিশিষ্ট ও বর্গাকার পরিকল্পনায় তৈরি (আলোকচিত্র-৯)। এর আয়তন ২.৭৪ মিটার এবং কার্নিশ পর্যন্ত দেয়ালের উচ্চতা ১.৮২ মিটার। দেয়ালগুলো ০.৬১ মিটার চওড়া। এর চারকোণায় রয়েছে চারটি সরু পোস্তা। রত্নসহ মন্দিরের উচ্চতা ৬.১০ মিটার। অভ্যন্তরের ছাদটি অর্ধ গম্বুজবিশিষ্ট। মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার বিদ্যমান। এটি দৈর্ঘ্যে ১.১৯ মিটার ও প্রস্থে ১.২২ মিটার। মন্দির গাত্রে পলস্তারায় রচিত বিচিত্র ধরনের নকশা পরিলক্ষিত হয়। নকশাগুলো সাধারণত ফুল লতাপাতা ও মনুষ্য আকৃতিবিশিষ্ট। মন্দিরের নকশাগুলো সাধারণত পশ্চিম পার্শ্বের প্রবেশপথে উৎকীর্ণ। তবে প্যানেল অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়বস্তু উপস্থাপনের মাধ্যমে এর সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত মন্দিরটি বর্তমানে ভূগর্ভে ঢেবে যাওয়ায় এর প্রকৃত সৌন্দর্য ও অলঙ্করণ প্রায় সবই নষ্ট হয়ে যাবার পথে এবং অনেকটাই ভগ্নদশাগ্রস্থ অবস্থায় কোনো রকমে টিকে রয়েছে।

২.১০ গোসাঞীবাড়ি কালিমন্দির

গোসাঞীবাড়ি কালিমন্দিরটি রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ থানায় অবস্থিত। রামেশ্বর শিব মন্দিরের ঠিক পূর্ব দিকে এটি এখনো অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। মন্দিরটি বর্গাকৃতির, যার প্রতিবাহুর পরিমিতি ৫.১৮ মিটার এবং এটি একটি বেদির উপর অবস্থিত (আলোকচিত্র-১০)। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে বেদির উচ্চতা ১.৫২ মিটার। আর বেদি হতে ছাদ পর্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪.২৭ মিটার। এর উত্তরাংশ ব্যতীত পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ তিন দিকে বারান্দা বেষ্টিত। তাছাড়া পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথগুলো একই রকম বহু খাঁজযুক্ত এবং এদের উচ্চতা ২.১৩ মিটার ও প্রস্থে ১.৫২ মিটার। মন্দিরের কেন্দ্রীয় কক্ষে একটি প্রবেশপথ আছে, যার উচ্চতা ও প্রস্থ যথাক্রমে ১.৫২ × ১.২২ মিটার। এর পূর্ব বাহুর প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে একটি করে এবং পশ্চিম বাহুর প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট চারটি জানালা রয়েছে। প্রতিটি জানালার পরিমাপ যথাক্রমে ১.১০ মিটার। সমগ্র মন্দিরে কোনো ধরনের আলংকারিক বিষয়বস্তু চোখে পড়ে না। তবে বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলান এ মন্দিরের নান্দনিক সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

বাংলাদেশের প্রায় সব কালিমন্দিরেই আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। প্রসঙ্গত মাহীগঞ্জ গোসাঞীবাড়ির কালিমন্দিরের সাথে নওগাঁর বলিহার রাজবাড়ি কালিমন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।^{৩৮} উভয় মন্দির সুউচ্চ আয়তাকার মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার সম্মুখে পাঁচ ধাপবিশিষ্ট সিঁড়িসোপান রয়েছে। তাছাড়া আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত উল্লিখিত মন্দিরদ্বয়ের সম্মুখে খিলানসারিযুক্ত উন্মুক্ত বারান্দা সন্নিবেশিত। বর্তমানে এ কালিমন্দির অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। তবে আরো পরিচর্যা ও যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে গোসাঞীবাড়ি তালুকের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ গোসাঞী ও জ্ঞানেন্দ্র গোসাঞী এ মন্দির দেখাশুনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

২.১১ দেওয়ান জমিদারি

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেওয়ান জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নরসিংহ মজুমদার। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার শিবগঞ্জ থানার পুসুরিয়া গ্রামের বরেন্দ্রীয় কায়স্থ ছিলেন।^{৩৯} দেওয়ান জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ নরসিংহ মজুমদার অল্প বয়সে পিতা রাজকৃষ্ণ মজুমদারকে হারিয়ে মাতৃতালয়ে বড় হন। তিনি একাধারে আরবী, ফার্সি, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন উচ্চভিলাষী মানুষ। প্রাথমিক পর্যায়ে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর অফিসের একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করলেও তা পরিহার করেন। অবশেষে ভাগ্যবশেষে তিনি রংপুরে চলে আসেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। তার ভাষা জ্ঞান ও পূর্ববর্তী চাকরির অভিজ্ঞতা তাকে কালেক্টর অফিসে সুউচ্চ পদের সুযোগ করে দেয়। তিনি ১৮২১-১৮২৭ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে রেকর্ডকিপার, মুন্সী (scribe) ও সেরেস্টাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।^{৪০} প্রসঙ্গত তিনি রংপুর অঞ্চলে নরসিংহ দেওয়ান নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। উল্লিখিত পদে আসীন থাকা অবস্থায় নরসিংহ বহু নতুন নতুন তালুক ও নিলামী সম্পত্তি ক্রয় করে একজন উদীয়মান জমিদারে পরিণত হন। তার এসব তালুকের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বর্তমান নীলফামারী জেলায় অবস্থিত। কিন্তু কৌশলগত কারণে তিনি বর্তমান রংপুর শহরের নওয়াবগঞ্জ এলাকায় একটি জমিদারবাড়ি নির্মাণ করেন।^{৪১} জমিদারবাড়িটি অদ্যাবধি দেওয়ানবাড়ি নামে অত্র এলাকায় বহুল পরিচিত।

জমিদার নরসিংহ মজুমদারের প্রথমা স্ত্রী রামমণির গর্ভে চার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা সকলেই মারা যায়। ধারণা করা হয় যে, সে শোকে জমিদার নরসিংহ মজুমদার ১৮৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে তার দ্বিতীয় স্ত্রী প্রেমময়ী দেবীর উপর জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়। অথচ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি জনৈক বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু উল্লিখিত দত্তক পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি রাধা রমন নামীয় অপর এক বালককে দত্তক নেন। প্রসঙ্গত প্রেমময়ী দেবী প্রায় সতেরো বছর জমিদারি পরিচালনা করে ১৮৭২ সালে পরলোক গমন করেন। অতঃপর জেলা জজের তত্ত্বাবধানে এ জমিদারির যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এদিকে রাধা রমন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তিনি দেশে ফিরে ১৮৮৫ সালে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৩-১৯০৩ সাল পর্যন্ত অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও কর্মরত ছিলেন।^{৪২} কিন্তু ১৯০৫ সালে তার মৃত্যু পরবর্তী দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র সন্তান ফণীভূষণ মজুমদার (জন্ম ১৮৯২) দেওয়ান জমিদারির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অবশেষে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বাতিলের সাথে সাথে দেওয়ান জমিদারি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে জমিদারবাড়িটি এখনো টিকে রয়েছে।

২.১১.১ দেওয়ান জমিদারবাড়ি (ভূমি নকশা-১১)

দেওয়ান জমিদারবাড়িটি দ্বিতল বিশিষ্ট, যার পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১৬.১০ মিটার ও প্রস্থে ৭.৮০ মিটার। দক্ষিণমুখী এ ভবনের সম্মুখ অংশের উপরিভাগে বাংলার দোচালা আকৃতির টিনের ছাউনি রয়েছে (আলোকচিত্র-১১)। তাছাড়া এর দ্বিতল অংশের বারান্দায় বড় করে দেওয়ানবাড়ি খচিত একটি নামফলক সংযুক্ত, যার চতুষ্পার্শ্বে ফুল ও লতাপাতার নকশা লক্ষণীয়। তাছাড়া দ্বিতল অংশে বারান্দার সম্মুখে পানি নিষ্কাশনের জন্য সিংহের মুখাকৃতি একটি লোহার পাইপ ব্যবহৃত হয়েছে। ভবনের নীচ তলার উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে টানা বারান্দা রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান আলোচ্য উভয় বারান্দার পরিমাপ ১৬.১০ × ২.০০ মিটার। সম্মুখ বারান্দায় ৬টি এবং পিছনের বারান্দায় ৬টি করে মোট ১২টি গোলায়িত ডোরিক স্তম্ভ রয়েছে। সম্মুখ বারান্দার পিছনে ৩টি কক্ষ বিদ্যমান, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় কক্ষটি উভয় পার্শ্বের কক্ষ অপেক্ষা আকার ও আয়তনে বড়। ৬.৭০ × ৩.৭০ মিটার পরিমাপের এ কক্ষটি জামিদারবাড়ির হলঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা যায়। কেন্দ্রীয় হলঘরের উভয় পার্শ্বে ৩.৩০ × ৩.৭০ মিটার পরিমাপের আরো দুটি কক্ষ রয়েছে। উভয় পার্শ্বের কক্ষদ্বয়ের ১টি করে প্রবেশপথ বারান্দার সাথে সংযুক্ত হলেও কেন্দ্রীয় হলঘরের ৩টি প্রবেশপথ বারান্দার সাথে সংযোজিত। তাছাড়া কেন্দ্রীয় হলঘরের পূর্ব পার্শ্বের কক্ষের বহিষ্কৃত দেয়ালে ২টি এবং কেন্দ্রীয় কক্ষ ও পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষের মধ্যবর্তী দেয়ালে ১টি করে জানালা বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় হলঘর ও উভয় পার্শ্বের কক্ষের বিভাজন দেয়ালে প্রবেশপথ নির্মাণ করে প্রতিটি কক্ষের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় হলঘরের পিছনে রয়েছে আরো ৪টি কক্ষ। পূর্ব দিক থেকে ১ নম্বর কক্ষের পরিমাপ ৩.৩০×২.৭০ মিটার, ২ নম্বর কক্ষের পরিমাপ ৩.০০×২.৭০ মিটার এবং ৩ নম্বর কক্ষের আয়তন ২.৩০×২.৭০ মিটার। আর ৪ নম্বর কক্ষের পরিমাপ ১.৭০×২.৭০ মিটার, যার পশ্চিমে একটি সিঁড়িঘর বিদ্যমান এবং এ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠা যায়। তাছাড়া ১ নম্বর কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে একটি করে মোট দুটি, ২ ও ৩ নম্বর কক্ষের উত্তর বাহুতে একটি করে এবং ৪ নম্বর কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। আর ১ নম্বর কক্ষের পূর্ব বাহুতে রয়েছে একটি জানালা। প্রবেশপথ ও জানালাগুলোর পরিমাপ যথাক্রমে ১.২০×২.০০ মিটার। আর ভবনে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ২৫×১৩ সেন্টিমিটার।

ভবনের দ্বিতীয় তলায় রয়েছে দুটি বারান্দাসহ পাঁচটি কক্ষ (ভূমি নকশা-১২)। কেন্দ্রীয় বৃহৎ কক্ষের সম্মুখে রয়েছে একটি বারান্দা এবং বারান্দায় রয়েছে চারটি গোলায়িত ডোরিক স্তম্ভ। কেন্দ্রীয় কক্ষের পরিমাপ ৬.৭০×৩.৭০ মিটার এবং উভয় পার্শ্বের কক্ষ দুটির পরিমাপ যথাক্রমে ৩.৩০×৩.৭০ মিটার। তাছাড়া উভয় পার্শ্বের কক্ষে রয়েছে ৩টি করে মোট ৬টি জানালা। আর ৩টি প্রবেশপথের মাধ্যমে বারান্দার সাথে কেন্দ্রীয় কক্ষের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথের মাধ্যমে উভয় পার্শ্বের কক্ষের সাথে আন্তঃসংযোগ রচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষের উত্তরে রয়েছে একটি আয়তাকার বারান্দা, যার পরিমাপ ৮.৪০×২.২০ মিটার। উল্লিখিত বারান্দার পূর্বে রয়েছে একটি শৌচাগার, যার আয়তন ১.৫০×২.২০ মিটার। একইভাবে বারান্দার পশ্চিমে রয়েছে ৩.২০×২.২০ মিটার পরিমাপের একটি সিঁড়িঘর। আর বারান্দার সম্মুখে রয়েছে চারটি গোলায়িত ডোরিক স্তম্ভ এবং বারান্দাটি নির্দিষ্ট উচ্চতা সম্পন্ন রেলিং বেষ্টিত। জমিদারবাড়ি সমতল ছাদে অচ্ছাদিত এবং এর কার্নিস ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল। কার্নিশের উপরিভাগে ঢেউখেলানো আলংকারিক বগ্ন ঘেরা এবং সম্মুখভাগের কেন্দ্রীয় বারান্দার উপরিভাগে দৃষ্টিনন্দন পেডিমেন্ট সন্নিবেশিত। তাছাড়া দ্বিতীয় তলার প্রতি কোণায় রয়েছে করিস্ট্রীয় ক্যাপিটলযুক্ত আয়তাকার স্তম্ভ। আর রাজবাড়ির ছাদের প্রতি কোণায় কলস শীর্ষদণ্ড শোভা বর্ধন করে আছে।

২.১১.২ দেওয়ানবাড়ির তোরণ

দেওয়ানবাড়ির মূল ফটক জামিদারি স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি অনন্য সংযোজন (আলোকচিত্র-১২)। মোগল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আলোচ্য প্রবেশ তোরণ অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে। দেওয়ানবাড়ির এ প্রবেশ তোরণ অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। প্রসঙ্গত ঢাকার অদূরে অবস্থিত হাজিগঞ্জ দুর্গ ও সোনাকান্দা দুর্গের প্রবেশ তোরণের সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, যা আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই দুর্গের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রবেশপথ ও প্রতিরক্ষা বুরুজটি প্রহরী কক্ষ সংবলিত, যা মোগল দুর্গের অন্যতম চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের প্রতিরক্ষা সংবলিত প্রবেশ তোরণ উত্তর ভারতীয় মোগল প্রাসাদ দুর্গেও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- আগ্রা দুর্গ, লালকেল্লা, ফতেপুরসিক্রি, শাহজাহানাবাদ দুর্গ প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এসব দুর্গ ফটক প্রারম্ভিক মুসলিম শাসনামলে নির্মিত কাসর আল-হায়ের আল-গারবী ও কাসর আল-হায়ের আল-শারকী এবং ফাতেমীয় আমলে নির্মিত কায়রো নগরীর বাব আল-ফুতহ, বাব আল-নসর ও বাব আল-জুয়াইলা প্রবেশ তোরণের অনুকরণে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। এর সমান্তরাল বেষ্টিনী দেয়ালের শীর্ষদেশে প্রতিরক্ষা ফোকরযুক্ত বগ্ন সন্নিবেশিত। এ ধরনের ফোকডযুক্ত বগ্নের ব্যবহার লালবাগ দুর্গেও দেখা যায়। প্রবেশপথের কোণস্থিত বুরুজ ও সংযুক্ত স্তম্ভের শীর্ষদেশে ছত্রী সংস্থাপিত। আর চতুর্দিক খিলানযুক্ত এ প্রবেশপথ অর্ধগম্বুজ ভল্ট সহযোগে আচ্ছাদিত। দেওয়ানবাড়ির ফটকটি উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও এর অন্যতম উদ্দেশ্য যে দেওয়ানবাড়ির সৌন্দর্য রক্ষার্থে মর্যাদার প্রতীকরূপে তৈরি করা হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. উপসংহার

শিল্পকলা একটি দেশ-জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার প্রতিচ্ছবি। আর সুকুমার শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা স্থাপত্যকলা সে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক এবং শিল্পসত্তার মানোন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। মানব সভ্যতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণয়নে প্রত্নসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক ও জীবন্ত উৎস হলো স্থাপত্যকর্ম। মধ্যযুগীয় ও ঔপনিবেশিক বাংলার স্থাপত্যিক ঐতিহ্য যথেষ্ট

দেদীপ্যমান। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার জমিদারদের নির্মিত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভাবপুষ্ট রাজবাড়িগুলো তারই অনন্য সাক্ষ্য বহন করছে। এসব জমিদারবাড়ি এ দেশের জমিদারদের ইংরেজ প্রীতি এবং ইংরেজ প্রভুদের মনস্তৃষ্টি ও মনোরঞ্জনের প্রতীকী নির্দশন হিসেবে অদ্যাবধি টিকে রয়েছে। এসব রাজবাড়ি একদিকে যেমন প্রজাপীড়নের কথা স্মরণ করে দেয়, তেমনি জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের স্মারক উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট মহিমাম্বিত। সাধারণ প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত খাজনার টাকায় নির্মিত এসব সুরম্য অট্টালিকার স্থাপত্যিক মূল্যমান যথেষ্ট সুসমামঞ্জিত। রংপুর জেলার বিদ্যমান ও ভগ্নদশাশ্রুত এসব জমিদারবাড়ি বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক নতুন সংযোজন, যেগুলো প্রকৃতপক্ষেই জমিদারদের স্থাপত্যপ্রীতি ও সুরচির পরিচায়ক। একদা সাধারণ প্রজা ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী হিসেবে বাংলার জমিদার শ্রেণি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তারই বিদ্যমান নির্দেশন হিসেবে এসব জমিদারবাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখ্য যে, ১৯৫০ সালে বাংলার জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও কালের সাক্ষী হিসেবে রাজবাড়িগুলো এ দেশের সমকালীন জমিদারদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস বহন করে চলেছে। প্রসঙ্গত ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে নির্মিত এসব প্রাসাদসম ইমারত ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের অনন্য উদাহরণ, যার সূচনা ও পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল এ দেশের জমিদারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যদিয়ে। এতদ্বিত্ত সমকালীন বাংলায় নির্মিত বাঁশ, কাঠ, খড় ও কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি দোচাল কিংবা চৌচালা কুঁড়েঘরের মাঝে জমকালো এসব ইমারত এ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা বেমানান মনে হলেও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এদের স্থাপত্যিক নান্দনিক মূল্যমান অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। ইতিহাস ও স্থাপত্য প্রেমিক দেশি-বিদেশি অসংখ্য পর্যটক আজও এসব জমিদারবাড়ি দর্শনের মাধ্যমে আত্মতৃষ্টি লাভ করে থাকে — জানতে পারে বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। রংপুর অঞ্চলের জমিদার তথা বাংলার জমিদারি ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট স্মরণীয় করে রাখার জন্য অতিশীঘ্রই এসব ধ্বংসোন্মুখ রাজবাড়িগুলোর সার্বিক পরিচর্যা করা এখন সময়ের দাবীমাত্র। কেননা দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত বাস্তব উপলব্ধি একটি জাতিকে আত্মবিশ্বাসী — দূরদৃষ্টি সম্পন্ন — উচ্চাভিলাষী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় সন্ধানে ইতস্ততভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা এসব জমিদারবাড়ির সংস্কারপূর্বক সংরক্ষণ করা একান্তই অপরিহার্য এবং বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এমনটি প্রত্যাশা রইল।

পরিশিষ্ট-১

রংপুর জেলার উল্লেখযোগ্য জমিদারি বংশ (১৬০৬-১৯৫০)

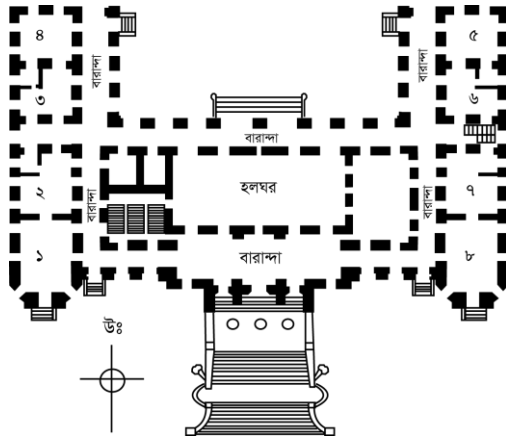
জমিদার বংশ	উৎপত্তি	বর্ণ	স্থায়ী/অস্থায়ী	জমিদারির ধরণ	মন্তব্য
কুণ্ডি	রাঢ়ীয়	ব্রাহ্মণ	স্থায়ী	মোগল জায়গিরদারী	সুবেদার মানসিংহের পুরোহিত শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১৫৯৬ সালে উড়িষ্যার কটক থেকে রংপুরে আগমন করে কুণ্ডি পরগণার জায়গীর লাভ করেন। তদীয় পুত্র কেশব মুখোপাধ্যায় ১৬০৬ সালে বংশানুক্রমে কুণ্ডির উক্ত জায়গির জমিদারি হিসেবে লাভ করেন।
পাঙ্গা	কামরূপ	কোচ	স্থায়ী	কোচ বংশীয় সামন্ত	কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের (১৪৯৩-১৫৩৩) জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ পাঙ্গার এ জমিদারি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
ঘোড়াঘাট (ইদ্রাকপুর)	বরেন্দ্রীয়	কায়স্থ	স্থায়ী	মোগল জায়গিরদারী	সতেরো শতকের সূচনা লগ্নে রাজা ভগবান এ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত এটি বর্ধনকোট জমিদারি নামেও পরিচিত।
তুষভাণ্ডার (২ আনা কাজিরহাট)	রাঢ়ীয়	ব্রাহ্মণ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি (দেবোত্তর ও ক্রয়সূত্রে)	১৬৩৪ সালে উপেনচৌকি তালুকদারীর মাধ্যমে পুরোহিত মুরারীদেব ঘোষাল তুষভাণ্ডারে এক দেবোত্তর এস্টেট প্রতিষ্ঠা করেন। তার বংশের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ

জমিদার বংশ	উৎপত্তি	বর্ণ	স্থায়ী/অস্থায়ী	জমিদারির ধরণ	মন্তব্য
					রামদেব ঘোষাল ১৭৪০ সালে কাজিরহাট চাকলার ২ আনা অংশ ক্রয়ের মধ্যদিয়ে তুষভাণ্ডার জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়।
মহীপুর (৪.৫ আনা কাজিরহাট)	মোগল	মুসলমান	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	মোগল বংশোদ্ভূত কোচ রাজার সেনাপতি আরিফ মোহাম্মদ চৌধুরী এ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কোচ রাজার নিকট থেকে মোগল-কোচ যুদ্ধের প্রাক্কালে কাজিরহাট চাকলার ৪.৫ আনা অংশ লাভ করে স্থায়ী জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।
কাকিনা	বরেন্দ্রীয়	কায়স্থ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ১৬৭৬ সালে কোচবিহার মহারাজা কর্তৃক কাকিনার চাকলাদার নিযুক্ত হন। ১৬৮৭ সালে মোগল বাহিনী কাকিনা দখল করে রঘুরামকে তার সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ তিনটি পরগণা যথাক্রমে পরগণা বাঘটি, পরগণা টেপা ও পরগণা কাকিনার চাকলাদার নিযুক্ত করেন। রঘুরাম ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী অধীনে একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। তার পিতা রামনাথ ১৬৩৪ সালে কোচরাজা প্রাণ নারায়ণের সময় (১৬৩২-১৬৬৫) মজুমদার (ৎবপড়ৎফশববঢ়বৎ) ছিলেন। রঘুরামের মৃত্যুর পর তার ছোট পুত্র রামনারায়ণ উত্তরাধিকারী সূত্রে কাকিনার জামদারি লাভ করেন।
পরগণা বাঘটি	বরেন্দ্রীয়	কায়স্থ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	সতেরো ও আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে রঘুরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রতনেশ্বর পরগণা বাঘটির জমিদারি লাভ করেন।
টেপা	বরেন্দ্রীয়	কায়স্থ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	টেপা জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাদেব রায় কোচরাজা রূপনারায়ণের (১৭০৪-১৭১৪) খাসনবিস (ঢত্রাধঃবৎবৎবৎবৎ) ছিলেন। আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকে মহাদেব রায় রঘুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রতনেশ্বরের নিকট থেকে পরগণা টেপা ক্রয়সূত্রে লাভ করেন এবং নিজ জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।
ইটাকুমারী (ফতেহপুর ৩ আনা বা ফকির কুণ্ডি)	বরেন্দ্রীয়	কায়স্থ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	মোগল অভিযানের প্রাক্কালে কোচবিহার মহারাজার জনৈক কানুনগো (ধপপড়ৎহঃবহঃ ড়ভৎবাবহঃবৎবৎবৎবৎ) নরোত্তর ফতেপুর চাকলার ৬ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর এ বংশের পঞ্চম পুরুষ রাজা শিবচন্দ্র উক্ত পরগণার অর্ধেকাংশ উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করে ইটাকুমারী জমিদারি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, তার সময়ে রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের দেবী সিংহের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল (১৭৮১-১৭৮৩)।
বামনডাঙ্গা	রাঢ়ীয়	কায়স্থ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	রামেশ্বর মুন্ডোফী চাকলা ফতেহপুরের ৮ আনা অংশ প্রাপ্ত হন এবং স্থায়ী জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।

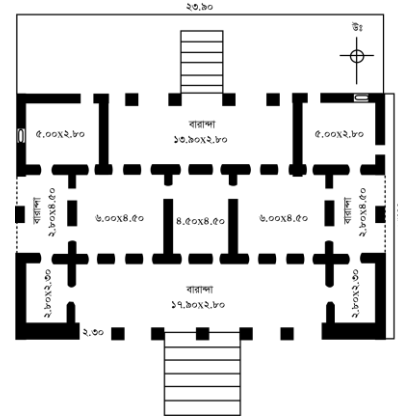
জমিদার বংশ	উৎপত্তি	বর্ণ	স্থায়ী/অস্থায়ী	জমিদারির ধরণ	মন্তব্য
					করেন, যা বামনডাঙ্গা জমিদার নামে খ্যাত। প্রসঙ্গত তার জমিদারি ডালপুর, রংপুর, সাদুল্লাহপুর ও বড়বাড়ি ব্যাপী বিস্তৃত ছিল।
মহুনা (২ আনা ফতেহপুর)	বরেন্দ্রীয়	ব্রাহ্মণ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	জনৈক অনন্তরাম কোচ মহারাজা রূপনারায়ণের (১৭০৪-১৭১৪) অধনস্থ একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, মোগল-কোচ যুদ্ধে তিনি মোগলদের পক্ষাবলম্বন করেন এবং প্রতিদানস্বরূপ রংপুরের পীরগাছা এলাকায় একটি ছোট তালুক লাভ করেন। মহুনা জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ অনন্তরাম পীরগাছায় যে জায়গির লাভ করেন তাই এ জমিদারির বংশের আয়ের একমাত্র উৎস।
ডিমলা	উড়িষ্যা	কায়স্থ	স্থায়ী	ব্রিটিশ জমিদারি (ইজারাসূত্রে)	হররাম সেন এ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রসঙ্গত তিনি নবাব আলীবর্দীর সময় ডিমলা এলাকার রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে তিনি দেবীসিংহের সহকারী ইজারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১৭৭০-১৭৮৩)। ১৭৯৩ সালে হররাম সেনের পুত্র রামজীবনের নামে ডিমলা জমিদারি বন্দোবস্ত দেয়া হয়।
তাজহাট	পাঞ্জাবি (শিখ)	ক্ষত্রিয় (জৈন)	স্থায়ী	ব্রিটিশ জমিদারি (ক্রয়সূত্রে)	এ বংশের প্রথম পুরুষ মান্নালাল রায় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভাগ্যাবেষে মাইগঞ্জ এসে বসতি গড়ে তোলেন। তিনি জহুরী (হীরা-জহরত ব্যবসায়ী) হিসেবে জীবনযাপন শুরু করেন। তিনি লাভের টাকায় রংপুর এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক খরিদ করে এ জমিদারি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে পৌত্র ধনপত রায় উত্তরাধিকারী সূত্রে এর মালিক হন।
নলডাঙ্গা	রাঢ়ীয়	ব্রাহ্মণ	স্থায়ী	কোচ জমিদারি	কোচবিহার মহারাজার খাসনবিস কাশীনাথ লাহিড়ী (১৭৭৩-১৭৮৪) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রংপুরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত নলডাঙ্গায় এ জমিদার বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
বাহারবন্দ (উলিপুর)	রাঢ়ীয়	তিলি	অস্থায়ী	ব্রিটিশ জমিদারি (ইজারাসূত্রে)	মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা কান্তনন্দী (১৭৭২-১৭৯৩) তৎকালীন রংপুর জেলার বাহারবন্দ পরগণায় (কুড়িগ্রাম-উলিপুর) এ জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বাহারবন্দ পরগণা নাটোরের রাণীভবানীর জমিদারিভুক্ত হয়।
মাইগঞ্জ গিরি গোসাঞী এস্টেট	বিহার (উত্তর ও দক্ষিণ ভারত)	গিরি সন্যাসী	স্থায়ী	দেবোত্তর এস্টেট	বিহার অথবা উত্তর কিংবা দক্ষিণ ভারত থেকে আগত শিতলগিরি নামক জনৈক গিরি সন্ন্যাসী বর্তমান নীলফামারী জেলার গয়াবাড়িতে ১১৪০ বঙ্গাব্দে (১৭৩৩-১৭৩৪) শিতলেশ্বর শিব দেবোত্তর এস্টেটের (মাইগঞ্জ গিড়ি গোসাঞী এস্টেট) পত্তন করেন।

জমিদার বংশ	উৎপত্তি	বর্ণ	স্থায়ী/অস্থায়ী	জমিদারির ধরণ	মন্তব্য
পায়রাবন্দ	মধ্যএশীয়া	মুসলমান	স্থায়ী	তালুকদারী	শেখ (মুন্সী) মুহাম্মদ রেজা আবু কুতুব উনিশ শতকের প্রারম্ভে পায়রাবন্দে এ জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। তার পূর্ব পুরুষগণ ইরানের তব্রিজ থেকে উত্তর ভারত এবং পরে বিহারের পূর্ণিয়া হতে পায়রাবন্দে এসে বসতি গড়ে তোলেন। এ পরিবারে এশিয়ার নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত বেগম রোকেয়া জন্ম গ্রহণ করেন।
দেওয়ানবাড়ি	বরেন্দ্রীয়	কায়স্থ	স্থায়ী	তালুকদারী (ক্রয়সূত্রে)	দেওয়ানবাড়ি জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ মজুমদার রংপুর কালেক্টরেটের সেরেস্তাদার ছিলেন (১৮২১-১৮২৭)। ১৮৪০ সালে তিনি বহু নতুন নতুন তালুক ক্রয় করে দেওয়ানবাড়ি জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি একাধারে আরবী, ফার্সি, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন।

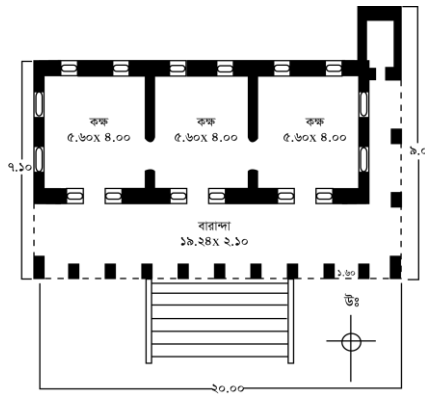
ভূমি নকশা ও রেখাচিত্র



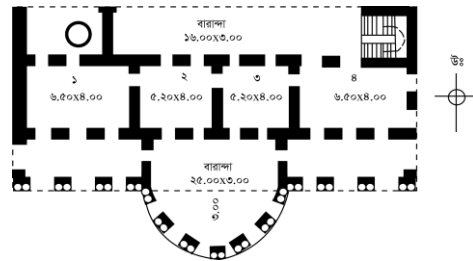
ভূমি নকশা-১ : তাজহাট জমিদারবাড়ি



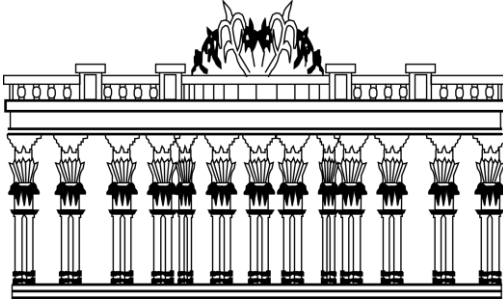
ভূমি নকশা-২ : মছনা জমিদারবাড়ি



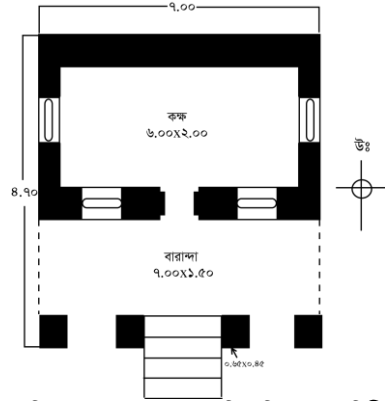
ভূমি নকশা-৩ : মছনা জমিদারির খাজাঞ্চিখানা



ভূমি নকশা-৪ : মছনা জমিদারির কাছারিবাড়ি



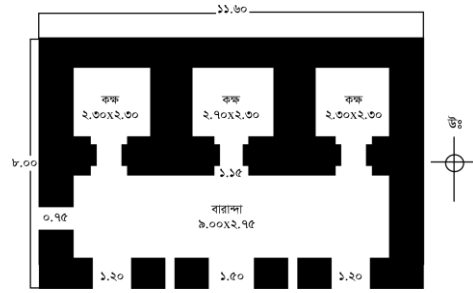
রেখাচিত্র-১ : মহানা জমিদারবাড়ির কাছারিঘরের সম্মুখ চিত্র (elevation view)



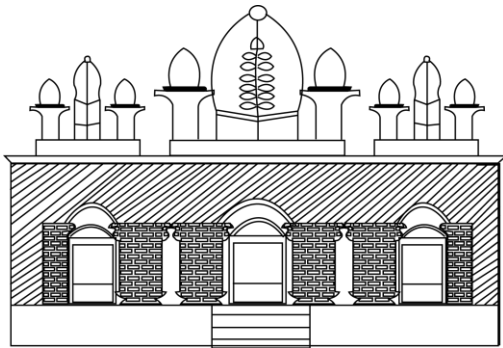
ভূমি নকশা-৫ : মহানা জমিদারির ভবতারিণী কালিমন্দির



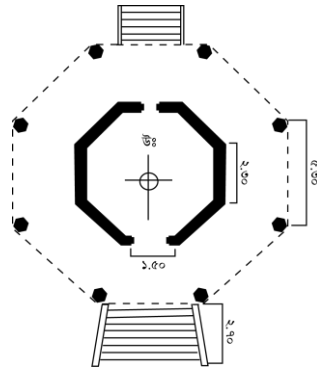
রেখাচিত্র-২ : ভবতারিণী কালিমন্দিরের সম্মুখ চিত্র (elevation view)



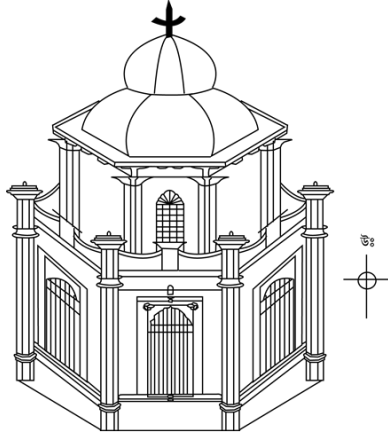
ভূমি নকশা-৬ : মহানা জমিদারির ত্রিবিহু মন্দির



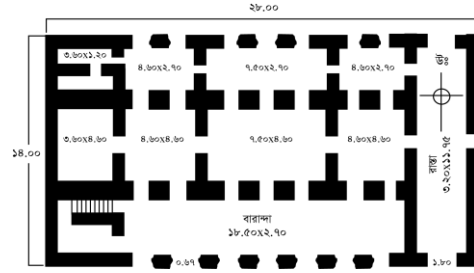
রেখাচিত্র-৩ : ত্রিবিহু মন্দিরের সম্মুখ চিত্র (elevation view)



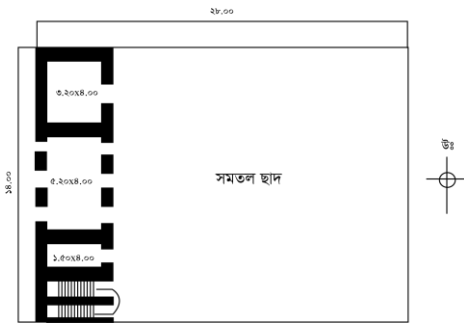
ভূমি নকশা-৭ : ডিমলা কালিমন্দির



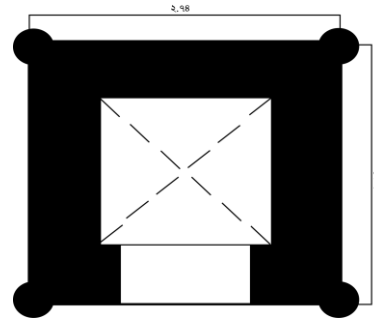
রেখাচিত্র-৪ : ডিমলা কালিমন্দিরের সম্মুখ চিত্র
(elevation view)



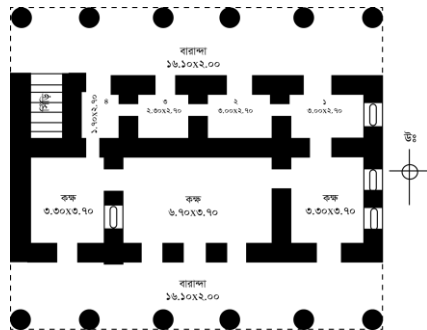
ভূমি নকশা-৮ : ইটাকুমারী জমিদারবাড়ি (নীচতলা)



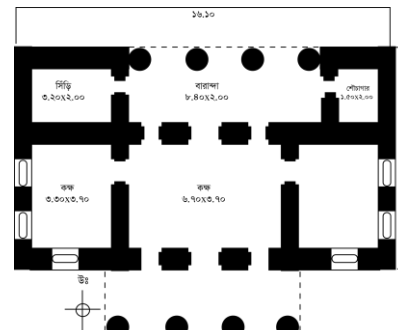
ভূমি নকশা-৯ : ইটাকুমারী জমিদারবাড়ি (দ্বিতীয়তলা)



ভূমি নকশা-১০ : হনমানজি মন্দির



ভূমি নকশা-১১ : দেওয়ান জমিদারবাড়ি (নীচতলা)



ভূমি নকশা-১১ : দেওয়ান জমিদারবাড়ি (দ্বিতীয় তলা)

আলোকচিত্র



আলোকচিত্র-১ : তাজহাট জমিদারবাড়ির সম্মুখদৃশ্য



আলোকচিত্র-২ : তাজহাট জমিদারবাড়ির সেগমেন্টাল ও বৃত্তাকার খিলান



আলোকচিত্র-৩ : মছনা জমিদারবাড়ির সম্মুখদৃশ্য



আলোকচিত্র-৪ : ভবতারিনী মন্দির



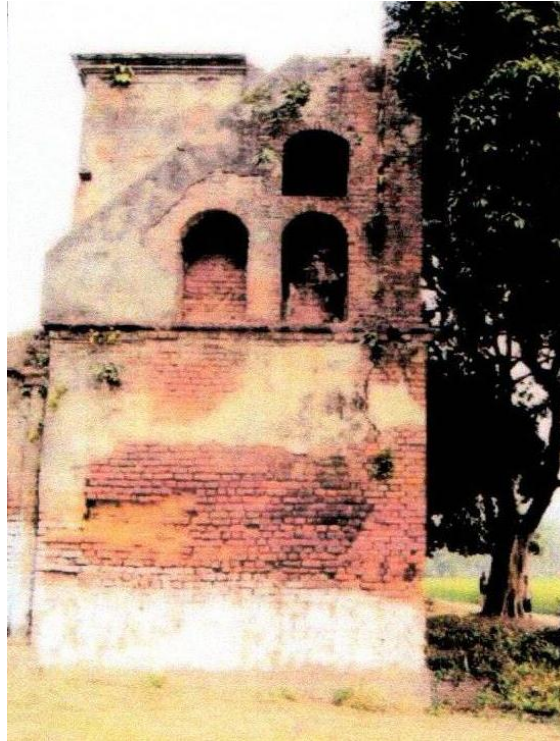
আলোকচিত্র-৫ : ত্রিবিহু মন্দির



আলোকচিত্র-৬ : ডিমলা কালিমন্দিরের সাধারণদৃশ্য



আলোকচিত্র-৭ : ইটাকুমারী জমিদারবাড়ি



আলোকচিত্র-৮ : ইটাকুমারী জমিদারবাড়ি বাতি প্রজ্জ্বলনের কুঠরী



আলোকচিত্র-৯ : হনুমানজি মন্দিরের সম্মুখদৃশ্য



আলোকচিত্র-১০ : গোসাঞীবাড়ি কালিমন্দির



আলোকচিত্র-১১ : দেওয়ান জমিদারবাড়ির সম্মুখদৃশ্য



আলোকচিত্র-১২ : দেওয়ান জমিদারবাড়ির মূল ফটক

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ Muhammad Maniruzzaman, *Zamindars of Bengal : A Case Study of Selected Rangpur Zamindars* (1793-1950), (Dhaka: Gatidhara, 2012), p. 1.
- ^২ *Ibid*, p. 29.
- ^৩ Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society* (C1760-1850), (New Delhi: Monohar Publication, 1979), pp. 136 & 213.
- ^৪ A. M. Serajuddin, *The Revenue Administration of the East-India Company in Chittagong* (1761-1785), (Chittagong: University of Chittagong, 1971), Appendix-E.
- ^৫ সংস্কৃত মূল শব্দ কায় (দেহ)-এর সঙ্গে 'ছ' ধাতু সংযোজনে কায়স্থ শব্দের উৎপত্তি এবং কায়স্থ বলতে বর্ণশ্রম অনুসারে শূদ্র বর্ণের বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষকে মনে করা হয়। আবার সংস্কৃত মূল ধাতু ব্রক্ষণ-এর সাথে 'অ' প্রত্যয় যোগে ব্রাক্ষণ শব্দটি গঠিত। হিন্দুশাস্ত্র মতে উচ্চবর্ণের লোক বা আর্যদের চার জাতির প্রথম শ্রেণির বর্ণ হলো ব্রাক্ষণ।
- ^৬ মোঃ মাহবুবুর রহমান, “বাংলার রাজা বা জমিদার শ্রেণী : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা”, *গবেষণা পত্রিকা* (কল্যাণ অনুষদ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৭-৯৮, পৃ. ১৮৭; কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *রাজশাহী জমিদারদের প্রাসাদ-স্থাপত্য* (১৭৯৩-১৯৫০), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯), পৃ. ৩১।
- ^৭ সম্রাট আকবরের শাসনামলে সমগ্র বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করা হয়, যেগুলো হলো পুর্ণিয়া, তাজপুর, পিঞ্জারা, ঘোড়াঘাট, জাল্লাতাবাদ, বারবকাবাদ, বজুহা, শ্রীহট্ট, উদম্বর, মান্দারণ, মাহমুদাবাদ, ফতেহবাদ, সোনারগাঁও, শরীফাতাবাদ, সোলায়মানাবাদ, খলিফাতাবাদ, সাতগাঁও, বাকলা ও চাটগাঁও। দেখুন- এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *সরকার ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও স্থাপত্যকীর্তি* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২৩), ১০২, মানচিত্র-৩.১।
- ^৮ W. W. Hunter, *Statistical Account*, vol. VII (London: Trubner & Com., 1876), p. 310.
- ^৯ Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963), p. 79.
- ^{১০} মোয়াজ্জেম হোসেন (সম্পা.), *রংপুর জেলার ইতিহাস* (রংপুর: জেলা প্রশাসন, ২০০০), পৃ. ৪০৫।
- ^{১১} Muhammad Maniruzzaman, *op. cit.*, p. 29.
- ^{১২} E. G. Glazier, *A Report on the District of Rungpore* (Calcutta: Calcutta Central Press Company, 1873), p. 36; W. W. Hunter, *op. cit.*, vol. VII, p. 318.
- ^{১৩} Mohammad Maniruzzanan, *op. cit.*, p. 49.
- ^{১৪} J. A. Vas, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers Rangpur* (Allahabad: The Pioneer Press, 1911), p. 152.
- ^{১৫} জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, *বংশ পরিচয়*, ৩য় খণ্ড (কলকাতা: লেখক: ১৩২৮-১৩৪৫), পৃ. ১৩২।
- ^{১৬} J. A. Vas, *op. cit.*, p. 152.
- ^{১৭} Mohammad Maniruzzanan, *op. cit.*, p. 50.
- ^{১৮} মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *রংপুরের প্রাচীন ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (রংপুর: লেখক, ১৯৮৮), পৃ. ১০১।
- ^{১৯} Mohammad Maniruzzanan, *op. cit.*, p. 50.
- ^{২০} Najimuddin Ahmad, *Building of the British Raj in Bangladesh* (Dacca: University Press Ltd. 1986), p. 25.
- ^{২১} মো. নজরুল ইসলাম (সম্পা.), *আলোকচিত্রের ইতিহাস : রংপুর ও দিনাজপুর জেলা* (রংপুর: এরিয়া সদর দপ্তর, ২০০৮), পৃ. ১৮৬।
- ^{২২} মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যে বিকাশ* (রাজশাহী: প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাবি, ১৯৯৬), পৃ. ১৬৮।
- ^{২৩} মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃ. ৯৩-৯৪।
- ^{২৪} জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬০।
- ^{২৫} Mohammad Maniruzzanan, *op. cit.*, p. 40.
- ^{২৬} জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২।
- ^{২৭} মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃ. ৯৫।

-
- ^{২৮} সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পা), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬) পৃ. ৪৬-৪৭; সুপ্রকাশ রায়, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন* (কলকাতা: ডিএনবিএ ব্রাদার্স, ১৯৮০), পৃ. ১০৬।
- ^{২৯} J. A. Vas, *op. cit.*, p. 139.
- ^{৩০} মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃ. ৭৪।
- ^{৩১} জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮-৮৯।
- ^{৩২} J. A. Vas, *op. cit.*, p. 139.
- ^{৩৩} মো: মহিবুল ইসলাম, “মাহিগঞ্জের ইতিবৃত্ত : ঐতিহাসিক সমীক্ষা”, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি), সংখ্যা ২৭-২৮, পৃ. ৪৮।
- ^{৩৪} বাস্তব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উদাহরণটি গৃহীত।
- ^{৩৫} মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৬), পৃ. ১৩৪।
- ^{৩৬} *Jurisdiction List of Police Stations, District Rangpur*, p. 19.
- ^{৩৭} মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃ. ১৭৬।
- ^{৩৮} কাজী মো: মোস্তাফিজুর রহমান, পৃ. ১৮০।
- ^{৩৯} Mohammad Maniruzzanan, *op. cit.*, p. 61.
- ^{৪০} জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩ - ২৮৪।
- ^{৪১} Mohammad Maniruzzanan, *op. cit.*, p. 62.
- ^{৪২} *Ibid*; জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আরব বসন্তের প্রভাব [Impact of the Arab Spring on the Syrian Civil War]

ড. মো. ফজলুল হক*

[Abstract: Syria, officially the Syrian Arab Republic, is a nation in West Asia's Levant and Eastern Mediterranean regions. The only nation currently ruled by Ba'athists, who support Arab nationalism and socialism, is Syria. Syrian nationalism fosters the coexistence of various peoples by assuming a shared nationality that unites all of the region's religious groupings. There are two types of pan-Syrian nationalism: pure and pragmatic. Greater Syria is a fully fledged nation on its own, according to the pure form, which flatly rejects the notion of an Arab nation. Syrian nationalism may generally represent a mainstream trend, acknowledging that a Syrian may be innately Muslim or Sunni, Christian or Jewish. The civil war in Syria is a protracted battle with multiple sides, including both state-sponsored and non-state entities. March 2011: As part of the larger Arab Spring protests in the area, public dissatisfaction with Bashar al-Assad's government in Syria led to widespread protests and pro-democracy demonstrations. The Syrian insurgency began when armed rebel organizations like the Free Syrian Army started to develop across the nation following months of crackdown by the government's security forces. The situation had worsened into a full-fledged civil war by the middle of 2012.]

Keywords: Syrian, Greater Syria, Arab spring, Syrian Civil War, Nationalism, Ba'athists

১. ভূমিকা

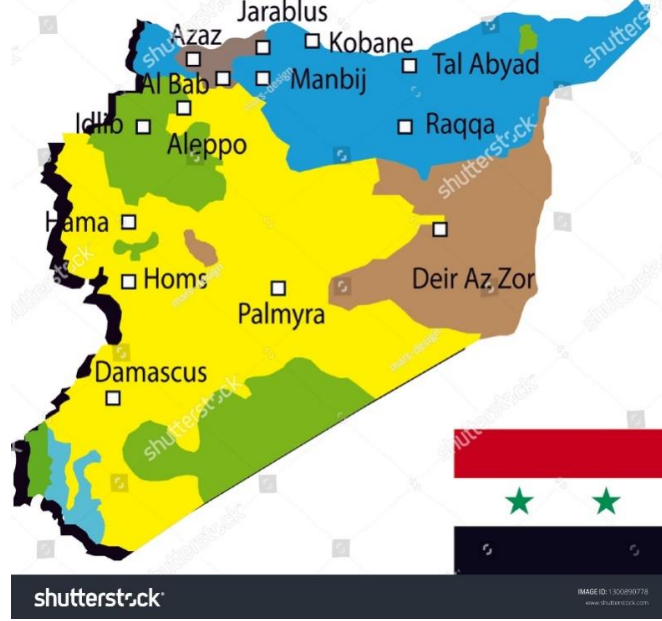
সিরিয়া আরব প্রজাতন্ত্র পূর্ব ভূমধ্যসাগর এবং লেভান্টে অবস্থিত পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ। এটি পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে তুরস্ক, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ইরাক, দক্ষিণে জর্ডান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ইসরাইল ও লেবানন দ্বারা বেষ্টিত। এটি একটি একক প্রজাতন্ত্র যা ১৪টি গভর্নরেট (উপবিভাগ) নিয়ে গঠিত। উর্বর সমভূমি, উচ্চ পর্বত এবং মরুভূমির একটি দেশ। সিরিয়া হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সিরিয়ান আরব, কুর্দি, তুর্কমেন, অ্যাসিরিয়ান, সার্কাসিয়ান^১, আর্মেনীয়, আলবেনীয়, গ্রিক এবং চেচেনসহ বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাসস্থান। ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম, খ্রিস্টান, আলাউইট, দ্রুজ এবং ইয়াজিদি অন্যতম। সিরিয়া জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং আরব লীগের সদস্য। রাজধানী দামেস্ক এবং বৃহত্তম শহর হোমস, লাতাকিয়া, হামা, দেইর ইজ-জোর এবং রাব্বা। আরবরা হলো বৃহত্তম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং সুন্নি মুসলমানরা বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী। সিরিয়া একমাত্র দেশ যারা বর্তমান বাথবাদীদের দ্বারা শাসিত এবং আরব সমাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষে।

২. পরিচিতি

সিরিয়া নামটি ঐতিহাসিকভাবে একটি বৃহত্তর অঞ্চলকে নির্দেশ করে, ব্যাপকভাবে লেভান্টের সমার্থক এবং আরবী ভাষায় আল-শাম নামে পরিচিত। আধুনিক রাষ্ট্রটি খ্রিস্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দের ইরান^২ সভ্যতাসহ বেশ কিছু প্রাচীন রাজ্য ও সাম্রাজ্যের স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করে। আলেক্সান্দ্রিয়া এবং রাজধানী শহর দামেস্ক বিশ্বের প্রাচীনতম ক্রমাগত বসবাসকারী শহরগুলোর মধ্যে একটি। দামেস্ক ছিল উমাইয়া (৬৬১-৭৫০) খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং মিসরের মামলুক সালতানাতের একটি প্রাদেশিক রাজধানী। আধুনিক সিরিয়া রাষ্ট্রটি ২০ শতকের মাঝামাঝি অটোমান শাসনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসি ম্যান্ডেট হিসেবে এর সময়কাল ১৯২৩-১৯৪৬। নব-সৃষ্ট রাষ্ট্রটি পূর্বে অটোমান শাসিত সিরিয়ার প্রদেশগুলো থেকে উদ্ভূত বৃহত্তম আরব

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতো। সিরিয়া প্রজাতন্ত্র একটি গণতান্ত্রিক সংসদীয় প্রজাতন্ত্র হিসেবে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫-এ স্বাধীনতা লাভ করে এবং জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে স্থান লাভ করে; যদিও ফরাসি সৈন্যরা ১৯৪৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সিরিয়ায় অবস্থান করে।



সিরিয়ার মানচিত্র

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সিরিয়ার রাজনীতি খুবই উত্তাল ছিল। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৯৫৮ সালে সিরিয়া মিসরের সাথে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র নামে একটি সংক্ষিপ্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করে, যা ১৯৬১ সালের সিরিয়ার অভ্যুত্থানের দ্বারা সমাপ্ত হয়। সেই বছরের ১ ডিসেম্বরের সাংবিধানিক গণভোটের পর ১৯৬১ সালের শেষ দিকে সিরিয়ার নামকরণ করা হয় ‘আরব প্রজাতন্ত্র অফ সিরিয়া’। ১৯৬৩ সালের এক অভ্যুত্থান আরব সমাজতান্ত্রিক বাথ পার্টির সামরিক কমিটি দ্বারা পরিচালিত একটি একদলীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এটি নাগরিকদের জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা কার্যকরভাবে স্থগিত করে ১৯৬৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জরুরি আইনের অধীনে সিরিয়া পরিচালনা করে। নব্য-বাথবাদী^৩ দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা-সংগ্রামের ফলে ১৯৬৬ এবং ১৯৭০ সালে আরও অভ্যুত্থান ঘটে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত জেনারেল হাফিজ আল-আসাদ ক্ষমতা দখল করেন। আসাদ সশস্ত্র বাহিনী, আমলাতন্ত্র, মুখাবরাত (সিরিয়ার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অনুগত অভিজাতদের নিয়োগ দেন এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য কার্যকরভাবে Alawi minority rule প্রতিষ্ঠা করেন।^৪

২০০০ সালে হাফিজ আল-আসাদের মৃত্যুর পর, তার ছেলে বাশার আল-আসাদ রাষ্ট্রপতি পদ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হন। ২০১১ সালের আরব বসন্তের প্রভাবে সিরিয়ায় যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা সহিংসতার সাথে দমন করা হয়। এর ফলে সিরিয়ার সরকারকে ২০২৩ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ১১ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে আরব লীগের সদস্য পদ থেকে স্থগিত করা হয়।^৫ সিরিয়া পরের মাসে ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যায়। জুলাই ২০১১ সাল থেকে সিরিয়া একটি বহুমুখী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

৩. সিরিয়ার জাতীয়তাবাদ

প্যান-সিরিয়ার জাতীয়তাবাদ সিরিয়া জাতীয়তাবাদ নামেও পরিচিত। সিরিয়ার অঞ্চল বা উর্বরচন্দ্র এলাকার সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সত্তা বৃহত্তর সিরিয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে অভিহিত। এটি আরব জাতীয়তাবাদের সাথে বিভ্রান্ত না হয়ে সিরিয়ার আরব প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতাসীন আরব সমাজতান্ত্রিক বাথ পার্টির সরকারী রাষ্ট্রীয় মতবাদ এবং

সিরিয়ান জাতীয়তাবাদ অপরিহার্যভাবে আধুনিক সিরিয়া বা তার সরকারের স্বার্থ প্রচার করে। ১৯৪৬ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত আধুনিক সিরিয়া লেভানটাইন অঞ্চলকে বোঝায়। লেভানটাইন হলো ভৌগোলিকভাবে ঐতিহাসিক একটি বৃহৎ এলাকা, যার অবস্থান ভূমধ্য অঞ্চলের পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত। অপর দিকে এটি বৃহত্তর সিরিয়ার ঐতিহাসিক অঞ্চলের সমতুল্য, যার মধ্যে বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরায়েল, ফিলিস্তিন এবং দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের বেশিরভাগ অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। লেভান্ট এর বিস্তৃত ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে তার দ্বীপগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অর্থাৎ এটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সমস্ত দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা গ্রীস থেকে পূর্ব লিবিয়ার সিরেনাইকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।^৬

সিরিয়ার জাতীয়তাবাদ ১৯ শতকের শেষ দিকে একটি আধুনিক চিন্তাধারা হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল নাহদা আন্দোলনের সাথে যা অটোমান শাসিত আরব বিশ্বকে আলোড়িত করে। বুট্রুস আল-বুস্তানি প্রথম সিরীয় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি মাউন্ট লেবাননে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যারোনাইট চার্চ থেকে তিনি প্রোটেস্ট্যান্টিজমে ধর্মান্তরিত হন। তিনি ১৮৬০ সালের মাউন্ট লেবানন গৃহযুদ্ধের পর বৈরুতে এই অঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র নাফির সুরিয়া শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯২০ সালে হাশেমীয় পরিবারের বাদশাহ ফয়সালকে (যাকে পরে ব্রিটেন ইরাকের বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়) সিরিয়া হতে বহিষ্কারের পর হতে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সিরিয়া ও লেবাননের ইতিহাস হলো ভয়াবহ দাঙ্গা আর বিদ্রোহের ইতিহাস। ম্যান্ডেটরি শাসনামলে সিরিয়া ও লেবাননের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যকার বিরোধের কারণগুলো নানাবিধ। ম্যান্ডেটরি শাসনের পূর্বে ও পরে মধ্যপ্রাচ্যের আরব অধ্যুষিত যেকোন অঞ্চলের তুলনায় সিরিয়া ও লেবাননের জাতীয়তাবাদ ছিল প্রবল শক্তিশালী। সিরিয়া লেবাননী জাতীয়তাবাদী গোপন সংস্থাগুলোর নেতৃবৃন্দই ফয়সালের মাধ্যমে হোসেন-ম্যাকমেহন পত্রালাপের (Hussein-McMahon Correspondence) শর্তগুলো স্থির করে দেয়। বৃহত্তর সিরিয়ার গুপ্ত সমিতি ফাতাতই সর্বপ্রথম সম্মিলিত আরব রাজত্বের প্রস্তাব করে।^৭

তুর্কিদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই আরব জাতীয়তাবাদীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু তুর্কিদের কবল থেকে সিরিয়াবাসীকে মুক্ত করার এ প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের অবদান ছিল একেবারেই নগণ্য। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ বাহিনী ও আরব বাহিনী যখন তুর্কি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে দামেস্কে প্রবেশ করে তখন ব্রিটিশ বাহিনীর অংশ হিসেবে একটি ক্ষুদ্র ফরাসি সেনাদল এতে যোগ দেয়। সিরীয় জাতীয়তাবাদীদের মতে এ নগণ্য অবদানের জন্য সিরিয়ার ম্যান্ডেটরি শাসক হিসেবে নিযুক্ত হবার কোন অধিকার ফ্রান্সের নেই। জাতীয়তাবাদীদের এ মনোভাব ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধীতার অন্যতম কারণ ছিল। তুর্কি বাহিনীর নিকট হতে সিরিয়াকে মুক্ত করার পর আরব জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র ফয়সাল (শরীফ হোসাইনের পুত্র) সিরিয়ার অভ্যন্তরভাগে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। সিরিয়ায় ফয়সালের সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আগের চেয়ে জোরদার হয়ে উঠে। পুরনো গোপন জাতীয়তাবাদী সংস্থাগুলো প্রকাশ্যে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু অনতিকাল পরেই ফরাসি সেনারা অপমানজনকভাবে ফয়সালকে অপসারিত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। কোন দেশপ্রেমিক সিরিয়াবাসীর পক্ষে ফরাসি কর্তৃপক্ষের এ আচরণ সহজভাবে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না।

সিরিয়া-লেবাননী জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লীগ অব নেশনস কর্তৃক জার্মানি ও তার মিত্রদের কাছ থেকে বিজিত অঞ্চলগুলোতে যে ম্যান্ডেটরি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তা ঐ অঞ্চলের জনগণের অগ্রগতির পর্যায়, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিসহ আরো কিছু কারণে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন পূর্বতন ওসমানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ফিলিস্তিন ও ট্রান্সজর্ডান ছিল “এ” ক্যাটাগরির ম্যান্ডেটরি অঞ্চল। লীগ অব নেশনস এর সনদের ২২নং ধারানুযায়ী যেহেতু এ অঞ্চল “বি” ক্যাটাগরি (মধ্য আফ্রিকার বিজিত অঞ্চলসমূহ) এবং “সি” ক্যাটাগরিভুক্ত (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহ) অঞ্চলগুলোর তুলনায় অধিকতর অগ্রসর ছিল, সেহেতু এ অঞ্চলে ম্যান্ডেটরি শক্তির নিয়ন্ত্রণের মাত্রা হবে সীমিত। কেননা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে তাদের অগ্রগতি ছিল সন্তোষজনক। ম্যান্ডেটরি শর্তানুযায়ী সিরিয়াবাসীকে উপদেশ ও

সহযোগিতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের উপযোগী করে তোলাই ছিল ফ্রান্সের দায়িত্ব। কিন্তু ফ্রান্স এ এলাকায় যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছিল তার সাথে ফরাসি উপনিবেশগুলোতে স্থাপিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। লীগ অব নেশনসের ম্যান্ডেট ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার পরিবর্তে সিরিয়াকে একটি ফরাসি উপনিবেশে পরিণত করার এ প্রচেষ্টা সিরিয় জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ফরাসিদের ধর্ম বিষয়ক নীতিও সিরিয়াবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের সহায়তার জন্য ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বাকী ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে অধিক সুবিধা প্রদান করতো। এছাড়া লেবাননে ম্যারোনাইট খ্রিস্টানদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ফ্রান্সের ভূমিকা সিরিয়াবাসীর মনে ফরাসি মনোভাব গড়ে তুলেছিল। অপরদিকে আরব জাতীয়তাবাদীর উদ্দেশ্য ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র গঠন করা। কিন্তু ম্যান্ডেটের শাসনের শুরুতেই ফ্রান্স “বিভাজন ও শাসন” নীতি অনুসরণ করে বৃহত্তর সিরিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করাই যে এর উদ্দেশ্য তা বুঝতে সিরিয়াবাসীর কষ্ট হয়নি। এছাড়া বৃহত্তর লেবানন রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে সংযুক্ত নতুন এলাকায় সুন্নি ও শিয়া মুসলমানরা ফরাসিদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কেননা এর ফলে সংযুক্ত এলাকার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানদের দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার ভয়ে ভীত ছিল। পূর্বতন তুর্কি সাম্রাজ্যের এ মুসলমানরা ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। এই প্রথম তারা একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রের অধীনে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

১৯২১-১৯২২ সালের লোক গণনা অনুযায়ী লেবাননে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশ্য এ গণনায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। লেবাননের সরকার ব্যবস্থায় লোকসংখ্যার ধর্মীয় অনুপাত অনুযায়ী আসন বন্টিত হওয়ায় মুসলমানরা নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে। খ্রিস্টানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য ফরাসি কর্তৃপক্ষ লেবাননে খ্রিস্টানদের বিদেশ গমনের উপর কড়া কড়ি আরোপ করে এবং বিদেশি খ্রিস্টানদের লেবাননে বসবাসে উৎসাহিত করে। এ অবস্থায় সংযুক্ত এলাকার মুসলমানরা নিজেদেরকে সিরিয়ার অধিবাসী হিসেবেই মনে করতে থাকে এবং বিভিন্ন সময় সিরিয়ার সাথে সংযুক্তির দাবী জোরালোভাবে উপস্থাপন করে। এ নিয়ে ম্যান্ডেটের কর্তৃপক্ষের সাথে সিরিয় জাতীয়তাবাদীদের বিরোধ দেখা দেয়।

১৯৩০ সালে সম্পাদিত ইঙ্গ-ইরাকি চুক্তি এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩২ সালে ইরাকের লীগ অব নেশনসের সদস্যপদ লাভ সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী মহলকে আরো গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তারা সিরিয়ার জন্যও অনুরূপ একটি চুক্তি দাবি করতে থাকে। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সালে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে দুটি চুক্তি সম্পাদন করে। সিরিয়া ও লেবাননে চুক্তিটি ব্যাপক সাড়া জাগায়। সিরিয়ার সর্বত্র চুক্তিটি অভিনন্দিত হয়। এ সময় লাতাকিয়া এবং জাবাল আল দ্রুজ রাজ্য সিরিয়া রাজ্যের সাথে যোগ দেয়। আলেপ্পো পূর্বেই এ রাজ্যে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু চুক্তিটি ফরাসি পার্লামেন্টে অনুমোদন লাভ করেনি। ফলে সিরিয়া লেবাননের জনসাধারণ ফরাসি শাসনের প্রতি অধিক বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ফ্রান্স পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য সিরিয়া ও লেবাননে প্রত্যক্ষ শাসন চালু করে। সংবিধান মূলতুই ঘোষণা করা হয় এবং মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। যদিও প্রেসিডেন্ট তাঁর পদে বহাল ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না। যুদ্ধের প্রথম মাসেই ফ্রান্স জেনারেল ভেগার এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। উদ্দেশ্য ছিল যদি যুদ্ধ পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এ সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কিন্তু ১৯৪০ সালের জুন মাসে জার্মানি ফ্রান্স দখল করে নেয়ায় নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সিরিয়া-লেবানন ফ্রান্সের জার্মান প্রভাবিত মার্শাল পেতের নেতৃত্বে গঠিত ভিসি (Vichy) সরকারের অধীনে চলে যায়। জেনারেল ভেগার পরিবর্তে জেনারেল মিখেল হাওজার নিকট প্রাচ্যে ফরাসী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। অন্যদিকে যারা পঁতা সরকারের জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণমূলক নীতির সাথে একমত হতে পারেনি তারা চার্লস ডিগল (Charles de Gaulle) দ্যগলের নেতৃত্বে ব্রিটেনে একটি প্রবাসী সরকার গঠন করে ব্রিটিশ সরকার সিরিয়া লেবাননে জার্মানির প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়ে। জার্মানির নিকট প্রাচ্য বিষয়ক পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান Herr Van Henting নাৎসি প্রচারণার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় আসেন। ১৯৪১ সালের মে মাসে ইরাকে রশীদ আলী আল গিলানীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জার্মানি সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। সিরিয়ার লেবাননের জার্মান প্রভাবিত হাইকমিশনার জেনারেল ডেনজ এ কাজে জার্মানিকে সিরিয়া লেবাননের বিমান

বন্দরগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাপারে সিরিয়া লেবাননের ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের কাছে নিরপেক্ষতার আশ্বাস চেয়েও কোন সাড়া না পেয়ে অবশেষে সিরিয়া লেবাননে আক্রমণ করে। ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে স্বাধীন ফ্রান্স সরকারের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীও যোগ দেয়। আক্রমণের প্রাক্কালে স্বাধীন ফ্রান্স সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল কাত্রো সিরিয়া লেবাননে ম্যান্ডেটরি শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার এ ঘোষণার প্রতি ব্রিটিশ সরকার সমর্থন করে।

জার্মান প্রভাবিত ম্যান্ডেটরি শাসনের বিরুদ্ধে সিরিয়া-লেবাননবাসীর সমর্থন আদায় করাই ছিল এ ঘোষণার উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সালের জুন মাসে মিত্রবাহিনী ইরাক, ট্রান্স জর্ডান ও ফিলিস্তিন হতে সিরিয়া লেবাননে প্রবেশ করে দখল করে নেয়। ২৪ জুন জেনারেল কাত্রো সিরিয়া-লেবাননে স্বাধীন ফ্রান্স সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে জেনারেল কাত্রো শেখ তাজউদ্দিন আল-হাসানীকে প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করেন এবং আবাবো সিরিয়াবাসীর স্বাধীনতা স্বীকার করে একটি ঘোষণা প্রদান করেন। এ ঘোষণায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সিরিয়া যেসব অধিকার ভোগ করবে সেগুলো উল্লেখ করেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সিরিয়া বিশ্বের যে কোন দেশে তার রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করতে পারবে। যেসব দেশে সিরিয়া তার প্রতিনিধি প্রেরণ করবে না সেসব দেশে ফ্রান্সই সিরিয়ার স্বার্থ রক্ষা করবে। একটি সিরিয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে ফ্রান্স সর্ব প্রকার সহযোগিতা করবে। এ বাহিনী গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মিত্রবাহিনী সিরিয়ার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এ দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে সিরিয়া সরকার মিত্র শক্তিকে সিরিয়া ভূখণ্ড ও যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করবে। জেনারেল কাত্রো'র এ ঘোষণায় সিরিয় জাতীয়তাবাদীরা আশ্বস্ত হয়। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লেবাননে জাতীয়তাবাদীরা জয়লাভ করে এবং রিয়াদ আল মূলহের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ সরকার লেবাননের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানায়। ফরাসি সরকার মৌখিকভাবে সিরিয়া লেবাননের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও কার্যত সিরিয়া লেবানন তখনও পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি। যেমন স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের ছিল না। ফরাসি প্রতিনিধি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন পরিবর্তন বা বিলুপ্ত করে দিতে পারতেন। শুল্ক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, বেদুঈন নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব তখনও ফরাসী প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণে ছিল।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে নতুন ফরাসি প্রতিনিধি জ্যা হেলুর নিকট সিরিয়া ও লেবাননের সরকার একটি স্মারকলিপি পেশ করে। এ স্মারকলিপিতে উভয় সরকার সিরিয়া লেবাননের সংবিধান পরিবর্তন করে ম্যান্ডেটরি শাসনের অবসান এবং পূর্ণ প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের দাবি জানান। কিন্তু ফরাসি প্রতিনিধি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সার্বিক ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয় বলে জানান। তিনি আরো বলেন যে, ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননে ম্যান্ডেটরি শাসক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে লীগ অব নেশনস থেকে। তাই আইনগতভাবে লীগ অব নেশনস বা তার উত্তরসূরী কোন সংস্থার অনুমোদন ছাড়া সে এ দায়িত্ব অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারে না। যদি তা করতেই হয় তাহলে একটি চুক্তির মাধ্যমে সিরিয়া লেবাননকে ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ১৯৩৬ সালের চুক্তিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু হেলুর এ প্রস্তাব সিরিয়া লেবাননের জাতীয়তাবাদীরা প্রত্যাখ্যান করে। ফ্রান্সের এককালের একান্ত অনুগত লেবাননই প্রথম জবাবটি দেয়। নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে লেবাননের সংসদ একটি বিশেষ অধিবেশন আহবান করে সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান হতে ম্যান্ডেট সম্পর্কিত ধারাটি বাতিল করে এবং লেবাননের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা সন্নিবেশ করে। ফরাসি ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষার মর্যাদা দান বিষয়ক ধারাটি সংবিধান হতে বাদ দেয়া হয়। সিরিয়ার সংসদও ১৯৪৪ সালের ২৪ জানুয়ারি ম্যান্ডেট সম্পর্কিত সংবিধানের ১১৬ নম্বর ধারাটি বাতিল করে দেয়। উভয় দেশের সংসদ কর্তৃক গৃহীত এ ধরনের ফরাসি বিরোধী পদক্ষেপ ফরাসি প্রতিনিধি হেলুকে যারপর নাই ক্ষুব্ধ করে। তিনি লেবাননের সংবিধান বাতিল ও সংসদ স্থগিত করে দেন। প্রেসিডেন্ট বিশারা আল খুরীসহ মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যকে গ্রেফতার করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে বৈরুতসহ লেবাননের অন্যান্য শহরে ধর্মঘট পালিত হয় এবং ফরাসি সেনাদের সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। লেবাননের সর্বত্র জেনারেল গ্যালোর প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফরাসি কর্তৃপক্ষ কারফিউ জারি করে। শুধু সিরিয়া লেবাননেই নয়, ইরাক, মিসর ও

ফিলিস্তিনেও এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ব্রিটিশ সরকারও এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। কেননা যুদ্ধের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে স্বাধীনতা বজায় রাখা ছিল অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট বিশারা আল খুরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং সিরিয়া লেবাননে ফরাসি প্রতিনিধি জাঁ হেলুকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সুপারিশ করে। অন্যথায় ব্রিটিশ সামরিক হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়া হয়। বাধ্য হয়ে ফরাসী সরকার হেলুর বদলে জেনারেল কাত্রোকে আবারো ফরাসি প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়। গ্রীষ্মকালকৃতদের মুক্তি দিয়ে তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাস হতেই শুষ্ক বিভাগসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো সিরিয়া ও লেবানন সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসতে থাকে। তবে ফরাসি সরকার পুরোপুরিভাবে সিরিয়া লেবাননের উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে রাজী ছিল না। সিরিয়া লেবাননের সাথে ফ্রান্স ১৯৩৬ সালের চুক্তির অনুরূপ একটি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে, যার মাধ্যমে দেশ দুটিতে স্বাধীনতার পরও ফরাসি প্রভাব বজায় রাখা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে সিরিয়া ও লেবাননবাসীর মধ্যে যে মানসিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তাকে একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত করা সম্ভব ছিল না। এ বাস্তবতাটি ফরাসি কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সিরিয়া লেবাননকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করানোর নীতি গ্রহণ করে। বৈরুতে ফরাসি সেনা অবতরণ শুরু হয়। জেনারেল বিয়া প্যারিস হতে চুক্তির একটি খসড়া নিয়ে আসেন। কিন্তু সিরিয়া ও লেবাননের সরকার এ চুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আবারো দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে ফরাসি সরকার। কিন্তু এতে আন্দোলন স্তিমিত না হয়ে আরো বেগবান হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সিরিয়া লেবাননের সরকার প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সিরিয়া ও লেবাননকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ উভয় দেশই আরব লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আরব লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই মাসে রাষ্ট্র দুটি মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু তারপরও উভয় দেশকেই একটি সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও ইঙ্গ-ফরাসি সেনাবাহিনী তখনো সিরিয়া লেবাননে অবস্থান করছিল। যে কোন স্বাধীন দেশের জন্য তা ছিল অস্বস্তিকর। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রমে ক্রমে সৈন্য প্রত্যাহারের ইঙ্গ-ফরাসি ঘোষণা সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তোলে। সিরিয়া-লেবাননবাসী ক্রমে ক্রমে সৈন্য প্রত্যাহারের এ ঘোষণার দীর্ঘসূত্রিতার আভাস পায়। ১৯৪৬ সালের মে মাসে উভয় দেশের সরকার বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। নিরাপত্তা পরিষদে যত দ্রুত সম্ভব সিরিয়া লেবানন হতে সকল বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়ার একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু প্রস্তাবটিতে কোন সময় সীমা উল্লেখ না থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়, ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। প্রস্তাবটি পাস না হলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স এ প্রস্তাব অনুযায়ী সিরিয়া লেবানন হতে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে। ১৯৪৬ সালের ১৭ এপ্রিল সিরিয়া থেকে এবং ৩১ ডিসেম্বর লেবানন হতে শেষ বিদেশি সৈন্য অপসারিত হয়। ফলে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে ১৭ এপ্রিল সিরিয়ার এবং ৩১ ডিসেম্বর লেবাননের আত্মপ্রকাশ করে।

৪. সিরিয়ার সরকার ব্যবস্থা

সিরিয়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ১৪টি গভর্নরেট, ৬১টি জেলা এবং আরও উপ-বিভাগে বিভক্ত। সিরিয়ার রাজনীতি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের কাঠামোয় সজ্জাচিত হয়। রাষ্ট্রের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি এবং বাথ পার্টির হাতে ন্যস্ত। সিরিয়া সংবিধানমতে একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র হলেও ১৯৬৩ সাল থেকে দেশটিতে একটি জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এবং বর্তমানে সরকার পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা নেই জনগণের। দেশটি তাই কার্যত একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সিরিয়ার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হাফিজ আল-আসাদ পাঁচ বার গনভোট বিজয়ের মাধ্যমে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। তার ছেলে ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি বাশার আল-আসাদও ২০০০ সালের এক গনভোটে সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে বহাল হন। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মূল সহযোগীরাই, বিশেষত সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী সিরিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে।

সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। এই সংখ্যা জাতিসংঘ ঘোষিত সংখ্যার দ্বিগুণ। এর বাইরে বাস্তবায়িত হয়েছে ৪৫ শতাংশ সিরীয়। সিরিয়া যুদ্ধে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সিরিয়ান সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের (এসসিপিআর)' একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুদ্ধের বিভিন্নিকায় পড়ে সিরিয়ার জাতীয় সম্পদ ও অবকাঠামো প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। 'আরব বসন্ত' নামে পরিচিত স্বৈরাচারবিরোধী তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ার সিরিয়াতেও এসে লাগে ২০১১ সালে। ওই বছরের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছরে এই জোয়ারের সুফল না মিললেও এই সময়ে হতাহত হয়েছে বিরাটসংখ্যক জনগোষ্ঠী। প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট করে আহত ব্যক্তির সংখ্যা বলা হয়েছে ১৯ লাখ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ২০১০ সালে সিরিয়ার মানুষের গড় আয়ু যেখানে ছিল ৭০ বছর, সেটাই ২০১৫ সালে নেমে দাঁড়ায় ৫৫ বছর ৪ মাসে। দেশটির অর্থনীতির সার্বিক ক্ষতির পরিমাণও নিতান্ত কম নয়, আনুমানিক ২৫ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। এসসিপিআরের মতে, নিহত ৪ লাখ ৭০ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ৪ লাখই মারা গেছে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সহিংসতার শিকার হয়ে। বাকি ৭০ হাজার মারা গেছে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধের ঘাটতিতে, সংক্রামক ব্যাধিতে, খাবার ও পানির অভাবে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ২০১০ সালে শুরু হওয়া আরব বসন্তের বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সিরিয়ান সেনার একটি কঠোর ব্যবস্থার দ্বারা অনুসৃত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের একটি চেইন হিসেবে ২০১১ সালে শুরু হয়। জুলাই ২০১১ সালে সেনাবাহিনীর দলত্যাগীরা ফ্রি সিরিয়ান সেনা গঠনের ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধ ইউনিট গঠন শুরু হয়। এই বিরোধিতা সুন্নি মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্লোবাল পিস ইনডেক্স ২০১৬-তে বিশ্বের সবচেয়ে অশান্ত দেশ সিরিয়া। বিগত কয়েক বছর ধরে সিরিয়ায় তাগুব চালাচ্ছে আইএস জঙ্গিরা। এ কারণে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন জঙ্গিদের হাতে বা আইএস বিরোধী অভিযানে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও বেশ উদ্বেগজনক।^৮

৫. সিরিয়ায় আরব বসন্ত

২০১১ সালের সিরিয়ার বিদ্রোহ ছিল জাতীয় মর্যাদার বিপ্লব। আরব বসন্তের অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হওয়া এই বিপ্লব পরবর্তিতে সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের আন্দোলন হিসেবে রূপলাভ করে। ২৮ জুলাই ২০১১ পর্যন্ত স্থায়ী এই আন্দোলন আরব বিশ্বের বৃহত্তর আরব বসন্তের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়।^৯ ২০১১ সালের জানুয়ারিতে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে এই বিদ্রোহ প্রাথমিকভাবে ছোটখাটো বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত হয়। পর্যায়ক্রমে বিক্ষোভ চলতে থাকে, যা মার্চ মাসে ব্যাপক বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। অভ্যুত্থানটি বাশার আল-আসাদের বাথবাদী শাসনের বিরুদ্ধে। সরকার বিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অসংখ্য লোক হতাহত হয়।

বাশার আল-আসাদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, সেনা মোতায়েন এবং বিক্ষোভ দমন করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এপ্রিলের শেষের দিকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিক্ষোভকারী এবং বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অসংখ্য বিরোধী মিলিশিয়ার উত্থান এবং সিরিয়ান সেনাবাহিনী থেকে ব্যাপকভাবে দলত্যাগ করতে থাকে, ফলে এ আন্দোলন ধীরে ধীরে সংঘাতকে জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। ফলে এ সশস্ত্র বিদ্রোহকে দমন করার জন্য বাশার আল-আসাদ ২৯ জুলাই ২০১১ সালে The Free Syrian Army (FSA) গঠন করেন। মূলত বাশার আল-আসাদ, তাঁর পরিবার এবং জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এ বাহিনী গঠন করা হয়। ব্যাপক বিক্ষোভ এবং সহিংস কঠোর অবস্থানের মাধ্যমে প্রতিবাদকারীরা আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং সহযোগিতা পেতে সমর্থ হয়। অক্টোবর-নভেম্বরে (২০১১) গৃহযুদ্ধ আরও জোরদার হয়। বিক্ষোভগুলো কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করা হয়, যার ফলে উত্তর এবং পশ্চিম সিরিয়ার বিক্ষোভকারীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সরকার বিক্ষোভকারীদের উপর আক্রমণ করার জন্য সাম্প্রদায়িক 'শাবিহা' ডেথ স্কোয়াড মোতায়েন করে। আত্মসী দমন সত্ত্বেও ছাত্র ও যুবকদের বিক্ষোভ ও দাঙ্গা অব্যাহত ছিল।

নজিরবিহীন সহিংসতা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল (UNHRC) ২৯ এপ্রিল একটি জরুরি অধিবেশন আহ্বান করে এবং সিরিয়ায় নৃশংসতার মাত্রা তদন্তের জন্য একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনকে দায়িত্ব দেয়। কমিশনের তদন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সিরিয়ার আরব সেনাবাহিনী,

গোপন পুলিশ এবং বাথবাদী আধাসামরিক বাহিনী গণহত্যা, জোরপূর্বক গুম, বিচার বহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড, শো-ট্রায়াল, নির্যাতন, গুলিহত্যা, নিপীড়ন এবং হাসপাতাল থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অপহরণ ইত্যাদিতে জড়িত ছিল এবং সরকারের পক্ষ থেকে 'শুট টু কিল' নীতি পরিচালিত হতো। ১৮ আগস্টে প্রকাশিত UNHRC রিপোর্টে বলা হয় যে এ নৃশংসতা 'মানবতা বিরোধী অপরাধ' হিসাবে গণ্য করা হয় এবং হাইকমিশনার নাভি পিল্লাই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদেরকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বাশার আল-আসাদের বিচার করার জন্য আহ্বান জানান। ২২ আগস্ট UNHRC কর্তৃক আহ্বান করা দ্বিতীয় জরুরি অধিবেশনে আসাদ সরকারের নৃশংসতার নিন্দা করা হয় এবং সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। সেই সাথে সিরিয়ার সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। বহু দেশ বাশার আল-আসাদের পদত্যাগ দাবি করে।^{১০}

আরব বসন্তের সূচনা

আরব বসন্তের সূচনায় বাথবাদী সিরিয়াকে আরব বিশ্বের সবচেয়ে পুলিশ নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেখানে বেসামরিক নাগরিক, স্বাধীন সাংবাদিক এবং অন্যান্য অননুমোদিত ব্যক্তিদের চলাচলের উপর একটি কঠোর প্রবিধান ছিলো। রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডারস সিরিয়াকে ২০১০ সালের প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ৬তম নিকৃষ্ট দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। ২০১১ সালের মার্চের মাঝামাঝি সিরিয়ায় অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আগে, আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতার বিবেচনায় এখানে বিক্ষোভগুলো তুলনামূলকভাবে স্তিমিত ছিল। মূলত গুলি পুলিশ কর্তৃক নেতৃস্থানীয় বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের গ্রেফতার করার কারণে সাধারণ জনগণ অতি মাত্রায় ভীত ছিলো। এ কারণে ২০১১ সালের মার্চ অবধি সিরিয়ায় সাধারণ জনগণের বিক্ষোভ প্রসারিত হয়নি।

সিরিয়ার সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরাকি সংঘাত (২০০৩-বর্তমান) দ্বারা সৃষ্ট অর্থ-সামাজিক চাপ, সেইসাথে এই অঞ্চলে সর্বকালের রেকর্ড করা তীব্র খরা। কয়েক দশক ধরে সিরিয়ার অর্থনীতি, সেনাবাহিনী এবং সরকার পরিচালনা করতো মূলত বাথ পার্টির অভিজাত শ্রেণী এবং আসাদ পরিবারের অনুগত 'আলাওয়াইট' শিয়াদের পৃষ্ঠপোষকরা। আসাদ রাজবংশ সিরিয়ার অর্থনীতির ওপর দৃঢ় দখল রেখেছিল এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি ছিলো চরম পর্যায়ে। ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিকে দুর্নীতির চরম অবস্থা নিয়ে বাথ পার্টির সংশ্লিষ্টদের এবং বৃহত্তর জনসাধারণের মাঝে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি এবং ব্যাপক ঘুষ-বাণিজ্য রাজনৈতিক দল, আমলা এবং সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান ছিল—এসবই জনগণের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করে, যার ফলশ্রুতিতে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।

সরকারকে সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে ছোটখাটো বিক্ষোভ জানুয়ারিতে শুরু হয়ে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। একই সময়ে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে কায়রোতে ব্যাপক বিক্ষোভ চলে এবং সিরিয়ায় ৩ ফেব্রুয়ারি ফেসবুক, টুইটার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাশার আল-আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা ৪ ফেব্রুয়ারি একটি 'ক্রোধ দিবস' আহ্বান করে, এটি যদিও কোনো আন্দোলনে রূপ নেয়নি।

নাগরিক বিদ্রোহ নামে খ্যাত সিরিয়ার দক্ষিণের শহর দারাতে^{১১} সিরিয়ান বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়।^{১২} এই শহরে ৬ মার্চ সরকার বিরোধী পোস্টার লেখার জন্য বিশিষ্ট পরিবারের ১৫ জন তরুণ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে ব্যাপক নির্যাতন করা হয়। এর ফলে সেখানে বিক্ষোভ ত্বরান্বিত হয়। সরকার বিরোধী লেখাটি ছিলো 'জনগণ শাসনের পতন চায়'।^{১৩} এটি আরব বসন্তের একটি ট্রেডমার্ক প্লোগান।^{১৪} তরুণ সমাজ সরাসরি বাশার আল-আসাদের দিকে ইঙ্গিত করে স্প্রের মাধ্যমে আঁকে "আপনার পোষা, ডাক্তার"। নিরাপত্তা বাহিনী কথিত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে এবং এক মাসেরও বেশি সময় ধরে তাদের আটকে রাখে। এর প্রতিবাদে দারায় বড় আকারের বিক্ষোভ শুরু হয় যা দ্রুত অন্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সিরীয় আরব সেনাবাহিনীকে শীঘ্রই বিক্ষোভে গুলি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। স্থানীয়দের নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং দারাকে সরকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে যা সিরিয়ার প্রদেশগুলোর মধ্যে প্রথম বিপ্লব।

সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় ছেলেদের আক্রমণ করা হয়নি এবং এক্ষেত্রে কাতার বেশিরভাগ বিক্ষোভকে উস্কে দিয়েছে। লেখক এবং বিশেষক লুই আল-হুসেন সেই সময়ে চলমান আরব বসন্তের উল্লেখ করে লিখেছেন, "সিরিয়া এখন এই অঞ্চলের দেশগুলোর মানচিত্রে একটি অভ্যুত্থানের নাম"^{১৫}। বিক্ষোভকারীরা স্থানীয় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ১৮ মার্চ শুক্রবারের নামাজের পর সংঘর্ষ বাড়তে

থাকে। ২০ মার্চ নিরাপত্তা বাহিনী ওমারি মসজিদে জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের উপর জল কামান এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে আক্রমণ করে, সেইসঙ্গে গুলি করে চারজনকে হত্যা করে।^{১৬} একদল জনতা বাথ পার্টির সদর দপ্তর এবং বিভিন্ন পাবলিক ভবন পুড়িয়ে দেয়। নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, ভিড়ের উপর গোলাবারুদ নিক্ষেপ করে এবং বিক্ষোভের কেন্দ্রিয় নির্দেশদাতাদের উপর আক্রমণ করে। দুই দিনের হামলার ফলে সাতজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং পনের জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়।^{১৭}

এদিকে, দেশের অন্যত্র ছোটখাটো বিক্ষোভ চলতে থাকে। বিক্ষোভকারীরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সিরিয়ার ৪৮-বছরের জরুরি আইনের বিলুপ্তি, পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং সরকারি দুর্নীতির অবসানের দাবি জানায়। বানিয়াস, দামেস্ক, আল-হাসাকাহ, দারা, দেইর আজ-জোর এবং হামাসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে বড় আকারের বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ১৮ মার্চ দিনটি একটি ‘মর্যাদাকর শুক্রবার’ হিসেবে পরিচিতি পায়। বিক্ষোভের জবাবে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, জলকামান ব্যবহার ও মারধর করে বিক্ষোভকারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এ বিক্ষোভে অন্তত ৬ জন নিহত এবং অনেক আহত হয়।^{১৮}

২৩ মার্চ, মাহের আল-আসাদের নেতৃত্বে ভয়ঙ্কর চতুর্থ ডিভিশনের ইউনিটগুলো দারায় একটি সুন্নি মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে হামলা চালায়। এ হামলায় পাঁচজন বেসামরিক লোক নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে একজন চিকিৎসকও ছিলেন যিনি আহতদের চিকিৎসা করছিলেন। এ রক্তাক্ত ঘটনায় প্রদেশটিতে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার পরের দিন ট্যাক্স কমানো এবং বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে বিক্ষোভকে প্রশমিত করার চেষ্টা করে। ২৫ মার্চ হাজার হাজার মানুষ নিহতদের জানাজায় অংশগ্রহণ করে শ্লোগান দেয় “আমরা আপনার রুটি চাই না, আমরা মর্যাদা চাই”। অনুষ্ঠান চলাকালীন হাফেজ আল-আসাদ এবং বাশার আল-আসাদের মূর্তি এবং বিলবোর্ড ভেঙে ফেলা হয়।^{১৯}

২৫ মার্চ বিক্ষোভকারীরা জুমার নামাজের পরে জমায়েত হয় এবং গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ২০ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়। প্রতিবাদ পরবর্তীতে হোমস, হামা, বানিয়াস, জাসিম, আলেক্সো, দামেস্ক এবং লাতাকিয়াসহ সিরিয়ার অন্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মোট ৭০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ৩০ মার্চ প্রদত্ত ভাষণে জনসাধারণের উদ্দেশে আসাদ বিক্ষোভকে “বিদেশী চক্রান্ত” হিসেবে নিন্দা করেন এবং গুলিবর্ষণের মাধ্যমে যারা নিহত হয়েছেন তাদের বর্ণনা করেন “জাতীয় স্থিতিশীলতার জন্য বলিদান” হিসাবে। এতে চারিদিকে ব্যাপক কান্নার রোল পড়ে যায়।

শ্রেফতারকৃতদের একজন প্রতিবাদকারী সাংবাদিকদের বলেন,

তিনি সংসদ সদস্যদের এক মিনিট নীরবতার জন্য দাঁড়াতে বলেননি এবং তিনি বলেছিলেন যে যারা নিহত হয়েছে তারা ত্যাগী শহীদ। কিন্তু এখানে দারায়, সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তাবাহিনী আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতক বা ইসরায়েলের এজেন্টের মতো আচরণ করে। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের সেনাবাহিনী যুদ্ধ এবং দখলকৃত গোলাবালি মুক্ত করবে, বেসামরিক লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য ট্যাক্স এবং হেলিকপ্টার পাঠাবে না।^{২০}

অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আগে সিরিয়ার সরকার অসংখ্য রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী এবং মানবাধিকার প্রচারকদের আসাদ সরকার সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে গ্রেপ্তার করে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক নেতা গাসান আল-নাজার, আব্বাস আব্বাস এবং আদনান মুস্তাফাসহ বেশ কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার করে। সরকারী বাহিনী বাথ পার্টি ভবনগুলোকে নিরাপত্তা বাহিনীকে সংগঠিত করার জন্য ব্যবহার করে এবং বিক্ষোভকারীদের উপর গুলির নির্দেশ দেয়। সরকার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর সরকারিভাবে গ্যাস-টু-কিল নীতি জারি করে। এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্যাস, ভারী মেশিনগান এবং বোমা ব্যবহার করা হয়। যে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দ্বিমত পোষণ করতেন বা নিজেদেরকে এসব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতেন তাদেরও পিছন থেকে বাথিস্ট আধাসামরিক বাহিনী এবং শাবিহা ডেথস্কোয়াড দ্বারা গুলি করা হতো।

পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী সহিংসভাবে বিক্ষোভের জবাব দেয়, জল কামান এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে সেইসাথে বিক্ষোভকারীদের শারীরিকভাবে মারধর করে এবং গুলি চালায়। সরকার প্রতিবাদকারীদের উপর হামলা চালানোর জন্য আলাউইট গ্রুপের অনুগতদের নিয়ে গঠিত ভয়ঙ্কর শাবিহা ডেথ স্কোয়াড মোতায়েন করে। এদেরকে সুন্নি বিক্ষোভকারীদের নির্যাতন এবং সুন্নি-বিরোধী বক্তব্য প্রচার করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং অফিসারদের অনেকে পদত্যাগ করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে।

বিদ্রোহ তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকলে সিরিয়ার সরকার গ্রেফতার অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে। বিদ্রোহের তীব্রতা অবলোকন করে সিরিয়ার আইন পরিবর্তন করা হয়, যাতে পুলিশ এবং দেশের ১৮টি নিরাপত্তা বাহিনীর যে কেউ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই আট দিনের জন্য আটকে রাখতে পারে। দুই ধরনের লোককে মূলত গ্রেপ্তার করা হতো, রাজনৈতিক এবং ভিন্নমতাবলম্বী। সিরিয়ান সেনাবাহিনী এপ্রিল মাসে ঘেরাও করা শুরু করবে এমন শহর থেকে পুরুষ ও ছেলে আটককৃতদের অনেকেই দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন। ছোট কক্ষে অনেক বেশী জনকে আটকে রাখে এবং সীমিত সুবিধা দেওয়া হয়। অনেককে মারধর করা হয়, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয় এবং মৃতপ্রায় করে রাখা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৩ জুলাই ২০১২ তারিখে সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত অন্তত ২৭টি নির্যাতন কেন্দ্র উদ্ঘাটন করে। প্রচার আছে যে “সাম্প্রদায়িক বিবাদ বপন করার একটি প্রকল্প” হিসেবে আলাউইট-নিয়ন্ত্রিত বাথিস্ট শাসক গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক বহুত্ববাদ এবং নাগরিক স্বাধীনতার বিপক্ষের যে কোনো প্রতিবাদকে সাহায্য করতো।^{২১}

শাসক বাহিনী আল-রাস্তানের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে নৃশংস হামলা চালায় এবং এর জনসংখ্যার ৮০% এরও বেশি বাস্তুচ্যুত করে। বাস্তুচ্যুত বেসামরিক নাগরিকদেরকে ‘সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’ হিসেবে চিহ্নিত করে, সিরিয়ার আরব সশস্ত্র বাহিনী আশে পাশের এলাকায় আশ্রয় নেওয়া বেসামরিক নাগরিকদের ওপর আক্রমণ চালায়, যার ফলে ১২৭ জন নিহত হয়। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে নিরাপত্তা বাহিনীর সৈন্যরা উদ্বাস্তুদের লাতাকিয়ায় তাঁবু স্থাপন করে আশ্রয় নেয়ায় বাধা দেয়। এছাড়াও বিক্ষোভের আন্দোলন ঠেকাতে বেশ কয়েকটি শহরে অবরোধ বসানো হয়। কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও দারা, বানিয়াস, আল-কামিশলি, হোমস, দৌমা এবং হারাস্তাতে মাসব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল।^{২২} মার্চ এবং এপ্রিল মাসে সিরিয়ার সরকার বিক্ষোভ প্রশমিত করার আশায় রাজনৈতিক সংস্কার এবং নীতি পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক সেনা টহল কমিয়ে আনে এবং দুর্নীতি কমানোর লোক দেখানো প্রচেষ্টায় দারার গভর্নরকে বরখাস্ত করে। সরকার ঘোষণা করেন যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে, কর কমিয়ে দেয়া হবে, সাধারণ কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হবে, সংবাদ প্রকাশের আরও স্বাধীনতা দেয়া হবে, এবং কাজের সুযোগ বাড়ানো হবে।^{২৩} এই ঘোষিত সংস্কারের বেশীরভাগই বাস্তবায়িত হয়নি।

আলাউইট নিয়ন্ত্রিত সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি এবং কিছু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে কিছুটা ছাড় দেয়। কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের নেকাব পরা বাধ্যতামূলক প্রত্যাহার করে নেয় এবং দেশের একমাত্র ক্যাসিনো বন্ধ করে দেয়। এমনকি সরকার হাজার হাজার সিরিয়ান কুর্দিদের নাগরিকত্ব প্রদান করে যারা পূর্বে ‘বিদেশী’ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। বাহরাইনকে অনুসরণ করে, সিরিয়া সরকার সঙ্কট নিরসনের প্রয়াসে জুলাই মাসে দুই দিনের জাতীয় সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপ আয়োজনকারীদের বেশিরভাগই ছিল বাথ পার্টির সদস্য; কিছু ছিল আসাদের অনুগত ব্যক্তিবর্গ এবং শাসনপন্থী স্যাটেলাইট দলগুলোর নেতা। অপরদিকে শহরের রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের অবস্থানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে এবং পুরো শহর ট্যাংক দ্বারা অবরোধ করে রাখা হয়। ফলে অনেক বিরোধী নেতা এবং প্রতিবাদী নেতারা উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন। বিক্ষোভকারীদের অন্যতম একটি দাবি ছিল দেশের জরুরি অবস্থার অবসান, যা প্রায় ৫০ বছর ধরে কার্যকর ছিল। জরুরি আইনটি নির্বিচারে আটক ও গ্রেপ্তার এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের জন্য ব্যবহার করা হতো। কয়েক সপ্তাহের বিতর্কের পর, আসাদ ২১ এপ্রিল সিরিয়ার জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার নির্দেশ নামায় স্বাক্ষর করেন।^{২৪} আসাদের কাছ থেকে সংস্কারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিয়ে কর্মীরা অসন্তুষ্ট থাকায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভ এপ্রিল মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

২০১১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিদ্রোহ অব্যাহত থাকায়, সিরিয়া সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করে। ২৫শে এপ্রিল দারা শহর বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সিরিয়ার সেনাবাহিনী দারা অবরোধ করা শহরগুলোর মধ্যে এটি ছিল প্রথম। আনুমানিক ৬,০০০ সৈন্য এ শহরে

মোতায়ন করা হয়, যারা বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে এবং ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে শত শত বিক্ষোভকারীদের খুঁজে বের করে হত্যা করে।

প্রথমবারের মতো বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শুটাররা মসজিদের ছাদে অবস্থান নেয়। যেসব মসজিদ বিক্ষোভকারী এবং সংগঠকরা সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করতো সেসব মসজিদকে টার্গেট করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী পানি, বিদ্যুৎ এবং ফোন লাইন বন্ধ করে দেয় এবং ময়দা ও খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরকার বিরোধীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এসময় সরকার বিরোধীদের সঙ্গে সশস্ত্র বিক্ষোভকারী এবং দলত্যাগী সৈন্যরা মিলিত হয়, যার ফলে শত শত লোক মারা যায়।^{২৫} আরব সমাজতান্ত্রিক বাথ পার্টি থেকে দলত্যাগ বাড়তে থাকে এবং ২৮শে এপ্রিল বাথ পার্টির ২৩৩ জন সদস্য পদত্যাগ করে। এটি ছিল বেসামরিক নাগরিকদের উপর ক্রমবর্ধমান মারাত্মক সহিংসতার প্রতি নিদান বহিঃপ্রকাশ।



২০১১ সালের ১৮ এপ্রিল হোমস শহরে সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

২০১১ সালের ১৮ এপ্রিল মাসের দারাতে কঠোর ব্যবস্থা চলাকালীন সিরিয়ান সেনাবাহিনী দামেস্কের আশেপাশের বেশ কয়েকটি শহর অবরোধ করে রাখে। পুরো মে মাস জুড়ে অন্যান্য অবরুদ্ধ শহরগুলোতে যেমন- বানিয়াস, হোমস, তালকালখ, লাতাকিয়া এবং আরোও কয়েকটি শহরে দারার মতই পরিস্থিতি ছিল। প্রতিটি অবরোধ শেষ হওয়ার পর, বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদের সহিংস দমন পরবর্তী মাস জুড়ে চলতে থাকে। ২০শে মে নিরাপত্তা বাহিনী এবং বাথবাদী সেনারাই দলিবেব আল-মাস্তুমাহ গ্রামের একটি শিবিরের দলীয় প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে কোনরূপ সতর্কতা ছাড়াই বিক্ষোভকারীদের শান্তিপূর্ণ র্যালিতে গুলি চালায়। এতে ৩০ জন নিহত এবং প্রায় ২০০ জন আহত হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সিরিয়ার ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস প্রকাশ করে যে মধ্য মার্চ থেকে ২৪শে মে'র মধ্যে বিদ্রোহে ১,০৬২ জনের মৃত্যু হয়।^{২৬}

২০১১ সালের জুন-জুলাই বিদ্রোহ তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে সেনাবাহিনী আরও সুসজ্জিত এবং আরও সংগঠিত হয়েও ওঠে। সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রায় দুইজন উর্ধ্বতন সামরিক বা নিরাপত্তা কর্মকর্তা বিরোধী দলে চলে যান। বিশ্লেষকগণ মনে করেন যে এই দলত্যাগ আসাদের দলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার লক্ষণ। ক্রমবর্ধমান দলত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে, সৈন্যরা যারা বেসামরিক লোকদের গুলি করার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল বা অবহেলা করেছিল তাদেরও হত্যা করা হয়েছিল। সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রথম সংঘটিত হয় ৪ জুন ২০১১-এ ইদলিব প্রদেশের তুর্কি সীমান্তের কাছে অবস্থিত একটি শহর জিসর অ্যাশ-গুগুরে। বিক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা একটি ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয় যেখান থেকে নিরাপত্তা বাহিনী একটি অস্ত্রাস্ত্রিক্রিয়ার সময় গুলি চালিয়ে ছিল। বিক্ষোভকারীরা অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে একটি পুলিশ স্টেশন নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং আট নিরাপত্তা কর্মকর্তা আগুন পুড়ে মারা যায়। আরও কিছুদিন বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। গোপন পুলিশ এবং গোয়েন্দা এজেন্টরা যারা বেসামরিক লোকদের হত্যা করতে অস্বীকার করে তাদের প্রভাবিত করে কিছু নিরাপত্তা কর্মকর্তা দলত্যাগ করেন। ৬ জুন সুন্নি সেনা এবং সেনাবাহিনীর দলত্যাগকারীরা শহরের দিকে যাওয়া নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দলকে অতর্কিত আক্রমণ করে, যা একটি বড়

সরকারি পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হয়। একটি গণহত্যার ভয়ে বিদ্রোহী এবং দলত্যাগ কারীরা ১০,০০০ বাসিন্দাসহ তুর্কি সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যায়।



২০১১ সালের ৩রা মে Tishreen University'তে সরকার পন্থীদের বিক্ষোভ

২০১১ সালের পুরো জুন এবং জুলাই সরকারী বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকে এবং সেই সাথে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানো, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা, থেপ্তার করা অব্যাহত থাকে। রাস্তান এবং তালবিসেহ এবং মারাত আল-নুমান শহরগুলো জুনের প্রথম দিকে অবরোধ করা হয়। ৩০শে জুন সিরিয়ার বৃহত্তম শহর আলেপ্পোতে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। ৩ জুলাই, সিরীয় ট্যাঙ্কগুলো হামাতে মোতায়েন করা হয়, এর দুই দিন পরে শহরটি বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম বিক্ষোভের সাক্ষী হয়। বিদ্রোহের প্রথম ছয় মাসে সিরিয়ার দুই বৃহত্তম শহর দামেস্ক এবং আলেপ্পোর অধিবাসীরা সরকারবিরোধী বিক্ষোভে ব্যাপকভাবে জড়িত ছিল না। দুই শহরের কেন্দ্রীয় স্কোয়ারে বাথ পার্টি দ্বারা সংগঠিত প্রেসিডেন্ট আসাদ ও তার সরকারের সমর্থনে কয়েক হাজারের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১১ জুলাই ২০১১ তারিখে বেশ কিছু বাথবাদী সৈন্যদল দামেস্কে আমেরিকান এবং ফরাসি দূতাবাস ঘেরাও এবং ভাঙচুর করে। আসাদ-পন্থীরা স্লোগান দেয় “আমরা তোমার জন্য মরব, বাশার”।^{২৭}

গণবিক্ষোভ ও দাঙ্গা অক্টোবর জুড়ে চলতে থাকে এবং সহিংস দমন-পীড়নও চলতে থাকে। ২০১১ সালের অক্টোবরে ৪ দিনের সরকারবিরোধী বিক্ষোভের ফলে দেশব্যাপী মারধর এবং দাঙ্গা চলে। প্রতিদিন আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক, কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত, লেবার, কৃষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং রাস্তার বিক্রেতার ব্যাপকভাবে অংশ নেন। এই বিক্ষোভ ২০০ জনের অংশগ্রহণে শুরু হয় কিন্তু হত্যাকাণ্ড এবং মারধরের কারণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী হয়ে ছিল। দাঙ্গা ও লুটপাট অব্যাহত থাকে, বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয় এবং পুলিশ ও দাঙ্গাকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে বোমা এবং প্লাস্টিক বুলেট ছোঁড়ে। ১৮-১৯শে নভেম্বর বিক্ষোভ চলাকালীন ৪-১৮ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছিল, যখন তারা দামেস্ক এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাস ভবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে ছিল। শ্রমিকরা তাদের পাওনা মজুরির দাবি জানান। বিলবোর্ডে বাশার আল-আসাদের ছবি লক্ষ্য করে ইট ও পাথর নিক্ষেপ করা হয়। ২০১২ সালের মে মাসে আলেপ্পোতে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং গুলি ব্যবহার করে, এবং অবসরপ্রাপ্তদের আঘাত করে। জানুয়ারী-এপ্রিল মাসে রাক্কায় কৃষক ও শ্রমিকদের বিক্ষোভের সময় ২১ জন নিহত হয়। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিযান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শত শত বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় বিক্ষোভ অব্যাহত রাখা।

৬. ফলাফল

সিরিয়ার বেসামরিক নাগরিকদের ওপর আসাদ সরকারের দমন-পীড়নের নজিরবিহীন বর্বরতার ফলে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং আরব লীগ, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সরকারের নৃশংস বর্বরতার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক যথাক্রমে ২৯ এপ্রিল এবং ১৮ আগস্ট ২০১১ দুটি জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত একটি অনুসন্ধানী মিশন গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, অপহরণ, জোরপূর্বক গুম এবং অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের জন্য আসাদ সরকারকে দায়ী করে। সরকার কর্তৃক সরাসরি গুলি করে হত্যার নির্দেশ নীতির জন্যও তাকে দোষী সাব্যস্ত করা

হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের হাইকমিশনার আসাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রতী আহ্বান জানায়। ১৮ আগস্ট দ্বিতীয় জরুরি অধিবেশন চলাকালীন, মানবাধিকার কাউন্সিলের বেশ কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র আসাদের পদত্যাগের দাবি জানায়, এসময় অন্যান্য দেশ সিরিয়ার সরকারকে অবিলম্বে তার সমস্ত কঠোর ব্যবস্থা বন্ধ করতে এবং বিক্ষোভকারীদের সাথে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সংলাপ শুরু করার আহ্বান জানায়।^{২৮}

২৯ জুলাই একদল দলত্যাগী আর্মি অফিসার “ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (এফএসএ)” গঠনের ঘোষণা দেয়। সিরীয় সশস্ত্র বাহিনীর দলত্যাগীদের নিয়ে গঠিত বিদ্রোহী সেনাবাহিনী বাশার আল-আসাদ এবং তার সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে চায়। ২৩ আগস্ট এফএসএ -এর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠিত হয়। অস্থিরতার সময়, বেশ কয়েকটি কুর্দি মিলিশিয়া কুর্দি সুপ্রিম কমিটি গঠন করে, যা নিজেকে একটি স্ব-শাসিত সত্তা হিসাবে ঘোষণা করে এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতে কুর্দি ভাষার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ২০১১-১২ জুড়ে শাসকদের দ্বারা দমন অভিযান জোরদার করা হয়েছিল; বাশার আল-আসাদ সিরিয়ান বিমান বাহিনীকে বেসামরিক এলাকায় বিমান বোমা হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ, সিরিয়ার সামরিক বাহিনী দ্বারা ৬০,০০০ এরও বেশি সিরিয়ানকে হত্যা করা হয়েছে।^{২৯}

৭. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় সিরিয়া আরব বসন্তের প্রভাবে গড়ে উঠা আন্দোলন প্রথম দিকে ছিল শান্তিপূর্ণ। পরে তা সহিংসতার নিপতিত হয়। ক্রমে তা জাতিগত গৃহযুদ্ধে রূপলাভ করে। দুর্নীতি নির্মূল এবং বৃহত্তর স্বাধীনতার দাবিতে ২০১১ সালে মার্চ মাসে সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর দিরায় আন্দোলন শুরু হয়। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালায়। এতে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। ২০১১ সালের জুলাইয়ে দেশজুড়ে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে এসে বাসার আল আসাদের পদত্যাগ দাবি করেন। আন্দোলন শেষপর্যন্ত দেশটিতে চরম বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে, উত্থান ঘটিয়েছে সশস্ত্র নানা গোষ্ঠীর। চারিদিকে মৃত্যু আর লাশের উৎসব। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে বেড়ে উঠছে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা। যুদ্ধে দুই লাখ ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এক কোটি ১০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে। ৭৬ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির ভেতরেই অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছে। এই সংঘাতের বিষয়ে রিপোর্ট করা শুরু থেকেই সংবাদ মাধ্যমের জন্য কঠিন এবং বিপজ্জনক ছিল। সাংবাদিকদের উপর হামলা, আটক, নির্যাতন এবং হত্যা করা হয়েছিল। প্রযুক্তিগত সুবিধা (ইন্টারনেট, টেলিফোন ইত্যাদি) সিরিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিলো। এই বিদ্রোহের উভয় পক্ষই পরস্পরকে দোষারোপ করে কিছু বানোয়াট এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করার চেষ্টা করে। ফলে বলা যায়, আরব বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো সিরিয়াতেও আরব বসন্ত সাধারণ গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। কিন্তু অচিরেই তা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং এর দূরবর্তী প্রভাব সিরিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমুখী সমস্যার মধ্যে নিপতিত করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ Gammer, Moshe, *The Caspian Region: The Caucasus*, Vol. 2, Routledge, 2004, p. 64.
- ^২ ব্রোঞ্জ যুগে (সি. ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) একটি ছোট বসতি হিসেবে গড়ে উঠে। পরবর্তীতে ইবলা একটি সম্প্রসারণবাদী শক্তিতে পরিণত হয়ে উত্তর ও পূর্ব সিরিয়ার বেশীরভাগ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে ইরান সভ্যতা গড়ে তোলে। খ্রিস্টপূর্ব ২৩ শতকে ইরান সভ্যতা ধ্বংস হয়।
- ^৩ বাথ মতবাদ বা বাথবাদ বা বাথবাদী অর্থ নবজাগরণ বা পুনরুত্থান। বাথবাদী হলো আরব জাতীয়তাবাদী আদর্শ, যা আরব জাতীয়তাবাদী আদর্শ দ্বারা একটি ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্রের ধারণা পোষণ করে। এই আদর্শ জাকি আল-আরসুজি, মিশেল আফলাক ও সালাহ আল দিন আল-বিতারের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- ^৪ Michael Bröning, "The Sturdy House That Assad Built", *Foreign Affairs*, 7 March 2011.
- ^৫ "Arab League brings Syria back into its fold after 12 years". *Al Jazeera*. 7 May 2023. Archived from the original on 7 May 2023.
- ^৬ https://hmn.wiki/bn/Syria_nationalism#cite_Salibi2003-1

- ^৭ Gruber, Haugbolle, Christiane, Sune; Heidemann, Stefan. "3: Memory and Ideology: Images of Saladin in Syria and Iraq". *Visual Culture in the Modern Middle East: Rhetoric of the Image*, (USA: Indiana University Press), 2013, pp. 57–75.
- ^৮ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ নভেম্বর ২০১৬।
- ^৯ Flock, Elizabeth, "Syria revolution: A revolt brews against Bashar al- Assad's regime". *The Washington Post*. 15 March 2011.
- ^{১০} "Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic", *United Nations:OHCHR. United Nations General Assembly: Human Rights Council*. 15 September 2011.
- ^{১১} দারা হলো দক্ষিণ-পশ্চিম সিরিয়ার একটি শহর, যা জর্ডানের সীমান্ত থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার (৮.১ মাইল) উত্তরে অবস্থিত। এটি দারা গভর্নরেটের রাজধানী, ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন হাওরান অঞ্চলের অংশ। শহরটি দামেস্ক থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার (৫৬ মাইল) দক্ষিণে দামেস্ক-আম্মান হাইওয়েতে অবস্থিত এবং এটি ভ্রমণকারীদের জন্য একটি স্টপিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিকটবর্তী এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বে উম্ম আল-মায়াজেন এবং নাসিব, পূর্বে আল-নাইমাহ, উত্তরে আতামান, উত্তর-পশ্চিমে আল-ইয়াদুদাহ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে রামথা ও জর্ডান।
- ^{১২} *Ibid.*
- ^{১৩} Fahim, Kareem; Saad, Hwaida (8 February 2013), "A Faceless Teenage Refugee Who Helped Ignite Syria's War", *The New York Times*. 8 February 2013.
- ^{১৪} Sinjab, Lina, "Middle East unrest: Silence broken in Syria". *BBC News*, 19 March 2011.
- ^{১৫} *Ibid.*
- ^{১৬} "We've Never Seen Such Horror", *Human Rights Watch*, 1 June 2011. Archived from the original on 3 February 2016. Retrieved 17 February 2016.
- ^{১৭} *Human Rights Watch. Op.cit.*, 1 June 2011.
- ^{১৮} Iddon, Paul "A recap of the Syrian crisis to date". *Digital Journal*, 30 July 2012, Archived from the original on 23 June 2018. Retrieved 3 August 2012.
- ^{১৯} Macleod, Hugh. "Syria: how it all began", *Global Post*, 25 April 2011, Archived from the original on 2 January 2014.
- ^{২০} Macleod, Hugh, "Syria: how it all began", *Global Post*, 25 April 2011. Archived from the original on 2 January 2014.
- ^{২১} "Syria lifts niqab ban, shuts casino, in nod to Sunnis", *Reuters*, 6 April 2011.
- ^{২২} *Ibid.* 22 April 2011.
- ^{২৩} "In Syrian flashpoint town, more deaths reported", *CNN*, 25 March 2011.
- ^{২৪} Oweis, Khaled Yacoub; Karouny, Mariam; al-Khalidi, Suleiman; Aboudi, Sami "Syria's Assad ends state of emergency". *Reuters*. Beirut, Amman, Cairo, 21 April 2011.
- ^{২৫} "Civilian killings in Syrian demonstrations rises to 800", *The Jerusalem Post*, 5 July 2011.
- ^{২৬} "Syria death toll 'surpasses 1,000'", *Al Jazeera*. 24 May 2011.
- ^{২৭} Ali, Nour (11 July 2011), "Syria: Assad loyalists besiege US and French embassies in Damascus", *The Guardian*, Archived from the original on 20 January 2022.
- ^{২৮} "Human Rights Council debates situation of human rights in Syrian Arab Republic in Special Session". *UN:OHCHR*. 22 August 2011. Archived from the original on 12 May 2023.
- ^{২৯} Ahmed, Akbar, "4: Musharraf's Dilemma", *The Thistle and the Drone*, (Washington, D.C.: Brookings Institution Press), 2013, p. 187.

উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার বিকাশ: একটি পর্যালোচনা [The Development of the Arabic Language in the Umayyad Period: A Review]

ড. জিয়াউর রহমান খান*

ড. মো. সাজিদুল হক*

[Abstract: The Umayyad period (661–750) marked a significant stage in the evolution of the Arabic language, transforming it from a regional dialect into a dominant language of administration, culture, and religion across a vast empire. The Umayyad dynasty, which ruled a vast and diverse territory, promoted Arabic as the official language of the state, replacing the previously dominant languages such as Greek in the Levant, Persian in the East, and Coptic in Egypt. Additionally, The Umayyad caliphs actively encouraged the translation of scientific, literary, and administrative works into Arabic. Besides this, they contributed to enriching the linguistic landscape. On the other hand, the Arabic poetry and prose are developed and flourished during this period by incorporating various new words and some new grammatical and linguistic rules blending pre-Islamic traditions with new influences from the Islamic conquests and interactions with other cultures. This period also observed the early development of Arabic grammar and lexicography, laying the groundwork for the linguistic sciences that would later flourish in the Abbasid period. Consequently, the standardization of the Arabic language and the Arabization of administrative functions during the Umayyad period facilitated the expansion of Arabic within the Islamic world, laying the groundwork for its future role as a global language of learning and communicating. This paper examines the various factors that contributed to this linguistic and cultural evolution, including the standardization of Arabic, the process of Arabization, the role of the Qur'an, and the cultural flourishing of Arabs. Through a comprehensive study of historical and linguistic sources, this research article will elucidate the development of the Arabic Language in the Umayyad period and its transformative impact on the Arabic language.]

Keywords: Arabic Language, Umayyad Period, Administrative Initiative, Socail and Cultural Mixing, Development of language and literature.

১. ভূমিকা

আরবী ভাষা উৎপত্তি কাল থেকে যুগে যুগে বিকশিত হয়ে মানব জাতির মাঝে তার দ্যুতি ছড়িয়ে চলেছে।^১ বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এ ভাষায় কথা বলে। প্রাক ইসলামী, ইসলামী, উমাইয়া বা আব্বাসীয় যুগের দিকেই দৃষ্টি দেয়া হবে, সেখানেই আরবী ভাষার ক্রমোন্নতি দৃশ্যমান হবে। সময়ের আবর্তনে আরবী ভাষা একদিকে যেমন দৃষ্টি নন্দন হয়েছে, অন্যদিকে তা বিভিন্ন সমাজ, দেশ ও জাতির মাধ্যমে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। আরবী ভাষার এ উন্নতি ও বিকাশের ধারাবাহিকতায় উমাইয়া যুগ এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।^২ উমাইয়া যুগে আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ও অগ্রগতিসহ নানাবিধ কারণে আরবী ভাষার দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। পারস্য, ভারতীয় ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে অসংখ্য নতুন পরিভাষা জন্ম লাভ করে। এই সময়ে আরবী ভাষা প্রমিতকরণ এবং পরিমার্জনের সময়কাল অতিক্রম করে এবং এটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে।^৩ মূলত এ যুগে এমন কিছু নতুন শাস্ত্র উদ্ভাবন হয়, যা আরবী ভাষার ব্যাপক উন্নতি সাধন করে। যেমন আরবী পঠন পাঠনে

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

বিশুদ্ধতা রক্ষায় নাহু এবং ছরফের প্রবর্তন করা হয়। প্রবর্তন করা হয় ভাষাগত এমন কিছু নতুন কলা কৌশল, যা একদিকে ছিল যুগোপযোগী অন্যদিকে তা ছিল অনন্য সাধারণ। এ সমস্ত উদ্ভাবন আরবী ভাষাকে আরো বেশী বিকশিত ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করে তুলে। নিম্নে উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার বিকাশ সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

২. আরবী ভাষার পরিচিতি

আরবী ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবারের জীবন্ত সদস্যসমূহের মধ্যে বৃহত্তম। হিব্রু ও আরামীয় ভাষার সাথে এ ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেমিটিক গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত মৃত ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাচীন হিব্রু ভাষা, আকাদীয় ভাষা (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ভাষা ও ইথিওপীয় ভাষা। সেমিটিক ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ে একটি মূল গঠিত হয় এবং প্রতিটির একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে (স্বরবর্ণ যোগ করে, উপসর্গ-মধ্যসর্গ-অন্ত্যপ্রত্যয় বসিয়ে) অন্যান্য কাছাকাছি অর্থের শব্দ সৃষ্টি করা হয়।

বনু সাম বা সেমাইট হলো নুহ আ. এর পুত্র সামের বংশধর। মূলত সেমিটিক জাতি বলতে সেমিটিক ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়। ফলে আয়লাম ও লুদ সামের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সামী ভাষাভাষী না হওয়ায় তারা সামী জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আয়লামরা পারস্যের সুসতানের ও লুদরা লিডিয়ার (এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত) অধিবাসী ছিল। অন্যদিকে ফিনিশিয়রা সাম বংশোদ্ভূত নয়, কিন্তু সামী ভাষায় কথা বলার কারণে সামী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরাও সামী ভাষাভাষী হিসেবে সামী জাতির মধ্যে গণ্য।^৪

সেমিটিক (Semitic) শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় আঠারো শতকের শেষের দশক থেকে।^৫ ভাষাবিজ্ঞানী শ্লোজার (১৭৩৫- ১৮০৯ খ্রি.) ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ‘সেমিটিক’ শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। পরবর্তীতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ শব্দটিকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সুরইয়ানী ভাষাবিজ্ঞানী ইয়াকুব আর-রাহাভি (মৃত: ৭০৮ খ্রি.)^৬ সামী ভাষাগোষ্ঠীর জন্য ‘আস-সামীয়্যা’ (السامية) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুরইয়ানী ভাষার পণ্ডিতগণ শব্দটিকে ব্যবহার করেন। এমনকি দ্বাদশ শতাব্দীতে বহু ঐতিহাসিকদের লেখায় শব্দটি ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক ইবনুল ইবরী শব্দটিকে তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ করেন। সুতরাং আরব বিশ্বের অনেকেই ‘সেমিটিক’ শব্দের প্রথম উদ্ভাবক হিসেবে ভাষাবিজ্ঞানী শ্লোজারকে সমর্থন করেন না।^৭

সামী ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী ভাষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সামী ভাষার নিকটবর্তী ভাষা। সামী ভাষাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আরবী ভাষাই মূল সামী ভাষার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষণ করে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব উপদ্বীপে আরবী ভাষার উৎপত্তি ঘটে। তৎকালীন সময়ে আরব উত্তর ও দক্ষিণ এ দুভাগে বিভক্ত ছিল। ফলে আরবী ভাষাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি উত্তর আরবীয় ভাষা, অপরটি দক্ষিণ আরবীয় ভাষা। উত্তর আরবের অধিবাসীদেরকে মুসতা‘রিবা (العرب المستعربة) বলা হয়। কেননা তারা ছিল আরব জাতীয়তা গ্রহণকারী অনারব ও ইসমাইল আ. এর বংশধর। তাদেরকে ‘আদনানীও বলা হয়। কারণ ‘আদনান তাদের প্রখ্যাত একজন পূর্বপুরুষ। উত্তর আরব বলতে হিজাজ ও নাজদ এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলকে বোঝানো হয়। দক্ষিণের অধিবাসীরা আরিবা (العرب العاربة) অর্থাৎ খাঁটি আরব বলে বিবেচিত ছিল। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কাহতান এর বংশধর হওয়ায় তাদেরকে বানু কাহতান হিসেবে নামকরণ করা হয়।

৩. আরবী ভাষা চর্চার ধারা ও প্রকৃতি

আরবী ভাষা চর্চার ধারাকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে: বিলুপ্ত আরবী (Proto-Arabic), প্রারম্ভিক আরবী (Early Arabic), প্রাচীন আরবী (Classical Arabic), মধ্যযুগীয় আরবী (Middle Arabic) এবং আধুনিক আরবী (Modern Arabic)। প্রথম পর্বে (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী) প্রচলিত আরবী ভাষার প্রকৃত স্বরূপ কাল্পনিক। কেননা সে যুগের টিকে থাকা প্রমাণসমূহ খুবই দুস্তাপ্য এবং

তা ভাষার গঠন সম্পর্কে খুব কম তথ্য বহন করে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে আরবী ভাষার প্রাথমিক রূপের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা হয়।^৮ তবে একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে আরবীর অস্তিত্বের প্রাচীনতম প্রমাণ প্রথম শতাব্দীর একটি শিলালিপিতে রয়েছে বলে মনে করা হয়।^৯ দ্বিতীয় পর্বটি প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এ দীর্ঘ সময়ে আশেপাশের সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবী ভাষায় বেশ পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধিত হয় এবং একটি পর্যায়ে এসে বহু অনারব শব্দ প্রাচীন আরবী ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যায়।

প্রাচীন যুগ আরবী ভাষার বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের অন্যতম প্রাচীন প্রমাণ হলো প্রাক ইসলামী কবিতা, যা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মৌখিকভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং অষ্টম শতাব্দীতে তা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাক ইসলামী যুগের আরব কবিরা যে আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন, তা ছিল অতি উৎকৃষ্ট মানের। ইসলাম আবির্ভাবের পর ইসলামী সাম্রাজ্য আরব উপদ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রথমে দামেস্ক ও পরে বাগদাদে এ সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এসময় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক বিশাল এলাকা জুড়ে আরবী প্রধান প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সময় ভাষাটি বাইজেন্টীয় গ্রিক ভাষা ও ফার্সি ভাষা থেকে বিভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। নবম ও দশম শতকে বাগদাদে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সম্পন্ন হয়। সে সময় বিশ্বের অপরাপর প্রাচীন ভাষা, বিশেষত গ্রিক ভাষার বহু প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লেখা আরবীতে অনুবাদ করা হয়। আধুনিক আরবী যা প্রায় আঠারো শতকের শেষ থেকে শুরু হয়, প্রাচীন আরবী থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরের বিরুদ্ধে একটি ফরাসি অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তাঁর অভিযানটি স্বল্পস্থায়ী হলেও তা আরবী ভাষার অবস্থানকে বেশ প্রভাবিত করে।

আরবীকে সাধারণত প্রাচীন আরবী, আধুনিক আদর্শ আরবী (Modern Standard Arabic) এবং আঞ্চলিক আরবী (Local Arabic) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে প্রাচীন আরবী ভাষার ব্যবহার শুরু হয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে এ ভাষার বিকাশ সাধিত হয়। আধুনিক আরবী ভাষায় নতুন নতুন শব্দ ও পরিভাষার সংযুক্তির কারণে প্রাচীন শব্দগুলোর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমে আসে। সংবাদপত্র, সাহিত্যচর্চা ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আধুনিক আদর্শ আরবী (Modern Standard Arabic) ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের জন্য আঞ্চলিক আরবী (Local Arabic) ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আরবী লিপি ডান থেকে বাম দিকে লেখা হয়। ২৮টি বর্ণ বা হরফের এই লিপিতে কেবল ব্যঞ্জন ও দীর্ঘ স্বরধ্বনি নির্দেশ করা হয়। আরবী লিপিতে বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর বলে কিছু নেই, তবে এক অক্ষরের সাথে আরেক অক্ষর পেঁচিয়ে লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের একাধিক রূপ আছে, যা শব্দের শুরুতে, মাঝে, শেষে অথবা আলাদাভাবে অবস্থানের কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে। কতগুলি বর্ণ একই মূল রূপের উপর ভিত্তি করে লেখা হয় এবং বিন্দুর সংখ্যা দিয়ে একে অপরের থেকে পৃথক করা হয়।

৪. আরবী ভাষা বিকাশের সূচনা

আরবী সাহিত্যে ইসলাম পূর্ব যুগকে জাহিলী বা প্রাচীন যুগ বলা হয় এবং মহানবী মুহাম্মদ সা. এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে খিলাফাতে রাশেদার যুগ পর্যন্ত সময়টিকে ইসলামী যুগ বলা হয়। এ হিসেবে ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ইসলামী যুগ বলা হয়। মূলত এ যুগ থেকেই আরবী ভাষার ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন সাধিত হয়। সূচিত হয় আরবী ভাষার বিকাশ। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখে মহান আল্লাহর বাণী আল কুরআন ও মহানবী সা. এর বাণী আল হাদীস। ইসলামী যুগে আরবী ভাষার বিকাশ ও সংস্করণ ছিল তৎকালীন আরবী ভাষাভাষীদের নিকট এক মহাবিষয়, যা তাদের নিকট ছিল শক্তিশালী নবজাগরণ। কেননা ইসলাম তাদের নিকট এমন এমন নতুন শব্দ ও পরিভাষা উদ্ভাবন করে যা তাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। ফলে এ সময়ে বেশ কিছু নতুন শব্দ ও পরিভাষা সৃষ্টি হয়।^{১০}

এছাড়াও উদ্ভাবিত পরিভাষার মাঝে এমন কিছু শব্দ ও পরিভাষা লক্ষ্য করা যায় যার শাব্দিক অর্থ তৎকালীন সমাজে পরিচিত থাকলেও নতুন পরিভাষাটি ইতোপূর্বে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন: **الأمم** শব্দটির দ্বারা

জাহেলী যুগে কোন ব্যক্তির বিপদ থেকে মুক্ত থাকাকে বুঝাতো, কিন্তু ইসলাম তাদের নিকট শব্দটিকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করে। ফলে **المؤمن** শব্দটি ইসলামী যুগে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী।^{১৫} ইসলামী শরীয়তের এ শর্ত সাপেক্ষ ব্যাখ্যাটি পূর্বে তাদের নিকট একদম অপরিচিত ছিল। অনুরূপ ভাবে **الكافر** (অবিশ্বাস) **المسلم** (ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী) **المنافق** (কপটতা প্রদর্শনকারী) পরিভাষাগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা ইসলামী যুগে এসে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। শুধু তাই নয় **الصلاة** শব্দটি ইতিপূর্বে শুধু দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হত কিন্তু ইসলাম **الصلاة** শব্দের দোয়া ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। অনুরূপভাবে **السجود** (সিজদা), **الركوع** (রুকু), **الحج** (হজ্জ), **النكاح** (বিবাহ), **الفرقان** (সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী), **التييم** (তায়াম্মুম), এই শব্দগুলোর অর্থ ও পরিভাষা ইসলাম পরিবর্তন করে দিয়েছে।^{১৬}

এ সময়ের আরবী ভাষায় কেবল নতুন কিছু শব্দ আর পরিভাষাই যুক্ত হয়নি বরং এ সময় পুরো আরবী ভাষার ব্যবহার এবং তাদের ভাষা-সাহিত্য অনন্য রূপ পরিগ্রহ করে। এমন কি সে সময়ের আরবী কবিগণ তাদের রচনায় কুরআনের শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করে আরবী কবিতা রচনা করতে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ কবি নাবিগা আল জাদী রা. এর একটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,^{১৭}

الحمد لله لا شريك له * من لم يقلها فنفسه ظلما

المولج الليل في النهار وفي اللي * ل غارا يفرج الظلما

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার কোন শরীক নাই। যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করবে না, সে নিজের আত্মার উপর জুলুম করল। যিনি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর এভাবে তিনি অন্ধকার বিদূরিত করেন।”

ইসলামী যুগে আরবী ভাষা সমৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে অভিধান চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন যুগে আরবরা অভিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, অন্য লোকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কবিতা, বক্তৃতা ও কথ্য ভাষার ব্যবহারের প্রতি বেশী আগ্রহী হওয়া। আরবদের অধিকাংশই নিরক্ষর ও যাযাবর হওয়ার কারণে তারা লিখিত ভাষার দিকে গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দেয়নি। যেমনটা তৎকালীন সময়ের চীনা, রোমান এবং গ্রীক পণ্ডিতগণ মনোযোগ দিয়েছিলেন।^{১৮}

ইসলাম আগমনের পর কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য শব্দাবলীর অর্থ ছাহাবায়ে কেরাম মহানবী সা. এর নিকট থেকে জেনে নিতেন। মহানবী সা. এর ইত্তিকালের পর বিশিষ্ট ছাহাবীগণ এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য, জটিল, কঠিন ও অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যাকল্পে আরবী অভিধান চর্চা সূচনা হয়। সর্ব প্রথম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. আরবী অভিধানচর্চার বীজ বপন করেন। তারপর আবু সাঈদ আব্বাস ইবনু তাগলিব (মৃ. ১৪১হি./৭৫৮ খৃ.) তাঁর পদাংক অনুসরণ করে ‘গারীবুল কুরআন’ শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করে কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য ও অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা করেন।

মূলত ইসলামী যুগ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি যুগ। এ যুগে অবতীর্ণ হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্রু আল-কুরআনুল কারীম। এ গ্রন্থ অবতরণের সাথে সাথে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব সাধিত হয়। পবিত্র কুরআনের ভাষাশৈলী অবলোকন করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় তৎকালীন কবি ও পণ্ডিতবর্গ। পবিত্র কুরআনের প্রভাবে নতুন নতুন শাস্ত্র সৃষ্টি হতে থাকে। আল কুরআনে ব্যবহৃত অলঙ্কারপূর্ণ বাচনভঙ্গি, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, আমছাল সেই সাথে চিত্তাকর্ষক শব্দ, অভিনব বর্ণনাভঙ্গি ও অনন্য সাধারণ বাক্যবিন্যাস নতুন রেনেসার সৃষ্টি করে এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে নতুন ধারা তৈরী করে।

আরবী ভাষার বিকাশে ইসলামী যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো ভাষার প্রমিতকরণের উদ্যোগ। আরবী ভাষায় রচিত আল কুরআন সেই উদ্যোগকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, আরবী ভাষার একটি আদর্শ রূপ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট সাহায্য করে। ফলে কুরআনে ব্যবহৃত আরবী ভাষা লিখিত ও কথ্য ভাষার মডেল হয়ে উঠে। সুতরাং এ বিষয়টি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল

কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী যুগ আরবী ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আরবী ভাষাকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে।

৫. উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার বিকাশ

৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সাম্রাজ্যের উত্থান আরবী ভাষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ সময়ে একটি আরব রাজবংশ তার বিশাল সাম্রাজ্যে বসবাসকারী ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় বহু সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে শাসন করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। প্রশাসনিক সুসংগতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জনের জন্য উমাইয়ারা আরব উপদ্বীপের একটি আঞ্চলিক ভাষা থেকে রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষায় রূপান্তরিত করে আরবী ভাষার একটি গঠনমূলক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। তাঁরা আরবী ভাষার প্রমিতকরণ ও আধুনিকায়ণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ফলে আরবী ভাষার চর্চা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে সামাজিক অঙ্গনে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। নিম্নে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পরিচিতি, উমাইয়া যুগে আরবী ভাষা বিকাশের প্রেক্ষাপট ও উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৫.১ উমাইয়া সাম্রাজ্যের পরিচিতি: উমাইয়া সাম্রাজ্য যা উমাইয়া খিলাফাত নামেও পরিচিত ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী সাম্রাজ্য। এটিই প্রথম ইসলামী সাম্রাজ্য যেখানে শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া সাম্রাজ্য ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং পরবর্তীতে আন্দালুস (স্পেন ও পর্তুগাল) অঞ্চলে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।^{১২} উমাইয়া খিলাফাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, যিনি উমাইয়া বংশের সদস্য ছিলেন। উমাইয়া বংশ মক্কার কুরাইশ গোত্রের একটি শক্তিশালী বংশ ছিল। চতুর্থ খলীফা আলী রা. হত্যার শিকার হওয়ার পর উমাইয়া বংশের শাসনের সূচনা হয় এবং মদিনা থেকে দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়।^{১৩}

উমাইয়া শাসনের অধীনে ইসলামী সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় এবং তা উত্তর আফ্রিকা, আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (স্পেন ও পর্তুগাল), ভারত উপমহাদেশের কিছু অংশ এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের সম্প্রসারণ শুধুমাত্র সামরিক ছিল না বরং সাংস্কৃতিকও ছিল। কেননা তাঁরা তাঁদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে প্রশাসনিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইসলামী শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয় যা বিশাল ও ক্রমবর্ধমান ইসলামী সাম্রাজ্যের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।

উমাইয়া সাম্রাজ্যকে মোট চৌদ্দজন খলীফা শাসন করে। উমাইয়া বংশের প্রথম শাসক মুয়াবিয়া কর্তৃক এ সাম্রাজ্য সূচিত হয় এবং উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের জাবের যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে এ সাম্রাজ্যের পতন হয়। মূলত উমাইয়া শাসনামলের শেষের দিকে উমাইয়া খলীফাগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষত আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে তারা বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় আন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়াদের পরাজয় ঘটে। তবে আব্দুর রহমান নামক এক রাজপুত্র স্পেনে পালিয়ে গিয়ে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে স্পেনীয় খিলাফাত হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।^{১৪} উমাইয়া সাম্রাজ্য ইসলামী বিশ্বে একটি দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য রাখতে সক্ষম হয় এবং এমন একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে যা পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর অধীনে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য মঞ্চ তৈরি করতে সহায়ক হয়।

৫.২ উমাইয়া যুগে আরবী ভাষা বিকাশের প্রেক্ষাপট

উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার বিকাশ ইসলামী বিশ্বের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই যুগটিকে ভাষা বিকাশের একটি বিবর্তনমূলক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেখানে আরবী আঞ্চলিক ভাষা থেকে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী ভাষায় পরিণত হয়। এই সময়ে আরবী ভাষার বিকাশ ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। নিম্নে উমাইয়া যুগে আরবী ভাষা বিকাশের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা হলো।

৫.২.১ ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ: উমাইয়া শাসনামলে বিশেষ করে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ও আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে ক্ষমতা একত্রিকরণ, সাম্রাজ্য বিস্তার ও দৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরির দিকে মনোনিবেশ করা হয়। দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করে উমাইয়ারা পশ্চিমে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (স্পেন

ও পর্তুগাল) ও পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা (ভারত উপমহাদেশ) পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ফলে বৈচিত্রময় অঞ্চলগুলো শাসন ও পরিচালনা করার জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা এ বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের চেয়ে ভিন্ন। এ বৈচিত্রের মাঝে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য নিশ্চিত করার জন্য আরবী ভাষাকে নির্বাচন করা হয়।^{১৫}

৫.২.২ প্রশাসনিক সংস্কার ও আরবী ভাষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: উমাইয়া শাসনামলে প্রশাসনিক সংস্কার এবং আরবী ভাষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বিশেষত সরকারী নথিপত্র, মুদ্রা, ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের মাধ্যমগুলো বিভিন্ন ভাষায় পরিচালিত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নতুন নতুন দপ্তর চালুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় প্রশাসনিক সংস্কার ও আরবী ভাষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়টি আবশ্যকীয় হয়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫ খ্রিস্টাব্দ) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের মাধ্যম সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরবী ভাষার চর্চা বেগবান হয়ে উঠে এবং সকলের নিকট আরবী ভাষার মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা আরবী ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫.২.৩ আরব জাতীয়করণের ব্যাপারে খলীফাদের আগ্রহ: উমাইয়া আমলের শুরু থেকে একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো আরব জাতীয়তাবাদি। সাম্রাজ্যের প্রতিটি স্তরে আরবদের সম্পৃক্তকরণ ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে খলীফাদের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও আরবী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে তাঁদের ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ও তাঁর পুত্র ওয়ালিদ এ ক্ষেত্রে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলে উমাইয়া সাম্রাজ্য আরব জাতীয়তাবাদি সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং আরবী ভাষার বিকাশের পথ সুগম হয়।^{১৬}

৫.২.৪ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আরবদের সংমিশ্রণ: উমাইয়া যুগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আরবদের সংমিশ্রণ ইসলামী সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ভাষাগত বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপুল জনসংখ্যার এ সংমিশ্রণ সাম্রাজ্যের প্রশাসন, সমাজ ও ভাষার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। বিশেষত আরব এবং পারসিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সামাজিক সংযোগ ও ভাব বিনিময় সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব রাখে এবং আরবী ভাষায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এছাড়া বিভিন্ন অনারব জাতির সাথে সংমিশ্রণের ফলে প্রাক ইসলামী শ্রোতের পাশাপাশি বিদেশী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসমূহের সাথে আরবগণ পরিচিত হয়, যা আরবী ভাষার বিকাশকে আরো বেশী সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে।^{১৭}

৫.২.৫ বিশুদ্ধ আরবী ভাষার চর্চা নিশ্চিতকরণ: উমাইয়া যুগে বিশুদ্ধ আরবী ভাষার চর্চা নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময়কালে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া সাম্রাজ্য বৃহত্তর ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত হয়। অনারব জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করলে আরবী ভাষায় তাদের অনেক ক্রটি দেখা যায়। বিশেষত আল কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। ফলে আল কুরআনের মর্মোদ্ধার, বিশুদ্ধ পঠন ও অনুবাদের প্রয়োজনে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আরবী ব্যাকরণ আরবী ভাষার একটি অন্যতম শাস্ত্র যা বাক্যের বিশুদ্ধ গঠন-পদ্ধতি, বাক্য ব্যবহৃত শব্দসমূহের অবস্থান ও তার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে। এছাড়াও ভাব বিনিময় ও লিখনের ক্ষেত্রে নানা রকম জটিলতা দেখা দেয়। এরই পরিপেক্ষিতে আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যা আরবী ভাষার বিকাশকে আরো ত্বরান্বিত ও সমৃদ্ধ করে।^{১৮}

৪.২.৬ আরবী কবিতার সংরক্ষণ ও কাব্যচর্চায় শাসকদের উৎসাহ প্রদান: আরবী কবিতা সংরক্ষণের প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল মৌখিক। উমাইয়া যুগে কবিতাকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রাবীগণ (কবিতা সংগ্রহকারী) বিখ্যাত কবিদের কবিতা সংগ্রহ এবং সংকলন করতে শুরু করেন। এ সময়ে “দিওয়ান” নামে পরিচিত কবিতার সংকলনগুলো লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষিত হতে থাকে। এই সংকলনগুলিতে স্বতন্ত্র

কবিদের নির্দিষ্ট বিষয়ের কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন প্রশংসা, ব্যঙ্গ বা প্রেমের কবিতাগুলো বিষয় ভিত্তিক আকারে সাজানো হয়। উমাইয়া যুগে আরবী কবিতা সংরক্ষণ একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল যা আরবী ভাষা ও ঐতিহ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও উমাইয়া শাসকগণ তৎকালীন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই কবিতার গুরুত্ব অনুভব করায় কাব্যচর্চাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন।^{১৯} মূলত উমাইয়া যুগে গ্রামীণ ও দরবারী কবিদের কাব্যচর্চা আরবী ভাষার সমৃদ্ধিকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। এ যুগে আরবী কবিতা সাধারণ জনগণের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও শাসকগোষ্ঠীর নিকট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং কবিদের সাথে তাদের এক সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী হয়।^{২০} ফলে আরবী কাব্যচর্চা ব্যাপক হয়ে উঠে এবং এর মাধ্যমে আরবী ভাষার বেশ সমৃদ্ধি ঘটে।

৬. উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার চর্চা ও বিকাশ

উমাইয়া যুগে আরবী ভাষার ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়। এ যুগেও এমন কিছু নতুন শাস্ত্র উদ্ভাবন হয়, যা আরবী ভাষার ব্যাপক উন্নতি সাধন করে। যেমন আরবী পঠন পাঠনে বিশুদ্ধতা রক্ষায় নাছ এবং ছরফের প্রবর্তন করা হয়। প্রবর্তন করা হয় এমন কিছু নতুন কলা কৌশল, যা একদিকে ছিল যুগোপযোগী অন্যদিকে তা ছিল অনন্য সাধারণ। এ সমস্ত উদ্ভাবন আরবী ভাষাকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করে তুলে। উমাইয়া যুগে আরবী ভাষা চর্চায় যে সমস্ত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৬.১ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভাবন: উমাইয়া যুগে আরবী ভাষা একটি বৈশ্বিক ভাষা হয়ে উঠে। আরব উপদ্বীপের আশেপাশের অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের কারণে উক্ত অঞ্চলসমূহে আরবী ভাষার চর্চা শুরু হয় এবং এসব অঞ্চলের সরকারী ও দাপ্তরিক কাজে আরবী ভাষা প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে। আরবী বাক্যের মৌলিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনারবগণের অজ্ঞতা, তদুপরি পূর্ব হতে আল-কুরআনের স্বরচিহ্ন ও স্বরবিন্দু প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত না থাকায় আরবী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়। এ অবস্থায় মুসলিম পণ্ডিতগণ আরবী ভাষার বিশুদ্ধ পঠন-পাঠন ও সঠিক মর্ম বোধগম্য করার নিমিত্তে এবং ভাষাকে সহজ, সরল ও ত্রুটিমুক্ত করার মহান উদ্দেশ্যে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণায় ব্যাপ্ত হন।^{২১} মূলত আল-কুরআনের মর্ম উপলব্ধি, বিশুদ্ধ পঠন ও অনুবাদের প্রয়োজনেই আলোচ্য শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এ শাস্ত্র উদ্ভাবনে আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী^{২২} যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা আরবী ভাষাকে এক বিশেষ মর্যাদার শিখরে উন্নীত করে।

৬.২ প্রশাসনিক নথির আরবী অনুবাদকরণ: খলীফা আব্দুল মালিকের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে সিরিয়ায় রোমান ভাষায়, ইরাকে ফার্সী ভাষায়, মিসরে গ্রীক ও কিবতী ভাষায় প্রশাসনিক নথিপত্র লিপিবদ্ধ করা হতো।^{২৩} পরবর্তীতে উমাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তৃতির কারণে প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করায় নতুন নথিপত্র তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে এ সময় আরবী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে আরবদের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় রচিত অনেক প্রশাসনিক নথি আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুবাদ কার্যক্রমকে বেগমান করার বিষয়ে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান যথেষ্ট উদ্যোগী হন এবং তাঁর বিশেষ সচিব সালমান বিন সাদকে প্রশাসনিক নথি আরবী ভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব প্রদান করেন।^{২৪}

এছাড়াও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনি প্রশাসনিক বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে ইরাকের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক নথিপত্রগুলো ফার্সী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফার্সী ও আরবীর মাঝে ভাষাগত পার্থক্য থাকার কারণে প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে নানা ধরনের সমস্যা তৈরী হয়। বিধায় তিনি প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক যাবতীয় নথিপত্রগুলো ফার্সী থেকে আরবী ভাষায় রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং যাদান ফাররুখ নামক একজন অনুবাদককে প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ প্রদান করেন।^{২৫} এ উদ্যোগের ফলে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে আরবী ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং উচ্চ পর্যায়ের আমলা থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী পর্যন্ত সকলের মাঝে আরবী চর্চার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৬.৩ আরবী মুদ্রার প্রচলন: মহানবী সা. এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন বিদ্যমান ছিলনা। এ সময়টিতে মুসলমানগণ তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রা ব্যবহার করতেন। মহানবী সা. এর পর খিলাফাতে রাশেদার যুগেও উক্ত অবস্থা বিদ্যমান থাকে। উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে শাসকগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাঠামো সুদৃঢ় করার প্রতি মনোযোগী হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা উমাইয়া শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫) উমাইয়া সাম্রাজ্যের শাসক হলে তিনি ৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং মুদ্রায় আরবী ভাষা ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো আরবী মুদ্রার প্রচলন। উক্ত মুদ্রার এক পৃষ্ঠে পবিত্র কুরআনের আয়াত **أحد الله هو قل** ও অপর পৃষ্ঠে **رسول الله محمد** অঙ্কিত ছিল।^{২৬} তবে কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন, মুদ্রার এক পৃষ্ঠে **رسول الله محمد** অঙ্কিত ছিল। পরবর্তীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ **أحد الله هو قل** ও অপর পৃষ্ঠে **رسول الله محمد** অঙ্কিত ছিল।^{২৭} বাক্যটির শেষে **والدين الحق** বাক্যটি সংযুক্ত করেন।^{২৮}

৬.৪ আরবী বর্ণলিপির সংস্কার সাধন ও নতুন ধারাবাহিকতার উদ্ভাবন

আরবী বর্ণমালার উৎপত্তি আরামীয় লিপি থেকে যা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবী লিপির দুটি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত এতে শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ বিদ্যমান ছিল, কোন স্বরবর্ণের উপস্থিতি ছিলনা। অন্যদিকে আরামীয় লিপিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা আরবী ভাষার তুলনায় ছিল কম। তাই একই আরামীয় বর্ণ আরবী ভাষার একাধিক বর্ণ নির্দেশে ব্যবহার করা হত।^{২৯} এ সমস্যার কারণে একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ লক্ষ্য করা যেত। দ্বিতীয়ত আরামীয় লিপিতে বিন্দু বিশিষ্ট (النقطة) বর্ণের ব্যবহার না থাকায় আরবী বর্ণসমূহে কোন প্রকারের বিন্দু বিদ্যমান ছিল না। ফলে একই আকৃতির বর্ণগুলোর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হত না। এ জাতীয় সমস্যার কারণে বিশুদ্ধ আরবী পঠন ও লিখন অনেকের নিকট জটিল আকার ধারণ করে। উল্লিখিত সমস্যা নিরসনের জন্য সপ্তম শতক থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের নির্দেশে সাদৃশ্যপূর্ণ অক্ষর (ب - ت - ث - س -) সমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নুকতার প্রবর্তন করেন।^{৩০} এছাড়াও এ যুগে আরবী বর্ণের নতুন ধারাবাহিকতার উদ্ভাবন করা হয়। প্রাচীন যুগে আরবগণ আরবী বর্ণ লেখার ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা ব্যবহার করত, তা বর্তমানে প্রচলিত ধারাবাহিকতা থেকে ভিন্ন। প্রাচীন যুগে আরবী বর্ণের যে ধারাবাহিকতাটি ছিল **أ ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ**^{৩১}

এভাবে প্রায় হিজরী প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। উক্ত ধারাবাহিকতায় বর্ণগুলোর মাঝে সাদৃশ্যতা না থাকায় লেখালেখি ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার আশংকা তৈরী হয় এবং বর্ণগুলোর মাঝে সাদৃশ্যতা নিয়ে আসার লক্ষ্যে নতুন করে সাজানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে নতুন ধারাবাহিকতা উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং নাসর ইবনে আসিম ও ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামুরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টায় প্রাচীন ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্ণের সাদৃশ্যতা অনুযায়ী নতুন ধারাবাহিকতায় আরবী বর্ণগুলো সাজানো হয়।^{৩২} বর্তমানে আরবী বর্ণগুলো যে ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে^{৩৩} **أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي**

৬.৫ আরবী বর্ণে হরকত, তাশদীদ ও মদ্বের ব্যবহার: প্রাচীন যুগে আরবী বর্ণসমূহে হরকতের ব্যবহার না থাকায় আরবী লিপিতে তা অনুপস্থিত থাকে। উমাইয়া যুগে ইসলাম বিস্তৃতির কারণে প্রচুর অনারবদের সাথে আরব জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটে। এ সময় আরবী লিপিতে হরকত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী আরবী ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের বিভিন্ন পদসমূহের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য যবর (فتحة), যের (كسرة), পেশ (ضممة) উদ্ভাবন করেন, কিন্তু এগুলোর স্বরূপ ততটা সমৃদ্ধ ছিল না। কেননা তিনি হরকত প্রয়োগের ক্ষেত্রে নুকতা ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে

বর্ণের উপরে নুকতা থাকলে তা যবর হিসেবে ব্যবহার হবে, বর্ণের পাশে নুকতা থাকলে তা পেশ হিসেবে ব্যবহার হবে এবং বর্ণের নিচে নুকতা থাকলে তা যের হিসেবে ব্যবহার হবে।^{৩৩} এ নিয়মটি প্রথমে কুরআন রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো। পরবর্তীতে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা তৈরী হয়। আর তা হলো বিন্দু বিশিষ্ট বর্ণসমূহের সাথে হরকতের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ বিন্দু বিশিষ্ট বর্ণসমূহে কোনটি বর্ণের বিন্দু এবং কোনটি হরকতের বিন্দু তা বোঝা কষ্টকর হয়ে উঠে এবং বর্ণটি উচ্চারণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়। ফলে পরবর্তীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে নাসর বিন আসিম আল লাইসি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে হরকত ব্যবহারের একটি নীতি উপস্থাপন করেন। উক্ত নীতিমালায় আরবী ভাষায় যবর (فتحة), যের (كسرة) ও পেশ (ضمة) এর জন্য ُ, ِ, ِ এ তিনটি চিহ্ন উদ্ভাবন করা হয় এবং َ এর ব্যবহার পেশ (ضمة) এর জন্য, ِ এর ব্যবহার যবর (فتحة) এর জন্য ও ِ এর ব্যবহার যের (كسرة) এর জন্য নির্ধারণ করা হয়।^{৩৪} এছাড়াও এ যুগেই الهمزة القطعية ও الهمزة الوصلية এর পার্থক্য নিরূপন করা হয় এবং مد ও تشدید এর চিহ্নসমূহ উদ্ভাবন করা হয়। আরবী বর্ণ লেখালেখির ক্ষেত্রে অদ্যবধি উক্ত রীতি-নীতি আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৬.৬ অভিধান চর্চার সূচনা: উমাইয়া যুগে অভিধান চর্চার সূচনা আরবী ভাষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশকে নির্দেশ করে। এই সময়ে আরবী ভাষা সংরক্ষণ ও সংযোজন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে আরবী ভাষার অভিধান সংকলনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। মূলত ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য জাতির ভাষার প্রভাব থেকে আরবীকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে অভিধান চর্চার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ সংকলন, শব্দের অর্থ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ তথ্য আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। অভিধান চর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে শব্দ সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ভাষাবিদগণ বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করে স্থানীয় লোকদের থেকে বিভিন্ন জিনিসের নাম জানতেন এবং তা লিপিবদ্ধ করতেন। এ ক্ষেত্রে শব্দ সংগ্রহের ধারাবাহিকতায় তা সাজানো হতো। মূলত শব্দ সংকলনের পদ্ধতি হাদীস সংকলনের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।^{৩৫}

দ্বিতীয় পর্যায়ে সংকলিত শব্দগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে লিপিবদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ যে সকল শব্দগুলো পূর্বে সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোকে বাছাই করে বিষয় ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এবং তা ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন খেজুর ও আঙ্গুর গাছের উপর ভিত্তি করে كتاب النخل والكرم রচনা করা হয়। গাছপালা এবং উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে كتاب النبات والشجر রচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ আবু য়ায়েদ আল-আনসারীর كتاب المطر পুস্তিকাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।^{৩৬}

৬.৭ নতুন শব্দ ও পরিভাষা সৃষ্টি: উমাইয়াদের আরবীকরণ কার্যক্রমটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এ যুগে আরবী ভাষায় নতুন শব্দ ও পরিভাষা সৃষ্টির মত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে আরবী ভাষাকে প্রভাবিত করে। কেননা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম আরবী ভাষায় পরিচালিত হওয়ায় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন নতুন আরবী পরিভাষা তৈরী হয়।^{৩৭} যেমন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দীওয়ান,^{৩৮} আমীর,^{৩৯} খারাজ^{৪০} ইত্যাদি শব্দগুলো নতুন পরিভাষাকে বুঝানোর জন্য তৈরী করা হয়। ধর্মীয় এবং আইনগত বিষয়ে শরীয়াহ,^{৪১} ফিকাহ,^{৪২} কাজী^{৪৩} ইত্যাদি শব্দগুলো নতুন পরিভাষা হিসেবে আরবী ভাষায় সংযুক্ত হয়। এ যুগে অন্যান্য পরিভাষার বিকাশের সাথে সাথে সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিভাষার সূচনা হয়। এ ক্ষেত্রে আদাব,^{৪৪} দীওয়ান,^{৪৫} কালাম^{৪৬} ইত্যাদি শব্দগুলোকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। উমাইয়াদের শাসনামলে নতুন শব্দ ও পরিভাষা সৃষ্টির অন্যতম কারন হিসেবে যে বিষয়টিকে লক্ষ্য করা যায় তা হলো অন্যান্য সংস্কৃতি বিশেষ করে পারস্য, বাইজেন্টাইন ও মিসরীয়দের সাথে আরবদের উল্লেখযোগ্য সংমিশ্রণ। এ সংমিশ্রণ আরবী ভাষায় বিভিন্ন বিদেশী শব্দ ও পরিভাষা যুক্ত করার দিকে পরিচালিত করে।^{৪৭}

৭. উপসংহার

উমাইয়া যুগ আরবী ভাষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ যুগে আরবী ভাষা একটি আঞ্চলিক উপভাষা থেকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকারী ভাষা হিসাবে আরবী ভাষার প্রমিতকরণ উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে একীভূত করে এবং বিশাল বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে যোগাযোগের সুবিধা স্থাপন করে। অনারব অঞ্চলগুলিতে উমাইয়াদের সম্প্রসারণ বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণকে উৎসাহিত করে, যা আরবী ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শনকে ব্যাপক সমৃদ্ধ করে তোলে। আরবী ভাষার এ উত্তরণে উমাইয়া খলীফাদের ব্যাপক অবদান লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত আরবী অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান আরবী ভাষার বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। উমাইয়া যুগের বিবর্তন প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র ভাষাগত উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে আরব বংশোদ্ভূত নাগরিক ছাড়াও অনারব জনগোষ্ঠীকে আরবী ভাষা চর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা যায়। মূলত উমাইয়া যুগে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক যে বিবর্তন ঘটে তা তাৎক্ষণিক এবং স্থায়ী উভয় উপায়ে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষত তা আরবী ভাষার উপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। উমাইয়া যুগে আরবী ভাষা বিকাশের ফলে যে প্রভাবগুলো লক্ষ্য করা যায় তার উল্লেখযোগ্য হলো: ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী শব্দাবলীর ব্যবহার বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরবী ভাষার মূল্যায়ন, সমাজে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য, সাহিত্যে নতুন ধারার রচনামূল্যবোধের বিকাশ, অনারবদের আরবী ভাষা চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। অধিকন্তু, এই ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক একত্রীকরণ একটি স্বতন্ত্র আরব পরিচয়কে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। সামগ্রিকভাবে, উমাইয়া যুগের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিকাশ কেবল ইসলামী সভ্যতার গতিপথকে রূপ দেয়নি বরং মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর ভাষাকে প্রভাবিত করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকা একটি উত্তরাধিকারও তৈরী করতে সক্ষম হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ৪৫।
- ^২ আহমাদ ইসকান্দারী ও অন্যান্য, আল-মুফাচ্ছাল ফি তারীখিল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল ইহইয়াউল উলুম, ১৯৯৪খ্রি.) পৃ. ১৯।
- ^৩ আহমাদ হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরবী (বৈরুত: দারুল মারিফাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০০খ্রি.) পৃ. ১৮২।
- ^৪ সৈয়দ সুলাইমান নাদভী, তারীখু আরদিল ১ম খণ্ড (দামেস্ক: দারুল কলাম, ১ম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১০৫।
- ^৫ <https://ar.m.wikipedia.org/wiki/semitic> (লগইন তারিখ: ১৫/০৩/২০২৩খ্রি.)
- ^৬ ইয়াকুব আর-রাহাভির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:
يعقوب الرهاوي (٦٤٠-٧٠٨م) أحد أشهر الكتاب السريان. ولد بلدة عين دابا بالقرب من حلب حوالي سنة ٦٤٠ وتلقى علومه بدير قنشرين الشهير. وانتقل لاحقا إلى الإسكندرية ليكمل دراساته اللاهوتية. وبعد عودته تم تعيينه اسقفا على مدينة الرها، واشتهر بتطبيقه الحرفي للتقاليد الكنسية وتعصبه لها مما أدى إلى عزله بعد سنوات معدودة، فاستاء يعقوب وانكفأ بدير صغير قرب مدينة شيشط الواقعة بتركيا حاليا حيث دأب على الكتابة وتعليم الفلسفة الإغريقية مما أدى إلى السخط عليه مجددا من قبل بعد السريان المعادين للثقافة اليونانية. تحول مرة إلى «دير تل معدة» شمالي حلب فدأب على تفسير إنجيل البشيطنا باستخدام مراجع يونانية كما عمل على تطوير نظام للتنقيط بالسريانية بتبني حروف يونانية كمصونات. وفي أواخر سنواته تولى كرسي الأسقفية بالرها قبل أشهر معدودة وفاته. خلف يعقوب الرهاوي المئات من الكتب والمخطوطات في مواضيع متنوعة كاللاهوت والفلسفة والتاريخ واللغويات ما جعله أحد أهم الكتاب السريان بجوار أفرام السرياني وابن العبري. https://ar.wikipedia.org/wiki/يعقوب_الرهاوي (لগইন তারিখ: ১৫/০৩/২০২৩খ্রি.)
- ^৭ এ প্রসঙ্গে বুলুস বেহনাম (Gregorius Bulus Behnam) এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:
وأول عالم سرياني أطلق هذه التسمية على مجموعة اللغات الشرقية هذه هو يعقوب الرهاوي المتوفي ٧٠٨م. وجرى العلماء السريان على أثر الرهاوي فاستعملوا هذا الاصطلاح قبل شلوتسر بقرون كثيرة. منهم المؤرخ السرياني المجهول في القرن الثاني عشر، وابن العربي في القرن الثالث عشر. فيكون الزعم بأن شلوتسر أول من استعمل هذا الاصطلاح بعيد عن الصحة. لأن العلماء السريان سبقوه إلى ذلك بعدة قرون. ولكن مما يؤسف له أن هذه المؤلفات مازالت بلغتها السريانية بعيدة عن أعين الباحثين المعاصرين.

- দ্র. বুলুস বেহনাম, আল আলাকাতুল জাওহারিয়াহ বায়নাল লুগাতায়নি আল আরবিয়াহ ওয়াল আরামিয়াহ *মাজল্লাতুল মাজমা' ইল 'ইলমিল আরাবি*, দামিষ্ক, ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ সংখ্যা, দামেস্ক, অক্টোবর, ১৯৫৮ খ্রি., পৃ. ৫৭০।
- ^৮ Kees Versteegh, *The Arabic Language* (New York: Columbia University Press, 1997), p: 9.
- ^৯ Clive Holes, *Modern Arabic: Structures, Functions and Varieties* (Washington, D.C: Georgetown University Press, 2004), p: 10.
- ^{১০} জুরজী যায়দান, *আল লুগাতুল আরবিয়াহ কায়িনুন হাইয়ুন* (কায়রো: মুয়াসাসাতুল হিন্দাবী, ২০১২খ্রি.) পৃ. ২৭।
- ^{১১} পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম চীনে অভিধানচর্চার শুভ সূচনা হয়। খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে বাউতিশি নামক জনৈক ভাষাবিদ ৪০ হাজার শব্দ সম্বলিত একটি অভিধান রচনা করেন। অতঃপর ওয়ারু নামক একজন পণ্ডিত ল্যাটিন ভাষায় 'লিঙুয়া ল্যাটিনিয়া' (Lingua Latini) নামে একটি অভিধান রচনা করেন। ১৭৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রীক ভাষাবিদ ইউলিউস বুলাকিস গ্রীক ভাষায় আরেকটি অভিধান প্রণয়ন করেন। দ্র. <https://ar.wikipedia.org/wiki/معجم> (লগইন তারিখ: ১৫/০৩/২০২৩খ্রি.)
- ^{১২} ড. সুহাইল তাকুস, *তারীখুদ দাওলাতিল উমাবিয়াহ* (বৈরুত: দারুন নাফায়িস, ৭ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৫।
- ^{১৩} বুছাইনা বিন হাসান, *আদ দাওলাতুল উমাবিয়াহ ওয়া মুকাওয়াতুহাল আইদোলিজিয়া ওয়াল ইজতিমাইয়াহ* (তিউনিসিয়া: মাতবায়াতুর রাসমিয়াহ লিল জামহুরিয়াতু তিউনিসিয়াহ, ১ম সংস্করণ, প্রকাশনা তারিখ নেই।), পৃ. ১২।
- ^{১৪} ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়াল-নিহায়া*, ৮ম খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৬৪।
- ^{১৫} ড. সুহাইল তাকুস, *তারীখুদ দাওলাতিল উমাবিয়াহ*, পৃ. ৯৯।
- ^{১৬} এ প্রসঙ্গে আদ দাওলাতুল উমাবিয়াহ গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য:
- وأراد أن يجعل الحكم العربي الإسلامي عربيا إسلاميا خالصا، فاستبعد من الإدارة غير العرب الذين كانوا عليها. كعائلة سرجون بن منصور وأحصر بدلا منهم عربا مسلمين. وعمل الوليد على أن يكون عصره عصر تقدم في الحضارة والمدنية والعمران والاقتصاد والوراعة والإدارة.
- দ্র. ড. ইউসুফ আল আশ, *আদ দাওলাতুল উমাবিয়াহ* (দামেস্ক: দারুন ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৬।
- ^{১৭} The Umayyad Caliphate ruled over a vast multiethnic and multicultural population. Christians, who still constituted a majority of the caliphate's population, and Jews were allowed to practice their own religion but had to pay the jizya (poll tax) from which Muslims were exempt.
- দ্র. https://en.wikipedia.org/wiki/Umayyad_Caliphate (লগইন তারিখ: ১৫/০৩/২০২৪ খ্রি.)
- ^{১৮} জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরবিয়াহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুন ফিকর, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ২৪০।
- ^{১৯} এ প্রসঙ্গে হামদী শাহীন বলেন,
- ومن الجدير بالذكر هنا أن اهتمام الأمويين بالشعر لم يقتصر على هذه الجوانب المتعددة بل امتد أيضا إلى محاولة جمعه وتدوينه، حيث كلف الوليد بن عبد الملك جمادا الراوية بجمع الشعر الجاهلي في ديوان.
- দ্র. হামদী শাহীন, *আদ দাওলাতুল উমাবিয়াহ আল মুফতারাহ আলাইহা* (যুক্তরাজ্য: মুআসাসাতু হিন্দাবী, ১ম সংস্করণ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৮।
- ^{২০} এ প্রসঙ্গে আদ দাওলাতুল উমাবিয়াহ আল মুফতারাহ আলাইহা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়:
- لقد أدرك الأمويون أهمية الشعراء في الدعاية السياسية لهم إزاء الأحزاب السياسية الأخرى، وأهميتهم في إبراز منجزات الدولة ودحض حجج الخصوم. ولذلك فقد جمعوا حولهم جماعة من أكابر الشعراء في ذلك العصر.
- দ্র. হামদী শাহীন, *আদ দাওলাতুল উমাবিয়াহ আল মুফতারাহ আলাইহা*, পৃ. ৪৫৯।
- ^{২১} গ্রীক পণ্ডিত পিতাগোরাস (মৃ. ৪১১ খৃ. পূ.) ভাষা সংক্রান্ত প্রাথমিক নীতিমালার গোড়াপত্তন করেন। তিনি গ্রীক ভাষার বিশেষ্য পদ ও লিঙ্গান্তরের উপর আলোচনা করেন। তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিত প্রদিকিউস সমার্থবোধক শব্দাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তবে গ্রীকদার্শনিক এরিস্টটলের হাতে এ শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে বলে জানা যায়। রোমান সম্রাট পম্পিউসের শাসনামলে (খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) পণ্ডিত দাইনি-সিউস্ট্রাকস ল্যাটিন ভাষায় পদান্ত ও পদ-বিন্যাস শাস্ত্র রচনা করেন। আরবগণ প্রথমে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতগণের নিকট হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে আরবী ভাষায় ব্যাকরণ শাস্ত্র (علم النحو) রচনায় অগ্রহী হন। পরবর্তীতে সিরীয় পণ্ডিতগণের অনুসৃত নিয়ম-রীতিকে অনুসরণ করে আরবগণ এ পথে অগ্রসর হন। আরবগণ ইরাক বিজয়ের পর সিরিয়দের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। এ সুবাদে সিরিয় সাহিত্য সংস্কৃতির সাথেও তাদের পরিচিতি ঘটে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরিয় পণ্ডিতগণ ভাষা সংক্রান্ত নানা বিধি-

বিধান উদ্ভব করেন। কালক্রমে এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রভূত উন্নতি লাভ করে উক্ত বিষয়ে অগণিত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আরবী ও সিরিয় উভয় ভাষাই সেমিটিক পরিবারের সদস্য। তাই কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, আরবী বাক্য-প্রকরণ প্রকৃতার্থে সিরিয় বাক্যেরই প্রকারভেদ।

দ্র. জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবুল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।

২২ আবুল আসওয়াদ: আবুল আসওয়াদের প্রকৃত নাম জালিম ইবন আমর। তাঁর মাতার দিক দিয়ে তিনি কুরাইশ বংশের আব্দুল্লাহ ইবন কুসাই এর অধঃস্তন পুরুষ। মহানবীর সা. হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে জন্ম লাভ করেন। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবৈয়ী। আলীর সমর্থনে সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধেও আয়িশার রা. সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনায় শরীক হন। শেষ জীবনে তিনি বাসরায় অবস্থান করেন এবং ৬৯হি./৬৮৮খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৬০খ্রি.), পৃ. ১০৭।

২৩ রফিক আল মাহায়িনি, *তারীখু খিলাফাতিল উমাবিয়াহ ওয়াল আব্বাসিয়াহ* (দামেস্ক: দারুল ইয়াকযাহ আল আরাবিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ৩০।

২৪ এ প্রসঙ্গে *তারীখুল উম্মাতিল আরাবিয়াহ* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়:

لم يزل ديوان الشام بالرومية حتى ولي عبد الملك بن مروان، فلما كانت سنة ٨١ أمر بنقله. وذلك أن رجلا من كتاب الروم أن يكتب شيئا فلم يجد ماء، فبال في الدواة. فبلغ ذلك عبد الملك فأدبه وأمر سليمان بن سعد بنقل الديوان. فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة، ففعل ذلك وولاه الأردن، فلم تنقص السنة حتى فرغ من نقله.

দ্র. মুহাম্মাদ আসআদ তালাস, *তারীখুল উম্মাতিল আরাবিয়াহ* (আসরুল ইত্তিসাক), ৪র্থ খণ্ড (যুক্তরাজ্য: মুআসসাসাতু হিন্দাবী, ১ম সংস্করণ, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১১০।

২৫ তদেব, পৃ. ১৮৪-১৮৫।

২৬ আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৮২; মুহাম্মাদ আসআদ তালাস, *তারীখুল উম্মাতিল আরাবিয়াহ* (আসরুল ইত্তিসাক), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৮-১০৯।

২৭ ইবনুল আছীর, *আল কামিল ফিত তারীখ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৬১।

২৮ আবুল ফিদা, *কিতাবুল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল লুবনানী, তা.বি.), পৃ. ১৩৩।

২৯ বসরার বিখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ নাসর ইবনে আসিমকে আরবী লিপির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামুরের সহযোগিতায় আরবী ভাষা ও লিপির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা শুরু করেন। অবশেষে তাঁরা উভয়ে প্রতিটি অক্ষরকে আলাদা করার জন্য বিন্দুগুলির একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। দ্র. আবুল ফিদা, *কিতাবুল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

৩০ আব্দুল ফাতাহ উবাদাহ, *ইনতিশারুল খাতিল আরাবী ফিল আলামিশ শারকি ওয়াল আলামিল গারবি* (যুক্তরাজ্য: মুআসসাসাতু হিন্দাবী, ১ম সংস্করণ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৬।

৩১ ড. আলী ইবরাহীম মুহাম্মাদ, *তারীখুল কিতাবাতিল আরাবিয়াহ* (মিসর: দারুল মাশরিক আল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৭১।

৩২ আব্দুল ফাতাহ উবাদাহ, *ইনতিশারুল খাতিল আরাবী ফিল আলামিশ শারকি ওয়াল আলামিল গারবি*, পৃ. ২৬।

৩৩ তদেব, পৃ. ২৮।

৩৪ জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, পৃ. ২৪০; আব্দুল ফাতাহ উবাদাহ, *ইনতিশারুল খাতিল আরাবী ফিল আলামিশ শারকি ওয়াল আলামিল গারবি*, পৃ. ২৮-২৯।

৩৫ এ প্রসঙ্গে আহমাদ আমীন বলেন,

فالعلم يرحل إلى البادية يسمع كلمة في المطر، وكلمة في اسم السيف وأخرى في الزرع والنبات، وغيرها في وصف الفتي أو الشيخ إلى غير ذلك. فيدون كل ما سمع من غير ترتيب إلا ترتيب السماع، كالحدث كان يسمع حديثا في الوضوء وحديثا في البيع وحديثا في الميراث. فيجمع ذلك كله على ما سمع من غير ترتيب.

দ্র. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৬খ্রি.), পৃ. ২৬৩-২৬৬।

৩৬ এ প্রসঙ্গে ইমিল ইয়াকুব বলেন,

وتوجهت هذه المرحلة بكتب تؤلف في الموضوع الواحد أي كل كتاب في موضوع، وهذه هي مرحلة تدوين اللغة مرتبة في رسائل متفرقة صغيرة محدودة الموضوع، مبنية على معنى من المعاني، أو على حرف من الحروف؛ مثل كتاب المطر لأي زيد الأنصاري، وللأصمعي كتب؛ منها: كتاب الإبل والخيول، وكتاب أسماء الوحوش وصفاتها، وكتاب النخل والكرم، وكتاب النبات والشجر.

- দ্র. ইমিল ইয়াকুব, আল মাজমুল লুগাবিয়াহ আরাবিয়াহ (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইয়ান, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ২৮।
- ^{৩৭} জুরজী যায়দান, আল লুগাহ আল আরাবিয়াহ কায়িনুন হাইয়ুন, পৃ. ৩৯-৪৬।
- ^{৩৮} **দীওয়ান:** দীওয়ান মূলত একটি ফার্সি শব্দ। উমাইয়া যুগে দীওয়ান রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগ বিশেষ করে ট্রেজারি এবং ট্যাক্স অফিসগুলিকে নির্দেশ করে। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ديوان>
- ^{৩৯} **আমীর:** আমীর শব্দটির অর্থ কমান্ডার বা গভর্নর। শব্দটি প্রাদেশিক শাসকদের জন্য ব্যবহৃত হত যারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে খলিফার কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করত। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/امير>
- ^{৪০} **খারাজ:** খারাজ শব্দটির অর্থ ভূমি কর। খারাজ ছিল উমাইয়া কর ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য শব্দ যার ব্যবহার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের কারণে নতুন অঞ্চলসমূহে বৃদ্ধি পায়। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/خراج>
- ^{৪১} **শরীয়াহ:** ইসলামী আইনের মূল অংশ যা হাদিস ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে রচিত সুবিন্যস্ত একটি রূপ। উমাইয়া যুগে শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/شريعة>
- ^{৪২} **ফিকাহ:** ফিকাহ শব্দটির মূল অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা। ফিকাহ শব্দটি ইসলামী আইনশাস্ত্র বুঝানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। উমাইয়া শাসনামলে ফিকাহ এর প্রাথমিক চিন্তাধারা তৈরী হতে শুরু করে এবং ফকীহগণ তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ শাস্ত্রটির বিকাশে ভূমিকা পালন করে। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/فقه>
- ^{৪৩} **কাজী:** শরীয়া আইন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত বিচারক ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য কাজী শব্দটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয়। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/قاضي>
- ^{৪৪} **কালাম:** এই শব্দটি ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়কে বোঝায়। যদিও আব্বাসীয় যুগে কালামের আনুষ্ঠানিক রূপ (ইসলামী ধর্মতত্ত্ব) সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল, তবে এর সূচনা উমাইয়া যুগ থেকে লক্ষ্য করা যায়। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/كلام>
- ^{৪৫} **আদাব:** প্রাথমিকভাবে যার অর্থ শিষ্টাচার বা ভাল আচরণ। উমাইয়া যুগে আদাব পরিভাষাটি বিকশিত হয় সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ادب>
- ^{৪৬} **দীওয়ান:** প্রশাসনিক অর্থে দীওয়ান একটি সরকারী দফতরকে উল্লেখ করলেও সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ কবিতার সংকলন, যা আরব বিশ্বের সমৃদ্ধ কাব্যিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। দ্র. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ديوان>
- ^{৪৭} জুরজী যায়দান, আল লুগাহ আল আরাবিয়াহ কায়িনুন হাইয়ুন, পৃ. ৬৭-৬৮।

আব্বাসীয় যুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে আল-জাহিয এর অবদান [Contribution of Al-Jahiz to the Excellence of Arabic Prose Literature in the Abbasid Period]

ড. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম*

[Abstract: In the field of Arabic prose literature Al-Jahiz was one of the illustrious personalities in Abbasid period (750-1258 AD.) He was born in Basra of Iraq in 776 AD. He was Arabic prose writer and author of works of literature. Prose is unfading peace of Arabic literature. Prose has a trace or every walk of Arab life along with peace and so more. He along with his books *Kitabul Haiwan*, *Kitabul Bukhala*, *Kitabul Baian wat-Tabeen*, *Kitabul Amsal*, *Kitabu Khalqil Quran* etc. has achieved wide ranging acceptance among the literature all over the world. Although Al-Jahiz was very good presenting humour is his writing. We also get the social, Political and Cultural Picture of the Contemporary. This bright star of the literature was diminished in 868 A.D. We have discussed in this article about the short life and contribution of Al-Jahiz in Arabic prose literature.]

Keywords: Arabic Prose, Abbasid Period, Al-Jahiz, Kitabul Amsal, Contribution.

১. ভূমিকা

আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক আল-জাহিয। তিনি ১৬০ হিজরী মোতাবেক ৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবকালেই আল-জাহিয এর পিতা ইত্তিকাল করেন। তারপর তাঁর মা তাঁকে লালন পালন করেন এবং পিতৃহীন পরিবারে ছিল করুন দারিদ্রতা। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে স্থানীয় মকতবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এ সময়ে বসরার মসজিদে জরানী-গুণী, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের সমাবেশ ঘটত। আল-জাহিয ঐ সমস্ত সমাবেশে উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের নিকট থেকে লেখাপড়া শিখতেন। তিনি স্বীয় প্রখর দীক্ষা দ্বারা জ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করতেন। আল-জাহিয প্রকৃত পক্ষেই জ্ঞান পিপাসু ও বিদ্যুৎসাহী ছিলেন। তিনি ‘আল-মিরবাদ’ নামক স্থানে আরব বাগীদের নিকট হতে অলংকার বিদ্যা ও বাক্যবিন্যাসের কলা-কৌশল আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হন। আল-জাহিয ফিকহুল লুগাহ তথা আরবী ভাষাতত্ত্ব, আরবী সাহিত্যিক এবং আরবী কাব্যের সমকালীন প্রসিদ্ধ কবিদের নিকট গমন করে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বসরা হতে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। ফলে বহিঃবিশ্বের ধারণাও তাঁর মনে স্থান লাভ করে। আল-জাহিয প্রাচীন দর্শন বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এ্যারিস্টোটলের দর্শন, মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের চিন্তার দিগন্ত প্রসারণ এবং দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত রূপ প্রদানে সমর্থ হন। আব্বাসীয় যুগে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) আরবী গদ্য সাহিত্য চর্চায় তিনি ছিলেন শীর্ষে। কেউ কেউ তাঁকে আরবী গদ্য সাহিত্যের জনক বলে থাকেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে *কিতাবুল বুখালা*, *কিতাবুল হাইওয়ান*, *কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন*, *কিতাবু খালকিল কুরআন*, *কিতাবুল আমছাল* প্রভৃতি তাঁকে আরবী সাহিত্যাকাশে অমর করে রেখেছে। আরবী গদ্য সাহিত্যের এ খ্যাতিমান পণ্ডিত ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইত্তিকাল করেন।

২. আল-জাহিয এর পরিচয়

আল-জাহিয ছিলেন আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক। তাঁর পুরো নাম ‘আমর ইবন বার ইবন মাহবুব আল-কিন’আনী আল-ফুকাযমী আল-বাসরী।’ পিতার নাম ‘আমর ও দাদার

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

নাম বার। আল-জাহিয় তাঁর প্রকৃত নাম নয়, বরং এটি তাঁর উপাধি। এ উপাধি লাভের কারণ- তাঁর চক্ষুর আকৃতিতে জন্মগত ত্রুটি ছিল। ‘জাহিয়’ শব্দের অর্থ যার চোখের মণি বাইরের দিকে স্ফীত। তাঁর চক্ষুদ্বয় গভীর কৌঠর থেকে উদগত ছিল বিধায় তাঁকে কৌতুক করে আল-জাহিয় নামে ডাকা হতো এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।^{১২} আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্যিক আল-জাহিয় ১৬০ হিজরী মোতাবেক ৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবকালেই আল-জাহিয় এর পিতা ইন্তিকাল করেন। তারপর তাঁর মা তাঁকে লালন পালন করেন। পিতৃহীন পরিবারে ছিল করুণ দারিদ্রতা। যার ফলশ্রুতিতে তিনি শৈশবেই বসরার সীহান নদীর তীরে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার কখনো কখনো রুটি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করতেন। আবার কখনো তরমুজ বিক্রি করে পরিবারের কষ্ট লাঘবে সহায়তা করতেন।^{১৩} আল-জাহিয় স্থানীয় মকতবে স্বীয় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তৎপর তিনি ফিকহুল লুগাহ, আরবী সাহিত্যিক এবং আরবী কাব্যের সমকালীন প্রসিদ্ধ কবিদের নিকট গমন করে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এ ভাবেই তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করেন এবং প্রচলিত ও ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টির ক্ষেত্রেও যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি বসরা হতে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। ফলে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।^{১৪} আল-জাহিয় প্রাচীন দর্শন বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এ্যারিস্টোটলের দর্শন, মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব, সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের চিন্তার দিগন্ত প্রসারণ এবং দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত রূপ প্রদানে সক্ষম হন।^{১৫} তিনি ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে যাদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে আন-নায্যাম^{১৬} এবং ছুমামা ইবনুল ‘আশরা^{১৭} এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল-জাহিয় বসরার যে সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিদ ও পন্ডিতগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন তাঁরা হলেন- ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ৭৯৮ খ্রি.)^{১৮}, আবু ‘উবায়দাহ মা‘মার ইবন আল-মুসান্না (মৃ. ৮২৪ খ্রি.)^{১৯}, আল- আসমাঈ (৮৩০ খ্রি.)^{২০}, আবু যায়দ আল- আনসারী (মৃ. ৮৩২ খ্রি.)^{২১}, আবুল হাসান আল-আখফাশ (মৃ. ৮৩০ খ্রি.) প্রমুখ।^{২২}

আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক আল-জাহিয় শেষ জীবনে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ দিন এ রোগ ভোগ করতে থাকেন। এ সময় তিনি জন্মস্থান বসরায় ফিরে আসেন। এ রোগের পাশাপাশি তিনি ‘আল-নিকরিস রোগেও আক্রান্ত হন। তিনি স্বীয় রোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,^{২৩}

انا من جانبي الايسر مفلوج فلو فرض بالمقاريض ما علمت و من جانبي اليمين منقرس فلو مري الذباب لاملت

“আমার বাম পার্শ্ব পক্ষাঘাত গ্রস্থ। ফলে বাম দিকে কাঁচি চালালেও আমি টের পাই না। আর ডান পার্শ্ব নিকরিস আক্রান্ত। ফলে এ অংশে মাছি বসলেও ব্যাথা পাই।”

আল-জাহিয় দীর্ঘ দশ বছর পক্ষাঘাত ও নিকরিস রোগে আক্রান্ত হয়ে এমন শক্তিহীন হয়ে পড়েন যে, বিছানা থেকে উঠার মতো সক্ষমতা ছিল না। অবশেষে তিনি ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

৩. আরবী গদ্যসাহিত্য চর্চায় আল- জাহিয় এর অবদান

আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) স্বর্ণময় অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ আরবী গদ্য সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন আল-জাহিয়। আরবী গদ্য সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করার জন্য যে সমস্ত সাহিত্যিক অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল-জাহিয়। সাহিত্যে বিশেষ করে সমালোচনা সাহিত্যকে পূর্ণতর রূপদানকারী হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, বিভিন্ন তথ্যসূত্রের মাধ্যমে আল-জাহিয় কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত রিসালা, ধর্মীয় পুস্তিকা এবং পাভলিপির উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো^{২৪}

কিতাবুল বুখালা (কৃপণদের সম্পর্কিত গ্রন্থ), কিতাবুল হাযম ওয়াল ‘আযম (প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা বিষয়ক গ্রন্থ) কিতাবুল আমছাল, (প্রবাদ-প্রবচন বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবু তাহসীনিলা আযওয়াল (ধন সম্পদের উন্নয়ন বিষয়ক

গ্রন্থ), কিতাবুল ওয়াদ ওয়াল ওয়াদীদ (প্রতিশ্রুতি ও ভীতি বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল হাইওয়ান (প্রাণীজগত বিষয়ক গ্রন্থ) কিতাবুল আওতান ওয়াল বুলদান (দেশ ও নগর বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল আওফাক ওয়াল রিয়াদাত (ব্যায়াম ও খেলাধুলা বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল আসনাম (প্রতিমা বা মূর্তি বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল জাওয়াবাত (উত্তরমালা বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল হিজরাতি ওয়ান নাবুয়াত (নাবুয়াত ও হিজরাত বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল 'আরাবি ওয়াল মাওয়ালী (আরব ও শৃংখলামুক্ত দাস বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবু ফী সিনা'আতিল কুওয়াদ (সমাজ পতিদের দক্ষতা বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল মা'আদিন (খনিজ সম্পদ বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবু যাম্মি আখলাকিল কুত্তাব (লেখকদের আচরণের দূর্নাম বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল মু'আল্লিমীন (শিক্ষকমণ্ডলী বিষয়ক গ্রন্থ), রিসালাতু ফী তাবাক্বাতিল মুগান্নিয়ীন (গায়কদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কিত রিসালাহ), কিতাবু ফী তাফযীলিল বাতন 'আলাল জাহর (বাহ্যিকতার উপর গোপণীয়তার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক গ্রন্থ), রিসালাতুন ফীল ওয়াকাল ওয়াল মুয়াক্কিলীন (গোমস্তা ও তাদের নিয়োগকর্তাদের সম্পর্কিত রিসালাহ), কিতাবুত তামছীল (দৃষ্টান্ত প্রদান বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবু তাহযীবিল আখলাক (চরিত্রের বিন্যাস বিষয়ক গ্রন্থ), রিসালাতুন ফী বায়ানি মায়াহিবিশ শী'আহ (শী'আহ মতবাদের বিবরণ বিষয়ক রিসালাহ), কিতাবু কিতমানিস সির ওয়া হিফয আল লিসান (রহস্য গোপন ও জিহবা সংবরন বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবুল 'আরশ ওয়াল 'আরুস (বিবাহ ও বাসর বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবু আখলাকিল মূলুক (রাজন্যবর্গের চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থ), রিসালাতুন ফী ইসতিনজায়িল ওয়াদ (প্রতিশ্রুতি পালন বিষয়ক রিসালাহ), কিতাবু আত'ইমাতিল 'আরাব (আরবদের খাদ্য বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবু আফ'আলিত তাবাস্ট (স্বভাবের কার্যাবলী বিষয়ক গ্রন্থ), কিতাবু ফীল আব্বাসীয়া (আব্বাসীয় বংশ সম্পর্কিত গ্রন্থ), কিতাবু খালকিল কুরআন (আল-কুরআনের সৃজন বিষয়ক গ্রন্থ) প্রভৃতি।^{১৫}

৪. আল-জাহিয রচিত কিছু গদ্য সাহিত্যের পর্যালোচনা

আরবী গদ্যের কিংবদন্তি সাহিত্যিক আল-জাহিয রচিত অসংখ্য গ্রন্থরাজী, যা তাঁকে অমর করে রাখবে সাহিত্য ভূবনে। তিনি আরবী গদ্য সাহিত্যকে বিভিন্ন ধারায় উপস্থাপন করেছেন। তাই কেউ কেউ তাঁকে আরবী গদ্য সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত করেছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হলো-

এক: কিতাবুল বুখালা (كتاب البخلاء)

'বুখালা' শব্দটি 'বাখিলুন' এর বহুবচন, অর্থ-কৃপণ। যেহেতু এ গ্রন্থে কৃপণতার বিষয়ে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিভিন্ন উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে, সেহেতু এ গ্রন্থটির নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। এতে আরবদের দানশীলতার প্রশংসা এবং আরব ও অনারবদের মধ্যে যারা কৃপণ তাদের কৃপণতার নিন্দাবাদ বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯৫০ সালে অধ্যায় ভিত্তিক ও ব্যাখ্যা সম্বলিতভাবে লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়।^{১৬} আল-জাহিয রচিত অসংখ্য গ্রন্থরাজীর মধ্যে কিতাবুল বুখালা গ্রন্থে আব্বাসীয় যুগের প্রচুর ঐশ্বর্যের সমাবেশে কৃপণদের জীবনচিত্র আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে যারা দরিদ্র ও অভাবী ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে ব্যবসা, শিল্প কিংবা জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে ধনী হয়েছে, আব্বাসীয় যুগে ইরাকের এমন কৃপণদের গল্প তিনি তাঁর আল-বুখালা গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।^{১৭} নিম্নে এর কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো-

ক. দলবদ্ধভাবে খাওয়া কষ্টকর

আবু নুওয়াস বলেন, আমরা একবার এক খোরাসানের অধিবাসীর সাথে বাগদাদ যাচ্ছিলাম। তিনি একাকী খেতে পছন্দ করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি একা একা খান কেন? উত্তরে তিনি বলেন, দলবদ্ধভাবে খেতে গেলে অন্যকেও খাবার দিতে হয়। এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, লোকটি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন।^{১৮}

খ. আল্লাহকে আহবান

আব্দুল্লাহ ইবন মাক্কী বলেন, ইসমাঈল ইবন গায়ওয়ান মাসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, মুসল্লীদের কাতার পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি সামনের

কাতার থেকে এক বৃদ্ধকে তার কাপড় ধরে টেনে এনে পেছনে দাঁড় করান এবং ইসমাঈল সামনে গিয়ে বৃদ্ধের ফাঁকা জায়গাতে দাঁড়ান। আর বৃদ্ধ পেছনে দাঁড়িয়ে তার কর্মকাণ্ড দেখছিলেন। অতঃপর বৃদ্ধ ঐ লোকটির সংকীর্ণমনা বা কৃপণপনা মনের জন্য আল্লাহকে আহবান করে তার জন্য বদ দু'আ করেন।^{১৯}

উল্লেখ্য, সুকুমার সাহিত্য প্রবাহমান আরবী গদ্য অলংকারিক শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। এ পদ্ধতিতে সাহিত্য চর্চা করায় আল-জাহিয় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও একটি প্রসিদ্ধ আবিষ্কারকের সম্মান লাভ হয়।^{২০} এ ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা গ্রন্থ হলো *কিতাবুল বুখালা*। এতে তিনি কৃপণ লোকদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্টময় চরিত্র সুনিপন শিল্পীর তুলির ন্যায় অংকন করেছেন। এ গ্রন্থের প্রশংসায় মন্তব্য করতে গিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক ড. তুহা হুসাইন বলেন,^{২১}

ومن اجود الكتب كتاب البخلاء و يحق اللغة العربية ان يفتخر به - قيمة هذا الكتاب لادري اهي في الجمال اللفظي ام في استقامة المعاني ام في حسب المعاني ام في هذا التصوير الدقيق الذي لا سقاس اليه تصوير حيوة البصرة و بغداد-

‘কিতাবুল বুখালা’ হলো উত্তম গ্রন্থসমূহের অন্যতম। আরবী ভাষায় এ গ্রন্থটি নিয়ে গর্ব করা যায়। আমি জানি না এ গ্রন্থের মূল্যায়ন কিসের ভিত্তিতে করব? সেটা কি শাব্দিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে, নাকি সঠিক ভাবার্থে, নাকি অর্থের প্রাচুর্যতায়, নাকি সূক্ষ্ম শৈল্পিক চিত্রায়নে করব? যাতে আল-জাহিয় এর সময়কার বসরা বা বাগদাদের চিত্র অংকিত হয়েছে।’

দুই: কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন (كتاب البيان والتبيين)

আল- জাহিয় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন* এ আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি আল-জাহিয়ার অনবদ্য সৃষ্টি; যা তাঁকে যুগ যুগ ধরে অমর করে রাখবে। সাহিত্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে উমাইয়া যুগ (৬৬১-৭৫০খ্রি.) ও আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮খ্রি.) এর অলংকার সমৃদ্ধ বাগ্মীতাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বিষয় গুলোর মধ্যে বাগ্মী, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, রাজা-বাদশাহ প্রমুখের ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে অলংকারের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ভাষার অস্পষ্টতা, স্বরচিহ্নে ত্রুটি বিচ্যুতি, দ্রুত কথা বলার সময় বুঝতে না পারা ইত্যাদি।^{২২} নিম্নে এ গ্রন্থের কিছু বিষয়ের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো:

ক. কবি সাহিত্যিক ও বাগ্মীদের বাকযুদ্ধ

আল- জাহিয় পূর্বের কবি সাহিত্যিক ও বাগ্মীদের মধ্যে পারদর্শীতার বিষয় নিয়ে যে বাকযুদ্ধ হয়েছিল তা স্বীয় সাহিত্য বীণায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বিখ্যাত কবি ও বক্তা বাশশার আল-আ'মা এবং উকবা ইবন রুবা এর মধ্যকার বাকযুদ্ধ তুলে ধরে বলেন, একদা উকবা ইবন রুবা স্বীয় প্রিয়ভাজন ব্যক্তি উকবা ইবন সালাম এর প্রশংসায় ছন্দময় কবিতা আবৃত্তি করলেন, যেখানে বাশশার আল-আ'মা উপস্থিত ছিলেন। তখন তাৎক্ষণিকভাবে বাশশার আল-আ'মা অধিকতর ছন্দময় কবিতা প্রকাশ করলেন। এমতাবস্থায় উকবা ইবন রুবা বললেন- হে বাশশার এটাকে আপনি আরও অধিক সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পারবেন না। তখন বাশশার রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমার চেয়ে, তোমার পিতার চেয়ে, এমন কি তোমার দাদার চেয়ে অধিকসুন্দর কবিতা রচনা করতে স্বক্ষম।^{২৩}

খ. চুপ থাকার উপকারিতা

বিশ্বখ্যাত গদ্য সাহিত্যিক আল- জাহিয় স্বীয় গ্রন্থ *কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন* এ চুপ থাকার উপকারিতা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। যেমন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শাব্বী রা. এর সংশ্লেষে থাকা এক

বিদুর্দিন দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন। তাঁকে কারন জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বলেন, আমি শ্রবন করে জ্ঞানার্জন করি এবং নিরবতা অবলম্বন করে নিরাপত্তা লাভ করি। তখন উপস্থিত লোকজন মন্তব্য করলেন- তুলনামূলকভাবে কথা বলা যদি রৌপ্য হয়, তাহলে চুপ থাকা স্বর্ণ সাদৃশ্য হবে। এ ক্ষেত্রে আল- জাহিয় কিছু জ্ঞানী লোকদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মানুষের ধ্বংসের কারণ তার দুই চোয়াল এবং ঠোঁটের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান। একদা আবু বকর রা. স্বীয় জিহবাকে টেনে ধরে বললেন, এই হচ্ছে সেই বস্তু যা আমাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন করেছে। মহানবী সা. বলেছেন, মানুষকে তার জিহবার দ্বারা অর্জিত পরিণাম ফল ছাড়া অন্য কোন কারণে উপড়ু করে জাহান্নামের আগুনে ফেলা হবে না। মহানবী সা. আরও বলেছেন, বান্দাকে লাগামহীন বাক স্বেচ্ছাচারিতার ন্যায় অধিকতর খারাপ কিছু দেয়া হয়নি।^{২৪}

গ. সাহিত্য শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা

আল-জাহিয় সাহিত্য শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, তুমি যদি শিল্প গ্রহণে ইচ্ছা কর এবং সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাও, তাহলে তোমার শিল্প পদ্ধতিকে এভাবে গঠন করতে হবে যে, উহার প্রতি মানুষের আগ্রহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না। তোমার সাহিত্য চর্চা, চিঠিপত্র, কবিতা বা বক্তৃতা যাচাইয়ের জন্য তুমি যদি জ্ঞানী লোকদের সামনে পেশ কর এবং মানুষ উহাকে ভালো মনে করে তাহলে অবশ্যই তুমি উহার চর্চা অব্যাহত রাখবে। একদিন সাহিত্য শিল্প চর্চা তোমাকে স্বার্থক সাহিত্যিক হিসেবে জাতির সামনে উপস্থাপন করবে।^{২৫}

ঘ. উত্তম বাহন হিসেবে গাধার বৈশিষ্ট্য

আল- জাহিয় *কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন* গ্রন্থে গাধার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। যেমন আল- জাহিয় এর সমকালীন যুগে ফযল ইবন 'ঈসা ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা, কথা শিল্পী ও সুন্দর গল্পকার। তিনি গাধা ব্যতীত অন্য কোন বাহনে আরোহন করতেন না। লোকজন কৌতুহল বশত: একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি গাধা ব্যতীত অন্য কোন বাহনে আরোহন করেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন, গাধার পিঠে আরোহনের মধ্যে নানাবিধ সুবিধা রয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এটি এমন একটি প্রাণী যা ঋতুর পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী তার নিজস্ব অবস্থানের পরিবর্তন করে না। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় গাধা রোগাক্রান্ত কম হয়। এই প্রাণী পদস্থলিত হবার দিক থেকে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ। এর উপর আরোহন করা অধিক সহজ এবং পিঠে বসা আরামদায়ক, গাধার পিঠ নরম তুলতুলে এবং এটি সব চেয়ে বেশী বাধ্য হয়।^{২৬}

উল্লেখ্য, আল-জাহিয় রচিত *কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন* গ্রন্থটি অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ ও সুকুমার সাহিত্যের অন্যতম। এ গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরবদের বাগ্মিতা ও কবিতা রচনার উপর জোর দেওয়া। এতে লেখক সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতি এবং জনসাধারণের বক্তৃতা ও বক্তার দোষ-গুণ তুলে ধরেছেন।^{২৭}

কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন গ্রন্থটির সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইবনু খালদুন বলেন,^{২৮}

اركان لادب اربعة وهي- ادب الكاتب لآبن قتيبة، البيان و التبيين للجاحظ، دواوين الامالى للقلالي و كتاب الكامل للمبرد-

“সাহিত্যের মৌলিক গ্রন্থ চারটি। যথা-ইবনু কুতায়বার *আদাবুল কাতিব*, আল-জাহিয় এর *কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন*, কালী এর *কিতাবু দাওয়ায়িনিল আমালী* এবং আল-মুবাররাদের *কিতাবুল কামিল*।”

তিন: *কিতাবুল হাইওয়ান* (كتاب الحيوان)

কিতাবুল হাইওয়ান অর্থ প্রাণীজগত বিষয়ক গ্রন্থ। এটি খ্যাতিমান গদ্য সাহিত্যিক আল- জাহিয় এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ গ্রন্থে লেখক মানব জাতির সাথে জীব

জগতের সম্পর্ক এবং জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গ্রন্থসমূহে ও লোকমুখে প্রচলিত কথামালা, কবিতা, প্রবাদ প্রবচন ও রূপকথা সমূহের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। আল-জাহিয় এ গ্রন্থটি ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই রচনা করেন এবং তৎকালীন উমর ইবন আয যাইয়াত এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটি ১৯০৭ সালে মিসরে ৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়। এতে লেখক আরব গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি এবং তৎকালীন বিশ্বে প্রচলিত ধর্ম সমূহ যেমন ইয়হুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলামকে সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও সম-সাময়িক ভাষা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আল-আসমাই, আবু উবায়দা, আবু যায়দ আল আনসারী, আন-নায্যাম প্রমুখ এ গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।^{২৯} লেখক এ গ্রন্থটিকে মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।^{৩০} অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্তসার নিম্নে আলোচনা করা হলো:

আল-জাহিয় এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কুকুর ও মোরগের উপকারিতা নিয়ে হৃদয়গ্রাহী ভাবে আলোকপাত করেছেন। সমাজের অনেক মানুষই বাড়ীর পাহাদার হিসেবে কুকুর পালন করে থাকেন। এদের কানে এমন এক শ্রবণ শক্তি রয়েছে যাতে করে রাতের বেলা এরা সামান্য আওয়াজে সাড়া দেয়। এরা শৃগালকে তাড়া করতে খুবই দক্ষ এবং শিকারী প্রাণীও বটে। এরা মনিবের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ ও অনুগত হয়। অন্যদিকে আল-জাহিয় মোরগের গুণের আলোচনায় বলেছেন, অন্যান্য জাতির ন্যায় আরবের যাযাবর জাতির বিভিন্ন শ্রেণির প্রতি মানুষের দোষ ও গুণের অনুরূপ দোষগুণ উল্লেখ করত। প্রমাণ সরূপ সেই যুগের অনেক প্রবাদ ও প্রবচন উপস্থাপন করেছেন। এতে প্রতি ক্ষেত্রে দোষ বা গুণবাচক কথা উল্লেখ করা হতো। যেমন-মোরগের প্রতি বদান্যতা গুণকে উল্লেখ করে বলা হয় *اسخى من ديك* অর্থাৎ সে মোরগ অপেক্ষা অধিক দানশীল।^{৩১}

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল-জাহিয় বিভিন্ন প্রকার প্রবাদ-প্রবচন ও রূপকথা সমূহের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এখানে লেখক কুকুর ও মোরগ কিভাবে তর্কযুদ্ধ করতে পারে, তার একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বিষয়টি আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষাও উপস্থাপন করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের উদ্ধৃতিরও অবতারণা করেছেন।^{৩২}

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রখ্যাত গদ্য সাহিত্যিক আল-জাহিয় বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি কবুতরের প্রকারভেদ ও স্বভাব সমন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও এ অধ্যায়ে তিনি হৃদহৃদ পাখী, বাদুড়, শকুনি, মশা-মাছি, গুবরে পোকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রবাদ বাক্য ‘রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন’ অর্থাৎ ক্রোধের অপকারিতা, প্রত্যেক ভালো জিনিসের প্রশংসা, মানুষ সম্পর্কে সুধারণা, প্রতিটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।^{৩৩}

চতুর্থ অধ্যায়ে আল-জাহিয় আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের সাময়িকভাবে কিংবা স্থায়ীভাবে মানবেতর প্রাণীতে রূপান্তরিত হবার কথা পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বাণী-^{৩৪}

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه و جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
اولئك شر مكانا و اضل عن سواء السبيل

“বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও গুরুরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকেও অনেক দূরে।”

উল্লিখিত আয়াতে কারা পশুতে রূপান্তরিত হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে আল-কিসাস বৈদ্য, যারা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল তারা ছিল বনী ইস্রাঈল জাতির লোক। দাউদ আ.^{৩৫} এর যুগে আল্লাহর নিষেধ থাকা সত্ত্বেও যারা শনিবারের দিন মাছ শিকার ও কৌশল করে মাছকে আবদ্ধ করে রাখার কারণে বানরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অপর দিকে যারা গুরুরে পরিণত হয়েছিল তারা ছিল ‘ঈসা আ.^{৩৬} এর যুগের সেই সমস্ত লোক যারা তাঁর প্রতি

ঈমান আনে নাই। অধিকাংশ জ্ঞানীদের মতে বানর ও শুকুরে রূপান্তরিত মানুষগুলি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিল।^{৭৭}

পঞ্চম অধ্যায়ে আল-জাহিয় প্রথম পর্বে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় পর্বে কতিপয় প্রাণী যেমন-ছাগল, দুগা, ভেড়া, ইঁদুর, ব্যাঙ এবং মানুষ ব্যতীত অন্য জীব জন্তুর মধ্যে বিড়ালের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।^{৭৮}

ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রখ্যাত গদ্য সাহিত্যিক আল-জাহিয় বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সম্পর্কে দুটি গীতি কবিতার পর্যালোচনা করেছেন। এতে লেখক কুমির, হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।^{৭৯}

সপ্তম অধ্যায়ে আল-জাহিয় কিতাবুল হাইওয়ান বা প্রাণীজগত বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহার টেনেছেন। এ অধ্যায়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টিকুলের বুদ্ধিমত্তা এবং শত্রুদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এখানে লেখক জিরাফ ও হাতী সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।^{৮০} জীববিদ্যার উপর আল-জাহিয় কিতাবুল হাইওয়ান গ্রন্থ রচনা করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিকের নিকট হতে ৫০০০ দিনার উপহার পান। বলা যায় জীববিদ্যার উপর লিখিত এটাই সর্ব প্রথম আরবী গ্রন্থ। বিভিন্ন লেখকদের লেখনীতে এ গ্রন্থের প্রশংসা আল-জাহিয়কে অমর করে রেখেছে। এ গ্রন্থে তিনি জীবজন্তুর কাহিনীর যতটা অবতারণা করেছেন তার চেয়ে বেশী চিত্রিত করেছেন জীবজন্তুর রূপক ধর্ম ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা।^{৮১}

৫. উপসংহার

আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বিশ্ব বরেণ্য গদ্য সাহিত্যিক আল-জাহিয় (মৃ.৮৬৮ খ্রি.) এর নিরলস প্রচেষ্টায় আরবী গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে। আরবী গদ্য সাহিত্যে তাঁর যে অবদান তা সমকালীন গদ্য সাহিত্যকে ফুলে ফলে সুশোভিত করেছে। সমকালীন গদ্য রচয়িতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি গদ্য সাহিত্যকে নতুনরূপে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন পাঠক সমাজের কাছে। সমকালীন গদ্য সাহিত্যিকগণ পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করতে পারেননি, সে ক্ষেত্রে আল-জাহিয় পুরাতন শৃংখলা ও গ্লানিকে ভেঙ্গে নতুন ধারায় বেরিয়ে এসেছেন। আর সৃষ্টি করেছেন গদ্য সাহিত্যের অভিনব নতুন ধারা। তিনি রচনা করেছেন কিতাবুল হাইওয়ান এর মত গদ্যসাহিত্য, যার ভাব, ভাষা, রচনামূল্য, অলংকার পূর্ণ বাক্য ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে গদ্যসাহিত্যে গতিশীলতা আনয়ন করেছেন। তিনি সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, খ্যাতিমান ও শক্তিমান গদ্যসাহিত্যিক ও রম্য সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর জীবনের অন্যতম অনবদ্য সৃষ্টি হলো আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন গ্রন্থ, যাতে অলংকার সমৃদ্ধ বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গির আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর রচিত কিতাবুল বুখালা এ কৃপণদের জীবনচরন, তাদের লোভ লালসা, নিচমনের পরিচয়সহ কৃপণদের বিভিন্ন ঘটনা আলোকপাত করে পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করেছে। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্ব বরেণ্য যে সকল আরবী গদ্য সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্থায়ী অবদানের মাধ্যমে বিশ্বজনীন প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন আল-জাহিয়কে তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে গন্য করা হয়। জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর মাধ্যমে তিনি আরবী গদ্য সাহিত্যকে প্রশস্ততর করে তুলেছেন। তিনি আরবী গদ্য সাহিত্যে যে নব দিগন্তের সূচনা করেছেন তা আরবী সাহিত্য জগতে চির ভাস্কর হয়ে থাকবে।

টীকা ও টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ আবুল কাসিম আল-হারিরী, আল-মাকামাতুল আদাবিয়াহ (মিসর: মাতবা'আ মুস্তফা আল-বাবিল হালাবী, তা. বি.), পৃ. ১৬৩।
- ^২ আহমদ হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, ২য় খণ্ড (বৈরুত: ফিল আদাবিয়াতিল লুগাতিল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ১৯৪।
- ^৩ ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান, ৪র্থ খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ১৫০; 'উমার ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালায়িন, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৩০৪।
- ^৪ হাসান আস-সানদুবী, আদাবুল জাহিয় (কায়রো: মাতবা'আতু তিজারিয়াতুল কুবরা, ১৯৩১ খ্রি.), পৃ. ২০।

৫. হান্না আল-ফাখুরী, *আল-জাহিয়* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৩০ খ্রি.), পৃ. ৫৯।
৬. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম, পিতার নাম সায্যার ইবন হানি। নায্যাম তাঁর উপাধী। তিনি ইরাকের বসরার অধিবাসী ছিলেন। বসরাতেই তিনি লালিত পালিত হন। পরবর্তী সময় তিনি বাগদাদে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন একজন মু'তামিলী কলাম শাস্ত্রবিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ। আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। মুসলিম চিন্তাধারা বিকাশে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করে আছেন। তিনি আবুল হুযায়ল আল-আল্লাফের মজলিসে কলাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রখ্যাত গদ্য সাহিত্যিক আল-জাহিয়ের উস্তাদ ছিলেন। তিনি ৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে ইত্তিকাল করেন। দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: ১৯২১ খ্রি.), পৃ. ৯৭; ইবনু হাজার আসকালানী, *লিসানুল মীযান* (হায়দারাবাদ: ৯৪০ খ্রি.), পৃ. ৬৭; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৩শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৬৪৯-৬৫০।
৭. ছুমামা ইবনুল 'আশরা এর উপনাম ছিল আবু মা'আনী, বংশগত পদবী ছিল আন-নুমায়রী। তিনি একজন ধর্মতত্ত্ববিদ এবং আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে মুক্তবুদ্ধি গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। তাঁর গভীর জ্ঞান ও মেধাগত ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে খলীফা হারুন-অর-রশীদ ও পরে খলীফা মামুনুর রশীদ তাঁকে দরবারে দাওয়াত করেছিলেন। পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যে তিনি যুগের অনন্য সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে মানুষ তাঁকে লৌহ মানব বলে মনে করত। তিনি ১৪৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইত্তিকাল করেন। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৩শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৮৫।
৮. ইমাম আবু ইউসুফ এর প্রকৃত নাম ইয়া'কুব, উপনাম আবু ইউসুফ। তাঁর পিতার নাম ইব্রাহীম। তিনি ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিলেন। তাঁর নিকটেই তিনি ফিকহ বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 'ইলমুল ফিকহের উপর তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকায় তিনি ৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনিই সর্ব প্রথম "কাযীউল কুযাত" উপাধী লাভ করেন। তিনি ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে ইত্তিকাল করেন। দ্র. ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৬০৯-৬১০; ড. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড (মিসর: আল-মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৪৫ খ্রি.), পৃ. ১৯৮।
৯. আবু 'উবায়দাহ মা'মার ইবন আল-মুসান্না ৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে বসরা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মূলত: তিনি ছিলেন একজন ভাষাতত্ত্ববিদ। তাঁর রচিত 'মায়াল কুরআন' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সুধী সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্য জোরালো স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তিনি ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে বসরা নগরীতে মৃত্যু বরণ করেন। দ্র. ইবন নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫৩-৫৪; *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪-৩০৫।
১০. আল-আসমা'ঈ এর প্রকৃত ও পুরো নাম-আবু সাঈদ আব্দুল মালিক ইবন কুবায়ব আল-আসমা'ঈ। তিনি ৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। আল-আসমা'ঈ তাঁর সমসাময়িক আবু উবায়দা এবং আবু যায়দ আল-আনসারীর নিকট আরবী কাব্য ও শব্দ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুলাংশে ঋণী। তিনি কখনো ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রচার করেননি। তিনি হাসান আল-বসরীর উক্তি সমূহ বিশুদ্ধভাবে বিবৃত করেছেন। 'আকীদাহগত দিক থেকে আল-আসমা'ঈ ছিলেন একজন গোঁড়া সুন্নী। উল্লেখ্য যে, প্রবল বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তি এবং অসাধারণ বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান আল-আসমা'ঈকে খ্যাতিমান করেছে। বসরার সাধারণ লোকেরাও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অসাধারণ কাহিনী ও মজাদার গল্প দ্বারা আল-আসমা'ঈ আব্বাসীয় খলীফা হারুন অর-রশীদদের মনোরঞ্জন করেন। ইব্রাহীম আল-আরাবী (মৃ. ৮৮৯ খ্রি.) এর মতে বসরার ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে চার জন ছিলেন সুন্নাহের একনিষ্ঠ অনুসারী, তন্মধ্যে আল-আসমা'ঈ ছিলেন অন্যতম। তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইত্তিকাল করেন। দ্র. আবু বকর ইবন 'আলী খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১০ম খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৯৩০ খ্রি.), পৃ. ৪১০-৪২০; ইবনু নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৫২; *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
১১. আবু যায়দ আল- আনসারী ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বিখ্যাত নগরী বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বসরার একজন বিখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ ও অভিধান রচয়িতা। আরবী ব্যাকরণবিদ হিসেবে তিনি আল-আসমা'ঈ এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। খলীফা আল-মাহদী তাঁকে বাগদাদে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি আবু উবায়দা ও আল-আসমা'ঈ এর সমসাময়িক ছিলেন। ব্যাকরণবিদ হিসেবে তিনি উক্ত দু'জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ 'আন নাওয়াদির ফিল লুগাহ' ও 'কিতাবুল মাতার'। তিনি ৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইত্তিকাল করেন। দ্র. ইবন কুতায়বা, *কিতাবুল মা'আরিফ* (মিসর: মাতবা'আ আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৩৬ খ্রি.), পৃ. ২৭০; *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৭; ইবনু খালিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৩৭১।

২২. আবুল হাসান আল-আখফাশ খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বসরা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলী ইবন সোলায়মান মারুফ। তিনি 'ইলমে নাহ্ ও আরবী সাহিত্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত 'ইলমে নাহ্ তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি ছিলেন আল জাহিযের সবচেয়ে সেরা শিক্ষক। আবুল হাসান আল-আখফাশ ছিলেন মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী হলো- গারীবুল কুরআন, তাফসীরু মা'আনীল কুরআন, কিতাবুল ইস্তিকাফ, কিতাবু মাসায়িলিল কুরআন, কিতাবুল মুলুক, কিতাবুল 'আরুয, কিতাবুন নাকায়িস, কিতাবুল মাসায়িলুস সাগীর ইত্যাদি। তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইন্তিকাল করেন। দ্র. ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৫২।
২৩. শাফিক জাবারী, আল-জাহিয মু'আল্লিমুল আকল ওয়াল আদাব (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৪ খ্রি.), পৃ. ১২৪।
২৪. জামীল জম্বার, আল-জাহিয: ফী হায়াতিহি ওয়া আদাবিহি ওয়া ফিকরিহি, পৃ. ২৯-৭০।
২৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৪৯-৫৫০।
২৬. ইন'আম আল-জুনদী, আর-রাযিদা ফিল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল রায়িদাল 'আরাবী, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৭০; জামীল জম্বার, আল-জাহিয: ফী হায়াতিহি ওয়া আদাবিহি ওয়া ফিকরিহি, পৃ. ৩৪-৩৯।
২৭. উমার ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আল-'আছরুল আব্বাসী (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমায়িন, ১৯৮১ খ্রি.) পৃ. ৩০৭।
২৮. আল-জাহিয, কিতাবুল বুখালা, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায়- ড. মুহাম্মদ আল-আসকান্দারি (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।
৩০. হান্না আল-ফাখুরী, আল-জাহিয (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৩০ খ্রি.), পৃ. ৭; তুহা আল হাজিরী, আল-জাহিয হায়াতুহু ওয়াআছরুহ (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ১৯।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।
৩২. জামীল জম্বার, আল-জাহিয: ফী হায়াতিহি ওয়া আদাবিহি ওয়া ফিকরিহি, পৃ. ৪০-৫২; Julia Ashtiany (EDS) Abbasid Belles Letter (Great Britain: Cambridge University Press, 1990), pages, 44-47.
৩৩. আল- জাহিয, 'কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম হারুন (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ. ৪৯।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩।
৩৬. তদেব।
৩৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৪৯-৫৫৩।
৩৮. আল-জাহিয, কিতাবুল হাইওয়ান, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর লিল জামি', ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ১১।
৩৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৪৯-৫৫৩।
৪০. তদেব।
৪১. আল-জাহিয, কিতাবুল হাইওয়ান, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর লিল জামি', ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ১১।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
৪৩. তদেব।
৪৪. সূরাহ মায়িদাহ, আয়াত: ৬০।
৪৫. দাউদ আ. ছিলেন বিশ্বখ্যাত নাবী ও রাসূল। তাঁর উপর যাবূর গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুমধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন। তিনি যখন মধুর কণ্ঠে যাবূর গ্রন্থ তেলাওয়াত করতেন তখন পশু পাখী এমন কি সমুদ্রের মাছ এবং পাহাড় পর্বত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে শামিল হত। পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় দাউদ আ. সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। ইংরেজী বাইবেল গ্রন্থে তাঁর নাম David., তিনি ছিলেন লৌহবর্ম নির্মানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারী স্বনির্ভর নাবী। তিনি জেরুজালেম শহরে একটি মেহরাব তৈরী করেছিলেন। ৯ম শতাব্দীতে মুসলমানগণ ঐ স্থান দখল করেন। আজ পর্যন্ত মুসলমানেরা উহা পবিত্র স্থান বলে গণ্য করেন। দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৬৯-৪৭০।
৪৬. মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় ও ইচ্ছায় 'ঈসা আ. পিতা ছাড়াই মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ও রাসূল। তাঁর উপর তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে যীশুখ্রিষ্ট

বা সংক্ষেপে যীশু বলে থাকেন। কাফিরদের হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। পৃথিবীতে পুনরায় তাঁর আগমন ঘটবে কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত হিসেবে। দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০৬-২১৩।

^{৩৭.} কার্ল. ব্রোক্যালম্যান, *তরীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ১১০-১১১।

^{৩৮.} জামীল জব্বার, *আল-জাহিয: ফী হায়াতিহি ওয়া আদাবিহি ওয়া ফিকরিহি*, পৃ. ৩০-৩৩।

^{৩৯.} ইন'আম আল জুনদী, *আর রায়েদ ফিল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল রাযিদিল 'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৫-৩৭।

^{৪০.} হান্না আল-ফাখুরী, *তরীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল বুলিসিয়া, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৫৭৬-৬৭৮।

^{৪১.} জামীল জব্বার, *আল-জাহিয: ফী হায়াতিহি ওয়া আদাবিহি ওয়া ফিকরিহি*, পৃ. ১৮; হাসান আস-সানদূবী, *আদাবুল জাহিয* (কায়রো: মাতবা 'আতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৯৩১ খ্রি.), পৃ. ১১৫।

বাংলাদেশে আরবী ভাষা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা [Arabic Language in Bangladesh: Importance and Necessity]

ড. মো. কামারুজ্জামান*

[Abstract: Arabic language is the oldest among the ancient languages of the world. On the one hand, it is the official language of Islam and on the other hand, it is also the official language of international organizations like OIC, Arab League. That is why it is a universally popular language. As Bangladesh is a Muslim populated country, there is a strong interest in the practice of Islam in this country. And there is no alternative to learning Arabic language in practicing Islam. Not only that it is an economic and diplomatic language. The majority of remittances to this country come from the Middle East whose official language is Arabic. That is why the Arabic language is particularly relevant to the economic arena of our country. Also, Arabic is a globally popular literary language which has become the focus of interest for literature lovers in Bangladesh. There are thousands of madrasahs in this country where Arabic education is compulsory and even some colleges and universities have Arabic departments, so the importance of Arabic language education is undeniable. Moreover, there are several obstacles and problems in the teaching of Arabic language in Bangladesh which are highlighted in this article.]

Keywords: Arabic Language, Problems, Possibility, Importance.

১. ভূমিকা

আরবী একটি পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রাচীন ভাষা হিসেবে মানুষের শিক্ষার ভাষা আরবী হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এ ভাষার ন্যায় এত সমৃদ্ধশালী, মোহনীয়, সুমিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এর প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা, ভাবগম্ভীর্য, নান্দনিকতা, সৃষ্টিশীলতা সবকিছুই এ ভাষাকে পৃথিবীর অন্যসব ভাষা থেকে স্বতন্ত্র মহিমায় দেদীপ্যমান করে রেখেছে। এটি ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামপূর্ব সময় থেকে বাংলাভাষী মানুষের সঙ্গে আরবদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরব বণিকরা সুপ্রাচীনকালে থেকে এই অঞ্চলে যাতায়াত করেন। তাঁদের মাধ্যমেই বাংলাভাষী মানুষের আরবী ভাষার সঙ্গে পরিচয় ও সংযোগের সূচনা হয়; যদিও তার প্রভাব ছিল সীমিত। বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম আগমনের পর আরবী ভাষার সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক নিবিড় হয়। দৈনন্দিন জীবনের ধর্মোচার সম্পন্ন করতেই আরবী ভাষার পাঠ নিতে হয় বাঙালি মুসলিমদের। ধীরে ধীরে আরবী ভাষার চর্চা প্রতিষ্ঠানিকতা লাভ করে এবং তা মসজিদ, মক্তব থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যভুক্ত হয়, যা সুলতানি, মোঘল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমল পেরিয়ে এখনো অব্যাহত রয়েছে। ভাষা গবেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশে আরবী ভাষার পথচলা বহুদিনের হলেও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এ দেশে আরবী ভাষার আশানুরূপ ব্যাপ্তি ও প্রসারতা লাভ করেনি। বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহে আরবী শিখানো হয় কুরআন-হাদীস এবং এতৎ সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের বুৎপত্তি অর্জনের জন্য। তা আবার একেভাবেই সীমিত পরিসরে। একটি স্বভাবজাত এবং যোগাযোগমূলক ভাষা হিসেবে আরবী চর্চা করা হয়নি। এজন্যে শিক্ষার্থীর কাছে জীবন্ত ভাষা হিসেবে আরবীর পরিচয় হয়নি এবং এর বৈষয়িক গুরুত্ব পায়নি। কারো কাছে আরবী মানেই অনিহা, ভয়, বিভ্রম। আবার কারো কাছে সীমিত আরবী শিখে আত্মতৃপ্তির টেকুর। বাংলাদেশে আরবী চর্চার পথচলার বাঁকে বাঁকে নানান সমস্যা জড়িয়ে আছে। তবে, এ ভাষা নিয়ে আরবীপ্রেমীদের প্রত্যাশা ও সম্ভাবনাও কম নয়; আলোচ্য প্রবন্ধে ‘বাংলাদেশে আরবী ভাষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ: সমস্যা ও সম্ভাবনা’ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

২. আরবী ভাষা পরিচিতি

আরবী আরব দেশের ভাষা। দেশের নামানুসারে অধিবাসীরা আরব العرب এবং তাদের ভাষা আরবী العربي বলে অভিহিত হয়ে আসছে। আরব নামের উৎপত্তির অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে।

ক. শব্দটি ইয়ারুব ইবন কাহতানের নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে।^১ কারণ বলা হয়ে থাকে যে, আরবী ভাষায় তিনিই প্রথম কথা বলেন। তার আপনজনেরা তার কাছ থেকে আরবী শিখেন এবং তারা ব্যাবিলন ছেড়ে ইয়ামেনে বসবাস করেন। তারাই কাহতানি।^২

খ. আরব শব্দটি এসেছে—الحديث يعرب أي يفصح ক্রিয়াপদ থেকে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাগ্মীতা। আরবরা ছিল বাকপটু। তাদের বাগ্মীতার জন্য এই নামকরণ।^৩

গ. عربة (আরবাহ) হলো মক্কা অঞ্চল। عربة (আরবাহ) অর্থ মরুভূমি বা অনাবাদি ভূমি। মক্কাকে পবিত্র কুরআনে ফসলবিহীন অনূর্বর উপত্যকা বলা হয়েছে।^৪ عربة (আরবাহ) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো—عرب (আরব)। এ থেকেই এ অঞ্চলকে আরব বলা হয়। আরবদের পিতা ইসমাইল ইবন ইবরাহিম সেখানে বড় হয়েছিলেন এবং তার সন্তানদের লালন-পালন করেছিলেন। তারা বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর কুরাইশরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

ঘ. عرب (আরব) শব্দটি একটি প্রাচীন সেমিটিক উৎস থেকে এসেছে। যার অর্থ পশ্চিম। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা তাদের দেশের পশ্চিমে মরুভূমিতে বসবাসকারী লোকদের নাম আরবী দিয়েছিল।

সামি^৫ ভাষাগুলোর মধ্যে আরবী মূল সামি ভাষার সবচেয়ে নিকটবর্তী ভাষা। সামি ভাষাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ করার পর অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, আরবীই মূল সামি ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো বেশির ভাগ সংরক্ষণ করে। আরবী আরবদেশের ভাষা। এদেশ উত্তর ও দক্ষিণ এ দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণের অধিবাসীরা আরিবা অর্থাৎ খাঁটি আরব এবং তাদের আদি পুরুষ কাহতান হিসেবে তারা বানু কাহতান। উত্তর আরবের অধিবাসীরা মুস্তারিবা অর্থাৎ আরবী জাতীয়তা গ্রহণকারী আরব। তারা বানু ইসমাইল বা ইসমাইল (আ)-এর বংশধর। তাদেরকে 'আদনানীও বলা হয়।^৬

৩. আরবী ভাষার উৎপত্তি

একটি তথ্য মতে, খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে আরবী ভাষার উদ্ভব হয়েছিল।^৭ ইউনেস্কোর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আরবী ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

Arabic, which first emerged in the northwest of the Arabian Peninsula, is a member of the Semitic family of languages which also includes Hebrew and Aramaic

তবে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নূহ আ. পর্যন্ত সকল মানুষ একই ভাষায় কথা বলত। পরবর্তীতে মানববংশ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়। বাইবেলে উল্লেখ আছে, নূহ আ. এর প্লাবনের পর সমস্ত পৃথিবী এক ভাষাতে কথা বলত। সমস্ত মানুষ একই শব্দগুলি ব্যবহার করত।^৮ আল্লামা জালালউদ্দিন আস সুয়ুতি বলেন, সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা হলো আরবী। আদম আ.-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দজ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা ছিল আরবী, এতে কোন দ্বিমত নেই।^৯ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আযহারি বলেন, মানুষ দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আদম আ.-কে আরবী ভাষা শিক্ষা দানের মাধ্যমে এ ভাষার সূচনা করেন।^{১০}

অতএব আরবীই প্রাচীনতম এবং দুনিয়ার প্রথম ভাষা। আরবী ভাষা থেকেই বর্তমান বিশ্বের অপরাপর ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এস. এম. লুৎফর রহমান বলেন, “ইউরোপের কোনো পাহাড়-পর্বত নয়; এশিয়ার আরব ভূমিই যে আদি আদম, আদি লিপি, আদি ভাষার উৎপত্তি স্থল, তা আধুনিক লিপিতত্ত্ববিদরাও গ্রহণ করেছেন। কেবল ব্রাহ্মী লিপি ও বৈদিক ভাষা নয়; সংস্কৃত লিপি, বৈদিক ভাষা এবং আর্যত্ববাদী ব্রাহ্মণ প্রাচীন পুরুষ-মহিলারাও সেমিটিক (আরব) অঞ্চল এবং সেমিটিক (আরবীয়) কওমের-ই অন্তর্ভুক্ত তা স্পষ্ট। ইউরোপ আর ইউরোপিয়নদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং ছিল

না।^{১১} মোটের ওপর মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন; তেমনি আদি মানবগোষ্ঠী, ভাষা ও লিপিরও উৎপত্তি এখানেই। সেই হেতু যে-ভাষাগোষ্ঠীকে ‘ইন্দো-ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পিচ’ বলা হয়ে থাকে; তা আসলে ‘সেমিটিক-প্যারেন্ট স্পীচ’ বা ‘সেমিটিক মূল ভাষা’ বলা উচিত। নির্দিষ্ট অর্থে এই ভাষাটি ‘আরবী’, আরবীয় বা আরব্য। আর এই ‘আরব্য’ শব্দটিকেই ম্যাক্সমুলার বানানের বিকৃতি ঘটিয়ে করেছেন- ‘আর্য’।

অতএব, ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা বা ‘ইন্দো ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পিচ’- এর তরফে যত কথা, যত যুক্তি-ই দেয়া হোক না কেন; তা না-গ্রহণ করার পক্ষে বহু যুক্তি আছে।^{১২} তিনি আরও বলেন, আর্য শব্দটি যে, আকাশ থেকে পড়েনি, ‘আরব্য’ শব্দ থেকে তৈরি এবং তা প্রাচীন আরবীয় জনপ্রবাহের দেশান্তর, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব, ধনিতত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ তা স্পষ্ট। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, ইউরোপ, ইউরোপিয়ান, আর্য, আয়ান এর উৎসও আরবী, আরব্য ও আরবীয়, থেকে।^{১৩} এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, ভাষাবিজ্ঞানের সঠিক ইতিহাস নির্ণয়ে ভাষাবিদরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক আল্লাহর মনোনীত পথকে এড়িয়ে মরীচিকার পেছনে ঘুরে ফিরছেন। সত্যকে বাদ দিয়ে কল্পনার মিশেলে রচনা করছেন ভাষার ইতিহাস। তাই তাদের চিন্তা চেতনা, ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারে গিয়ে থেমে যায়।

৪. আরবী ভাষার সাথে বাঙালির সম্পর্ক

বাংলাদেশে ইসলাম যেদিন থেকে সূচিত হয়েছে, সেদিন থেকেই এ দেশের সঙ্গে আরবী ভাষার পরিচয় ঘটেছে। ব্যবসা ও ইসলামের কল্যাণে আরবদের সঙ্গে এ দেশের মানুষের যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়। অল্প দিনেই দীনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কালের আবর্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এ দেশের শহরে-বন্দরে। যার অনিবার্য ফলে ছড়িয়ে পড়ে আরাবি ভাষাও। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হতে থাকে কুরআন-হাদিসের শব্দ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় আরবী শব্দ-বাক্যের ব্যবহার। গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষায় শব্দসংখ্যা সোয়া লাখের মতো; যার এক হাজার ইংরেজি ও চারশোর মতো তুর্কি। বাকি দশ হাজার শব্দই আরবী ও ফারসি। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, বাংলা ভাষার ৩০ শতাংশ শব্দ আরবী। বাংলা একাডেমির ২০১৫ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল, এ পর্যন্ত বাংলায় চার হাজার আরবী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।^{১৪} নিজের অজান্তেই নানা প্রয়োজনে দৈনিক আমরা অসংখ্য আরবী শব্দ ব্যবহার করছি। ধর্ম, প্রশাসন, আইন-আদালত, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি সবখানে আছে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবীর বিরাট সংখ্যক শব্দের উপস্থিতি; যার কিছু রয়ে গেছে আরবীর আসল রূপে, কিছু আছে পরিবর্তিত পোশাকে। ধর্মীয় বিষয়সমূহ শেখানোর জন্য যখন থেকে ভারত উপমহাদেশে একের পর এক দীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে, সেই সঙ্গে শুরু হয় অ্যাকাডেমিকভাবে আরবী ভাষার পাঠদান। ইসলামি শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠা দীনী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা লক্ষাধিক, যেখানে সন্তানদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আরবী ভাষা শেখানো হয়। বর্তমানে শুধু বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাজারের অধিক। এসব প্রতিষ্ঠানে ইসলামি আইন, শরিয়ত, কুরআন, হাদীস তাফসীরসহ অন্যান্য ইসলামি বিষয়ের পাঠদান দেওয়া হয়।

৫. সুলতানী ও মোঘল আমলে বাংলাদেশে আরবী ভাষার চর্চা

সুলতানী ও মোঘল শাসনামলে বাংলাদেশে আরবী ভাষার চর্চা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সুদীর্ঘ সময়ে আরবী ভাষা চর্চায় মুসলিম শাসকগণ যেমন কৃতিত্বের সাক্ষর রাখতে সক্ষম হন, তেমনি বহু ইসলাম প্রচারকও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একদিকে ধর্মপ্রাচরকদের নিরলস প্রচেষ্টা, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সমন্বয় সাধন, ফলে আরবী ভাষার চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলত খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা (তৎকালীন লাখনাবতী রাজ্য) বিজয় হলে এদেশে রাজনৈতিকভাবে ইসলামের আগমন ঘটে।^{১৫} তিনি এদেশে মুসলিম ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন। ফলে এদেশে আরবী ভাষা চর্চার সূচনা হয়।^{১৬} বর্তমানকালের মত সেযুগে মসজিদগুলো কেবল উপাসনালয় হিসেবেই ব্যবহৃত হতনা; বরং এতে নিয়মিত পাঠদানের ব্যবস্থা

ছিল। মাদরাসাগুলো ছিল উচ্চতর আরবী চর্চার কেন্দ্র। আর সূফী-দরবেশদের খানকাহ সমূহতেও অনুরূপ আরবী ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো। তবে বখতিয়ার খলজীর রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের পূর্বে আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশ থেকে আগত অলী আওলিয়াগণের মাধ্যমেও এদেশে আরবী ভাষার কিছু চর্চা হয়েছিল। কিন্তু তখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাঁদের পক্ষে স্থায়ী কোন আরবী চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।^{১৬}

অতঃপর ১২০৩ সালে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর অসংখ্য ইসলাম প্রচারক এদেশে আগমন করেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিদ্বান আলিম ও খ্যাতনামা আরবীবিদ। তাঁরা এদেশে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের আহবানে সাড়া দিয়ে অগণিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।^{১৭} তখন নবদীক্ষিত এসকল মুসলমানদের আরবী ভাষা তথা ইসলামি শরী'আতের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এজন্য আরবী ভাষা শিক্ষা ও চর্চা অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ফলে এ সকল অলী আওলিয়া নিরলসভাবে তাদের আরবী ভাষা তথা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন।^{১৮} তাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন:

এক: তকীউদ্দীন আল-আরবী^{১৯} তিনি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সুদূর আরবদেশ থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মাহিসুনে একটি ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসাটি বাংলাদেশে আরবী চর্চার প্রথম কেন্দ্র।^{২০} তিনি ছিলেন একজন প্রতিথ্যশা আরবী ও ইসলামি শাস্ত্রবিদ।^{২১} অল্প দিনের মধ্যে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এমনকি ভারত থেকেও ছাত্ররা মাহিসুনে ভীড় জমাতে থাকে।^{২২}

দুই. শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা: ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে (১২৭০খ্রী.-১২৭৮খ্রী.) শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা নামে একজন বিশিষ্ট আরবীবিদ ও ধর্মপ্রচারক সুদূর দিল্লী থেকে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে আগমন করেন।^{২৩} ঐ সময় বাংলার শাসক ছিলেন মুগীসউদ্দীন তুগরীল। তিনি সোনারগাঁয়ে আগমন করে ইসলাম প্রচারকার্যে মনোবিবেশ করেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে অগণিত অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।^{২৪} তিনি নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ জাঘত করার মানসে সোনারগাঁয়ে একটি বড় মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ করেন।^{২৫} জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ঐতিহাসিকগণ এটাকে 'ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে অভিহিত করেন। কারণ এতবড় বিদ্যাপীঠ ইতিপূর্বে কেবল বাংলাদেশেই নয় বরং গোটা উপমহাদেশের আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি।^{২৬} ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল এমনকি মধ্যপ্রাচ্য থেকেও জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা এ প্রতিষ্ঠানে ভীড় জমাতে থাকে। তিনি ৩৬ বছর যাবত এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আরবী ভাষা তথা ইসলামি শরী'আতের শিক্ষা দেন। তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের দরস প্রদান করেন।^{২৭}

তিন. ইয়াহইয়া আল-মানেরী: বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে আরো একজন নিবেদিত প্রাণ ধর্ম প্রচারক ও শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার শিষ্য ও জামাতা ইয়াহইয়া আল মানেরীর নাম উল্লেখযোগ্য।^{২৮} আবু তাওয়ামা দিল্লী থেকে সোনারগাঁয়ে আসার পথে পাটনার মানের শহরে আল-মানেরীর পিতার গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বালক আল-মানেরীর জ্ঞান স্পৃহা ও উজ্জ্বলতম প্রতিভা মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর শিষ্য করার ইচ্ছা পোষণ করেন। আবু তাওয়ামা মানেরীকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষা দান করে একজন যোগ্য আলিম হিসেবে গড়ে তোলেন। পরবর্তীসময়ে উস্তাদ ও ছাত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁয়ে ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র আরবী চর্চা ও বাংলাদেশে মুসলমানদের ইসলামি জীবন ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।^{২৯}

চার. শাইখ আখি সিরাজুদ্দীন: চতুর্দশ শতকে শাইখ আখি সিরাজুদ্দীন নামে আরেকজন অনন্য সাধারণ ধর্ম প্রচারকের আগমন ঘটে। এ মহান ব্যক্তি স্বীয় মুর্শীদ দিল্লীর প্রখ্যাত আওলিয়া নিয়ামুদ্দীন রহ.-এর আদেশে ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে লাখনাবতী রাজ্যে গমন করেন।^{৩০} তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রভূমি গৌড় ও

পাণ্ডুয়াতে বসে তিনি ইসলামের বানী প্রচার করেন।^{১১} অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য নিযামুদ্দীন আওলিয়া তাকে ‘আইনায়ে হিন্দ’ বা হিন্দুস্থানের মুকুট উপাধিতে ভূষিত করেন।^{১২} তিনি নবদীক্ষিত মুসলমানদের তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষার জ্ঞান শিক্ষা দেন। ফলে তারা সত্যিকার ইসলামি মূল্যবোধের উপর জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হন।^{১৩}

পাঁচ. শাহ জালাল রহ.: চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে যে সকল প্রখ্যাত অলী-আওলিয়া বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও কুরআন-হাদীসের চর্চার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন শাহ জালাল (রহ) তাদের অন্যতম।^{১৪} তিনি আরবের ইয়ামান থেকে ৩৬০ জন সুযোগ্য শিষ্য নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং সিলেটে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।^{১৫} তিনি দীর্ঘদিন সিলেটে ইসলাম প্রচার করেন এবং নব দীক্ষিত মুসলমানদের কুরআন-হাদীস ও আরবী ভাষাসহ ইলমে শরী‘আতের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দান করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার সাথে ইলমে জাহেরীর সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি শিক্ষার আলো বিতরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও অন্যদের মধ্যে রয়েছেন: খান জাহান আলী রহ.^{১৬}, শাইখ আলাউল হক^{১৭}, নূর কুতুবল আলম^{১৮}, উলুখ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী^{১৯} প্রমুখ।

৬. বৃটিশ আমলে বাংলাদেশে আরবী ভাষার চর্চা

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় এবং ১৭৬৫ সালে ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে দ্বিতীয় শাহ আলম কর্তৃক (১৭৫৯-১৮০৬) বাংলার দেওয়ানী সোপর্দ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে; অপরদিকে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।^{২০} বৃটিশ শাসনামলে মুসলিমরা আরবী ভাষা চর্চায় অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। মুসলিম শাসনামলের পাঁচশত বছরে এদেশে আরবী ও ইসলামি শিক্ষা চর্চার যে গতিধারা সূচিত হয়েছিল, বৃটিশ শাসনামলে তা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। বৃটিশরা মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কুঠারাঘাত হানে। তারা আরবী চর্চার কেন্দ্রসমূহ বন্ধ করার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।^{২১} সুলতানী ও মোঘল শাসকগণ মাদরাসা সমূহের ব্যয়ভারের জন্য যে সকল লা-খারাজ সম্পত্তি দান করেন, বৃটিশরা তা বাজেয়াপ্ত করে দেয়।^{২২} ফলে আরবী ও ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রগুলো দারুন অর্থ সংকটের সম্মুখীন হয় এবং কালক্রমে এগুলোর কার্যক্রম স্তব্ধ হয়ে যায়।

ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি কোন প্রকার পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ তখনও চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ফার্সি ভাষাতেই ইসলামি আইন অনুযায়ী বিচারকার্য ও রাজস্ব আদায়ের কাজ কর্ম সম্পাদিত হতো। বৃটিশরা উপলব্ধি করে যে, মুসলমানদের সাথে বৈরী আচরণ করে বাংলার শাসন ক্ষমতায় বেশী দিন টিকে থাকা যাবে না। বরং এদেশে শাসন করতে হলে তাদের সহযোগিতা ও আনুকূল্য একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই একদিকে মুসলমানদের সমষ্টিগত বিধান, অন্যদিকে প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য ওয়ারিং হেস্টিং (১৭৭২-১৭৮৫) ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা স্থাপন করেন।^{২৩} বাংলার বৃটিশ রাজত্বকালের ইতিহাসে এ কলকাতা আলিয়া মাদরাসাই হলো মাদরাসা শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ। এ পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে এ মাদরাসা হতে তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ আইনবিদ, বিচারক, কর নির্ধারক, মুন্সি, দারগা ইত্যাদি সুশিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে।^{২৪}

ওয়ারিং হেস্টিং তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ১৭৮৫ সালে ওয়ারিং হেস্টিং এর সুপারিশের ফলে মাদরাসার বাৎসরিক সরকারি অনুদানের পরিমাণ দাড়ায় ২৯০০০০ টাকায়। তখন মাত্র ৪০জন ছাত্রের আবাসিকতার ব্যবস্থা করা হয়।^{২৫} প্রখ্যাত আলিম ও পণ্ডিত মোল্লা মজদুদ্দীনকে এ মাদরাসার হেড মাওলানা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি মাদরাসায় দরসে নিয়ামিয়ার পাঠ্যক্রম চালু করেন। কেননা তিনি নিজে ছিলেন দরসে নিয়ামিয়ার ছাত্র। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় এ পাঠ্যসূচি পড়ানো হয়। এ পাঠ্যসূচিতে কিছুটা পরিবর্তনসহ অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে

১. আরবী ব্যাকরণ, ২. মানতিক বা তর্কশাস্ত্র, ৩. হিকমাত প্রকৃতি দর্শন, ৪. রিয়াজী ও হাইয়াত বা গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র, ৫. বালাগাত বা বাক্যালংকার শাস্ত্র, ৬. ফিক্হ বা মুসলিম আইন, ৭. উসূলে ফিক্হ বা ইসলামী বিচারের নীতিমালা, ৮. কালাম বা ধর্মশাস্ত্র ৯. তাফসীর বা আল-কুরআনের ব্যাখ্যা, ১০ হাদীস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত দরসে নিয়ামীয়ার পাঠ্যসূচী অনুসারে অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষা তথা কুরআন-হাদীসের ওপর ব্যাপক জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পায়। তবে, এ পাঠ্যসূচি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ১০ বছর এই পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান করার পর ১৭৯০ সালে ইংরেজ সরকারের নির্দেশে হাদীস, তাফসীর ও উসূলে ফিক্হ-এর বিষয়গুলোকে উক্ত সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার এটা চায়না যে, মুসলমানেরা কুরআন-হাদীসের শিক্ষা লাভ করে ইসলামি মূল্যবোধে জাগ্রত হোক; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজন মার্কিন প্রশাসন পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা। যদি মুসলমানরা কুরআন-হাদীসের মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয় তাহলে সেটা হবে ব্রিটিশ সরকারের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই তড়িঘড়ি করে মুসলিম মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

৭. ব্রিটিশ উত্তর বাংলাদেশে আরবী ভাষার চর্চা

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার তীব্র আন্দোলনের মুখে ভারতবর্ষ থেকে তাদের শাসন ব্যবস্থা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এরপর সমগ্র ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি বৃহত্তর অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান আবার দু'টি অঞ্চল, যথা- বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে গঠিত হয়। অতঃপর ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের জন্ম হয়। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ সুদীর্ঘ সময়ে (১৯৪৭ সাল থেকে অদ্যাবধি) বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চার ইতিহাসকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়: ক. পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চা। খ. স্বাধীনতা উত্তর (১৯৭১) বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চা।

ক. পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময় বিশেষ মহলের প্রচেষ্টায় কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক, কর্মচারী, রেকর্ডপত্র, গ্রন্থাগার, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম সমুদয় ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এ মাদরাসাকে 'মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা' নামে নামকরণের মাধ্যমে কলকাতা আলিয়া মাদরাসাকে পশ্চিম বঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয়।^{৪৬} এরপর মাদরাসায় নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি 'সেন্ট্রাল এক্সামিনেশন বোর্ড' গঠন করা হয়। এ বোর্ড ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ও অন্যান্য আলিয়া মাদরাসা পরিচালনা করত এবং মাদরাসা সমূহের বার্ষিক ও সনদ প্রদান পরীক্ষা (দাখিল, আলিম, ফাযিল ও টাইটেল বা কামিল) গ্রহণের ব্যবস্থা করতো।^{৪৭} পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশে শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে বহু শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এ সকল শিক্ষা কমিশন কর্তৃক মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশমালা পেশ করা হয়। যেমন- মাওলানা আকরাম খাঁ কমিশন, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী কমিশন (১৯৫৫), ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৬৩-৬৪)। পাকিস্তান আমলের (১৯৪৭-১৯৭১) ২৪ বছরে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এ সকল কমিশন যথাযথভাবে রিপোর্ট পেশ করলেও তা অতি অল্পই বাস্তবায়িত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে আরবী ভাষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। অথচ পাকিস্তান আমলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে আরবী ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।^{৪৮} ফলে পাকিস্তান আমলে দেশে আরবী চর্চার গতি সংকুচিত হয়ে যায়।^{৪৯}

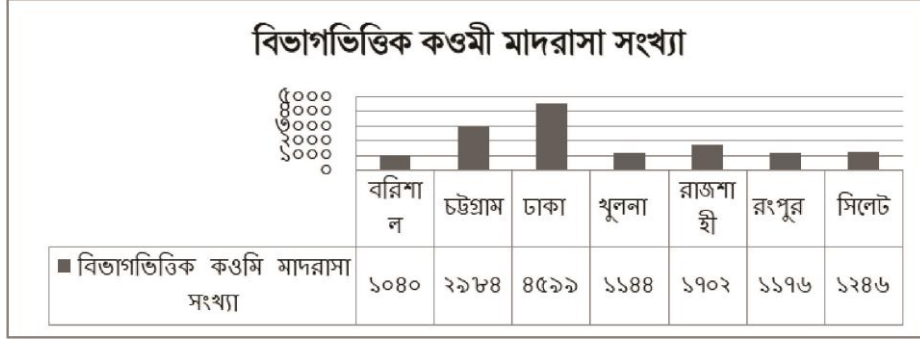
খ. স্বাধীনতা উত্তর (১৯৭১) বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চা

স্বাধীনতা উত্তর বর্তমানে মাদরাসার পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও আরবী ভাষার চর্চা হচ্ছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও পাঠ্যসূচি আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

কওমী মাদরাসায় আরবী ভাষার চর্চা

১৯০১ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দারুল 'উলুম মঈনুল ইসলাম কওমী মাদরাসা' স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চার দিগন্ত উন্মোচন করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে এ মাদরাসার অনুকরণে দেশে আরো অসংখ্য কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবী চর্চার ক্ষেত্রে এ সকল কওমী মাদরাসার কার্যক্রম প্রশংসার্য। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দেশে প্রায় ৪৪৩টি কওমী মাদরাসা স্থাপিত হয়।^{৫০} এর মধ্যে ৫১টিতে দাওরায়ে হাদীস পড়ানো

হতো। বর্তমানে সারা দেশে ১৩ হাজার কওমি মাদরাসায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থী আরবী ভাষা চর্চা করছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি মাদরাসা, ৪ হাজার ৫৯৯টি। সবচেয়ে কম বরিশালে ১ হাজার ৪০টি। প্রথমবারের মত কওমী মাদরাসা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ এ তথ্য সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)। যা নিম্নে প্রদত্ত হলো^{৫১}:



বেফাকুল মাদারিস শিক্ষা বোর্ডের প্রতিষ্ঠা লাভ

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর থেকেই বাংলাদেশে আলিম সমাজ কওমী মাদরাসাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি কওমী মাদরাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তখন এ ব্যাপারে সমাজে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। সকলে প্রায় এরূপ একটি বোর্ডের অনুভব করতে থাকে। বস্তুতঃ তখন হতেই বিফাকুল মাদারিস সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। সে সময় এ মহতি কাজের জন্য যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন মুজাহিদে আযম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)।^{৫২}

আলিয়া মাদরাসায় আরবী চর্চা

বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে আলিয়া মাদরাসাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা আলিয়া মাদরাসার নিয়ন্ত্রণাধীনে অনেক আলিয়া নিসাবের মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এমপিওভুক্ত আলিয়া মাদরাসার সংখ্যা প্রায় ৭৯৫৫টি। চার ধরনের মাদরাসা তথা-দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসায় মোট শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৫৪২৩৪জন। শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৭৬২২৭৭জন। এছাড়াও নন-এমপিওভুক্ত ৮৫৭টি দাখিল মাদরাসা, ৩২৩টি আলিম মাদরাসা, ৯৪টি ফাযিল মাদরাসা ও ১২৪টি কামিল মাদরাসা রয়েছে। সেখানে মোট শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫১৩০ জন।^{৫৩}



বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৯৫৫টি এমপিওভুক্ত আলিয়া মাদরাসার বিভিন্ন স্তরে আরবী ভাষার চর্চা হয়ে থাকে। বিশেষতঃ আরবী ভাষা শেখানোর জন্য ইবতেদায়ী স্তরে *الدروس العربية* নামে, দাখিল স্তরে *اللغة العربية* নামে, আলিম স্তরে *اللغة العربية* নামে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসভুক্ত বই পড়ানো হয় এবং ফাযিল-কামিল ও অনার্স-মাস্টার্স স্তরে নির্ধারিত সিলেবাসে আরবী ভাষা চর্চার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবী ভাষার চর্চা হয়ে থাকে। সেগুলো যথাক্রমে ক. আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. আরবী বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, গ. আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঘ. আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে যেসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগ রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ				
ক্র:	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	বিভাগীয় শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা	ডিগ্রি
০১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৩ জন	৭০০ জন	উচ্চতর সকল ডিগ্রি
০২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫ জন	৬০০ জন	উচ্চতর সকল ডিগ্রি
০৩	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২১ জন	৬০০ জন	উচ্চতর সকল ডিগ্রি
০৪	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	১৮ জন	৪৫০ জন	উচ্চতর সকল ডিগ্রি
০৫	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৪ জন	১০০ জন	উচ্চতর সকল ডিগ্রি
০৬	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৯ জন	৩০০ জন	ট্রেনিং

৮. আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে আরবী ভাষায় দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা আরবী ভাষার ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিকসহ অন্যান্য গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবী ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

এক. আরবী মুসলমানদের নিত্যদিনের ভাষা

ইসলামের সঙ্গে এ জনপদের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশি। সুদীর্ঘ এই সময়ের প্রতিদিন এ ভূখন্ডের মানুষ নিদ্রা ত্যাগ করে নতুন দিনের যাত্রা শুরু করে যে আজানের সুমধুর সুর শোনে তা-ও কিন্তু আরবী ভাষার কিছু বাক্য। দলমত নির্বিশেষে এ দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে প্রতিদিন সামান্য হলেও কুরআন পড়ে থাকে। তারও ভাষা আরবী। এ দেশের তিন লক্ষাধিক মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবেলা দলবদ্ধভাবে ও এককভাবে যে নামাজ পড়া হয় তার ভাষাও আরবী। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, তিনি যে দল ও মতের হোন না কেন; নামাজের কারণে প্রতিদিন তাকে কম করে হলেও মোট আধা ঘণ্টা সময় নিবীড়ভাবে আরবী ভাষার সঙ্গে কাটাতে হয়। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে তাকে দশ মিনিট আরবীতে খুতবা শোনতে হয়। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের জন্মের পর মুহূর্তে সর্বপ্রথম যে শব্দ শোনে, যে বাক্যগুলো দিয়ে পৃথিবীর নতুন জীবনে তারা বরণীয় হয়, সমাদৃত হয়, অভিনন্দিত হয়- সেই আজানের ভাষাও আরবী। আবাব পৃথিবী থেকে তাকে চিরবিদায় দেওয়া হয় আরবী ভাষায়। জানাজার নামাজ, লাশ কবরে রাখার দোয়া, কবর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার দোয়া সবই আরবীতে। তাই আরবী ভাষার সঙ্গে এ দেশের মানুষের সম্পর্ক জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক। শুধু জন্ম-মৃত্যু নয় বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিত্যদিনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক সুকঠিন এক সম্পর্ক। “এ দেশের মুসলমানরা আরবী ভাষাকে তাদের ধর্ম ও কর্মের ভাষা হিসেবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে।”^{৫৪} এ ভাষার সাথে তাদের আত্মার সম্পর্ক, প্রাণের সম্পর্ক।

দুই. ইসলামের ভাষা আরবী

ক. কুরআন, হাদীস, তাফসীর, আকাইদ, ফিকহ, উসুলসহ ইসলামের সকল মৌলিক গ্রন্থসমূহের ভাষা আরবী। এজন্য বলা যায়, দীন-ইসলামের ভাষা হলো আরবী। আরবী ভাষা শিক্ষা করা ব্যতীত ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহ থেকে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে একজন মুসলমানের জীবনে আরবী ভাষার গুরুত্ব অপরিহার্য। কুরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় এর গুরুত্ব সর্বকালে প্রায় সমান। আরবী ভাষা ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ﴿لَا أُزَلُّهُ﴾ ‘আমিই আরবী ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো’ রাসূল সা. বলেছেন,^{৫৫} *أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي* ‘তোমরা

তিনটি কারণে আরবীকে ভালোবাসো। আমি আরবী, কোরআন আরবী এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা হবে আরবী।^{১৫৬}

কুরআন-সুন্নাহর নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে আরবী অদ্বিতীয় মাধ্যম। এ জন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবী শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর রা. বলেন, ‘তোমরা আরবী ভাষা শেখো। তা তোমাদের দীনের অংশ।’^{১৫৭} শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আরবী ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী সা.-কে আরবী ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দীনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবীভাষী। তাই দীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, আরবী চর্চা করা দীনেরই অংশ ও দীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।’^{১৫৮}

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে, আরবী ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এই বিধানের কারণ হলো, কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। আর কুরআন তেলাওয়াত করতে হয় আরবীতে। এছাড়া কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যেহেতু আরবী ছাড়া সেই জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় সেহেতু আরবী শিক্ষা করাও ফরয।

খ. সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে ‘ইজতিহাদ’ তথা গবেষণালব্ধ ইসলামের বিধিবিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ ফিকাহ অ্যাকাডেমি ও ইসলামি আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই ইসলামের সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবী ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি।

গ. কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা, শান্তির ধর্ম ইসলামকে মানুষের সামনে ভুলভাবে উপস্থাপন, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, ফেতনা-ফাসাদ ইত্যাদি থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য, বিশেষ করে কোমলমতি ছাত্রদেরকে জঙ্গিবাদের ছোবল থেকে বাঁচানোর জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা দান করা অতীব জরুরী; যাতে তারা নিজেরা সরাসরি কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করে ইসলামের সঠিক মর্মবাণী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারে এবং মানুষের সামনে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারে।

তিন. অধিক রেমিটেন্স অর্জনের লক্ষ্যে

ক. আমাদের দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্স আসে সৌদি আরবসহ আরবী ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরবদেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছেন। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবী ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতনভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে আরবী ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রফতানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারতেন; দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিটেন্স আসত। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই দেশে আধুনিক আরবী ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

খ. মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করে জ্বালানি তেল ও পর্যটনশিল্পে। তবে COVID-19 করোনাকালীন তেলের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় দেশগুলো অন্য অর্থনীতির ওপর জোর দিচ্ছে। অনেকে মরু অঞ্চলে কৃষি খামার ও শিল্প-কারখানা গড়ে তুলছে। আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি। আরবী ভাষাভাষী দেশগুলোতে বেশির ভাগ শ্রমিকই বাইরের দেশের। এই দেশগুলোতে এত পরিমাণ বিদেশি শ্রমিক কাজ করে যে স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় প্রবাসী কর্মীর সংখ্যাই বেশি। এসকল দেশের বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারি। আর এজন্য প্রয়োজন আরবী ভাষায় দক্ষতা উন্নয়ন।

গ. বর্তমান বিশ্বে ভাষা একটি অন্যতম Technology. তেমনি আরবী ভাষাও একটি Technology. বিভিন্ন পেশাগত কর্মে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি আরবী ভাষা নামক Technology তে দক্ষতা অর্জন করে আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা যদি মধ্যপ্রাচ্যের এসকল দেশে গমন করেন, তবে তারা বর্তমানে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ করতে সক্ষম হবেন। এজন্য বিদেশগামীদের প্রশিক্ষণের জন্য

স্থাপিত Technical Institute সমূহে আরবী ভাষা শিক্ষার সুযোগের পাশাপাশি দেশের সকল শিক্ষাধারায় আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় মূলত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা লেখা-পড়া করে। তাদেরকে আরবী ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি যদি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজারে কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্ব হ্রাস, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন সফল হবে, তেমনি ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার, তাও বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

চার. কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে

আরব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবী ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরব দেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরব দেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অপর দিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবী ভাষী হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক নানা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।

পাঁচ. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে

ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলাম আগমনের বহু বছর আগ থেকেই এ দেশের সাথে আরবদেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল এবং অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবী ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ আরবেরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া আরবী ভাষা বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বিশাল ভূখণ্ডের আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনের জন্য আরবী ভাষা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

ছয়. গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা

বর্তমানে প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী। আর ২৫ কোটি মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবী ব্যবহার করে। ১৮০ কোটি মুসলিমের ধর্মীয় ভাষা আরবী। বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে চতুর্থতম এই আরবী ভাষা। ২৮ দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী। আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরব লীগ এবং জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা আরবী। আন্তর্জাতিকভাবে এই ভাষার ১২টি নিয়ন্ত্রণ সংস্থা রয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস। ১৯৭৩ সালের এ দিনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরবীকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারেও আরবী ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাত. ইসলামী সংস্কৃতিকে ধারণ

ভাষা যেহেতু সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এর অনবদ্য প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। ঠিক তেমনি আরবী যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এরও কিছু ইসলামী প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। তাই ইসলামী সংস্কৃতিকে জানা ও জীবনে ধারণ করার জন্য আরবী শিক্ষা করা আবশ্যিক। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের আলোকে বলা যায়, আরবী ভাষার ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিকসহ অন্যান্য গুরুত্ব বিবেচনায় সকল মুসলমানের আরবী ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন; বিশেষ করে এদেশের মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আরবী ভাষায় দক্ষতা উন্নয়ন একান্ত আবশ্যিক।

৯. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আরবী ভাষার সাথে এদেশের মুসলমানদের সম্পর্ক হাজার বছরের প্রাচীন। কুরআন-হাদিস তথা দীন-ইসলামের ভাষা হিসেবে আরবী ভাষার সাথে এ জনপদের মুসলমানদের হৃদয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আরবী শুধু আমাদের ধর্মীয় ভাষাই নয়, এটি বর্তমানে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, কূটনীতি ও

আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষার সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের দেশের সিংহভাগ রেমিটেন্স ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাই শিক্ষার সর্বস্তরে আরবী ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা সময়ের একান্ত দাবী। মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আরবী ভাষার দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সমাধানের উপায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরবী ভাষায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। রেমিটেন্সের প্রবাহ দ্বিগুণ-তিনগুণকরণ, জঙ্গিবাদ ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ দেশ গঠনে আরবী ভাষা হতে পারে অন্যতম কার্যকর প্রযুক্তি। সেই প্রযুক্তির চর্চা, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে এ ভাষা এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ সুয়ুতি, জালালুদ্দিন, *আল-মুযহির ফি উলুমিল লুগাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৩১২-৩২।
- ^২ ড. আবু সালেহ মোহাম্মদ তোহা, *আরবী ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: সালেহা প্রকাশনী, ২০২৩ খ্রি.), পৃ. ১৪৭।
- ^৩ তদেব।
- ^৪ সুরা ইবরাহিম: ৩৭।
- ^৫ নূহ আ.-এর তিন সন্তান প্লাবনের পর জীবিত ছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে ১. সাম, ২. হাম, ৩. ইয়াফিস। বর্তমান পৃথিবীর সব মানুষ এই তিনজনের বংশধর।^৬ সামের পাঁচ সন্তান— ‘আয়লাম, আশূর, আরফাখ্‌শায, লুদ এবং আরাম।’^৭ সম্ভবত নূহ-তনয় সাম হতে السامية বা semitic শব্দটির উৎপত্তি বলে একাধিক পণ্ডিতদের মত। এ প্রসঙ্গে মিসরীয় পণ্ডিত জুরজি জায়দান বলেন,
 "والتي كانت تتفاهم بالفينيقية والآشورية والآرامية "شعوباً سامية" نسبة إلى سام بن نوح لأن هذه الأمة جاء في التوراة أنها من نسله
 وسموا لغاتهم اللغات السامية. "The Arabs belong to the great family of nations which on account of their supposed descent from Shem, the son of Noah, are commonly known as the "Semitic". R. A. Nicholson, A Literary History of the Arab (Cambridge; 1953), p. 22.
- ^৬ ড. আবু সালেহ মোহাম্মদ তোহা, *আরবী ভাষাতত্ত্ব*, পৃ. ১৪৭।
- ^৭ তদেব, পৃ. ৪৫।
- ^৮ বাইবেল, *আদিপুস্তক ১১/১*
- ^৯ জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, *আল ইতকান ফি উলুমিল ১ম খণ্ড* (সৌদি আরব), পৃ. ১৩৬।
- ^{১০} *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৭৪।
- ^{১১} *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৩ ফেব্রুয়ারি-২০১৭।
- ^{১২} ডক্টর এস. এম. লুৎফল রহমান, *বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস* (ঢাকা: ধারণী সাহিত্য সংসদ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭৬-৭৭।
- ^{১৩} তদেব, পৃ. ৭৮।
- ^{১৪} ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২১২।
- ^{১৫} ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরববিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১-২।
- ^{১৬} ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, *বাংলাদেশে (বঙ্গদেশে) হাদীস চর্চা*, পৃ. ৪৭।
- ^{১৭} আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১১৭।
- ^{১৮} ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, *বাংলাদেশে (বঙ্গদেশে) হাদীস চর্চা*, পৃ. ৪৭।
- ^{১৯} সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১২২।
- ^{২০} ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২১৩।
- ^{২১} তদেব।
- ^{২২} তার ছাত্রদের বিহারের খ্যাতনামা সূফী মুহাদ্দিস মাখদুম আহমদ ইবন ইয়াহইয়া আল মানোরীর পিতা ইয়াহইয়া আল মুনীরী ছিলেন অন্যতম।
- ^{২৩} মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৬৯৩।
- ^{২৪} ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ: অধ্যাপনিক সংকলন আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৯৪-৯৫।
- ^{২৫} আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১১৭।
- ^{২৬} ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ: অধ্যাপনিক সংকলন আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ৯৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৬১।
- ^{২৭} ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, *বাংলাদেশে (বঙ্গদেশে) হাদীস চর্চা*, পৃ. ৫২।

- ^{২৮} বাংলাদেশে ইসলাম, তদেব, পৃ. ১০০; বাংলাদেশে সূফী সাধক, তদেব, পৃ. ১৯১।
- ^{২৯} নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৮খ্রি.), পৃ. ২৬১।
- ^{৩০} ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও মুহাম্মদ আবুল বাশার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, পৃ. ৪৫; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, অগ্রপথিক সংকলন, পৃ. ১০০।
- ^{৩১} হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ২৬১।
- ^{৩২} তদেব।
- ^{৩৩} ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, অগ্রপথিক সংকলন, পৃ. ১৩৩।
- ^{৩৪} দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, সিলেটে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রি.), পৃ.
- ^{৩৫} History of The Traditional Islamic Education in Bangladesh, Ot.cit. pp: 17-18.
- ^{৩৬} বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও আরবী ভাষার চর্চার বিকাশ সাধনে খান জাহান আলী ছিলেন একজন মহান দিকপাল। তিনি হলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত খানে 'আযম খান জাহান আলী (মৃত: ১৪৫৮)। তিনি যশোর ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালান। দেখুন: আজিল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ১৩৬; বাংলাদেশের সূফীবাদের দিশারী য়ারা, তদেব, পৃ. ৩২।
- ^{৩৭} বাংলাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, ও রাজনৈতিক জীবনকে সুসংহত ও সুউচ্চ করার ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর পরিবারের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। তৎকালীন বাংলার দুটি প্রধান কেন্দ্র পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁও তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল। দেখুন: বাংলাদেশে ইসলাম, তদেব, পৃ. ১২৪; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১০১।
- ^{৩৮} বাংলাদেশে আরবী ভাষার চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রে শাইখ আল-উল হকের সুযোগ্য সন্তান নূল কুতুবুল আলমের অবদান প্রশংসার্য। তিনি পাণ্ডুয়াতে একটি মাদরাসা ও তৎসংলগ্ন একটি খানকাহ নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।
- ^{৩৯} তিনি একজন মহান ইসলাম প্রচারক ও আরবী শিক্ষার আলো বিস্তারকারী আলেম (যিনি পূর্বে শাসক ছিলেন)। বরেন্দ্র ও রাঢ় এলাকায় ইসলাম প্রচারে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেখুন: বাংলাদেশে (বঙ্গদেশে) হাদীস চর্চা, তদেব, পৃ. ৫৫; বাংলাদেশে ইসাম, পৃ. ১০৩।
- ^{৪০} শিক্ষার ইতিহাস, অধ্যাপক আ. খা. আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য (সম্পাদিত) (ঢাকা: ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ৮৮।
- ^{৪১} মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ (ঢাকা: সোনারী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ১৮৬।
- ^{৪২} এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ৯৯।
- ^{৪৩} মুহাম্মদ আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ১২৯।
- ^{৪৪} ইলিয়াস আলী, মাদরাসা শিক্ষা' ত্রিমাসিক বিচয়ন (ঢাকা: বাংলাদেশ জুলাই, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ৩৪।
- ^{৪৫} এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১০৫।
- ^{৪৬} মুনমুন আকমল, শিক্ষা ব্যবস্থা: একশতাব্দীর খতিয়ান, নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, মে ১৯৯৫), পৃ. ২৩; মুহাম্মদ আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ১৩৮।
- ^{৪৭} মুনমুন আকমল, শিক্ষা ব্যবস্থা: একশতাব্দীর খতিয়ান, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩; Dr. Sekandar ALi Ibrahim, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Vol-3 (Dhaka: Islamic Foundation, 1986), p. 135.
- ^{৪৮} তদেব।
- ^{৪৯} অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব অন্যান্য সম্পাদিত, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ৫৮।
- ^{৫০} ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তদেব, পৃ.
- ^{৫১} ব্যানবেইস।
- ^{৫২} ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তদেব, পৃ.
- ^{৫৩} তদেব, পৃ. নং ১১-১২।
- ^{৫৪} ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান, বিশ্ব আরবী ভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক ভার্সুয়াল কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।- দৈনিক সমকাল, ২১ ডিসেম্বর-২০২০।
- ^{৫৫} সূরাহ ইউসুফ: ০২।
- ^{৫৬} ইমাম তাবারানী, আল-মুজাম্মুল আওসাত (কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.), হাদিস নং: ৫৫৫৩।
- ^{৫৭} মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসাবি, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৯।
- ^{৫৮} মাজমাউল ফাতাওয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।

মু'আল্লাকার শব্দালংকার: একটি পর্যালোচনা [Ornamentation of Muallaqah: A Discussion]

ড. মোঃ মতিউর রহমান*

[Abstract: Arabic is one of the most ancient languages in the world. Human express their feelings in wonderful ways through words. Literature plays a vital role to present a language in an alternative and ornamental manner. A particular language is as widely appreciated in the world as developed its literature. A great literature has many branches like- poetry, prose, drama, novel, short stories etc. No literature can be imagined without poetry. Arabic literature is an advanced and highly recognised literature in the world. Since the dawn of knowledge, Arab poets have been composing poetry that is very rhythmic and decorative. Muallaqah, the standard type of selected Qasida (odes) hung on the walls of the Kaaba, include most of the early Arab poems of pre-Islamic age. These are considered as the most famous & greatest poems of that pre-Islamic “Age of Ignorance” which depicts the life of ancient Arabs. Muallaqah poems are composed mainly in verse which have gained supremacy over poems of other ages in diction, versification, rhythm and use of rhetorical devices. The structure of Arabic poetry of pre-Islamic “Age of Ignorance” is very elegant, decorative and full of rhetorical devices. To study phonetical ornamentation of Muallaqah, vast knowledge in Arabic rhetoric is essential. Phonetically and semantically are the two main ways that Arabic rhetoric typically appears. Phonetically it translates to “SHABD ALANKAR” (embellishment of words) which is the term for linguistic ornamentation as defined by the rules of rhetoric. Certain distinctive phonetic ornaments are used in Arabic rhetoric. Muallaqah poems have been embellished by these rhetorical devices. Important Arabic (word ornamentation components)/rhetorical devices are emphasised in this article and the ornamentation of Arabic poetry is investigated through a study of how they are used in various Muallaqah poems.]

Keywords: মু'আল্লাকাহ শব্দালংকার।

১. ভূমিকা

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম আরবী ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে থাকে। ভাষাকে সুন্দর ও নান্দনিক করে উপস্থাপনে সাহিত্যের অবদান যথেষ্ট। তাই যে ভাষার সাহিত্য যত উন্নত, সে ভাষা বিশ্বের বুকে তত ব্যাপ্ত ও মর্যাদা সম্পন্ন। একটি উন্নত সাহিত্যের অনেক শাখা প্রশাখা থাকে, যেমন: গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি। পদ্য বা কবিতা ছাড়া সাহিত্য অকল্পনীয়। আরবী সাহিত্য একটি উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্য। আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে আরবী কবিতার অবদান যথেষ্ট। আবহমানকাল থেকেই আরবী কবিতা আরবী সাহিত্যের প্রধান ও মৌলিক শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আরব কবিগণ প্রাচীন যুগ থেকেই ছন্দবদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ কবিতা রচনা করে চলেছেন। প্রাচীন যুগের অধিকাংশ কবিতায় মু'আল্লাকার অন্তর্ভুক্ত। মু'আল্লাকা জাহিলী যুগের প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠতম কবিতা। মু'আল্লাকায় প্রাচীন যুগের আরবদের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। মু'আল্লাকা মূলত ছন্দবদ্ধ কবিতা। মু'আল্লাকার শব্দচয়ন, ছন্দমিল, অন্তর্মিল, বিষয়বস্তু ও ভাষা অলংকার সকল যুগের আরবী কবিতার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। জাহিলী যুগের আরবী কবিতার কাঠামো ও গঠন প্রণালী অনেক সুন্দর ও অলংকারময়। যাতে আরবী অলংকার শাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। তাই মু'আল্লাকার শব্দালংকার সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হলে আরবী অলংকার শাস্ত্রের ভাষা অলংকার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আরবী ভাষা অলংকার সাধারণত

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

দু'ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শব্দগতভাবে এবং অর্থগতভাবে। শব্দের দিক থেকে ভাষা অলংকারপূর্ণ হওয়াকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় *الحسنات اللفظية* বা শব্দালংকার বলা হয়। আরবী অলংকার শাস্ত্রে *الحسنات اللفظية* এর কিছু সুনির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে। যেমন: *التصدير - السجع - الجناس* ইত্যাদি। এ গুলোর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মু'আল্লাকার শব্দালংকার ফুটে উঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে আরবী শব্দালংকারের কিছু উল্লেখযোগ্য উপাদানের পরিচয় তুলে ধরে মু'আল্লাকার বিভিন্ন কবিতার মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনার মাধ্যমে মু'আল্লাকার শব্দালংকার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাব।

২. মু'আল্লাকা পরিচিতি

মু'আল্লাকা মূলত জাহেলী যুগের দীর্ঘ কবিতা। আরবী *معلقة* শব্দটি এক বচন, বহুবচনে (*معلقات*) ব্যবহৃত হয়। যা *تعلق* মাসদার থেকে *ع-ل-ق* মূল অক্ষর হতে উৎপন্ন হয়েছে। শব্দটির শাব্দিক অর্থ ঝুলন্ত বস্তু, লটকিয়ে রাখা বস্তু, টাঙ্গিয়ে রাখা বস্তু ইত্যাদি।^১ এ শব্দটি আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ*^২ “তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না।”

রাসূল সা. এর বাণীর মাঝেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন, *الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله*^৩, “রেহেম তথা আত্মীয়তা আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে এবং বলছে যে ব্যক্তি আমার সম্পর্ক রক্ষা করবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।”

পারিভাষিক অর্থে জাহেলী যুগের সংরক্ষিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘ কবিতাবলীকে মু'আল্লাকা বলা হয়। মু'আল্লাকার সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান গ্রন্থ *المعجم الوسيط* গ্রন্থে বলা হয়েছে, *المعلقات وهي سبع قصائد لشعراء*, “জাহিলী যুগে প্রসিদ্ধ কবিদের সাতটি কাসীদা বা কবিতা হল মু'আল্লাকা।”^৪ *من شعراء الجاهلية*

জাহিলী যুগের মু'আল্লাকার বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। মু'আল্লাকা নামক কবিতাগুলো জাহিলী যুগের উকায মেলায় কাব্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করার কারণে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত। তাই এগুলোকে মু'আল্লাকা বলা হয়। কেউ কেউ মু'আল্লাকাকে কাসীদাহ বলে নামকরণ করেছেন। আকারে দীর্ঘ হওয়ার কারণে জুরজী যায়দান এগুলোকে *السبع الطوال* বলে নাম দিয়েছেন।

মু'আল্লাকার সুন্দর শব্দ বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করে এগুলো *السموط* বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মু'আল্লাকার কবিতাগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হতো তাই এগুলো *المذهبات* বলেও নামকরণ করা হয়। মু'আল্লাকার কবিতাগুলো অন্যান্য কবিতার চেয়ে বেশী দীর্ঘ। এগুলোর চরণ সংখ্যা ৬৪ থেকে ১১৫ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আসমা'য়ী মু'আল্লাকার বায়ত সংখ্যা ৭৭টি বলে মত প্রকাশ করেছেন। শারহুল মু'আল্লাকতিস সাব'ই গ্রন্থে এর বায়ত সংখ্যা ৮১টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।^৫

মু'আল্লাকার সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করেছেন। যাওয়ানী^৬ মু'আল্লাকার সংখ্যা সাতটি বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক ইবন খলদুনও এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন! এদিক থেকে এ কবিতাগুলো আস-সাব'উল মু'আল্লাকাত নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ইমরু'উল কায়েস, তুরাফা ইবন আবদ, যুহাইর ইবন আবি সুলামা, লাবিদ ইবন রাবী'আ, আমর ইবন কুলছুম, আনতারা ইবন শাদ্দাদ এবং হারিছ ইবন হিলযাহ। আবু যাকারিয়া আত-তাবরীযী আরও তিন জন কবিকে মু'আল্লাকার কবি হিসেবে স্থান দিয়েছেন। তারা হলেন নাবিগা, আল-আশা ও আবীদ ইবন আল আবরস। এদিক থেকে অনেকেই মু'আল্লাকার সংখ্যা দশ বলে উল্লেখ করেছেন।^৭

৩. *الجناس* পরিচিতি ও মু'আল্লাকায় এর ব্যবহার

الجناس আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। *الجناس*-এর ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আরবী কবিতার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, তন্মধ্যে জাহেলী যুগের আরবী কবিতা অন্যতম।

জাহেলী যুগের আরবী কবিতায় الجناس-এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মু'আল্লাকার কবিতায় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এ পর্যায়ে الجناس-এর পরিচয় ও মু'আল্লাকার কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

الجناس-এর পরিচয়

الجناس শব্দটি باب مفاعلة এর ج ن س | ج ن س এর তিনটি আরবী মূল অক্ষর থেকে শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। অলংকার শাস্ত্রের দিক থেকে শব্দটির বাংলা অর্থ: বাক্যের দুই অংশের মধ্যে মিল, শ্লেষ, শ্লেষালংকার, শ্লেষবাক্য।^{১৮} শব্দটির মৌলিকতা ও অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: «الجناس: شاكله واتحد معه في الجنس»।^{১৯} “তার মত হয়েছে এবং শ্রেণীগত দিক থেকে তার সাথে মিল রয়েছে।” এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে:

الجناس في البديع: تشابه الكلمتين في اللفظ كله نحو "العين" أي الباصرة و "العين" أي ينبوع الماء أو بعضه نحو "ساه: و "ساهر"^{২০}

“العين অর্থ “জেনাস হলো বাক্যের মাঝে শব্দগত দিক থেকে দু’টি শব্দ পূর্ণরূপে মিল হওয়া। যেমন: العين: “সাহু আবার العين অর্থ পানির বর্ণা। অথবা আংশিকভাবে মিল হওয়া যেমন: ساه এবং ساهر শব্দ।”

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়, একই পঙক্তিতে ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট একই ধরনের দুই বা ততোধিক শব্দ ব্যবহার করাকে جناس বলা হয়।^{২১} “الشبيه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف في المعنى”^{২২} “শব্দগত দিক থেকে দু’টি শব্দের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া এবং অর্থগত দিক থেকে পার্থক্য হওয়াকে جناس বলা হয়।”

“الدُّو” جناس أن يتشابه اللفظان في النطق و يختلفا في المعنى^{২৩} “দু’টি শব্দের উচ্চারণের দিক থেকে এক রকম হওয়া এবং অর্থের দিক থেকে পার্থক্য হওয়াকে جناس বলা হয়।” যেমন ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾^{২৪}, আল্লাহর বাণী,

الجناس-এর প্রকার: جناس মূলত দু’প্রকার ১. নাম বা পূর্ণাঙ্গ ২. নাম বা অপর্যাঙ্গ। جناس সম্পর্কে বলা হয়েছে: «الجناس: وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي: نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها»^{২৫} “বাক্যের মাঝে দুটি শব্দে চারটি বিষয়ে মিল থাকলে তাকে جناس বলা হয়। বিষয়গুলো হলো: ১. হরফের শ্রেণী, ২. হরফের আকৃতি, ৩. হরফের সংখ্যা, ৪. হরফের বিন্যাস।” যেমন আল বারুদীর কবিতায় বলা হয়েছে, ﴿وَحَمَل رِزَايا الدهر أحلى من المن﴾^{২৬} “অনুগ্রহের খোঁটা দেয়ার ভয়ে সকল বালা-মুছিবত আমি সহ্য করলাম তাই যুগযুগ ধরে সে বালা-মুছিবত আমি মধুর চেয়েও মিষ্টি ভাবলাম।” ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾^{২৭} “কোনো বাক্যে দুটি শব্দের মাঝে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের কোনো একটিতে অমিল থাকলে তাকে جناس বলা হয়।” “কোনো বাক্যে দুটি শব্দের মাঝে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের কোনো একটিতে অমিল থাকলে তাকে جناس বলা হয়।” যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾^{২৮} “সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না; এবং সাহায্য প্রার্থীকে ভরসনা করিও না।”

মু'আল্লাকায় الجناس-এর ব্যবহার

الجناس-এর সংজ্ঞার আলোকে মু'আল্লাকার কবিতার মাঝে অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যেগুলোর মাঝে جناس-এর ব্যবহার ঘটেছে। এ পর্যায়ে মু'আল্লাকার এমন কিছু উক্তি পর্যালোচনা করা হলো, যেথায় جناس-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে। যেমন কবি ইমরুল কায়স তাঁর মু'আল্লাকায় বলেন,

تجاوزت أحراسا إليها ومعرشاً * علي حراسا لو يسرون مقتلي^{২৯}

“জাহাত প্রহরী এবং স্বজনদের অতিক্রম করে তার নিকট পৌঁছেছি আমি যাদেরকে আমার খুনের ব্যাপারে অনুরক্ত পেয়েছি।”

মু'আল্লাকার আলোচ্য কবিতার লাইন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এখানে ব্যবহৃত أحراسا এবং حراسا শব্দ দুটির মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল থাকলেও একটি অক্ষরে অমিল রয়েছে। তবে অর্থগত দিক থেকে উভয় শব্দের

مکر مفر مقبل مدبر مع * کجلمود صخر خطہ السیل من عل^{۲۵}

মু'আল্লাকার বর্ণিত কবিতার উক্তির মাঝে مكر ও مفر শব্দের মাঝে جناس এর অলংকার ফুটে উঠেছে। কবিতার এ শব্দ দুটির মাঝে একটি অক্ষরে অমিল থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। তবে শব্দ দুটির মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অর্থের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। তাই এখানে جناس غير تام এর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। কবি আনতারা ইবন শাদাদের মু'আল্লাকায় বলা হয়েছে,

یا دار عبلة بالجواء تکلمی* و عمی صباحا دار عبلة و اسلمی^{۵۵}

আলোচ্য কবিতার অংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কবিতার একই বায়ত এর মাঝে اسلمي و تكملي শব্দ দুটির কিছু অক্ষরে মিল না থাকলেও অধিকাংশ অক্ষরে মিল আছে। তাছাড়াও শব্দ দুটির মাঝে অক্ষর সংখ্যা ও ধারাবাহিকতার দিক থেকেও যথেষ্ট মিল রয়েছে। সাথে সাথে অর্থগত দিক থেকেও শব্দ দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাই এখানে جناس غير تام-এর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

سجع আরবী অলংকার শাস্ত্রের *الحسنات اللفظية* বা শব্দালংকারের একটি অন্যতম প্রকার। سجع-এর ব্যবহার গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাই আরবী কবিতার মাঝে سجع-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যার মাধ্যমে আরবী কবিতায় অলংকার শাস্ত্রের শব্দালংকার সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। سجع শব্দটি একবচন, বহুবচনে أسجاع ব্যবহৃত হয়। এর শাব্দিক অর্থ অন্তর্মিলযুক্ত গদ্যাংশ, অন্তর্মিলযুক্ত বাক্য।^{২২} অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় سجع হলো، *السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وأفضله ماتساوت فقره*^{২৩} “দু’টি বাক্যের শেষাংশে মিল হওয়াকে سجع বলে। আর শ্রেষ্ঠ سجع যার সকল অনুচ্ছেদে মিল থাকে।” যেমন আল্লাহর বাণী،^{২৪} *﴿الرَّحْمَنُ -عَلَّمَ الْقُرْآنَ -خَلَقَ الْإِنْسَانَ -عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾*^{২৫} “দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে।” *﴿فِيهَا سُرُّرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾* “সেথায় থাকিবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকিবে পানপাত্র।”^{২৬}

سبح সুন্দর ও সার্থক হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। যথা: প্রথমত: বাক্যের প্রতিটি শব্দ সুগঠিত, সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর হতে হবে। দ্বিতীয়ত: বাক্যের সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে অর্থের অনুযায়ী এবং অনুগামী হতে হবে। কোনোরূপ কম বেশি হলে তা কৃত্রিম ও অপছন্দনীয় রূপে গণ্য হবে। তৃতীয়ত: বাক্য গঠনের সময় অর্থ হবে মনোরম ও আকর্ষণীয়, কখনই অপছন্দনীয় হবে না। চতুর্থত: প্রতিটি অন্তর্মিলযুক্ত বাক্য যেন এমন অর্থ প্রকাশ করে যা দ্বিতীয় বাক্যের অর্থের বিপরীত হয়, কখনই দ্বিরুক্ত না হয়। অন্যথায় অন্তর্মিলযুক্ত শব্দ ব্যবহার অনর্থক হয়ে পড়বে।^{২৬}

وهو على ثلاثة اضراب: مرصع، متواز، سجع এর প্রকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সجع-এর প্রকার: অলংকার শাস্ত্রে

২৭ এটি তিন প্রকার। যথা:

এক. **السجع الموصع**: দুটি বাক্যের সকল শব্দে অথবা অধিকাংশ শব্দে ওয়ন এবং অন্তর্মিল উভয় দিক থেকে মিল হওয়াকে **السجع الموصع** বলা হয়। যেমন হারীরী বলেন,

فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه * ويقرع الأسماع بزواجر وعظه^{٢٥}

“তিনি তাঁর বক্তব্যে শব্দের অলংকার দ্বারা ধারাবাহিক ছন্দের সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর ধমকিমূলক উপদেশ দ্বারা শ্রবনেন্দ্রিয়কে বাংকত করেছেন।”

দুই. المتوازي السجع দুটি বাক্যের শেষ দুটি শব্দে ওয়ন এবং বর্ণে মিল হওয়াকে বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْمُرْسَلَتِ غُرْفًا - فَأَلْعَصِفَتِ عَصْفًا﴾^{২৯} “শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর, আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার।”

তিন. السجع المطرف দুটি বাক্যের শেষ দুটি শব্দের শেষে ওয়নে মিল না হয়ে শুধু বর্ণে মিল হওয়াকে বলা হয়।^{৩০} যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا - وَقَدْ خَلَقَكُمْ﴾^{৩১} “তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।”

মু'আল্লাকায় সجع-এর ব্যবহার

সجع-এর সংজ্ঞার আলোকে মু'আল্লাকার বিভিন্ন কবিতার মাঝে এমন অনেক উক্তি পাওয়া যায়, যাতে সجع এর ব্যবহার ঘটেছে। যেমন ইমরুল কায়স এর কবিতায় বলা হয়েছে,

قفنا نبك من ذكرى حبيب و منزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل^{৩২}

“হে প্রিয় বন্ধুদয়! দাঁড়াও, আমার প্রেমসী এবং তার বাস্তুভিটার স্মরণে একটু কেঁদে নিই। যা বালুর টিলার শেষপ্রান্তে ‘দাখুল’ ও ‘হাওমাল’ নামক জায়গার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।”

আলোচ্য কবিতায় প্রথমার্ধের শেষ শব্দ منزل এবং দ্বিতীয়ার্ধের শেষ শব্দ حومল এর মাঝে ওয়ন এবং বর্ণে মিল থাকার কারণে এখানে আরবী কবিতার মাঝে সجع-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে। ইমরুল কায়স এর মু'আল্লাকার পরবর্তী অংশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ل অক্ষর দিয়ে অন্তিমিল রক্ষা করা হয়েছে। কবি আনতারা ইবন শাদাদের মু'আল্লাকায় বলা হয়েছে,

فوقفت فيها ناقتي وكأنا * فدن لأقضي حاجة المثلوم

و تحل عيلة بالجواء و أهلنا * بالحنن فالصمان فالملتئم^{৩৩}

“সেখানে আমার টীলা সদৃশ উষ্ট্রীকে বেঁধে দাঁড় করে রেখেছিলাম যার ফলে আমার দীর্ঘ বিরহের জ্বালায় কিছুটা উপশম করছিলাম। আবলা যখন জেওয়াই অবস্থান করছিলো আমার পরিবার তখন হাযন, স্বাম্মান ও মুতাছল্লামে বাস করছিলো।”

উল্লেখিত কবিতার প্রথম সতরের শেষ শব্দ المثلوم এবং দ্বিতীয় সতরের শেষ শব্দ فالملتئم। শব্দ দুটির মাঝে মাত্রা এবং বর্ণের দিক থেকে মিল থাকার কারণে এখানে কবিতার মধ্যে অন্তিমিলের শব্দালংকার ফুটে উঠেছে। কবি তরফা ইবন আবদ এর মু'আল্লাকায় বলা হয়েছে,

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا * ويأتيك بالأخبار من لم تزود

و يأتيك بالأخبار من لم تبع له * بناتا ولم تضرب له وقت موعد^{৩৪}

“সময় তোমার নিকট এমন কিছু প্রকাশ করবে যা তুমি জানো না আর সে ব্যক্তি তোমাকে অনেক কিছু খবর দিবে যাকে তুমি প্রয়োজনীয় কিছু দাও না। সে ব্যক্তি তোমাকে সংবাদ দিবে যার জন্য তুমি কোন সামগ্রী ক্রয় করো নি আর (সে ব্যক্তি তোমাকে সংবাদ দিবে) যাকে তুমি স্বাক্ষাতের সময় দাও নি।”

আলোচ্য কবিতার লাইন দুটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম লাইনের শেষ শব্দ لم আর দ্বিতীয় লাইনের শেষ শব্দ موعد। উভয় লাইনের শেষে د অক্ষর দিয়ে অন্তিমিল রক্ষা করা হয়েছে। তাই এখানে অন্তিমিলের অলংকার প্রকাশ পেয়েছে।

৫. التصدير পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার

আরবী অলংকার শাস্ত্রে التصدير শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। আরবী সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আরবী ভাষায় শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আরবী অলংকার শাস্ত্রে একে التصدير বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।^{৩৫} আরবী কবিতার মাঝে অনেক বাক্যে التصدير-এর ব্যবহার পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে التصدير-এর পরিচয় ও মু'আল্লাকার কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

التصدير-এর পরিচয়

التصدير শব্দটি تفعيل باب-এর مصدر। আরবী ص د ر মূল অক্ষর থেকে শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। এর শাব্দিক অর্থ আরম্ভ করা, শুরু করা, সামনে স্থান দেয়া।^{৩৩} পারিভাষিক অর্থে التصدير হলো, هو في النشر أن يجعل أحد الركنين في أول الفقرة والأخر في آخرها، و في النظم أن يجعل أحد الفريقين من ذلك في آخر البيت في أول صدره^{৩৪}

“গদ্যে বাক্যের দু’টি মূল অংশের মধ্যে একই জাতীয় দু’টি শব্দের একটিকে বাক্যের প্রথমে এবং অন্যটিকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করা। আর পদ্যে ছত্রের صدر-এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দকে عجز-এর মধ্যে পুনরায় নিয়ে আসা।”

আমরা এভাবে বলতে পারি পৌনঃপুনিকতা বা একজাতীয় দু’টি শব্দের একটিকে বাক্যের প্রথমে এবং অপরটিকে বাক্যের শেষাংশে ব্যবহার করাকে التصدير বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা’আলার বাণী, ﴿فَقُلْتُ﴾ “তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমশীল।” ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾^{৩৫} আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন, ﴿وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾^{৩৬} “তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।”

মু’আল্লাকায় التصدير-এর ব্যবহার

মু’আল্লাকার কবিতার অনেক পঙ্ক্তিতে التصدير-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কবি আনতারা ইবন শাদাদের মু’আল্লাকায় বলা হয়েছে,

يا دار عيلة بالجواء تكلمي * و عمي صباحا دار عيلة و اسلمي^{৩৭}

“জেওয়াই অবস্থিত হে আবলার বাড়ী তুমি কথা কও! হে আবলার বাড়ী প্রভাতে তুমি সুখে থাকো ও নিরাপদে রও।” আলোচ্য কবিতাংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে কবিতার দু’টি অংশের প্রথমাংশে دار عيلة শব্দ ব্যবহার করে দ্বিতীয়াংশের মাঝে পুনরায় শব্দ দু’টি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে কবিতার মাঝে التصدير-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে। ইমরুল কায়স এর মু’আল্লাকায় বলা হয়েছে,

الا رب يوم لك منهن صالح * ولا سيما يوم بدارة جليل^{৩৮}

“ওহ! কত মধুর দিন আমি অতিবাহিত করেছি তাদের সঙ্গে হেথা বিশেষ করে মনে পড়ে দারুল জুলজুল এর সুমধুর দিনের কথা।”

আলোচ্য কবিতার লাইনটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে صدر এর মাঝে يوم শব্দটি ব্যবহার করে পুনরায় عجز এর মাঝেও উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এখানে মু’আল্লাকার কবিতার মাঝে التصدير-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে। কবি তরফা ইবন আবদ এর মু’আল্লাকায় বলা হয়েছে,

أرى قبر نحام بخيل بماله * كقبر غوي في البطالة مفسد^{৩৯}

“আমার নিকট অর্থ খরচের ক্ষেত্রে কৃপন ব্যক্তির কবর যেমন অমিতব্যয়ী, পথভ্রষ্ট এবং কুপথে অর্থনাশকারীর কবর তেমন।”

আলোচ্য কবিতার লাইনটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে কবিতার صدر অংশে قبر শব্দটি ব্যবহার করে পুনরায় عجز অংশেও قبر শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এখানে অলংকার শাস্ত্রের التصدير এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে। কবি তরফা ইবন আবদ এর মু’আল্লাকায় আরও বলা হয়েছে,

فلو شاء ري كنت قيس بن خالد * ولو شاء ري كنت عمرو بن مرثد^{৪০}

“আমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে আমি কায়স ইবন খালিদ হতাম আমার প্রতিপালক চাইলে আমি খালিদ ইবন মারছাদ হতে পারতাম।”

আলোচ্য কবিতার صدر অংশে ري كنت عجز অংশেও لو شاء ري كنت ব্যবহার করে পুনরায় عجز অংশেও ري كنت ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এখানে অলংকার শাস্ত্রের التصدير এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

৬. لزوم ما لا يلزم পরিচিতি ও মু'আল্লাকার কবিতায় এর ব্যবহার

لِزُوم আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম উপাদান। গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে لزوم ما لا يلزم-এর পরিচিতি ও মু'আল্লাকায় এর ব্যবহার সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হলো।

لِزُوم ما لا يلزم পরিচিতি

لِزُوم একটি যৌগিক শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অনাবশ্যককে আবশ্যক করা। এর পারিভাষিক পরিচয় (যে حرف الروي لزوم ما لا يلزم هو أن يؤتى قبل حرف الروي بما ليس بلازم في التقيفة^{৪৪}, অক্ষরে অন্তর্মিল রক্ষা করা হয়)-এর পূর্বে অন্তর্মিলের জন্য অনাবশ্যক কিছু নিয়ে আসাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় يلزم لزوم ما لا يلزم বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, ^{৪৫} ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا- وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾^{৪৫}, “শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।”

মু'আল্লাকার কবিতায় لزوم ما لا يلزم ব্যবহার

মু'আল্লাকার কবিতার মাঝে এমন কিছু পঙ্ক্তি পাওয়া যায়, যে গুলোর মধ্যে لزوم ما لا يلزم-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন কবি হারিছ ইবন হিল্লিয়াহ এর কবিতা,

يخلطون البرئ منا بذي الذن * ب و لا ينفع الخلي الخلاء

زعموا أن كل من ضرب العي * ر موال لنا وأننا الولاء^{৪৬}

“তারা আমাদের নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গকে অপরাধীদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে ফলে নির্দোষ ব্যক্তিও দোষমুক্ত থাকার ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ধারণা যে ব্যক্তি গোত্র প্রধানকে হত্যা করেছে আমরা তাদের সহযোগী আর তারা আমাদের মিত্র হয়েছে।”

কবিতার আলোচ্য লাইন দুটির শেষে ছন্দমিল রক্ষার জন্য ʿ অক্ষর নেয়া যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ʿ এর পূর্বে لا অক্ষরেও মিল আনা হয়েছে; যা ছন্দমিল রক্ষার জন্য আবশ্যিক ছিল না। ফলে এখানে মু'আল্লাকার কবিতার মাঝে لزوم ما لا يلزم-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে। কবি হারিছ ইবন হিল্লিয়াহ তার মু'আল্লাকায় আরও বলেন,

و كأن المنون تردى بنا أر * عن جونا ينجاب عنه العماء

مكفها علي الحوادث لا تر * ثوه للدهر مؤيد صماء^{৪৭}

“যুগ আমাদের দিকে কৃষ্ণ-গিরি চূড়ার মতো নিক্ষিপ্ত হয় তখন মেঘমালা আমাদেরকে বিপদ মুক্ত করে দেয়।”

কবিতার আলোচ্য লাইন দুটির শেষে ছন্দমিল রক্ষার জন্য ʿ অক্ষর নেয়া যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ʿ এর পূর্বে ʿ অক্ষরেও মিল আনা হয়েছে; যা ছন্দমিল রক্ষার জন্য আবশ্যিক ছিল না। ফলে এখানে মু'আল্লাকার কবিতার মাঝে لزوم ما لا يلزم-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে। কবি ‘আমর ইবন কুলছুমের মু'আল্লাকায় বলা হয়েছে,

و نحن الحاكمون إذا أطعنا * و نحن العازمون إذا عصينا

و نحن التاركون لما سخطنا * و نحن الأخذون لما رضينا^{৪৮}

“যখন আমাদের আনুগত্য করবে তখন আমরা তাদের জন্য সুবিচারক আর যখন আমাদের বিরুদ্ধাচারন করবে তখন কঠোর শাস্তির বিধায়ক। যখন আমরা অসন্তুষ্ট হই তখন আমরা প্রত্যাখান করি আর যখন আমরা সন্তুষ্ট হই তখন আমরা গ্রহণ করি।”

৭. التوزيع পরিচিতি ও মু'আল্লাকার কবিতায় এর ব্যবহার

التوزيع আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। التوزيع-এর মাধ্যমে বাক্যের সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়ে التوزيع পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

التوزيع পরিচিতি

التوزيع শব্দের শাব্দিক অর্থ বন্টন, বিতরণ, বিলি, পরিবেশন, ভাগকরণ।^{৪৬} অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় التوزيع বলতে কোনো বাক্যের প্রতিটি শব্দে নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ নিয়ে আসা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

هو أن يلتزم حرف في كل لفظ من العبارة^{৪৭}

“التوزيع হলো বাক্যের প্রতিটি শব্দে কোনো একটি বর্ণকে ব্যবহার করা।”

আরবী কবিতায় التوزيع-এর ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। যেমন হারীরীর কবিতায় বলা হয়েছে,

و سيف السلاطين مستأثر * بأنس السماع و حسو الكؤس
سلافي وليس لباس السلولو * يناسب حسن سمات النفيس
و سنن تناسلي جلاسه * و أسوا السجايا تناسلي الجليس
و سر حسودي بطمس الرسوم * و طمس الرسوم كرمس النفوس
وأسكرني حسرة واستعاض * لقسوته سكرة الخندريس^{৪৮}

হারীরীর আলোচ্য কবিতার বাক্যগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়। এখানে প্রতিটি বাক্যের প্রত্যেক শব্দের মাঝে স বর্ণটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে التوزيع-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

التوزيع-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো একই অক্ষর বাক্যের প্রতি শব্দে না হয়ে অধিকাংশ শব্দের মাঝে হয়ে থাকে। যেমন বাসরার একজন লোক কোনো এক কাজিকে লক্ষ্য করে রচনা করেন।

أيا من فرض القاضى * له أرضى لكي يرضى
أهذا في القضا فرض * بأن ترضى ولا أرضى
قضى قاضيك في أرضى * قضاء ليت لم يقضى
فأين العوض المفرو * ض لا كلا ولا بعضا^{৪৯}

আলোচ্য কবিতার শ্লোকগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে প্রতিটি শব্দে ض অক্ষর ব্যবহার না হলেও অধিকাংশ শব্দের মাঝে ض অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে আরবী কবিতার মাঝে التوزيع-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে। দুটি উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, বাক্যের সকল শব্দে একই অক্ষর ব্যবহার করা অথবা বাক্যের অধিকাংশ শব্দে একই অক্ষর ব্যবহার করাকে التوزيع বলা হয়।

মু'আল্লাকায় التوزيع এর ব্যবহার

মু'আল্লাকার কবিতার মাঝে অনেক স্থানে التوزيع এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইমরুল কায়স এর মু'আল্লাকায় বলা হয়েছে,

ترى بحر الارام في عرصاتها * وفيعائها كأنه حب فلفل^{৫০}

“তুমি দেখবে তার উঠানে ও নর্দমায় ছড়িয়ে হরিনের পায়খানা সেগুলো দেখে মনে হয় একেকটি গোলমরিচের দানা।”

মু'আল্লাকার কবিতার আলোচ্য লাইনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কবিতার ছন্দ এর মাঝে যে কয়টি শব্দ রয়েছে তার প্রত্যেকটির মাঝে ر অক্ষর বিদ্যমান রয়েছে। তাই এখানে মু'আল্লাকার মাঝে التوزيع এর অলংকার ফুটে উঠেছে। ইমরুল কায়স এর মু'আল্লাকায় অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে,

و قرية أقوام جعلت عصامها * على كاهل مني ذلول مرحل^{৫১}

আলোচ্য কবিতার লাইনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে عجز এর মধ্যে প্রায় সকল শব্দে ل অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে মু'আল্লাকার মাঝে التوزيع এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে। ইমরুল কায়স এর মু'আল্লাকায় আরও বলা হয়েছে,

كلانا إذا ما نال شيئا أفاته * ومن يحترث حرثي و حرثك يهزل^{৫২}

“আমাদের উভয়েই যখন কিছু পেয়ে তা হারিয়ে ফেলে তখন যে আমার ও তোমার অর্জন করে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।”

আলোচ্য মু'আল্লাকার কবিতার বায়তটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে কবিতার *عجز* অংশে অধিকাংশ শব্দে ঠ অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে *التوزيع*-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

কবি তরফা ইবন আবদ এর মু'আল্লাকায় বলা হয়েছে,

بلا حدث أحدثه و كحدث * هجاني وقذني بالشكاة و مطردي^{৫৬}

“আমি এমন কোন ঘটনা ঘটাইনি যে ঘটনার ফলে আমাকে ঠাট্টা, অপবাদ, অভিযোগ ও নির্বাসন দিবে।”

আলোচ্য মু'আল্লাকার কবিতার বায়তটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে কবিতার *صدر* অংশে অধিকাংশ শব্দে ঠ অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে *التوزيع*-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

৮. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, এভাবে জাহেলী যুগের আরবী কবিতা তথা মু'আল্লাকার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি কবিতার শ্লোকে আরবী অলংকার শাস্ত্রের কোনো না কোনো সূত্রের ব্যবহার ঘটেছে। আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকার একটি অন্যতম বিষয়। মু'আল্লাকার সংখ্যা ও প্রতিটি মু'আল্লাকার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ার কারণে একটি প্রবন্ধে মু'আল্লাকার শব্দালংকার আলোচনা করা সম্ভব নয়। সে দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচ্য প্রবন্ধে অলংকার শাস্ত্রের শব্দালংকারের উল্লেখযোগ্য কিছু বিশেষ বিশেষ সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে উদাহরণ স্বরূপ মু'আল্লাকার কিছু পঙ্ক্তির মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে জাহেলী যুগের আরবী কবিতার শব্দালংকারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠক সমাজ ও গবেষকবৃন্দ এখান থেকে মু'আল্লাকার শব্দালংকারের একটি ন্যূনতম ধারণা পেতে সক্ষম হবেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮০৫।
- ^২ সূরাহ আন-নিসা, আয়াত নং-১২৯।
- ^৩ মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *ছহীহ মুসলিম* (কায়রো: দারুল আল-হাদীস, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৮১৭, হাদীস নং- ২৫৫৫।
- ^৪ ড. ইবরাহীম আনস ও অন্যান্য, *আল-মু'জাম আল ওয়াসীত* (শাহারানপুর: যাকারিয়া বুক ডিপো, ১৯৭২ খ্রি.), ৬০৩।
- ^৫ আব্দুর রহমান আল-মুসতাবী, *দিওয়ানু ইমরিল কায়স* (বৈরুত: দারুল আল-মারিফাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৪।
- ^৬ তাঁর নাম আবু আদিল্লাহ আল-হুসাইন ইবন আহমাদ ইবন আল-হুসাইন আয-যাওয়ানী। তিনি আয-যাওয়ানী নামে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। পারস্যের নিশাপুর অঞ্চলের আয-যাওয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি নিজ শহরে কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত আলিম ও ইমাম ছিলেন। আল্লামা সূফি তাঁকে সে যুগের নাহ, ভাষা এবং আরবী বিষয়ের ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে তারজুমানুল কুরআন যা আরবী ও ফারসি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং শারহুল কাসাইদ আস-সাবই যা শারহুল মু'আল্লাকাত আস-সাবই নামে ছাপা হয় এবং এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি ৪৬৮ হি. মোতাবিক ১০৯৩ খ্রিস্টাব্দে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। দ্র: <https://www.marefa.org> > الزوني
- ^৭ জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবি আল-লুগাতি আল-আরাবিয়াহ* (বৈরুত: দারুল আল-ফিকির, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৯৮।
- ^৮ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *তদেব*, পৃ. ৩১২।
- ^৯ *আল-মুনজিদ* (বৈরুত, লেবানন: আল-মাকতাবাহ আশ-শারকিয়াহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৫।
- ^{১০} *তদেব*।
- ^{১১} অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *আরবী অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণ* (কলিকাতা: বাণী মনসিল, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ভূমিকাংশ।
- ^{১২} আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *উলূম আল-বালাগাহ* (বৈরুত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়াহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৯৭।
- ^{১৩} আস-সাইয়িদ আহমদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহির আল-বালাগাহ* (কায়রো: মুআস্সাসাতুল আল-মুখতার, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩১৭।
- ^{১৪} সূরাহ আর-রুম, আয়াত নং-৫৫।
- ^{১৫} মুস্তফা আমীন ও আলী আল-জারিম, *আল-বালাগাহ আল-ওয়াযিহাহ* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল আত-থানুভী, ১৯৯১ খ্রি.) পৃ. ২৬১।
- ^{১৬} আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *উলূম আল-বালাগাহ* (বৈরুত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়াহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৯৭।
- ^{১৭} মুস্তফা আমীন ও আলী আল-জারিম, *তদেব*, পৃ. ২৬১।
- ^{১৮} সূরাহ আয-যুহা, আয়াত নং-৯-১০।
- ^{১৯} আব্দুর রহমান আল-মুসতাবী, *তদেব*, পৃ. ৩৬।
- ^{২০} *তদেব*, পৃ. ৫৪।
- ^{২১} ইয়াহইয়া ইবন আলী আত-তাবরীযী, *শারহু আল-কাসাইদু আল-আশার* (বৈরুত: দারুল আল-জিল, তা. বি.), পৃ. ১৭৭।
- ^{২২} ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *তদেব*, পৃ. ৪৫৮।

-
- ২৩ মুক্তফা আমীন ও আলী আল-জারিম, তদেব, পৃ. ২৬৯।
- ২৪ সূরাহ আর-রহমান, আয়াত নং-১-৪।
- ২৫ সূরাহ আল-গাশিয়াহ, আয়াত নং-১৩-১৪।
- ২৬ আহমাদ মুক্তফা আল-মারাগী, তদেব, পৃ. ৩০২।
- ২৭ তদেব, পৃ. ৩০৩।
- ২৮ আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম আল-হারীরী, শারহ মাকামাত অল-হারীরী (বৈরুত: দারু আল-ফিকর লি আত-তবা'আ ওয়া আল-নশর ওয়া আত-তাওযী, তা.বি.), পৃ. ১১।
- ২৯ সূরাহ আল-মুরসালাত, আয়াত নং-১-২।
- ৩০ আহমাদ মুক্তফা আল-মারাগী, তদেব, পৃ. ৩০৩।
- ৩১ সূরাহ নূহ, আয়াত নং-১৩-১৪।
- ৩২ আব্দুর রহমান আল-মুসতাবী, তদেব, পৃ. ৩৬।
- ৩৩ ইয়াহইয়া ইবন আলী আত-তাবরীযী, তদেব, পৃ. ১৭৮।
- ৩৪ তদেব, পৃ. ১০১।
- ৩৫ আস-সাইয়িদ আহমদ আল-হাশিমী, তদেব, পৃ. ৩২৭।
- ৩৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, তদেব, পৃ. ৫১৩।
- ৩৭ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, মাজমূ'উল আদব ফী ফুন্নি আল-'আরব (বৈরুত: আল-মাতবা'আতু আল-উম্মাহ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ১৬৬।
- ৩৮ সূরাহ নূহ, আয়াত নং-১০।
- ৩৯ সূরাহ আল-আহযাব, আয়াত নং-৩৭।
- ৪০ ইয়াহইয়া ইবন আলী আত-তাবরীযী, তদেব, পৃ. ১৭৭।
- ৪১ আব্দুর রহমান আল-মুসতাবী, তদেব, পৃ. ২৬।
- ৪২ ইয়াহইয়া ইবন আলী আত-তাবরীযী, তদেব, পৃ. ৮৬।
- ৪৩ তদেব, পৃ. ৯৩।
- ৪৪ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, তদেব, পৃ. ১৭২।
- ৪৫ সূরাহ আশ-শামস, আয়াত নং ২-৩।
- ৪৬ ইয়াহইয়া ইবন আলী আত-তাবরীযী, তদেব, পৃ. ২৫৮।
- ৪৭ তদেব, পৃ. ২৬১-২৬২।
- ৪৮ তদেব, পৃ. ২৪১।
- ৪৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, তদেব, পৃ. ২৭৯।
- ৫০ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, তদেব, পৃ. ১৭২।
- ৫১ আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম আল-হারীরী, তদেব, পৃ. ৬০৬।
- ৫২ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, তদেব, পৃ. ১৭২।
- ৫৩ আব্দুর রহমান আল-মুসতাবী, তদেব, পৃ. ২২।
- ৫৪ আব্দুর রহমান আল-মুসতাবী, তদেব, পৃ. ৫১।
- ৫৫ আব্দুর রহমান আল-মুসতাবী, তদেব, পৃ. ৫৩।
- ৫৬ ইয়াহইয়া ইবন আলী আত-তাবরীযী, তদেব, পৃ. ৯১।

সাহাবিগণের কবিতায় উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা [Poems of Companions of the Holy Prophet about the Battle of Uhud: An Overview]

ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান^{১*}

[Abstract: The humiliating defeat at the historic Battle of Badr (17 Ramadan, 2 AH/11 March 624 AD) was very embarrassing and painful for the Qurayshi Polytheists. In this war they suffered heavy loss of life and property and also lost many leading person. Many were captured by Muslim forces. Their foresight, bravery, and tactics were questioned in the public mind. So they planned to take revenge. Turning grief into strength, at one point they resolved to engage in another battle with the Muslim forces and took up battle preparations with great enthusiasm. After preparing for war under the direct supervision of Iqrama Ibn Abu Jahl, Safwan Ibn Umayyah, Abu Sufyan Ibn Harb and Abdullah Ibn Ziyad and other polytheist leaders, they reached the desert of Uhud with a large force of about three thousand soldiers. On the other hand, Muhammad (PBUH) received the news of Quraysh's war preparations from a reliable and trustworthy source and stayed in the desert of Uhud with seven hundred fearless soldiers to resist them. According to the 7th Shawwal of the third Hijri, on Saturday 23 March 625 AD, fierce battle started between the two forces. At the beginning of the day, the Muslim army rushed towards victory. The Polytheists were defeated and ran for safe shelter. When the Muslim soldiers guarding the pass saw the Mushriks fleeing in defeat, they left the appointed place and busied themselves in collecting booty. Meanwhile, the cavalry of the Mushriks, finding the pass clear, launched an organized attack on the Muslim forces again. The Muslim forces were scattered. About seventy Muslims were martyred. Muhammad (PBUH) was physically injured. Even fake news of his death spread. At one point, due to mental fortitude and indomitable bravery, the Muslim forces overcame the temporary setback and launched a counter-attack on the enemy. About twenty-six soldiers of the Mushriq forces were killed. Seeing the Muslim forces regrouping in a safe place, the Mushriks lost courage to advance and retreated. At some point both the armies left the battlefield. Many Sahabi wrote poems reminiscing about the events of the Uhud battle. In those poems, various aspects of war, valor, bravery, foresight, achievements, leadership qualities of Muhammad (PBUH), prudence and military skills of the Muslim forces are discussed. Many poets have also composed grief stories highlighting the pain of losing loved ones. The relevant Article will illustrate on the reminiscences of the Battle of Uhud in the poems of the Companions of Holy Prophet Muhammad (PBUH).]

Keywords: Companions of Prophet, Arabic Poems, The Battle of Uhud.

১. ভূমিকা

ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধ ছিল মুসলিম জাতির ইমান ও ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা। এ যুদ্ধের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পরিস্থিতি তাদেরকে এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়। যার মাধ্যমে তারা প্রকৃত মুমিন হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে সুদৃঢ় থাকার অমূল্য পাথেয় অর্জন করে এবং সামরিক দিক থেকে আরও অধিক সুশৃঙ্খল ও সতর্ক থাকার শিক্ষা পায়। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় মক্কার মুশরিকদের জন্য ছিল খুবই লজ্জাকর ও যন্ত্রণাদায়ক। এ যুদ্ধে তাদের বহুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিহত হয়। জান-মালের ব্যাপক

^{*} প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি তাদের অনেকে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তারা এর প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা থেকে মুসলিম বাহিনীর সাথে আরেকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প নিয়ে বিপুল উৎসাহে যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইকরামা ইবন আবু জাহেল, সাফওয়ান ইবন উমাইয়া, আবু সুফইয়ান ইবন হারব এবং আব্দুল্লাহ ইবন যিয়াদসহ অন্যান্য মুশরিক নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণ শেষে তারা প্রায় তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে উহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়। অন্যদিকে মুহাম্মদ সা. নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ সূত্রে কুরাইশদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতিহত করার জন্য সাতশত অকুতোভয় সৈন্যসহ উহুদ প্রান্তরে অবস্থান করেন। ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ই মার্চ উভয় বাহিনীর মাঝে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দিনের শুরুতে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দিকে ধাবিত হয়। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। গিরিপথের পাহারায় নিযুক্ত মুসলিম সৈন্যরা প্রতিপক্ষকে পালাতে দেখে তারা নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করে গণিমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী গিরিপথ ফাঁকা পেয়ে পুনরায় প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণের ফলে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রায় সমস্ত মুসলিম সৈন্য শাহাদতবরণ করেন। মুহাম্মদ সা. শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর ভূয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে মানসিক দৃঢ়তা ও অদম্য সাহসিকতার ফলে মুসলিম বাহিনী সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে এবং পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এ যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর ছাব্বিশজন সৈন্য নিহত হয়। মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদ স্থানে পুনরায় সুসংগঠিত হতে দেখে মুশরিক বাহিনী সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারায় এবং তারা পিছু হটতে থাকে। একসময় উভয় বাহিনী-ই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধের নানা ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতিচারণ করে অনেক সাহাবি কবিতা রচনা করেছেন। যেসকল কবিতায় যুদ্ধের বিভীষিকাময় দিকসহ মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, শৌর্যবীর্য, কৃতিত্ব, মুহাম্মদ সা.-এর নেতৃত্ব-গুণ, বিচক্ষণতা ও সামরিক দক্ষতার বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন হারানোর ব্যথা-বেদনার কথা তুলে ধরে অনেক মুসলিম কবির পাশাপাশি মুশরিক কবি রচনা করেছেন শোকগাথা। যাতে ফুটে উঠেছে শোকাতুর হৃদয়ের মর্মব্যথা ও উহুদ প্রান্তরের হৃদয়বিদাক দৃশ্য। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

২. সাহাবি পরিচিতি

সাহাবি (صحابي) শব্দটি আরবী সুহবাতুন (صحبة) শব্দ থেকে উৎকলিত। মূলধাতু হল ح-ب-ص। শব্দটি একবচন। এর বহুবচন আসহাবুন (اصحاب) ও সাহাবাতুন (صحابية)। আভিধানিক অর্থ- সহচর, বন্ধু, সাথী, সঙ্গী, সাহচর্যে অবস্থানকারী বা একত্রে জীবনযাপনকারী।^১ সাহাবি বলতে মুহাম্মদ সা.-এর সাথী-সঙ্গীকে বোঝায়। স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে সাহিবাহ (صاحبة) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআনুল কারিমেও শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾^২, ‘লিসানুল আরব’ গ্রন্থ প্রণেতা ‘সাহাবি’এর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন,

الصَّحَابِيُّ هُوَ مُصْطَلَحٌ إِسْلَامِي يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُحَمَّدٌ وَأَسْلَمَ وَبَقِيَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى مَاتَ. كَمَا أَنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ بِالصَّحَابَةِ حَمَلَةُ رَسُولِ الْإِسْلَامِ الْأَوَّلِينَ، وَأَنْصَارُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُدَافِعِينَ عَنْهُ، وَالَّذِينَ صَحَبُوهُ وَآمَنُوا بِدَعْوَتِهِ وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ^৩

‘ইসলামি পরিভাষায় সাহাবি বলা হয় ঐ (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তিকে, যিনি মুহাম্মদ সা. এর সাক্ষাত পেয়েছেন, ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আমৃত্যু ইসলামের উপর অটল থেকেছেন। সাহাবি দ্বারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে, যারা ইসলামের বাণী বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ সা.-কে সাহায্য করেছেন ও প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করেছেন; তাঁর বরকতময় সান্নিধ্য লাভ করেছেন; তাঁর আশ্রানে সাড়া দিয়ে ইমান আনয়ন করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।’

হাদিস বিশারদ ও উসুলবিদগণের মাঝে ‘সাহাবি’-এর পরিচয়ের ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

فتعريف الصحابي عند الأصوليين هو: كل من لقي الرسول مؤمناً به ولازمه زمناً،

طويلاً 'সাহাবি হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি ইমান অবস্থায় রাসুল সা.-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং দীর্ঘসময় তাঁর বরকতময় সংশ্বে অবস্থান করেছেন।'

আর হাদিস বিশারদগণের মতে সাহাবি হলেন, كل من لقيه مسلماً ومات على إسلامه سواء طالت، 'সাহাবি হলেন তিনি যিনি ইসলামের উপর থাকা অবস্থায় মুহাম্মদ সা. এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। চাই তিনি দীর্ঘসময় তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করুন বা না করুন।'

ইবনু হাজার আস-কালানী 'সাহাবি'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন, 'সাহাবি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদ সা. এর প্রতি ইমান অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং মুসলমান থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।'

উল্লেখ্য যে, কিছু সংখ্যক ইসলামিক ফলার সাহাবি হওয়ার জন্য আল-লিকা (সাক্ষাৎ করা) এর স্থলে আর-রুইয়াত (চোখে দেখা)-এর শর্তারোপ করেছেন। তবে ইমাম বুখারি, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলসহ অধিকাংশ ইমাম পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলোকে সর্বাধিক সঠিক বলে মত দিয়েছেন। কেননা আর-রুইয়াতকে শর্ত করা হলে এমন সব মুমিন ব্যক্তি সাহাবির সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যাবেন, যারা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র অন্ধত্বের কারণে সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম রা. এর নাম সবার আগে চলে আসবে। অথচ তিনি একজন সম্মানিত ও মর্যাদাবান সাহাবি ছিলেন। যিনি ইসলামের শুরুতে রাসুল সা. এর পক্ষ থেকে মদিনার লোকদের দীন শিক্ষা দানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধের সময় মসজিদের নববির ইমাম নিযুক্ত হয়েছিলেন।^৬ আর সাইদ ইবনু মুসায়্যিব সাহাবি হওয়ার জন্য মুহাম্মদ সা. এর সাহচর্যে এক বা দুই বছর অবস্থান করা কিংবা তার এক-দুটি গায়ওয়ায় অংশগ্রহণ করাকে শর্তারোপ করেছেন।^৭ উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাহাবি হলেন ঐ সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা ইমান অবস্থায় রাসুল সা. এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইমানদার থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩. উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও যুদ্ধপ্রস্তুতি

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ মার্চ মোতাবেক তৃতীয় হিজরির ৭ শাওয়াল মুসলিম বাহিনী ও মুশকিরদের মাঝে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধটি উহুদ পাহাড় সংলগ্ন স্থানে সংঘটিত হয় বলে একে 'উহুদ যুদ্ধ' হিসেবে নামকরণ করা হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন মুহাম্মদ সা.। আর মুশরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আবু সুফইয়ান।^৮ ইতিহাস বিশ্লেষকগণের ভাষ্যমতে, বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই মক্কার মুশরিক বাহিনী উহুদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা বদর প্রান্তরে নিজ গোত্রের নেতৃত্বাধীন সত্তরজনের নিহত হওয়া, আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপক্ষের হাতের বন্দী অবস্থায় দেখা, জান-মাালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেওয়ার মত ছিল না। এ জন্য তারা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। বদর যুদ্ধ প্রাক্কালে আবু সুফইয়ান যে বাণিজ্য কাফেলা প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এনেছিল সে কাফেলার সমুদয় মালামাল উহুদ যুদ্ধে ব্যয় করার প্রস্তাব পেশ করে বলে- 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! শুনো, মুহাম্মদ তোমাদের উপর কঠিন পরিস্থিতি চাপিয়ে দিয়েছে। তোমাদেরকে মারাত্মক আঘাত করেছে। বদর প্রান্তরে অত্যন্ত নির্মমভাবে তোমাদের প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে। সমগ্র আবার জাতির সামনে তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা ভুলুপ্তি করেছে। সুতরাং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোমরা তোমাদের সহায়-সম্পদ দিয়ে সহায়তা কর।'^৯ আবু সুফইয়ানের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা সকলেই উক্ত বাণিজ্য কাফেলার লভ্যাংশের পুরোটাই যুদ্ধের জন্য ব্যয় করতে সম্মত হয়। এই সম্পদের পরিমাণ ছিল এক হাজার উট এবং পঞ্চাশ হাজার দিনার। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে মুশরিকদের এই অর্থ ব্যয়ের অপতৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ﴾.^{১০}

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তবে এই সম্পদ তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। তারপর তারা পরাজিত হবে এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।'

মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত করার জন্য ইকরামা ইবন্ আবু জাহেল, সাফওয়ান ইবন্ উমাইয়া, আবু সুফইয়ান ইবন্ হারব এবং আব্দুল্লাহ ইবন্ যিয়াদ-এর তৎপরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। স্বগোষ্ঠীয় লোকদের পাশাপাশি তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত অন্য গোত্রের লোকদেরকেও যুদ্ধে শরিক হওয়ার আহ্বান জানায়। তারা মুশরিক কবিদের পিছনে অর্থ লগ্নি দ্বারা উদ্দীপনামূলক কবিতার মাধ্যমে তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে। এভাবে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা ও যুদ্ধ করার উদ্দীপনা-উৎসাহ দিনদিন বেড়েই চলে। বনি আবদে মানাফকে যুদ্ধে সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে আবু উযা^{১১} নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে,

أيتها بني عبد مناة الرزّام * أنتم حماة وأيوكم حام
لا تعدوني نصركم بعد العام * لا تسلموني لا يحل إسلام^{১২}

‘হে বনি আবদ মানাতের দুঃসাহসী যুদ্ধাগণ! তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণের ন্যায় গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাকারী। সুতরাং আমাদের বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে তোমরা আমাদের সাহায্য কর। এ দুঃসময় কেটে যাওয়ার পর আমরা তোমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি চাই না। তোমরা বিনা বিবেচনায় আমাদেরকে ধ্বংসের জন্য শত্রুর হাতে ছেড়ে দিও না। কেননা সভ্য সমাজের জন্য এরূপ করা সমীচীন নয়।’

মুসাফি ইবন্ আবদ মানাফ বনি মালিক ইবন্ কিনানার নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সগোত্রের লোকদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে। তার ভাষায়,

يا مال مال الحسب المقدم * أنشد ذا القري وذا التذمم
من كان ذا رحم ومن لم يرحم * الخلف وسط البلد المرحم
عند حطيم الكعبة المعظم^{১৩}

‘হে বনি মালিক ইবন্ কিনান! তোমাদের সুপ্রাচীন ও সর্বজন বিদিত আভিজাত্যবোধ কি নিঃশেষ হয়ে গেল? আমি তো তোমাদের মাঝে সেই বৈশিষ্ট্যধারী আত্মীয়-স্বজন, প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরাই আমাকে বল, অনুগ্রহকারী উদার হৃদয়ের অধিকারী (তোমরা ব্যতীত) আর কারা ছিল? তোমাদের মাঝে এমন কে ছিলেন, যিনি সম্মানিত শহরে অবস্থিত পবিত্র কা’বার হাতিমের পাশে মিত্রদের প্রতি অনুগ্রহ করেনি?’

মক্কার মুশরিক বাহিনী বছরব্যাপী যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মুসলমানদের নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে। পুরুষ যোদ্ধাদের পাশাপাশি তারা অনেক মহিলাও তাদের যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী হয়, যাদের মূল কাজ ছিল উত্তেজিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়নকারীদের তিরস্কার করে আবার যুদ্ধে ফিরিয়ে আনা। মুশরিক বাহিনীর সাথে গমনকারী মহিলাদের মধ্যে হিন্দার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দা যুদ্ধযাত্রার শুরু থেকে তার সঙ্গিনীদের সাথে নিয়ে ঢোল-তবলা বাজিয়ে ও গান গেয়ে মুশরিক সৈন্যদের উত্তেজিত করতে থাকে। হিন্দার^{১৪} ভাষায়,

ويها بني عبد الدار * ويها حماة الأدبار
ضربا بكل بتار
إن تقبلوا نعانق * ونفرش النمارق
أو تدبروا نفارق * فراق غير وابق^{১৫}

‘হে বনি আবদদার! (কাপুরুষতা ও অলসতার নিদ্রা থেকে) জেগে ওঠো। জেগে ওঠো হে ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষণাবেক্ষণকারী দুঃসাহসী লোকেরা! তোমরা যদি সামনে অগ্রসর হও তবে আমরা নারীরা তোমাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিব। আর তোমাদের জন্য নরম তুলতুলে বিছানা ও বালিশ বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানাবো। অন্যদিকে তোমরা যদি ভীক-কাপুরুষদের ন্যায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটো তাহলে আমরা তোমাদের থেকে প্রেমহীন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় চিরতরে বিচ্ছিন্ন হবো।’

মক্কা থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে ‘বাতনুস সাবাখা’ নামক পাহাড়ের পাদদেশে ‘আইনাইন’ নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে। ঐতিহাসিকগণের মতে, কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। মক্কার কুরাইশদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কতিপয় গোত্র থেকে বেশকিছু লোক তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। মুশরিক সৈন্যদের মধ্যে সাতশজন ছিল বর্মধারী, দুইশজন অশ্বারোহী। তাদের সাথে আরো ছিল তিন হাজার উট ও পনেরো জনের অধিক মহিলা।^{১৬} কা’ব ইবন্ মালিক রা.^{১৭} রচিত একটি কবিতায় মুশরিক বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। পাশাপাশি মুসলিম বাহিনী সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

فَجَنَّا إِلَى مَوْجٍ مِنَ الْبَحْرِ وَسَطَهُ * أَحَابِيسُ مِنْهُمْ حَاسِرٌ وَمَقْنَعٌ
ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَنَحْنُ نَصِيَّةٌ * ثَلَاثُ مِائَةٍ إِنْ كَثَرْنَا وَأَرْبَعُ
نَغَاوَرُهُمْ تَجْرِي الْمَنِيَّةُ بَيْنَنَا * نَشَارِعُهُمْ حَوْضَ الْمَنَايَا وَنَشْرَعُ^{১৮}

‘অতঃপর আমরা যখন মুশরিক সৈন্যদলের মাঝে ঢুকে পড়ি, তাদের মাঝে হাবশি গোলামও ছিল, কতিপয় সৈন্য ছিল শিরস্কাণ্ড পরিহিত, আর কিছু ছিল নগ্ন মস্তক বিশিষ্ট। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। আর আমরা ছিলাম তিনশ, আর বেশি থেকে বেশি হলে চারশ জন। কিন্তু আমরা ছিলাম বাছাই করা। যুদ্ধ আমাদের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল (কখনও অনুকূলে আবার কখনও প্রতিকূলে)। আর মৃত্যু তার খেলা খেলছিল। মৃত্যুর হাউজের পানি তাদেরকেও পান করচ্ছিলাম এবং আমরাও তা পান করছিলাম।’

আব্বাস রা. কুরাইশদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। কুরাইশ বাহিনী যাত্রা শুরু করা মাত্রই এ সংবাদ তিনি এক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ভৃত্যের মাধ্যমে মুহাম্মদ সা.-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। কুরাইশদের যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে অবগত হয়ে মুহাম্মদ সা. মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে এক জরুরী পরামর্শ শেষে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। প্রস্তুতি গ্রহণ শেষে আব্দুল্লাহ ইবন্ উম্মে মাকতুমকে মসজিদে নববির ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করে তিনি সাহাবিদের নিয়ে মুশরিক বাহিনীকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মদিনা থেকে বের হয়ে ‘শায়খাইন’ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি কতিপয় অল্পবয়স্ক বালককে মুসলিম বাহিনীর সাথে দেখতে পান, তাদেরকে তিনি মদিনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন।^{১৯} উল্লেখ্য যে, মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে বের হওয়ার সময় মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবন্ উবাই তিনশ সেনা নিয়ে তাদের সাথে যোগদান করেছিল। মুহাম্মদ সা. যখন উহুদ পাহাড়ের সন্নিহিতে ‘শাওত’ নামক স্থানে পৌঁছান তখন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবন্ উবাই মৃত্যু ভয়ে তার সঙ্গী তিনশ যোদ্ধাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। মুনাফিকরা ফিরে যাওয়ার পর মুসলিম বাহিনীতে সাতশজন সৈন্য অবশিষ্ট ছিল।^{২০}

৪. উভয় বাহিনীর সেনাবিন্যাস

মুহাম্মদ সা. উহুদ প্রান্তরে পৌঁছে মদিনা নগরীকে সামনে এবং উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে সেনাবিন্যাস করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করেন এবং পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে পৃথক তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। আব্দুল্লাহ ইবন্ জাবের ছিলেন এ বাহিনীর প্রধান। তিনি তীরন্দাজ বাহিনীকে নির্দেশ দেন যে, আমরা যুদ্ধে জয়ী হই বা পরাজিত হই কোনো অবস্থাতেই তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে সরবে না। এমনকি যদি দেখো যুদ্ধে আমরা একেরপর এক শহিদ হয়ে যাচ্ছি তবুও আমাদের সাহায্যে এগিয়ো এসো না। আর যদি দেখো আমরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছি, তবুও গনিমতের মাল সংগ্রহে তোমরা আমাদের সাথে অংশ নিয়ো না।^{২১} অপরদিকে মুশরিক বাহিনীর প্রধান আবু সুফইয়ান ইবন্ হারব তার সৈন্যদের বিন্যস্ত শেষে ডান দিকের বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করে খালিদ ইবন্ ওয়ালিদকে এবং বাম দিকের বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে ইকরামা ইবন্ আবু জাহেলের উপর। আর পদাতিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে সাফওয়ান ইবন্ উমাইয়্যাকে নিযুক্ত করল। পাশাপাশি আব্দুল্লাহ ইবন্ রাবিয়ার উপর তীরন্দাজ বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে মুশরিক বাহিনীর এই পাঁচ সেনা প্রধানের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কুরাইশদের যুদ্ধের পতাকা বহনের দায়িত্ব ছিল বনি আবদুদ্দারের উপর।^{২২}

৫. যুদ্ধের সূচনা ও বিভীষিকাময় দৃশ্য

একপর্যায়ে উভয়দল কাতারবন্দী হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। কুরাইশদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আবু আমের এরপর তালহা ইবন্ আবু তালহা এবং উসমান ইবন্ আবু তালহা এগিয়ে এসে মল্লযুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষকে আমন্ত্রণ জানায়। মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে হামযা ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব রা. এগিয়ে এসে আক্রমণ শুরু করেন এবং উসমান ইবন্ আবু তালহার উভয় হাত কেটে ফেলেন। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপর আবু সা'দ ইবন্ আবু তালহা এগিয়ে এলে সা'দ ইবন্ আবি ওয়াক্কাস রা. নিষ্কিণ্ট একটি তীর তার প্রাণ কেড়ে নেয়। এরপর মুসাফি ইবন্ তালহা কুরাইশদের পতাকা তুলে নিলে আসিম ইবন্ সাবিত রা. এক আঘাতেই তাকে হত্যা করেন। এভাবে যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশদের বাইশজন সৈন্য নিহত হয়। এরপর উভয় দলের মধ্যে ব্যপকভাবে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।^{২৩} কা'ব ইবন্ মালিক (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.)-এর কবিতায় এই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়,

وليس لأمر حمه الله مدفع	*	فلما تلاقينا ودارت بنا الرحي
كأنهم باللقاع خشب مصرع	*	ضربناهم حتى تركنا سراهم
كأن ذكانا حر نار تلفع	*	لذن غدوة حتى استفقنا عشية
أسود على لحم بباشة ظلع	*	ورحنا وأخرنا بطاء كأننا
فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع	*	فلنا ونال القوم منا وربما
وقد جعلوا كل من الشر يشيع	*	ودارت رحانا واستدارت رحاهم
على كل من يحمي الزمار ويمنع	*	ونحن أناس لا نرى القتل سبة
على هالك عينا لنا الدهر تدمع	*	جلاد على ريب الحوادث لا نرى
ولا نحن مما جرت الحرب نجزع	*	بنو الحرب لا نعيأ بشيء نقوله
ولا نحن من أظفارها نتوجع	*	بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش
ويفرح عنه من يليه ويسفح ^{২৪}	*	وكننا شهابا يتقي الناس حره

‘আমরা উভয় প্রতিপক্ষ যখন একে অপরের মুখোমুখি হলাম এবং যুদ্ধের দামামা আমাদের উপর তীব্রভাবে চলতে লাগলো-তখন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে পালাবার কোনো উপায় অবশিষ্ট ছিল না। আমরা তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে তাদের শীর্ষস্থানীয় লোকদের এমন অবস্থায় ছাড়লাম, যেন নিম্ন ভূমিতে আছড়ে ফেলা কাঠ পড়ে রয়েছে। এ তরবারি চালনা সকালে শুরু হয়েছে আর আমরা সন্ধ্যাবেলা শ্বাস নিলাম। আমাদের যুদ্ধোন্মাদনা যেন আগুনের দাহ, যা প্রতিপক্ষকে বালসে দেয়। তারপর তারা দ্রুত পালাতে লাগল, যেন উপড়ে ফেলা একটি মেঘমালা, যার পানি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে এবং দ্রুত উড়ে যাচ্ছে। আর সন্ধ্যাবেলা আমরা এমনভাবে ফিরে এলাম যে, আমাদের শেষ কাতারের লোকেরা শান্ত পদে দম্ভভরে চলে আসছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন বধ্যভূমিতে গর্বের ভঙ্গিতে গোশত ভক্ষণকারী সিংহ। তারপর আমরা কাফিরদের থেকে এবং কাফিররা আমাদের থেকে যা কিছু পাওয়ার পেয়ে গেছে। আর আমরা বেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছি। আর আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশস্ত। আর আমাদের আক্রমণের চাকা তাদের উপর এবং তাদের আক্রমণের চাকা আমাদের উপর তীব্রভাবে চলল। ফলে আমরা সকলে প্রাণভরে একে অপরের মোকাবিলা করি। আর আমরা তো ঐ ব্যক্তির জন্য শহিদ হওয়া দোষণীয় মনে করি না, যে নিজের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়। আমরা যুগের বিপর্যয় রক্ষা করতে পুরোপুরি সক্ষম। আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত কারো জন্য কোনদিন অশ্রু বরাতে একটি চক্ষুও দেখা যাবে না। আমরা চিরকাল যুদ্ধপ্রিয়। আর যা বলি তা পূর্ণ করতে আমরা কখনো ক্লান্ত হই না। আর না যুদ্ধজনিত বিপদাপদে হতাশ হয়ে পড়ি, বরং আমরা তো কঠোর প্রকৃতির

যুদ্ধবাজ জাতি। আর আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করে অন্যায় ও অশীলতায় মেতে উঠি না। আর না আমরা যুদ্ধের থাবার আঘাতে ব্যথিত হই। আমরা হলাম যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা, লোকেরা এর তাপ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু যে কাছে যায় সে রক্ষা পায় না। বরং জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।’

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাঝে আবু দুজানার বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল উল্লেখ করার মত। মুহাম্মদ সা. তাঁর নিজের তরবারি আবু দুজানাকে প্রদান করেছিলেন। আবু দুজানা ঐ তরবারি হাতে নিয়ে তার মাথায় লাল পট্টি বাঁধেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করেন,

أَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي * وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النِّخِيلِ
أَلَا أَقُومُ لِلدَّهْرِ فِي الْكُيُولِ * أَضْرَبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرُّسُولِ^{২৫}

‘আমি সেই ব্যক্তি যার থেকে আমার বন্ধু (আল্লাহর রাসূল) খেজুর বৃক্ষের নিচে এবং পাহাড়ের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আমি ওঠে কাতারের শেষ পর্যন্ত মোকাবেলা করতে থাকবো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরবারি দিয়ে সামনে আঘাত হানতে থাকবো।’

উহুদ যুদ্ধের সময় হানযালা রা. সদ্য বিবাহিত ছিলেন। এরই মাঝে তিনি মুহাম্মদ সা.-এর যুদ্ধের আহ্বান শুনতে পান। তিনি বাসর ঘর থেকে যুদ্ধের ময়দানে ছুটে আসেন। যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করলে হানযালা রা. তরবারি হাতে মুশরিক সেনাদের মাঝে ঢুকে পড়েন এবং একের পর এক তাদেরকে হত্যা করতে থাকেন। এমনকি তিনি কুরাইশদের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের কাছে পৌঁছে যান এবং তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। একপর্যায়ে হানযালা আবু সুফিয়ানকে পরাস্ত করে তার বুকের উপর ওঠে বসেন। নিজের তরবারি উঁচু করে যখন তার উপর আঘাত করতে উদ্যত হন তখন পেছন থেকে ইবন্ শাউব তা দেখে আকস্মিক হানযালা রা. এর উপর আক্রমণ চালায়। ইবন্ শাউবের আঘাতে হানযালা রা. শাহাদাত বরণ করেন। আর আবু সুফিয়ান প্রাণে বেঁচে যায়।^{২৬} মৃত্যুকালে দাঁড়িয়ে থাকা আবু সুফিয়ানকে রক্ষা করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইবন্ শাউব আবৃত্তি করে,

لأَحْمِيَنَّ صَاحِبِي وَنَفْسِي * بَطْعَنَةً مِثْلَ شَعَاعِ الشَّمْسِ^{২৭}

‘আমি নিজেকে এবং আমার বন্ধুকে (আবু সুফিয়ানকে) এমন বর্শা দ্বারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছি, যা সূর্যের কিরণের মত বলমলে ছিল।’ ইবন্ শাউব আরও বলে,

وَلَوْلَا دِفَاعِي يَا بَنَ حَرْبٍ وَمَشْهَدِي * لَأَلْفَيْتَ يَوْمَ النِّعْفِ غَيْرَ مَجْبِي
وَلَوْلَا مَكْرِي الْمَهْرَ بِالنِّعْفِ قَرَقَرْتُ * ضَبَاعَ عَلَيْهِ أَوْ ضَرَاءَ كَلِيبِ^{২৮}

‘হে আবু সুফিয়ান ইবন্ হারব! আমি যদি উপস্থিত থেকে তোমাকে রক্ষা না করতাম, তবে উহুদ যুদ্ধের সময় তোমাকে এমন অবস্থায় পাওয়া যেত যে, তোমার আওয়াজ শোনার মত কোনো লোকই থাকত না।

যদি উহুদ পাহাড়ে আমি আমার ঘোড়া না ছাড়তাম, তবে শৃগাল আবু সুফিয়ানের উপর চারদিক থেকে বাঁপিয়ে পড়ত এবং তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ভক্ষণ করত।’

ইবন্ শাউবের এই সাহায্যের কথা আবু সুফিয়ান প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের দৃঢ়তা, সাহসিকতা, বীরত্ব ও হানযালা রা. কে হত্যা করার বিষয়টি তুলে ধরে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে,

وَلَوْ شِئْتُ نَجْتَنِي كَمِيَّتِ طَمْرَةٍ * وَلَمْ أَحْمِلِ النِّعْمَاءَ لَابْنَ شُعُوبٍ
وَمَا زَالَ مَهْرِي مَزَجَرَ الْكَلْبِ فِيهِمْ * لَدُنْ غَدْوَةٍ حَقَى دَنْتَ لَغُرُوبٍ
أَقَاتَلَهُمْ وَأَدْعَى يَالَ غَالِبٍ * وَأَدْفَعُهُمْ عَنِّي بَرْكَانَ صَالِبٍ
فَبِكِي وَلَا تَرَعَى مَقَالَةَ عَاذِلٍ * وَلَا تَسَامَى مِنْ عِبْرَةِ وَنَحِيبٍ
إِيَّاكَ وَإِخْوَانَا لَنَا قَدْ تَتَابَعُوا * وَحَقَّ لَهُمْ مِنْ حَسْرَةٍ بِنَصِيبٍ
وَسَلِيَ الَّذِي قَدْ كَانَ فِي النَّفْسِ إِنِّي * قَتَلْتُ مِنَ النِّجَارِ كُلِّ نَجِيبٍ

ومن هاشم قريما ومصعبا * وكان لدى المهيجاء غير هـيـوب
ولو أنني لم أشـف نفسي منهم * لكـانت شـجا في الصدر ذات ندوب
فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم * بهم كمد من واهـم وكـيب
أصـابهم من لم يـكن لدمائهم * كفاء ولا في سنـخهم بضـريب^{২৬}

‘যদি আমি নিজের জীবন বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে চাইতাম তবে আমার তেজস্বী সাদা-কালো রঙের ঘোড়া আমাকে উদ্ধার করে নিত। এজন্য আমার ইবন্ শাউবের অনুগ্রহের প্রয়োজন হতো না। আমার এ ঘোড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী থেকে এতটুকু দূরে দৃঢ় অবস্থায় ছিল যতটুকু দূরত্ব থাকে কুকুরকে তাড়া দেওয়া হয়। আমি তাদের সাথে লাগাতার লড়াইতে থাকি। হে বনি গালিব! হে বনি গালিব! বলে বলে লোকদের ডাকতে থাকি এবং আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে থাকি। সুতরাং তোমরা আহাজারি করে নাও। আর তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ক্ষেপ করো না। হে বনি গালিব! তোমাদের পিতা ও ভাইদের বিচ্ছেদের জন্য যত পার শোক প্রকাশ করো। যারা শত্রু পক্ষের হাতে একেরপর এক নিহত হচ্ছিল। তাদের জন্য অশ্রু ঝরাতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে না। কেননা তারাই হল তোমাদের অশ্রু প্রবাহের প্রকৃত হকদার। আর ঐসব লোকদের সান্ত্বনা দাও, যাদের মনে একথা রয়েছে যে, আমরা বনি নাজ্জারের সকল সম্ভ্রান্ত লোকদের কেন হত্যা করলাম এবং বনি হাশিমের অভিজাত এক ব্যক্তিকে (হানযালা) কেন মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দিলাম। যিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ও যুদ্ধের ময়দানে নির্ভয়ে লড়াইকারী। অথচ তাকে হত্যা করে আমার অন্তর যদি ঠাণ্ডা করে না নিতাম, তবে আমার অন্তরে এমন ক্ষত থেকে যেত, যার দাগ কখনো মুছতো না। মুসলিম বাহিনী এমন অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের বড় বড় তেজস্বী ব্যক্তি পেট এফোঁড় ওফোঁড়কারী বর্ষার আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের কতকের শরীর থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল শোণিত ধারা। আর তাদের কতক দুঃখ ও বিষণ্ণতায় জর্জরিত হয়েছিল। তাদেরকে আবু সুফইয়ান পরীক্ষায় ফেলে দেয়, যার কারণে তাদের রক্তের প্রতিশোধ কেউ নিতে পারছিল না। আর না তার কৃতিত্বে কেউ তার সমকক্ষ ছিল।’

৬. মুসলিম বীর শহিদগণের লাশের সাথে প্রতিপক্ষের নির্মম আচরণ

যুবাইর ইবন্ মুতয়িমের চাচা আদী বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর এক সাহসী যোদ্ধা হামযা রা. এর হাতে নিহত হয়েছিল। এ কারণে যুবাইর তার কৃতদাস ওয়াহশি ইবন্ হারবকে বলে, তুমি যদি আমার চাচার হত্যাকারী হামযাকে হত্যা করতে পারো তাহলে তোমাকে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি দেব। মুক্তির নেশায় ওয়াহশি উল্লসিত প্রান্তরে আসে। আর সুযোগ পেয়ে সে হামযাকে হত্যা করে।^{২৭} উল্লসিত যুদ্ধের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল হামযা রা. শাহাদতবরণ ও তাঁর লাশের সাথে মানব ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট আচরণ। যুদ্ধ শেষে মুশরিক বাহিনী মক্কায় ফিরে যাওয়ার সময় কিছু মুশরিক নারী-পুরুষ তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে মুসলিম শহিদগণের অঙ্গচ্ছেদ করাসহ লাশের বিকৃতি ঘটাতো থাকে। তারা কারো লাশের লজ্জাস্থান কেটে ফেলে। কারো নাক-কান কেটে পৈশাচিক আনন্দ করে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনত উতবা হামযা রা. এর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবুতে থাকে। তাঁর নাক ও কান কেটে তা দিয়ে মালা গাঁথে পায়ের বানিয়ে পরিধান করে।^{২৮} আর চিৎকার করে আবৃত্তি করতে থাকে,

نحن جزيناكم بيوم بدر * والحرب بعد الحرب ذات سعر
ما كان عن عتية لي من صبر * ولا أخي وعمه وبكري
شفيت نفسي وقضيت نذري * شفيت وحشي غليل صدري
فشكر وحشي على عمري * حتى ترم أعظمي في قبري³²

‘আজ আমরা তোমাদের উপর বদর দিবসের প্রতিশোধ নিয়েছি। আর এটাই সত্য যে, এক যুদ্ধের (বদর) পর আরেক যুদ্ধ (উল্লসিত) আরও তীব্র হয়। উতবা নিহত হওয়ার পর আমার ধৈর্যধারণ করার মত অবস্থা ছিল না। অনুরূপভাবে আমার ভাই, তার চাচা ও বকরের হত্যাকাণ্ড আমাকে ভীষণ বিচলিত করেছিল। এখন আমি শান্তি পেয়েছি। আমি আমার মানত পূর্ণ করেছি। হে ওয়াহশী তুমি আমার মনের বেদনা উপশম করে দিয়েছ। ওয়াহশীর প্রতি এখন আমাকে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, যতক্ষণ না কবরে আমার হাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়।’

হিন্দা বিনত্ উতবার এ কবিতা শুনে প্রতিউত্তরে হিন্দ বিনত্ উছাছা বলেন,

خزيت في بدر وبعد بدر * يا بنت وقاع عظيم الكفر
صبحك الله غداة الفجر * م الهاشميين الطوال الزهر
بكل قطاع حسام يفري * حمزة ليثي وعلي صقري
إذ رام شيب وأبوك غدري * فخصبنا منه ضواحي النحر^{৩৩}

‘হে জঘন্য কাফির কন্যা! তুমি বদর দিবসেও অপমানিত হয়েছ এবং বদর দিবসের পরও (উহুদ প্রান্তরে) অপমানিত হয়েছ। উজ্জ্বল ভোরবেলায় আল্লাহ তা‘আলা হাশিম বংশীয়দের পক্ষ থেকে তোমার জন্য যেন প্রস্তুত করে দেন— প্রতিটি তরবারি যা সুতীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন ও কর্তনশীল। মনে রেখ! হামযা আমার সিংহ এবং আলী আমার ঈগল। তোমার পিতা আমার নিকট একজন বিশ্বাসঘাতক মাত্র। যুবক আলী ও হামযা যখন তাকে আক্রমণ করলেন তখন তাঁরা তার বক্ষে রক্তের কলপ লাগিয়ে দিলেন এবং তার সারা দেহ রক্তে রঞ্জিত করে দিলেন।’

হামযা রা. এর শাহাদতবরণের বিষয়টি তার বোন সাফিয়্যা বিনত্ আব্দুল মুত্তালিব স্বীয় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। যাতে এক ভাইয়ের প্রতি বোনের ভালোবাসার অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। তার ভাষায়,

أسائلة أصحاب أحد مخافة * بنات أبي من أعجم وخير
فقال الخبير إن حمزة قد ثوى * وزير رسول الله خير وزير
دعاه إله الحق ذو العرش دعوة * إلى جنة يحيا بها وسرور
فذلك ما كنا نرجي ونرجي * لحمزة يوم الحشر خير مصير
فوالله لا أنساك ما هبت الصبا * بكاء وحزنا محضري ومسيري
على أسد الله الذي كان مدرها * يذود عن الإسلام كل كفور
فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي * لدى أضيع تعادني ونسور
أقول وقد أعلى النعي عشيري * جزى الله خيرا من أخ ونصير
بكاء وحزنا محضري ومسيري * ما بكت به نعم زوجها شماسا^{৩৪}

‘হে আমার বোনেরা! তোমরা কি উহুদের মুজাহিদদের প্রতি শঙ্কহস্তা হয়ে অবগত অনবগত নির্বিশেষে সকলের কাছেই প্রশ্ন করেছ? ফলে, ঘটনা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি তো জবাব দিয়েছে যে, আল্লাহর রাসুলের অমাত্য ও শ্রেষ্ঠ অমাত্য হামযা শহিদ হয়েছেন। তাকে ডাক দিয়েছেন সত্য মাবুদ, যিনি আরশের অধিপতি, জান্নাতের দিকে যেখানে তিনি জীবিত থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন।

আর এঁটা তো সেই বস্তু, যার প্রত্যাশা আমরা সকলেই করি এবং অন্যদেরও আশাবিত্ত করি। বস্তুত হাশরের দিন হামযার জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর কসম! হে হামযা! আমি তোমাকে ততদিন ভুলতে পারব না, যতদিন প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত থাকবে। আমি তোমার জন্য সবসময় মাতম করেই যাবো-বাড়িতে ও সফরে যেখানেই থাকি। আমার এই ক্রন্দন আল্লাহর সেই সিংহের জন্য, যিনি ছিলেন তার কণ্ঠের রক্ষক এবং প্রত্যেক কাফির থেকে ইসলামকে রক্ষাকারী।

হায় আফসোস! যদি আমার অস্থি মাংস শেয়াল ও শকুনের খোরাক হত, যারা মানুষের গোশত খায়! যখন মৃত্যুর সংবাদদাতা আমাদের পরিবারে তার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছাল, তখন আমি বলে উঠলাম— আল্লাহ তায়ালা

আমার ভাই ও সাহায্যকারীকে উত্তম বদলা দান করুন। তার জন্য আমার এ শোক ও ক্রন্দন অব্যাহত থাকবে— বাড়িতে এবং সফরে (অর্থাৎ আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন)।’

উহুদ যুদ্ধের শুরুর দিকে মুসলিম বাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। তারা ক্রমাগত মুশরিকদের হত্যা করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। কুরাইশরা দৃঢ় মনোবলের সাথে যুদ্ধ শুরু করলেও একের পর তাদের লোকজন নিহত হতে দেখে তাদের মনে পরাজয়ের ভয় ও শঙ্কা জাগে, মনোবল ভেঙ্গে যায়। অনেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাহাড়ের দিকে পলায়নের পথ খুঁজতে থাকে। তারা পরাজয়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে সঙ্গে আনা মালপত্র ফেলে জীবন বাঁচাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করে।^{৩৫} যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়নরত মুশরিক বাহিনীকে মুসলমানরা পিছু ধাওয়া করে এবং তাদের রেখে যাওয়া গণিমতের মাল সংগ্রহ করে। গিরিখাতে নিয়োজিত মুসলিম যোদ্ধাগণ এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে দলনেতা আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রা.-এর কথা অমান্য করে গণিমতের মাল সংগ্রহ করতে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করে। উহুদ যুদ্ধে খালিদ ইবন ওয়ালিদ ছিলেন কুরাইশদের ডান বাহিনীর অধিনায়ক। তিনি গিরিপথের প্রহরায় অল্পকিছু লোক দেখে কুরাইশ সেনাদের নিয়ে পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং তার দশজন সঙ্গী খালিদ ইবন ওয়ালিদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা একে একে সবাই শহীদ হয়ে যান। এদিকে মুসলমানদের মনোবল দুর্বল করার জন্য জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা করে যে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। সাময়িক সাফল্য পেয়ে খালিদ বাহিনীর সৈন্যরাও উচ্চস্বরে শ্লোগান দিতে শুরু করে। এতে পলায়নরত কুরাইশ বাহিনী রণক্ষেত্রে ফিরে আসে।^{৩৬}

৭. মুসলিম বাহিনীর সাময়িক বিপর্যয় ও প্রতিরোধ

মুশরিক বাহিনীর এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুশরিকরা নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা করতে থাকে। এমনকি তারা মুহাম্মদ সা.-এর নিকট পৌঁছে যায়। মুসলমানদের পতাকাবাহী ছিলেন মুস’আব ইবন উমায়ের রা.। তিনি মুহাম্মদ সা. এর কাছে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে সুরক্ষা দিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মুস’আব রা. শহীদ হয়ে যান। মুস’আব রা. শহীদ হয়ে গেলে মুহাম্মদ সা. মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনের দায়িত্ব আলী রা. এর উপর অর্পণ করেন।^{৩৭} খালিদ ইবন ওয়ালিদের ক্ষিপ্ত আক্রমণের কারণে মুসলিম বাহিনী বিচলিত হয়ে পড়ে। মুশরিকরা মুহাম্মদ সা. কে হত্যার উদ্দেশ্যে একযোগে আক্রমণ শুরু করে। উতবা ইবন আবু ওয়াক্কাস সুযোগ পেয়ে মুহাম্মদ সা.-এর দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাতে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর নিচের ঠোঁট কেটে যায় এবং নিচের মাড়ির ডানদিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবন কুমাইয়া তরবারি উঠিয়ে মুহাম্মদ সা. এর উপর আঘাত হানে। তার এ আঘাত তাঁর ডান চোখের নিচের হাড়ে লাগে এবং শিরস্ত্রানের দুটি কড়া তাঁর চেহারা মোবারকে বিঁধে যায়।^{৩৮} শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সেদিন বেশ ক’জন সাহাবি এগিয়ে আসেন। এদের মাঝে হারিস ইবন সামা-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবন ইসহাক বলেন, উহুদ যুদ্ধের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রণক্ষেত্রে অসংখ্য তরবারি ও বর্ষার মাঝে হারিস ইবন সামা আল্লাহর রাসুল সা. কে খুঁজে ফিরছিলেন। আলী রা.-এর একটি কবিতায় এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন,

لَا هَمَّ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ صَمَّةَ * أَهْلُ وَفَاءٍ صَادِقٍ وَذِمَّةَ
أَقْبَلَ فِي مَهَامَةٍ مُهْمَةٍ * فِي لَيْلَةٍ لِيَلَاءٍ مُدْهِمَةٍ
بَيْنَ رِمَاحٍ وَسُيُوفٍ جَمَّةَ * يَسُوقُ بِالنِّبْيِ هَادِيَ الْأُمَّةِ^{৩৯}

‘ইয়া আল্লাহ! হারিস ইবন সামা, যিনি একজন প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও দায়িত্ব সচেতন লোক, নিছিদ্র অন্ধকার রজনীর মত সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে অসংখ্য তরবারি ও বর্ষার মাঝে খুঁজে ফিরছিলেন— কোথায় আছেন আল্লাহর রাসুল সা., যিনি মানব জাতির জন্য ছিলেন পথপ্রদর্শক।’

অবশেষে রণাঙ্গণে কতিপয় সাহাবির অদম্য সাহসিকতা ও অসীম দৃঢ়তার ফলে মুহাম্মদ সা. পাহাড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সক্ষম হন। আবু সুফইয়ান ও খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল মুশরিক পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করে। উমর ইবন খাত্তাব রা. তাদেরকে পাহাড় থেকে নামিয়ে দেন। পাহাড়ী ঘাঁটিতে পৌঁছার পর মুহাম্মদ

সা. সেখানে বসে পড়েন। আলী রা. পানি নিয়ে আসেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারার রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। এরপর তিনি অযু করেন এবং যোহরের সালাত আদায় করেন। সাহাবায়ে কেলাম এ সময় বসে বসে তাঁর পেছনে একতেন্দা করেন। এরপর তিনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে দুয়া করেন।^{৪০} উল্লেখ্য যে, উহুদ যুদ্ধে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কতিপয় সাহাবি কর্তৃক মুহাম্মদ সা.-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলিম বাহিনীর সাময়িক বিপর্যয় সম্মুখীন হয়। মুশরিকরা মুসলিম বাহিনী উপর ভয়ংকর আক্রমণ করে। কিন্তু সাহাবিদের দৃঢ়তা ও অদম্য সাহসিকতার ফলে মুসলিম বাহিনী এ সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে। কবির ভাষায়,

شاع في المعركة قتل الرسول * وإنه ثبت بنفر من صحبه
فلما علم المسلمون أنه حي * فالتفوا حوله لإحتراسه^{৪১}

‘(উহুদ) যুদ্ধে রাসূল সা.-এর হত্যার ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। অথচ তিনি সাহাবিদের দ্বারা তৈরি বেষ্টনির মাঝে নিরাপদে ছিলেন। বিক্ষিত মুসলিম বাহিনী যখন এ সংবাদ জানতে পারল যে তিনি জীবিত রয়েছেন। তখন তারাও রাসূলের চারপাশে তাঁর প্রহরায় সমবেত হলেন।’

৮. উহুদ যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে শোকগাথা

মুসলিম বাহিনীর শাহাদতবরণকারী সৈন্যদের মাঝে এক অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন শাম্মাস ইবন্ উসমান রা.। যিনি উহুদ প্রান্তরে বীরদর্পে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি প্রতিপক্ষের আঘাতে শাহাদতের অমিও সুধা পান করেন। তাঁর শাহাদতের সংবাদ যখন প্রিয়তমা স্ত্রী নু‘আমের নিকট পৌঁছে তখন প্রিয়তম স্বামীর প্রতি ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

يا عين جودي بفيض غير إيساس * على كريم من الفتيان إياس
صعب البديهة ميمون نقييته * حمل ألوية ركب أفراس
أقول لما أتى الناعى له جزءاً * أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي
وقلت لما خلت منه مجالسه * لا يبعد الله عنا قرب شماس^{৪২}

‘হে আমার আঁখিদ্বয়! অব্যাহত ধারায় সেই মহান ও কৃতিমান যুবকের জন্য অশ্রু বর্ষণ কর, যিনি ছিলেন যুবককূলের শিরোমণি ও নির্ভীক প্রাণ। তিনি ছিলেন প্রত্যাশাপূর্ণমতিত্বের অধিকারী। তাঁর প্রতিটি কাজ হতো বরকতময়। আর তিনি ছিলেন উত্তম পতাকাবাহী ও সুদক্ষ অশ্বরোহী।

যখন সংবাদদাতা এসে তাঁর শাহাদতের সংবাদ শোনালো, তখন আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম- দানবীর ব্যক্তি চলে গেছেন। আর তিনি মারা গেছেন, যিনি ছিলেন লোকদের খাদ্য-দানকারী ও বস্ত্রদানকারী। যখন তাঁর উপস্থিতি হতে মজলিস শূন্য হয়ে গেল, তখন আমি বললাম- আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তর থেকে শাম্মাসের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা যেন দূর না করেন।’

বোনের এ কবিতা শোনে নু‘আমের ভাই আবুল হাকাম ইবন্ সাঈদ ইবন্ ইয়ারবু রা. তাকে সাত্ত্বনা ও ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদান করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

إفنى حيائك في ستر وفي كرم * فإمّا كان شماس من الناس
لا تقتلي النفس إذ حانت مبيته * في طاعة الله يوم الرزق والناس
فد كان حمزة لئب الله فاضطري * فذاق يؤمئذ من كأس شماس^{৪৩}

‘পর্দা ও ভদ্রতা সহকারে নিজের লজ্জা বজায় রাখো। শাম্মাস তো ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতোই। সুতরাং (মাতম করে) তুমি নিজেকে নিজে ধ্বংস করো না। তাঁর তো মৃত্যু হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে বিভীষিকাময় কঠিন যুদ্ধের দিন। হামযা তো ছিলেন আল্লাহর সিংহ। তিনিও তো আজ শাম্মাসের মত মৃত্যুর পেয়ালা পান করেছেন। অতএব তুমি শান্ত হও এবং ধৈর্যধারণ করো।’

উহুদ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে প্রখ্যাত সাহাবি আমর ইবন্ আস রা.^{৪৪} একটি কবিতা রচনা করেন। যাতে তিনি যুদ্ধের তীব্রতা ও উভয় পক্ষের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেন। এ কবিতায় তিনি মুসলিম বাহিনীর যেসকল বীর

যোদ্ধাগণ সাহসিকতার সাথে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল তাদের প্রতি নিজের মাতাকে উৎসর্গ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাঁর ভাষায়,

لما رأيت الحرب ينزو	* شرها بالرضف نزوا
وتناولت شهباء تلحو	* الناس بالضرء لحوا
أيقنت أن الموت حق	* والحياة تكون لغوا
حملت أثوابي على	* عتد يئذ الخيل رهوا
سلسل إذا نكبن في البيداء	* يعلو الطرف علوا
وإذا تنزل ماءؤه	* من عطفه يزداد زهوا
ربذ كيغفور الصرمة	* راعه الرامون دحوا
شجع نساء ضابط	* للخيال إرخاء وعدوا
ففدى لهم أمني غداة	* الروع إذ يمشون قطوا
سير إلى كبش الكتيبة	* ⁴⁵ إذا جلته الشمس جلوا

‘আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে, যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্তপ্ত পাথরে ঘর্ষণ খেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে, আর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৈন্যরা সব লোকদের চামড়া অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ছুলে ফেলছে, তখন আমি ভালোভাবে বুঝে নিলাম যে, মৃত্যু অনিবার্য এবং জীবন বৃথা ও অনর্থ। আমি আমার কাপড় এমন একটি ধৈর্যশীল ঘোড়ার উপর রেখে দিলাম, যা অন্যান্য ঘোড়ার থেকে অনায়াসেই অগ্রগামী হতে পারত। যে খুবই অনায়াসে উত্তম থেকে উত্তম উভয়কূল অভিজাত ঘোড়া থেকে এ সময় অগ্রগামী হচ্ছিল, যখন অন্যান্য ঘোড়া প্রান্তরে মুখ থুবড়ে পড়ছিল। আর যখন সে ঘোড়ার পার্শ্বদেশ থেকে ঘাম বারছিল তখন তার গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই ঘোড়া এতোটাই দ্রুতবেগে দৌড়াচ্ছিল যেমন বালুর টিলার হরিণ শাবক শিকারীর তাড়া খেয়ে অত্যন্ত দ্রুত দৌড়ায়। তার উরুর রগগুলো সংকুচিত হচ্ছিল। সে অত্যন্ত দ্রুত দৌড়ে অন্যান্য ঘোড়াকে পিছনে ফেলে দিচ্ছিল। যুদ্ধের ময়দানে সূর্যের আলোতে আমাদের সৈন্যবাহিনী যখন শত্রুবাহিনী ও তাদের ভেড়ার মত ভীতু সরদারের দিকে অত্যন্ত শান্তপদে দম্ভভরে অগ্রসর হচ্ছিল-তাদের এ দৃশ্য দেখে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আমার প্রিয়তম মা এ সকল সাহসী যোদ্ধার জন্য উৎসর্গিত হোক।’

মক্কার মুশরিক বাহিনী পাশ্চাত্য অঞ্চলের অনেক গোত্রের বেশকিছু ব্যক্তিকে তাদের সাথে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিয়ে এসেছিল। এ সকল লোকদের মাঝে বনি কিনানার ব্যক্তিবর্গও ছিল। বনি কিনানার অনেক ব্যক্তিই উহুদ প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর হাতে মৃত্যুর পথযাত্রী হয়। হাসসান ইবন সাবিত^{৪৬} রা.-এর একটি কবিতায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন,

سقتهم كنانة جهلا من سفاهتكم	* إلى الرسول فجنده الله مخزيها
أوردتموها حياض الموت ضاحية	* فالنار موعدها، والقتل لا قيهها
جمعتموها أحابيشا بلا حسب	* أئمة الكفر غرتكم طواغيها
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت	* أهل القلب ومن ألقينه فيها
كم من أسير فككناه بلا ثمن	* ⁴⁷ وجز ناصية كنا مواليهها

‘তোমরা নির্বুদ্ধিতার কারণে না জেনে আল্লাহর রাসুল সা.-এর মোকাবিলায় বনি কিনানাকে তোমাদের সাথে নিয়ে এসেছ। আর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহর সৈনিকগণ বনি কিনানাকে লাঞ্ছিত করেছে।

বহুত তোমরা সকাল সকালই তাদেরকে মৃত্যুর হাউজে নিয়ে এসেছিলে। সুতরাং জাহান্নামই হয়েছে তাদের নির্ধারিত স্থান। আর মৃত্যু তাদের সাক্ষাৎ করেছে। তোমরা বংশ-মর্যাদাহীন কতিপয় অপদার্থ লোক সমবেত

করেছ, কুকুরের সরদারদের দাষ্টিকরা তোমাদের প্রতারিত করেছে। তোমরা কি আল্লাহর অশ্বারোহীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করনি, যখন তারা এরপূর্বে বদর প্রান্তরের খোদাদ্রোহীদের হত্যা করে বদরের কূপে নিক্ষেপ করেছিল। তাদের অনেক বন্দীকে আমরা বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দিয়েছি, এমনকি আমরা তাদের কপালের চুল পর্যন্ত কাটিনি। আর তাদের প্রতি আমাদের হাজারো অনুগ্রহ ছিল।’

উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সত্তরজন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন। এদের মধ্যে পয়ষট্টি জন ছিলেন আনসার। আনসারদের মাঝে একচল্লিশ জন ছিলেন খায়রাজ গোত্রের, বাকি চব্বিশ জন ছিলেন আওস গোত্রের। মুহাজিরদের থেকে চারজন শাহাদতবরণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে মুহাম্মদ সা. শহিদদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি সাহাবিদের নিয়ে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন।

৯. উপসংহার

মুহাম্মদ সা. সশরীরে যেসকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিনতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন উহুদ প্রান্তরে। ঐতিহাসিকগণ উহুদ যুদ্ধের জয়-পরাজয় নিয়ে ভিন্নভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কতিপয় যোদ্ধা মুহাম্মদ সা.-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলিম বাহিনী সাময়িক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেও এ যুদ্ধে তারা পরাজিত হননি। কেননা মুসলিম বাহিনী সামান্য সময়ের জন্য ছত্রভঙ্গ হলেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারা পলায়ন করেননি এবং কুরাইশ বাহিনী মুসলিম সৈন্যবাহিনীর কাউকে বন্দি করতেও সক্ষম হয়নি। তাছাড়া মুসলিম বাহিনী বিপর্যয় কাটিয়ে যখন পুনরায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং পূর্বের চেয়ে অধিক সুসংগঠিত হয় তখন মুশরিক বাহিনী মৃত্যুভয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারায়- যা দৃশ্যত মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের বার্তা প্রদান করে। উহুদ যুদ্ধে সত্তরজন মুসলিম সৈন্য শাহাদতবরণ করলেও এ যুদ্ধের পর ইসলামি দাওয়াতি কার্যক্রম ও একত্ববাদের আহ্বানের অধিক সম্প্রসারণ ঘটে। এ যুদ্ধের প্রতিকূল ও অনুকূল পরিস্থিতি মুসলিম জাতিকে এক অভিনব শিক্ষা প্রদান করে। তাদের ভাবনার জগতে নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করে। তাওহিদপন্থী অনেক মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রক্তে উহুদ প্রান্তর সিক্ত হলেও শহিদি রক্তের জ্যোতির্ময় শিখা ইসলামের ঝাণ্ডাকে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে এবং মুসলিম জাতি পৃথিবীর বুকে এক মহাপরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধের নানা ঘটনাপ্রবাহের কথা স্মরণ করে মুসলিম ও মুশরিক উভয় সম্প্রদায়ের কবিগণ-ই কাব্যগাথা নির্মাণ করেছেন। যাতে যুদ্ধাকালীন ভয়াবহ পরিস্থিতি ও উভয় পক্ষের সৈন্যদের চিন্তাচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। এ সকল কবিতা আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে একদিকে যেমন রয়েছে সাহিত্যপ্রেমীদের আত্মার খোরাক, অন্যদিকে রয়েছে শিক্ষণীয় নানা বিষয়- যা দ্বারা আমরা সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের পাথর্য করতে পারি। একইসাথে ঐশী শক্তিতে বলিয়ান ইমানদার ব্যক্তির সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, সক্ষমতা ও বীরত্ব সম্পর্কে জানতে পারি এবং ইসলামের শত্রুদের ভীৰুতা, কাপুরুষতা ও দুর্বলতা অনুভব করতে পারি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৫), পৃ. ৫১১।
- ^২ সূরাহ আল-জিন: ৩।
- ^৩ ইবন্ মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৭৬০।
- ^৪ আবুল ফযল আহমদ ইবন্ আলি ইবন্ হাজার আসকালানী, *আল-ইসাবাহ ফি তাময়যিস সাহাবা*, খণ্ড ৩ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫০।
- ^৫ আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবন্ মুহাম্মদ, *উয়ুনুল আসার ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামায়েল ওয়াস সিয়ার*, খণ্ড ২ (বৈরুত: দারুল ইবন্ কাসির, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১২৪।
- ^৬ আবুল হাসান আলী নদবী, *আস-সিরাতুন নববিয়াহ* (দামেশক: দারুল ইবন্ কাসির, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৩২।
- ^৭ *উয়ুনুল আসার*, তদেব, খণ্ড ২, পৃ. ১২৫।
- ^৮ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন্ উমর ইবন্ কাসির, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, খণ্ড ৪, (রিয়াদ: মাকতাবতুল ফালাহ, তাবি.), পৃ. ৩৪।

- ^{১০} আলী ইবন বুরহানুদ্দীন, *আস সিরাতুল হালবিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল মারিফা, ১৪০০ হি.), পৃ. ৫৪৩; আব্দুল কাদের, *আল-কাছাছুল হাক ফি সিরাতি সাইয়্যিদিল খালক মুহাম্মদ* (রিয়াদ: মাকতাবাতু ফাহাদ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ৩৪২।
- ^{১১} সূরাহ আনফাল: ৩৬।
- ^{১২} আবু ওযাযা : একজন মুশরিক কবি। সে বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিল। তার মুক্তিপণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকায় মুহাম্মদ (স.) তাকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেন। আর তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, ভবিষ্যতে সে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। কিন্তু সাফওয়ানের ধন-সম্পদের প্রলোভনে সে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাজি হয় এবং কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। দ্র. মুহাম্মদ ইবন ওমর আল-হাদারমী, *হাকাইকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফি সীরাতিন নাবিযিল মুখতার* (বৈরুত: দারুল হাদী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪১৩।
- ^{১৩} উয়ুনুল আসার, খণ্ড ২, তদেব, পৃ. ২৩১; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৪, তদেব, পৃ. ২০।
- ^{১৪} ইবন হিশাম, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, খণ্ড ৩ (বৈরুত: দারুল মাআরিফা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫৮২।
- ^{১৫} হিন্দা: হিন্দা বিনতে উতবাহ ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ও উমাইয়া খিলাফাতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার মা। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ছয় সদস্যের একটি দলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের সময় মুহাম্মদ সা.-এর চাচা আবু তালিবের কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার জন্য তিনি নিন্দিত ও কুখ্যাত হয়েছিলেন। এত ঘট্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল সা. তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। দ্র. *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, তদেব, খণ্ড ২, পৃ. ৬৭।
- ^{১৬} আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, খণ্ড ২ (বৈরুত: বাইতুল আফকারুদ দাউলিয়া, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৯৬; *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, তদেব, খণ্ড ২, পৃ. ৬৮।
- ^{১৭} ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, *আস সিরাতুন নববিয়্যাহ*, (বৈরুত: দারুল মাআরিফা, ২০১০খ্রি.), পৃ. ৪৭০-৪৭৩।
- ^{১৮} কা'ব ইবন মালিক: ৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু আব্দুল্লাহ ও আবু বাশির। তার পিতার নাম মালিক ইবন আবি কা'ব আমর। মাতার নাম লায়লা বিনতে যায়িদ। কা'ব ইবন মালিক আসহাবুস সুফফার সদস্যদের মাঝে অন্যতম। তিনি জাহেলি যুগে স্পষ্টবাদী কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি ২৫ বছর বয়সে দ্বিতীয় আকাবার শপথের সময় মদিনার প্রতিনিধি দলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৮০ এর অধিক। তিনি আবু যুদ্ধ ব্যতীত প্রায় সকল যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দ্র. *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, তদেব, পৃ. ৪৭২।
- ^{১৯} ইবন হিশাম, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, খণ্ড ৩, তদেব, পৃ. ৬৪২।
- ^{২০} ইমাম শাফি'রী (র.)-এর মতে, উহুদের যুদ্ধে মোট সতেরো জন বালককে উপস্থিত করা হয়, যাদের বয়স চৌদ্দ হওয়ায় তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ঘোষণা করে মদিনায় ফেরত পাঠানো হয়। তবে রাফি ইবন খাদিজ রা. অল্প বয়স্ক হলেও দীর্ঘদেহী এবং তীরন্দাজিতে পারদর্শী হওয়ায় তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। দ্র. *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, খণ্ড ৩, তদেব, পৃ. ৫৬৭।
- ^{২১} ড. মাহদী রিয়কুল্লাহ আহমদ, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ ফি দুইল মাসাদিরিল আসলিয়াহ* (রিয়াদ: মারকাযুল মুল্ক ফয়সাল লিল বহুস ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪৫৩; *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৬৮।
- ^{২২} মুহাম্মদ ইবন ওমর আল-হাদারমী, *হাকাইকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফি সিরাতিন নাবিযিল মুখতার* (বৈরুত: দারুল হাদী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৭৬; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম (কাতার: ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, ২০০৩খ্রি.)*, পৃ. ২৫৯-২৬০।
- ^{২৩} ইবন হিশাম, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, খণ্ড ৩, তদেব, পৃ. ৩১।
- ^{২৪} হাশিম মারুফ আল-হুসনি, *সিরাতুল মুস্তফা*, খণ্ড ২ (বৈরুত: দারুল তাআরুফ লিল মাতবু, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৭১।
- ^{২৫} ইবন হিশাম, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৪৩।
- ^{২৬} নু'মান আল-মাগরিবী, *শরহুল আখবার*, খণ্ড ১ (বৈরুত: মুয়াসসাতুন নাশরিল ইসলামিয়া, ১৪৩১ হি.), পৃ. ২৭৪।
- ^{২৭} হানযালা রা. শহিদ হওয়ার পর মুহাম্মদ সা. সাহাবিদের বলেন, আমি দেখলাম ফেরেশতার বরফের শীতল পানি দিয়ে রৌপ্যের বাসনে হানযালাকে গোসল করাচ্ছে। তোমরা হানযালার পরিবারকে জিজ্ঞাসা করে দেখো এর কারণ কী? তার স্ত্রীর নাম ছিল জামিলা বিনত উবাই ইবন সালুল। সাহাবিগণ হানযালার স্ত্রীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তার স্ত্রী জানালেন, তার সাথে হানযালার সদ্যই বিয়ে হয়েছে এবং আজকের রাতেই নতুন বউ হিসেবে তিনি হানযালার ঘরে এসেছেন। তিনি আরও বলেন, হানযালার উপর গোসল ফরজ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের আবহাওয়া শোনা মাত্রই তিনি ফরজ গোসল না করে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এ ঘটনা শুনে মুহাম্মদ সা. বললেন, এজন্যই ফেরেশতাগণ হানযালা রা. কে গোসল করিয়েছেন। দ্র. *সিরাতুল মুস্তফা*, খণ্ড ২, তদেব, পৃ. ১৭৬-১৭৭।
- ^{২৮} *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, খণ্ড ৩, তদেব, পৃ. ৬২০।

- ^{২৮} তদেব।
- ^{২৯} ইবন্ আবি আল-হাদিদ, শরহ্ নাহজিল বালাগাহ, খণ্ড ৪ (বৈরুত: দারুল জীল, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৭০।
- ^{৩০} আবুল হাসান আলী নদবী, আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, পৃ. ৩২৫; আর রাহীকুল মাখতুম, তদেব, পৃ. ২৬৫-২৬৬; সিরাতুল মুস্তফা, তদেব, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৪-১৭৫।
- ^{৩১} আর রাহীকুল মাখতুম, তদেব, পৃ. ২৮১; আবুল হাসান আলী নদবী, আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, পৃ. ৩৩১।
- ^{৩২} আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৪, তদেব, পৃ. ৭৫।
- ^{৩৩} তদেব, পৃ. ৭৭।
- ^{৩৪} আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৩৪।
- ^{৩৫} আর রাহীকুল মাখতুম, তদেব, পৃ. ২৬৭; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, তদেব, খণ্ড ৪, পৃ. ২২; আবুল হাসান আলী নদবী, আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, পৃ. ৩২৫।
- ^{৩৬} আব্দুল ওয়াহীদ সালেহ, সুবলুস সালাম (জর্ডান: মাকতাবাতুল গুরাবা, ১৪৪৮ হি.), পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।
- ^{৩৭} সিরাতুল মুস্তফা, তদেব, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৭-১৭৮; সীয়ারু আ'লামিন নুবালা, তদেব, পৃ. ১৮৪।
- ^{৩৮} সুবলুস সালাম, তদেব, পৃ. ৩৫৭-৩৫৯।
- ^{৩৯} আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৩৪।
- ^{৪০} তদেব।
- ^{৪১} ড. মুহাম্মদ সোলাইমান, কাব্যে প্রিয় রাসূল, পৃ. ৮৪-৮৫।
- ^{৪২} আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৩৪।
- ^{৪৩} তদেব।
- ^{৪৪} আমার ইবন্ আস রা.: তিনি ৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে) মক্কার কুরাইশ বংশে বনু সাহম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আল-আস ইবন্ ওয়াইল। মাতার নাম লায়লা বিনতে হারমালা। তিনি অষ্টম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিশরে ইস্তিকাল করেন। মিশরে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- ^{৪৫} আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৩৫।
- ^{৪৬} হাসসান ইবন্ সাবিত রা.: তিনি ৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় বনু খাজরায় গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত কবি হিসেবে তার সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তিনি রাসূল সা. এর সভাকবি হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেন। যারা জন্য মসজিদে নববিত্তে আলাদা মিম্বারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহুগুণে গুণায়িত এই সাহাবি কবি ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ১১০ বছর বয়সে ইস্তিকাল করেন। ইসলামি বিষয়কে উপজীব্য করে অসংখ্য কবিতা রচনা করে তিনি নবিশ্রেমিকদের অন্তরে এক সুউচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছেন। দ্র. আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৩৭।
- ^{৪৭} আস-সিরাতুন নববিয়াহ, তদেব, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৩৬।

সংলাপ পদ্ধতিতে রচিত আরবী গদ্যসাহিত্যের রূপরেখা [The Picture of Arabic Prose Literature Written in Dialogue Style]

ড. মো. আবু বকর*

[Abstract: Dialogue is a well-known term. An exchange of words between two or more people is called a dialogue. There is no alternative of dialogue for mutual exchange of ideas, gaining knowledge on new issues, solving problems, simplifying complex issues, assessing the acceptability of decisions taken, etc. That's why writers have often followed the style of dialogue in their compositions. Several genres of Arabic prose literature such as letters, tales of astrologers, biographies, exegesis of the Qur'an, maqamah, Islamic literary, criticism, drama, novels, short stories, essays, etc. Dramas and Novels Complete dialogue based literature including Kalila wadimna, Maqamah Hariri and Hamadani, Tafseerul Kashshaf, Hadisul Arabia etc. Popular prose literature following dialogue method. In these literatures. The literary quality has increased by following the dialogue style in those literatures also the readers have been appreciated in many ways. In this paper depicts an overall picture of Arabic prose literature written in dialogue style.]

Keywords: গদ্যসাহিত্যে সংলাপ, সংলাপ পদ্ধতি, নাট্যসাহিত্যে সংলাপ।

১. ভূমিকা

সংলাপ জীবন ঘনিষ্ঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংলাপ হলো পারস্পারিক মতবিনিময়, আলাপচারিতা, তথ্য আদান-প্রদান ইত্যাদির একপ্রকার বচনশৈলী ও রচনাধারা। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিকসহযে কোন জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান হলো সংলাপ। সংলাপের সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু বা সীমারেখা নেই, যে কোন বিষয়ে সংলাপ সংঘটিত হতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের মত সাহিত্যের জটিল ভাবধারা বোধদয়ে সংলাপ পদ্ধতি একটি অলংকারিক সংযোজন। আরবী গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হলো-

২. সংলাপ পরিচিতি

সংজ্ঞে আলাপ শব্দদ্বয় সন্ধি যোগে সংলাপ। কারো সাথে পরিকল্পিতভাবে পারস্পারিক কথোপকথন সংঘটিত হওয়াকে সংলাপ বলে। আরবী ভাষায় সংলাপকে *الحوار* বলা হয়। *الحوار* শব্দটির কয়েকটি মৌলিক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন,

১. কোনো কিছু থেকে অথবা কোনো কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা (الرجوع عن الشيء والرجوع إلى الشيء)। যেমন বলা হয়ে থাকে *حار الرجل* 'লোকটি প্রত্যাবর্তন করেছে।' একই অর্থে আল কুরআনে এসেছে, *إِنَّهُ* ﴿الرجوع عن الشيء والرجوع إلى الشيء﴾ সে তো ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না।

অপর একটি আয়াতে এসেছে, *وَهُوَ يُحَاوِرُهُ* ﴿فَقَالَ لَصَاحِبِهِ﴾ তারপর সে তার বন্ধুকে আলাপচারিতায় ফিরে এসে বলল...

২. বিতর্ক করা ও প্রতিউত্তর করা (المجادلة والمجاوبة)। শব্দটি এ অর্থে আল কুরআনের একাধিক স্থানে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, *وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا* ﴿وَأَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَآلَهُ﴾ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিতর্ক শোনেন।

৩. পর্যালোচনা (المنافشة)। যেমন বলা হয়ে থাকে *أَيُّ نَفَاشٍ* (কোন বিষয়ে) তাদের দু'জনের মাঝে পর্যালোচনা চলছে।

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

পরিভাষায় আল হিওয়ার (الحوار) শব্দটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মাঝে পারস্পরিক মতবিনিময় করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে الحوار এর কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

এক: নাসির ইবন সাঈদ ইবন সাইফ বলেন, ^৫هو مراجعة الكلام و تداوله بين طرفين, পক্ষের মাঝে প্রচলিত আলাপচারিতা।

দুই: সালিহ আব্দুল্লাহ বলেন,

هو مناقشة بين طرفين أو أطراف يُقصد بها تصحيح كلام وإظهار حُجَّة وإثبات حقٍ ودفع شبهة وردُّ الفاسد من القول والرأي^৬

‘সংলাপ বলা হয় কোন বিষয়ে দুই বা ততোধিক পক্ষের মাঝে পর্যালোচনা; যার উদ্দেশ্য হলো উত্থাপিত বিষয়ে বিশুদ্ধতা নিরূপণ, যুক্তি উপস্থাপন, সত্য প্রতিষ্ঠা, সংশয় নিরসন, প্রদত্ত বক্তব্য ও মতামতে বিভ্রান্তি দূরীকরণ।’

তিন: সা’আদ ইবন নাসির বলেন, ^৭هو مناقشة بين اثنين فأكثر في قضية مختلف عليها بينهم, কোন বিতর্কিত বিষয়ে দুই বা ততোধিক পক্ষের মাঝে পর্যালোচনাকে সংলাপ বলা হয়।

চার: বাসসাম দাউদ আযাক বলেন,

هو محادثة بين شخصين أو فريقين حول موضوع محدد لكل منهما وجهة نظر خاصة به هدفها الوصول إلى الحقيقة أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر؛ بعيداً عن الخصومة أو التعصب بطريق يعتمد على العلم والعقل مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف الآخر^৮

‘সংলাপ বলা হয় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে দু’ব্যক্তি বা দু’পক্ষের মাঝে আলোচনাকে; তাতে উভয়ের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। উদ্দেশ্য হলো উত্থাপিত বিষয়ে কোনরূপ বিতর্ক ও স্বজনপ্রীতি উর্ধ্বে থেকে সত্য উপনিহিত হওয়া অথবা পারস্পরিক উভয় মতের সমতা বিধান করা। আলোচনা হতে হবে জ্ঞান ও বিবেক নির্ভর এবং উভয়পক্ষকে সত্য মেনে নেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে, যদিও সত্য প্রতিপক্ষের পক্ষে প্রমাণিত হয়।’

পাঁচ: ^৯هو في أصول الحوار:،

هو نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين , يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة؛ فلا يستأثر أحدهما دون الآخر به , ويغلب عليه الهدوء , والبعد عن الخصومة والتعصب^{১০}

‘সংলাপ দু’ব্যক্তি বা দু’পক্ষের মাঝে অনুষ্ঠিত একপ্রকার কথামালা, যেখানে উভয়ে সমভাবে তাদের মতবিনিময় সম্পন্ন করে; একে ওপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে না এবং স্বজনপ্রীতি, বিবাদের উর্ধ্বে উঠে শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে।’

ছয়: উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে,

هو مراجعة الكلام و تداوله بين طرفين لمعالجة قضية من قضايا الفكر والعلم والمعرفة بأسلوب متكافئ يغلب عليه طابع الهدوء والبعد عن الخصومة.^{১১}

‘সংলাপ হলো চিন্তা, মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে দু’টি পক্ষের মাঝে প্রচলিত মতের আদান-প্রদান; সেখানে কোনরূপ বিতর্ক থাকবে না, শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত থাকবে।’

সাত: الحوار عملية اتصال بين طرفين أو أكثر تعتمد على المخاطبة و المسائلة حول , কেউ কেউ বলেছেন, সংলাপ হলো দু’ বা ততোধিক পক্ষের মাঝে যোগাযোগের উপায়; যা কোন বিষয়ে এক অপরকে সম্বোধন এবং জিজ্ঞাসাবাদ রীতি নির্ভর।

৩. **সংলাপের শর্তাবলী:** সার্থক ও যথার্থ সংলাপের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে মৌলিক শর্তসমূহ হলো- ক. প্রতিপক্ষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে; খ. যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক হতে হবে; গ. বিষয়ভিত্তিক ও ন্যায়সংগত হতে হবে।^{১২}

৪. সংলাপের শিষ্টাচার: সংলাপের অনেকগুলো শিষ্টাচার রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিষ্টাচার হলো,

ক. সংলাপের বিষয়ে উভয়পক্ষকে যথেষ্ট জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হয়; খ. উভয়পক্ষকে সংলাপের বিষয়ে নিজ ভুল বা সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে ফলাফল মেনে নেয়ার মানসিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়; গ. সংলাপে প্রত্যেকেরই মার্জিত, প্রাসঙ্গিক শব্দচয়ন অপরিহার্য; ঘ. সংলাপে একে ওপরের ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস, দর্শন ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কর্তব্য; ঙ. সকলকে এতটুকু উদারতা প্রদর্শন করা উচিত যেন আলোচিত বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায়; যদিও তা নিজ মতের বিপক্ষে যায়; চ. সকল প্রকার ক্রোধ ও বিদ্বেষ এর উর্ধ্বে অবস্থান হওয়া অপরিহার্য; ছ. পরস্পরের আলোচনায় মনোযোগী হওয়া উচিত।^{১৭}

৫. সংলাপের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা: সংলাপ কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। সেসব উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংলাপের মৌলিক কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো, ক. একটি সঠিক গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনিত হওয়া; খ. সৌহার্দপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মতের বৈচিত্র উপস্থাপন; গ. জ্ঞানাহরণ; ঘ. চিন্তার নবদিগন্ত উন্মোচন; ঙ. মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়ন; চ. পারস্পারিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করণ।^{১৮} আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিসীম।

৬. আরবী গদ্যসাহিত্যে সংলাপ: আরবী গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সংলাপ পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। সেসবের কিছু ধারা সম্পূর্ণ সংলাপ নির্ভর আবার কিছু ধারা সংলাপ নির্ভর না হলেও তথায় সংলাপ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা আলোচনা করা হলো-

এক. নাট্যসাহিত্যে সংলাপ: যেসব বিষয়ে সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে আরবী সাহিত্যের নবজাগরণ ও আধুনিকায়ন ঘটেছে নাট্যসাহিত্য তন্মধ্যে অন্যতম। নাটক বলা হয়,

شكل من الأدب الذي يكتبه الكاتب المسرحي وعادة ما يتكون من حوار أو غناء بين الشخصيات، ويكون النص مخصصاً للأداء المسرحي بدلاً من مجرد القراءة^{১৯}

‘নাটক সংলাপ ও অভিনয় নির্ভর একটি সাহিত্য; যার মাধ্যমে একটি ঘটনাকে উপস্থাপন করা হয়। নাটক পঠনের চেয়ে মঞ্চস্থ প্রাধান্য পায়।’

নাট্যসাহিত্যের অন্যতম মৌলিক উপাদান হলো সংলাপ। সংলাপের মাধ্যমেই নাটকের বিশেষত্ব প্রস্ফুটিত হয়। সংলাপের আলংকারিক মান যত বেশি সমৃদ্ধ সে নাটক ততটাই সমাদৃত। নাটক একই সঙ্গে লেখ্য, অভিনয় ও প্রদর্শন সাহিত্য। নাটকে পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টি প্রতিফলিত হয় সংলাপের প্রতি। কারণ অর্থবহ সংক্ষিপ্ত চিত্তাকর্ষক সংলাপ পাঠক ও দর্শককে বহুগুণে মনযোগী করে তোলে। নাট্যসাহিত্যে সংলাপের কয়েকটি মৌলিকত্ব হলো, ক. নাটকে চরিত্র বেশী থাকে, যে কারণে সংলাপ ছোট ও অলংকারসমৃদ্ধ হয়; খ. সংলাপের কারণেই নাটক প্রতিক্রিয়াশীল হয়; গ. নাটকে চরিত্র সংলাপ সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণস্বরূপ আরবী সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার তাওফীক আল হাকীমের ঐতিহাসিক **আহলুল কাহাফ** নাটক। নাটকটিতে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্রের অপূর্ব মিশ্রণ রয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে এর পরিচয় পর্ব থেকে একটি নমুনা সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে। নাটকে মারনূশ ছিল নিজ পরিবারের সদস্যদের সন্ধানে বিভোর অন্যদিকে মিশলিনিয়ার চিন্তা-চেতনায় ছিল কাল্পনিক চরিত্র শ্রেয়সী প্রেসকাকে এক পলক দেখার কৌশল বের করা। এমন প্রেক্ষাপটে মিশলিনিয়াকে উদ্দেশ্য করে মারনূশের দু’টি আকর্ষণীয় সংলাপ হলো-

‘মারনূশ: তুমি তোমার ভালবাসার মানুষকে নিয়েই পেরেশান; এতে অন্যের বিপদ দেখছ না! কে বেশী অস্থির?’

মিশলিনিয়া: তুমি।

মারনূশ: আমি? প্রেমিকের চোখ কতইনা অন্ধ হয়, অকৃতজ্ঞ হয়!

মিশলিনিয়া: বরং তুমি এটা বল যে, কম-বেশী তুমিও এ রোগে আক্রান্ত।

মারনূশ: প্রেম, ভালবাসা সবকিছু গিলে ফেলে এমনকি সত্যবাদিতা ও ঈমানকেও।

মিশলিনিয়া: কি বললে, ঈমানকেও?^{২০}

দুই. উপন্যাসে সংলাপ

আধুনিক আরবী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞায়ন হলো উপন্যাস। উপন্যাস বলা হয়,

هي سلسلة من الأحداث تُسرد بسرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية أو واقعية وأحداثاً على شكل قصة متسلسلة^{১৭}

‘বাস্তব অথবা কাল্পনিক চরিত্র অবলম্বনে গল্পাকারে একটি বিষয় বা ঘটনাকে গদ্যসাহিত্য ধারায় রচিত সাহিত্যকে উপন্যাস বলা হয়।’

নাটকের ন্যায় উপন্যাস সাহিত্যও সংলাপ নির্ভর একটি সাহিত্য। তবে নাটকের মত উপন্যাসের দৃশ্যরূপ নেই। উপন্যাস সম্পূর্ণ পাঠ্যসাহিত্য। সংলাপের বৈচিত্রে একটি বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয় উপন্যাসে। সংলাপের মোহ ও ঘটনার অগিবার্য পরিণতি পাঠককে উপন্যাসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেয়। সুতরাং সংলাপই উপন্যাস সাহিত্যের মূল চালিকাশক্তি। উপন্যাসসাহিত্যে সংলাপের মৌলিকত্ব হলো ক. উপন্যাসে চরিত্র কম থাকে, যে কারণে সংলাপ বড় ও বর্ণনামূলক হয়; খ. উপন্যাসে চয়িত সংলাপ নাটকের ন্যায় সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণস্বরূপ নোবেলিস্ট নাজিব মাহফুযের বিখ্যাত উপন্যাস যুকাক আল মিদাক থেকে একটি নমুনা সংলাপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংলাপটি হলো নিম্নরূপ:

‘উম্ম হামীদা সিন্তু হুদাকে বলেন, তাহলে তুমি কেন আমার নিকট এসেছ! এরপর নীচু স্বরে বলল, আমি কিভাবে বিয়ের বিষয়ে নেতিবাচক কথা বলি অথচ বিয়ে একটি শরীয়তের অপরিহার্য বিষয়! আর তুমি তো একজন জানাশোনা ভদ্র মেয়ে। সবাই তোমার সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্যই দেয়। বান্ধবী শোন! বিবাহ হলো দ্বীনের অর্ধেক, আল্লাহ পাক এটিকে শরীয়তভুক্ত করে দিয়েছেন এবং নবী সা. বিবাহের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সিন্তু হুদা বিশ্বাসের সাথে বলল: নবী সা. এরূপ বলেছেন!

উম্ম হামীদা বলল: কেন নয়, তিনি তো আরব নবী, সবাইকে তিনি ভালবাসেন।

সিন্তু হুদার চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হল। সে প্যাকেট থেকে দু’টি সিগারেট বের করে বলল: কে আমাকে বিয়ে করবে?

উম্ম হামীদা তার আনন্দে বিমোহিত হয়ে বলল: এক হাজার একজন বিয়েতে রাজি হবে।

সিন্তু হুদা নির্মোহ হেসে বলল: একজনই যথেষ্ট।’^{১৮}

তিন. রম্যরচনায় সংলাপ

রম্যরচনাকে আরবী ভাষায় الفكاهي বা হাসি বলা হয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো الضحك^{১৯} বা হাসি, المزاح^{২০} বা এমন কথা ও কাজ যা হাসির উদ্বেক করে। এছাড়া শব্দটি السرور^{২১} বা আনন্দ, প্রফুল্লতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমনকি الدعابة^{২২} বা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে আনন্দ-ফুর্তি, হাসি-তামাশা করা অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে রম্যসাহিত্যের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপিত হলো:

এক. ড. আব্দুল আযীয শারায়ফ বলেছেন,

الفكاهة هي عرض أمور الحياة من الإحساس الفلسفي بالحياة حيث يضحك الناس ويبعث سرورهم و يتمتعهم^{২৩}

‘রম্য সাহিত্য হলো দার্শনিক উপলব্ধি থেকে উপস্থাপিত জীবন বৈচিত্র যা মানুষকে হাসায়, আনন্দ ও ভৃগু দান করে।’

দুই. المعجم الوسيط এ বলা হয়েছে-الكلام^{২৪} به من طرف المزاح ما يتمتع به من طرف المزاح রম্য রচনা হলো আনন্দদায়ক হাস্যরসাত্মক কালাম।

তিন. লুইস মা'লুফের মতে, ^{২৫} الفكاكة ما يعطي به من المضاحي وملح الكلام لانبساط النفس به, রম্যরচনা এমন কথা যা হাসায় এবং মনে প্রফুল্লতা বয়ে আনে।

চার. মুনীর বালাবাকীর মতে, ^{২৬} الفكاكة هي ملكة عسلية تمكن المرأ من اكتشاف المضحكات والأعاجيب, রম্যরচনা এমন মধুমাখা বচনযোগ্যতা যা হাসায় এবং অভিভূত করে।

পাঁচ. New Standard Encyclopedia তে বলা হয়েছে, রম্য রচনা এক প্রকার লেখনী, বাগ্মিতা ও বাদ্যশিল্প যা হাসির খোরাক জোগায় এবং শরীর ও আত্মায় নির্মোহ শান্তি প্রবাহিত করে।^{২৭}

ছয়. বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, প্রধানত লঘুচালে লিখিত হাস্যরসাস্রিত সুখপাঠ্য রচনাকে রম্যরচনা বলে।^{২৮}

রম্যরচনায় অনেক সময় সংলাপ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় যেমন ইবনুল মুকাফ্ফার কালজয়ী অনুদিত রচনা কালীলা ওয়া দিমনাহ গ্রন্থে গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক ভূমিকার শুরুতেই বলেছেন,

وهذا الكتاب موضوعه جرى على ألسن البهائم والطيور صيانة لغرضه فيه من العوام وضناً بما ضمنته عن الطعام وتنزيهاً للحكمة ما في فنونها ومحاسنها وعيوبها^{২৯}

‘অত্র গ্রন্থটি বিভিন্ন পশু-পাখির আচারগত ভাষায় রচিত। যেন বইটির গল্পের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সর্বসাধারণ উপকৃত হয় এবং রচনার শৈল্পিকরূপ ও ভাল-মন্দ দিক পর্যালোচনা না করে উহার নৈতিক শিক্ষা উপলব্ধি করে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।’

গ্রন্থটি প্রথমত অত্যাচারী শাসক দাবশালীমকে উপদেশ দেয়ার লক্ষ্যে রচিত। অতপর তার মতো অন্যান্য যালিম শাসক ও কর্তৃত্বশীল সকলকে নসীহত প্রদানের উদ্দেশ্যে বইটি প্রণীত। এটি রম্য উপাদানে ভরা। গ্রন্থে উল্লিখিত গল্পগুলো পঠনে সর্বাত্মক হাসির খোরাক যোগাবে। তবে এতে বিজ্ঞজনদের জন্য রয়েছে উপদেশ ও পথনির্দেশনা। গ্রন্থটির রচনামূল্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বন্যপ্রাণীদের পারস্পারিক সংলাপের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত বিষয়বস্তু আলোকপাত করা। বন্যপ্রাণীদের পারস্পারিক সংলাপই গ্রন্থটিকে সমাদৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থ থেকে একটি সংলাপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

‘সিংহের দরবারে দিমনা প্রবেশ করলে সিংহ তাকে বলল: তুমি সেখানে গিয়ে কি করলে? কি দেখলে?’

দিমনা বলল: আমি একটি বলদ দেখতে পেলাম, সে জোরে হাম্বা-হাম্বা করে চিৎকার করছে।

সিংহ বলল: তার বলশক্তি কেমন?

দিমনা বলল: নির্ভয়ে আমি তার নিকটবর্তী হয়েছি, তার সাথে কথা বলেছি।

সিংহ বলল: আমার মনে হচ্ছে, তার বিষয়টি ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ প্রচণ্ড ঝড়ে দুর্বল ঘাসের কোন ক্ষতি হয় না; ক্ষতি হয় বড়, লম্বা গাছের।

দিমনা বলল: মালিক ভয় পাবেন না। তার বিষয়টি ততটা বড় না যেমনটি আপনি ভাবছেন। আমি তাকে আপনার নিকট নিয়ে আসছি। সে আপনার অনুগত হয়ে থাকবে।

সিংহ বলল: তোমার যা ভাল মনে হয় কর।

দিমনা বলদের নিকট গেল এবং তাকে নির্ভয়ে বলল: সিংহ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আপনাকে তার নিকট নিয়ে যাই। যদি কালক্ষেপণ না করে দ্রুত আমার সাথে চলেন তবে তার নিকট আপনার নিরাপত্তা আমি নিশ্চিত করব আর যদি তালবাহানা করেন তবে কিন্তু আপনার সব খবর তার নিকট বলে দিব।

শাতরাবা (বলদের নাম) বলল: কোন সেই সিংহ যে তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়েছে? সে কোথায় থাকে? তার অবস্থা কি?

দিমনা বলল: সে এই জঙ্গলের বন্যপ্রাণীর রাজা। অমুক জায়গায় তার অবস্থান। তার চতুর্পাশে স্বগোষ্ঠীয়রা অবস্থানকরে।

শাতরাবা কিছুটা ভীত হয়ে বলল: যদি তুমি আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত কর তবে আমি তোমার সাথে যাব।

দিমনা তাকে অভয় দিল এবং তাকে নিয়ে সিংহের দরবারে হাজির হলো।

সিংহ তাকে অভিবাদন জানালো এবং নৈকট্য দান করল। তাকে বলল, কবে তুমি এ রাজ্যে প্রবেশ করেছ?
শাতরাবা তার পুরো ঘটনা খুলে বলল।

সিংহ তাকে বলল: ঠিক আছে, আমার সাহচর্যেই থাক। আমি তোমার যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করব।

বলদ তার জন্য দু'আ করল, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।^{১০০}

চার. মাকামা সাহিত্যে সংলাপ

আব্বাসী যুগে প্রবর্তিত আরবী গদ্য সাহিত্যের বিশেষ একটি ধারা হলো মাকামা সাহিত্য। মাকামা আরবী গদ্য সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ব্যতিক্রমী শাখা। মাকামা শব্দের অর্থ জায়গা, দাঁড়াবার স্থান, সভা, সমাবেশ, মজলিস ইত্যাদি। কোন বিষয়ে উপদেশ বা বার্তা প্রদানের লক্ষ্যে আকস্মিকভাবে রাস্তার পাশে বা জনসমাগম স্থলে লোকজনকে ডেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে সাজিয়ে-গুছিয়ে আলংকারিক শব্দ চয়নে অভিনব উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কল্পিত বার্তা পৌছানার ছোট আয়োজনকে মাকামা বলা হয়। বাদীউয যামান হামাদানী মাকামার সংজ্ঞায় বলেন, মাকামা এক প্রকার গদ্যসাহিত্য যা গল্পাকারে বর্ণনার মাধ্যমে রচিত হয়। লেখক একজন বর্ণনাকারী, একজন নায়ক বা মূল চরিত্র এবং কয়েকজন পার্শ্ব চরিত্র নির্ধারণ করেন। নায়কের কৌশল থাকে তার জাদুকরী উপস্থাপনার মাধ্যমে সবাইকে তাক লাগিয়ে অর্থ উপার্জন অতপর দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান। মাকামার সম্পূর্ণ বর্ণনা শব্দচয়ন ও অর্থে সুদৃঢ় ও ভাষালংকারে সমৃদ্ধ এবং হৃদয়স্পর্শী। আব্বাসী যুগের শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষার লক্ষ্যে এ সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়।^{১০১}

তদ্রূপ আল কালকাশান্দী তার সুবহুল আ'শা গ্রন্থে বলেন, *انَّ تسمية المقامة بهذا الاسم كان لأئها تُذكر في مجلس*, মাকামা নামকরণের যথার্থতা হলো এটি ছোট জনসমাবেশে উপস্থাপিত হয়, কিছু মানুষ তা শোনার জন্য তথায় উপস্থিত হয়।

শাওকী দায়িফ এর মতে, *هي حديثٌ موضوع بأسلوب سهل سلس لتعليم الناشئة أنواع الأساليب في اللغة*, মাকামা হলো একটি বক্তব্য যা উদীয়মান শিক্ষার্থীদের ভাষালংকার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রচিত।^{১০২}

আব্বাসী যুগের মাঝামাঝি সময়ে গদ্যসাহিত্যের এ ধারা বিকশিত হয়। সর্বপ্রথম আহমাদ ইবনুল ফারিস(৯৪১-১০০৪খ্রি.) মাকামা রচনা করেন। এরপর তাঁর অনুসরণে বাদীউয যামান হামাদানী চারশটি মাকামা রচনা করেন। তারপর আবুল কাসিম হারীরী পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন। পরবর্তীতে আরো অনেকে মাকামা রচনা করেন। যেমনযামাখশারী, ইবনুল জাওযী, আল হানাফী, আস সা'দী, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন নাকিয়া আল বাগদাদী প্রমুখ।

মাকামা অনেকটা সংলাপ পদ্ধতিতে রচিত সাহিত্য। প্রতিটি মাকামায় একজন বর্ণনা কারী থাকে। তিনি সাহিত্য সমৃদ্ধ এক একটি গল্প বর্ণনা করতে থাকেন, ঘটনার আকস্মিকতায় সেখানে গল্পের নায়ক উপস্থিত হন। মূলত বর্ণনাকারী ও নায়ক এর মাঝে সংলাপের মধ্য দিয়েই গল্পটি সাহিত্যরূপ লাভ করে। যেমন হারীরী'র মাকামায় বর্ণনাকারী হলেন, হারিছ ইবন হাম্মাম এবং নায়ক হলেন আবু যায়দ আস সারুজী এবং হামাযানীর মাকামায় বর্ণনাকারী হলেন, ঈসা ইবন হিশাম এবং নায়ক আবুল ফাতাহ আল ইসকিন্দারী। নিম্নে হামাযানীর মাকামা কারীদিয়্যাহ থেকে ঈসা ইবন হিশাম ও আবুল ফাতাহ আল ইসকিন্দারী'র মাঝের একটি নমুনা সংলাপ উল্লেখ করা হলো:

‘ঈসা ইবন হিশাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, পথের দূরত্ব আমাকে নিষ্কোপ করল শস্যভরা এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। একপর্যায়ে আমি জুরযানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে আসলাম। সেখানে এসে আমি নিজের বয়সকে হার মানালাম এবং ঐ ভূখণ্ডে বসবাসের চিন্তা স্থির করলাম। আমার সাথে থাকা সম্পদ বিনিয়োগ করলাম। আমি মদের দোকানকে সমাবেশের স্থান নির্ধারণ করলাম এবং কিছু বন্ধুদের সাথী বানালাম। আমি সকাল-বিকেল গৃহের জন্য ও মাঝের সময় দোকানে অতিবাহিত করতে লাগলাম। আমরা দোকানে একদিন কবিতা ও কবি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। ঐ সময় আমাদের অনতিদূরে এক যুবক বসে ছিল। সে চুপ করে বসেছিল যেন সে কিছুই বুঝে না; সে নীরব

ছিল যেন কিছুই জানে না। আমাদের আলোচনা দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলছিল। একপর্যায়ে নিজেদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় এবং তা চরমে পৌঁছায়।

এমতাবছায় ঐ যুবক বলল: তোমরা বিতর্কের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়েছ। আমি চাইলে বিতর্কের বিষয়ে কথা বলতে পারতাম এবং অনেক কিছুই বলতে পারতাম। আমি বললে সবকিছুই প্রকাশ করে দিতাম; সত্য উন্মোচিত করতাম যা বধিরকেও শুনিয়ে ছাড়ত, চিতাকেও নীচে নামিয়ে আনত।

আমি বললাম: ওহে বিদ্বান! কাছে আস। তুমি আমাদের আশাব্যিত করেছ। তুমি নিজের অনেক প্রশংসা করেছ। এখন বলো, তোমার কথা।

যুবক সামনে এসে বলল: আমাকে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর দিব। তোমরা শুনতে থাক, অভিভূত করে ছাড়ব।

আমরা বললাম: ইমরুল কায়স সম্পর্কে তুমি কি বলবে?

যুবক বলল: তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম প্রেমিকার স্মরণে তার বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি অতি প্রত্যুষে গৃহ ত্যাগ করেছেন যখন পাখিরা নীড়েই অবস্থান করত। তিনি অশ্বের গুণাগুণের যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য কবিতা রচনা করেন নি। তিনি অতি উৎসাহী হয়ে কথা বলেন নি। যে তার কথায় চতুরতার আশ্রয় নিয়েছে বা কোন কিছু পাবার আশায় পুষ্পউদ্যান অন্বেষণ করেছে তার উপর তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।

আমরা বললাম: কবি নাবিগা সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

যুবক বলল: যখন তিনি রাগান্বিত হতেন, গালিগালাজ করতেন। আর যখন খোশমেজাজে থাকতেন, প্রশংসা করতেন। যখন ভয় পেতেন অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। তিনি সঠিক লক্ষ্যবস্তুতেই তীর নিক্ষেপ করতেন।

আমরা বললাম: কবি যুহায়র সম্পর্কে কি বলবে?

যুবক বললেন: তিনি কবিতাকে উজ্জীবিত করতেন, কবিতাও তাকে উজ্জীবিত করত। তাকে কিছু বলা হলে যেন যাদু তার উত্তর দিত।

আমরা বললাম: কবি তুরাফা সম্পর্কে কি বলবে?

যুবক বললেন: তিনি কবিতার মাটি ও পানি। ছন্দের খনি ও শহর। তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন কিন্তু তার প্রথিত গুণধনের রহস্য উন্মোচিত হয়নি। আজও তার কাব্যভাণ্ডারের তালা খোলা হয়নি।

আমরা বললাম: জারীর ও ফারায়দাক সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি? কে এগিয়ে?

যুবক বলল: জারীর কবিতা রচনায় সুনিপুণ এবং সমৃদ্ধশালী। ফারায়দাক পাথরের মত শক্ত ও অধিক অহংকারী। জারীর কুৎসামূলক কবিতা রচনায় বিদ্বাকারী এবং আজও সমাদৃত। ফারায়দাক উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সে কেবল নিজ গোত্রে বরণীয়। জারীর যখন বংশমর্যাদা উল্লেখ করেন তখন অনেক চিন্তা করেন, যখন কারো নিন্দা করেন তাকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করেন, আর যখন কারো প্রশংসা করেন তখন অনেক বেশী করে ফেলেন। ফারায়দাক যখন গর্ব করেন পূর্ণমাত্রায় করেন, যখন কাউকে হেয় করেন লাঞ্চিত করেন, আর যখন কারো গুণকীর্তন করেন তখন পরিপূর্ণভাবে করেন।

আমরা বললাম: আধুনিক ও প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

যুবক বলল: প্রাচীন যুগের কবিগণ শব্দচয়নে শ্রেষ্ঠ, তাৎপর্যগত দিক থেকে অর্থবহ। আর আধুনিক যুগের কবিরা কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত, ছন্দের গাঁথুনিতে সুনিপুণ।^{৩৪}

পাঁচ. তাফসীর রচনায় সংলাপ

আল কুরআনের ইজায, রচনাশৈলী, অলংকারিক সৌন্দর্য উপস্থাপনে অনেক মুফাসসির অবদান রেখেছেন। যামাখশারী রহ. এক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগণ্য। তিনি স্বরচিত তাফসীরুল কাশশাফ এর মাধ্যমে আল কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যলংকার এর অলৌকিকত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি তাঁর এ রচনায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

তথা **فان قيل قلت** পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে বলা হয় **فنفلة** পদ্ধতি। অর্থাৎ মুফাসিসর একজন কাল্পনিক সতীর্থতের মাধ্যমে প্রশ্ন উপস্থাপন করে তিনি সেসবের জবাব দিয়েছেন। **فنفلة** পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের সংলাপ। যার মাধ্যমে পাঠক খুব সহজেই প্রশ্নাতীত অসংখ্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জনে সক্ষম হোন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ **اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** এর তাফসীর থেকে দু'টি সংলাপ উল্লেখ করা হলো:

‘যদি তুমি বল: **بسم الله** এর **ب** কার সাথে সম্পর্কযুক্ত?

আমি বলব: **ب** একটি উহ্য ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। আসল ইবারত হলো, **أُتْلُو**, **أُتْلُوا** বা **أُتْلُوا** ক্রিয়া উহ্য রয়েছে।

যদি তুমি বল: **بسم الله** এর **ب** এর সম্পর্কিত উহ্য ক্রিয়া **بسم الله** এর পরে কেন ধরা হচ্ছে?

আমি বলব: কারণ **بسم الله** যার সাথে সম্পর্কিত সেই উহ্য ক্রিয়ার চেয়ে এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।^{৩৫}

হয়. সমালোচনা সাহিত্যে সংলাপ

সমালোচনা সাহিত্য একটি স্পর্শকাতর সাহিত্য। সমালোচনা করতে হলে সে বিষয়ে রচয়িতার চেয়েও অধিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। যথার্থ সমালোচনায় অনেকে সংলাপ রীতি অনুসরণ করেছেন। যেমন ড. তুহা হুসাইন তাঁর হাদীসুল আরবী‘আ গ্রন্থে একজন কাল্পনিক বন্ধুর সাথে সংলাপ পদ্ধতিতে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করেছেন। নিম্নে কবি লবীদ ও যুহায়র সম্পর্কে ড. তুহা হুসাইন ও তার বন্ধুর মাঝে সংলাপের নমুনা উল্লেখ করা হলো-

‘আমি আমার বন্ধুর সাথে এই ঘন্টা জাহিলী যুগের বিশিষ্ট কবি লবীদ সম্পর্কে দীর্ঘ সংলাপের প্রত্যাশা ব্যক্ত করলাম।

বন্ধু বলল: আমি লবীদের কবিতা মনোযোগসহ শুনলেও বুঝি না। বুঝার চেষ্টা করলেও মজা পাই না। আধুনিক যুগের কবিতায় যে কাব্যরস আমি পাই তা লবীদের কবিতায় পাই না।

আমি বললাম: এবার আমি তোমার ও তার মাঝে দোভাষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হব।^{৩৬}

তদ্রূপ যুহায়র সম্পর্কে বলেন,

‘বন্ধু আমাকে বলল: কবি যুহায়র এর কবিতা যখন পড়ি তখন মনে হয় তাকে আমি অনেক কাছে থেকে দেখছি, তাকে অনেক সহজ মনে হয়। তার কবিতা পঠনে কষ্ট পাই না, বেগ পেতে হয় না। অন্যান্য কবিদের কবিতা বুঝতে যেমন কষ্ট হয় যুহায়র এর কবিতা তেমন মনে হয় না।

আমি বললাম: তুমি যুহায়র এর তারীফ করতেই থাক, তাকে ভালবাসতেই থাক, তার কবিতা সংকলন করতেই থাক, তার কবিতায় বিস্ময় প্রকাশ করতেই থাক, ইচ্ছামত তার কবিতা মুখস্থ করতেই থাক।

বন্ধু বলল: তোমার দু’টি স্বভাব আমি খুব ঘৃণা করি, অপছন্দ করি।

আমি বললাম: তুমি যখন আমার দোষ খুঁজে বের কর সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না তুমি ভুল করছ।

আমি তো দোষ মুক্ত নই। আমি চাই তুমি আমার দোষ ধরতেই থাকবে।^{৩৭}

সাত. আল কুরআন ও হাদীসে নববীতে সংলাপ

আল কুরআন ও হাদীসে নববী মোটেও সাহিত্য গ্রন্থ নয়। তারপরও প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে এতদুভয়ের আলোচনা নিয়ে আসা হয়েছে যেহেতু আল কুরআন ও হাদীসে নববীতে অনেক সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন আল কুরআনে ফিরিসতাগণের সাথে আল্লাহর সংলাপ উল্লিখিত হয়েছে,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{৩৮}

‘আর যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন: নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করব;

তারা বলল: আপনি তথায় এমন জাতি পাঠাবেন যে জাতি দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, রক্তপাত ঘটাবে! অথচ আমরাই আপনার প্রশংসায় তাসবীহ জ্ঞাপন করি, পবিত্রতা বর্ণনা করি।

আল্লাহ বললেন: আমি যা জানি তোমরা তা জান না।’

নবীগণের সংলাপ তাঁর কণ্ঠের সাথে। যেমন,

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فَلَوْ أَتَيْنَاهُ هُزُؤًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ^{৩৫}

‘মূসা আ. তাঁর কণ্ঠকে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের গাভী জবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন;

তারা বলল: তুমি কি আমাদের বোকা বানাতে চাও!

মূসা আ. বললেন: আমি অঙ্কুরের শামিল হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’

অনুরূপ হাদীসে এসেছে-

‘রাসূল সা. একদা সাহাবীদের বললেন: নিশ্চয়ই গাছ-পালার মধ্যে এমন এক প্রকার গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না; আর সেটি হলো মু’মিনদের উপমা। তোমরা আমাকে বলতে পারবে, সেটি কোন গাছ?

রাবী ইবন উমার রা. বলেন, সাহাবীগণ জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বলেন, আমার মনে হল, সেটি খেজুর গাছ হবে, কিন্তু লজ্জায় বলিনি।

সাহাবীগণ বললেন: আল্লাহর রাসূল সা. আপনি বলে দিন, সেটি কোন গাছ।

নবী সা. বললেন: খেজুর গাছ।^{৩৬}

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

‘রাসূল সা. বললেন: বলত, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় আর সে প্রতিদিন পাঁচবার তাতে গোসল করে, তবে কি তার শরীরে নাপাক অবশিষ্ট থাকতে পারে?

সাহাবীগণ বললেন, না, তার দেহে কোনরূপ নাপাক বাকী থাকতে পারে না।

নবী সা. বললেন: এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ; আল্লাহ পাক এত করে নামাজী ব্যক্তির গুনাহ ধুয়ে মুছে দেন।^{৩৭}

৭. উপসংহার

সবশেষে আমরা বলতে পারি সংলাপ একটি সর্বজন গৃহিত ভাষাশৈলী। সংলাপের নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু নেই। তবে অর্থবহ সংলাপের জন্য ইঙ্গিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শিষ্টাচার থাকা জরুরী। সংলাপের মাধ্যমে যে কোনজটিল বিষয় সহজভাবে উপস্থাপন করা যায়। একইভাবে অন্যকে জানার বা নিজের কথা কাউকে বুঝানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হলো সংলাপ। সাহিত্য রচনায় এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, বিশেষত আরবী গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় এ পদ্ধতির অনুসরণ লক্ষণীয়। সংলাপের মাধ্যমেই নাটক, উপন্যাস সাহিত্য দর্শক নন্দিত ও পাঠক সমাদৃত হয়। অর্থবহ ও অলংকারিক সংলাপ নাটক ও উপন্যাসকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম আসনে সমাসীন করে। এছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য ধারা যা সংলাপ পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে সংলাপ সেসব রচনার বিষয়বস্তু উপলব্ধি ও অজানা বিষয়কে জানার নব দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

^১ ইবন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮), ৭৫০; ফীরুযাবাদী, *আল কামূস আল মুহীত* (বৈরুত: মুওসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬), প. ৪৮৮।

^২ সূরাহ ইনশিকাক: ১৪।

^৩ সূরাহ আল কাহফ: ৩৪।

^৪ ইবরাহীম আনিস, *আল মু’জামুল ওয়াসীত* (কায়রো: মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়াহ, তাবি), প. ২০৫।

^৫ সূরাহ আল মুজাদালাহ: ১।

^৬ নাসির ইবন সাঈদ ইবন সাইফ, *আল হিওয়ার ফিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ নববিয়াহ* (অনলাইন সংস্করণ, ২০১৮), পৃ. ৩।

সুদি অর্থব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন: পরিপ্রেক্ষিত রাসুল সা.-এর জীবনাচার [Extinction of Interest-based Finance on the Prophetic Life Sketch]

ড. মো. আতোয়ার রহমান*

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী*

[Abstract: The reformation of Muslim society lies solely in adhering to the teachings of the Holy Prophet (Peace be upon Him), who aimed to cleanse society of moral ailments. He not only prohibited people from committing immoral deeds but also instructed followers to abstain from the curse of usury (interest on loans). Usury is such a curse where all the wealth is accumulated in few hands, and the weak and oppressed class of the Society become indebted to them to fulfill their needs. Arab tribes practiced usury, but Islam, upon arrival, forbade it and commanded followers to shun this ignorant practice, nullifying Hazrat Abbas's interest. Islam gradually prohibited usury to eliminate immoral practices, enabling Muslims to lead peaceful lives.]

Keywords: Interest, Oppressed, prohibited, eliminate.

১. ভূমিকা

মানবজাতি নিজেদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাঙ্গী পূরণে অবাধ ও অপরিমিত স্বাধীন নয়; বরং ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও বিধানাবলির অনুগত। বস্তুগত প্রয়োজনাঙ্গী পূরণের এই দর্শন শুধু মুসলিম সমাজে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনই করে না; বরং নিরাপদ জীবনব্যবস্থারও নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য এতে এমন সকল নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মূলে রয়েছে অনুগ্রহ ও সহযোগিতা, ভালোবাসা ও হৃদয়তা, আত্মত্যাগ ও ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণকামিতা। মানববৈতনিকের সূচনা এ-সকল বিষয় নিয়েই হয়েছে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ঐশী গ্রন্থসমূহে রদবদল ও সংযোজন-বিরোধন করে স্বার্থ চরিতার্থ করার পথ প্রসারিত করা হয়। এমন সকল প্রথা চালু করা হয়, যার ভার বহন করতে মানবজাতি শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়ে পড়ে। মূলত বস্তুগত প্রয়োজনাঙ্গী পূরণ করার কোনো যথাযথ উপায় ইসলামের পূর্বে ছিল না। যার ফলে সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির মতো অভিশাপগুলো পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। ফলে প্রত্যেকে নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অনুযায়ী বস্তুগত প্রয়োজনাঙ্গী পূরণ করতে থাকে। ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার পর রাসুল সা. একদিকে মানবতা-বিরোধী সকল প্রকার রেওয়াজ ও প্রথা বিলোপ করেন; অপরদিকে সুদ-ঘুষ ও দুর্নীতির মতো মানবতা-বিধ্বংসী বিষয়াদিও নির্মূল করেন। যাতে সামাজিক অশান্তি ও অন্যায় বিদূরিত হয়ে পৃথিবী নিরাপত্তা ও শান্তির আধারে পরিণত হয়। ফলে এ কথা বলা যায় যে, যদি মানবতাপ্রেমী মহানবি সা.-এর আগমন না হতো, তাহলে ঋণদাতারা রক্তখেকোর মতো গ্রহীতাদের রক্তশোষণ করত এবং সমাজে সর্বনিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার জয়জয়কার অবস্থা হতো।

২. সুদের সংজ্ঞা

সুদকে ইংরেজিতে INTEREST বা USURY এবং আরবীতে ‘রিবা’ বা ‘লিয়াত’ বলা হয়।^১ এর অর্থ অধিক বা বৃদ্ধি। তথা এমন অন্যায় অধিক সম্পদ, যা ঋণগ্রহীতা থেকে শর্তের ভিত্তিতে আদায় করা হয়। আরবী ‘রিবা’ শব্দের শেষে ওয়াও, আলিফ ও ইয়া তিন হরফযোগেই পড়া যায়।^২

তাজুল উরুজ প্রণেতা সুদের সংজ্ঞায় বলেন, “كل قرض يؤخذ به أكثر منه” “যে ঋণের মাধ্যমে কারও থেকে তুলনামূলক অধিক সম্পদ আদায় করা হয় তা সুদ।”^৩

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৮৩৩১।

মুহাম্মাদ বিন কাব কুরায়জি বলেন, “كل قرض جر منفعة فهو ربا” যে ঋণের মাধ্যমে কোনো প্রকার মুনাফা অর্জিত হয় তাই সুদ।”^{৪৪}

ইমাম আবু বকর জাসসাস বলেন, وهو القرض المشروط فيه الأجل لزيادة مال على المستقرض, “সুদ এমন শর্তযুক্ত ঋণ, যার জন্য সময় নির্ধারিত থাকে এবং ঋণগ্রহীতার ওপর অধিক সম্পদ চাপিয়ে দেওয়া হয়।”^{৪৫}

ফুজালা বিন উবায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا, “যে-ঋণেই কোনো প্রকার মুনাফা লাভ হয়, তা সুদের অন্তর্ভুক্ত।”^{৪৬}

রাসুল সা. এবং সাহাবি ও তাবিয়ীগণ সুদকে এমন অর্থেই জানতেন। তাই কোনো ঋণগ্রহীতা শর্তবিহীন ঋণদাতাকে অতিরিক্ত কিছু দিলে তাতে অসুবিধা নেই, তা সুদ হবে না। ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قال ابن عمر في القرض إلى أجل لأبأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه لم يشترط

“নির্ধারিত সময়ে প্রদানের শর্তে ঋণ দিতে কোনো অসুবিধা নেই। ঋণদাতা তুলনামূলক ভালো মানের টাকা গ্রহণ করলেও অসুবিধা নেই, যদি তা শর্ত না করা হয়।”^{৪৭} সুদ হারাম হওয়া-সংক্রান্ত বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে পূর্ণরূপে হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয় নবম হিজরিতে।^{৪৮}

৩. সুদের প্রকারভেদ

আলিমগণ সুদকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

এক: রিবা আন্ নাসিয়াহ : ঋণের ওপর অতিরিক্ত টাকা আদায় করা। একে রিবা আল কুরআন, রিবা আল জাহিলিয়া এবং রিবা আদ দাইনও বলা হয়। যুক্তির বিবেচনায় এটাও তিনটি প্রকার:

ক. নির্ধারিত সময়ে আদায় করলে ঋণদাতাকে অতিরিক্ত দিতে হবে না। নইলে দ্বিগুণ আদায় করতে হবে।

খ. প্রথম থেকেই সুদের হার নির্ধারিত থাকে।

গ. নির্ধারিত সময়ে আদায় না করলে সময়ের সাথে সাথে সুদও বৃদ্ধি পাবে।

দুই: রিবা আল-ফাদল বা বৃদ্ধির সুদ: একে রিবা আল-হাদিসও বলা হয়। এর অধীনে সেই ছয়টি জিনিস অন্তর্ভুক্ত, যাকে রাসুলের সা. হাদিসে সমপরিমাণে ক্রয়বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর, অতিরিক্ত করাকে সুদ বলা হয়েছে।^{৪৯}

৪. সুদের ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যখন ব্যবসার সাথে সর্বপ্রথম পরিচিত হয়েছে, তখন থেকেই সুদের উৎপত্তি। মানবজাতির সূচনাকালে যেভাবে ব্যবসা ও লেনদেন শুরু হয়েছিল, সময়ে সময়ে তাতে অনিয়ম ও অন্যায়ে অনুরোধ ঘটে থাকে। মানুষ পার্থিব স্বার্থাবলি চরিতার্থ করার জন্য অন্ধ হয়ে দুর্বলদের ওপর জুলুম করতে থাকে। সর্বপ্রথম এই সুদি ব্যবস্থা কে প্রণয়ন করেছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ইতিহাস থেকে মনে হয়, ইসলাম-পূর্ব জাহিলি যুগে লেনদেন-ভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে সুদের প্রচলন ছিল। একেই আল্লাহ তায়ালা রিবা বলেছেন। কুরআন মাজিদে সামগ্রিক অর্থে সুদের নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। তা ব্যক্তিগত ঋণের ভিত্তিতে হোক অথবা ব্যবসায়িক ঋণের ভিত্তিতে। অন্যান্য ঐশী গ্রন্থেও সকল প্রকার সুদকে পরিপূর্ণভাবে হারাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাজেই, সুদি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একে নতুনভাবে সংজ্ঞায়ন করা এবং এর অবৈধতার ব্যাপারে পুনঃনিরীক্ষণের প্রয়োজন মনে করা শরিয়তের নীতিমালা-পরিপন্থী। লেনদেনের ক্ষেত্রে যারা সুদি-কারবারে লিপ্ত হতো, তাদেরকে রাসুল সা. সুদ থেকে বারণ করেছেন। বিদায় হজের ভাষণে নবীজী সা. সুদ হারাম হওয়ার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন এবং সর্বপ্রথম আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল ঘোষণা করেন।^{৫০} বিদায় হজের ভাষণে নবীজী সা. বলেন,

أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبٍّ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَأَوَّلُ رَبٍّ مَوْضُوعٌ، رَبُّ عَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

“শোনো, তোমাদের জন্য জাহিলী যুগের সব সুদ আজ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো। ঋণের মূলধন তোমরা পাবে। তোমরা জুলুম করবে না। তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না। সর্বপ্রথম যার সুদ পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো, সে হলো আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব।”^{১১}

তাওরাত, জাবুর এবং ইনজীলেও সুদের ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বিবৃত হয়েছে। বাইবেলের কিতাব আল খুরুজ (Book of Exodus) বলা হয়েছে, ‘যদি তোমার নিকটবর্তী ও আপন ভাই অভাবী হয়, তাহলে তাকে ঋণ দাও। তবে তার সাথে ঋণদাতার মতো আচরণ কোরো না এবং সুদ নিয়ো না।’^{১২} ইহুদিরা ‘ভাই’ বলতে শুধু তাদের ধর্মাবলম্বীদেরকেই বোঝে। তাই তাদের কথামতে সুদি কারবার অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বৈধ। বর্তমানে সুদি কারবারি ইহুদিরাই পুরো পৃথিবীতে সুদি অর্থব্যবস্থার অকল্পনীয় বিস্তার ঘটিয়েছে। কিতাব আল ইসতিসনায় (Book of Deuteronomy) বলা হয়েছে, “তুমি স্বীয় ভাইকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ো না। তা রূপা হোক অথবা ক্ষুদ্র শস্যদানা।”^{১৩} জাবুরে সংকর্মশীল মানুষের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, “তারা সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয় না।”^{১৪}

ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও কূটচাল পরিচালনা করে যাচ্ছে। ধন-সম্পদ ব্যয় করছে। সুদও সেই ষড়যন্ত্রের অংশ। ডক্টর সালিহ বলেন, *اليهود هم أكلة الربا في العالم كله*, “ইহুদিরাই পুরো পৃথিবীতে সুদ ভক্ষণকারী।”^{১৫}

ইনজিল লুকায় (Gospel of Luke) আছে, ‘যদি তোমরা ঋণগ্রহীতাকে কিছু আশা না করে ঋণ দাও, তবে তোমাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।’^{১৬}

সুদের ক্ষেত্রে একজনের লাভ হলে আরেকজনের অবশ্যই ক্ষতি হয়। এই অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চাকা জালিম, ক্ষমতাবান ও দুর্নীতিগ্রস্তদের চারপাশে আবর্তিত হতে থাকে। অপরদিকে দরিদ্র ও নিঃস্বশ্রণি দুটো রুটিও পায় না। অনেকটা এমন আচরণই ক্ষমতাস্বত্ব রাষ্ট্রগুলো তুলনামূলক কম ক্ষমতাসীল রাষ্ট্রের ওপর করে আসছে। প্রথমত, তাদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়, এরপর মূলধনের ভিত্তিতে সুদ গ্রহণ করে। সুদি অর্থব্যবস্থার অভিশাপে আজ রাষ্ট্র ও সমাজে আল্লাহর রহমত নেই। সুদি কারবারে লিপ্ত হওয়ার ফলেই আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলের জন্য হালাল বিষয়াদিও হারাম করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا اخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ طَبَاتٍ أَحْلَلَتْ لَهُمْ وَبَصَدَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

“আমি ইহুদিদের জুলুমের কারণে তাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু বৈধ ছিল, তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি এবং যেহেতু তারা অনেক মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে প্রতিরোধ করত। সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করত, অথচ সুদ থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকেও বারণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য আমি কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।”^{১৭}

৫. ইসলাম-পূর্ব আরবে সুদ

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম মোতাবেক কেউ কাউকে ঋণ দিলে ঋণগ্রহীতাকে দ্বিগুণ অর্থ পরিশোধ করতে হতো। আর নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায় করতে না পারলে সময়ে সময়ে তা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকত।^{১৮} ইসলাম মানুষের বস্তুগত ও ধর্মীয় প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে সমতার প্রবক্তা। একদিকে বস্তুগত প্রয়োজনাতি থেকে যেমন সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলে না, অপরদিকে এসব প্রয়োজনাতি পূরণের জন্য সকল প্রকার বৈধ-অবৈধ কাজে জড়ানোর নির্দেশও দেয় না। এ জন্যই রাসুল সা.-এর সিরাত থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, উপার্জনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়াদি রয়েছে বৈধ আর কিছু অবৈধ। অবৈধ উপার্জনের মধ্যে সুদও একটি দিক যা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬. কিয়ামতের পূর্বে সুদি লেনদেনের ব্যাপকতা

কুরআন মাজিদে সুদের ভয়াবহতা ও অপকারিতা সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে সুদকে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল সা.-এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াতে সুদ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকের কাছেই এর ধোঁয়া পৌঁছাবে বলে হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। রাসূল সা. বলেন, وَالْحُمُرُ، وَالزَّيْتُ، وَالزَّيْتُ، وَالزَّيْتُ، وَالزَّيْتُ “কিয়ামতের পূর্বে সুদ, ব্যভিচার এবং মদ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে।”^{১৯} অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الزَّيْتُ. قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ، نَالَهُ مِنْ غَيْرِهِ.

“এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষেরা সুদ খাবে” রাসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সকল মানুষই? তিনি বললেন, “যে খাবে না, অন্তত সুদের ধোঁয়া হলেও তার কাছে পৌঁছাবে।”^{২০}

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এমন এক সময়ে পৃথিবীতে আছি, যখন সুদ প্রত্যেকের রক্তে-রক্তে অনুপ্রবেশ করেছে। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, সকলেই এতে প্রভাবিত। কেউ সদিচ্ছায় সুদ থেকে বাঁচতে চাইলেও তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যবসায়ী হলে মাল না আমদানি করা যায়, আর না রপ্তানি। তারা ব্যাংক থেকে এলসি (LETTER OF CREDIT) নিয়ে ব্যবসা জারি রাখতে পারে। সুদ প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূল সা.-এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। এর সমূহ অপকারিতার ব্যাপারে আজকের পৃথিবী অনেক যুগ পরে অবগত হয়েছে, সেখানে রাসূল সা. চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানবজাতিকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন, যদি সমাজ ও রাষ্ট্র এই অভিশাপ থেকে মুক্ত না হতে পারে, তাহলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

৭. সুদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ

আরবের লোকেরা এক সময় মদপানের মতো নিকৃষ্ট কাজে জড়িত ছিল, ফলে আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে বিধান অবতীর্ণ করেন। ধীরতর কৌশল অবলম্বন করে মানবজাতিকে এই চারিত্রিক কলুষতার ব্যাপারে সতর্ক করেন। প্রথম ধাপে সুদের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য বলা হয় সুদ খাওয়া ইহুদিদের স্বভাব। সুদি ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে।^{২১} দ্বিতীয়ধাপে সময়ের সাথেসাথে সুদের আরও অপকারিতার উল্লেখ করা হয়। রাসূল সা. মুমিনদেরকে নির্দেশ দেন, তোমরা দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ খেয়ো না। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।^{২২} তৃতীয় ধাপে সুরা বাকারায় সুদের ব্যাপারে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।^{২৩}

৮. সুদি-ব্যবস্থার সামাজিক প্রভাব

পৃথিবীতে সুদি-ব্যবস্থা দাসত্বের এমন এক শৃঙ্খল, যাতে আজ লক্ষ-কোটি মানুষ বন্দি হয়ে আছে। এখন এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রের কাছে ঋণী। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রও এখন সুদি ঋণ নিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে এমনভাবে আটকে আছে যে, সেখানকার অনাগত কয়েক প্রজন্মও বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আর এই অভিশাপ থেকে তাদের মুক্তি পাওয়া শুধু মুশকিলই নয়, রীতিমতো অসম্ভবও। সুদি-ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করার ফলে মুসলমানরা এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে, যেখানে ঈমান, আমানতদারিতা এবং ধার্মিকতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলছে। এই সংকটময় পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল সা. বলেছেন,

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيُطْلَأُ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرِ دَخَرْتُهُ عَلَى رَجْلِكَ فَتَقَطُّ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيَصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ! مَا أَظْفَرَهُ! مَا أَجَلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ

حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعَتْ: لَنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيَا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

‘এক সময় মানুষ ঘুমাবে, তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেওয়া হবে, তখন ফোসকার ন্যায় তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ের ফোসকা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই।’ (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রের একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোনো কোনো লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না সাহসী, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। এরপর হুজায়ফা রা. বলেন, আমার ওপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমি তোমাদের কার সাথে লেনদেন করছি এ সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে তার দ্বীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খ্রিস্টান হয়, তাহলে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া কারো সঙ্গে বেচাকেনা করব না।^{২৪}

বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে যে সামান্য ঈমান আছে, তা শেষ করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সুদি-অর্থব্যবস্থা। সুদি অর্থ-ব্যবস্থাই পৃথিবীতে মানুষকে অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ, অন্যায়-অবিচার, হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদিতে লিপ্ত করে একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এই অভিশাপ এতই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, সেখানকার আর্থিক সংস্থাগুলো নিজেদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বাড়ি, গাড়ি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রমোটকথা সবকিছুই সুদের ভিত্তিতে সরবরাহ করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এর কলুষতা থেকে এখন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো অঞ্চলগুলোও মুক্ত নয়। এটি মূলত অধঃপতনেরই একটি ধাপ। সুদি অর্থব্যবস্থায় বাহ্যিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধি হয় মনে হলেও বাস্তবে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চূড়ান্ত বিচারে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيَرْزُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُوَ عِنْدَ اللَّهِ، وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ﴾

“আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই সমৃদ্ধশালী।”^{২৫}

৯. সামাজিক ভারসাম্যহীনতায় সুদের ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনাকে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখেছেন। এই ভারসাম্য ও সমতা বজায় থাকলে সফলতা ও সমৃদ্ধির দরজা খোলা থাকে। ইসলামি রাষ্ট্রে ভারসাম্য ও সমতার প্রধান কারণগুলো হলো পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব, যে কোনো বিষয়ের সুষম বন্টন, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহর ভয়। সুদি অর্থব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাবে এখন পুরো পৃথিবীই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। বাস্তবতা হলো, যারা এই অভিশাপ থেকে বেঁচেও থাকে, তারা আর্থিকভাবে দুর্বল ও অসচ্ছল হয়ে পড়ে। কেননা সুদি ও পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ধনাঢ্যকে আরও ধনবান আর দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে তোলে। এই অভিশাপের দরুণ সমৃদ্ধশালী ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অনেক নাগরিক পেটভরে খেতে পারে না। বাজারে খাবারের অভাব না থাকলেও তাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই। সামির মাযহার কানতাকজী বলেন,

تَقْدِيسُ الْمَالِ فِي يَدِ طَبَقَةٍ مَعِيْنَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رُوسِ الْمَالِ، وَكُلُّ هَذِهِ الْمُضَارَّاتُ دَعَتْ بَعْضَ الْاِقْتِصَادِيِّينَ إِلَى الدَّعْوَةِ إِلَى تَخْفِيفِ الْفَوَائِدِ إِلَى الصَّفْرِ.

“নির্দিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের কাছে সম্পদ আবদ্ধ থাকা প্রকারান্তরে আরেক (দরিদ্র) শ্রেণি এ সম্পদের সুবিধা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকা।”^{২৬} সুদি ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র যেন নাগরিকদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এ দিকে

ঋণগ্রস্তরা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে আরও ঋণ নেয়। ফলে তাদের উপার্জনের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। সুদি ব্যবস্থার কিছু প্রভাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

এক. সুদি কারবারি ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মতো মেহনত করে না। বরং কোনো মেহনত ছাড়াই অবৈধ উপায়ে প্রতিনিয়ত মুনাফা লাভ করে।

দুই. সুদি লেনদেনের ক্ষেত্রে অসহায় ও নিঃস্ব শ্রেণি থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা এদেরকে সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিন. সুদের মধ্যে ক্ষমতাবানরা দরিদ্র শ্রেণির রক্তচোষে। ফলে দরিদ্রশ্রেণি আরও দরিদ্র হয়।

চার. সুদের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণির মনে বিভ্রাটের শ্রেণির প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে রূপাত, হত্যা ও হানাহানির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

পাঁচ. সুদি ঋণের মাধ্যমে মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ হারিয়ে যায় এবং যে-কোনোভাবে স্বার্থ হাসিল করা মূখ্য হয়ে ওঠে।

১০. সুদ হারাম হওয়ার কারণ

সুদি লেনদেন পারিবারিক, সামাজিক ও চারিত্রিক সকল প্রকার অধঃপতনের মূল। এর মাধ্যমে বিভ্রাটের শ্রেণি আরও আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থবাদী এবং সম্পদের প্রতি অগ্রহী হয়ে ওঠে। ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ এমন মহামারীর আকার ধারণ করেছে, যা থেকে মুক্ত থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। সাধারণ রাষ্ট্রগুলো ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ থেকে বিলাসিতার জন্য ঋণ নিয়ে অনাগত প্রজন্মকে ঋণের বোঝাসহ জন্মগ্রহণের সার্টিফিকেট দিয়ে রেখেছে। আরো পরিতাপের বিষয় হলো, পুরো পৃথিবীতে চলমান সুদি লেনদেনের অধীনে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এবং কনভেনশনাল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামের লেবাস পরিয়ে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা নাম দেওয়া হয়েছে।

১১. সুদি-ব্যবস্থা বিলুপ্তির জন্য নবিজীর পদক্ষেপ

রাসুল সা. মদিনায় হিজরত করার পর ইসলামি রাষ্ট্রকে সুদমুক্ত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন,

এক: সুদের অপকারিতা বর্ণনা

মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ভয় এমন এক গুণ, যার মাধ্যমে তারা সকল প্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে। নবি সা. সুদের অনিষ্টের প্রতি মানুষকে সতর্ক করতেন। এ জাতীয় চারিত্রিক কলুষতার ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করতেন। যাতে মানুষ চারিত্রিক শুদ্ধতা লাভ করতে পারে। নবিজী সা. বলেন, **اَلشَّيْبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَشَرُّ الْمَكَايِبِ كَسْبُ الرِّبَا**, “যৌবন উন্মাদনার একটি অংশ। আর সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন যা সুদের মাধ্যমে অর্জিত হয়।”^{২৭}

দুই: সুদখোরদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ মেরাজের রাতে সপ্তম আসমানে^{২৮} নবিজী সা. কিছু লোক দেখতে পান, যাদের পেট গম্বুজের মতো উঁচু এবং সিসার মতো স্বচ্ছ। পেটগুলো সাপ এবং বিচ্ছুতে পূর্ণ। এরা উঠে দাঁড়াতে চাইলেও উঠতে পারছিল না। রাসুল সা. এদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে জিবরাইল আ. বলেন, এরা সুদখোর।^{২৯} সিরাত-গবেষক আবুল কাসিম সুহাইলি বলেন, **أَكَلَةُ الرِّبَا، وَفِيهَا حَيَاتٌ تَرَى خَارِجَ الْبُطُونِ**, “সুদখোরদের পেটে সাপ ছিল, যা বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।”^{৩০}

তিন: পূর্ববর্তী শরিয়তে সুদের অবৈধতা

সুদ এমন পাপ, যা শুধু ইসলামি শরিয়তেই নিষিদ্ধ নয়; বরং পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহেও নিষিদ্ধ এবং হারাম ছিল। রাসুল সা. ইহুদি পণ্ডিতদের থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন যে, মুসা আলাইহিস সালামকে যে ‘নয়াটি নিদর্শন’ দেওয়া হয়েছিল, তন্মধ্যে সুদ থেকে বেঁচে থাকা ছিল অন্যতম। তাই সুদের নিষেধাজ্ঞা নতুন কোনো বিধান নয়, বরং তা পূর্বের শরিয়তসমূহ থেকে পরম্পরাগতভাবে এসেছে।^{৩১}

চার: খ্রিস্টানদেরকে সুদ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ

নবিজী সা. প্রকৃত নবি কি না, তা যাচাই করার জন্য নাজরান থেকে খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল আসে। এরা নবিজীর নবুওয়ত যাচাই করার জন্য ‘মুবাহালা’^{৩২} করবে বলে মনস্থ করে। কিন্তু রাসুল সা.-এর নবুওয়ত ও রিসালাতের সত্যতা দেখতে পেয়ে তারা ‘মুবাহালা’ করা থেকে বিরত থাকে। তারা প্রতি বছর দুই হাজার বস্ত্র আদায়ে তাঁর সাথে সন্ধি করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই সন্ধিতে আরও কিছু শর্ত আরোপ করেন। তন্মধ্যে সুদ না খাওয়া অন্যতম। তিনি বলেন, **وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا يَتَعَامَلُوا بِهِ**, “তারা সুদ খাবে না এবং সুদি লেনদেন করবে না।”^{৩৩} আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদলও রাসুল সা.-এর সাথে সন্ধি করতে এলে নবিজী তাদেরকেও সুদ থেকে বেঁচে থাকার শর্ত জুড়ে দেন। ইয়াহইয়া আমিরি বলেন,

قال البغوي: فصالحهم رسول الله ﷺ، وقال: والذي نفسي بيده أن العذاب قد تدلى على أهل نجران، ولوتلاعنوا لمسخوا قرودة وخنازير.

বাগাবি বলেছেন, নবিজী সা. তাদের সাথে সুদি লেনদেনে না জড়ানোর শর্তে সন্ধি করেন। তিনি বলেন সে সত্ত্বার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ নাজরানবাসীর শাস্তি ঘনিয়ে এসেছে। তারা যদি অস্বীকার করত, তবে বানর এবং শূকরে পরিণত হতো।^{৩৪}

বর্তমান যুগে সুদ-ঘুষ এবং জুয়ার মতো নিকৃষ্ট বিষয়গুলো অনেকের ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাসুল সা.-এর জীবনেই রয়েছে মুমিনদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। নবিজী পৃথিবীতে তেইশ বছর নবুওয়তি জীবন অতিবাহিত করেছেন। মক্কায থাকাকালে মুশিরকরা নবিজী সা.-কে ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু তিনি ধন-সম্পদের লোভকে ছুঁড়ে মেরেছেন। তিনি শিআবে আবি তালিবে তিন বছর কারান্তরীন ছিলেন। অত্যাচার ও জুলুমের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন সাহাবিরা। হিজরত ও শাহাদতের মতো তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁদের। তবুও তাঁরা কখনো চারিত্রিক কলুষতার সাথে সমঝোতা করেননি। তায়িফের লোকেরা সুদি কারবারে লিপ্ত ছিল। তাদের সাথে সন্ধি করার সময় রাসুল সা. সুদে লিপ্ত না হওয়ার শর্তারোপ করেন।^{৩৫}

১২. সুদি-ব্যবস্থার প্রতি নিরুৎসাহ

রাসুল সা.-এর জীবনাচার থেকে বোঝা যায় তিনি মদের অপকারিতা ও সমূহ ক্ষতি মুমিনদের হৃদয়ে গোঁথে দেওয়ার জন্য মদপানকারী, সরবরাহকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা এবং তার পাত্রের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। তদুপ সুদি লেনদেনে সহায়তাকারী, সুদের চুক্তি সম্পাদনকারী এবং সুদের সাক্ষী সকলের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। রাসুল সা. বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. مُسْلِمٌ

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুল সা. সুদ ভক্ষণকারী, তার উকিল, লেখক ও সাক্ষী সকলের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, গুনাহের ক্ষেত্রে এরা সকলেই সমান।”^{৩৬}

মদিনায় যখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপীকৃত উট আসতে থাকে। তখনও নবিজীর ঘরে অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্য ছিল। রাজা বাদশাহদের মতো দাপট ও ক্ষমতা, দরবারের রেশমি পর্দা, নকশাকৃত গালিচা, হিরে-মোতি খচিত মুকুট রাসুল সা.কে সামান্য প্রভাবিত করতে পারেনি। এ জন্যই তাঁর মৃত্যুকালে বরাদ্দকৃত অস্ত্র, বাহন হিসেবে ব্যবহৃত খচ্চর আর সামান্য জায়গা ছাড়া তেমন কিছু ছিল না। এসবও সদকা করে দেওয়া হয়। সুদ তখন বহুল প্রচলিত ও সহজ একটি ব্যাপার ছিল। ইয়েমেনের নাজরানি ব্যবসায়ীরাও সুদ থেকে প্রচুর মুনাফা লাভ করত। নবিজী সা. তাদের সাথে সুদে জড়িত না হওয়ার শর্তে সন্ধি করেন।^{৩৭} আইনবিদ এবং হাদিসবিশারদগণ রাসুল সা.-এর সিরাত থেকে প্রাপ্ত এই শিক্ষার প্রতি কঠিনভাবে আমল করে দেখিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর ব্যাপারে বলা হয়

“ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির মাধ্যমে লাভবান হওয়া এবং সুদে শামিল হয়ে যাবার আশঙ্কায় তিনি তার কাছে কখনও যেতে হলে তার ছায়ায়ও বসতেন না।”^{৩৮}

১৩. সুদবিহীন সমাজ গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা

ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠন করতে চায়। যে সমাজে জনগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করবে। বিত্তশালী ও ধনাঢ্য শ্রেণি অনাথ, নিঃস্ব ও দরিদ্র মানুষদের অধিকার তাদের দুয়ারে পৌঁছে দেবে। অবৈধ মুনাফাখোরি ও শ্রেণিবৈষম্য থাকবে না। বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনা স্বাধীন ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। এতিম, অনাথ, বিধবা এবং কর্মহীন মানুষের ভাতা নির্ধারিত থাকবে। সামাজিক বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র জিরো-টলারেন্স অবস্থানে থাকবে। চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, রাহাজানি, পুঁজিবাদ, সুদ-ঘুষ এবং দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

পৃথিবীর সকল মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে আজ সুদের অভিশাপ ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাঝেই সুদি লেনদেন বৈধ নয় এ ব্যাপারে সকল ইসলামি পণ্ডিত একমত। তবে অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে এমন লেনদেন বৈধ কি না? এ ব্যাপারে মুফতি তাকি উসমানি বলেন,

“অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে সুদ গ্রহণ করা যাবে কি না এ ব্যাপারে ফকিহগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ এর বৈধতা দিলেও তা সুদের বৈধতা প্রদান করে নয়। বরং শত্রু শাসিত রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ধন-সম্পদ তাদের সম্মতিতে হস্তগত করা এই ফকিহদের মতে বৈধ। এই সম্পদ তারা যেভাবেই দিক, তা বিবেচ্য নয়। তারা একে সুদ মনে করলেও মুসলমানরা ‘শত্রু দেশের অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ’ এই মূলনীতির অধীনে গ্রহণ করতে পারে। তাই কোন উপায় না থালকে এই মত গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।”^{৩৯}

১৪. উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষিত হবার পর নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলামের বিধানাবলি পরিবর্তনের সুযোগ নেই। অসদাচার, মদ্যপান, জুয়া ইত্যাদিকে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে যেমন বৈধ করা যাবে না, তদ্রূপ সুদি অর্থ-ব্যবস্থার পথ প্রসারিত করার জন্যও এর নতুন কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর সুযোগ নেই। বর্তমান পৃথিবী সুদী অর্থব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাবে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। বাস্তবতা হলো, যারা এই অভিশাপ থেকে বেঁচেও থাকে, তারা আর্থিকভাবে দুর্বল ও অসচ্ছল হয়ে পড়ে। কেননা সুদি ও পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ধনাঢ্যকে আরও ধনবান এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে তোলে। কাজেই, ইসলামের লেবাস ও নাম ব্যবহার করে নিষিদ্ধ কোনো বিষয়কে বৈধতা দেওয়ার অবকাশ নেই।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ মুসা ইবনু রাশিদ আল-আজীমী, *আল-লু'লুউল মাকনুন ফি সিরাতিনা বিয়্যাল মা'মুন*, ১ম খণ্ড (কুয়েত: আল-মাকতাবাতুল আমিরিয়াহ, ১ম সং, ১৪৩২ হি.), পৃ. ৩৬২।
- ^২ বদরুদ্দিন আইনি হানাফি, *শারহুল মুহাজ্জাব*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল ইয়াহইয়ায়ি তুরাস, ১৯৭৮), পৃ. ৭৬।
- ^৩ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আজ-জুবাইদি, *তাজুল উরুজ মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, ৩৮-তম খণ্ড (বৈরুত: দারুল হিদায়াহ, তা.বি.), পৃ. ১১৮।
- ^৪ আবু মুহাম্মাদ মাক্কি ইবনু আবি তালিব আল-কায়রাওয়ানি আল-মালিকি আল-কুরতুবি, *আল-হিদায়াহ ইলা বুলুগিন নিহায়াহ ফি ইলমি মাআনিল কুরআন ওয়া তাফসিরিহ ওয়া আহকামিহি ওয়া জুমালিনমিন ফুনুনি উলুমিহি*, ১ম খণ্ড (শারজাহ: কুল্লিয়াতুশ শরিয়া ওয়া দিরাসাতিল ইসলামিয়া, জামিয়া আশ-শারিকা, ১ম সং, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯০৭।
- ^৫ আহমাদ ইবনু আলি আবু বকর আর-রাজি আল-জাসাস আল-হানাফি, *আহকামুল ২য় খণ্ড* (বৈরুত: দারুল ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১৪০৫ হি.), পৃ. ১৮৯।
- ^৬ মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, আল-মাজহারি, *আত-তাফসির আল-মাজহারি*, ১ম খণ্ড (ইসলামাবাদ: মাকতাবাতুর রশিদিয়া, ১৪১২ হি.), পৃ. ৪১৯।

- ৭ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল ইবনু কাসির, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩২৩।
- ৮ মুহাম্মদ ইবনু উমর ইবনু মুবারাক আল-হুযায়রি আল-হাজরামি, *হাদায়িকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফি সিরাতিন নাবিয়্যিল মুখতার*, ১ম খণ্ড (জেদ্দা: দারুল মিনহাজ, তা.বি.), পৃ. ৩৬।
- ৯ শিবলি নোমানি ও সাইয়িদ সুল্লাঈমান নদভি, *সিরাতুন নাবী*, ৪র্থ খণ্ড (লক্ষনৌ: মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২০১।
- ১০ আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আর-রাজি, *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতু নাজ্জার মুসতাফা আল-বাজ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৫৫১।
- ১১ তদেব।
- ১২ বাইবেল: অধ্যায় ২২, কিতাবুল খুরুজ, আয়াত ১৯।
- ১৩ ওল্ড টেস্টামেন্ট: অধ্যায় ২৩, কিতাব আল ইসতিসনা, আয়াত ১৯।
- ১৪ জাবুর: অধ্যায়, ১৫, আয়াত ৫।
- ১৫ সালিহ ইবনু তাহা আবদুল ওয়াহিদ, *সুবলুস সালাম মিন সহিহি সিরাতি খাইরিল আনাম*, ১ম খণ্ড (দামেশক : মাকতাবাতুল গুরাবা, ১৪২৮ হি.), পৃ. ২৪৪।
- ১৬ ইনজিল লুক: ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫।
- ১৭ সূরাহ নিসা: ১৬০-১৬১।
- ১৮ আবুল হাসান মুকাতিল ইবনু সুলাইমান আল বালখি, *তাফসির মুকাতিল ইবনু সুলাইমান*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: ইহইয়ায়িত তুরাস, ১৪২৩ হি.), পৃ. ২২৬।
- ১৯ সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-তাবরানি, *আল-মু'জাম আল-আওসাত*, ৭ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা.বি.), হাদিস নং ৭৬৯৫, পৃ. ২৪৯।
- ২০ আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল, *মুসনাদু ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল*, ১৬ খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালালাহ, ১৪২১ হি.), পৃ. ২৫৮।
- ২১ সূরাহ নিসা: ১৬১
- ২২ সূরাহ আলে ইমরান: ১৩০
- ২৩ সূরাহ বাকার: ২৭৮
- ২৪ সহিহুল বুখারি, তদেব, হাদিস নং: ৬৪৯৭।
- ২৫ সূরাহ আর-রুম : ৩৯
- ২৬ সামির মাজহার কানতাকজি, *জাওয়াবিতুল ইকতিসাদ আল-ইসলামি ফি মুআলাজাতিল আজিমাত আল-মালিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ*, (দামেশক: দারুল কলম, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩।
- ২৭ মুহাম্মদ ইবনু উমর আল ওয়াকিদ, *আল-মাগাজি*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল আলামি, ৮ম সং, ১৪০৯ হি.) পৃ. ১০১৬।
- ২৮ জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, *আল-খাসায়িস আল-কুবরা*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৯০।
- ২৯ আবদুল মালিক ইবনু হিশাম আল-মাআফিরি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি ইবনি হিশাম*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাতবাতাতু মুসতাফা আল-বাবি আল-হালাবি ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ৪০৫।
- ৩০ আবুল কাসিম আবদুর রাহমান আস-সুহায়লি, *আর-রাওজুল উনুফ ফি শারহিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ লি ইবনি হিশাম*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত তুরাস আল-আরাবি, ২০০০), পৃ. ৩৮৩।
- ৩১ আল-খাসায়িস আল-কুবরা, তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।
- ৩২ 'মুবাহালা' শব্দটি আরবী মূলশব্দ 'বাহলাহ' হতে এসেছে যার অর্থ 'অভিশম্পাত' করা। এর অন্য অর্থগুলো হল কামনা করা, ইচ্ছে করা, আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, চাওয়া বা নিজেদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করা।
শরীয়তের পরিভাষায় বলা যায় যে, যখন দু'জন ব্যক্তি নিজের বক্তব্যকেই সঠিক ও অপরের বক্তব্যকে মিথ্যা বলে দাবি করে তখন তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর গযব কামনা করতে পারে এই বলে যে, হে আল্লাহ আমি বা আমরা যদি সং পথের পরিবর্তে মিথ্যার দাবীতে অটল থাকি তাহলে আমার বা আমাদের ধ্বংস ও গজবের মাধ্যমে শেষ করে দিন, মূলত এটাই মাবাহালা। (তাজুল উরুজ মিন জাওয়াহিরিল কামুস, তদেব, ৩৮ খণ্ড, পৃ. ২২২)

-
- ৩৩ তাকিয়ুদ্দিন আবুল আব্বাস আল-মাকরিজি, ইমতাদুল আসমা বিমা লিন্‌াবিয়্য ﷺ মিনাল আহওয়াল ওয়াল আমওয়াল ওয়াল হাফাদাহ ওয়াল মাতা, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৯৫।
- ৩৪ ইয়াহইয়া ইবনু আবু বকর আল-আমিরি, বাহজাতুল মাহাফিল ওয়া বুগইয়াতুল আমাসিল ফি তালখিস আল-মুজিজাত ওয়াস সিয়্যার ওয়াশ শামায়িল, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ১৬।
- ৩৫ আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া জাবির আল-বালাজুরি, ফুতুহুল বুলদান, (কায়রো: দারু মিসর, ১৯৫৬ খ্রি.), পৃ. ২৩।
- ৩৬ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আশ-শামি, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ, ৯ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৬।
- ৩৭ ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনু আশআস সিজিস্তানি, সুনানু আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ফি আখজিল জিয়ইয়াহ, হাদিস নম্বর: ৩০৪১।
- ৩৮ ইসমাইল হাক্কি, রুহুল বায়ান, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৩১।
- ৩৯ মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, হামারা মাআশি নিজাম, (করাচি : মাকতাবা-ই দারুল উলুম, ১৪৩২ হি.), পৃ. ৭৯।

তুলনামূলক সাহিত্যে আরব-ধারা ও প্রকৃতি [Arabic-style and Nature in Comparative Literature]

ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা*

[Abstract: Comparative literature emerged in Europe in the first half of the nineteenth century. It was later perfected in the early 20th century by the pioneers of the French historical school. From its inception for more than half a century only the historical method was dominant, stimulated mainly by American poets. The French historical school eventually gave rise to other schools that competed with it, such as American, European, German, etc. But no one thought of establishing an Arabic curriculum in comparative literature studies. A reference to the history of the comparative literary study of the Arabs makes it clear that the pioneers of the Renaissance are ahead of others in such studies. This study attempts to define the characteristics of the Arab school in the field of comparative literature. In fact, the influence of comparative literature has been observed since the beginning of Arabic literature. Arabs used foreign words because of their association with other nations. The ancient Arabs would have been the originators of comparative literature if they addressed the forms in which the Arabs exchanged with others.]

Keywords: Comparative literature, Influence, Arab school, Comparisons, Renaissance.

১. ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে তুলনামূলক সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। পরবর্তীতে ফ্রান্সে তুলনামূলক সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তা পূর্ণতা পায়। সূচনাকাল থেকে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তুলনামূলক সাহিত্যে ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ধারাই প্রভাবশালী ছিল। কালক্রমে এ ধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকান, স্লাভিক, জার্মান ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। তুলনামূলক সাহিত্য পাঠে আরবী পাঠ্যক্রম প্রতিষ্ঠার কথা তখনও কেউ ভাবেনি। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আরব বিশ্বে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের উদ্ভব হয়। প্রথমদিকে বিশেষ করে আরব ও ইউরোপীয়দের মহাকাব্যের মধ্যে এবং প্রাক-ইসলামী কবিতা ও গ্রিক কবিতার মধ্যে তুলনা করতে দেখা যায়। অবশ্য বর্তমানে তুলনামূলক সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও এটি মিডিয়া, ব্যবসা, বিশ্ব স্বাস্থ্য; এমনকি একাডেমিক ক্ষেত্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। আরবদের তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের ইতিহাস উল্লেখ করলে স্পষ্ট হয়— রেনেসাঁর অগ্রদূতরা তুলনামূলক সাহিত্য গবেষণায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তাদের মাধ্যমেই পর্যায়ক্রমে তুলনামূলক সাহিত্যে আরব-ধারা ও প্রকৃতি সমৃদ্ধি লাভ করে।

২. তুলনামূলক সাহিত্য পরিচিতি

তুলনামূলক সাহিত্য (Comparative Literature) হলো, যেখানে দুই বা ততোধিক ভাষাগত, সাংস্কৃতিক বা জাতিগত পটভূমি থেকে আগত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা বা অনুসন্ধান করা হয়। সাধারণত তুলনামূলক সাহিত্যে ভিন্নতর ভাষার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হলেও একই ভাষাভাষী ভিন্নতর জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্য নিয়েও আলোচনা হতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায়— বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস দু’শো বছরের পুরোনো হলেও তুলনামূলক সাহিত্য চর্চার বিষয়গত আঙ্গিককে উল্লেখ করে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। বাংলাভাষায় তুলনামূলক সাহিত্য চর্চা নিয়ে ১৯০৭ সালে ‘বিশ্বসাহিত্য’ প্রবন্ধ রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে তিনি বলেন— “ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।”

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়, “তুলনামূলক সাহিত্য হলো পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্যের সাথে নিজের জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য নিজের মাতৃভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের সীমারেখার মধ্যে অধ্যয়ন।” তুলনামূলক সাহিত্যের অন্য সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “তুলনামূলক সাহিত্যের ধারণাটি ঐতিহাসিক। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে বর্তমানে বা অতীতে সৃষ্টি হওয়া সাদৃশ্য ও সম্পর্ক খুঁজে বের করাই হলো তুলনামূলক সাহিত্য।”^২ সুতরাং এক সাহিত্য অপর কোন সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বা অন্য সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করার অনুসন্ধানই তুলনামূলক সাহিত্যের কাজ। সাহিত্যের এ আদান-প্রদান ও প্রভাব নানা ভাবে হতে পারে। যেমন— এক. সাহিত্যের কোনো মৌলিক অনুশঙ্গ গ্রহণের মাধ্যমে। দুই. সাহিত্য মতবাদ, সাহিত্য চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে। তিন. কোন বিষয়বস্তু বা অবস্থান বা সাহিত্যের কোন চরিত্র গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে। সাহিত্যের এ ধারা ‘তুলনামূলক সাহিত্য’ বা ‘Comparative Literature’ হিসেবে বিশ্ব সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেছে।^৩

৩. তুলনামূলক সাহিত্য ও আরব ঐতিহ্য

আরবী সাহিত্যের আবির্ভাবের পর থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আরবরা অন্যান্য জাতির সাথে মেলামেশার কারণে তাদের লেখকরা ফার্সি ও গ্রিক শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিকরা পাঠের আদান-প্রদান বা বিনিময় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেনি। তবে আল-জাহিয (মৃ. ২৫৩ হিজরি/৮৬৭ খ্রি.) তার ‘আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন’ গ্রন্থে পারস্য, ভারত, গ্রিক ও রোমানদের বাগ্মীতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এসব বাগ্মীতা ও আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।^৪ যদিও তার সময়ের চারটি প্রধান জাতির সাহিত্যের মধ্যে এই তুলনা কোনো পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে হয়নি। আল-জাহিয ফারসি, গ্রিক ও আরবী কবিতার তুলনা করেছেন। তিনি এসবের মধ্যে ছন্দ ও ছড়ায় ভিন্নতা প্রত্যক্ষ করেছেন।^৫ তিনি এসব ভাষার মর্ম উপলব্ধি করে অনেক জাতির বাগ্মীতার প্রশংসা করেছেন আবার অনেকের ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এই তুলনা কালে বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তার মতামতেও কোনো বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি নিরপেক্ষভাবেই মূল্যায়ন করেছেন। অন্যদিকে তিনি ‘আল-বুখালা’^৬ গ্রন্থে পারসিকদের চিত্র সম্পর্কে কথা বলেছেন। এগ্রন্থটিকে প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা অন্যদের সম্পর্কে মতামত দেয়। আসলে আল-জাহিয পারসিক উপাদানের সমালোচনা করতে চাননি। তিনি তাদের গুণাবলীও উল্লেখ করেছেন এবং তার সময়ের কৃপণ আরবদের সম্পর্কেও কথা বলেছেন।^৭ আল-জাহিয ‘আল-হায়ওয়ান’ গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে, কবিতার অনুবাদ করা উচিত নয়। এতে কবিতার সৌন্দর্য হারিয়ে যায় এবং তা সাধারণ বক্তৃতায় পরিণত হয়। তবে কোনো সত্য না হারিয়ে গদ্যের অনুবাদ করা যায়।^৮ আল-জাহিয আরবী কবিতা অনুবাদের অসুবিধার কথা এবং অনুবাদের প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেন,

ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة

والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء غاية، ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما

অর্থাৎ অনুবাদের অবশ্যই একই অনুবাদে তার ব্যাখ্যা এবং একই জ্ঞানে তার জ্ঞানের ভারসাম্য থাকতে হবে এবং তাকে উৎস ও লক্ষ্য ভাষায় অধিক জ্ঞানী হতে হবে। দুই ভাষাতেই সমান পারদর্শী হতে হবে। উভয় ভাষায় কথা বলতে পারলে তার পারদর্শিতা অনুমান করা যাবে।^৯ আল-জাহিয সর্বপ্রথম অনুবাদের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং কবিতা মূল ভাষায় পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রাচীন আরবদের অনুরাগ জানতে আরব-ছাত্রদের অবশ্যই আল-জাহিযের উল্লিখিত গ্রন্থে ফিরে যেতে হবে। শুধু বিদেশী ভাষা ও অনুবাদ প্রসঙ্গ নয়, বরং উপাদানের ক্ষেত্রেও আল-জাহিযকে প্রথম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যিনি তার সময়ের প্রধান প্রধান জাতি যেমন— আরব, পারস্য, ভারত ও রোমানদের মধ্যে তুলনা করেছিলেন। এভাবে আল-জাহিয হাজার বছর আগেই তুলনামূলক সাহিত্যের পথপ্রদর্শকদের অন্যতম হয়েছেন। ইবনুল-আসির (মৃ. ৬৩৭ হি./১২৩৯ খ্রি.) তাঁর ‘আল-মাসাল’ গ্রন্থেও গ্রিক ও আরব লেখকদের অলঙ্কৃত অর্থ এবং এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।^{১০} তুলনামূলক সাহিত্যে আরবদের ধারা এবং আরবী ও ফারসি কবিতার দীর্ঘতা ও স্বল্পতার কথা তুলে ধরেছেন।^{১১}

৪. আরবদের তুলনামূলক সাহিত্য

প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে আরবী সাহিত্যে চালু হওয়া তুলনামূলক পর্যালোচনাই আরবী সাহিত্যকে বিকশিত করেছে। এবিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হলো- কাযি আল-জুরজানি (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.) রচিত ‘আল-ওসাতাতু বাইনাল মুতানাক্বি ওয়া খুসুমুহু’ (আল-মুতানাক্বি ও তার বিরোধীদের মধ্যে মধ্যস্থতা) এবং আল-আমিদি (মৃ. ৩৭০ হি./৯৮১ খ্রি.) রচিত ‘আল মুয়াযানাতু বাইনা শি’রি আবি তাম্মাম ওয়াল-বুহতুরি’ (আবু তাম্মাম ও আল-বুহতুরির কবিতার মধ্যে তুলনা)। আল-জুরজানি কবি আল-মুতানাক্বি ও তার বিরোধীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে আল-আমিদি কবি আল-বুহতুরি ও আবু তাম্মামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।^{১২} এসব তুলনা একটি নান্দনিক প্রকৃতির ছিল। এখানে প্রভাব বিস্তারের কোনো ঘটনা নেই। এটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মৌলিকতা সম্পর্কে আলোচনা। এই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকদের কাছে পরিচিত ছিল না। প্রাচীন আরব সমালোচকরা তাদের মূল্যায়ন আরবী ভাষার লেখকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। আরব কবির অন্যান্য ভাষা যেমন ফারসি, হিন্দি ও গ্রিক থেকে কী গ্রহণ করেছিলেন তা আলোচনা করেনি। কিছু আরব কবি ছিলেন যারা ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং তাদের কেউ কেউ গ্রিক চিন্তাধারা অধ্যয়ন করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উমাইয়া যুগ থেকে আরবদের করা অনুবাদ ছাড়াও ভারতের সাহিত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন। আসলে আরবরা অন্যদের সাথে যেসব রূপ বিনিময় করেছে প্রাচীন আরবরা তাদের তুলনামূলকভাবে সম্বোধন করলে তারাই তুলনামূলক সাহিত্যের দরজায় প্রথম কড়া নাড়তো।

৫. আরবদের তুলনামূলক সাহিত্য ধারার সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরব বিশ্বে তুলনামূলক সাহিত্য গবেষণা করতে দেখা যায়। সংস্কারের প্রবক্তারা ইউরোপ জয়ের মাধ্যমে আরব পাঠককে পশ্চিমাদের আচার-আচরণের সাথে পরিচিত করার চিন্তা করেছিলেন। তা যখন উন্নয়নের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন মহাসাগর থেকে উপসাগর পর্যন্ত আরবী সাহিত্য দীর্ঘ পতনের পর্যায়ে পড়েছিল। আরব রেনেসাঁর প্রবর্তকদের আরব বিশ্বের তুলনামূলক সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা আরবী সাহিত্য ও আধুনিক পশ্চিমা সাহিত্যের মধ্যে মিল-অমিলের অধ্যয়নের উপর দৃষ্টি দিয়েছিল। তাঁরা প্রভাব বিস্তার করা বা প্রভাবিত হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হননি। কারণ, তাঁরা একটি জাতির সাহিত্যকে অন্য জাতির সাহিত্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দেননি। বরং তাঁরা ফারাসি ধারা সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যস্ত ছিল।^{১৩} যদিও প্রাথমিক আরব অগ্রগামীদের অধ্যয়ন আরব রেনেসাঁর সাথে যুক্ত ছিল এবং তাঁদের পশ্চিমা সাহিত্য থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু জাতির সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমান্তরাল অধ্যয়নের উপর তাঁদের নির্ভরতা এবং প্রভাব বিস্তার করা বা প্রভাবিত হওয়াকে স্পর্শ না করা বোঝায় যে তাঁরা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আমেরিকান সমালোচনা বা মূল্যায়ন প্রবণতার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। কিন্তু তাঁদের পরে আসা তুলনাকারীরা তুলনামূলক সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরব রেনেসাঁর অগ্রদূতদের অনুসরণ করেনি বরং তারা ফারাসি বা আমেরিকান প্রবণতার নীতি অনুসরণ করেছিল। রিফা’আ রাফি আত-তাহতাভি, আলী মুবারক, আদিব ইসহাক, আহমেদ ফারিস আশ-শিদয়াক, ইয়াকুব সররুফসহ অন্যরা আরব সংস্কৃতির কিছু দিককে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে তুলনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মিল-অমিল অধ্যয়ন করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত এসব গবেষণাকে আরবদের মধ্যে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম সূচনা বলে মনে করা হয়। রিফা’আ রাফি আত-তাহতাভি (মৃ. ১২৯০ হি./১৮৭৩ খ্রি.) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে তুলনামূলক গবেষণার জন্য প্রথম বলে বিবেচিত। তিনি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে একটি ছাত্র প্রতিনিধি দলের সাথে ফ্রান্সে ভ্রমণ করেন এবং ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মিশরে ফিরে বেশ কয়েকটি ফারাসি রচনা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *تخليص الإبريز في تلخيص أخبار العرب* ‘তাখলীস আল-ইবরিজ ফি তাখলিসি আখবারি বারিজ’ লিখেছেন যা আরব ও পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে একটি অতিমাত্রার তুলনা। এটি ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের সূচনালগ্নে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নবজাগরণের আরব অগ্রদূতরা পশ্চিমা সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং আরব ঐতিহ্যের সাথে তুলনা করেন। তাঁরা পশ্চিমা ঐতিহ্য থেকে অনুবাদ ও ধার নিতে আগ্রহী ছিলেন।

আরব রেনেসাঁর এসব লোকেরা প্রভাব বিস্তার করা বা প্রভাবিত হওয়া নিয়ে উদ্ভিগ্ন ছিলেন না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পশ্চিমাদের বাগিতার সাথে পাঠকদের পরিচিত করা এবং আরব সাহিত্যের নবজাগরণে এসব থেকে উপকৃত হওয়া। ইয়াকুব সররুফ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে আল-ইনতিক্বাদ (সমালোচনা) শিরোনামে ‘আল-মুকাতাতাফ’ ম্যাগাজিনে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। যেখানে তিনি আরব ও পাশ্চাত্য সমালোচনার তুলনা করেছিলেন এবং আরব সমালোচকদেরকে পশ্চিমা সমালোচকদের অনুকরণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।^{১৪} একইভাবে নাজিব আল-হাদ্দাদ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আল-বায়ান ম্যাগাজিনে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। যার শিরোনাম ছিল ‘মুকাবালাতুন বাইনা শি’রিল আরবী ওয়াশ-শি’রিল ইফরিনজি’ (আরবী ও পশ্চিমা কবিতার মধ্যে তুলনা)। তিনি তাঁর গবেষণাকে আরবী কবিতা ও পাশ্চাত্য কবিতার মধ্যে মিল-অমিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।^{১৫} তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল- ফরাসি সংস্কৃতির সাথে আরব পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আল-মুকাতাতাফ ম্যাগাজিন ‘বালাগাতুল ‘আরব ওয়াল ইফরিনজি’ (আরব ও ইউরোপীয় জাতির অলঙ্কারশাস্ত্র) শিরোনামে একটি ধারাবাহিক গবেষণা প্রকাশ করে- যা আহমাদ কামিল, খলিল সাবিত ও নিকোলা ফায়য়াসদের মধ্যে বিতর্ক ছিল। আহমাদ কামিল আরবী ও ইউরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করেন এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন। এছাড়া আরব অলঙ্কারশাস্ত্র ইউরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের চেয়ে উচ্চতর হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।^{১৬} অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ছিল না, বরং ছিল নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যক্তিগত। খলিল সাবিত আরব ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সাহিত্যের স্বাদের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, তুলনার উদ্দেশ্য, একটি সাহিত্যের উপর অন্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো নয়। বরং তুলনার উদ্দেশ্য হলো, এটি থেকে উপকৃত হওয়া। তিনি পশ্চিমা সাহিত্যকর্মের আরবীকরণেরও আহ্বান জানান যেন আরব পাঠক তাদের চিনতে পারে।^{১৭} নিকোলা ফায়য়াস যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কেবল অনুবাদের উপর নির্ভর না করে মূল পাঠ্যটিও উল্লেখ করা উচিত। কারণ অনুবাদ সাহিত্যের মূলপাঠের অনেক বৈশিষ্ট্য হারায়। তিনি মনে করেন, আরবী সাহিত্যের প্রতি আহমাদ কামিলের উগ্রতা তার ফ্রান্সিস সংস্কৃতির অজ্ঞতার কারণেই হয়েছে।^{১৮} এই সময়ের পথপ্রদর্শকদের মধ্যে লেখক ইসহাকও ছিলেন। যিনি ‘আল-উসলুব ওয়া জাহিরাতুল বাদি’ (Style and the Phenomenon of the Badi) নামে একটি বই লিখেছেন। এছাড়া আহমাদ ফারিস আল-শিদিয়াক দীর্ঘ ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পরে তুলনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে সম্ভবত তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মধ্যে একটি হল ‘মুকাবালাতুন বায়ানাল মাদ্হিল আরবী ওয়াল গারবি’ (আরব ও পশ্চিমাদের প্রশংসার মধ্যে তুলনা)।

৬. বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তুলনামূলক সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিমাদের সাথে যোগাযোগ উন্মোচিত হওয়ার পর অনুবাদ ও অভিযোজন আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। তুলনামূলক গবেষণায় আরব পণ্ডিতদের আগ্রহ ও অধ্যয়ন অনেক বেড়ে যায়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সাঈদ আল-খোরি আশ-শারতুনি ‘আল-মুকাতাতাফ’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ‘আল-বায়ানুল ‘আরাবি ওয়াল বায়ানুল ইফরিনজি’ (আরব বিবৃতি ও পশ্চিমা বিবৃতি) শিরোনামের একটি নিবন্ধে আরব বিবৃতি এবং ইউরোপীয় বিবৃতির মধ্যে মিল-অমিল নিয়ে আলোচনা করেন। প্রভাব উল্লেখ না করে এই তুলনার মাধ্যমে তিনি আরব এবং পশ্চিমা বক্তব্যের সুবিধা-অসুবিধা দেখানোর চেষ্টা করেন।^{১৯}

প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্যিক নমুনার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মূল্যায়ন নিয়ে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি প্রকাশ পায় রুহি আল-খালিদির গ্রন্থে। তার গ্রন্থ *تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور هوجو* ‘তারিখু ‘ইলমিল আদাব ‘ইনদাল আফরিনজ ওয়াল ‘আরাবি ওয়া ফিকতুর হুজু (ইউরোপীয় জাতি, আরব ও ভিক্টর হুগোর মধ্যে সাহিত্য বিজ্ঞানের ইতিহাস) যা ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়।

বইটির শিরোনামের উপর ভিত্তি করে আল-খালিদিই প্রথম ইলমুল আদাব বা সাহিত্য বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেন। সুতরাং রুহি আল-খালিদির অধ্যয়ন ও গবেষণা ঐতিহ্যগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি যা শুধু দুইটি সাহিত্যের তুলনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর চেয়েও আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি তার গ্রন্থে পশ্চিমা কবিতা ও এর পূর্ববর্তী আরবী কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি

আন্দালুসিয়ান কবিতার কিছু রূপ ও বিষয়বস্তুতে দক্ষিণী ট্রুবাদরদের (Troubadours) এবং উত্তরের ট্রুবেরদের (Trouvères) কবিতার উপর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া তার গবেষণায় সাহিত্যের মধ্যকার ঐতিহাসিক সংযোগের উপর নির্ভর করে মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের গল্প আরব গল্প দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন।^{২০} তার এই গবেষণা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়ার আগে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আল-হিলাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথমবারের মতো আরবী সাহিত্যের ছাপ আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে সুলাইমান আল-বুস্তানি হোমারের ‘ইলিয়াড’ গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। ভূমিকায় তিনি জীবন, কবিতা এবং গ্রিক ও ইউরোপীয় সাহিত্যকে স্পর্শ করেছেন। তিনি আরবী সাহিত্য ও গ্রিক সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য নিয়েও আলোচনা করেছেন। এছাড়া আরব ও পশ্চিমাদের মধ্যে কবিতার প্রকারভেদ তুলনা করার পাশাপাশি চৌর্যবৃত্তি ও প্রভাবের মধ্যে পার্থক্যও উল্লেখ করেছেন।^{২১} লেখক কুস্তাকি আল-হামসি আল-হালাবি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সেন্ট-বেউভ (Sainte Beuve), বাল্ডেনস্পারগার (Baldensperger), তাইন (Taine), ব্রুনেটিয়ের (Brunetiere) এবং অন্যান্য ফরাসি সমালোচক- তুলনামূলক সাহিত্যে ফরাসি ধারা প্রতিষ্ঠার যাদের কৃতিত্ব ছিল তাদের রচনা পড়ার পর তুলনামূলক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গবেষণা সম্পন্ন করেন। এসবের মাধ্যমে তিনি আরব লেখকদের পশ্চিমাদের প্রবণতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর গ্রন্থ *منهل الورد في علم*

الانقصاد ‘মানহালুল ওয়াররাদ ফি ইলমিল ইনতিকাদ’ এর তৃতীয় খণ্ডে দান্তে আলিঘেরির (Dante Alighieri) আরবী লেখক আবুল আ’লা আল-মা’আরির ‘রিসালাতুল ওফরান’^{২২} দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা তুলে ধরেছেন। তার পাঠের শিরোনাম ছিল, *الموازنة بين الألعية الإلهية ورسالة الغفران وبين أي العلاء المعري وداني*, অর্থাৎ ‘দৈবনিক খেলা’ ও ‘ক্ষমার বার্তা’- এর মধ্যে এবং আবুল-আ’লা আল-মা’আরির ও ইতালীয় কবি দান্তের মধ্যে তুলনা।’ এছাড়া ইবনে শহীদ আল-আন্দালুসির গ্রন্থ *رسالة التواضع والزوايع* ‘রিসালাতুত তাওয়াবি’ ওয়ায যাওয়াবি’, *কিতাবুল মিরাজ* এবং অন্যান্য ইসলামিক উৎস মধ্যযুগীয় ইতালীয় লেখকদের প্রভাবিত করেছিল।^{২৩} এ পর্যায়ে আবদুল ওয়াহাব আযাম ‘আর-রিসালাহ’ ম্যাগাজিনে আরবী ও ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবদের মধ্যে যে তুলনামূলক সাহিত্য চর্চা হয়েছিল তা ছিল সাধারণত ফলিত অধ্যয়ন। লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং আরবী সাহিত্যে উদ্ভাবনের স্বার্থে আধুনিক সমালোচনামূলক পদ্ধতি থেকে উপকৃত হওয়া। এক্ষেত্রে পশ্চিমাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা বা তুলনামূলক সাহিত্য শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ ছিল না। ‘তুলনামূলক সাহিত্য’ শব্দটি প্রথমবারের মতো ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ‘আর-রিসালাহ’ ম্যাগাজিনে খলিল হিন্দাভি এবং ফাখরি আবু আস-সৌদের নিবন্ধে ফরাসি শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসেবে প্রকাশ পায়। ফাখরি আবু আস-সৌদ ১৯৩০-এর দশকের শুরু থেকে আর-রিসালাহ ম্যাগাজিনে গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন। যেখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ও ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে মিল-অমিল তুলনা করেছিলেন।^{২৪} তার নিবন্ধগুলোতে তিনি নিজেকে পাঠের সাদৃশ্য অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারার প্রভাব ও প্রভাবের শর্ত মেনে চলেননি, যা পরে আমেরিকান প্রবণতার অগ্রগামীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল।^{২৫} খলিল হিন্দাভি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আর-রিসালাহ ম্যাগাজিনে আবু আল-ওয়ালিদ ইব্ন রুশদের অ্যারিস্টটলের ‘ফানুশ শির’ (দ্য আর্ট অফ পোয়েট্রি) এর সারসংক্ষেপের উপর একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন। যেখানে তিনি আরবী ও ফরাসি ভাষায় ‘তুলনামূলক সাহিত্য’ শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন। খলিল হিন্দাভি আরব লেখকদের বিদেশী সাহিত্যের জন্য উন্মুক্ত হতে এবং কর্ডোভা দার্শনিকদের উদাহরণ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তিনি মনে করেন, ইব্ন রুশদ এই সংক্ষিপ্তসারটি শুধুমাত্র এটি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং আরব পাঠককে গ্রিকদের অলঙ্কারশাস্ত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করেন।^{২৬} লেখক ইলিয়াস আবু শাবাকা বেশ কয়েকটি ফরাসি রচনা আরবীতে অনুবাদ করেছেন এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ১৯৪৩

খ্রিস্টাব্দে তিনি, *روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجية*, রাওয়াবিতুল ফিকর ওয়ার রুহি বাইরাল 'আরাব ওয়াল ফারান্জাহ্' (আরব ও পশ্চিমাদের মধ্যে চিন্তা ও আত্মার যোগসূত্র) শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন। যেখানে তিনি আরবদের সাহিত্য ও পশ্চিমাদের সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক সংযোগ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।^{২৭}

লক্ষণীয় যে, তুলনামূলক সাহিত্যে ফরাসি ধারার প্রথম অগ্রগামীরা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের পর উনিশ শতকের শেষের দিকে তাদের ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনার ভিত্তি হিসেবে জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রভাব বা ঐতিহাসিক সংযোগের কারণসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। তুলনামূলক আরব অধ্যয়ন শুরু হয়েছে একযোগে ফরাসি ধারার সাথে এবং আমেরিকান, স্ক্যান্ডিনাভিক ও জার্মান ধারা উত্থানের আগে। প্রথম দিকের আরব পণ্ডিতরা কিছু দিক থেকে ঐতিহাসিক প্রবণতার সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও অন্যান্য দিকে একমত পোষণ করেন। এতে বোঝা যায়, আরব গবেষকরা ফরাসি প্রবণতার প্রশংসা ও আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের অধ্যয়নকে তাদের রেনেসাঁর চাহিদা এবং তাদের সাহিত্য ও আদর্শিক ঐতিহ্য অনুসারে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

৭. তুলনামূলক সাহিত্যে পদ্ধতিগত রচনাবলি

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নাজিব আল-আকিকির 'মিন আদাবিল মুকারান' বইটি প্রকাশিত হয়— যা মূলত সাহিত্য ও সমালোচনার পাঠ। তুলনামূলক সাহিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যেন লেখক তুলনামূলক সাহিত্যের কোনো বই পড়েনি। অথচ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে 'আল-মুকতাতাফ' ও 'আর-রিসালাহ' ম্যাগাজিনে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই বইটির শিরোনাম পরিবর্তন করাই সমীচীন ছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আবদুল রাজ্জাক হামিদার বই 'মিন আদাবিল মুকারান' নামে প্রকাশিত হয়। যেখানে তিনি আল-মা'আররির 'রিসালাতুল গুফরান' ও দান্তের 'আল-কমেডিয়া আল-ইলাহিয়াহ' কে একটি নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাজ। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ড. ইবরাহিম সালামা, *تيارات أدبية بين الشرق والغرب* 'তায়ারাতুন আদাবিয়াতুন বাইনাশ-শারকি ওয়াল গার্ব' (প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যে সাহিত্যের স্রোত) শিরোনামের একটি বই প্রকাশ করেন যা তুলনামূলক সাহিত্যের একটি পরিকল্পিত পাঠ। তিনি প্রায় সমস্ত শিল্পে আরবী ও গ্রিক সাহিত্যের তুলনা করেন। তিনি এ ব্যাপারে অবশ্য ফরাসি ধারার পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। ১৯৪০-এর দশকে এই পাঠগুলো ভাসমান ছিল। ১৯৫০-এর দশকে একদল আরব গবেষক যারা পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন তাদের হাতে তুলনামূলক আরবী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটেছিল। তাদের মাধ্যমে এবিষয়ে অনেক বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল 'আদাবুল মুকারান' শিরোনামে তার বই প্রকাশ করেন। যার মাধ্যমে আরব পাঠক তুলনামূলক পাঠে ফরাসি পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। এ বইটি আরব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তুলনামূলক সাহিত্যের উৎস গ্রন্থ হিসেবে রয়েছে। এরপর তিনি আরো বই প্রকাশ করেছেন। যেগুলো প্রায়ই তার প্রথম বইতে বলা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল যিনি ফ্রান্সে অধ্যয়ন করেছিলেন। তার তুলনামূলক সাহিত্যের বইয়ে ঐতিহাসিক প্রবণতা ছাড়া বেশি কিছু পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি পূর্ববর্তী আরব গবেষকদের কোন গবেষণা উল্লেখ করেননি। এক্ষেত্রে আরব গবেষণার চরিত্র নির্ধারণে অবদান রাখার পরিবর্তে তিনি M.F. Guyard, J.M. Carré, P. Van Tieghem এবং অন্যান্য যারা ঐতিহাসিক ধারার নীতি প্রচারের জন্য কাজ করেছিলেন তাদের গ্রন্থের আলোচিত মতবাদ প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ফরাসি উৎস যার উপর নির্ভর করেছিলেন তাও উল্লেখ করেননি। মুহাম্মদ গুনাইমি হিলালকে আরবদের মধ্যে তাত্ত্বিক তুলনামূলক সাহিত্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দেওয়া হয় এবং অনেক আরব গবেষক এখনও তার প্রথম বইটির উপর নির্ভর করে। সেটি মূলত তার পিএইচডি থিসিস ছিল। যার মাধ্যমে আরব পণ্ডিতরা তুলনামূলক সাহিত্যের ক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। একই বছরে মুহাম্মাদ আল-বুহাইরি 'আদাবুল মুকারান' নামে বই প্রকাশ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ গুনাইমি হিলালের বই থেকে তার পদ্ধতি ভিন্ন ছিল না। তিনিও তার পূর্ববর্তী আরব অগ্রগামীদের প্রচেষ্টা ও গবেষণা উত্থাপন করেননি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সাফা হুসুসি 'দিরাসাতুন

ফিল আদাবিল মুকারান' শিরোনামে বই প্রকাশ করেন। সাফা হুসুসি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তুলনামূলক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ষাটের দশকে আরব বিশ্বে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয়। বৈরুত ও আলজিয়ার্সে বিশেষ ম্যাগাজিন এবং বেশ বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে আবদুল মুনইম খাফাজির 'দিরাসাতুন ফিল আদাবিল মুকারান', হাসান জাদের 'আদাবুল মুকারান' এবং তুহা নাদার 'আদাবুল মুকারান' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রয়েছে মুহাম্মদ মুফিদ আল-শুবাশি এর 'রিহলাতুল আদাবিল 'আরাবি ইলা উরুবা' (ইউরোপের আরব সাহিত্যের যাত্রা) নামের বইটি। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে তুলনামূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার আরো বিকাশ ঘটে এবং অনেক বই, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বেশিরভাগ আরব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে পাঠদান শুরু হয়। এসময়ের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে হোসাম আল-খতিব, বদি মুহাম্মদ জুমা', রেমন্ড তাহান, ইহসান আব্বাস প্রমুখ। এই সময়ের আলোচনা ছিল- প্রাচ্যের পণ্ডিতদের উন্মোচন এবং আরবী, ফারসি ও তুর্কি সাহিত্যের মধ্যে তুলনা। এর বিপরীতে ফরাসি ধারার অগ্রগামীরা অন্যান্য সাহিত্যকে ছোট করে দেখেছে। অথচ ১৯৭০-এর প্রজন্মের আরব তুলনাকারীরা এই পাঠ নিয়ে কাজ করার সময় অন্যদের প্রতি সহনশীল ছিল। তারা আরবী সাহিত্যে বিদেশী প্রভাবকে বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং বিব্রত অবস্থা ছাড়াই উল্লেখ করেছিল।^{২৮}

৮. তুলনামূলক সাহিত্যে পরিপক্বতা ও সমৃদ্ধি

আশির দশকে তুলনামূলক সাহিত্যে অন্যান্য প্রবণতার উত্থানের পর আরব তুলনাকারীদের একটি নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। যারা মূলত আরব সাহিত্য শৈলীকে বিবেচনায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক তুলনামূলক পাঠকে এগিয়ে নিয়ে যায়। গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তারা উচ্চ শিক্ষায় কিছু ছাত্রকে তুলনামূলক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ করে তোলে। তখন আরবী ও ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ও প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা এবং বিশেষ করে মধ্যযুগে আরব-ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সাহিত্যের সংযোগের আলোচনা প্রবল ছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক ও বিদেশী সাহিত্যে বিশেষায়িত বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন তুলনামূলক সাহিত্যে ছাত্র ও গবেষকদের উপর একটি দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল। তখন কিছু পাঠ ফরাসি ধারা মেনে না চললেও অন্যরা এই পদ্ধতি মেনে চলেছিল। অনুকরণ হিসেবে নয়, বরং এতে আরবী সাহিত্য পুনরুদ্ধারের জন্য আদর্শ নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। একই সময়ে ফরাসি তুলনাকারীরা তাদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি থেকে পিছু হটতে শুরু করে। তাদের যুক্তি ছিল, এটি আর তুলনামূলক সাহিত্য পরিবেশন করে না।^{২৯} প্রকৃতপক্ষেই তা আর ফরাসি সাহিত্য ও ইউরোকেন্দ্রিকতা পরিবেশন করে না। যখন প্রথম অগ্রগামীরা এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তারা রেনেসাঁ থেকে শুরু করে তাদের পাঠকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। যখন তুলনামূলক সাহিত্য ইউরোপীয় সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং অন্যান্য প্রবণতার দিকে পরিচালিত হয় তখন গবেষকরা মধ্যযুগীয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই ফরাসি গবেষকরা বুঝতে পেরেছিলেন, তাদের পূর্বসূরীদের আরোপিত প্রভাবিত হওয়া বা প্রভাব বিস্তার করার শর্ত ফরাসি সাহিত্যকে পরিবেশন করে না, বরং তাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতির সাহিত্যকে পরিবেশন করে। তাদের আরও একটি শর্ত ছিল- প্রাক-রেনেসাঁর সাহিত্য অধ্যয়ন না করা। কারণ তখন প্রাচ্যের সাহিত্য মানে- ভারত, পারস্য ও আরব সবচেয়ে সমৃদ্ধ যুগে বসবাস করছিল। মধ্য যুগে বা তার আগের কিছু ফ্রাঙ্কিশ রাজারা পড়তে বা লিখতে জানত না।^{৩০} বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে প্রকাশিত তুলনামূলক আরব পাঠগুলির বেশিরভাগই বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অবশ্য কেউই আরব প্রেক্ষাপট ও সংস্কৃতি অনুসারে শুধুমাত্র রেফারেন্স ছাড়া তুলনামূলক সাহিত্যে আরব প্রবণতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেনি। যদিও ফরাসি, আমেরিকান, স্লাভিক ও জার্মান প্রবণতার অগ্রগামীদের বই অনুবাদ করা হয়েছিল। বেশিরভাগ আরব গবেষক আধুনিক সমালোচনামূলক পদ্ধতি ও তার প্রয়োগের দিকে খুব মনোযোগ দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরব পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূতদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণাকে আরব পাঠ্যক্রমের প্রথম বিল্ডিং ব্লক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পশ্চিমা পাঠের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রশংসা সত্ত্বেও তারা যে সাহিত্য অনুবাদ করেছে বা উদ্ধৃত করেছে, তা কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপীয় পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল। এই পার্থক্যের অন্যতম কারণ ছিল জাতীয় পরিচয় ও চেতনার প্রতি তাদের আনুগত্য। ১৯৮০-এর

দশকে বিশিষ্ট তুলনাবাদীদের মধ্যে ছিলেন ড. আল-তাহের আহমেদ মাক্কি, যিনি বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেছিলেন। দাউদ সাল্লুম যিনি এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু গবেষণা করেন। এছাড়া ড. মানাফ মনসুর যিনি ‘মাদখালুন ইলা আদাবিল মুকারান’ (তুলনামূলক সাহিত্যের ভূমিকা) নামে বই প্রকাশ করেন। তাতে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের ফরাসি এবং আমেরিকান ধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন।

৯. তুলনামূলক সাহিত্যে আরব ধারার বৈশিষ্ট্য

প্রথমে আরব অগ্রগামীরা বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে মিল-অমিলের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তারা প্রভাব বিস্তার বা প্রভাবিত হওয়ার দিকে মনোযোগ দেননি। কারণ একটি জাতির সাহিত্যকে অন্য জাতির সাহিত্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া তাদের উদ্বেগের বিষয় ছিল না। জাতির সাহিত্যের মধ্যে তারা মিল এবং সমান্তরাল অধ্যয়নের উপর নির্ভর করেছিল। তাদের অবদানের মধ্যে রয়েছে গ্রিস, পারস্য, তুর্কি, ভারত ও অন্যান্য সাহিত্যসহ মধ্যযুগীয় এবং প্রাচীন সাহিত্যের তুলনামূলক গবেষণার প্রসার। তারা তাদের তুলনা শুধুমাত্র দু’টি সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং তারা তাদের অধ্যয়নকে বেশ কয়েকটি সাহিত্যে প্রসারিত করেছে। বিভিন্ন জাতির সাহিত্য তাদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল। ভাষা বা জাতীয়তাবাদের অবস্থা তাদের উদ্বেগের মধ্যে ছিল না। আরবদের প্রভাবিত হওয়া কোন ত্রুটি নয়, যদি না এটি একটি অনুকরণ হয়। বরং এটি অধিক পাঠ এবং রুচি ও পছন্দ অনুসারে অন্যের সাহিত্য থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে। একজন আরব লেখক একজন বিদেশী লেখক দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে দ্বিধা করে না। বরং প্রভাবের কারণ, পার্থক্য, মিলের মাত্রা এবং তার কারণ অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে। প্রভাবিত সাহিত্য বলতে দুর্বল সাহিত্যকে বোঝায় না। অনেক সময় উচ্চ সাহিত্যও নিম্নতর সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। তুলনামূলক গবেষক একটি সাহিত্যকে অন্য সাহিত্যের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারেন বা একটি বাগ্মীতাকে অন্যটির চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। তবে সেটি পূর্বের পটভূমির উপর ভিত্তি করে নয়। যেমনটি ঐতিহ্যগত ঐতিহাসিক ধারার ক্ষেত্রে ছিল। বরং এই অগ্রাধিকার পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ভিত্তি করে হয়। তা- দু’টি সাহিত্যের গুণাগুণ ও ত্রুটি উন্মোচন করার জন্য। এক সাহিত্যের উপর অন্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয় এবং পক্ষপাতের কারণেও নয়। সাহিত্যের ধারা ইতিহাসের মতো বিভিন্ন জাতির বিকাশে অংশীদার হয়। কাজেই তুলনামূলক গবেষককে অবশ্যই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাহিত্যের বিকাশের পর্যায় দেখতে হয়। এটি জাতির ভাষাগত সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। যেমন- প্রাণীর ভাষায় গল্পের জন্য ফরাসি লা ফন্টেইন (La Fontaine) বিখ্যাত হয়েছিলেন। যা দ্বারা আরবসহ অনেক লেখক প্রভাবিত হয়েছিল। লা ফন্টেইন আরবদের সাহিত্য থেকে এটি গ্রহণ করেছিল এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল। আরবরাও এটি ভারতীয় সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে আরবী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেছিল। তুলনামূলক সাহিত্য গবেষক বিদেশী সাহিত্যকর্মের আরবীকরণের আস্থান জানিয়েছেন- যেন আরব পাঠক সেগুলো সম্পর্কে অবগত হতে পারে। উদ্দেশ্যহীন কিছু ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ আরব সমাজের একটি বিকৃত চিত্র এঁকেছিলেন। অনুবাদের মাধ্যমে জানার পরই বেশ কিছু আরব তুলনাকারী চিত্রকল্প, ভ্রমণ সাহিত্য ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যে বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন।^{১৩} তুলনামূলক সাহিত্যের আরব প্রবণতা হলো- সাদৃশ্য, পার্থক্য, নিদর্শন, প্রভাব বিস্তার, প্রভাবিত হওয়া, গ্রাহকের রুচি, অনুবাদ এবং শৈলীর নান্দনিকতার পার্থক্য অধ্যয়ন করা। কিন্তু ফরাসি ধারার মতো ইতিহাসের অধ্যয়ন বা আমেরিকান ধারার মতো অতিরঞ্জিত সমালোচনা বা স্লাভিক ধারার মতো সামাজিক নিদর্শন অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করে না। বরং এটি প্রাথমিক কিছু বিষয়ে জার্মান ধারার খুব কাছাকাছি চলে আসে।

১০. উপসংহার

আরবী সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আরবরা অন্যান্য জাতির সাথে মেলামেশার কারণে তারা বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছে। আরবরা অন্যদের সাথে যেসব রূপ বিনিময় করেছে প্রাচীন আরবরা তাদের তুলনামূলকভাবে সম্বোধন করলে তারাই তুলনামূলক সাহিত্যের সূচনাকারী হতেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরব বিশ্বে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিমাদের সাথে যোগাযোগ উন্মোচিত হওয়ার পর অনুবাদ ও অভিযোজন আন্দোলন বিকাশ লাভ করার ফলে তুলনামূলক গবেষণায় আরব পণ্ডিতদের আগ্রহ ও

অধ্যয়ন বেড়ে যায়। ফরাসি ধারার অগ্রগামীরা অন্যান্য সাহিত্যকে ছোট করে দেখলেও আরব তুলনাকারীরা তুলনামূলক সাহিত্য পাঠে অন্যদের প্রতি সহনশীল হয়ে কাজ করে। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে তুলনামূলক সাহিত্যে আরব তুলনাকারীদের একটি নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। যারা মূলত আরব সাহিত্য শৈলীকে বিবেচনায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক তুলনামূলক পাঠকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তুলনামূলক সাহিত্যের আরব-ধারা সাদৃশ্য, পার্থক্য, নিদর্শন, প্রভাব বিস্তার, প্রভাবিত হওয়া, গ্রাহকের রুচি, অনুবাদ এবং শৈলীর নান্দনিকতায় বিশ্বাস করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ <https://bn.wikipedia.org/wiki/তুলনামূলক-সাহিত্য>। (৩০/১২/২০২৩)
- ^২ অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান, তুলনামূলক সাহিত্য কী ও কেন? <https://bangla.thereport24.com/article/147662/index.html>। (৩১/১২/২০২৩)
- ^৩ <https://arts-sciences.buffalo.edu/comparative-literature/about/what-is-comparative-literature.html> (01/01/2024)
- ^৪ আল-জাহিয়, *আল-বায়ান ওয়া-তাবয়ীন*, আবদুস সালাম সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারুল খানজী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৭।
- ^৫ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।
- ^৬ আল-জাহিয়, *আল-বুখালা*, তুহা হাজিরী সম্পাদিত, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা. বি., পৃ. ৫-১০।
- ^৭ ড. মাজিদাহ হাম্মুদ, *মুকরাবাতুন তাতবিকীয়াতুন ফিল আদাবিল মুকারিন* (দামেস্ক: আরব রাইটার্স ইউনিয়ন পাবলিকেশন্স, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১২৩।
- ^৮ আল-জাহিয়, *আল-হায়ওয়ান*, আবদুস সালাম হারুন সম্পাদিত, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৭৪।
- ^৯ তদেব, পৃ. ৭৬; আল-জাহিয় ও তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ড. আল-তাহির আহমেদ মাক্কি, *ফিল আদাবিল মুকারান দিরাসাতুন নাযরিয়াতুন ওয়া তাতবিকীয়াতুন* (কায়রো: দারুল-ফিকর আল-আরাবী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭।
- ^{১০} ইবনুল আশির, *আল-মাসালুস সাযির ফি আদাবিল কাতিব ওয়াশ শায়ির*, ড. আহমেদ আল-হাওফি এবং ড. বাদভী তাবানা সম্পাদিত, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল নাহদাতি মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.) পৃ. ৩।
- ^{১১} তদেব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১।
- ^{১২} ড. মুহাম্মদ আব্বাসা, *আল-মাদরাসাতুল 'আরাবিয়্যা ফিল আদাবিল মুকারান*, হেরিটেজ অ্যানালস ম্যাগাজিন, মোস্তাগানেম বিশ্ববিদ্যালয়, আলজেরিয়া, সংখ্যা: ২৬, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ৩।
- ^{১৩} Marius-François Guyard, *La littérature comparée*, 6e éd., PUF, Paris 1978, p. 25.
- ^{১৪} ইয়াকুব সররুফ, *আল-ইনতিকাদ*, আল-মুকতাতাফ ম্যাগাজিন, দ্বাদশ বর্ষ, ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রি., পার্ট ৩, পৃ. ১৬২-১৭০।
- ^{১৫} নাজিব আল-হাদ্দাদ, *'মুকরাবাতুন বাইনা শিরিল আরবী ওয়াশ-শিরিল ইফরিনজ'*, আল-বায়ান ম্যাগাজিন, ১৮৯৭ খ্রি., পৃ. ২৭১; ফুসুল ম্যাগাজিনে পুনঃপ্রকাশিত, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ২৫৭।
- ^{১৬} আহমাদ কামিল, *বালাগাতুল 'আরব ওয়াল ইফরিনজ*, আল-মুকতাতাফ ম্যাগাজিন, ভলিউম ২৪, জানুয়ারি, ১৯০০ খ্রি., পার্ট ১, পৃ. ৩৮।
- ^{১৭} খলিল সাবিত, *বালাগাতুল 'আরব ওয়াল ইফরিনজ*, আল-মুকতাতাফ ম্যাগাজিন, ভলিউম ২৪, মার্চ, ১৯০০ খ্রি., পার্ট ৩, পৃ. ২১৩।
- ^{১৮} নিকোলা ফায়য়াস, *বালাগাতুল 'আরব ওয়াল ইফরিনজ*, আল-মুকতাতাফ ম্যাগাজিন, ভলিউম ২৪, এপ্রিল ১৯০০ খ্রি., পার্ট ৩, পৃ. ২৯১।
- ^{১৯} সাইদ আল-খোরি আশ-শারতুনি, *আল-বায়ানুল 'আরাবি ওয়াল বায়ানুল ইফরিনজ*, আল-মুকতাতাফ ম্যাগাজিন, ভলিউম ২৭, এপ্রিল, ১৯০২ খ্রি., পার্ট ৪, পৃ. ৩৭০-৩৭৪।
- ^{২০} রুহি আল-খালিদি, *তারিখু 'ইলমিল আদাব 'ইনদাল আফরিনজ ওয়াল 'আরাব ওয়া ফিকতুর হুজু* (দামেস্ক: চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১২৫।
- ^{২১} হোমার, *ইলিয়াড*, সুলাইমান আল-বুস্তানি অনূদিত (মিসর: দারুল হিলাল, ১৯০৪ খ্রি.), পৃ. ২-৩।
- ^{২২} কুস্তাকি আল-হামসি আল-হালাবি, *মানহালুল ওয়ারাদ ফি ইলমিল ইনতিকাদ*, ৩য় খণ্ড (আলেপ্পো: মাতবায়াতুল 'আসরিল জাদিদ, ১৯৩৫ খ্রি.), পৃ. ১৫৪।
- ^{২৩} আল-মাদরাসাতুল 'আরাবিয়্যা ফিল আদাবিল মুকারান, হেরিটেজ অ্যানালস ম্যাগাজিন, পৃ. ১৩।

-
- ^{২৪} ফখরি আবু আস-সৌদ, *ফিল আদাবিল মুকারান ওয়া মাকালাতুন উখরা*, কায়রো: আল-হাইয়াতুল মিশরিয়্যাহ আল-‘আমমা লিল কুতাব, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৫-৭।
- ^{২৫} রিনি উইলিক (Rene Wellick), *মাফাহিমু নাকদিয়্যাহ (Critical Concepts)*, ড. মুহাম্মদ আসফুর অনূদিত (কুয়েত: ওয়ার্ল্ড অফ নলেজ সিরিজ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৯৭।
- ^{২৬} খলিল হিন্দাভি, *ইশতিগালুল ‘আরাব বিল আদাবিল মুকারান*, আর-রিসালাহ ম্যাগাজিন, সংখ্যা: ১৫৩, ৯ জুন, ১৯৩৬ খ্রি., পৃ. ৯৩৮-৯৪০।
- ^{২৭} “আল-মাদরাসাতুল ‘আরাবিয়্যাহ ফিল আদাবিল মুকারান”, *হেরিটেজ অ্যানালস ম্যাগাজিন*, পৃ. ১৪।
- ^{২৮} তদেব, পৃ. ২২।
- ^{২৯} ফরাসি গবেষকদের মধ্যে যারা অন্যান্য সাহিত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে স্পর্শ করেছিলেন এবং প্রথাগত ফরাসি পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য করেননি, তারা হলেন পিয়েরে ব্রুনাল, রুদ পেন্ডুয়া, আন্দ্রে-মিশেল রুসো, ইয়েভেস শেভরাল আরো অনেকে।
- ^{৩০} মেরোভিনিজিয়ান (Mérovingiens) ফ্রাঙ্কিশ রাজাদের (শার্লমেন) যুগকে অজ্ঞতা এবং বর্বরতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ল। এমনকি ক্যারোলিংজিয়ান শার্লমেন (Charlemagne) খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্কুল নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
- ^{৩১} “আল-মাদরাসাতুল ‘আরাবিয়্যাহ ফিল আদাবিল মুকারান”, *হেরিটেজ অ্যানালস ম্যাগাজিন*, পৃ. ২৩।

মারুফ আর-রুসাফীর ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতায় সমাজচিত্র [Social Picture in Maruf ar-Rusafi’s Poem *Al-Yeatim fil Eid*]

ড. মো. সেতাইর রহমান*

[Abstract: Maruf ar-Rusafi (1875–1945) was a renowned and distinguished humanitarian Iraqi poet and scholar in the 20th century. He was ranked one of the eminent poets in Arabic literature of the time with his excellent contribution. He was famous for his delineating of portrayal of the society and defence of women's rights in his writings. He had good commands on poetical composition and Arabic literature. His *Diwan* is a monumental work of Arabic Literature. In his writings *Al-Yeatim fil Eid* is a significant work which was important towards society. It covers the socio-cultural aspects of the time; rather it spreads over a great canvas of thought and life perception. He earned his fame by this poetry imbued with social and cultural events. Rusafi's writings were influenced fully by Arab writers. As an Arab poet and litterateur Maruf ar-Rusafi and his literary work will remain ever remembering in the minds of those who are interested in the study of Arabic poetry along with contemporary culture and civilization. The purpose of the present study is to discuss the life sketch of poet Maruf ar-Rusafi along with his praise-worthy achievement in Arabic poetry, specially his remarkable heroic-writing *Al-Yeatim fil Eid* in imaging of the society in this poetry.]

Keywords: Society, Portrayal, Delineate, Contemporary, Culture.

১. ভূমিকা

কবি মারুফ আর-রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.) আরবী কবিতার রেনেসাঁ যুগের একজন ইরাকী কবি। আধুনিক আরবী সাহিত্যে যে সকল ক্ষণজন্মা কবির আবির্ভাব হয়েছিল তিনি তাঁদের অন্যতম। আরবী সাহিত্যে আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর শোচনীয় ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনচিত্র তাঁর কবিতার মূল প্রাণ। সমাজের বাস্তব চিত্রকে শৈল্পিক তুলির নিপুণতায় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মারুফ আর-রুসাফী এক অনন্য প্রতিভা। আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে রয়েছে তাঁর দখল। *আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ* তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যেখানে তিনি সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর জীবনধারা অত্যন্ত সূচারুপে চিত্রিত করেছেন। উক্ত কবিতায় তিনি ঈদের দিনে একজন ইয়াতীম শিশুর মনে যে প্রচণ্ড যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় তার সন্ধান চিত্র অংকন করেছেন। ঈদের দিনে সচ্ছল পরিবারে যেমন আনন্দের বন্যা বইতে থাকে, অন্যদিকে অসচ্ছল ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারে দুঃখের সীমা থাকেনা। কবি *আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ* কবিতায় ঈদের দিনে ধনিক শ্রেণি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

২. মারুফ আর-রুসাফীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবি মারুফ আর-রুসাফী আধুনিক আরবী কবিতার এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে তাঁর কবিতায় স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কারণে তিনি মানবতার কবি হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচরমা উপস্থাপন করা হলো:

২.১ জন্ম ও বাল্যকাল

আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি মারুফ আর-রুসাফী ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় সুলতান আব্দুল আযীযের শাসনামলে (১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.) বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^১ তাঁর

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

পিতার নাম আবদুল গণী। তিনি বাগদাদের পুলিশ বিভাগে চাকুরী করতেন এবং মাতার নাম ফাতিমা। পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন কুর্দি বংশোদ্ভূত।^২ কোন কোন ইতিহাসবেত্তার মতে, কবি মা'রুফ আর-রুসাফীর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী রা. এর বংশধর।^৩ কবির পিতা উনিশ শতকের শেষের দিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য বাগদাদের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত 'রুসাফা' নামক গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন^৪ এবং এখানেই কবির জন্ম হয়।^৫ রুসাফাতেই কবির বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। এ কারণেই তিনি 'রুসাফী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।^৬

২.২ শিক্ষাজীবন

কবির পিতা পুলিশের চাকুরীর কাজে প্রায়ই বাইরে থাকতেন। ফলে মা-ই ছিল তাঁর ছোটবেলার নিত্যসঙ্গী। তিন বছর বয়সে রুসাফীর মাতা তাকে পবিত্র কুরআন মাজীদসহ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তবে ভর্তি করেন।^৭ বাগদাদের বিভিন্ন মক্তবে অধ্যয়নের পর অবশেষে শহরের সেরা মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'রুশদিয়া সামরিক বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়ে চার বছরের কোর্স সমাপ্ত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অপমানের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরণ্য শিক্ষক ও পণ্ডিতগণের নিকট থেকে ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন।^৮ এ সময় তিনি বাগদাদের জামি'উল ফজলের প্রখ্যাত শিক্ষাগুরু 'মাহমুদ শুকরী আল-আলুসী' এর নিকট প্রায় তের বছর অতিবাহিত করেন এবং ভাষা, সাহিত্য, আইন ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছে, শায়খ আব্দুল ওয়াহাব আল-নায়িব, শায়খ কাসিম আল-কায়সী ও শায়খ কাসিম আল-বয়াসী প্রমুখ।^৯ আর সেসময় থেকেই তিনি কবিতা লিখা শুরু করেন।^{১০} কবি মা'রুফ আর-রুসাফী শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে অনুপ্রবেশের পর ১৯০৮ সালে ইস্তাম্বুলে এক ধার্মিক মহিলাকে বিবাহ করেন। দাম্পত্য জীবনে কয়েকজন সন্তান লাভ করলেও সকলেই শৈশবে মারা যায়।^{১১}

২.৩ কর্মজীবন

তিনি কর্মজীবনের সূচনায় গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এক বছর পর সেখান থেকে বাগদাদের এক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলী হন। অতঃপর সেখানকার বিভিন্ন সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরবী ভাষার শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।^{১২} শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি তাঁর কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে অনেকগুলি চমৎকার কবিতা রচনা করেন। ফলে অল্প সময়েই তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।^{১৩} ১৯১২ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর তিনি ইস্তাম্বুলে তুর্কি প্রতিনিধি সভায় দক্ষিণ ইরাকের একটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) শেষ হবার পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ইরাকে ফিরে যাবার চিন্তা করেন। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্ত্রীকে ইস্তাম্বুলে রেখে দামেস্কে চলে যান।^{১৪} সেখানে সাত মাস অতিবাহিত করার পর এক বন্ধুর মাধ্যমে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতার আমন্ত্রণ পেয়ে জেরুজালেমে যান। সেখানে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।^{১৫} ১৯২১ সালে তিনি ইরাক সরকারের আহ্বানে দেশে ফিরে আসেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুবাদ সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।^{১৬}

২.৪ মৃত্যু

কবি রুসাফীর শেষজীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ। তিনি অবসরকালীন সরকারী সাহায্য সহযোগিতাগুলো আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে অবশেষে নিজেই আর্থিক সংকটে নিপতিত হন।^{১৭} ফলে তিনি বাগদাদ ছেড়ে ফোরাত নদীর তীরবর্তী ফালুজা শহরে এসে সাধারণ জীবন যাপন করতে থাকেন। ১৯৪১ সালে সেখান থেকে পুনরায় বাগদাদে ফিরে এসে শহরের 'আয-যামিয়া' এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। আর এখানেই আধুনিক আরবী সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি মা'রুফ আর-রুসাফী ১৯৪৫ সালের ১৬

মার্চ শুক্রবার সকালে নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এলাকাস্থ কবরস্থানে প্রখ্যাত কবি জামীল সুদক্কী আয়-যাহাবীর কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।^{১৮}

৩. মারুফ আর-রুসাফীর সাহিত্যকর্ম

কবি মারুফ আর-রুসাফী আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। কবি সম্রাট আহমদ শাওক্কী মিসরীয় সাহিত্যে যে স্থান দখল করে আছেন, অনুরূপ রুসাফীও ইরাকী সাহিত্যে অনুরূপ স্থান দখল করে আছেন।^{১৯} তিনি ইরাকের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।^{২০} এমনকি তাঁর কাব্যিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ইরাকের সমসাময়িক প্রখ্যাত কবি জামীল সিদক্কী আয়-যাহাবী তাকে মিসরের শাওক্কী ও হাফিজ ইব্রাহীমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।^{২১} তাঁর কাব্যচর্চার পরিধি ছিল অতিব্যাপক ও বহুমুখী। প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার কোন বিষয়ই তাঁর লেখনি থেকে বাদ পড়েনি। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি যে বিষয়ে কলম ধরেছেন তাকে সাহিত্যের রঙ্গে রঙ্গিন করে নতুন সাজে সজ্জিত করেছেন।^{২২} নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিধৃত হলো:

১. الديوان (কাব্য সংকলন)

এটি কবি মারুফ আর-রুসাফীর অনবদ্য রচনা। এ গ্রন্থটি কবির জীবদ্দশাতে দুই বার প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশে তাঁর সংগৃহীত কবিতাসমূহকে অধ্যয়নভিত্তিক চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। যথা- ১. الاجتماعيات (সামাজিক) ২. الكونيات (সৃষ্টিজগত বিষয়ক) ৩. التاريخيات (ঐতিহাসিক) ৪. الوصفيات (বর্ণনামূলক)।^{২৩} অতঃপর ১৯৩২ সালে এ গ্রন্থটি বৈরুত থেকে দ্বিতীয়বার বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিত হয়। এবং এতে আরো ৭টি নতুন বিষয়বস্তুর সংযোজন ঘটে। যথা- ১. الفلسفيات (দার্শনিক) ২. الحربيقات (অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক) ৩. المراثي (শোকগাথা) ৪. النسائيات (নারী সংক্রান্ত) ৫. السياسيات (রাজনৈতিক) ৬. الحربيقات (যুদ্ধ সংক্রান্ত) ৭. المقطعات (নাতিদীর্ঘ কবিতা)।^{২৪} এ সংকলনটি বাগদাদ, কায়রো ও বৈরুত থেকে কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ হয়।^{২৫}

২. دفع المراق في لغة العامة من أهل العراق (ইরাকী কথ্য ভাষার দুর্বলতার অপসারণ)

৩. دفع المهجنة في إرتضاخ الكنيسة (আরবী ভাষার সাথে বিদেশী ভাষার সংমিশ্রণগত ত্রুটি অপসারণ)

৪. رواية الرؤيا (স্বপ্নের বর্ণনা)

৫. رسائل التعليقات (পুস্তক সমালোচনা-নিবন্ধমালা)

৬. محاضرات في آداب اللغة العربية (আরবী ভাষা সাহিত্যের উপর কতিপয় লেকচার)

৭. على باب سجن أبي العلاء (আবুল 'আলার কারাদ্বারে)

৮. آراء أبي العلاء (আবুল 'আলার চিন্তাধারা)

৯. نظرة إجمالية في حياة المتنبي (মুতানাব্বীর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন)

১০. عالم الذباب (মাছির জগৎ)

১১. الأدب الرفيع في ميزان الشعر و قوافيه (কবিতার ছন্দ ও অন্তর্মিল বিষয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য)

১২. خواطر و نوادر (চিন্তাধারা ও বিরল সামগ্রী)

১৩. الرسالة العراقية (ইরাকী বার্তা)

১৪. الآلة والأداة (যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র)

১৫. شخصية محمد ﷺ (মোহাম্মাদ সা. এর ব্যক্তিত্ব)

১৬. مع الرصافي الثائر (বিদ্রোহী রুসাফীর সাথে)

١٩. الأندلسية الوطنية (দেশাত্ত্ববোধক সঙ্গীতমালা)

١٧. ثنائى التعليم والتربية (শিক্ষা-দীক্ষার কবজ)

١٥. مختارات من معروف الرصافي (মাক্ৰুফ আর-রুসাফীর নির্বাচিত কবিতা)

٢١. المنهل الصافي من شعر الرصافي (রুসাফী কাব্যের নির্মূল ফুয়ারা)

٢٠. بক্তا و بكتا सम्पर्के सुरभिर बिछूरण)^{২৬} (বক্তা ও বক্তা সম্পর্কে সুরভির বিচ্ছুরণ)

৪. ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতায় সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছায়া

কবি মাক্ৰুফ আর-রুসাফী রচিত ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতাটি একটি অনন্য কবিতা। এ কবিতায় সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। ঈদ মানব জীবনে বিশেষত মুসলিম জীবনে একটি আনন্দের বার্তা নিয়ে আগমণ করে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এ ঈদ সমাজের দুস্থ ও অভাবহীন মানব শ্রেণির জীবনে আনন্দের পরিবর্তে কষ্টের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের নির্বাচিত ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতায় দেখা যায় যে, একটি ইয়াতিম শিশু ঈদের মাঠের এক কোণে জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক পরে একাকী দাঁড়িয়ে আছে, আর অপরাপর বাচ্চাদের আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক ও তাদের বাবাদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা অবলোকন করে গভীরভাবে ব্যথিত হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজের বিধবা ও দুস্থ শ্রেণির মানুষেরা জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবের জীবন যাপন করতে থাকে। সমাজের এ সব অসঙ্গতি ও বাস্তব চিত্র নিয়েই কবি মাক্ৰুফ আর-রুসাফীর ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতাটি রচিত। কবি মাক্ৰুফ আর-রুসাফী তৎকালীন ইরাকের সমাজ জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তাঁর এই কবিতায় অংকন করেছেন।^{২৭} তবে আলোচিত কবিতায় বর্ণিত সমাজের এ ভিন্নধর্মী চিত্র যে কোন রাষ্ট্রে যে কোন সময়ে একইভাবে প্রতিভাত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে নতিদীর্ঘ বর্ণনা বিধৃত হলো:

৪.১ ঈদের সকালের সূর্যোদয় ও সমাজের বাস্তবতা

ঈদের দিন সকালেও অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রভাত উদিত হয়। মানব জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও কোলাহল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ দিন সকালে মানব জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমে দু’টি ভিন্ন ধারা পরিলক্ষিত করা হয়। একদিকে স্বচ্ছল শ্রেণির পরিবারে আনন্দের বন্যা বইতে থাকে। অন্যদিকে দরিদ্র, দুস্থ ও ইয়াতীম শ্রেণির পরিবারে দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার সুর বইতে থাকে। কবি বলেন,

أطلّ صباح العيد في الشرق يسمع * ضجيجاً به الأفراح تَمضي وتُرجع
صباح به تبدي المسرة شمسها * وليس لها إلا التوهم مَطْلَع
ويعوز ذا الإعدام طُمْرُ مرقع * صباح به يختال بالوشى ذو الغنى
ثياباً لها ييكى اليتيم المضئع * صباح به يكسو الغنى وليده

“ঈদের প্রভাত পূর্ব গগণে উঁকি মেরে কোলাহল শুনতে পায়। সে কোলাহলের সাথে হর্ষোৎফুল্ল জনগণ গমনাগমন করছে। ঈদের সকালে উহার সূর্য আনন্দ প্রকাশ করে অথচ তার মনে শুধু কল্লনাই উদিত হয়। ধনী ব্যক্তির ঈদের সকালে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে গর্ববোধ করে আর তালীযুক্ত ছিন্নবস্ত্র সর্বহারা ব্যক্তিকে (ধনীদেব) মুখাপেক্ষী করে। ঈদের সকালে ধনী ব্যক্তি তার সন্তানকে নতুন পোশাক পরিধান করায় আর নিঃস্ব ইয়াতীম সেই পোশাকের জন্য কান্নাকাটি করে।”^{২৮}

৪.২ ঈদের দিনে বিধবা রমণীদের মন:কষ্ট

ঈদের দিন সকালে সধবা রমণীগণ নানা ধরনের অলংকারে বিভূষিতা হয়ে সকাল উদযাপন করে, আর বিধবা নারীদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। সমাজের এ বাস্তবতা লক্ষ্য করে কবির অনুভূতি হচ্ছে ঈদের দিন না আসলেই ভাল হত। কেননা এ দিনে শোকাহত পরিবারে কষ্টের বন্যা বইতে থাকে। তিনি বলেন,

صباح به تغدو الحلائل بالخلي * وَتَرْفُضَ من عين الأرامل أدمع
ألا ليت يوم العيد لا كان أنه * يجدد للمحزون حزناً فيجزع
يرينا سروراً بين حزن وإنما * به الحزن جد والسرور تصنع
فمن يؤساء الناس في يوم عيده * نحوس بها وجه المسرة أسفع

“ঈদের সকালে সধবা রমনীগণ অলংকারে বিভূষিতা হয়ে প্রভাত করে, আর বিধবা নারীদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। আহ! ঈদের দিন যদি না থাকত (তবে কতইনা ভাল হত) কেননা উহা চিত্তিত ব্যক্তির চিত্তাকে সঞ্জীবিত করে, ফলে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। দুঃখের মাঝে ইহা আমাদেরকে আনন্দ প্রদর্শন করে, মূলত দুঃখ হচ্ছে উহার প্রকৃত রূপ আর আনন্দ হচ্ছে কৃত্রিমতা মাত্র। ঈদের দিনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে এমন একটি লক্ষণ রয়েছে, যার কারণে আনন্দের অবয়ব (চেহারা) ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।”^{২৯}

৪.৩ ঈদুল আযহার সকালে চারিদিকে কবির দৃষ্টিপাত

ঈদের দিনের সকাল হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় প্রকাশ পায়। কিন্তু দুঃখীদের দুঃখ কষ্ট ঈদের মুখমণ্ডলের উপর একটা কালো চিহ্ন নিষ্ক্ষেপ করে। ঈদুল আযহার সকালে বের হয়ে চারিদিকে কবি তাঁর দৃষ্টিপাত করেন অতঃপর তাঁর সামনে বিপরীতধর্মী দৃশ্য প্রকাশ পায়। এদিকে সূর্য যেন উর্ধ্বজগত থেকে পৃথিবীর পীড়িত মানুষের আর্তনাদ শোনার জন্য উঁকি মারে। অতঃপর সমাজের বাস্তবতা লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়। কবির ভাষায়,

قد ابيض وجه العيد لكن يؤسهم * رمى نكتاً سوداً به فهو أبقع
خرجت بعيد النحر صباحاً فلاح لي * مسارح للأضداد فيهن مرتع
خرجت وقرص الشمس قد ذر شارفاً * ترى النور سبلاً به يتدفق
هي الشمس خؤد قد أطلت مُصيخة * على الأرض من افق العلا تتطلع

“ঈদের দিবসের মুখমণ্ডল শুভ্র বর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু তাদের (দুঃখীদের) দুঃখ কষ্ট উহার (ঈদের মুখমণ্ডলের) উপর একটা কৃষ্ণকায়-চিহ্ন নিষ্ক্ষেপ করেছে। যার ফলে উহা (বিবর্ণ) স্থায়ী হয়ে গেছে। কুরবানীর ঈদের দিন সকালে আমি বের হলাম, অতঃপর আমার সামনে বিপরীতধর্মী চারুণভূমি প্রকাশ পেল। আমি বের হয়ে পড়লাম এমতবস্থায় যে সূর্যগোলক পূর্ব দিকে উদ্ভিত হয়েছে। তুমি উহার আলোক রশ্মিকে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হতে দেখবে। সেই দিবাকর এক যুবতী রমনী সদৃশ। সে উর্ধ্বগগন হতে যমিনের উপর (আর্তনাদ শোনার জন্য) কান পেতে উঁকি মেরে আছে।”^{৩০}

৪.৪ ঈদের মাঠে ইয়াতীম শিশুর করুণ চাহনি

ঈদের মাঠে হাজির হয়ে কবি হৃদয়ে নাড়া দেয়ার মত এক দৃশ্য অবলোকন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারিদিকে প্রকটভাবে ঢোল-তবলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে উঠতি বয়সের এক যুবক মাঠের এককোণে নিরবভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঢোলের কোন শব্দ যেন তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছেন। কবি বলেন,

تري مئعة الأطراب والطبل هادر * تفيض وفي أعصابهم تتميع
فقد كانت الأفراح تفتح بأبها * لمن كان حول الطبل والطبل يقرع
وقفت أجبل الطرف فيهم فراغي * هناك صبي بينهم مترعر
صبي صبيح الوجه أسمر شاحب * نحيف المباني أدعج العين أنزع

“ঢোল স্বজোরে ধ্বনিত হবার ফলে তুমি আনন্দ বন্যাকে তাদের কর্ণ কুহরে প্রবাহিত হতে দেখবে। ঢোল বাজার সময় তার চারপাশে উপস্থিত জনতার জন্য আনন্দরাশি তার (আনন্দ) দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল। আমি চারদিকে

দৃষ্টি বুলিয়ে দাঁড়াতেই তাদের মধ্যকার একটি উঠতি বয়সী বালক আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করলো। সে উজ্জ্বল চেহারার বিবর্ণ বাদামী রঙের ডাগর কালো চক্ষু বিশিষ্ট টাক মাথা ওয়ালা এক ক্ষীণকায় বালক।^{৩১}

৪.৫ ঈদের মাঠে ইয়াতীম বাচ্চার অবয়ব

কবি সেই ইয়াতিম বাচ্চাটির চেহারার বর্ণনা প্রদান করেছেন। তার কপালটি ছিল প্রশস্ত, ফলে তার ভ্রুগুলো দেখতে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তবে তার পোশাক-পরিচ্ছদে ও চেহারায়ে স্পষ্টই দারিদ্রতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি বলেন,

يَزِينُ حِجَابِيهِ اتساع جبينه * وفي عينه برق الفطنة يلمع
عليه دريس يعصر اليتيم رُدْنَه * فيقطر فقر من حواشيه مُدَقَّع
يُلِيحُ بوجهه للكآبة فوقه * غُبار به هبَّت من اليتيم زَعْرَع
على كثر قرع الطبل تلقاه واجما * كأن لم يكن للطبل ثمة مَقْرَع

“তার (বালকের) ললাটের প্রশস্ততা ভ্রুগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আর তার চক্ষুদ্বয়ে বিচক্ষণতার বিদ্যুৎ চমকচ্ছিল। তার পরনে রয়েছে জীর্ণশীর্ণ পোশাক। এমতাবস্থায় ভুলুষ্ঠনকারী (কঠোর) দরিদ্রতা বিন্দু বিন্দু করে বরছে। সে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ ধুলায় ধুসরিত একটি চেহারা প্রকাশ করছে যার উপর দিয়ে পিতৃহীনতার ভীষণ বাধা প্রবাহিত হয়েছে। ঢোলের অধিক শব্দ সত্ত্বেও তুমি তাকে নিঃশব্দ অবস্থায় দেখতে পাবে, যেন তথায় ঢোলের কোন শব্দই পৌঁছেনি।”^{৩২}

৪.৬ ঈদের মাঠে ইয়াতীমের হৃদয় ক্ষরণ

কবি বলেন, ঢোলের শব্দ যেন সে ইয়াতিম বাচ্চার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাধারণ মানুষের কথা ও চাহনির প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল। কবি বলেন,

كَأَن هدير الطبل يقرع سمعه * فلم يُلَفَّ رجعاً للجواب فيرجع
يردّ ابتسام الواقفين بحسرة * تكاد لها أحشاؤه تتقطع
ويرسل من عينيه نظرة مُجْهِشٍ * وما هو بالباكي ولا العين تدمع
له رجفة تنتابه وهو واقف * على جانب والجو بالبرد يلسع

“ঢোলের শব্দ যেন তার কর্ণকে ধ্বনিত করে (তার পক্ষ হতে) কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে সে (ঢোলের আওয়াজ) ফিরে আসে। সে অনুশোচনার (দুঃখ-দুর্দশার) দ্বারা দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মৃদু হাসির জবাব দিচ্ছিল আর উহার (দুঃখ-দুর্দশার) কারণে তার নাড়িভূড়ি টুকরা টুকরা হবার উপক্রম হচ্ছিল। সে তার নয়ন যুগল হতে ক্রন্দনযুক্ত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করছিল কিন্তু সে না কাঁদছিল আর না তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল। সে একপাশে দাঁড়ানো অবস্থায় উপর্যুপরি কম্পমান ছিল। আর তীব্র ঠাণ্ডা আবহাওয়া তাকে দংশন করছিল।”^{৩৩}

৪.৭ ইয়াতীম শিশুর অবলোকনে কবির হৃদয়ে ব্যথা

ইয়াতীম যুবকটি জীর্ণ-শীর্ণ পোষাকে ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। ইয়াতীম শিশুর এ অবস্থা অবলোকনে কবির হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি হয়েছিল। কবি বলেন,

يرى حوله الكاسين من حيث لم يجد * على البرد من بُرد به يتلفّع
فكان ابتسام القوم كالثلج قارساً * لدى حشرات منه كالجمر تلذّع
فلما شجاني حاله وأفزني * وقفت وكلي مجزع وتوجّع
ورحت أعاطيه الحنان بنظرة * كما راح يرنو العابد المتخشّع

“সে তার চারপাশে পোশাক পরিধানকারীদের দেখতে পাচ্ছে অথচ ঠাণ্ডা সত্ত্বেও সে নিজেকে আবৃত করার মত কোন চাদর পায়নি। বিদম্বকারী অগ্নিকুণ্ডের মত তার (বালকের) দুর্দশার নিকট সম্প্রদায়ের মৃদু হাসি ছিল বরফের ন্যায় কনকনে ঠাণ্ডা (কর্তনকারী ঠাণ্ডা)। তার অবস্থা আমাকে ব্যথিত ও বিচলিত করে তুলল। আমি

তথায় দাঁড়ালাম আর আমার সমস্ত মন-প্রাণ দুগুণে সিয়মান ও ব্যথিত হয়ে পড়ল। ধর্মভীরু উপাসকের অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ন্যায় আমি তার দিকে করুণার দৃষ্টি রেখে রওয়ানা হলাম।”^{৩৪}

৪.৮ ইয়াতীম শিশুর নিকটে কবির পরিচয় জানা

কবি শিশুটির পরিচয় জানার জন্য তার নিকটে গিয়ে আশু করে তার নাম জানতে চাইলেন এবং তার করুণ পরিচ্ছিত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কবির ভাষায়,

وأفتح طرفي مُشَبَّعاً بتعطُّف * فترتد طرفي وهو بالحزن مشبع
هناك على مهل تقدمت نحوه * وقلت بلطف قول من يتضرع
أيا ابن أخي من أنت ما اسمك ما الذي * عراك فلم تفرح فهل أنت مُوجع
فهَبْ أُمَامِي مِنْ رُقَادٍ وَجُومِهِ * كما هَبْ مَرعُوبَ وَالْجَنَانَ الْمُهْجَعِ

“আমি আমার করুণাপূর্ণ চক্ষু উন্মোচন করলাম অথচ চিন্তা বিজড়িত অবস্থায় উহা ফিরে আসল। আমি তথায় ধীরস্থিরভাবে তার দিকে অগ্রসর হয়ে বিনয়ের সাথে নম্র ভাষায় বললাম: ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কে? তোমার নাম কী? তোমার কী হয়েছে যে আনন্দ করছ না? তবে তুমি কী ব্যথিত? ভীত ব্যক্তির ঘুম থেকে জেগে উঠার ন্যায় সে আমার সম্মুখে চেতনাহীন তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হল।”^{৩৫}

৪.৯ ইয়াতীম শিশুর বাড়ি অভিযুখে যাত্রা

ইয়াতীম শিশুটি দ্বিদের মাঠের ভিন্নধর্মী চিত্র মোটেও সহ্য করতে পারছিলেন। তাই সে সেখান থেকে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে কবি তার পিছু নেন। কবি বলেন,

وأعرض عني بعد نظرة يائس * رواح ولم ينس إلى حيث يهْرَع
فَعَقْبَتُهُ مُسْتَطَلْعاً طُلُعَ أَمْرُهُ * عَلَى الْبُعْدِ أَقْفُو الْأَثَرُ مِنْهُ وَأَتَبِعْ
وَبَيْنَاهُ مَا شِئَ حَيْثُ قَدْ رُحِتْ خَلْفَهُ * أَدَبَ دَيْبِ الشَّيْخِ طَوْرًا وَأَسْرَعَ
لَحْتُ عَلَى بُعْدِ إِشَارَةِ صَاحِبِ * يَنَادِي أَنْ ارْجِعْ وَهُوَ بِالثُّوبِ مُلْمَعِ

“সে নিরাশা ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপের পর আমার থেকে বিমুখ হলো এবং কোন কথা না বলেই তার পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। তার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আমি দূর থেকে তার পিছু নিলাম এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম। চলার সময় একজন পথচারী আমার ও তার মাঝে আড়াল হলো, আর তার পিছনে আমি কখনও বৃদ্ধের (ধীরগতির) ন্যায় এবং কখনও দ্রুত গতিতে চললাম। সামান্য দূরে আমি কাপড় দ্বারা আবৃত জনৈক বন্ধুর ইঙ্গিত লক্ষ্য করলাম। সে আমাকে ফিরে যেতে আহবান করছে।”^{৩৬}

৪.১০ ইয়াতীম শিশুর বাড়ির দরজায় কবির অপেক্ষা

কবি শিশুটির প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তার বাড়ীর দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন,

فَأَوَّمَاتُ أَنْ ذَكَرْتُهُ مَوْعِدًا لَنَا * وَقُلْتُ لَهُ اذْهَبْ وَانْتَظِرْ فَسَارِجِعْ
وَعُدْتُ فَأَبْصُرْتُ الصَّبِيَّ مُعْجَزًا * لِيَدْخُلَ دَارًا بَابَهَا مُتَضَمِّعُ
فَلَمَّا أَتَيْتُ الدَّارَ بَعْدَ دَخُولِهِ * وَقَمْتُ حَيْالَ الْبَابِ وَالْبَابِ مُرْجِعُ
دَنَوْتُ إِلَى بَابِ الدَّوْبِيرَةِ مَطْرَقًا * وَأَصْغَيْتُ لَا عَنْ رَيْبَةٍ أَسْمَعُ

“আমি আমার প্রতিশ্রুত স্থানের কথা তাকে স্মরণ করে দিয়ে ইশারা করলাম এবং বললাম তুমি গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই আসছি। আমি ফিরে এসে বালকটিকে ভগ্নপ্রায় দরজাবিশিষ্ট একটি ঘরে ঢুকার জন্য পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখলাম। তার (ঘরে) প্রবেশের পর আমি এসে ঘরটির দরজার সম্মুখে দাঁড়ালাম আর উহার

দরজা ছিল বন্ধ। আমি নিঃশব্দে ছোট ঘরটির দরজার নিকটবর্তী হলাম এবং সন্দেহের বশবর্তী নয় বরং শোনার জন্যই কান পেতে রইলাম।”^{৩৭}

৪.১১ বাড়ির ভেতরে ইয়াতীম শিশুর কান্না

কবি মা'রুফ আর-রুসাফী বাড়ীর ভেতর থেকে শিশুটির প্রচণ্ড কান্না শুনতে পান। যেমন তিনি বলেন,

سمعت بكاءً ذا نسيج مُردّد * تكاد له صمّ الصفا تتصدّع
فجرت وعيني ترمق الباب خلسةً * وللنفس في كشف الحقيقة مطمّع
أرجع أدراجي ولم أك عارفاً * جلية هذا الأمر أم كيف أصنع
فمرت عجز في الطريق وخلفها * فناة يغشها ازارٌ وُرفّع

“আমি ক্রমাগত ফুঁকিয়ে ফুঁকিয়ে কাঁদার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে ক্রন্দনে কঠিন পাথরও খণ্ড বিখণ্ড হবার উপক্রম হয়। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক দৃষ্টিতে (সতর্কভাবে) দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম আর আমার অন্তরে ছিল রহস্য উদঘাটনের লালসা। ঘটনার বাস্তব রূপ উপলব্ধি না করেই কি আমি আমার পথে প্রত্যাবর্তন করব না অন্য কোন পথ অবলম্বন করব। (এমতাবস্থায়) এক বৃদ্ধা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এবং তার পিছনে ছিল ইয়ার ও বোরকা দ্বারা আবৃত এক যুবতী রমনী।”^{৩৮}

৪.১২ ইয়াতীম শিশুর মা সালমার আর্তনাদ

কবি লক্ষ্য করলেন যে, শিশুটির মা সালমাও প্রচণ্ড কান্না করছিল। তার ভাষায়,

عزاه إلى إيقاعه مُوقعاً به * وما هو يا ابن القوم للجرم موقع
ولكنّ غدر الخافدين رمى به * إلى السجن فهو اليوم في السجن مُودّع
فحقّ لسلمي أن تنوح فإنها * من العيش سماً ناقعاً تتجرّع
فلا غرو من أم اليتيم إذا غدت * ضحى العيد يُبكيها اليتيم المضئّع

পুলিশ সুপার তাকে একটি অপরাধমূলক কাজের মূলহোতা বলে চিহ্নিত করল, হে গোত্রের সন্তান! কিন্তু সে উহার সংঘটক ছিলনা। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণদের বিশ্বাস ঘাতকতা তাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করেছে। তাই আজ তাকে কারাগারে রাখা হয়েছে। তাই ক্রন্দন করা সালমার জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে কেননা সে জীবনের হত্যাকারী ‘গরল’ (বিষ) ঢোকে ঢোকে পান করছে। ইয়াতীমের মাতার জন্য এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, তার ঈদের সকাল হবে এমতাবস্থায়, নিঃস্ব ইয়াতীম তাকে কাঁদাবে।”^{৩৯}

৫. সাহিত্যিক মূল্যায়ন

কবি মা'রুফ আর-রুসাফী রচিত ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতাটি একটি বাস্তবধর্মী কবিতা; যেখানে কবি সমকালীন ইরাকী সমাজের বাস্তব চিত্র অংকন করতে স্বার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত কবিতার ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। এ কবিতার মাধ্যমে কবি পাঠক হৃদয়ের গহীন কোঠায় অনায়াসে স্থানলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ কবিতার ভাষা এতটাই হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠক অবচেতন মনে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। এর বর্ণনাভঙ্গি এতটাই প্রাণবন্ত যে, কবিতাটির একলাইন পড়ার পরে দ্বিতীয় লাইনে কী আছে তা জানার ব্যাপারে পাঠকের মনে প্রবল আগ্রহ তৈরী হয়। এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি অনেকক্ষেত্রে উপন্যাসের মত। উপন্যাসে যেমন মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি বর্ণনার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়, ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতায়ও তেমনি একটি ইয়াতীম বাচ্চা ও তার পরিবারের সন্ধান চিত্র কাব্যিক বর্ণনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। কবিতাটিতে অন্তর্মিলিত অত্যন্ত চমৎকার। মূলত ‘আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ’ কবিতাটি কবি মা'রুফ আর-রুসাফী রচিত একটি স্বার্থক কবিতা যার সাহিত্যিক মূল্য অনন্য।

৬. উপসংহার

মারুফ আর-রুসাফী আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন অনন্য প্রতিভা। আরবী সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর সফল পদচারণা ছিল। মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হিসেবে তিনি সমধিক বিবেচিত। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী এবং সাহিত্যিক শৈল্পিকতার ফলে আরবী সাহিত্য লাভ করেছে গতিময় ছন্দ এবং সাহিত্য অনুরাগীগণ পেয়েছেন মনের খোরাক। সমাজের বাস্তব চিত্রকে শৈল্পিক তুলির নিপুণতায় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মারুফ আর-রুসাফী এক অনন্য প্রতিভা। আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে রয়েছে তাঁর দখল। বিশেষত আধুনিক আরবী কবিতার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সর্বোপরি আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইরাকের কবি মারুফ আর-রুসাফী'র অবদান অনস্বীকার্য। *আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ* কবিতায় তিনি সমাজের দুঃ ও বঞ্চিত শ্রেণির জীবনধারা অত্যন্ত সূচারুরূপে চিত্রিত করেছেন। ঈদের দিনে একজন ইয়াতীম শিশুর মনে যে প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রণার উদ্বেগ হয় তার সন্ধান চিত্র অংকন করেছেন এ কবিতায়। এ দিনে সচ্ছল পরিবারে যেমন ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে অসচ্ছল ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি *আল-ইয়াতীম ফিল ঈদ* কবিতায় ঈদের দিনে উভয় শ্রেণীর মাঝে যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ মুহিউদ্দীন আল-খাইয়্যাভ, *মুকাদ্দামাতু দিওয়ানির রুসাফী* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আহলিয়াহ, ১৯১০ খ্রি.), পৃ. ১; আহমাদ কাকিশ, *তারীখুশ শি'র আল-আরাবী আল-হাদীস*, পৃ. ৪০০; আল-জামে'উ ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।
- ^২ আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খান, 'মারুফ আর-রুসাফী ওয়া তা'ছীরুল কুরআনিল কারীম ফী শি'রিহি', *আল-মাজল্লাতুল আরাবিয়াহ*, সংখ্যা-২, জুন ১৯৯৬ খ্রি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৭; Jhon A. Haywood, *Modern Arabic literature*, p. 26-29.
- ^৩ আহমাদ কাকিশ, *তারীখুশ শি'র আল-আরাবী আল-হাদীস*, পৃ. ৪০০; আল-জামে'উ ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ১০১৫।
- ^৪ ইউসুফ ইজ্জুদ্দিন, *ফিল আদাবিল আরাবী আল-হাদীস* (কায়রো: আল-হাইয়্যাতুল মিসরিয়াতুল 'আম্মাহ লিল কুতুব, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৬৯; ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫।
- ^৫ হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ১০১৫।
- ^৬ আল-জামে'উ ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।
- ^৭ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ১৪৬।
- ^৮ ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।
- ^৯ সালমা আল-খাদরা আল-জায়সী, *আল-ইত্তিজাহাতু ওয়াল হারকাতু ফিশ শি'রিল 'আরাবিল হাদীস* (লাইডেন, প্রকাশনা সংস্থার উল্লেখ নেই, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ১৮৯।
- ^{১০} Jhon A. Haywood, *Modern Arabic Literature*, p. 110.
- ^{১১} ওয়াফাঈল বাত্তী, *আল-আসরু ফিল ইরাকিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (কায়রো: প্রকাশনা সংস্থার উল্লেখ নেই, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৭২; ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ২১৭।
- ^{১২} আহমাদ কাকিশ, *তারীখুশ শি'র আল-আরাবী আল-হাদীস*, পৃ. ৪০০; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ১৪৭।
- ^{১৩} ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭।
- ^{১৪} তদেব।
- ^{১৫} হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ১০১৬; আল-জামি'উ ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; Jhon A. Haywood, *Modern Arabic Literature*, p. 110.
- ^{১৬} ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ২১৭; ড. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম, *আরবী সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, পৃ. ১০৬।
- ^{১৭} Jhon A. Haywood, *Modern Arabic Literature*, p. 110.
- ^{১৮} আহমাদ কাকিশ, *তারীখুশ শি'র আল-আরাবী আল-হাদীস*, পৃ. ৪০০।
- ^{১৯} Jhon A. Haywood, *Modern Arabic Literature*, p. 110.
- ^{২০} আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খান, 'মারুফ আর-রুসাফী ওয়া তা'ছীরুল কুরআনিল কারীম ফী শি'রিহি', পৃ. ৬৪।
- ^{২১} ইউসুফ ইজ্জুদ্দিন, *ফিল আদাবিল আরাবী আল-হাদীস*, পৃ. ৭০।

-
- ২২ ড. আহমাদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২২৪।
- ২৩ মারুফ আর-রুসাফী, দীওয়ান, পৃ. ৫।
- ২৪ হান্না আল-ফাখুরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১০১৬; হান্না আল-ফাখুরী, আল-মুজাযু ফীল আদাবিল 'আরাবী ও তারীখুল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭২।
- ২৫ আহমাদ কবিশ, তারীখুশ শির আল-'আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৪০০।
- ২৬ আহমাদ কবিশ, তারীখুশ শির আল-'আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৪০১; ড. মুহাম্মাদ ইকরামুল ইসলাম, তদেব, আরবী সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃ. ১০৭; ড. আহমাদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২১৯-২৩; ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা, পৃ. ১৪৯-৫৫; জি. এম. মেহরুল্লাহ, আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য (ঢাকা: নাহদা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৭৪-৭৮।
- ২৭ কাসিম আল-খাত্তাত ওয়া মুহাম্মাদ 'আব্দুল মুন'ঈম খাফাজী, মারুফ আর-রুসাফী: শাইরুল 'আরাবিল কবির, হায়াতুল ওয়া শিরুহ (কায়রো: আল-হায়াতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ১৪৩।
- ২৮ মারুফ আর-রুসাফী, আদ-দীওয়ান (মিসর: আল-মাতবা'আতুল 'আশরিয়্যাহ, ১৯২৪ খ্রি.), পৃ. ২১০।
- ২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১।
- ৩০ তদেব।
- ৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২।
- ৩২ তদেব।
- ৩৩ তদেব।
- ৩৪ তদেব।
- ৩৫ তদেব।
- ৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।
- ৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪।
- ৩৮ তদেব।
- ৩৯ তদেব।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগত মূল্যায়ন [Characteristic Evolution of the book *Hujjatullahil Baligah*]

মুকাররম হুসাইন*

[Abstract: Hujjatullahil Baligah' is considered to be the best of the books written by Shah Waliullah. In this book, such a strong, comprehensive and authoritative picture of Islamic Shari'ah is presented, where aqeedah-belief, ibadat, transactions, rituals, morals, character, sociability, civilization, culture, politics are presented as a whole. At the same time, they are presented in such a way of logic and harmony as if they were pearls of the same necklace. As a result, nothing can even temporarily hide the core branches, aims and objectives or the means as well as elements. This strong and complete explanation of Islam is visible in every page of Hujjatullahil Baligah and it is rare in any other book. According to Saiyed Abul Hasan Nadwi, no book of this standard with such explanation full of wisdom has been written or at least not available at the moment in front of the people of the world. This Hujjatullahil Baligah brought a transparent and complete concept about the Quran-Sunnah, Philosophy, Physics, Hikmah, Economics Biology, Management, Political Science etc. The demand of great scholars and wise persons was like that. Such things are known by reading the content of "*Hujjatullahil Baligah*", the immortal creation of Shah Waliullah Muhaddith Dehlawi. For example, he considered the arkan (pillars) of Islam not only as a rukon but also discussed in details the methods of attaining more aims and goals through these arkan. Therefore, Hujjatullahil Baligah is a suitable book for research and for attaining the knowledge of aqeedah and fiqh. The thesis consists of five parts and they are introduction, purpose, method, result and conclusion.]

Keywords: Shah waliullah, Hujjatullahil Baligah, Fiqh, Qias, Aqidah, Towhid, Shirk.

১. ভূমিকা

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রহ. রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-কে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। যার মধ্যে ইসলামী শরীআতের এমন মজবুত, সামগ্রিক ও প্রামাণ্যচিত্র পেশ করা হয়েছে, যেখানে 'আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, আখলাক-চরিত্র, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইহসানকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে এগুলো এমন এক যোগসূত্রে ও সামঞ্জস্যের সাথে পেশ করা হয়েছে, মনে হয় যেন তারা একই মালার মুক্তা। তাতে মূল শাখা-প্রশাখা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অথবা উপায়-উপকরণ সাময়িকের জন্যও আড়াল হতে পারে না। এই সামঞ্জস্যের কারণ শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র হাদীসশাস্ত্র ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবন। দেখলে মনে হয়, নববী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল কোন আলেমে রব্বানীর সংস্পর্শেরই ফল। ইসলামের এই মজবুত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা, যা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়, যা খুব কম বইয়েই দৃষ্টিগোচর হয়। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী রহ. বলেন, 'আমার জানামতে কোন মাযহাবের সমর্থনে এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই মানের গ্রন্থ রচনা করা হয়নি, আর হয়ে থাকলেও তা বর্তমানে জগতবাসীর সামনে নেই।' বারো হিজরী শতকের পরে ভারতবর্ষে এক বিশেষ ধরনের 'দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সে কারণে অনেক মেধা বিভ্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিশেষ করে হাদীস ও সুন্নাহর উপর নানা অভিযোগ-আপত্তি ও সন্দেহের দৃষ্টি পড়েছিল। এগুলোর বিপরীতে কুরআন-সুন্নাহ, দর্শন ও

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

হিকমতশাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, চারিত্রিক জ্ঞান, জীববিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নিয়ে আসেন এই *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* বই এর মাধ্যমে। জ্ঞানী-গুণীদেরও এমনই চাহিদা ছিল।^২

এ গ্রন্থে মানুষের জীবন কিভাবে সুখময় ও সুন্দর হতে পারে তা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে নাগরিক জীবন, পারস্পরিক লেন-দেন, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বিভিন্ন দিক তিনি বিন্যস্ত করেছেন।^৩ উক্ত গ্রন্থে উপস্থাপিত ও আলোচিত ফিকহ ও আকীদাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২. ফিকহশাস্ত্রের পরিচয়

আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত বিধান কুরআন-সুন্নাহরই নির্ধারিত, যা ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণ। ইসলামী জ্ঞানের একটি শাখা আর্বিভাবে প্রয়োজন ছিল; যা ব্যবহারিক জীবনের সকল চাহিদাকে সম্পন্ন করবে। “ইলমুল ফিকহ” হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের সেই বিশেষ শাখা, যা কুরআনুল কারীমের ফায়সালা অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে দ্বীনের জ্ঞান প্রকাশ করে থাকে। তাই সমীচীন হচ্ছে একদল লোক ফিকহের গবেষণায় নিমগ্ন থাকবে এবং অন্যরা তাদের কাছ থেকে সে বিষয়গুলো গ্রহণ করবে। যেমন এরশাদ হচ্ছে- “তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যেন তারা দ্বীনের জ্ঞান (ফিকহ) অর্জন করে, এবং সতর্ক করে জাতিকে, যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে”।^৪ মূলত: ফিকহ কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ থেকে আলাদা কিছু নয়; বরং এ দুয়ের গভীরে থাকা বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে সামনে আনার নামই হচ্ছে ফিকহ।

ফহ শব্দটি আরবী, যা বাবে *سمع يسمع* এর মাসদার। এর অর্থ বুঝা, জ্ঞানী হওয়া, দক্ষতা, মেধা, উপলব্ধি করা, গভীরভাবে কিছু বুঝতে পারা, উন্মোচন করা, সুক্ষদর্শিতা, অনুধাবন করা, ফিকহ শাস্ত্রজ্ঞান।^৫

ড. ইয়ায আস-সুলামী বলেন, ফিকহ শব্দের অর্থ *الفهم* বা বুঝা, অথবা *معرفة باطن الشيء* বস্তুর গোপনীয়তা জানা, *إلى الوصول* বা বস্তুর গভীরে পৌছা।^৬

মাওসুআতু ফিকহিল ইসলামী প্রণেতা বলেন, *معرفة النفس ما لها وما عليها* নফস ও আত্মার জন্য যে সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয় তা যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।^৭

ইমাম শাফিঈ রহ. ফিকহের সংজ্ঞায় বলেন, শরীআতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরীআতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলে।^৮

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. বলেন, *أن الفقه معقول من منقول* আল-কুরআন ও হাদীস থেকে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে ফিকহ বলা হয়।^৯

অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ আফরীকী আল-মিসরী রহ. বলেন,

العلم بالشئ والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم.

ফিকহ শব্দের অর্থ হল, কোনো কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা। অন্যান্য ইলম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরে শারঈ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব, ফযীলত ও মহত্ত্বের কারণে এর ব্যবহার শারঈ ইলমের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।^{১০}

ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: ফিকহের উৎপত্তি মূলত: রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগেই। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সময় ফিকহের উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

ক. রাসূল সা. এর যুগ। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে রাসূল সা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে ফিকহের প্রথম যুগ বলা হয়। এগুলো আবার দুই ভাবে হতে পারে। হিজরতের পূর্বে ও পরে।^{১১}

খ. খুলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবীদের যুগ। যা রাসূল সা.-এর যুগের সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে বয়োজৈষ্ঠ সাহাবী, চার খলিফাসহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী এবং রাসূলের স্ত্রীগণ।

গ. নবীন সাহাবী ও প্রবীন তাবেঈ এর যুগ। রাসূল সা. এর ইত্তিকালের পর তাদের পরবর্তী প্রজন্মে যারা সাহাবী হয়েও জীবিত ছিলেন। সাথে যারা প্রবীণ সাহাবীদের দেখে তাবেঈ হয়েছেন, তাদের যুগ।

ঘ. ফিকহ সংকলন, সংরক্ষণ ও ইজতিহাদের যুগ। ফিকহ চর্চার এটাই সোনালী যুগ বলা যেতে পারে। এ সময়ই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহিমাহুমুল্লাহ) সহ অনেক মুজতাহিদ ইমামের ফিকহ চর্চার ইতিহাস পাওয়া যায়।^{১২}

৩. ফিকহী গ্রন্থ হিসেবে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ

ফিকহী গ্রন্থ হিসাবে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ সত্যিই অতুলনীয়। কারণ সেখানে একটি একটি করে ফিকহী মাসআলাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। শায়খ মুহাম্মাদ মানযুর নোমানী বলেন, ‘এটি এমন একটি গ্রন্থ যার পূর্বে এ বিষয়ে এমন গ্রন্থ রচিত হয়নি। এই গ্রন্থটি সকল কিছুই মধ্য সমন্বয় ও সংযোজন ঘটিয়ে প্রথমত: ‘আকল ও নকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, দ্বিতীয়ত: তাসাউফ ও শরী‘আতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, তৃতীয়ত: উসূল এবং আখলাককে মিশ্রিত করে। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা গ্রন্থের অনন্য দিক।’^{১৩}

হাদীসের সাথে ফিকহ, তাছাউফের সাথে শরী‘আত, আকল ও নকলকে মিশ্রিত করার প্রচেষ্টা শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এর প্রায় সব গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোর সাথে সাথে ইজতিহাদ ও তাকলীদ নিয়েও অনেক আলোচনা করেছেন। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’র পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হল عقد الجيد

في أحكام الاجتهاد والتقليد। সেখানে তিনি ফিকহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং ইজতিহাদ ও তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে এসেছেন। তিনি ফিকহের গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে বলেন, ‘ফিকহের সবচেয়ে বড় রহস্য হল ইজতিহাদ। ফিকহ যখন ইজতিহাদকে হারিয়ে ফেলে তখন তা রুহবিহীন একটি শরীরের মতো হয়ে যায়’।^{১৪}

৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’র বিষয়বস্তু

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে লেখক ফিকহ ও আকীদা বিষয় ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি শুধু জ্ঞানকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস করেছেন। যথা: ১. ‘ইলমুল হাদীস, ২. ‘ইলমুল লুগাত। ৩. ‘ইলমুল ইসতিমাত। ৪. ‘ইলমুল ইসতিদলাল। ৫. ‘ইলমুল আসরার বা রহস্য। অতঃপর ‘ইলমুল আসরার নামক অধ্যায়ে শরীয়তের সাথে তাছাউফ এবং উসূলের সাথে আখলাককে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। তাদবীরুল মানযিল, আল-ইরতিফাকাত, জাতীয় রাজনীতি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি।^{১৫} ফিকহী গ্রন্থ হিসেবে হুজ্জাতুল্লাহ’র বড় প্রমাণ হল লেখক দুই খণ্ড বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় পুরোই ফিকহী মাসআলা-মাসআল নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪.১ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’র উপস্থাপিত ফিকহের উপাদান

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার হলেও ফিকহ গ্রন্থ হিসাবে বেশ উপযুক্ত এবং পরিচিত। ফিকহের উপাদান বলতে ইসলামের ঐসব মৌলিক বিষয় বুঝায়, যার উপর ইসলামের পুরো প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। শরীয়তের প্রধান উপাদান যেহেতু দু’টি। ফিকহের উপাদানও দু’টি তথা কুরআন ও সুন্নাহ।^{১৬} কুরআন-সুন্নাহর অনুমোদন সাপেক্ষে আরও দু’টি উৎস রয়েছে। এ দু’টি হলো যথাক্রমে ইজমা ও কিয়াস। সুতরাং ইসলামি শরীয়তের উৎস চারটি। আল-কুরআন, আল-হাদীস, আল-ইজমা, আল-কিয়াস। সুতরাং হুজ্জাতুল্লাহ গ্রন্থের ফিকহী উপাদান উপরিউক্ত ৪টি।

এক: আল-কুরআন ফিকহের মূল উপাদান যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ রহ. ফিকহের উপাদান হিসাবে কুরআন-সুন্নাহকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন- তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا। যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক।^{১৭} অত্র আয়াত থেকে তিনি যে ফিকহ নিয়েছেন, তা হচ্ছে- বিষয়বস্তুর মাঝে পারলৌকিক জ্ঞান ও ঐশী বিষয়ক কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত। সব জ্ঞান কেবল অহীর মাধ্যমেই অর্জিত হয়।^{১৮}

যেমন সপ্তম অধ্যায়ে খেজুর গাছের ফলন বৃদ্ধির জন্য পুরুষ গাছের ফুলের সাথে নারী গাছের ফুলের পরাগায়ন করার ব্যাপারে রাসূল সা. তাঁর পরামর্শ সম্পর্কে বলেন, সেটা ছিল আমার ধারণা, আমার

ধারণাকে তোমরা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিও না। তবে আল্লাহর তরফ থেকে যখন কিছু বলি তখন তা মেনে চলো। কারণ অহির ব্যাপারে আমি কখনো মিথ্যা বা ভুল বলি না। রাসূল সা. বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

‘নিঃসন্দেহে আমি একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেই, তা গ্রহণ কর। আর যখন নিজের তরফ থেকে তোমাদের কোন কথা বলি, তখন তা একজন মানুষ হিসাবেই বলি’।^{১৯}

মহান আল্লাহ বলেন, “তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো অহি, যা তার প্রতি প্রত্যাশে হয়”।^{২০} তাছাড়া কুরআন এর আভিধানিক অর্থ আবৃত্তি করা, পাঠ করা, একত্র করা। সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে কুরআন সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। তাই একে কুরআন বলা হয়।^{২১} মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। জিবরিল তা নিয়ে অবতরণ করছেন”।^{২২} যেহেতু কুরআনের আলোচ্য বিষয়: মানব জাতি। সুতরাং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মূলনীতি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, “আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম”।^{২৩}

দুই: আল হাদীস শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রহ. এর নিকট দ্বিতীয় উপাদান হলো হাদীস বা সুন্নাহ। আস-সুন্নাহ অর্থ রীতিনীতি। শরি’আতের পরিভাষায় মহানবী সা. এর কথা, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতি-নীতিকে সুন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহের অপর নাম হাদীস। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইসলামী শরি’আতের বিভিন্ন বিষয়ের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। সুন্নাহ বা হাদীস ব্যতীত কুরআন সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। যেমন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي بُعِثْتُ بِالْخَيْفَةِ السَّمْحَةِ، وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرُّهْبَانِيَّةِ الْبِدْعَةِ، فَكُلُّوا اللَّحْمَ، وَاتَّبِعُوا النِّسَاءَ، وَصُومُوا وَأَفْطَرُوا وَفُؤِمُوا وَنَامُوا، فَإِنِّي بِذَلِكَ أُمِرْتُ

আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমি একনিষ্ঠ দ্বীনসহ এবং সহজ ও সাবলীল দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি। আমি নব উদ্ভাবিত বিদ’আতী বৈরাগী হিসাবে প্রেরিত হয়নি। সুতরাং তোমরা গোস্ত খাও, বিয়ে করো, সওম পালন করো, মাঝে মাঝে বিরতি দাও, রাত জেগে ইবাদত কর এবং ঘুমাও। কারণ আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি।^{২৪}

উক্ত হাদীসের ফিকহী বিশ্লেষণে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, ‘সামহা’ শব্দের তাৎপর্য এই যে, তাতে কষ্টকর কোন ইবাদত নেই। অর্থাৎ পাদীরা যেক্ষেপ কষ্টকর ইবাদত বানিয়ে নিয়েছে তা মূলত দ্বীনে নেই। উপরন্তু তাতে প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অবকাশ ও বিকল্প রয়েছে। ফলে দুর্বল, সক্ষম ব্যবসায়ী বা অবসরপ্রাপ্ত সবাই সহজে সে দ্বীন অনুসরণ করতে পারে। ‘হানিফিয়া’ শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে ইবরাহিম আ. এর মিল্লাত। তার কাজ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত করা ও শিরকের নমুনাগুলো নিশ্চিহ্ন করা। সাথে তার মধ্যকার বিকৃতি বিচ্যুতি এবং কুসংস্কার বিলুপ্ত করা।

তিন: ইজমা ইজমা (الإجماع) শব্দটি আরবী, বাবে إفعال এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- কোন বিষয়ে সকল জনগণ একমত হওয়া।^{২৫} ইবন উমার রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ আমার পুরো উম্মাতকে কখনও পথভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহর হাত জামা’আতের উপর রয়েছে।^{২৬} উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বিদ্যানরা মনে করেন এখানে জামা’আত বলতে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত আর কোনো কিছুতেই মুসলিম উম্মাহ একমত হবে না।^{২৭}

ইজমা সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া রহ. বলেন,

معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة.

ইজমা এর অর্থ এটা যে, আহকামের ভেতর কোন হুকুমের উপর মুসলিম আলিম বা বিজ্ঞগণ ঐকমত্য হয়ে যাওয়া। আর যখন কোনো হুকুমের উপর উম্মতের ইজমা প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন কারো জন্য জায়েয নয় যে, আলিমদের ঐ ইজমা থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ উম্মত কখনই গোমরাহীর উপর ঐকমত্য হতে পারে না। কিন্তু অনেক মাসাইল এর উপর কিছু লোক ভাবে যে, এর উপর ইজমা আছে। কিন্তু আসলে ঐ মাসআলায় ইজমা হয়নি। কারণ অন্য বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহয় হয়তো বিদ্যমান যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।^{২৮}

ইজমা বিষয়ে আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রহ. বলেন, ইজমার অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে ইসলামী শরী‘আতে তাহরীফ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাহরীফ বা দ্বীনের পরিবর্তন কথিত ইজমা নামক অধ্যায় দিয়েই শুরু হয়েছে। মুজতাজিদ ইমাম ছাড়াই কতিপয় স্বার্থপর নামধারী আলেম একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইজমা দাবী করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় আরও বলেন, কোন এক যুগের দ্বীনের ধারক ও বাহকদের একটি অংশ কোন মাসআলায় একমত হয়ে গেল, তাতে সর্বসাধারণ ভাবল, ‘অধিকাংশের ইজমা হকের ওপরই হয়’। কিন্তু এটা আসলে ঠিক নয়। তাদের দেখা উচিত- যে মাসআলায় তারা একমত হয়েছে কুরআন-সুন্নাহ তার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে কি না। সুতরাং এ সব ইজমা সেই ইজমা নয় যার ওপর উম্মত একমত হয়েছে এবং যার প্রমাণ কুরআন-সুন্নাহয় বিদ্যমান। মূলত কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যার সমর্থন মিলে না তার ইজমা নাজায়েয। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ۖ “যখন লোকদের বলা হলো তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখেছি তার ওপরই বিশ্বাসী হব”।^{২৯}

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, আজকে ইহুদিরা ওয়াহীর আ.কে এবং সমস্ত নাসারা ঈসা আ. কে আল্লাহর স্থানে বসিয়েছে (নাউয়ুবিল্লাহ)। এক্ষেত্রে দেখা যায় খ্রিষ্টানদের সকল উম্মত এ বিষয়ে ইজমা করে ফেলেছে যে, ঈসা আ. মারা গেছেন এবং তিনি আল্লাহর পুত্র। অথচ তা সত্য নয়। সুতরাং ইজমা মানব কল্যাণে হলেও তার উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী বজায় রেখেই ইজমার দাবী পূরন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্য কারো অন্ধ আনুগত্য করাও দ্বীনের বিকৃতিতে অবদান রাখার শামিল। একমাত্র নবীগণই নিষ্পাপ। তাঁদের ছাড়া আর কারো অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ চলে না। এ ধরনের তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের পক্ষে উম্মতের কোন ইজমা ছিল না। কারণ জাতি তো সে সব মুজতাহিদের তাকলীদের ওপর একমত হয়েছেন, যাদের ইজতিহাদ কুরআন-সুন্নাহর অনুকূলে হয়েছে।^{৩০}

চার: কিয়াস কিয়াস কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. মুসলেহাত বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর বিশ্লেষণের পর মানব কল্যাণে প্রয়োজনে কোন নীতিমালা উপস্থাপন করা, যা কোনভাবেই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বা সাংঘর্ষিক নয়। কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই কিয়াসের ভিত্তিতেই আমরা জানতে পারি- যাকাতের একটা নেসাব হওয়া জরুরী। আমরা জানি ২০০ দিরহাম ও ৫ ওয়াসাক শস্য বা ফল একটি উপযুক্ত পরিমাণ। কারণ পরিমাণের কথা হাদীসে এভাবেই এসেছে।^{৩১} আর এই মানের সম্পদশালী একজন ব্যক্তি ধনী প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই কিয়াসের দাবি হলো, তার উপর যাকাত বা ওশোর ফরয। তবে এ বিষয়গুলো শুধু কুরআন-সুন্নাহর দলিলের আদলেই হওয়া উচিত।

কিয়াস সংক্রান্ত একটি বিশেষ সতর্কতা: শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য আলেম এ বিষয়ে একমত যে, ‘পরিমাণ নির্ধারণ’ এ কোন কিয়াস চলে না। কিয়াসের সাথে কুরআন-সুন্নাহর দলীলও জরুরী। কিয়াসের মূল কথা হচ্ছে, কোন মিশ্র কারণের ভিত্তিতেই মূলের হুকুমটি শাখা-প্রশাখায় স্থানান্তরিত হবে। কিয়াস একবারেই মানবরচিত বা মনগড়া হয়না; বরং এমন কারণ বিবেচনায় রাখে যার ওপর বিধানটি নির্ভরশীল হয়। যেমন রুগ্ন বা অপারগ কোনো মুসল্লির উপর সফরের কিয়াস চলে না। তার প্রতিবন্ধকতার জন্যে তাকে সময় দেয়া বা মুসলেহাতের দাবি হতে পারে বটে, সেটা কসর পড়া বা রোযা ভঙ্গের কারণ হতে পারে না। সে দুটোর জন্যই সফরই একমাত্র বিষয় যেটাকে তার কারণ বানানো হবে।

অনুরূপ কিয়াসের কুফল নিয়েও তিনি বক্তব্য রেখেছেন। যেমন গ্রন্থের ৭০ নং অধ্যায়ে “বিকৃতি থেকে দ্বীনের সংরক্ষণ” শিরোনামের এক অংশে তিনি কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ ইবন সিরিন রহ. বলেন, সর্বপ্রথম কিয়াস করেছিল শয়তান। সূর্য ও চন্দ্রের যে ইবাদত করা হয়, তা কেবল কিয়াসের মাধ্যমেই তারা বৈধ করে থাকে। হাসানুল বসরী রহ. বলেন, প্রথমে শয়তান সিঁজদা না করার যুক্তি উপস্থাপন করেছিল। যা মহান আল্লাহই বলেছেন, *خلقتني من نار وخلقته من طين* ‘হে আল্লাহ তুমি আমাকে তৈরী করেছ আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে’।^{৯২} অর্থাৎ সে মাটি থেকে, সে তো নীচেই থাকবে আর আমি আগুন থেকে হওয়াই আমার মাথা তো নীচে নামবে না (নাউয়িবুল্লাহ)।^{৯৩}

ইমাম শা’বী রহ. বলেন, তোমরা যদি সব বিষয়ে কিয়াস করে থাকো, তাহলে অচিরেই কোন হালালকে হারাম করে নেবে এবং হারামকে হালাল করে নেবে।^{৯৪} যেমন নিম্নের হাদীসে কিয়াস বা যুক্তি দিয়ে মানুষের নিকট হাদীস পেশ করার কৌশল ফুটে উঠেছে।

মু’আজ ইবন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত আছে। লোকদের মাঝে কুরআন এরূপ প্রসার লাভ করবে যে, আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা সবাই তা পাঠ করবে। তখন এক লোক বলবে, আমি এত কুরআন পড়লাম, অথচ লোকজন আমাকে মান্য করছে না। আল্লাহর কসম! এবারে আমি কুরআনের ওপর পুরোপুরি আমল করব। তা হলে হয়ত লোকজন আমাকে মান্য করবে। তারপর সে তাই করবে। তথাপি লোকজন তাকে মান্য করবে না। তখন সে বলবে, আমি বেশি বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করলাম, পুরোপুরি কুরআন আমল করলাম, তবুও লোকজন আমাকে মানছে না। এবারে আমি আমার ঘরে মসজিদ বানাব তাহলে হয়তো সবাই আমাকে মানবে। অতঃপর সে তাই করবে। তথাপি লোকজন তার অনুগত হবে না। তখন সে বলবে, আমি কুরআন তিলাওয়াত করলাম, তার ওপর আমল করলাম, এমনকি আমার বাড়িতে মসজিদ বানালাম, তথাপি লোকজন আমার অনুসারী হলো না। এবারে আমি এমন হাদীস বানিয়ে তাদের সামনে পেশ করব যা তারা আল্লাহর কুরআনে পাবে না, রাসূলের হাদীসেও পাবে না। তাহলে হয়তো লোকজন আমার অনুসারী হবে। মু’আজ রা. বলেন, এভাবে সে মনগড়া হাদীস পেশ করবে। তার থেকে বেঁচে থেকো। কারণ, সে যা বর্ণনা করবে তা সুস্পষ্ট গোমরাহী।^{৯৫}

৪.২ ‘আকীদাহর গ্রন্থ হিসাবে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ

আল-‘আকীদাহ’ (العقيدة) শব্দটি (ع ق د) মূল অক্ষর দ্বারা গঠিত ‘আকদুন’ শব্দ থেকে উদ্ভূত।^{৯৬} অর্থ- গিরা বা বাঁধন। যেমন- আল-কুরআনে ‘উকদাতুন নিকাহ’ (عُقْدَةُ النِّكَاحِ) বা বিবাহের বাঁধন বলা হয়েছে।^{৯৭} কর্ম ছাড়া কোন বিষয়ে সন্দেহাতীত চূড়ান্ত বিশ্বাসই ‘আকীদাহ’। তাই আল্লাহকে না দেখে, ফিরিশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, কিয়ামত, কবরের আযাব ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয় হলেও শুধু কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনায় সুদৃঢ় বিশ্বাস করার নাম ‘আকীদাহ’।^{৯৮} যাকে একভাবে ঈমানও বলে।^{৯৯} মুসলিম জীবন ‘আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। যার ‘আকীদাহ সঠিক নয়, সে একেবারেই ব্যর্থ মানুষ। কারণ বিশুদ্ধ ‘আকীদাহ মুমিন জীবনের মূল চাবিকাঠি ও মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় ভিত্তি। সেই বিশ্বাসের আলোকেই মানুষ তার সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু মুসলিমদের বিরাট অংশ ভ্রান্ত ‘আকীদাহ পোষণ করে থাকে। কেউ কুফরী ‘আকীদাহ লালন করছে, কেউ শিরকী, কেউ বিদ’আতী। এভাবে মনের অজান্তেই তারা ঈমান ও আমল ধ্বংস করে দিচ্ছে।^{১০০} ‘আকীদার ব্যাপারে তারা খুবই উদাসীন। তাদের কাছে ‘আকীদার কোন গুরুত্ব নেই।^{১০১}

মুসলিম জীবনে ‘আকীদার এ গুরুত্ব অনুধাবন করেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রহ. তাঁর রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে ‘আকীদার আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রায় পুরো অংশই আলোচনা করেছেন ‘আকীদাহ নিয়ে। সেখানে তাওহীদের গুরুত্ব, প্রকারভেদ, মুসলিমের মূল বিষয়ই তাওহীদ, আল্লাহর গুণাবলীর উপর ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান, আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এভাবে তাওহীদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।^{৪২}

ইসলাম বিদ্যে মাহল এমন ধারণা পোষণ করে যে, মুসলিমদের সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি হচ্ছে ‘আকীদাকে সমূলে বিনাশ করা অথবা এর কিছু বিষয় সংশোধন করা’। অথচ এটি একটি ভুল এবং বিপদজনক ধারণা। কারণ তারা চাইলেও এ বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয়; বরং তা অমোঘ, অপরিবর্তনীয়, অকাট্য।^{৪৩} তারা খ্রিস্টবাদের উদাহরণ খাড়া করে আল-কুরআন সংশোধন ও নতুনভাবে লেখার কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেনি।^{৪৪} অপরদিকে মুসলিমদের বিরাট অংশ নিজেদেরকে শিরক-বিদ’আতের আড্ডাখানায় প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে, কবরে বাতি জ্বালানো, লালশালু চড়ানো, সিজদা করা, মানত করা নিয়ে তারা ব্যস্ত। পীর-দরবেশদের সম্বন্ধিই যেন তাদের মূল ইবাদত। এজন্যই শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহেল বালিগাহ গ্রন্থে শিরকের হাকীকত, শিরকের প্রকারভেদ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ‘ইবাদত, অন্যের নামে যবহ, অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শানে মাথা নত করা বা সিজদা দেয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন।^{৪৫} তিনি বলেন, ‘সকল পুণ্যের উৎস হল তাওহীদ।’^{৪৬} সকল পুণ্যের ভেতর তাওহীদই সর্বোত্তম।^{৪৭} কারণ প্রতিপালকের সামনে একাত্মচিহ্নে নিজে সপে দেয়ার সর্বোত্তম কাজটি নির্ভর করে তাওহীদের উপর। রাসূলুল্লাহ সা.-এর বর্ণিত একটি হাদীসের উপর নির্ভর করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাওহীদকে ‘কলব’ বা অন্তরের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘জেনে রাখ! শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ! সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর’।^{৪৮} অনুরূপ কোনো মানুষ সবকিছু ঠিক রেখে যদি তাওহীদকে নষ্ট করে তাহলে তার সবকিছুই বরবাদ হবে। আর তাওহীদ ঠিক থাকলে বাকিগুলো ঠিক থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি আল-কুরআনের আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস^{৪৯} উল্লেখ করে তাওহীদের কারণে একজন মুমিন জান্নাতী হতে পারে আবার তাওহীদ বিহীন আমলকারী সবকিছু থাকার পরেও জান্নাত থেকে মাহরুম হতে পারে বলেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।^{৫০}

‘আকীদার উপর আলোচনা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ কিতাবে ঈমানের শাখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঈমানের স্তম্ভ ৬টি নিয়ে এসেছেন। যেমন ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান, ২. ফিরিশতামণ্ডলী ৩. কিতাবসমূহ ৪. রাসূলগণ ৫. বিচার দিবস ৬. তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এর মাঝে বিশেষ করে আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের প্রতি ঈমানকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন।^{৫১}

কিতাবের সাইত্রিশতম পরিচ্ছেদে ‘তাওহীদ’ এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা আকীদার মূল অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নবী-রাসূল সবাই দুনিয়াতে তাওহীদ বা আকীদার দাওয়াতই দিয়ে গেছেন।^{৫২} তাওহীদের যেমন রয়েছে ফযীলত এবং তেমনই রয়েছে গুরুত্ব। তাওহীদের ফযীলত ও গুরুত্বসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. তাঁর অমূল্য গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ। যেমন- ওছমান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি এই স্বাক্ষ দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা’বুদ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।^{৫৩}

ওবাদা ইবন সামিত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বাক্ষী দেবে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা’বুদ নেই, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালিমা যা মারঈয়াম এর প্রতি ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য- তার আমল যেমনই হোক, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।^{৫৪}

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যার শেষ কথা হবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।^{৫৫}

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. তাঁর কিতাবে তাওহীদকে চারভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন- ১. ওয়াজিবুল ওজুদ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কারো অস্তিত্বই স্থায়িত্ব পাবে না ২. আরশ, আকাশ, পৃথিবী ও সকল মৌলিক বস্তুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ ৩. আসমান ও যমীন এবং তাতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন এবং ৪. একমাত্র আল্লাহই ইবাদত লাভের যোগ্য।

‘আক্বীদাকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তাওহীদের পর তিনি শিরকের হাকীকত বা বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। সেখানে শিরকের প্রকারভেদ, শিরকের ভয়াবহতা, শিরকমুক্ত জীবনের গুরুত্ব ও ফযিলত ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহকে এক জানা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর জন্যই ইবাদত করা, কুরবানী, মান্নাত সবই আল্লাহর জন্যই করা। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তার জন্য মুক্তি সুনিশ্চিত, যদিও তার অন্যান্য গোনাহ থেকে থাকে। শুধু শিরক মুক্ত জীবন হতে হবে। যেমন তিনি একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন-

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, এমন এক ব্যক্তি সে কোন ভাল কাজ করেনি। সে মৃত্যুর সময় ঘনিজে আসলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ওসিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর মৃতদেহের ছাইভস্ম স্থলভাগে, আর সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দিবেন, যা দুনিয়ার কাউকেও কখনো দেননি। সে মারা গেলে তার সন্তানরা তার নির্দেশ মতই কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম করলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছাইভস্ম পড়েছিল সব একত্র করে দিলো। ঠিক এভাবে স্থলভাগকে নির্দেশ করলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছাইভস্ম ছিল সব একত্র করে দিলো। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ কাজ করলে? উত্তরে বলল, وَأَنْتَ أَعْلَمُ ‘তোমার ভয়ে হে রব! আর তুমি তো তা জানো’। তার এ কথা শুনে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।^{৫৬} প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই পাঠানো হয়েছে শিরকের আসল রূপ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য।^{৫৭}

যেমন মুশরিকরা তালবিয়া পাঠ করতো এমনভাবে- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ ‘হে আল্লাহ আমরা উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নেই। অবশ্য যে শরীক তোমার আছে, যার মালিক তুমি এবং তারা যে জিনিসের মালিক তারও তুমি মালিক।’ রাসূল সা. বলেন, এ কথা বলে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে।^{৫৮} ইসলাম এসে তার বিপরীতে সঠিক শিক্ষা দিয়েছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. এর তালবিয়া ছিল লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক। অর্থাৎ আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার দরবারে হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নি‘আমত তোমার এবং কর্তৃত্ব তোমারই, তোমার কোন অংশীদার নেই।^{৫৯}

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে শিরককে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন মুশরিকরা কথায় শিরক করতো। যা তাদের তালবিয়ার মধ্যে দেখা যায়। মুসলিমরা মনে করে যাই হোক তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে এবং এখানে বান্দার কিছুই করার নেই। কিন্তু মুশরিকরা মনে করতো- লাভ, মানাত, ওজ্জা, হোবল নামক যে প্রতিমা তাদের ছিল তাদের অনুমতি নিলে বা শুভকামনা নিয়ে গেলে অকল্যাণ হয় না। তারা লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতো। আবার কাজে কর্মেও শিরক করতো। সেখানে গরু, ছাগল, মুরগি জবাই করে আসে। লাল শালু যুক্ত কবরে মূল্যবান গহনা নগদ অর্থসহ বিদেশী মুদ্রা পর্যন্ত ফেলে আসে। সেখানে তারা সিজদা দেয়া, মাথা নিচু করে থাকা, কবর বাসীর

নিকট প্রার্থনা করা, সন্তান প্রার্থনা করা, দারিদ্রতা থেকে মুক্তি কামনা করা, জীবিকার সন্ধান করা, দ্রুত বিবাহ হওয়া, বিদেশ যাত্রা শুভ হওয়া ইত্যাদি বিষয় মুসলিমদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। তাই এ ধরনের কবরবাসীকে তারা আল্লাহর সাধারণ বান্দা নয়; তাকে আল্লাহর পুত্র ও তার বন্ধু বলে আখ্যায়িত করে থাকে। যেমন- আব্দুল মাসীহ, আব্দুল উযা ইত্যাদি। এ ধরনের শিরকে ইয়াহুদী, নাসারাদের প্রায় সবাই একাকার। বর্তমানে আমাদের মুসলিমদের মাঝেও এ ধরনের বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছে।^{৬০}

মুশরিকরা তাদের ধর্মজায়ক এর ব্যাপারে বিশ্বাস করতো- তারা যে বস্তুকে হালাল বলবে সেটাই হালাল এবং যাকে হারাম বলবে সেটাই হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আয়াত নাখিল করলেন, ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ

دُونِ اللَّهِ﴾ ‘তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আহবার ও রোহবানদের প্রভু বানিয়েছে’।^{৬১} এ কথা শুনে আদী ইবন হাতিম রা. ইসলামে আসার পূর্বে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তাদের ইবাদত করে না। রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু তারা যা হালাল করে তাই হালাল এবং তারা যা হারাম করে তাই ই কি হারাম না? আদী বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহর রাসূল সা. বললেন, فَبَلَّغْ عِبَادَتَهُمْ هُمْ এটাই তাদের পাদ্রিদের ইবাদত করা।^{৬২}

শিরকের আরেক পদ্ধতি ছিল যে, প্রতিমা ও নক্ষত্রের নৈকট্য লাভের জন্য জীব-জানোয়ার জবাই করে সেগুলোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। এ পদ্ধতি মুশরিকরা সে জীব প্রতিমার জন্য নির্ধারিত পূজার বেদীতে জবাই করতো আর জবাই করার সময়ে প্রতিমার নাম নিত। বাহীরা ও সায়েবা নামক কান কাটা বা শিং ভাঙ্গা উট তারা দেবতার নামে উৎসর্গ করে মুক্তভাবে ছেড়ে দিত। অথচ রাসূল সা. বলেন, মুসলিমরা কুরবানী করবে কিন্তু তাদের কানকাটা বা জীর্ণ-শির্ণ কোন পশু কুরবানী করতে পারবে না।^{৬৩} এমনকি রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, গাইরুল্লাহর নামে কোন পশু জবাই করলে তার উপর আল্লাহর লা‘নত।^{৬৪} রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি শপথ করবে, যারা পূর্বে লাভ-মানাত-উয্যার নামে শপথ করতো, তারা যেন বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।^{৬৫}

শিরক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, এমনকি কেউ যদি মনে করে রাসূলের কবরে গিয়ে কিছু চাইব বা কবরে নেকীর উদ্দেশ্যে সফর করব তাও শিরক হবে।^{৬৬} কারণ সালাতের জন্য কেবল মুসলিমরা তিন স্থানে যেতে পারে; অন্য কোন স্থানে নেকীর উদ্দেশ্যে সফর করতে পারবে না। রাসূল সা. বলেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে নেকীর উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। ১. মসজিদে হারাম মক্কা, ২. মসজিদে নববী আমার মসজিদ এবং ৩. মসজিদে আকসা বায়তুল মাকদাস।^{৬৭}

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, তাওহীদ ও শিরক সাধারণ মুসলিমদের না বুঝলে তারা তাওহীদকে ছেড়ে শিরককেই দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করবে। আসলে তাওহীদকে শরীআত ও ঈমানের ভিত্তি বলে নির্ধারণ করা হয়েছে তা আমাদের সবারই বুঝা উচিত।

৫. উপসংহার

‘আকীদা ও ফিকহী বৈশিষ্ট্যের সমাহার হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থটি। মুসলিমদের রীতিনীতিতে অমুসলিমদের কুফুরী ‘আকীদা এবং সালাতে-সিয়ামে বিভিন্ন আহকামের মাসআলা সম্বন্ধে অজ্ঞতা মুসলিমদের আজ সাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরবী সাহিত্যিক ড. আব্দুল আযীয ইবন রাইস আররাইসী মুসলিমদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন। মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো- ابتعاد المسلمين عن الإسلام ‘ইসলাম থেকে মুসলিমদের দূরে থাকা’। কালের আবর্তে ‘না জানাকে’ আরও প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রহ.র অমর সৃষ্টি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থটি পাঠ করা এবং তা থেকে মূল্যবান জ্ঞান আহরণ করা সময়ের দাবি। আকীগত দূর্বলতা এবং মাসআলা সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূরীকরণে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থটি খুবই উপযোগী। আমাদের বিশ্বাস উক্ত বৈশিষ্ট্যগত গ্রন্থটি আমাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস* (ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, জুমাদাল উলা ১৪৩৭ হি./মার্চ ২০১৬), পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৭৮।
- ^২ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারু ইবন কাছীর, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩।
- ^৩ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।
- ^৪ সূরাহ আত-তাওবা: ১২২।
- ^৫ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২২ তম সংস্করণ ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭৬৪।
- ^৬ ড. ইয়ায ইবন নামী আস-সুলমি, *উসুলুল ফিকহ* (দাম্মাম: দারু ইবনিল জাওয়া, তা.বি.), পৃ. ১৩।
- ^৭ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আত তুয়াইযীরী, *মাওসুআতুল ফিকহিল ইসলামী*, ১ম খণ্ড, (প্রকাশনা স্থান বিহীন: বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ২৯।
- ^৮ ড. ওয়াহাবুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলাম ওয়া আদিল্লাতুহ*, ১ম খণ্ড (পাকিস্তান: আল-মাকতাবাতুল হাক্কানিয়া, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৫-১৬; মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩০।
- ^৯ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ., *আল-ইকতিরাহ ফী ইলমি উসূলিন নাহবি*, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা ও প্রকাশনা স্থান বিহীন, তা.বি.), পৃ. ২২।
- ^{১০} ইবন মানযুর আল আফরিকী আল-মিসী, *লিসানুল আরব*, ১১তম খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২১০।
- ^{১১} শায়খ মুহাম্মাদ খিযরী, *তারীখু তাশরীইল ইসলামী*, প্রফেসর, জামি'আ মিসরিয়্যা মিসর, তারীখে ফিকহে ইসলামী ভূমিকা অংশ (করাচী: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলুভী মুসাফিরখানা, তা.বি.), পৃ. ১৬-১৭।
- ^{১২} তারীখু তাশরীইল ইসলামী, পৃ. ১৭।
- ^{১৩} অধ্যাপক আখতার ফারুক, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* (অনুবাদকের আরজ অংশ) (ঢাকা: রশিদ বুক হাউস, ডিসেম্বর ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫-৬।
- ^{১৪} নূর আলম খলীল আমীনী, *ভূমিকা- হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* (ব্রেলী: মাতবা'আতুস সিদ্দীক, ব্রেলী, প্রথম প্রকাশ, ১২৮৬ হি./১৮৬৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।
- ^{১৫} প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজ, *ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও উসূল* (রোয়াক ব্লগ, ১৭ জুলাই ২০২১ খ্রি.), <https://www.rowyak.com/>।
- ^{১৬} মালিক ইবন আনাস আবু আব্দিল্লাহ আল-আসবাহী, *মুওয়াত্তা আল ইমাম মালিক*, ২য় খণ্ড (মিসর: দারু ইহইয়ায়িত তুরাখিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৮৯৯, হাদীস নং: ১৫৯৪।
- ^{১৭} সূরাহ আল-হাশর: ৭।
- ^{১৮} *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১।
- ^{১৯} *সহীহ মুসলিম*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫, হাদীস নং ৬২৭৬।
- ^{২০} সূরাহ আন-নাযম: ৩-৪।
- ^{২১} আকরাম আদ-দায়লামী, *জাম'উল কুরআন- দিরাসাহ তাহলিলিয়া লি মারবিয়াতিহি* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৯।
- ^{২২} সূরাহ আশ-শু'আরা: ১৯২-১৯৩।
- ^{২৩} সূরাহ আন-নাহল: ৮৯।
- ^{২৪} মুহাম্মাদ ইবন হারুন আর-রুওয়ানী আবুবকর, *মুসনাদে রুওয়ানী*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মুওয়াস্সাসাহ কুরতুবা, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪০০, হাদীস নং ১২৯৬।
- ^{২৫} মাজদুদ্দীন আবু তাহির মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব ফিরযাবাদী, *আল-কমুসুল মুহীত*, (দাম্মাম: দারু ইবন আল জাওয়া, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৯১৭; মুজাম্ম'আ লুগাহ, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, ১ম খণ্ড (কায়রো, মাকতাবাতুস শুরুক আদ দাওলিয়া, ১৪৩৩ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৩৫।
- ^{২৬} আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী* (বৈরুত: দারুল গারব আল ইসলামী, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), হাদীস নং ২১৬৭।

- ২৭ বিশিষ্ট ওলামাবর্গ, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ, অনু: ড. মুহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী ও ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (মুজাম্মা'আ মালিক ফাহাদ, মদীনা, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪০০-৪০২।
- ২৮ আবুল আক্বাস আহমাদ ইবন তায়মিয়া, ফাতোয়া আল-কুবরা, ৫ম খণ্ড (দারুল: কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৭৮।
- ২৯ সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৭০; শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬১।
- ৩০ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১-২৬২।
- ৩১ আবুদাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আছ আল-আজদী আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০, হাদীস নং ১৫৭৩।
- ৩২ সূরাহ আল-আ'রাফ: ১৩।
- ৩৩ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩।
- ৩৪ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০।
- ৩৫ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, আস-সুনান, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৭৭, হাদীস নং ১৯৯।
- ৩৬ শায়খ সালাহ ইবন ফাওয়ান ইবন আব্দুল্লাহ আল-ফাওয়ান, আকীদাতুত তাওহীদ (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.) পৃ. ১।
- ৩৭ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৩৫, ২৩৭; আবুল হাসান ওবাইদুল্লাহ ইবন আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আল-মুবারাকপুরী, মির আতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।
- ৩৮ সাদরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আলাউদ্দীন ইবন আবিল ইয্য দিমাশকী, শারহ 'আকীদাতিত তাহাজী (বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামী, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৯১ হি./১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৬৯।
- ৩৯ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াহইয়া ইবন মান্দাহ, আল-ঈমান, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুওয়াসসা সাতুর রিসালাহ, ১৪০৬), পৃ. ৩৩১; ক্বাতফুছ ছামার, পৃ. ৬১।
- ৪০ সূরাহ আয-যুমার: ৬৫; সূরাহ আল-আন'আম: ৮৮; সূরাহ আল-মায়িদাহ: ৫।
- ৪১ ড. মুযাফফর ইবন মুহসিন, দ্রাষ্ট আকীদা বনাব সঠিক আকীদা (রাজশাহী: আছ-ছিরাত প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭-১০।
- ৪২ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী লি., ১৪০৪ হি./জুন ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪১১-৪১২।
- ৪৩ সূরাহ আল-আন'আম: ১১৫; সূরাহ আল-হিজর: ৯; আবু 'আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল শায়বানী, আল-মুসনাদ (বৈরুত: মুওয়াসসা সাার রিসালা, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), হাদীস সংখ্যা- ১৫১৯৫।
- ৪৪ Ayman Al-Sayyad (managing editor of the Wighat Nazar (point of view) mangazine in Egypt), Islam and US security, Aljazeera.Net, 20 May 2004@2003-2005.
- ৪৫ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০৯-২৪৪।
- ৪৬ শায়খ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায, আল-'আকীদাতুস সহীহাহ ওয়ামা ইউযাদুহা (রিয়াদ: দারুল ক্বাসিম, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩।
- ৪৭ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর আদ-দিমাশকী, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ৪র্থ খণ্ড (দিমাশক: দারু তাইমিয়া, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৯১।
- ৪৮ আল-ইমাম আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী, আস-সহীহ (কায়রো: দারুত তাক্বওয়া, ১৪৩৪ হি./২০১২ খ্রি.), হাদীস সংখ্যা- ৫২।
- ৪৯ আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-খাতীব আল-'উমরী আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ (বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), হাদীস সংখ্যা- ২৫, ২৬, ৩৬, ৩৮।
- ৫০ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০৬।
- ৫১ باب خمسة : الإيمان بالقدر، باب أربعة : الإيمان بصفات الله تعالى। তদেব, পৃ. ২২২-২৩৬।
- ৫২ সূরাহ আন-নাহল: ৩৬।
- ৫৩ সহীহ মুসলিম, তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩, হাদীস নং ১৪৫।
- ৫৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহুল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০১, হাদীস নং ৩৪৩৫।

-
- ৫৫ আবুদাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আছ আল-আজদী আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭, হাদীস নং ৩১১৬।
- ৫৬ *সহীহুল বুখারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭, হাদীস নং ৭৫০৬।
- ৫৭ সূরাহ আল-আ'রাফ: ৩৩।
- ৫৮ *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২, হাদীস নং ১১৮৫।
- ৫৯ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ১৫৪৯।
- ৬০ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।
- ৬১ সূরাহ আত-তাওবা: ৩১।
- ৬২ আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন ইবন আলী আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, ১০ম খণ্ড (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ নিয়ামিয়া, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪৪ হি./১৯২৫ খ্রি.), পৃ. ১১৬।
- ৬৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী, *আস-সুনান*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ: ১৩৭১ হি./১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ১০৫০, হাদীস নং ৩১৪৪।
- ৬৪ *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬৭, হাদীস নং ১৯৭৮।
- ৬৫ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮২, হাদীস নং ৬৩০১।
- ৬৬ সূরাহ ফাতির: ১৩-১৪।
- ৬৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬, হাদীস নং ১১৮৯।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী কাব্যচর্চা [Practice of Arabic Poetry in the Indian Subcontinent in the 20th Century]

হাশেম আলী*

[Abstract: A review of ancient texts and reliable sources of history and literature reveals that the practice of Arabic poetry began in the Indian subcontinent in the 2nd century of Hijri. Harun ibn Musa Al Multani is the first poet of Arabic language in the Indian subcontinent of this century. From then until the 20th century, numerous poets of Arabic language appeared in this subcontinent in the course of time. Many of them reached the level of Arabian poets in their ability to compose poetry in Arabic language. A number of poets of Arabic language also appeared here in the 20th century. The main theme of Arabic poetry of the Indian subcontinent in the 20th century is the praise of the Prophet Muhammad (PBUH). This practice of Arabic by Indians was so widespread that a new genre of Arabic literature was born. Arabic poetry especially in the Indian subcontinent has greatly enriched Arabic literature. Even though they are non-Arabs, their contribution is mentioned with deep respect by the Arabs. In many cases the Arabic poets of the subcontinent have created innovations. As a result, it is considered as a separate trend of Arabic poetry.]

Keywords: Practice, Arabic Poetry, Indiansubcontinent.

১. ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, হিন্দু প্রভৃতি জাতি ও ধর্মের মিলনস্থল। এখানে ইসলাম ধর্ম আগমন করে প্রথমে আরব বণিকদের বাণিজ্যের পথ ধরে এবং পরে মুসলিম শাসকবর্গ ও ধর্মপ্রচারকগণের মাধ্যমে। ইসলাম ধর্ম ও আরবী ভাষা অন্যান্য ধর্ম ও ভাষার তুলনায় ভারতীয় জনগণকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। ইসলাম ধর্মের সুমহান আদর্শ তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে। ফলে তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষায় হওয়ায় ইসলামী জীবন-যাপনের তাগিদে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ আরবী ভাষাচর্চার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েন। ভারতীয় উপমহাদেশের অসংখ্য অনারব মুসলিম মনীষী তাঁদের স্থানীয় ভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষায় কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফিকহ, ইতিহাস, দর্শন, ইসলামী সাহিত্য, শিশু-সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এসবের পাশাপাশি তাঁদের অনেকে আরবী ভাষায় কাব্যচর্চার প্রতিও মনোনিবেশ করেন এবং আরবীয় কবিদের ন্যায় আরবী ভাষায় কাব্যচর্চা করে প্রশংসনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁদের অধিকাংশের কাব্যে মহান আল্লাহ, মুহাম্মদ সা. ও ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

২. ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী কাব্যচর্চার সূচনা

ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী কাব্যচর্চার সূচনা হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হারুন ইবন মুসা আল-মুলতানীর মাধ্যমে।^১ হাতির বর্ণনায় কবিতা রচনা করায় তাকে ‘শায়িরুল ফিল’ বা হাতির কবিও বলা হয়।^২ হারুন ইবন মুসা পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইয়ামানের আজদ্ বংশোদ্ভূত। তারা (ইয়ামান থেকে এসে) দীর্ঘকাল ধরে মুলতানে (বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি জেলা) বসবাস করেন। কবি সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হন।^৩ মাসউদী তার মুক্জুয যাহাব গ্রন্থে প্রাণীর বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, সিন্ধু ভূমির মুলতানে হারুন ইবন মুসা নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। যিনি আজদ বংশোদ্ভূত মুজোদাস ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি, বীর এবং সিন্ধু অঞ্চলের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব। তিনি স্থায়ী দূর্গে অবস্থান করতেন। একদা

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

তিনি এক ভারতীয় রাজা ও তার হস্তিবাহিনীর মুখোমুখি হন। হারুন ইবন মুসা বের হয়ে সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং সবচেয়ে বড় হাতিটির দিকে যান। হাতিটি যখন তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তখন তিনি স্বীয় জামার নিচে লুকিয়ে রাখা বন্যবিড়ালটি তার সামনে ছেড়ে দেন। বিড়ালের ভয়ে হাতি ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করে। এভাবে রাজার হস্তিবাহিনী পরাজিত হয়, রাজা নিহত হন এবং মুসলিম বাহিনী জয়ী হয়।^৪ এ ঘটনা প্রসঙ্গে হাতির বিবরণ দিয়ে হারুন ইবন মুসা আরবী কবিতা রচনা করেন। কবিতার কতিপয় চরণ নিম্নরূপ :

أليس عجباً بأن خلقه * له فطن الإنسان في جرم فيل
وأظرف من قشة زولة * بحلم يجل عن الخنثليل
وأوقص مختلف خلقه * طويل النيوب قصير النصيل
ويلقى العدو بناب عظيم * وجوف رحيب وصوت ضئيل^৫

‘নিশ্চয়ই বিস্ময়কর তার সৃষ্টি, মানুষের বুদ্ধিতে সজ্জিত সে হাতির শরীর/ এবং তৃণের চেয়ে সূক্ষ্ম তার ধৈর্য, যা সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করে/তার সৃষ্টি বৈচিত্রময়, যার দাঁত লম্বা কিন্তু দেহ ছোট/এবং শত্রুর সাথে মুখোমুখি হয় বিশাল দাঁত নিয়ে, তার দেহ প্রশস্ত কিন্তু কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।’

কবি মুসলিম বাহিনীর বিজয় লাভ ও আল্লাহর অপরিসীম মহিমার বিবরণ দিয়ে বলেন,

فلما أحس به في العجاج * أتانا الإله بفتح جميل
فطار وراغم فياله * بقلب نجيب وجسم نبيل
فسبحان خالقه وحده * إله الأنعام ورب الفيول^৬

‘যুদ্ধের ময়দানের শোরগোল অনুভব করতে না করতেই আল্লাহ আমাদেরকে একটি চমৎকার বিজয় দান করলেন। তারপর সে (হস্তী) মহৎ হৃদয় ও বিশাল দেহ নিয়ে মাছতকে পরিত্যাগ করে ধাবিত হলো (পানিয়ে গেল)। তার একক সৃষ্টা অতীব পবিত্র, যিনি প্রাণীকুলের ইলাহ (উপাস্য) ও হস্তীদের রব (প্রতিপালক)।’

জাহিয় (১৫০-২৫৫ হি.) বলেন, কবিতার এ চরণগুলি সাফওয়ান ইবন সাফওয়ান আল-আনসারী (মৃ. ১৮০ হি.)^৭ আমার নিকটে বর্ণনা করেছেন। সাফওয়ান ছিলেন দাউদ ইবন ইয়াজিদ ইবন হাতিম আল-মুহাল্লাবীর (মৃ. ২০৫ হি.) একজন অন্যতম বর্ণনাকারী।^৮ আর দাউদ ইবন ইয়াজিদ আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ (১৪৯ - ১৯৩ হি.) কর্তৃক ১৮৪ হি. থেকে ২০৫ হি. সন পর্যন্ত সিন্ধুর গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন। দাউদ ইবন ইয়াজিদ ২০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ২০৫ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।^৯ দাউদ ইবন ইয়াজিদের মৃত্যুর পর খলিফা মামুন তার পুত্র বিশর ইবন দাউদ আল মুহাল্লাবীকে (শাসনামল: ২০৫-২১২ হি.) প্রতি বছর তার নিকট ১০,০০০০০ (দশ লক্ষ) দিরহাম প্রেরণের শর্তে সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।^{১০} এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হারুন ইবন মুসা ছিলেন হিজরী ২য় শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের আরবী কবি। তিনি তৎকালীন সিন্ধুর অনন্যসাধারণ কবি ছিলেন। তিনি স্পষ্ট আরবী ভাষায় চমৎকার বর্ণনায় মানসম্মত কবিতা লিখতেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, একমাত্র জাহিয় ব্যতীত মুহাম্মাদ ইবন দাউদ ইবন জাররাহ, হাজেব আন নু‘মান, ইবন কুতায়বা, আবুল ফারজ প্রমুখ উপমহাদেশের প্রাচীন আরবী কাব্যসংকলকগণ তার কাব্য ও সাহিত্যকর্মের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি।^{১১} জাহিয় হারুন ইবন মুসার রচিত হাতির বিবরণ সম্পর্কিত আরো কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন। যেমন:

مشيت إليه رادغا متمحلا * وقد وصلوا خرطومهم بحسام
فقلت لنفسي : إنه الفيل ضارب * بأبيض من ماء الحديد هدام
فإن تنكلي عنه فعذرک واضح * لدى كل منخوب الفؤاد عمام
وعند شجاع القوم أكلف فاحم * كظلمة ليل جللت بقتام^{১২}

‘আমি ধৈর্য সহকারে ধীর গতিতে তার (হাতির) দিকে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে তারা (মুসলিম বাহিনী) তার গুঁড়ে তলোয়ার চালিয়ে দিয়েছে / আমি মনে মনে বললাম: এটি সেই হাতি যার আঘাত পানির চেয়েও স্বচ্ছ

লোহার মত, যা তীব্র ও ধারালো/ তুমি যদি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমার অজুহাত স্পষ্ট, প্রত্যেক সাহসী এবং শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী মানুষের কাছে/ এবং সাহসী লোকদের কাছে। (আর যদি না ছাড়) তবে আমি এমন কয়লায় পরিণত করব, যা তমসায় আচ্ছাদিত রাতের অন্ধকারের মত।’

ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী কবিতা চর্চার সূচনাকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহুসংখ্যক আরবী ভাষার কবি আবির্ভূত হয়েছেন। তারা শুধু আরবী ভাষার কবিই ছিলেন না। তাদের অনেকে একাধারে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, লেখক, গবেষক প্রভৃতি গুণে গুণাবিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে আবার আরবীর পাশাপাশি উর্দু-ফারসি ভাষায়ও কাব্যচর্চা করেছেন।

৩. বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী কাব্যচর্চা

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী ভাষার অনেক কবি আবির্ভূত হন। যারা অনারব হয়েও আরবীয় কবিদের ন্যায় আরবী ভাষায় কাব্যচর্চার মাধ্যমে উপমহাদেশের আরবী কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের আরবী কাব্যচর্চায় প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে রয়েছেন:-

৩.১ খাজা আলতাফ হুসাইন হালী পানিপথী

খাজা আলতাফ হুসাইন ইবন আইয়াদ বখ্শ আল আনসারী পানিপথী (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.) ভারতের দিল্লির পানিপথ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা খাজা হালী নামেও সুপরিচিত। তিনি মূলত উর্দু ভাষার কবি ও লেখক। উর্দু ভাষার পাশাপাশি আরবী ও ফারসি ভাষায় তার কিছু চমৎকার কবিতার শ্লোক আছে। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম নতুন রীতির উদ্ভাবন করেন।^{১০} শাইখ আলতাফ হুসাইন হালী শাহ আব্দুল গনি দেহলভীর প্রশংসায় আরবী কবিতায় বলেন,

وحيد الوري، عبد الغني الذي له * أوائل مرآة لكشف العواقب

يقوم غني جالس الشيخ ساعة * بقلب ذكي مطمئن مراقب^{১১}

‘আব্দুল গনি বিশ্বের এমন এক বিরল ব্যক্তি, যার আছে পরিণামফল দেখার আগাম দৃষ্টি/ তিনি সামনে দাঁড়ান আপোষহীন, সুস্থিরভাবে আর বুদ্ধিমান ও শান্ত হৃদয় নিয়ে, পর্যবেক্ষণ করেন সতর্কভাবে।’

আল্লামা শিবলী নু‘মানীকে ‘শামসুল উলামা’ উপাধি প্রদান করা হলে তিনি তাঁর মর্যাদার বর্ণনায় আরবী কবিতায় বলেন,

يا وحيدا من الكرام فريدا * وعزيزا كمثل علق نفيس

أنت أولى بأن تلقب شمسا * بل بأن يجعلوك شمس الشموس

أنت شمس الهدى ولست بشمس * يعزيبها الخنوس بعد الخنوس^{১২}

‘হে অনন্য সম্মানিত প্রিয় মানুষ! হে অমূল্য মুক্তো! / আপনিই শামস (সূর্য) উপাধি পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত! বরং সকল সূর্যদের সূর্য আপনি! / আপনি সে সূর্য নন, যা উদয়ের পর অস্ত যায়, বরং আপনি এক পথপ্রদর্শনকারী সূর্য।’

৩.২ আল্লামা শিবলী নো‘মানী

আল্লামা শিবলী নো‘মানী (১২৭৫-১৩৩২ হি./১৮৫৭-১৯১৪ খ্রি.) ছিলেন উপমহাদেশের একজন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যসমালোচক, গবেষক, বাগ্মী ও বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের আ‘জমগড় জেলার বিন্দাওল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।^{১৩} তিনি উর্দু, আরবী ও ফারসি ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। তার কবিতায় চিন্তার মননশীলতা, বর্ণনার সাবলীলতা, ভাষার মাধুর্যতা, ও দক্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব চিত্রিত হয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে কবিতা রচনা করতেন। তিনি স্যার সায়েদ আহমাদ ও তার রাজনীতির প্রশংসা করে প্রাঞ্জলভাষী বিশিষ্ট কবিদের কবিতা রচনার রীতিতে একটি আরবী কবিতা রচনা করেন। এতে তার সাহিত্যিক দক্ষতা

ফুটে উঠেছে।^{১৭} তিনি আলীগড় শিক্ষা আন্দোলনের প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ আরবী কবিতা রচনা করেন। তিনি নিম্নোক্তভাবে কবিতাটির সূচনা করেছেন:

المجد يصحب علما حيثما يصل * والعلم عن قومنا لا زال يرتحل
نالوا من الذل مالا ناله أحد * إذ لا يرى فيهم علم ولا عمل
ولا تزال ترى يشئت شملهم * في كل يوم وقد ضاقت بهم حل^{১৮}

‘গৌরব সবসময় থাকে জ্ঞানের সাথে যতদূর তা পৌঁছাক না কেন/কিন্তু সে জ্ঞান আমাদের জাতি থেকে দূরে সরে যেতেই আছে/ফলে এমন লজ্জার শিকার তারা হয়েছে যা ইতিপূর্বে কেউ হয়নি/ কেননা তাদের মধ্যে জ্ঞানের ও কর্মের কোন দেখা নেই/ ফলে তাদেরকে তুমি আজও বিশৃংখল দেখছ/ দিনের পর দিন যার সমাধান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।’

৩.৩ হাবীবুর রহমান উসমানী দেওবন্দী

হাবিবুর রহমান উসমানী (১২৭৫-১৩৪৮হি./১৮৫৮-১৯২৯ খ্রি.) ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেউবন্দ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত, ধার্মিক ও শিক্ষিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশধারাকে উসমান ইবন আফফান রা. এর বংশধারার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন আরবী ভাষার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। দারুল উলুম দেউবন্দের বিদ্বানগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি চমৎকারভাবে সহজ-সরল ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। ‘মুআইয়িনুল লাবীব ফি জাম্ঈ ক্বাসায়িদিল হাবীব’ নামে তার একটি কাব্য-সংকলন আছে। এতে প্রায় ১৫০০ টি শ্লোক আছে। হাবিবুর রহমান উসমানীর কাব্য-সংকলনের অন্যতম একটি কবিতা হলো, ‘ক্বাছিদাতু লামিয়াতিল মুজিয়াত’। এতে ২৮৫ টি শ্লোক আছে। কবি এতে নবী মুহাম্মাদ সা. এর ১০০ টি মুজিয়া সন্নিবেশিত করেছেন। এটি নবী সা. এর মুজিয়ার বিবরণে লেখা অত্যন্ত সুন্দর কবিতা। এতে রয়েছে সুন্দর বিবরণ, উৎকৃষ্ট রচনাশৈলী, সূক্ষ্মতত্ত্ব ও গভীর অর্থ। কবি ত্রুটি বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে দ্রষ্টতার নিমজ্জিত হওয়া থেকে সতর্ক করে নিজেকে সন্মোদন করে কবিতায় বলেন,

أيها المختال في ثوب الأمل * والمباهي بطراز في الحل
والمجاري في ميادين الخلا * قد دنت منك مرات الأجل
أنت في تيه العمى تبغي المنى * والمنايا كشرت ناب الوجل
أنت في لهو وزهو تختني * من ثمار موفقات من أكل^{১৯}

‘হে কামনার পোষাকে উদ্ধত ব্যক্তি! হে পোষাকের সাজসজ্জায় অহংকারী! নির্জন পথে-প্রান্তরে বহুবার তোমার কাছাকাছি হয়েছে মৃত্যুর বার্তা / তবুও তুমি অন্ধত্বের আঁধার প্রাপ্তির কামনার আগুনে ছুটে বেড়াচ্ছ! অথচ মৃত্যুর আতংকবার্তা তার ভয়াল দাঁত বের করেছে/ এখনও তুমি খেল-তামাশায় মত্ত রয়েছে আর ধ্বংসাত্মক ফলের আহরণে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে!’

হাবিবুর রহমান উসমানীর নবী সা. এর মুজিয়া বিষয়ে ‘ক্বাসিদাতু বায়িয়াতিল মুজিয়াত’ নামে আরো একটি সুন্দর কবিতা আছে। এ কবিতাটিও তিনি প্রথম কবিতার আদলে রচনা করেন। কবিতাটির কতিপয় শ্লোক নিম্নরূপ:

وعكة السمن لما أهديت بقيت * تفيض سمننا وما جفت ولا نضبا
حتى إذا أعصرت جفت وما وجدوا * فيها من السمن ما يفيض لهم أربا^{২০}

‘যখন মেদবাহিত অসুস্থতা উপহার হিসাবে দেয়া হয়েছিল, তখন তা এমন ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, যা শুকিয়েও যায়নি, কমেও নি/ এমনকি যদি তুমি শুকিয়ে যাওয়া জন্য চাপও দিতে, তবুও তারা সেই মেদবহুলতার মাঝে তাদের প্রত্যাশিত বস্তু খুঁজে পের না।’

ক্বাসিদাতু দুআ'য়িল মুজতার : কবি এই কবিতাটি 'আল ক্বাছিদাতুল বুরদাতুল মিমিয়াহ' এর আদলে রচনা করেন। এতে ১২১ টি শ্লোক আছে। কবি রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত হলে রাত্রি বেলায় উঠে এই কবিতাটি রচনা করেন। এতে তিনি নিজেকে পরকালের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সৎ আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কবি বলেন,

دعا ودعا ريم الطباء وأودعا * بدور الحمى في الحى رهنا مضيعا
وسمرا وسمارا ولحظا وصوبة * ورعبا خلاء دارس الرسم أقرعا
وهجرا وصرما واصطبارا وسلوة * دنانا وخمارا وراحا مشعشعا^{২৬}

'আহবান করল হরিণী আর প্রস্তুত করল নিজেকে শিকারীর জন্য, হারিয়ে যাওয়া বন্ধকী বস্তুর মত/ বাদামী চামড়া, যাতে দাগ আর দাগ/ কিছুটা খালি, কিছুটা অংকিত, কিছুটা সাপের মত/পরিত্যক্ত, কঠোর, সুস্থির, প্রশস্ত, মটমটে, ঘন, নরম ও জ্যোতিপ্রদ।'

হিকমাতুশ শির: এটি কবির 'ক্বাছিদাতুল হামযিয়াহ'। এতে ৭১টি শ্লোক আছে। এটি কবির প্রশংসা ও প্রার্থনা বিষয়ক কবিতা। কবি এর সূচনা করেন হিকমাতপূর্ণ বাণী দ্বারা। কবি বলেন,

لا تيأسن إن يصيبك اليوم ضراء * ففي غد يعقب الضراء سراء
الدهر ذو غير والناس في غير * والخال منقلب بؤس و نعاء
بيننا ينوبك أحوال تزول بما * شم الجبال ورضت منه صماء^{২৭}

'যদি নেমে আসে তোমার উপর কষ্টের ধারা তাতে হতাশ হয়ো না, কেননা আগামী দিন কষ্টের পর আসবে সুখ/ সময় পরিবর্তনশীল, আর মানুষের অবস্থা প্রবাহমান আর পরিস্থিতি কষ্ট আর নেআমতে পূর্ণ/ আর এসবের মধ্য দিয়ে তোমার প্রতিনিধি হয়ে সময় এসে সব দূর করে দেয়, পাহাড়ের মত অটলতা নিয়ে, যাতে বধিরও খুশী হয়ে যায়।'

হাবিবুর রহমান উসমানী আরো কতিপয় আরবী কবিতা লেখেন। যেমন: 'দারুল হাদীস বিদারিল উলুম', 'আল মাদীনাতে মুনাওওয়্যারাহ', 'তারাকামাল ফিতান আলল ইসলাম ওয়া আহলিহি', 'উরুজুল ইসলাম ওয়া নুযুলুহ', 'ফি হানিনিল জায়ফ', 'আয তায়কির ওয়াত তাহযির', 'হাশিয়াতু কানযুদ দাক্বায়িক' প্রভৃতি।

৩.৪. ওয়াহীদুদ্দীন আলী আল হায়দারাবাদী

ওয়াহীদুদ্দীন আলী আল হায়দারাবাদী (১২৭৭-১৩৪৪ হি./১৮৭১-১৯২৫ খ্রি.) ভারতের হায়দারাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট আরবী ভাষার কবি ছিলেন। নবী সা. এর প্রশংসায় "আল জাওয়াহিরুয যাহিরাহ ফি মাদহিন নাবিয়্যি ওয়া আলিহিত তাহিরাহ" নামে তার একটি কাব্য-সংকলন আছে।^{২৮} প্রেম, প্রশংসা শোকগাথা প্রভৃতি বিষয়েও তার কবিতা আছে। তিনি তার কবিতায় প্রসিদ্ধ স্পেনীয় শোকগাথার অনুকরণ করেন। তিনি কবিতায় বলেন,

لكل شيء إذا ما تم نقصان * فلا يسر بطيب العيش إنسان
هل من سبيل إلى وصل الألى بانوا * بيني وبينهم بيد وقيعان
أو للزمان رجوع بالوصل إذا * كانت له كالرحى في الدور أحيان^{২৯}

'প্রতিটা জিনিসের পূর্ণতা ক্ষতিই ডেকে আনে, আর তাই আয়েশী যিন্দেগীতে মানুষ খুশী হতে পারে না/সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছানোর কী কোন রাস্তা আছে যা আমার আর তাদের মধ্যে সংযোগ তৈরী করে দিবে, কোন হাত কিংবা কোন শক্তি! / অথবা চাকতির ঘূর্ণির মত সময়ের কাছে ফিরে আসার কি সংযোগসূত্র আছে?'

৩.৫. আব্দুল হামীদ ইবন আব্দুল করীম আল-ফারাহী

আব্দুল হামীদ ইবন আব্দুল করীম আল-ফারাহী (১২৮০-১৩৪৯ হি./১৮৬৩-১৯৩০ খ্রি.) পরবর্তীতে হামীদ উদ্দীন ফারাহী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ১২৮০ হিজরী সনে জুমাদাল আখিরা মাসে আ'জমগড় জেলার ফারাহী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাতহার নামক গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।^{৩০} তিনি আরবী

ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে মুফরাদাতুল কুরআন, আল-ইমআন ফি আকুসামিল কুরআন, হিজাজুল কুরআন, দিওয়ানু হামীদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থপ্রণয়নের পাশাপাশি তার ছিল অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা। এর অন্যতম কারণ হলো, তিনি ছোটবেলা থেকেই আরবী ভাষাচর্চার পরিবেশের মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠেন এবং আরবী ভাষাচর্চার প্রতি তার ছিল বিশেষ অনুরাগ। উসমানী শাসনের শেষের দিকে মুসলমানদের অধিপতনে কবি দুঃখ প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন,

كيف القرار وقد نكس * أعلامنا بطرابلس
كيف القرار وحولنا * الأعداء ترقب المجلس
من كل ذنب إن رأى * من عزة فينا اختلس^{২৬}

কিভাবে স্থির হব, যখন আমাদের পতাকাগুলো ত্রিপলির মাটিতে অবনত হয়েছে! / কিভাবে স্থির হব, যখন চারিদিকে শত্রুরা গোপন প্রহরায় আছে! / আমাদের প্রত্যেক ভুলে যখন তারা আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য ঝুঁপেতে রয়েছে!

৩.৬ আব্দুল আওয়াল ইবন কারামাত আলী জৌনপুরী

আব্দুল আওয়াল ইবন কারামাত আলী জৌনপুরী (১২৮৪-১৩৩৯ হি./১৮৫৬-১৯২০ খ্রি.) বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ভারতের উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে গমন করেন। শৈশবেই তিনি কুরআন হিফয করেন। তিনি ছিলেন সুমিষ্ট, বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞভাষী। আরবী ভাষায় তার সুন্দর সুন্দর অনেক কবিতার শ্লোক আছে। আরবী, ফারসি ও উর্দু ভাষায় কবিতা রচনায় তার ছিল পূর্ণ দক্ষতা। তার রচিত কবিতার কতিপয় শ্লোক নিম্নরূপ :

لعمرك ما الدنيا بذات تودد * فلا تبغ فيها عيشة قم ومهد
ألم تر أسلافا مضوا لسبيلهم * وما أخبروا عن حالهم مثل جلمد
وباتوا عن الدنيا وعن دورهم نأوا * وأنت تلاقهم فاعرض عن الدد^{২৭}

‘তোমার শপথ! দুনিয়া নিজের ইচ্ছা পূরণের জায়গা নয়, সুতরাং দুনিয়াকেই তোমার আবাস বানিয়ে নিও না। দাঁড়াও, নিজেকে প্রস্তুত কর/ তুমি কি দেখনি তোমার পূর্ববর্তীদের, যারা তাদের পথ পাড়ি দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, অথচ তারা তাদের অবস্থা সম্পর্কে কোন সংবাদ দেয়নি, কঠিন প্রস্তরের মতই/ দুনিয়া থেকে তারা ও তাদের কর্ম আজ বহু দূরে, সুতরাং দুনিয়ার খেল-তামাশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।’

৩.৭. আবদুল হাই ফখরুদ্দীন আল হাসানী

আব্দুল হাই ফখরুদ্দীন আল হাসানী (১৮৬৯-১৯২৩ খ্রি.) ভারতের লৌক্কর রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবুল হাসান আলী হাসানী নাদভীর (১৯১৩-১৯৯৯ খ্রি.) পিতা। তিনি আরবী, ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট উপমহাদেশীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরবী গদ্য সাহিত্যে অপরিসীম অবদান রাখার পাশাপাশি আরবী কাব্যচর্চাও করেন।^{২৮} তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রশংসায় আরবী কবিতা রচনা করেন। তার কবিতার কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

خير البرية رأسهم ورئسهم * ابن الكرام أخو الندى والسودد
رحب الذراع حليف مجد سابغ * خدن الصلاح شقيق عز سرمد
نور الهدى غوث الورى غيث الندى * غرض الحنى متمسك المستنجد
كهف الأرامل عون قلب خائف * مولى البرية ملجأ المسترفد
المصطفى المختار من تمت به * نعم المليك الواحد المتوحد^{২৯}

‘সৃষ্টির সেরা হল তাদের মধ্যমণি এবং তাদের নেতা, সম্মানিতদের সন্তান এবং মহানুভব ও সুপ্রতিষ্ঠিতদের ভ্রাতা/একজন মহান উদারতাপূর্ণ সহযোগী, মহাগুণে গুণাবিত মুখ এবং চিরস্থায়ী মর্যাদার প্রতীক/পথের আলো, মানবতার উদ্ধারকারী, তিনি শিশির বৃষ্টি, ভরসার কেন্দ্র, নিরাশ্রয়ের সহমর্মী/বিধবার আশ্রয়, ভীত-

সম্ভ্রান্ত মানুষের সহায়, সৃষ্টির অভিভাবক, সর্বহারার শরণ/তিনিই হলেন মনোনীত নবী, যাতে পূর্ণতা পেয়েছে এক ও একক সত্ত্বার নেয়ামত।’

৩.৮. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী

আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৮৭৫-১৯৩৩ খ্রি./১২৯২-১৮৭৫ হি.) কাশ্মীরের ‘বুদওয়ান’ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হানাফী মায়হাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। ইলমে হাদীসে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।^{৩০} তিনি আরবী ও ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করেন। আরবী ভাষায় কবিতা রচনায় তার ছিল অসাধারণ দক্ষতা। তিনি আরবের জাহিলী কবিদের কবিতা রচনার রীতির অনুকরণে প্রণয়গাথার মাধ্যমে কবিতার সূচনা করেন। তিনি নবী সা. ও সাহাবীদের প্রশংসায় বলেন,

لله در صحابة ألفتهم * ديم الندى للمجندي والجارى
أنا في أمان من بوادي حيرة * ولي اهتداء بالنبي الهادي
شمس الضحى بدار الدجى صدر العلى * علم الهدى هو قدوة للقادي^{৩১}

‘কতইনা উত্তম সাহাবীগণ, যারা পরবর্তী অনুসারীদের জন্য সদা প্রশান্তির কারণ/ যাদের কারণে বিভ্রান্তির উপত্যকায় আমি নিরাপদে আছি, নবীর হেদায়েতে আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত রয়েছি/ যে নবী তিমির আঁধারে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত, পূর্ণতার শিখরচূড়া, পথের দিশা, অনুসারীদের চূড়ান্ত আদর্শ।’
তিনি স্বীয় উস্তায রশীদ আহমাদ গাংগোহীর প্রশংসায় আরবী কবিতায় বলেন,

قفا يا صاحبي عن السفار * بمأى من عرار أو بحار
يسير بنشرها نفحات أنس * وربا عند محي من قطار
يفيض لروحها رشحات قدس * حياة للبراري والقفار^{৩২}

‘হে আমার সাথী (শিক্ষক) আপনি উটের লাগাম ছেড়ে দিয়ে আমার দর্শনস্থল সুগন্ধিযুক্ত ফলবাগিচার পাশে একটু দাঁড়ান/ ফুলের ঘ্রাণের বিচ্ছুরণে সাথে জীবনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে/ এর শৌরভে স্থলে ও মরুময় স্থানে জীবনের প্রতিটি দিক পবিত্রতার পূর্ণতা লাভ করবে।’

৩.৯. ইজাজ আহমাদ ইবন আব্দুল বারী সাহসাওয়ানী

ইজাজ আহমাদ ইবন আব্দুল বারী সাহসাওয়ানী (১৮৭৭-১৯৬৩ খ্রি.) ভারতের উত্তর প্রদেশের বুদওয়ান জেলার সাহসাওয়ান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু ভাষার একজন বড় মাপের কবি। তিনি আরবী ও ফারসি ভাষায় অনেক কবিতা রচনা করেন। তিনি তার আরবী কবিতায় বলেন,

قد جبت في طلب العلوم مفاوزا * ومهالكا كالهائم المستوق
كم من أذى وسط الفلاة سئمته * فلقيت آمالي بوجه مشرق
غررتني الدنيا كثيرا بالغنى * وتركتها سخطا لظاهر رونق^{৩৩}

‘আমি জ্ঞানান্বেষণের জন্য প্রেমাসক্ত প্রেমিকের ন্যায় বহু দুর্গম স্থান পরিভ্রমণ করেছি/নির্জন প্রান্তরে নানা বাধা-বিপত্তিতে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তখন আমি আবার উজ্জ্বল বদনে আশা-আকাংখারও সাক্ষাৎ পেয়েছি/ দুনিয়ার প্রাচুর্য আমাকে অনেকবার প্রতারিত করার চেষ্টা করেছে। তখন আমি এই বাহ্যিক চাকচিক্যকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি।’

তিনি তার কবিতায় দুনিয়ার মূল্যহীনতা তুলে ধরে বলেন,

يهوي الفتى لذة الدنيا ويأملها * ولا نصيب له منها سوى الألم
تبا لدار فناء لا بقاء لها * ولا مصير لأهلها سوى العدم^{৩৪}

দুনিয়ার স্বাদ ভোগের জন্য যুবক আশাবিস্ত হয়। কিন্তু দুঃখ-বেদনা ছাড়া তার নসীবে আর কিছুই জোটে না/ ধিক এই ক্ষয়িষ্ণু বাসস্থানের, যার কোন স্থায়িত্ব নেই, আর যার অধিবাসীদের বিনাশ ছাড়া কোন সুপরিণতি নেই।

৩.১০. সায়েদ সুলায়মান নাদভী

সায়েদ সুলায়মান নাদভী (১৮৮৪-১৯৫৩ খ্রি./১৩০২-১৩৭৩ হি.) ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনার দিসনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ এবং করাচিতে মৃত্যুবরণ করেন।^{৫৫} ভারতবর্ষে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের একজন দক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় কিছু কবিতা রচনা করেন। সূর্যাস্তের সময় সূর্যের বর্ণনায় তাঁর বর্ণনামূলক কবিতার কতিপয় শ্লোক নিম্নরূপ :

كأنما الشفق الممتد في الأفق * خمر معتقة شجت لمغتب
خمر يعتقها أعلى همالية * شجت بماء غمام همامر غدق
كف الطبيعة تسقي الناس أكوسها * ويل لمن هذه الصهباء لم يذق^{৫৬}

‘দিগন্ত জুড়ে সূর্যের লালিমা রেখা যেন পোক্ত মদ, যা পানকারীর জন্য মনোরঞ্জন/ সে মদ যেন হিমালয় শীর্ষে প্রস্তুত করা হয়েছে, প্রচুর বৃষ্টিতে ভরা মেঘের পানির মিশ্রণে/ প্রকৃতি যেন নিজ হাতে মানুষকে পানপাত্র এগিয়ে দেয় সে মদ পানের জন্য, থিক তাদের! যারা এই সোনালী মদের স্বাদ আশ্বাদন করেনি।’

তিনি মৃত্যুর তাৎপর্য স্মরণ করে কবিতায় বলেন,

إن الحياة كتاب وهو متسق * وكل يومك من أيامها ورق
لا الموت معناه إلا أن تفرقه * الريح فتنتشر الأوراق تفرق^{৫৭}

জীবন এক সুবিন্যস্ত গ্রন্থের নাম, প্রতিটি দিনই যার একেকটি পৃষ্ঠা/ মৃত্যুর অর্থ কেবল এতটুকুই যে বাতাসের প্রবাহে তার পৃষ্ঠাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩.১১. ইয়াকুব বকশ রাগিব আল কাদিরী আল বাদায়ুনী

ইয়াকুব বকশ রাগিব আল কাদিরী আল বাদায়ুনী (১৮৮৮-১৯৪৮ খ্রি.) ভারতের বাদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন এবং আলীগড়ে মৃত্যুবরণ করেন। উস্তায আবু মাহফুজ কারীম আল মা’সুমী তাঁকে ভারতের বিংশ শতাব্দীর আরবী ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, “(আরবী ভাষা ও কবিতা রচনায়) ফাইজুল হাসান সাহারানপুরী, আল্লামা ফারাহী ও রাগিব বাদায়ুনীর সুউচ্চ অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে।”^{৫৮} তিনি নবী সা. এর প্রশংসায় বলেন,

ظهر النبي ففاضت الأنوار * وأضاءت الأرياف والأوعار
قد عم كل الكائنات ظهوره * كالشمس فاحتزقت به الأستار
فالكون أزهر كالرياض إذا بدا * وفتفتت من نوره الأزهار
وتألأت من حسنه وجماله * وبهائه الأنجاد والأغوار^{৫৯}

‘নবীর আগমনে আলোকমালা প্রবাহিত হয়েছে। শহর-নগর-গ্রাম সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টিজগতে তার আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন সূর্যোদয়ের ফলে অন্ধকারের পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়/ ফুলেল হয়ে বিশ্ব যেন ফুলবাগানে পরিণত হয়, তার আলো থেকে যেন ফুলেরা প্রস্ফুটিত হয়/ আর তার সৌন্দর্যে ও লাভণ্যে উপত্যকা ও পাহাড়গুলো বলমলে হয়ে উঠে।’

৩.১২. মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ সুরাটী

মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ সুরাটী (১৩০৭-১৩৬১ হি./১৮৮৯-১৯৪২ খ্রি.) ভারতের সামরুদে জন্মগ্রহণ করেন এবং আলীগড়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন কবি, ভাষাবিদ, ফক্বীহ ও বিজ্ঞ আলেম। নাহ, সরফ ও বালাগাহ শাস্ত্রে তার অনবদ্য অবদান আছে। তিনি আরবী ভাষায় কাব্যচর্চাও করেন। তিনি স্বীয় উস্তায জামাল উদ্দিন মুসা সুরাটীর প্রশংসায় তাঁর আরবী কবিতায় বলেন,

أقول لنفسي في الخلاء السومها لك * الويل ماهذا التخشع والذكر
ومن أجل أن خانت عهودك عصبه * يهتمهم الدنيا وما إن لهم عذر^{৪০}

‘আমি নির্জনে আমার অন্তরকে ভর্ৎসনা করে বলি, তোমার ধ্বংস হোক। এই নম্রতা ও স্মৃতিকাতরতার কারণ কী! / এই জন্য যে, একদল মানুষ তোমার সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে! যারা দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্ত, তাদের প্রতারণায় কী যায়!’

তিনি ইবন দুরাইদের “জামহারা তুল বালাগাহ” তাহক্বীক্ব করার পর বলেন,

كدرة البحر زهت للرائد * صافية من كل طعن الناقد
فريدة وحيدة في بابه * يرغب فيها كل حبر نابه
فرحم الله امرأ تحفظا * ودان نفسه بما قد لفظا^{৪১}

পাঠকের জন্য সমুদ্রের মুক্তোদানার মত স্ফটিক স্বচ্ছ এই গ্রন্থ, যা সমালোচকের সমালোচনা থেকে মুক্তো/ এক অসাধারণ, অনন্য গ্রন্থ, যা পাঠে প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আগ্রহান্বিত হয়/ আল্লাহ রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর যিনি সতর্কতার সাথে লেখেন এবং যা লেখেন তা পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে লেখেন।

৩.১৩ আব্দুল গফুর বাসকুহারী

আব্দুল গফুর বাসকুহারী (জন্ম. ১৯০৩ খ্রি.) ভারতের উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলার ‘বাসকুহার’ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী ভাষায় তাঁর উৎকৃষ্ট মানের কিছু কবিতা আছে। যেগুলো আরব বিশ্বে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তাঁর কবিতাগুলো বিভিন্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন। উত্তরপ্রদেশের নওগারাহ শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তিনি একটি আরবী কবিতা উপস্থাপন করেন। যার সূচনা নিম্নরূপ:

أملني القصيدة بسم الله ذي الكرم * رب السموات والأرض والقلم
إياه نعبد طول الدهر نحمده * إياه ندعو لعرض الحادث العمم
ما نال الإنس ولا جن ولا ملك * ما نال سيدنا من أفضل العظم^{৪২}

‘আমি এই কবিতার শুরু করছি মহাঅনুগ্রহশীল আল্লাহর নামে, যিনি আসমান, যমীন ও কলমের রব/ আমরা সারাজীবন একমাত্র তারই ইবাদত করি, তারই প্রশংসা করি এবং কঠিন বিপদে একমাত্র তারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি/আমাদের নবী যে মর্যাদা অর্জন করেছেন তা কোন মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতা অর্জন করতে পারেনি।’

৩.১৪. মুহাম্মাদ নাযিম নাদভী

মুহাম্মাদ নাযিম নাদভী (১৯১৪-২০০০ খ্রি.) বিহারে জন্মগ্রহণ করেন এবং করাচিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আরবী ভাষার শব্দ-ভান্ডার এবং নাহু-সরফ ও বালাগাহ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তার “বাক্বাতুল আযহার” ও “আল ক্বাছীদাতুল রায়িয়াহ” নামে দু’টি কাব্য সংকলন আছে এবং উর্দু থেকে আরবী ভাষায় বেশ কিছু অনূদিত গ্রন্থও আছে। তিনি ১৯৫৬ খ্রি. সনে হজ্জ আদায়ের পর মুনাজাত দিয়ে তার “বাক্বাতুল আযহার” কাব্যের সূচনা করেন। তিনি বলেন,

بسطت يدي راجيا منك عفرا * وجنة فردوس لديك ورضوانا
وثبت إليك من جميع مآثي * فرحماك عفوا ثم رحماك تحنانا^{৪৩}

‘আমি আমার হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক তোমার ক্ষমা ভিক্ষা, জান্নাতুল ফেরদাউস ও তোমার সন্তুষ্টি কামনা করছি/ আমাকে আমার যাবতীয় পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দান কর, তোমার রহমত হল তোমার ক্ষমা, তোমার রহমত হল তোমার দয়া।’

তিনি তার বাম চোখে অপারেশন করার পর আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে “ক্বাহীদাতুর রায়িয়াহ্” এর সূচনা করেন। তিনি বলেন,

حمدا لمن أعطى ضياء في البصر * وجاد لي قلبا نبيها قد شكر
شكرا وحمدا وثناء وافرا * والشكر يأتي بالمزيد من الخير
نعمائه العظمى كثير لا تعد * أما التي ترنو فمن نعم كبر^{৪৪}

‘ঐ সত্ত্বার প্রশংসা করছি যিনি দৃষ্টি দান করেছেন এবং আমাকে কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী একটা মহৎ অন্তর দিয়েছেন / তাঁরই জন্য সব শুকরিয়া, প্রশংসা, গুণগান; আর কৃতজ্ঞতাই সব কল্যাণ নিয়ে আসে/ তাঁর মহান নেয়ামতরাজি অগণিত, আর তুমি যা কামনা কর, তাও তাঁর নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।’

৩.১৫ আবু মাহফুজ করীম মা’সুমী

আবু মাহফুজ করীম মা’সুমী (১৯৩১-২০০৯ খ্রি.) বিহারের মহাতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। আরবী ভাষায় তার অনেক রচনা প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম আছে। তিনি আরবী ভাষায় সুন্দর সুন্দর অনেক কবিতা লিখেছেন যা অনেকগুলো এখনো মুদ্রিত হয় নি। তিনি আরবী, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষা ভালো জানতেন।^{৪৫} তিনি “যিকরা আল্লামা আব্দুল আজীজ মাইমানী রাজাকুটী” শিরোনামে একটি আরবী কবিতা লেখেন। তার কবিতার নমুনা নিম্নরূপ :

تحدث عن الخبر المشاطر للبحر * وعن لجج البحر المسائر للبحر
حديثك عن بحر تصدر لافظا * بدرّ ومرجان حديث عن البحر
سواء إذا لقيته البحر طاميا * أو الخبر غواصا على ناصع الدرّ^{৪৬}

তুমি বল সেই কালির কথা যা সাগরের সাথে মিশে আছে, বল সেই ঢেউয়ের কথা যা কালির সাথে থাকে/ কালির ব্যাপারে তোমার কথাগুলো শব্দ হয়ে বের হবে মুক্তোদানা আর কোরালের মত/ হয়তো তুমি সাগরের বালিতে সেই কালির সাক্ষাৎ পেয়েছ অথবা কালিই সমুদ্রগভীর স্ফটিক স্বচ্ছ মুক্তোর সাথে মিশেছে।

৩.১৬ শাইখ মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দীন ফাইযী ইবন মুহাম্মাদ হাসান আল-কাদেরী আল-মিলিমারী

শাইখ মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দীন ফাইযী ইবন মুহাম্মাদ হাসান আল-কাদেরী আল-মিলিমারী (২০১৭ খ্রি.) ভারতের কেরালার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবী সা. এর প্রশংসায় আরবী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। তার আরবী কবিতার কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

قمر جلا بدجي الضلال يبيدها * بشر علا قمم الكمال يفيدها
وغدا يؤر قني الربيع هلاله * فبطية الخضر اينام مليكها
عشق الفؤاد فبات يعشق وصله * فسرى الخيال، ففي العيون دموعها^{৪৭}

পথভ্রষ্টতার তিমির অন্ধকারের বেড়া জাল ছিন্ন করে দ্বন্দ্বের আল্পপ্রকাশ ঘটেছে। একজন মহামানব সেই অন্ধকারকে বিদূরিত করেন। যিনি পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। অন্তর তার প্রেমে পড়েছে। ফলে সে তার মিলনের জন্য প্রহর গুণছে। তার সাক্ষাতের কল্পনা অন্তরে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে।

কবি তার এই অনন্য কবিতার জন্য ২০১২ খ্রি. কেরালায় অনুষ্ঠিত ‘সায়্যেদ মুহাম্মাদ আলী শিহাব জাতীয় প্রতিযোগিতায়’ ২য় পুরস্কার অর্জন করেন।

৩.১৭ ড. সদরুল হাসান নাদভী

ড. সদরুল হাসান নাদভী (জন্ম: ১৯৫৭ খ্রি.) ভারতের ‘দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায়’ অধ্যয়ন শেষে সৌদি আরবের ‘মদিনাতুল মুনাওওয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়’ এ ভর্তি হন। সেখানে শরিয়া অনুশাসনে পড়াশুনা

শেষ করে বর্তমান ভারতের মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গাবাদের ‘জামিয়া ইসলামিয়া আনওয়ারুল উলুম’ এ শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিনি একজন ভারতীয় সাহিত্যিক ও আরবী ভাষার কবি। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আরবী কবিতা রচনা করেন। নবী সা. এর প্রশংসায় তাঁর আরবী কবিতার কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

فاق النيين في الأخلاق قاطبة * من جاءه منكرا قد زانه شرقا
نال الكرامة فالخلق يكرمه * بحر الفضائل لا نقصا ولا رتقا
أسرى به ربه في دار مكرمة * ولا يفوه بشر ساهيا نطقا
أرجو من الله يوم الحشر صحبته * وأعوذ بالله من أنذل ما خلقا^{৮৭}

‘সমস্ত নবীর উপর স্থান তাঁর, যে তাঁর কাছে আসে অন্যায়কারী হয়ে, তাকে তিনি তাঁর উজ্জ্বলতা দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করেন/ তিনি সম্মান অর্জন করেছিলেন, সৃষ্টি তাকে সম্মানিত করেছিল। তিনি ছিলেন বিপুল গুণের সাগর যার কোন লয় নেই, ক্ষয় নেই/ তাঁর প্রভু তাঁকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন এক সম্মানজনক গৃহে/ কোন মানুষ তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত একটি (অমূলক) শব্দও যেন না বলে/ আল্লাহর কাছে কামনা করি কেয়ামতের দিন যেন তাঁর সাথী হতে পারি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হতে।’

২.১৮ আবু সুহাইল আনোয়ার আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-ফাযফারী

আবু সুহাইল আনোয়ার আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-ফাযফারী (জন্ম: ১৩৭৯ হি.) কেরালার একজন প্রখ্যাত আরবী ভাষার কবি। প্রশংসাগাথা, শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ও শোকগাথা বিষয়ে আরবী ভাষায় তার অনেক কবিতা আছে। নবী সা. এর প্রশংসায় ‘তাবিল’ ছন্দে তার রচিত আরবী ভাষার কতিপয় কবিতার শ্লোক নিম্নরূপ,

صحا القلب من ذكرى حبيب ومنزل * وأنباء آكام وأرجاء محمل
تعال! أقاسمك المحبة لحظة * محبة من ينجيك من كل معضل
وتهدي إلى دار الخلود بلا امتراء * أ للمرء إلا تلك من خير موئل
فاقبل إلى ذكرى الحبيب محمد * نبي الهدى، أسمى الورى، خير مرسل^{৮৮}

‘বন্ধু আর বাড়ির স্মরণে হৃদয়টা জেগে উঠল, স্মরণ হল পাহাড় আর অলি-গলির কথা/ চলো ভালোবাসা ভাগাভাগি করি কিছুক্ষণ। সেই মানুষটির ভালোবাসা যিনি যাবতীয় বিপদাপদ/সমস্যা থেকে মুক্ত করবেন। যেই ভালোবাসা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য পথ দেখাবে সন্দেহাতীতভাবে, মানুষের জন্য সেই জীবনের চেয়ে উত্তম কিছু কি আর আছে! / অতএব এসো সেই হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে স্মরণ করি, যিনি হেদায়েতের নবী, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বোত্তম রাসূল।’

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের উপরে লিখিত কবিগণ ব্যতীত আরো অনেক কবি আরবী ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন। যাদের অনেকে একবিংশ শতাব্দীতেও আরবী কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন।

৪. উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম মনীষীগণ মূলত কুরআন, তাফসীর, হাদীস, উসুলুল হাদীস, ফিকহ, আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের পাশাপাশি উর্দু, ফারসি ও আরবী ভাষায় কাব্যচর্চা করেন। উপমহাদেশের কবিগণের অনেকেই আরবী কবিতাচর্চায় আরব্য কবিদের সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। আরবী কবিতা রচনায় তাদের অনেকে প্রাচীন আরবীয় কবিদের আবার অনেকে আধুনিক আরবীয় কবিদের কাব্য-রীতির অনুকরণ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের আরবী কবিতায় যেসব বিষয় দেখা যায় তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রশংসাই প্রধান। মোটকথা ভারতীয় উপমহাদেশের আরবী কবিতায় ধর্মীয় ছাপ প্রধান্য পেয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. আলাউদ্দীন রমজান আস সায়েদ মুরসি, “আশ শিরুল মাকতুব বিল আরাবিয়াহ ফি শিবহিল কুররাতিল হিন্দিয়াহ” মাজাল্লাতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪ তম সংখ্যা (জামি’আহ মিনিয়া : কুল্লিয়াতু দারিল উলুম, জুন ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২২৪৫; ড. ইনায়েত রাসুল, “আলওয়ান মিনাশ শিরিল আরবী ফিল হিন্দ” মাজাল্লাতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়াহ, ১৫ তম সংখ্যা (কাশির: আরবী বিভাগ, কাশির বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৪।
- ^২ সায়েদ রিজওয়ান আলী নাদভী, “শায়িরুল ফিল হারুন ইবন মুসা আল মুলতানী মিনাল ক্বারনিস সানী লিল হিজরাহ” মাজাল্লাতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়াহ, ৩২তম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা (পাকিস্তান: আল জামিআতুল ইসলামিয়া আল আলামিয়া-মাজমাউল বুহু আল ইসলামিয়া, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৩।
- ^৩ কাজী আতহার মুবারকপুরী, *রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ* (মুসাই, মাতবাআ’ আল হিজাজিয়াহ, ১৩৭৭ হি./১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ২৬৩।
- ^৪ ইমাম আবুল হাসান ইবন আলী আল মাসুদী, *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআ’দিনুল জাওহার*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : আল মাকতাবাতুল আছরিয়াহ, ১ম মুদ্রণ ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৯।
- ^৫ আবু উসমান আমর ইবন বাহার আল জাহিয়, *কিতাবুল হায়াওয়ান*, ৭ম খণ্ড (মিসর : শারিকা মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল বাবি আল হালাবি ওয়া আওলাদুহ, ২য় মুদ্রণ ১৩৮৭ হি./১৯৬৮ খ্রি.) পৃ. ৭৬।
- ^৬ তদেব, পৃ. ৭৭।
- ^৭ সাফওয়ান ইবন সাফওয়ান আল আনসারী ছিলেন হিজরী ২য় শতাব্দীর মু’তাজিলী কবি ও বিশিষ্ট বিদ্বান। তিনি ১৮০ হি./৭৯৬ খ্রি. সনের দিকে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মু’তাজিলী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবন আতার (৮০-১৩১ হি.) ও উমাইয়া-আব্বাসীয় যুগ প্রাণ্ড কবি বাশশার ইবন বুরদ (৯৬-১৬৮ হি.) এর সমসাময়িক কবি ছিলেন। বাশশার ইবন বুরদ মু’তাজিলীদের নিন্দা করে কবিতা রচনা করলে তিনি কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দেন (দ্র. صفوان وكيبيديا , <https://ar.m.wikipedia.org>)।
- ^৮ *কিতাবুল হায়াওয়ান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
- ^৯ আবু জা’ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত তাবারী, *তারীখুত তাবারী* (তাহক্কীক: মুহাম্মাদ আবুল ফজল ইবরাহিম), ৮ম খণ্ড (কায়রো : দারুল মা’আরিফ, ৩য় মুদ্রণ ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.) পৃ. ৫৮০।
- ^{১০} ড. মুহাম্মাদ আব্দুল আজিম আবুন নাসর আস ছুফি, *তারিখুল মুসলিমীন ওয়া হাযারাতাহিম ফি বিলাদিল হিন্দ ওয়াস সিন্দ ওয়াল বানজাব* (কায়রো : শারিকা নাওয়াবিউল ফিকর লিন নাশরি ওয়াত তাওযি’ ১ম মুদ্রণ ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৬ ও ১৫৭।
- ^{১১} সায়েদ রিজওয়ান আলী নাদভী, “শায়িরুল ফিল হারুন ইবন মুসা আল-মুলতানী মিনাল ক্বারনিছ ছানী লিল হিজরাহ”, *মাজাল্লাত আদ-দিরাসাতুল ইসলামিয়াহ*, ৩২তম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৯ ও ৪২।
- ^{১২} *কিতাবুল হায়াওয়ান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।
- ^{১৩} আব্দুল হাই ইবন ফখরুদ্দীন আল হাসানী, *আল ই’লাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আ’লাম বিমুসাম্মা নুজহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামি ওয়ান নাওয়াযির*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইবন হাযম, ১ম মুদ্রণ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪১।
- ^{১৪} আলতাফ হুসাইন হালী, *যামিমাহ উর্দু কুল্লিয়াতে হালী* (আরবী ও ফারসি পদ্য ও গদ্য) (দিল্লি: তুহফায়ে হিন্দ প্রেস, ১৩৩২ হি.), পৃ. ১২৫-১২৮।
- ^{১৫} তদেব।
- ^{১৬} আব্দুল হাই ইবন ফখরুদ্দীন আল হাসানী, *আল ই’লাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আ’লাম*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৪১।
- ^{১৭} ড. খালদুন সাঈদ সুবাহ ও তার আছ ছাক্বাফাতুল আরাবিয়াহ ফিল হিন্দ (সৌদি আরব : রিয়াদ, মারকাযুল মালিক আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আজীজ আদ দুয়ালী লিখিদমাতিল আরাবিয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.) পৃ. ৩৪৮-৩৫০।
- ^{১৮} উস্তায মুহাম্মাদ আকরাম নাদভী, *শিবলী আন নো’মানী আল্লামাতুল হিন্দ আল আদিব ওয়াল মুওয়াররিখ আন নাকিদুল আরিব* (দিমাক্ক: দারুল কলম, ১ম মুদ্রণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৯২।
- ^{১৯} হাবিবুর রহমান উসমানী, *মুয়াইয়ানুল লাবিব ফি জামঈ ক্বাছায়িদিল হাবিব* (দেওবন্দ, ভারত: আল মাকতাবাতুল ই’জাজিয়াহ, ১৩৪৮ হি.) পৃ. ৭।
- ^{২০} তদেব।
- ^{২১} তদেব।
- ^{২২} তদেব।
- ^{২৩} ড. আহমাদ ইদরিস, *আল আদাবুল আরবী ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়াহ হাত্তা আওয়াখিরিল কারনিল ইশরিন*, পৃ. ৪২৩।

- ^{২৪} ড. মুহাম্মাদ ছাকিব নাদভী, “আশ শিরুন্না আল আরবি আল হিন্দি ফিল কারনিল ইশরিন আর মিলাদী”, *মাজল্লাতুল মাজমাউল ইলমি আল হিন্দি*, ৩৮ তম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (ভারত: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আলীগড় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮-২০১৯ খ্রি.) পৃ. ১৪৫।
- ^{২৫} আল ইলাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আলাম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৬৭।
- ^{২৬} আব্দুল হামিদ ফারাহী, *দওয়ানু আব্দিল হামিদ ফারাহী* (পাকিস্তান: আদ দায়িরাতুল হামিদিয়াহ, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৩১।
- ^{২৭} আল ইলাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আলাম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৫৭ ও ১২৫৮।
- ^{২৮} ড. মুহাম্মাদ আইয়ুব তাজ উদ্দীন নাদভী, “আল মাদিহুন নববী ফিল হিন্দ ফিল কারনিল ইশরিন”, *মাজল্লাতুল দিরাসাতিল আরবিয়াহ*, ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, (কাশ্মির, ভারত: আরবী বিভাগ, কাশ্মির বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০১২) পৃ. ৯-১০।
- ^{২৯} ড. নিহার আহমাদ আজমি, *রায়হানাতুশ শির ওয়াশ শুআরা* (লৌক, ভারত: মাতবাবা কাকুরী, ১ম মুদ্রণ ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২০০।
- ^{৩০} আল ইলাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আলাম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১৯৯ ও ১২০০।
- ^{৩১} তদেব, পৃ. ৫৪।
- ^{৩২} আল ইলাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আলাম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১৯৯ ও ১২০০।
- ^{৩৩} তদেব।
- ^{৩৪} তদেব।
- ^{৩৫} আল ইলাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আলাম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৩৫ ও ১২৩৮।
- ^{৩৬} আল ইলাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আলাম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৩৮।
- ^{৩৭} তদেব।
- ^{৩৮} ড. নিহার আহমাদ আজমী, *রায়হানাতুশ শির ওয়াশ শুআরা*, পৃ. ২৭৮।
- ^{৩৯} ড. আলাউদ্দীন রমজান আস সায়েদ মুরসী, “আশ শিরুন্না মাকতুব বিল আরবিয়াহ ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়াহ” *মাজল্লাতুল দিরাসাতিল আরবিয়াহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪ তম সংখ্যা, পৃ. ২২৩৭ ও ২২৩৮।
- ^{৪০} আল ইলাম বিমান ফিল হিন্দ মিনাল আলাম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪৯।
- ^{৪১} ইবন দুরাইদ, *জামহরাতুল লুগাহ*, তাহকীক: মুহাম্মাদ ইউসুফ সুরাটী ও কারনাকু, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদ, ভারত: দায়িরাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়াহ, ১৩৪৪ হি.) পৃ. ৩।
- ^{৪২} ড. মুহাম্মাদ ছাকিব নাদভী, “আশ শিরুন্না আরবি আল হিন্দি ফিল কারনিল ইশরিন আর মিলাদী (তারাজিমুশ শুআরা ওয়া নামাযিযু আশআরিহিম)”, *মাজল্লাতুল মাজমাউল ইলমি আল হিন্দি*, ৩৮ তম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (ভারত: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আলীগড় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮-২০১৯ খ্রি.) পৃ. ১৫২।
- ^{৪৩} উস্তায নাযিম নাদভী, *দিওয়ানু বাকাতুল আযহার* (করাচি, পাকিস্তান: দারুত তালিফ ওয়াত তরজমা দারখশা সোসাইটি, তাবি) পৃ. ৭।
- ^{৪৪} উস্তায নাযিম নাদভী, *দিওয়ানু ক্বাছীদাতুর রায়িয়াহ* (পাকিস্তান: মাতবাবাতুল কাদির রামসুওয়ামী, তাবি) পৃ. ৩।
- ^{৪৫} ড. আহমাদ ইদরিস, *আল আদাবুল আরবী ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়াহ হাত্তা আওয়াখিরিল কারনিল ইশরিন*, পৃ. ৩৮১।
- ^{৪৬} ড. মুহাম্মাদ ছাকিব নাদভী, “আশ শিরুন্না আরবি আল হিন্দি ফিল কারনিল ইশরিন আর মিলাদী (তারাজিমুশ শুআরা ওয়া নামাযিযু আশআরিহিম)”, *মাজল্লাতুল মাজমাউল ইলমি আল আরবি আল হিন্দি*, ৩৮ তম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫২।
- ^{৪৭} ড. মুহাম্মাদ আইয়ুব তাজ উদ্দীন নাদভী, “আল মাদিহুন নববী ফিল হিন্দ ফিল কারনিল ইশরিন”, *মাজল্লাতুল দিরাসাতিল আরবিয়াহ*, ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, (কাশ্মির, ভারত: আরবী বিভাগ, কাশ্মির বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০১২) পৃ. ১৪।
- ^{৪৮} ড. নিসার আহমাদ আজমী, *রায়হানাতুশ শির ওয়াশ শুআরা*, পৃ. ৩৫৪।
- ^{৪৯} তদেব, পৃ. ১৩ ও ১৪।

আরবী মাছাল সাহিত্যে হাদীসের প্রভাব [Impact of Hadith on Arabic Masal Literature]

মো: হাদিউজ্জামান*

[Abstract: The Hadith of the prophet is the main influencer in Arabic literature, particularly in prose after the Quran. The prophet (SM) conveyed the call of Islam to people and explained it through various methods. One of the most important methods is Masal (proverbs and comparison). The Prophet (SM) did not use the style of proverbs and examples for an artistic purpose to decorate his words as litterateurs do, Rather his goal was higher than that; it was the embodiment of inward meanings, so that the ambiguous becomes clear and the distant approaches. Likewise, Masal (proverbs and comparison) is a method of motivating the soul to do good deeds and to keep it away from evil and sin. Masal also trains it on correct thinking and sound logical analogy. For these and other purposes, the Prophet (SM) used a group of proverbs and comparison in several different places and cases. He mostly relied on this prose style, as he knew the role that the Masal played among the people. This is why he used to recite the verses of the Masal of the holly Quran. We see him (SM) diversifying the one who is compared. Sometimes he attributes the comparison to himself, sometimes to Allah and sometimes to the angels. He also varies the subjects of the Masal. The Masal was enriched with a variety of topics and a diversity of styles. This paper contains a study of the impact of the prophetic Hadith on the Arabic Masal literature.]

Keywords: Masal, Hadith, Literature, Comparison, Prophet.

১. ভূমিকা

ইসলামের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদ সা.-কে নির্বাচন করেছেন। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এ গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি এ গুরুদায়িত্ব পালনে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তন্মধ্যে মাছাল (প্রবাদ বা তুলনা) অন্যতম। তিনি তার জাতির নিকট মাছালের গুরুত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে জানতেন। তাই তিনি তার জাতির নিকট প্রায়ই মাছাল সম্বলিত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতেন। তার মাছালগুলো শিল্পগুণ সমৃদ্ধ হলেও তিনি তার কথায় শৈল্পিক সৌন্দর্যের জন্য মাছাল ব্যবহার করেন নি। তার মূল লক্ষ্য ছিলো মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও বিবেককে জাগ্রতকরণ। তিনি অল্প কথায় গভীর অর্থপূর্ণ বক্তব্য দানে পারঙ্গম ছিলেন। এ কারণে তাকে জাওয়ামিউল কালিম বলা হয়। আর একারণে তার মাছালগুলো আরবী সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে পরিনত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আরবী মাছাল সাহিত্যে হাদীসে নববীর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. المثل বা উপমাদাতার বৈচিত্র্যায়ণ

রাসূলুল্লাহ সা. উপমেয় (যাকে উপমা দেয়া হয়) ও উপমাদাতার বর্ণনায় বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। কখনো উপমাকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। যেমন- হাদীসে রয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَنْعَجِبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ.

“জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেন, আমার ও অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি গৃহ নির্মাণ করলো আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ শেষ করে গৃহটিকে সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের জায়গাটুকু খালি রাখা না হত।”

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

কখনো উপমাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। যেমন- হাদীসে রয়েছে,
 عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَعْدَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
 عَلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ سُورَانِ هُمَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَتَانِ، عَلَى الْأَبْوَابِ سُورٌ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ
 ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يُونُس: وَالْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا يَفْغُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ السِّتْرُ وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ

“আন-নাওয়াস ইবনু সাম’আন আল-কিলাবী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তা’আলা এভাবে সোজা পথের একটি উদাহরণ দিয়েছেন-রাস্তার দু’ধারে দুটি প্রাচীর। প্রাচীর দুটিতে আছে অনেকগুলো খোলা দরজা। এগুলোতে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। একজন আহবানকারী রাস্তার মাথায় দাড়িয়ে আহবান করছেন। অন্য এক আহবানকারী পথের উপর থেকে ডাকছেন। “আর আল্লাহ তা’আলা শান্তিময় আবাসের দিকে ডাকছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা পথের হিদায়াত দান করেন”। রাস্তার দু’পাশে দরজাগুলো হল আল্লাহ তা’আলার নির্ধারিত সীমাসমূহ। সুতরাং কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তাতে (দরজার) পর্দা সরে যায়। আর উপর থেকে যে আহবায়ক আহবান করছেন তিনি হলেন আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হতে উপদেশদাতা।”^২

কখনো উপমাকে ফেরেশতাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। যেমন- হাদীসে রয়েছে,
 جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ
 وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِمَصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ
 نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ
 الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا أَوَلَوْهَا لَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ
 بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالِدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالِدَّاعِي مُحَمَّدٌ، فَمَنْ أَطَاعَ
 مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرَقَ بَيْنَ النَّاسِ

“জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ফেরেশতা নবী সা. এর নিকট আসলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। একজন ফেরেশতা বললেন, তিনি [নবী সা.] ঘুমিয়ে আছেন। অন্য একজন বললেন, চক্ষু ঘুমিয়ে বটে, কিন্তু অন্তর জেগে আছে। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উদাহরণ আছে। সুতরাং তাঁর উদাহরণ তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ বলল- তিনি তো ঘুমন্ত, আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উদাহরণ হল সেই লোকের মত, যে একটি বাড়ী তৈরি করল। তারপর সেখানে খানার আয়োজন আহবানকারীকে করল এবং একজন (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিল, তারা ঘরে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, তারা ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উদাহরণটি ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো ঘুমন্ত, আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত, তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, ঘরটি হল জান্নাত, আহবানকারী হলেন মুহাম্মাদ সা.। যারা মুহাম্মাদ সা. এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহ আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ সা. এর অবাধ্যতা করল, তারা আসলে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ সা. হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি।”^৩

৩. المثل বা উপমানের বৈচিত্র্যায়ণ

নববী সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন আমাদের নিকট স্পষ্ট করে যে, মহানবী সা. এক অসাধারণ সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি তার কথায় অনেক কিছুর উপমা প্রদান করেছেন। উপমানের

ক্ষেত্রে (যার সাথে উপমা দেয়া হয়) তিনি বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। কখনো মুমিনকে উপমা দিয়েছেন ঘোড়ার সাথে। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى آخِيَّتِهِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ

“মুমিনের উপমা হলো খুঁটিতে বাধা ঘোড়ার ন্যায়। তা চক্রর কাটতে থাকে। অতপর খুটির দিকে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কোনো মুমিন কোনো ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়। আবার ইমানের দিকে প্রত্যবর্তন করে।”^{৪৪} আবার কখনো মুসলিমকে মৌমাছির সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ، إِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا

“মুমিনের উপমা মৌমাছির ন্যায়। যদি কিছু খায় পবিত্র খায়, যদি কিছু রাখে পবিত্র রাখে। আর যদি কোনো শুকনো ডালে বসে তা ভেঙে ফেলে না।”^{৪৫}

কখনো মুমিনকে স্বচ্ছ স্বর্ণের সাথে উপমা দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ سَيِّكَةِ الذَّهَبِ إِنْ نَفَخْتَ عَلَيْهَا احْمَرَّتْ وَإِنْ وَزَنْتَ لَمْ تَنْقُصْ

“মুমিনের উদাহরণ সোনার দণ্ডের মতো। যদি আপনি এটিতে ফুঁ দেন তবে এটি লাল হয়ে যায়। আর যদি আপনি এটির ওজন করেন তবে এটি হ্রাস পায় না।”^{৪৬}

৪. উপমায় বা উপমেয়-এর বৈচিত্র্যায়ণ

মহানবী সা. উপমেয়-এর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন, যেন এই উপমাগুলো সমাজ ও জাতির সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি উপমা প্রদান করেছেন মানবজাতির। যেমন- হাদীসে এসেছে,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ، لَا تَكَادُ تُجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

“আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রা. থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রা. বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে শুনেছি, তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই মানুষ এমন শত উটের মত, যাদের মধ্যে থেকে তুমি একটিকেও বাহনের উপযোগী পাবে না।”^{৪৭}

তিনি উপমা দিয়েছেন নবীগনের,^{৪৮} মুসলিম জাতি এবং ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতির,^{৪৯} আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনকারীর,^{৫০} সৎ ও অসৎ বন্ধুর,^{৫১} এবং মুমিন ও পাপিষ্ঠের।^{৫২} এ ছাড়াও তিনি উপমা দিয়েছেন ঐ মুমিনের যিনি কুরআন পাঠ করেন, অন্যদিকে যিনি কুরআন পাঠ করেন না,^{৫৩} ঐ নামাজি ব্যক্তির যিনি রুকু-সিজদা সঠিকভাবে আদায় করেন না^{৫৪} এবং কৃপন ও দানকারী ব্যক্তির।^{৫৫} এমনভাবে তিনি উপমা দিয়েছেন ঐ ব্যক্তির যিনি পাপের কাজ হয়ে গেলে দ্রুত নেকির কাজে মনোনিবেশ করেন,^{৫৬} ঐ ব্যক্তির যিনি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেন অথচ নিজেই তা পালন করেন না^{৫৭} ইলম গোপনকারীর,^{৫৮} নফল সাওম আদায়কারীর,^{৫৯} আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের,^{৬০} হেদায়াতের যা নবি সা. নিয়ে এসেছেন^{৬১} এবং ঐ বাড়ির যাতে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।^{৬২}

৫. উপমার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যায়ণ

নবী সা. উপমার বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যায়ণ করেছেন এবং উপমাকে বিভিন্ন বিষয় এবং উদ্দেশ্য দিয়ে এমনভাবে সমৃদ্ধ করেছেন যা পূর্বে কেউ করে নি। বৈচিত্র্যময় বিষয়গুলো হলো: আকিদা, ইবাদত, নৈতিকতা, নৈতিকতা, দুনিয়াবিমুখতা, জ্ঞান ও দাওয়াত। নিম্নে এর দুটি উদাহরণ পেশ করা হলো,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْفَدَ نَارًا. فَجَعَلَتْ الدَّوَابَّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ. فَأَنَا آخِذٌ بِخُرْكُمِ وَأَنْتُمْ تَقْحُمُونَ فِيهِ

“আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের উদাহরণ এমন লোকের মত, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চারদিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পুড়ে, তারা তাতে পুড়তে লাগল। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে ফিরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেগুলো আগুনে তাকে পরাজয় করল এবং আগুনে পতিত হল। (তদুপ) আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমরা তাতেই পতিত হচ্ছ।”^{৬৩}

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: رَأَيْتُمُ الْجَيْشَ بَعْثَنِي وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالْتَجَا النَّجَاءَ، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ فَأَدْجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَتَنَجَّوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَجْتَنَحَهُمْ.

“আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি ও আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ এমন এক লোকের মত, যে তার সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলল, আমি আমার চোখ দিয়ে শত্রুদলকে দেখেছি আর আমি স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা সত্বর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একদল তার কথা মান্য করে রাতের অন্ধকারে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল। এদিকে আরেক দল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, যদ্বারা ভোর বেলায় শত্রুসেনা এসে তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দিল।”^{২৪}

৬. উপমার রীতিতে বৈচিত্র্যায়ণ

রাসূল সা. উদাহরণ পেশ করার ক্ষেত্রে একাধিক অভিনব রীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হলো অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার যা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাদের হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। এ পদ্ধতিতে হিন্দীয়গুলো শেখার প্রক্রিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়।

শ্রোতা একইসাথে ইঙ্গিতের চিহ্ন দেখে ও বাক্য শ্রবণ করে যা মনে রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। এই পদ্ধতির একটি উদাহরণ হলো, রাসূল সা. বর্ণিত হাদীস যাতে তিনি কেয়ামতের আসন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ، وَفَرَنَ بَيْنَ السَّابَةِ وَالْوُسْطَى

“সাহল ইবন সা’দ-সা’ঈদী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর সহাবী সাল ইবনু সা’দ-সা’ঈদী রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ আমার আগমন এবং কিয়ামতের মাঝে দূরত্ব এ আঙ্গুল থেকে এ আঙ্গুলের দূরত্বের মত। কিংবা তিনি বলেন, এ দু’টির দূরত্বের মত। এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দুটি মিলিত করলেন।”^{২৫}

রাসূল সা. কখনো কখনো শিক্ষা প্রদান ও ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নকশাকে (Diagram) অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মানুষের উচ্চাশা ও এটিকে ঘিরে থাকা আয়ুষ্কালের বিষয়ে তিনি বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «خَطُّ النَّبِيِّ خَطٌّ مُرَبَّعٌ، وَخَطُّ خَطِّ الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطُّ خَطِّ صِغَارٍ إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ، وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمْلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا

“আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী সা. একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মধ্যখানে একটি রেখা টানলেন, যা তা থেকে বের হয়ে গেল। তারপর দু’পাশ দিয়ে মধ্যের রেখার সঙ্গে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ মাঝের রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা বেষ্টন করে আছে। আর বাইরে বেড়িয়ে যাওয়া রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বন্ধন। যদি সে এর একটি এড়িয়ে যায়, তবে আরেকটি তাকে দংশন করে। আর আরেকটি যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে।”^{২৬}

নকশার মাধ্যমে কোনো বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করানোর আরেকটি হাদীস,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ خَطِّينِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطِّينِ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ، فَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

“জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। আমরা নবী সা. এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দু’টি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দু’টি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন, এটা আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর তিনি এ

আয়াত তিলওয়াত করেন, “এবং এ পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।”^{২৭}

৭. হাদীসভিত্তিক মাছাল সম্বলিত গ্রন্থ রচনা ও অধ্যায় রচনা

হাদীস সংকলনকারী মুহাদ্দিসগন রাসূল সা. এর মাছালগুলিকে তাদের গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলাদা অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগনের অবদান উল্লেখ করা হলো:

ক. ইমাম তিরমিজি রহ. রচিত সংকলন গ্রন্থ “আল আমছাল মিনাল কিতাবি ওয়াসসুনুহা”। তিনি গ্রন্থটিতে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মাছাল সম্বলিত আয়াত, হাদীস ও বিজ্ঞানের মাছাল নিয়ে এসেছেন। এতে তিনি মাছাল সম্বলিত ১৭ টি হাদীস নিয়ে এসেছেন। তিনি প্রত্যেকটি মাছাল ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি সেগুলোর শিক্ষা ও উপদেশের বর্ণনা দিয়েছেন।

খ. ইমাম সুয়ুতী রহ. এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থের নাম “আল জামি”। এতে রাসূল সা.-এর হাদীসগুলো সংকলন করার মাধ্যমে হাদীসে নববীর অনেক বড় খেদমত করেছেন। খুব সহজে হাদীস খুঁজে পাওয়ার জন্য গ্রন্থটিকে তিনি হরফে হিজা অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন। এজন্যই রাসূল সা. এর মাছাল সম্বলিত হাদীসগুলো ধারাবাহিকভাবে এসেছে। কারণ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো **مثل** শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। আর এতে মাছাল সম্বলিত হাদীসের সংখ্যা ৪২ টি।

গ. আবু উবাইদ কাসিম ইবন সালাম রহ. এর মাছাল সম্বলিত গ্রন্থ “আল-আমছাল”। তিনি এতে রাসূল সা. এর মাছাল সম্বলিত কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেন নি। তবে তিনি তার মাছাল সংক্রান্ত রচনায় রাসূল সা.-এর ৩০ টি মাছাল নিয়ে এসেছেন এবং প্রত্যেক মাছাল উল্লেখ করার সময় মাছাল সংক্রান্ত হাদীসটির মান উল্লেখ করেছেন।

ঘ. আবুল ফজল আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-মাইদানী রহ. হাদীসে নববীতে বর্ণিত মাছালগুলোকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি শিরোনাম দিয়েছেন “ফী নাবজিম মিন কালামিন নাবিয়্যি সা. ওয়া খুলাফাইহির রাশিদীন ওয়াসসালাফিস সলিহীন”। এতে তিনি রাসূল সা. এর ৫৮ টি মাছাল উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ অধ্যায়ে ৪ জন খোলাফায়ে রাশেদীন, ইবনে আব্বাস, আবুদারদা, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, হাসান বসরি রহ. এর উক্তিও রয়েছে।

৮. বর্ণনামূলক সমৃদ্ধকরণ

বর্ণনামূলক সমৃদ্ধকরণে হাদীসে নববী আরবী মাছাল সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। শৈল্পিক গুণে সমৃদ্ধ কয়েকটি মাছাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ: إِنْ غَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ

“ইবন উমার রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্ত) রাখে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু সে বাঁধন খুলে দেয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।”^{২৮}

অত্র হাদীসে রাসূল সা. যে ব্যক্তি কুরআন ধারণ করে, নিয়মিত তেলাওয়াত করে এবং ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে তাকে রশি দিয়ে বেধে রাখা উটের মালিকের সাথে তুলনা করেছেন। আর কুরআনের ধারককে রশি দিয়ে বেধে রাখা উটের মালিকের সাথে উপমা দেয়াতে এক চমৎকার আলঙ্কারিক রহস্য বিদ্যমান। আর তা হলো এখানে **المصاحبة** দ্বারা উদ্দেশ্য **المؤلفة** বা ভালোবাসায় পরস্পরের সাথে লেগে থাকা। আর এটি তখন হবে যখন কুরআনের ধারক নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করবে, আল্লাহর কিতাবের ফুলবাগিচায় বিচরণ করবে এবং তা অনুযায়ী আমল করবে। শুধুমাত্র মুখে আওরিয়ে পাঠ নয়, বরং কুরআন তার জীবন

চলার পথে সঙ্গী হবে এবং কুরআনের আলো দ্বারা তার প্রতিটি কর্ম আলোকিত হবে। যেমনটি নিয়ন্ত্রণে থাকা উটের মালিক বাসায় ও সফরে সর্বাবস্থায় উটের সাহচর্যপ্রাপ্ত হন। আর উটের সাথে উপমাকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, উট অন্যতম সর্বাধিক পলায়নপর প্রাণী। আমি মনে করি, উটকে উল্লেখ করার অন্য একটি রহস্য রয়েছে। আর তা হলো, আরব জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো উট। কোথাও ভ্রমণে গেলে উটের পিঠে সর্বদাই খাদ্য সামগ্রী বহন করতো। আর তাই উটের মালিক অত্যন্ত সতর্ক থাকতো যাতে হারিয়ে না যায়। এমনভাবে কুরআনের ধারক কুরআনকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তিনি তা ভুলে না যান। কারণ, কুরআন তার জীবনের অংশ।

খ. রাসূল সা. এর বাণী: *هَذَا حَيْنٌ حَمِيٍّ الْوُطَيْسُ* “এটা যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত।”^{২৬}

আক্ষরিক অর্থে *وطيس* হচ্ছে চুলা বা গোলাকার পাথর যা আগার না হওয়া পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। কেউ তা বহন করতে পারে না এবং মাড়িয়ে যেতে পারে না। যখন উভয় পক্ষ থেকেই যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে তখন রাসূল সা. এই উক্তি করেন, যা শৈল্পিক গুণে সমৃদ্ধ।

গ. রাসূল সা. এর বাণী: *عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ* রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন, মুমিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।^{২৭}

সিরাতের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে, আবু ইজ্জাহ আলজুমাহি নামক একজন মুশরিক ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূল সা. এই উক্তি করেছিলেন যা পরবর্তীতে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবু ইজ্জাহ আলজুমাহি বদর যুদ্ধে বন্দি হন। তিনি তার পরিবার ও সন্তানদের অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করলে রাসূল সা. দয়াপরবশ হন এবং পরবর্তীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা অঙ্গিকার করে কোনো প্রকার জরিমানা ছাড়াই মুক্তি পান। কিন্তু তিনি অঙ্গিকার ভঙ্গ করেন। উহুদ যুদ্ধে আবার বন্দি হলে তিনি আবারও পরিবারের অসহায়ত্বের কথা বললে রাসূল সা. এই উক্তি করেন।^{২৮}

৯. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, হাদীসে বর্ণিত মাছালগুলি আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এবং আরবী মাছাল সাহিত্য হাদীসে নববী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। মাছালগুলি একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং জনহিতকর কাজে প্রেষণা প্রদান করে অন্যদিকে আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাদীসে বর্ণিত মাছালগুলিতে উপমাদাতা, উপমান, উপমেয়, উপমার বিষয়বস্তু ও উপমার রীতিতে বৈচিত্র্যায়ণের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়। অত্র প্রবন্ধে হাদীসে বর্ণিত মাছালগুলির বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিক ও উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়- পাঠক সমাজ অত্র প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে আরবী মাছাল সাহিত্যে হাদীসের প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে সক্ষম হবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ৪র্থ খণ্ড (বুলাক, মিসর: আল মাতবাতুল কুবরা আল আমীরিয়াহ, ১৪২২ হি.), বাবু খতামিন নাবিয়্যন, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৩৫৩৪।
- ^২ সূরা ইউনুস, আয়াত নং ২৫; মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানু আত-তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড (মিসর: শিরকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবাতুল মুসতফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রি.), বাবু মা জাআ ফী মাছালিল্লাহি লিইবাদিহী, পৃ. ১৪৪, হাদীস ২৮৫৯।
- ^৩ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ৯ম খণ্ড, বাবুল ইকুতিদা বিসুনানি রসুলিল্লাহ সা., পৃ. ৯৩, হাদীস নং ৭২৮১।
- ^৪ আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, ১৩ শ খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল রুশদ লিল্লাশরি ওয়াত্তাজ্জি, ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং ১০৪৬১।
- ^৫ মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, *সহীহ ইবন হিব্বান*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারু ইবন হাজম, ১ম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৪৯৬, হাদীস নং ৩৮৩৫।
- ^৬ আলাউদ্দিন আলি ইবন হিসামুদ্দিন আশ-শাজিলী, *কানজুল উম্মাল ফী সুনানিল আকুওয়াল ওয়াল আফআল*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাতুল রিসালাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৪৮, হাদীস নং ৭৩৫।
- ^৭ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ৮ম খণ্ড, বাবুল রফঈল আমানাহ, পৃ. ১০৪, হাদীস নং ৬৪৯৮।

- ^৮ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী (সা. বলেছেন, আমার ও অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি গৃহ নির্মাণ করলো আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ শেষ করে গৃহটিকে সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের জায়গাটুকু খালি রাখা না হত। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, তদেব, ৪র্থ খণ্ড, বাবু খতামিন নাবিয়্যীন, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৩৫৩৪।
- ^৯ আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেন, মুসলিম, ইয়াহুদী ও নাসারাদের উদাহরণ হলো এমন, এক ব্যক্তি একদল লোককে নিয়োগ করলো, তারা তার জন্য রাত পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু অর্ধদিবস পর্যন্ত কাজ করার পর তারা বললো, আপনার পারিশ্রমিকের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। সে ব্যক্তি অন্য আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করলো এবং বলল, তোমরা দিনের বাকী অংশ কাজ কর, তোমরা আমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজ করতে শুরু করলো। যখন 'আসরের সালাতের সময় হলো, তখন তারা বললো, আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। অতঃপর সে ব্যক্তি আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করলো। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বাকী অংশে কাজ করলো এবং সে দু'দলের পূর্ণ পারিশ্রমিক অর্জন করলো। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, তদেব, ১ম খণ্ড, বাবু মান আদরাকা রাকাআতান মিনাল আসরি কুবলাল গুরুব, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ৫৫৮।
- ^{১০} নু'মান ইবনু বাশীর রা. থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেন, যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লঙ্ঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদের মতো, যারা কুরআন মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহ কালে উপর তলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তবে ভাল হয়) এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, তদেব, ৩য় খণ্ড, বাবু হাল ইউকুরাউ ফিল কিসমাতি ওয়াল ইসতিফহাম ফীহি, পৃ. ১৩৯, হাদীস নং ২৪৯৩।
- ^{১১} আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিস্ক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুব্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, তদেব, ৩য় খণ্ড, বাবুন ফিল আত্তার ওয়া বাইঈল মিসকি, পৃ. ৬৩, হাদীস নং ২১০১।
- ^{১২} আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল, শস্যক্ষেতের নরম চারাগাছের মত। যে কোন দিক থেকেই তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার যখন বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বাল্য মুসিবত মু'মিনকে নোয়াতে থাকে। আর ফাসিক হল শক্ত ভূমির উপর শক্তভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো গাছের মত, যাকে আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন ভেঙ্গে দেন। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, তদেব, ৭ম খণ্ড, বাবু মা জাআ ফী কাফফারাতিল মারীদ, পৃ. ১১৫, হাদীস নং ৭২৮১।
- ^{১৩} আবু মুসা আশ'আরী রা. সূত্রে নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ লেবুর মত যা সুব্রাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মু'মিন) কুরআন পাঠ করে না, তাঁর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুব্রাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তাঁর দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মত, যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিষাদ। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিষাদ এবং যার কোন সুগন্ধও নেই। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাবু ফাদ্বলিল কুরআন আলা সাঈরিল কালাম, পৃ. ১৯০, হাদীস নং ৫০২০।
- ^{১৪} আবু আব্দিল্লাহ আশ'আরী রা. বলেন। রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি রুকু পরিপূর্ণরূপে করে না, সিজদায় ঠোঁকর মারে অর্থাৎ তারাহুরো করে তার উদাহরণ সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো যে একটি অথবা দুটি খেজুর তো খায়, অথচ তা তাকে মোটেই পরিতৃপ্ত করে না। দ্র. মুহাম্মাদ ইবন আলী আত-তিরমিযী, আল-আমছাল মিনাল কিতাবি ওয়াসসুনুহ (বৈরুত: দারু ইবন জায়দুন, তা. বি.), পৃ. ৫৫, হাদীস নং ৪৮।
- ^{১৫} আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেন, কুপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির মত, যারা লৌহ বর্মের আচ্ছাদিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কজায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছে করে, তখন বর্মটি তার দেহের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে। আর কুপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছে করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হস্ত কণ্ঠের সঙ্গে লেগে যায়। অতঃপর আবু হুরায়রা রা. বলেন, তিনি নবী সা.-কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করত যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, তদেব, ৪র্থ খণ্ড, বাবু মা ক্বীলা ফী দিরঈন্নাবি সা., পৃ. ৪১, হাদীস নং ২৯১৭।
- ^{১৬} উকুবাহ বিন আমের রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পাপ করার পরপরই পুণ্যকর্ম করে, সেই ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মত যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাস রোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি পুণ্যকর্ম করে, তখন বর্মের একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পুণ্য

- করলে আরো একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। দ্র. ইবন আবদুন্নইয়া, *কিতাবুত তাওবাহ* (মিসর: মাকতাবাতুল তা. বি.), পৃ. ১১২, হাদীস নং ১৩৭।
- ^{১৭} রাসূল সা. বলেন, যে জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করেন অথচ নিজেকে ভুলে যান ও নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন না প্রদীপের ন্যায় যা মানুষকে আলো প্রদান করে অথচ নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়। দ্র. সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-তাবরানী, *আল-মুজাম আল-কাবীর*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়া, তা. বি.), পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ১৬৮১।
- ^{১৮} যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে কিন্তু তা গোপন রাখে তিনি ঐ ব্যক্তির মতো যিনি সম্পদ জমা করে রাখে। আর তা হতে ব্যয় করে না। দ্র. সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-তাবরানী, *আল-মুজাম আল-আওসাত*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২১৩, হাদীস নং ৬৮৯।
- ^{১৯} আয়শা রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেন, নফল সাওমের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে দান করার নিয়তে কিছু মাল বের করল। এখন সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা দানও করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে। দ্র. আহমাদ ইবন শুআইব, *সুনান আন-নাসাঈ*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: আল-মাকতাবাহ আত-তিজারিয়াহ আল-কুবরা, ১ম সংস্করণ, ১৯৩০ খ্রি.), পৃ. ১৯৩, হাদীস নং ২৩২২।
- ^{২০} বানু ফিরের মুসতাওরিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের পানিতে তার একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে আনল। সে দেখুক তার আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে। দ্র. মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *তদেব*, ৪র্থ খণ্ড, বাবু ফানাদ্দুন্নইয়া ওয়া বায়ানিল হাশরি ইয়ওমাল ক্বিয়ামাহ, পৃ. ২১৯৩, হাদীস নং ২৮৫৮।
- ^{২১} আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুণতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিখায়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত- যে সে দিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহর যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না। দ্র. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ১ম খণ্ড, বাবুল ইক্বতিদা বিসুনানি রসূলিল্লাহ সা., পৃ. ২৭, হাদীস নং ৭৯।
- ^{২২} আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেনঃ যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এরূপ দুটি ঘরের তুলনা করা যায় জীবিত ও মৃতের সঙ্গে। দ্র. মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *তদেব*, ১ম খণ্ড, বাবু ইসতিহবাবি সলাতিন নাফিলাহ ফী বাইতিহী ওয়া জাওয়াজিহা ফিলমাসজিদ, পৃ. ৫৩৯, হাদীস নং ৭৭৯।
- ^{২৩} মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *তদেব*, ৪র্থ খণ্ড, বাবু শাফাক্বাতিহী আলা উম্মাতিহী সা. ওয়া মুবালাগাতিহী ফী তাহজীরিহিম মিন্মা ইয়াদুররুহ্ম, পৃ. ১৭৮৯, হাদীস নং ২২৮৪।
- ^{২৪} ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ৮ ম খণ্ড, বাবুল ইনতিহা আনিল মাআছী পৃ. ১০১, হাদীস নং ৬৪৮২।
- ^{২৫} ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ৭ম খণ্ড, বাবুল লি'আন পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৫৩০১।
- ^{২৬} ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ৮ম খণ্ড, বাবুল ফিল আমাল ওয়া তুওলিহী পৃ. ৮৯, হাদীস নং ৬৪১৭।
- ^{২৭} সূরা আনআম, আয়াত নং ১৫৪; ইবনু মাজাহ আবু আব্দিল্লাহ আল-কাজবিনী, *সুনানু ইবন মাজাহ* (জুবাইল, সৌদি আরব: দারুস সিদ্দিক লিনাশর, ২য় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), বাবু তাজীমি হাদীসি রসূলিল্লাহ সা. ওয়াত তাগলীজি আলা মান আরাজাহ পৃ. ৫১, হাদীস নং ১১।
- ^{২৮} ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাবু ইসতিজকারিল কুরআন ওয়া তাআহ্দিহী, পৃ. ১৯৩, হাদীস নং ৫০৩১।
- ^{২৯} মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *তদেব*, ৩য় খণ্ড, বাবু শাফাক্বাতিহী আলা উম্মাতিহী সা. ওয়া মুবালাগাতিহী ফী তাহজীরিহিম মিন্মা ইয়াদুররুহ্ম, পৃ. ১৩৯৮, হাদীস নং ৪৫০৪।
- ^{৩০} ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *তদেব*, ৮ম খণ্ড, বাবু লা ইউলদাগুল মারউ মিন জুহরিন মাররাতাইন, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৬১৩৩।
- ^{৩১} ইবন হিশাম, *আস-সীরাতুল্লাবাবিয়াহ*, ২য় খণ্ড (মিসর: শিরকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবাহা মুসতফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ১০৪।

কবি আল-আখতাল ও উমাইয়া খলীফাদের প্রশংসায় তাঁর কাব্যচর্চা [Poet Al-Akhtal and his Poetry in Praise of the Umayyad Caliphs]

মোহাম্মদ উল্লাহ*

[Abstract: The Umayyad period (661-750 AD) saw great progress in Arabic language and literature. During this period, the caliphs and royals patronized literature, education and culture. Poets and writers traveled to the royal court and they got close to the kings. Al-Akhtal was one of the greatest poets of the Umayyad period. He secured the patronage of the caliphs by composing poems in praise of them and slanderous poems against their enemies and cemented his position in the royal court. The poet Al-Akhtal contributed immensely to the praise of the Caliphs. His panegyric was rich in language and rhetoric. The poet Al-Akhtal followed his predecessors Nabigah and Al-Asha in writing panegyric. The poet at the beginning of the Appreciative Qasida Proyasī has narrated the description of habitats, vehicle and desert. Caliph Abdul Malik Ibn Marwan awarded the poet Al-Akhtal the title of poet of the Umayyad dynasty and one of the greatest poets of Arab due to his outstanding contribution to the composition of the caliphate's praise sagas. This article will shed light on the biography of the poet Al-Akhtal and his poetry in praise of the Umayyad Caliphs.]

Keywords: Poet Al-Akhtal, Poetry, Praise of the Umayyad Caliphs.

১. ভূমিকা

উমাইয়া যুগে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগে খলীফা ও রাজন্যবর্গ সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কবি ও সাহিত্যিকগণ রাজদরবারে যাতায়াত করেন এবং রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্য লাভ করেন। উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভাকবি ছিলেন আল-আখতাল। তিনি খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তাদের প্রশংসাগাথা এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করে রাজদরবারে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। কবি আল-আখতাল খলীফাদের প্রশংসাগাথা রচনায় অসাধারণ অবদান রাখেন। তাঁর প্রশংসাগাথার ভাষা ছিল প্রাজ্ঞ ও অলংকারপূর্ণ। কবি আল-আখতাল প্রশংসাগাথা রচনায় তাঁর পূর্ববর্তী কবি নাবিগা ও কবি আল-আশা-এর অনুসরণ করেন। প্রশংসামূলক ক্বাসিদার সূচনায় কবি প্রেয়সীর বাস্তবতা, বাহন ও মরুভূমির বর্ণনার অবতারণা করেন। খলীফাদের প্রশংসায় কাব্যরচনায় অসামান্য অবদান রাখার কারণে খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান কবিকে উমাইয়া রাজবংশের কবি ও আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদায় ভূষিত করেন। এই প্রবন্ধে কবি আল-আখতালের জীবনী ও উমাইয়া খলীফাদের প্রশংসায় তার কাব্যচর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

২. কবি আল-আখতালের জীবন পরিচয়

২.১ নাম ও বংশ পরিচয়

কবির প্রকৃত নাম গিয়াছ।^১ শারহুল ঈ'দাহ গ্রন্থে কবির নাম আত্তাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^২ তার বড় ছেলের নাম মালিক, তাই তিনি আবু মালিক উপনামেও পরিচিত ছিলেন।^৩ ঐতিহাসিকদের মতে কবি আল-আখতাল دويل (দাওবাল), ذو العباية (যুল আবাইয়াহ) ও ذو الصليب (যুস সালিব) উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।^৪ কবি মূলত আল-আখতাল নামে সর্বাধিক পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এমনকি এ উপাধীর কারণে কবির প্রকৃত নামটি আড়ালে রয়ে গেল।^৫ তাঁর এ উপাধীর কারণ ও প্রেক্ষিত সম্পর্কে সাহিত্যিক সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কবির পিতার নাম গাওস এবং দাদার নাম আস-সালত। তাঁর বংশধারা গিয়াছ ইবন গাওস ইবন সালত ইবন তারিকাহ ইবন আমর ইবন সায়হান

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

ইবন ফাদুকাস ইবন আমর ইবন মালিক ইবন জুশাম ইবন বাকর ইবন হুবাইব ইবন গুলাম ইবন তাগলীব ইবন ওয়াইল ইবন কাসিত ইবন হিনব ইবন আফসা ইবন দু'মা ইবন জুদায়লাহ ইবন আসদ ইবন রাবীআহ ইবন নাযার।^৬

২.২ জন্ম ও বাল্যকাল

কবির জন্মের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ড. ফাখরুদ্দীন কাবাওয়ার মতে কবি আল-আখতাল সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সিরিয়ার রুসাফা নগরীর সারজিও পোলাস নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।^৭ প্রসিদ্ধ মতে, কবি আল-আখতাল উত্তর আরবের দাজলাহ ও ফুরাত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক হীরাহ নগরীর নিকটতম এক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন।^৮ কবির জন্মের দিন ও তারিখ নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায়নি। তবে তার জীবন, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা, উক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। আবু উবাদাহ আমর ইবনুল আলার একটি উদ্ধৃতি নকল করে বলেন, “আল-আখতাল যদি জাহিলী যুগের একদিনও পেতেন তবে আমি তার উপর অন্য কাউকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রাধান্য দিতাম না”। কিতাবুল আগানীর গ্রন্থকার আবুল ফারায় আল-ইস্পাহানী বলেন,

وهو والفرزدق والأخطل المقدمون علي شعراء الإسلام لم يدركوا الجاهلية جميعا.^৯

কবি আল-আখতাল ইসলামি যুগে জন্ম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে ড. মুস্তফা গাজী আহমাদ হাসান বাসবাহ এবং ড. মুহাম্মদ হাম্মুদ সহ অধিকাংশ জীবনীকার মনে করেন কবি আল-আখতাল উমার রা. এর খিলাফতের শেষের দিকে ১৯ হিজরী মৃতাবেক ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।^{১০} কবি আল-আখতাল ছিলেন মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাই শৈশবকাল থেকেই পিতা-মাতার অতি আদরে লালিত পালিত হোন। মায়ের স্নেহ আর সোহাগ পেয়ে বেড়ে উঠতে শুরু করেন। মা তাকে দাওবাল বলে ডাকতেন।^{১১} কিন্তু মায়ের সেই পরম আদর-সোহাগ আর ভালবাসা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। শৈশব কালেই কবি তার মমতাময়ী মাকে হারান।^{১২} মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করলে কবির জীবনে নেমে আসে দুঃখ-কষ্টের কালো অধ্যায়। কবি মায়ের স্নেহ-মমতা আর ভালবাসার পরিবর্তে বিমাতা থেকে পেয়েছেন অত্যাচার, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, লাঞ্ছনা, খাদ্য কষ্ট ও রুঢ় ব্যবহার। তিনি বিমাতার কাছ থেকে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।^{১৩} এসব কিছু কবির ব্যক্তিত্ব বিকাশে অনেক বড় প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তিনি কিছুটা অবাধ্য, জেদী ও প্রতিযোগী স্বভাবের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন।^{১৪} একবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিমাতার নিকট খাবার চাইলে সে রাগান্বিত হয়ে বলে উঠল *امسيت بطينا* “তুই পেঠুক হয়ে গেছিস। এত খেয়েও পেট ভরে না, বার বার খেতে চাস।”^{১৫} কবি তখন দুঃখ করে বলেছিল,

تقول وقد ظللت بعوف سوء * لقد أمسيت منتفخ الضلوع

وذلك من جنائي كل يوم * من الذبح المقشر والفروع^{১৬}

“তুমি এরূপ বলছ, অথচ আমার এ দুরাবস্থা ও আমি জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছি। আর তোমার পাজর ফুলে গেছে। বাল্য বয়সে প্রতিদিন আমি ক্ষুধার জ্বালায় জবেহ করা ছাল ছাড়ানো পশুর মত ছটফট করি।”

শৈশবকাল থেকেই কবি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দুঃখ-কষ্টের মাঝে বেড়ে উঠেও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আর ভালবাসা কবিকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলো। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনার প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। কৈশোর বয়সে রচিত কবিতাবলীর মধ্যে কবি কা'ব ইবনে জু'আইল আত-তাগলীবির বিরুদ্ধে রচিত কবিতাটি ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তার কাব্য রচনার সূচনা হয়েছিল হিজা কবিতার মাধ্যমে। দুঃখময় প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কবি হিজা রচনাকে বেঁচে নিয়েছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে হিজা শিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।^{১৭} কবির যুগে কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা পূরনের লড়াই ছিল সাধারণ ব্যাপার। স্বজাতির ভূমিতে কঠিন যুদ্ধের জন্য প্রতিনিয়ত মানুষের অশ্রু প্রবাহিত হত। কবি-সাহিত্যিকরা সম্মান ও মর্যাদার জন্য কাব্যিক লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতো। কবির

বেদনাবিধুর ও যন্ত্রানাদায়ক জীবন তাঁর স্বভাব ও আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। যার ফলে তাঁর শৈশবকালে হিজা শিল্পে পারদর্শী হয়ে ওঠা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না।^{১৯}

২.৩ শিক্ষা ও কর্মজীবন

কবি আল-আখতাল তদানিন্তন সময়ের প্রথা অনুসারে শৈশবকাল থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। কবি জন্মগত ভাবে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে খ্রিস্ট ধর্মের পাশাপাশি ইহুদী এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষত তিনি ইনজিল ও তাওরাত কিতাব অধ্যয়ন করে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।^{২০}

جراك ربك عن مستفرد وحد * نفاه عن أهله جرم وتشريد
جاء يوسف احسانا ومغفرة * أو مثل ما جزى هارون وداود
أو مثل ما نال نوح في سفينته * إذا استجاب لنوح وهو منجود^{২১}

“মৃত্যুর ভয়ে পলাতক ব্যক্তি যাকে পরিবারের লোকজন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ত্যাগ করেছেন, এমন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিদান দেবেন।

(আমি কামনা করি) আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ইউসুফ আ., হারুন আ. ও দাউদ আ. এর মত প্রতিদান স্বরূপ অনুগ্রহ ও মাগফিরাত দান করে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে নুহ আ. এর মত অনুগ্রহ ও প্রতিদান দিবেন। নুহ আ. তাঁর নৌকায় যখন বিপদগ্রস্থ, বন্দী ও চিন্তিত অবস্থায় আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন।”

কবি মরু জীবনের প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অনুধাবন করার ক্ষমতা, ফলে জাহিলী যুগের অনেক কবিতাও তিনি মুখস্থ করেন। কাব্য রচনায় তিনি জাহিলী যুগের অন্যতম কবি নাবিগাহ আজ-জুবায়ানীর পদ্ধতি অনুকরণ করেন। কবি আল-আখতাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন এবং সাহিত্য সংস্কৃতিতে তাঁর বিশেষ প্রতিভা ফুটে ওঠে। আল-আখতাল ছিলেন উমাইয়া শাসকদের সভাকবি। তিনি রাজন্যবর্গ ও রাজ পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের প্রশংসা ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে হিজা রচনা করে তাদের দান ও উপঢৌকন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।^{২২} কবি আল-আখতালের কাব্য প্রকাশিত হবার পর তিনি তাঁর কবিতাবলী প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট পরিচিতির জন্য জাযিরাহ ও ইরাকসহ বিভিন্ন স্থানে সফর শুরু করেন। তিনি প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রশংসাগাথা রচনা করে তাদের দান-দক্ষিণা ও উপহার-উপঢৌকনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত শাসকদের সভাকবি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর এভাবেই তার কর্ম জীবন অতিবাহিত হয়।^{২৩}

২.৪ কবির চরিত্র ও ধর্মবিশ্বাস

কবি আল আখতাল শৈশবকাল থেকেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন। ফলে তাঁর চরিত্রে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি অল্প বয়সে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি আল-খামারিয়ায় তথা মদের প্রশংসায় কবিতা রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। উমাইয়া রাজদরবারে কবির খ্যাতি ও বিশেষ মূল্যায়ণ এবং খলীফাদের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে মদ পান করার সুবর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন।^{২৪} কবি আল-আখতালের জীবন ও কাব্য প্রতিভা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর মধ্যে অনেক ভাল গুণের সমাহার ছিল। কবির বাল্যকাল ও যৌবনে পরিবার-পরিজনের অবজ্ঞা-অবহেলা, মরু বেদুইনদের সাথে বসবাসের প্রভাবে তাঁর জীবনে নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতা মূলক কিছু কর্মকাণ্ড ঘটলেও পরবর্তীতে রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা এবং কবি-সাহিত্যিকদের দরবারে যাতায়াত ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক কবিকে যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান হতে সাহায্য করে।^{২৫} কবি ছিলেন দুর্ধ্ব যোদ্ধা ও নির্ভীক সৈনিক। তিনি কবিতার পাশাপাশি তরবারী নিয়েও বীরত্বের সাথে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করেন। যুদ্ধ ও বিপদের দিনে স্থায়ী জীবন বাজি রেখে তিনি তাঁর প্রতিবেশী ও অসহায়দের সাহায্যার্থে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।^{২৬} কবি স্থায়ী বীরত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন,

ولقد أوكل بالمديح تنقي * بالسيف عوته كعرة أجرب
يسعى الى بزة وسلاحه * يمشي بشكته كمشي الأُنكب^{২৭}

“আমি (আমার শত্রুর বিরুদ্ধে) অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। সে (শত্রু) গওরোগ বিশিষ্ট উটের ন্যায় আমার আক্রমণকে ভয় পায়। সে ব্যক্তি আমার নিকট অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু উট যেমন বোঝার ভারে নুয়ে যায়, তেমনি সে ব্যক্তি নুয়ে পড়ে।”

কবি আল-আখতাল স্বীয় বক্তব্য ও কাব্যের মাঝে নিজেকে সৎ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বলে দাবী করেন। তিনি নিজের সততার গর্ব করে বলেন, দুজন নারী তার প্রেম ভালবাসা পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন নি।^{২৮} কবি বলেন,

وحائتين تبتغيان سري * جعلت القلب دوغما حجابا^{২৯}

“দুজন মহিলা আমার ভালবাসা ও সঙ্গ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি তাদের হাত থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করেছি।”

কবির চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদারতা, দানশীলতা ও বদান্যতা। তিনি রাতের বেলায় পথিকদের জন্য অপেক্ষা করে উত্তমভাবে মেহমানদারী করানোকে প্রয়োজন মনে করতেন।^{৩০} কবি স্বীয় কবিতায় বলেন,

ومبتنع بعد الهدو دعوته * بصوتي فاستعشى بنضو ترغما^{৩১}

“রাতের অন্ধকারে চিৎকার করে বিপদগ্রস্থ পথিকরা আহ্বান করলে তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত কষ্টের সাথে ক্ষণ কণ্ঠে সাড়া দেয় এবং শীর্ণকায় উদ্ভীতে আরোহন করে আলো দেখে তার দিকে এগিয়ে যায়।”

কবি আল-আখতাল আরবের বিখ্যাত খ্রিস্টান গোত্র তাগলীব পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি বলে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তার সাহিত্য ও জীবনচা্রে উভয় ধর্মের সমন্বয় পাওয়া যায়। একটি ছিল তার জন্মগত বিশ্বাস আর অপরটি ছিল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব। কবি আল-আখতাল জন্মগত ভাবে খ্রিস্টধর্মের ইউ ‘আকিবাহ মায়হারের অনুসারী ছিলেন।^{৩২} শৈশবকালে খ্রিস্টধর্মের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন এবং পরবর্তী জীবনে এ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালনও করেন। ধর্মীয় রীতি অনুসারে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল-কাসিস এর সামনে দণ্ডায়মান হন এবং গীর্জায় বিশপের শাস্তি স্বাচ্ছন্দে বরণ করেন। এ ঘটনার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে সারা দেশে তোমার এত সুনাম সুখ্যাতি খলিফাগণ পর্যন্ত তোমাকে সম্মান করে তুমি সামান্য বিষয়ের নিকট এতটা নত হবে এবং এত লাঞ্ছনা বরণ করলে? উত্তরে কবি বলেন,

إن الدين إنه الدين يا أخي * إذا جاء الدين ذلنا^{৩৩}

“এটাইতো ধর্ম, এটাইতো ধর্ম, হে আমার ভ্রাতা! ধর্মীয় ক্ষেত্রে সবাই লাঞ্ছিত।”

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কবি আল-আখতাল খ্রিস্টধর্ম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং পালনও করতেন। তিনি জন্মগত ও আদর্শিকভাবে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ছিলো। তার জীবনে খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি উভয় ধর্মের মাঝে সমন্বয় করে চলতেন। তার কবিতায় পাওয়া যায় যে, তিনি মুসলিম ও খ্রিস্টানদের প্রতিপালকের নামে এবং প্রাদী ও ইসলাম ধর্মনুরাগীদের নামে শপথ করতেন। যেমন কবি বলেন,

إني ورب النصارى عند عيدهم * والمسلمون إذا ضمها الجمع

و رب كل حبيس فوق صومعة * ٢٨ يمشى ولاهمه الدين ولا الطمع

“আমি সেই খ্রিস্টান ও মুসলমানদের প্রতিপালকের নামে শপথ করছি, যারা জুমুয়ার দিনে নামাজ আদায়ের জন্য একত্রিত হয়। আমি সেই সব বৈরাগ্যদের প্রতিপালকের নামে শপথ করছি, যারা পরকালের আশায় দুনিয়ার জীবন থেকে বিমুখ হয়েছে।”

২.৫ মৃত্যু

কবি আল-আখতাল দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি এমন বাধাকর্ষ উপনিত হয়েছিলেন যে, বয়সের ভারে তার চুল-দাড়ি সাদা হয়ে যায়। যেমন কবি বলেন,

أعرضن لما حنى قوسى مؤثرها * و أبيض بعد سواد اللمة الشعر^{৩৪}

“শরীরে যখন বয়সের ছাপ পড়ল, পিঠ বাঁকা হয়ে গেল এবং মাথার চুল সাদা হয়ে গেল। তখন তারা (গায়িকাগণ) দূরে সরে গেল।”

আরবী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি আল-আখতালের মৃত্যুকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি খলীফা ওয়ালীদ ইবন আব্দিল মালিকের খিলাফতকালে (৮৬-৯৬ হি.) ৯২

হিজরীতে ইত্তিকাল করেন। ইমাম আয-যাহাবী তাকে ১০ম শতকের ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেন। যাদের মৃত্যু ৯১ হিজরী থেকে ১০০ হিজরীর মধ্যে হয়েছে।^{৩৬}

৩. উমাইয়া খলীফাদের প্রশংসায় সভাকবি আল আখতালের কাব্যচর্চা

উমাইয়া শাসনামলে রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক কাব্যচর্চা শুরু হয়। এ যুগের সভাকবিদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে কবি আল-আখতাল, কবি জারীর ও আল-ফারায়দাক ছিলেন অন্যতম।^{৩৭} উমাইয়া সভাকবি আল-আখতাল জীবন-জীবিকার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাব্য চর্চাকে বেঁচে নেন। তিনি খলীফাদের প্রশংসাগাথা রচনা করেন। কখনো তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিজা বা নিন্দাসূচক রচনা করে নিজের অবস্থানকে রাজ-দরবারে সুদৃঢ় করেন। তিনি বিশেষ করে উমাইয়া খলীফা ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়া, আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান, ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিক ও উমাইয়া অন্যান্য রাজন্যবর্গের প্রশংসায় বিশেষ অবদান রাখেন। কবি আল-আখতাল উমাইয়া খেলাফতের যে সকল রাজা-বাদশাহ-এর দরবারে কাব্য চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে নিজের সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন, নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল।

৩.১ খলীফা ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়ার প্রশংসায় কাব্যচর্চা

কবি আল-আখতাল ও খলীফা ইয়াযীদ ছিল সমমনা পর্যায়ে ব্যক্তি। বয়স চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও রুচি আদর্শসহ নানা দিক থেকে উভয়ের মাঝে অনেক মিল পাওয়া যায়। দু'জনই ছিলেন মদ্যপান, বিনোদন প্রিয়, পাপাচারী মানসিকতা ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারী। আল-আখতাল ও ইয়াযীদ দু'জনই বাল্যব্যয়সে কাব্য প্রতিভা অর্জন করেন। মু'আবিয়া রা. এর খিলাফতকালে আনসারদের বিরুদ্ধে হিজা রচনার ঘটনা থেকে কবি আল-আখতালের সাথে ইয়াযীদের সম্পর্ক শুরু হয়। ইয়াযীদের খিলাফত লাভের পর সে সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে ওঠে।^{৩৮} মুসলিম খলীফাদের মধ্যে ইয়াযীদই প্রথম প্রবৃত্তি পূজারী ও বিনোদন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রাজ প্রাসাদে গান, নৃত্য, বানর খেলা সহ নানা ধরনের বিনোদনমূলক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হত। কবি আল-আখতাল সেই সকল আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নিজেকে উপস্থিত রাখতেন।^{৩৯} কবি আল-আখতাল ইয়াযীদের প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে ৪টি পূর্ণ কাসিদা এবং দু'টি বিচ্ছিন্ন পংক্তি তার দীওয়ানে সংরক্ষিত আছে। এই বিচ্ছিন্ন পংক্তির মধ্যে একটি ইয়াযীদের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা কবিতা।^{৪০}

أما يزيد فإني لست ناسيه * حتى يغيبني في الرمس ملحود

جزاء يوسف احسانا ومغفرة * أو مثلما جزاء هارون وداود⁴¹

“আমি ইয়াযীদের মর্যাদা ও মহানুভবতার কথা যতদিন জীবিত থাকব তথা কবরে না যাওয়া পর্যন্ত ভুলব না। তিনি যেমন আশা করেন আল্লাহ তাকে সেরূপ প্রতিদান দিবেন। যেমন প্রতিদান দিয়েছেন অতীতে ইউসুফ আ., দাউদ আ. ও হারুন আ. কে এবং সকলকে যেমন বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন তাকেও তেমন বন্ধু রূপে গ্রহণ করবেন।”

কবি আল-আখতাল খলীফা ইয়াযীদের মৃত্যুতে চার পংক্তির একটি কবিতা রচনা করে বলেন,

لعمري لقد دلى الى اللحد خالد * جنازة لا كأبي الزناد ولا غمر

مقيم لحوارين ليس يرميها * سقته الغودي من ثدو ومن قبر

تصيح الموالي أن رأوا أم خالد * مسلبة تبكي على الما جد الغمر

إذا جاء سرب من نساء يعدنها * تجردن ألا من جلابيب أو خمر^{৪২}

“খালিদ ইবন ইয়াযীদ তাঁর পিতা কর্মবীর ও প্রতাপশালী ইয়াযীদকে কবরে শায়িত করেন। তাকে হাওয়াবীন নামক স্থানে কবরস্থ করা হয়েছে। সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ নেই। তাই বৃষ্টি বর্ষনের মত তার উপর ও তার কবরের উপর রহমতের প্রার্থনা করা হচ্ছে। ইয়াযীদ পত্নী ফাখিতাহ বিনতে হাশিম ইবন রাবি'আহ যখন কালো পোশাক আবৃত হয়ে চিৎকার করে ও ফুঁফিয়ে কাদছিল, তখন সন্তান-সন্ততিসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। মহিলাগণ ইয়াযীদ পত্নীকে শাদ্ধনা দেবার জন্য তার নিকট

গমন করেন এবং দুঃখ ও আফসোসে তাদের পোশাক ছিড়ে ফেলেন। তাদের পরনে জালবীব ও ওড়না ব্যতীত কিছুই ছিলনা।”

কবি আল-আখতাল খলীফা ইয়াযীদেদের আমলে তার পাশাপাশি প্রাদেশিক অন্যান্য শাসকবর্গেরও প্রশংসাগাথা রচনা করে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী লাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইরাকের গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ। প্রশংসাগাথার মধ্যে হানী ইবন উরওয়াহ আল-মুরাদী ও মুসলিম ইবন আকীল ইবন আবি তারীবেদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{৪০} খুরাসানের গভর্নর সালাম ইবন যিয়াদের মর্যাদা, দানশীলতা ও বিচক্ষণতার প্রশংসায় কবি বলেন,

إلى إمرئ لا تخطاه الرفاق ولا * جذب الحوان اذا ما اسطى المرق

صلب الحيازم لا هذر الكلام إذا * 88 هز القناة و لا مستعجل زهق

“সকলে সেই ভদ্র ও দানশীল ব্যক্তির নিকট দূর থেকে ভ্রমণ করে আগমন করে, যিনি মেহমানদারী করেন। তাঁর জন্য খাদ্যের পাতিল সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তিনি বীরপুরুষ ও নেতৃত্বদানকারী। যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় কখনও পিছপা হন না। বরং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।”

এছাড়া তিনি সিজিস্তানের গভর্নর আবযাদ ইবন যিয়াদের দরবারে গিয়ে তাঁর প্রশংসাগাথা রচনা করেন। যেমন কবি বলেন,

اليه اشار الناظرون كأنه * هلال بداء من قتمة وغيوب 89

“মানুষ যখন বিপদে আপতিত হয় এবং তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে অপারগ হয়ে পড়ে, তখন তিনি তাদের নিকট অদৃশ্যের পক্ষ থেকে পূর্ণিমার চাঁদের মত আবির্ভূত হন। অর্থাৎ বিপদের সময় সাহায্য সহযোগিতা করে বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন।”

কবি আল-আখতাল ছিলেন খলীফা ইয়াযীদেদের পারিবারিক কবির মত। তিনি খলীফার প্রশংসাগাথা কবিতা ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রশংসাগাথা রচনা করেন। তিনি ইয়াযীদেদের ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবন মু'আবিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তার প্রশংসাগাথা রচনা করে বলেন,

بنيت قناتك منهم في أسرة * بيض الوجوه مصالت أحيار 90

“তিনি সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি। বংশ মর্যাদা তার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বকে আরো বৃদ্ধি করেছে।”
এছাড়াও কবি আল-আখতাল ইয়াযীদ পুত্র খালিদ সম্পর্কে প্রশংসাগাথা রচনা করে নিজেকে খলীফার পারিবারিক কবি হিসেবে উপস্থাপন করেন। কবি বলেন,

أ خالدا ما بوايكم بملعن * و لا كلبكم للمعتنى بعفور 91

“খালিদ দানশীল ও সম্মানিত ব্যক্তি। অভাবীদের জন্য তাঁর দরজা সর্বদা খোলা। তার বাড়ির পোষা কুকুর কখনো মেহমানদেরকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না।”

৩.২ খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের প্রশংসায় কাব্যচর্চা

উমাইয়া যুগের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কবি আল-আখতাল প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের (৬৪৬-৭০৫খ্রি.) রাজ দরবারে নিজের অবস্থানকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সক্ষম হন। আল-আখতাল মূলত সভাকবির মর্যাদা পান খলীফা আব্দুল ইবন মারওয়ানের শাসনামলে। এমনকি তিনি দামিশকের প্রতিনিধিত্বকারী সকল কবিগণের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তিনি প্রশংসাগাথা রচনায় আসাধারণ দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেন। ফলে সে সময়ে তিনি অন্যান্য কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।^{৪১} কবি আল-আখতাল খলীফা আব্দুল মালিকের প্রশংসায় তিনটি কাসীদা রচনা করেন। প্রথম কাসীদার সূচনা পংক্তিটি নিম্নরূপ,

لعمري لقد اسريت لا ليل عاجز * بساهمة الحدين طاوية القرب 92

“তিনি রাতের বেলা দৃঢ় মনোবল ও অসীম সাহসের সাথে গাল ও পাজর কৃষ্ণকায় জীর্ণ উটনীর পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন।”

খলীফা আব্দুল মালিকের প্রশংসায় রচিত কবি আল-আখতালের দ্বিতীয় কাসীদাটির সূচনা পংক্তি-

الا يا اسلمي يا هند بنى بدر * وان كان حيانا عدى اخر الدهر^{৫০}

“কবি তার প্রেমিকা হিন্দাকে তার গোত্রের সাথে সম্বন্ধিত করে বলেন, সে যেন নিরাপদে থাকে। তাঁদের দু’জনের মাঝে যেন ভালবাসা গড়ে ওঠে এবং উভয় গোত্রের মাঝে অপছন্দনীয় কোন বিষয় যেন সংঘটিত না হয়।”

খলীফার প্রশংসায় কবি আল-আখতালের তৃতীয় কাসীদার সূচনা পংক্তিটি,

خف القطين فرحوا منك أو بكروا * وازعجتهم نوى في صرفها غير^{৫১}

“প্রতিবেশী প্রিয় বন্ধুগণ সকালে ও সন্ধ্যায় যাত্রা করেছে। তাদের দুর্বলতার কারণে যুগের বিপদাপদ সহ্য করতে না পারায় তাদের কষ্ট দূর করে অনিচ্ছাকৃত বিরহের সৃষ্টি হয়েছে।”

এ কাসীদটি আল-আখতালের রচনাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাসীদ। খলীফা আবুদল মালিক সেই কাসীদটি শোনার জন্য অধীর অগ্রহ প্রকাশ করলে কবি তা আবৃত্তি করে শোনান।^{৫২} খলীফা যখন কবির এই পংক্তিটি শোনেন,

شمس العداوة حتى يستقاد لهم * وأعظم الناس احلاما اذا قدروا^{৫৩}

“তারা শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর যত্নক্ষণ না তারা তাদের বাধ্যগত বা অনুগত না হয়। আর শত্রুরা যখন আত্ম সমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশ করে তখন তাদের প্রতি সহানুভূতি ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে।”

তখন খলীফা বলেন, “এটি এমন এক বাঁশি, আল্লাহর শপথ ইহা যদি বিশাল কোন প্রস্তর খণ্ডের উপর রাখ তবুও তা গলে যাবে।” কবি আল-আখতাল খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান ছাড়াও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন গভর্নরের প্রশংসাগাথা রচনা করেন।

খলীফা ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিকের প্রশংসায় কাব্যচর্চা

খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানরের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিক (৬৬৮-৭১৫খ্রি.) বিনা বাধায় ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে দামিশকের সিংহাসনের আরোহণ করে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে সুবিস্তৃতি করেন। সিরিয়াবাসীগণ খলীফা ওয়ালীদ ইবন আব্দিল মালিককে উমাইয়াদের শ্রেষ্ঠ খলীফা হিসেবে মনে করেন। কবি আল-আখতাল মারওয়ানী বংশের অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় খলীফা ওয়ালীদ ইবন আব্দিল মালিকের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তার প্রশংসার কবিতা রচনা করে খলীফার নিকটতম ব্যক্তিতে পরিণত হন। কবি খলীফার প্রশংসায় বলেন,

إن الوليد أمين الله أنقذني * وكان حصنا إلى منجته هربي

أتيتنه و همومي غير نائمة * أخوا الجدار طريح القتل و الهرب

خليفة الله يستسقى بسنه * الغيث من عند مولى العلم منتخب^{৫৪}

“ওয়ালীদকে আল্লাহ হেফাযত করলেন। তিনি আমাকে সেই সময় রক্ষা করেছেন যখন আমি জীবন বাঁচানোর জন্য পলায়ন করি। তিনি তাকে ভয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং অনেক অনুগ্রহ দিয়ে বৃষ্টির পানির মত ভাসিয়ে দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর খলীফা, তিনি সুন্দর জীবন ও চরিত্রের অধিকারী। তাঁর দ্বারা মহামহিম আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে বৃষ্টি কামনা করি।”

কবি আল-আখতাল তার শেষ বয়সে ওয়ালীদদের আনুগত্য, বিভিন্ন অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসাগাথা রচনা করে ওয়ালীদদের নিকট দামিশকে স্বশরীরে উপস্থিত হতে অক্ষম ছিলেন। এমন সুযোগে তার বিরুদ্ধে শত্রুগণ খলীফাকে ভুল বুঝায়। ফলে কবি আল-আখতালের সম্মান ও মর্যাদা শেষ পর্যন্ত ভূলুপ্তিত হয় এবং এ অবস্থাতে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উমাইয়া রাজন্যবর্গের প্রশংসায় কাব্যচর্চা

আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ ইবনুল আস-এর প্রশংসায় কাব্যচর্চা

মারওয়ানীদের নিকটতম ব্যক্তি ছিলেন মদীনার গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ ইবনুল আস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানবীর ও উদার হৃদয়ের শাসক। কবি আল-আখতাল অর্থ লাভের আশায় আব্দুল্লাহর নিকট প্রশংসাগাথা রচনা করে বলেন,

فمن يك سائلك بنى سعيد * فعبد الله اكرمهم نصابا
بحور بنى أمية أو رثوه * حمالات و احلاقا رغبا^{৫৬}

“যে ব্যক্তি বনু সাঈদ গোত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চায়, সে আব্দুল্লাহকে তাদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হিসেবে পাবে।

তিনি তার পূর্বপুরুষদের থেকে বদান্যতা ও প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। তিনি সকল নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য (الدية) পরিশোধ করেছেন।”

বিশর ইবন মারওয়ানের প্রশংসায় কাব্যচর্চা

বিশর ইবন মারওয়ান (মৃ. ৭৪হি.) ছিলেন খলীফা মারওয়ান ইবনুল হাকামের তৃতীয় পুত্র। তিনি কূফা ও বসরার গভর্নর ছিলেন। কবি আল-আখতাল তার সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। কবি বিশর ও তাঁর উমাইয়া বংশকে আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ এবং তাকে রাজ্যের প্রকৃত হকদার হিসেবে উপস্থাপন করে বলেন,

انتم خيار قريش ما أنتم عند نسبتها * أهل بطحائها الأثرون والفرع
أعطاكم الله ما أنتم أحق به * إذا الملوك على امثاله اقترعوا^{৫৭}

“বিশরকে উদ্দেশ্য বলেন, বংশ পরিচয়ের দিক থেকে তোমরা কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তার পরিবারবর্গ সবচেয়ে ভদ্র। আল্লাহ তোমাদেরকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন, যা অন্য কোন বাদশাহকে সে মর্যাদায় সমাসীন করা হয় নি।”

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রশংসায় কাব্যচর্চা

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৬৬১-৭১৪খ্রি.) ছিলেন ইরাকের গভর্নর। তিনি একজন উমাইয়া শাসনামলের রাজনীতিবিদ ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। কবি আল-আখতাল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি তার প্রশংসায় কবিতা রচনা বলেন,

فعليك بالحجاج لا تعدل به * احدا اذا نزلت عليك أمروا
ولقد علمت و أنت اعلمنا به * أن ابن يوسف حازم منصور^{৫৮}

“তোমার উচিত হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা। যখন তোমার নিকট কোন বিষয় আসে তখন তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করিও না। তুমি জান- আর তুমি আমাদের চেয়ে অধিক অবগত আছ যে, নিশ্চয়ই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দৃঢ়চেতা ও বিজয়ী।”

খালিদ ইবন উসাইদের প্রশংসায় কাব্যচর্চা

খালিদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উসাইদ যখন বসরার আমীর নিযুক্ত হলেন তখন কবি আল-আখতাল তার দরবারে গিয়ে প্রশংসাগাথা রচনা করেন। কবি তাঁর কাছ থেকে নানা রকম উপহার-উপঢৌকন ও পারিতোষিক লাভ করেন। কবি বলেন,

إلى خالد حتى انحدنا بمخلد * فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل^{৫৯}

কবি আল-আখতাল উমাইয়া খলীফাদের এত বেশী প্রশংসাগাথা রচনা করেন যে, খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান কবিকে বলেন, হে আখতাল! তুমি কি চাও যে আমি চতুর্দিগন্তে লিখে দেই যে তুমি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি? খলীফা আরো বলেন, প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব কবি রয়েছে, তেমনি আল-আখতাল উমাইয়াদের কবি।^{৬০} অতপর খলীফার নির্দেশে তাঁর একজন কর্মচারী রাজ প্রাসাদের বাহিরে এসে ঘোষণা দেন।

هذا شاعر أمير المؤمنين هذا أشعر العرب^{৬১}

এভাবে কবি আল-আখতাল খলীফার স্বীকৃতির মাধ্যম উমাইয়াদের রাষ্ট্রীয় কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং খলীফাদের দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

৪. উপসংহার

উমাইয়া যুগের খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী কবিতার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। খলীফাগণ কবিতা ভালবাসতেন এবং কবিতা চর্চার জন্য কবিদেরকে উৎসাহ প্রদান করতেন। কবি আল-আখতাল রাজদরবারে স্বীয় কাব্য চর্চার প্রতিভা প্রদর্শন করে নিজেকে প্রাসাদ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। খলীফাদের প্রশংসাগাথা রচনা করে কবি তাদের কাছ থেকে অটেল উপহার ও উপঢৌকন লাভ করেন। তিনি একাধিক খলীফার রাজ দরবারে সভা কবির মর্যাদা পান। কবি আল-আখতাল ছিলেন উমাইয়া যুগের আরবী সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমির উমারাদের প্রশংসাগাথা রচনায় কবির ভাষার মাধুর্য্যতা, চমৎকার রচনাশৈলী, অলংকারপূর্ণ শব্দ চয়ন, ছন্দের প্রবাহমানতা, বর্ণনার লালিত্য ও উপমা ছিলো তার কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবী কাব্য সাহিত্যে কবি আল-আখতালের অসামান্য অবদান যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ডক্টর আব্দুল মাজীদ আল-হারর, *আল আখতাল শাইরুদ দাওলাতিল উমাইয়া* (বৈরুত: দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৫৭।
- ^২ ডক্টর ফাখরুদ্দীন কাবাওয়াহ, *আল-আখতাল আল-কাবীর হায়াতুহ ওয়া শাখসিয়াতুহ ওয়া কীমাতুহুল ফান্নিয়াহ* (হালব: দারুল আসমাঈ), পৃ. ১১।
- ^৩ মুহাম্মাদ মাহদী আল-বাসীর, *আসরুল কুরআন* (বাগদাদ: দারুশ শুউনিছ ছাকফিয়াতিল 'আম্মাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২০৯।
- ^৪ *আল-আখতাল আল-কাবীর*, পৃ. ১১; ডক্টর আব্দুল মাজীদ আল-হারর, *আল আখতাল শাইরুদ দাওলাতিল উমাইয়া*, পৃ. ৫৮।
- ^৫ ডক্টর আব্দুল মাজীদ আল-হারর, *আল-আখতাল শাইরুদ দাওলাতিল উমাইয়া*, পৃ. ৫৯।
- ^৬ ডক্টর মুহাম্মাদ হাম্মদ, *আল-আখতাল হায়াতুহ ওয়া শিরুহ* (বৈরুত: দারুল ফিকরিল লুবনানী, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৫।
- ^৭ *দীওয়ানুল আখতাল*, পৃ. ৬।
- ^৮ *আল-আখতাল হায়াতুহ ওয়া শিরুহ*, পৃ. ১১-১২।
- ^৯ *তদেব*, পৃ. ১২।
- ^{১০} *কিতাবুল আগানী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।
- ^{১১} ডক্টর মুস্তাফা গাযী, *আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া*, পৃ. ৩৩-৩৪; *আল-আখতাল আল-কাবীর*, পৃ. ৪২-৪৩; *আল-আখতাল হায়াতুহ ওয়া শিরুহ*, পৃ. ১৩।
- ^{১২} *আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া*, পৃ. ৪০।
- ^{১৩} ডক্টর মুস্তাফা গাযী, *আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া*, পৃ. ৪০।
- ^{১৪} *আল-আখতাল আল-কাবীর*, পৃ. ২০।
- ^{১৫} ডক্টর আব্দুল মাজীদ আল-হারর, *আল-আখতাল শাইরুদ দাওলাতিল উমাইয়া*, পৃ. ৮২।
- ^{১৬} *তদেব*, পৃ. ৬৪।
- ^{১৭} *দীওয়ানুল আখতাল*, পৃ. ১৬৯।
- ^{১৮} ডক্টর মুস্তাফা গাযী, *আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া*, পৃ. ৪১।
- ^{১৯} *তদেব*, পৃ. ৪৪।
- ^{২০} *তদেব*, পৃ. ৩২।
- ^{২১} *দীওয়ানুল আখতাল*, পৃ. ৭১।
- ^{২২} ডক্টর মুস্তাফা গাযী, *আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া*, পৃ. ৪৪।
- ^{২৩} *আল-আখতাল হায়াতুহ ওয়া শিরুহ*, পৃ. ২২-৩১।
- ^{২৪} *আল-আখতাল আল কারীর*, পৃ. ১১৪-১১৬; আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ২১৪।
- ^{২৫} *আল-আখতাল আল-কাবীর*, পৃ. ১৩১-১৩৫।
- ^{২৬} *তদেব*, পৃ. ১৩৯।
- ^{২৭} *দীওয়ানুল আখতাল*, পৃ. ৩৪।
- ^{২৮} *আল-আখতাল আল কাবীর*, পৃ. ১৫১।
- ^{২৯} *শারহ দীওয়ানিল আখতাল*, পৃ. ২০২।
- ^{৩০} *আল-আখতাল শাইরুদ হায়াতুহ ওয়া শিরুহ*, পৃ. ৫৭।

-
- ৩১ শারহু দীওয়ানিল আখতাল, পৃ. ৪৪০-৪৪১।
- ৩২ আল-আখতাল হায়াতুহু ওয়া শিরুহ, পৃ. ৫৯-৬০।
- ৩৩ আল-আখতাল আল কাবীর, পৃ. ২৪১-২৪২।
- ৩৪ দীওয়ানুল আখতাল, পৃ. ১৬৬।
- ৩৫ তদেব, পৃ. ৮৯।
- ৩৬ ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৯ম খণ্ড (লাহোর: মাকতাবাতুল কুদ্দুসিয়া, ১৯৮৪ খ্রি.) পৃ. ৮০; কার্ল ব্রেকেলম্যান, তরীখুল আদাবিল আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; উদাবাউল আরাব, পৃ. ৩১৯-৩২১।
- ৩৭ ডক্টর শাওকী দাইফ, আত-তাউরু ওয়াত তাজদীদু ফী শিরিল উমাবী (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৯ খ্রি.) পৃ. ৩১০-৩১৩; ইন'আম আল-জুনদী, আর-রাযিদ ফিল আদাবিল আরাবী, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল রাযিদিল আরাবী, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩২০-৩২৫।
- ৩৮ ডক্টর মুস্তফা গাযী, আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া, পৃ. ৬৬-৬৭।
- ৩৯ তদেব পৃ. ৬৭; আদাবুস সিয়াসাহ ফিল আসরিল উমাবী, পৃ. ৪৬৭।
- ৪০ ডক্টর মুস্তফা গাজী, আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া, পৃ. ১০০।
- ৪১ দীওয়ানুল আখতাল, পৃ. ৭৯।
- ৪২ তদেব, পৃ. ১৩০।
- ৪৩ আল-আখতাল হায়াতুহু ওয়া শিরুহ, পৃ. ২৬।
- ৪৪ দীওয়ানুল আখতাল, পৃ. ১৭৩; আল-আখতাল কাবীর, পৃ. ৭৩-৭৪।
- ৪৫ তদেব, পৃ. ৪৫।
- ৪৬ তদেব, পৃ. ১৫০।
- ৪৭ তদেব, পৃ. ১৩১।
- ৪৮ আল-আখতাল হায়াতুহু ওয়া শিরুহ, পৃ. ২৯।
- ৪৯ শারহু দীওয়ানিল আল-আখতাল, পৃ. ৯২।
- ৫০ আল-আখতাল হায়াতুহু ওয়া শিরুহ, পৃ. ৩০।
- ৫১ শারহু দীওয়ানুল আখতাল, পৃ. ৯২।
- ৫২ আল-আখতাল হায়াতুহু ওয়া শিরুহ, পৃ. ৩১।
- ৫৩ দীওয়ানুল আখতাল, পৃ. ১০৬।
- ৫৪ আল-আখতাল হায়াতুহু ওয়া শিরুহ, পৃ. ৩১।
- ৫৫ দীওয়ানুল আখতাল, পৃ. ৩৭-৩৮।
- ৫৬ তদেব, পৃ. ১৭।
- ৫৭ তদেব, পৃ. ১৬৭।
- ৫৮ তদেব, পৃ. ১৮।
- ৫৯ তদেব, পৃ. ২০৮।
- ৬০ ডক্টর মুস্তফা গাযী, আল-আখতাল শাইরু বানী উমাইয়া, পৃ. ১০৫-১০৬।
- ৬১ আল-আখতাল হায়াতুহু ওয়া শিরুহ, পৃ. ৩১।

আহমাদ আমীন-এর সাহিত্যকর্ম: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন [Ahmad Amin's Literary Works: Review and Evaluation]

জুনাইদ আহমদ*

[Abstract: Ahmad Amin is an Egyptian prolific essayist, philosopher, prominent Islamic thinker and literary figure in modern Arabic literature. Through his literary practice and literary works, a unique golden age began in modern Arabic literature and Islamic thought. A great figure in Egyptian Islamic history, a renowned pioneer in calling for the development of Islamic civilization and cultural consciousness. He is a great educator, professor and historian. He is the father of an independent intellectual movement based on moderation. He practiced many fields of knowledge such as Quran, Hadith, Islamic History, Tradition, Civilization, Culture, Philosophy, Literature, Criticism and Education. He describes the rational movement of Islamic civilization and elements. Hence, he was known to us as "Encyclopedia of Islamic Civilization". Ahmad Amin was devoted to research, teaching and writing throughout his life. He left us a rich literary repertoire and unique intellectual heritage, which was preserved by his later generations. He enriched the Arabic literature as well as upheld the status of the Arabic language in the world of literature. In the discussion article. Ahmad Amin's literary works will be reviewed and evaluated.]

Keywords: Ahmad Amin, Literary Works, Review, Evaluation.

১. ভূমিকা

আহমাদ আমীন আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন মিসরীয় প্রতিভাবান প্রবন্ধকার, দার্শনিক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্য সারথী। তাঁর সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে আধুনিক আরবী সাহিত্য তথা ইসলামী চিন্তাধারায় এক অনন্য সোনালী যুগের সূচনা হয়। মিসরীয় ইসলামী চিন্তাধারার একজন মহান ব্যক্তিত্ব, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেতনা বিকাশের আহ্বান জানানো একজন বিশিষ্ট অগ্রপথিক। মধ্যযুগান্তরিক একটি স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের জনক। তিনি হলেন মহান শিক্ষাবিদ, অনুবাদক ও ঐতিহাসিক ড. আহমাদ আমীন। তিনি কুরআন, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য ও সমালোচনাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসামান্য অবদান থাকলেও ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডারকে যথাযথ যুক্তির নিরীখে উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা কল্পেই তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য প্রেমীদের নিকট “ইসলামী সভ্যতার বিশ্বকোষ” হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আহমাদ আমীন সারা জীবন সাহিত্য সাধনা, গবেষণা, অধ্যাপনা ও লেখা-লেখির জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। আমাদের জন্য একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডার ও অনন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য রেখে যান। যা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা সঞ্চিত হয়েছিল। তিনি আরবী সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেন তেমনি বিশ্ব সাহিত্য ভূবনে আরবী ভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আহমাদ আমীন-এর সংক্ষিপ্ত সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনাপূর্বক মূল্যায়ন তুলে ধরা হলো।

২. জন্ম ও পরিচিতি

তাঁর নাম আহমাদ আমীন। পিতার নাম: ইবরাহীম তাব্বাখ। তিনি ১৩০৪ হিজরীর ২ মহররম, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ লা অক্টোবর ভোর পাঁচটায় কায়রোর খলিফা জেলার একটি শালীন পাড়ায় বাব আল-খালাফের কাছে তাঁর পরিবার সুমখরাত শহরের আরবী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য, পিরামিডের দেশ মিসরের রাজধানী কায়রোর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^১ তাঁর পরিবার যে পাড়ায় বাস করত তা দীর্ঘ,

* পিএইচডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

ছায়াময়, শান্ত ছিল। তাঁর বাসস্থানের সংকীর্ণতা এবং বাসস্থানের দৈর্ঘ্যের কারণে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি বিরাজ করত। পিতা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে অল্প বেতনে ছাপাখানায় কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও শিক্ষাবিদ। পিতার ধর্মীয় আদর্শ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলেই তিনি বেড়ে উঠেন। তাই আহমাদ আমীন তাঁর সাহিত্য রচনার শিরোনাম ও বিষয়বস্তু ইসলামী উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন।

৩. শিক্ষাজীবন

পিতা আহমাদ আমীনকে কুরআনুল কারীম মুখস্থ করার জন্য হিফয খানায় ভর্তি করেন। পরবর্তীতে ‘মাদরাসাতু ওয়ালিদাতি আব্বাস আল-আউয়াল আল-ইবতিদাইয়াহ’-এ ভর্তি করানো হয়। সেখানে মাত্র আট বছর বয়সে আরবী ও ফারসী ভাষাসহ গাণিতিক বিদ্যা অর্জন করেন। এভাবেই আহমাদ আমীন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আহমাদ আমীন উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ভর্তি হন।^১ তাঁর পিতা তাঁকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেন।^২ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা কঠোর নিয়ম-কানুন ও নির্ধারিত পাঠ্য তালিকা তাঁর মোটেই ভালো লাগত না। তাই পিতার বেঁধে দেয়া নিয়মানুসারে সকালে হানাকী ফিক্হ ও তাজবীদ, দুপুরে আরবী ব্যাকরণ, বিকেলে ভূগোল ও গণিত অধ্যয়ন করতেন।^৩ এছাড়া তিনি দিনে ও রাতের অবশিষ্ট সময়ে তাফসীর, হাদীস ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। এভাবেই তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি মিসরের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম মাদরাসায় শরীআহ তথা ইসলামী আইন বিভাগে ভর্তি হন। দীর্ঘ চার বছর অধ্যয়ন করার পর অত্যন্ত সুনামের সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে একজন বিচারক (কাজী) হিসেবে ডিগ্রী অর্জন করেন।^৪ নিয়মিত অধ্যাপনায়, কঠোর পরিশ্রম, সুচারু গবেষণা আর নিরলস সাধনায় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আরবী সাহিত্যের উপর সর্বোচ্চ পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি ইংরেজি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।^৫ আরবী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করায় তাঁর কর্মজীবন হয়েছিল সম্মানজনক, বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্রময়। তিনি একাধারে অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, বিচারক, প্রথম শ্রেণীর সরকারি অফিসার, সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক ও দার্শনিক ছিলেন।

৪. কর্মজীবন

তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করে মিসরের রয়েল স্কুলে শিক্ষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় রাতিব পাশা স্কুলে নিয়োগ পান।^৬ এ প্রতিষ্ঠানে তিনি দুই বছর অবস্থান করেন। এখানে থাকা অবস্থায় শায়খ আব্দুল হাকীম ইবন মুহাম্মদ নামে এক মহান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত প্রাপ্ত হন।^৭ আহমাদ আমীনের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর এই শিক্ষাগুরুর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি নিজে বলতেন, যদি আমার পিতা জীবিত থাকতেন তবে তিনি হতেন আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। অধ্যাপক আব্দুল হাকীম ইবন মুহাম্মদ হতেন দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু।^৮ ড. আহমাদ আমীন যে আইন কলেজ থেকে পাশ করেন সেই কলেজের শারঈ আইন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে তিনি নিযুক্ত হন। তিনি অত্র কলেজে দুই বছর যাবত অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে শারঈ বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।^৯ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল থেকে মিসরের বিভিন্ন স্থানে তিনি বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে মিসরের আল উযবেকিয়ায় বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।^{১০} ড. আহমাদ আমীন আধুনিক মিসরের বিখ্যাত কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।^{১১} প্রথমদিকে একই সঙ্গে আইন ও কলা অনুষদের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করলেও পরবর্তীতে তিনি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।^{১২}

আহমাদ আমীন প্রভাষক হিসেবে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। পিএইচডি ছাড়া যেহেতু অধ্যাপক হওয়া যায় না, তাই তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় ‘ফাজরুল ইসলাম’ ও ‘দুহাল ইসলাম’ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করেন। দেশীয় ও পাশ্চাত্যের পরীক্ষকের বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে পিএইচডি ডিগ্রী এবং স্বর্ণপদক প্রদান করা

হয়।^{১৪} ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন পদ খালি হলে শিক্ষামন্ত্রীর মনোনয়নের মাধ্যমে ড. আহমাদ আমীন ডীন পদে মনোনীত হন।^{১৫} ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ড. আহমাদ আমীন আরবলীগের সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন।^{১৬} এর পূর্বে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালক ছিলেন।^{১৭} আহমাদ আমীন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে শুভ বিবাহ সম্পন্ন করেন।^{১৮}

৫. গবেষণা ও সাহিত্য-সাধনা

আরবী গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ড. আহমাদ আমীনের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত অসংখ্য রচনাবলী রয়েছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধমালায় মাধ্যমে জ্ঞানের জগতকে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি মিসর ও প্রাচ্যের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষত সভ্যতার ইতিহাসের উপর পাঠদান করাতেন।^{১৯} তাফসীর, হাদীস, উসূল, আকাইদ, কালাম, আরবী সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইসলামী তাসাউফ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি সমসাময়িক রাজনীতি, ধর্মনীতি, সামাজিক, সাহিত্যিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিতেন।^{২০} তিনি মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে পশ্চাদপদ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছেন।^{২১} তিনি মিসরের ‘আস-ছাকাফা’ ও ‘আর-রিসালাহ’ নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি সাহিত্যিক গবেষণা ও উৎকৃষ্ট মানের প্রবন্ধ লেখার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।^{২২}

৬. ইত্তিকাল

অবশেষে আধুনিক আরবী সাহিত্যের এই দীপ্তিমান সাহিত্যিক ২৭ রমযান ১৩৭৩ হি./৩০ মে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ইহকালের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান।^{২৩} তিনি আলেকজান্দ্রিয়া ভ্রমণের প্রস্তুতি শেষ করেছিলেন এবং তার গ্রীষ্মের ছুটি গুরু হওয়ার পরের দিন, তিনি তার সন্তানদের সাথে আলেকজান্দ্রিয়ার বারান্দায় বসেছিলেন। বাড়ির উপরের তলায় গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডায় ছিলেন। তিনি একটি শান্ত ও স্বস্তিদায়ক মনের অবস্থায় ছিলেন। সকালে তিনি এনজাইনা রোগে আক্রান্ত হন, ডাক্তার আসার আগেই তিনি ইত্তিকাল করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তাঁর বয়স ছিল আটষাট বছর। মৃত্যুর আগে আহমাদ আমীন চোখের রোগে আক্রান্ত হন, তারপর পায়ের রোগে আক্রান্ত হন, তাই তিনি অতি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হননি।

৭. আহমাদ আমীনের সাহিত্যকর্ম

আহমাদ আমীন আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। বিশ্ব সাহিত্য তথা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে মিসরের প্রখ্যাত ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ ও ধর্ম-গবেষক আহমাদ আমীন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একাধারে প্রবন্ধকার, গদ্য সাহিত্যিক, অনুবাদক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, বিচারক, সরকারি কর্মকর্তা, অনলবর্ষী বাগী ও প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক। আহমাদ আমীন তাঁর সাহিত্যে মূলত ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক আলোকপাত করেছেন। ধর্ম মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের সকল মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এক নয়। এসব বিষয়ে আহমাদ আমীন-এর বিভিন্ন গ্রন্থ ও লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাঁর বিজ্ঞমনের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির প্রতিফলন। তাঁর পুরো কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম প্রণয়ন করেছিলেন। ড. আহমাদ আমীন তাঁর বর্ণাঢ্য সাহিত্য জীবনে নিরলস প্রচেষ্টা এবং কঠোর জ্ঞান-সাধনার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে অভূতপূর্ব অবদান রেখে গেছেন। তাঁর রচিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে উন্নীত ২৯^{২৪} টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁর কিছু মৌলিক রচনাবলির পর্যালোচনা করা:

৭.১ ইসলামী ইতিহাসের উপাদান সমৃদ্ধ সাহিত্য

এক: ফাজরুল ইসলাম (فجر الإسلام): এটি অধ্যাপক আহমাদ আমীন-এর শ্রেষ্ঠ অবদান। গ্রন্থটি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের কায়রোতে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি ইসলামী যুগের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করে। যা মুহাম্মাদ সা. এর জীবন, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিস্তারকে সন্নিবেশিত করে।^{২৫} আহমাদ আমীন-এর এ গ্রন্থে ইসলামী উপাদানের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশটির উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি ইসলামের শুরু থেকে উমাইয়া রাজবংশের শেষ অবধি মুসলমানদের

মানসিক অবস্থার পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়েছেন।^{২৬} আহমাদ আমীন ইসলামী ইতিহাসের এই সংকটময় সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক দিক ও পরবর্তী প্রজন্মের উপর এর প্রভাব পরীক্ষা করেন।

উপর্যুক্ত গ্রন্থটিতে ড. আহমাদ আমীন ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ইসলামের প্রাথমিক যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর ও স্বার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন। গ্রন্থটিতে, তিনি আরব জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসকে নির্মোহ ও আধুনিক আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এতে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে উমাইয়াদের আমল পর্যন্ত আরব জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের অনন্য গাঁথা নির্মাণ করেছেন।^{২৭} তাঁর এই অসাধারণ সাহিত্যকর্মকে সমাজের প্রতিটি স্তরের লোক সাদরে গ্রহণ করেন এবং এই ধারার আরও সিরিজ রচনা করার জন্য তাঁকে অনেক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এটি ছিল তাঁর দীর্ঘ দুই বছরের সাধনা ও পরিশ্রমের সোনালী ফসল।^{২৮}

দুই: দুহাল ইসলাম (ضحى الاسلام): দুহাল ইসলাম হলো তাঁর অনবদ্য আরও একটি গ্রন্থ। সুধী সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করায় লেখক সে ধারায় দ্বিতীয় সিরিজ হিসেবে তিন খণ্ডে দুহাল ইসলাম রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি আব্বাসীয় যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা এবং সে যুগের ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ ও তাদের মতবাদ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি মোট তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এতে আব্বাসি যুগের সভ্যতা, সংস্কৃতি সমাজ তথা বহুমাত্রিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি দীর্ঘ ছয় বছর (১৯৩০-১৯৩৬ খ্রি.) এই অনবদ্য গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশ করেন।^{২৯} প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ড. ত্বহা হোসাইন তাঁর এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, আমি “দুহাল ইসলাম” ও “ফাজরুল ইসলামে”-এ দেখেছি, এটি সত্যের প্রতি সত্যতা ও আন্তরিকতার পথপ্রদর্শক। আমি যদি সঠিক হই, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা তাঁর সাফল্যের জন্য। যদি আমি ভুল বলি, তবে সেটা আমি সত্যের উদ্দেশ্যে বলেছি। কেননা, প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতে হয়। আমি “দুহাল-ইসলাম” সম্পর্কে বলতে চেয়েছি, আব্বাসীয় যুগের প্রথম শত বছর (১৩২-২৩২ হিজরি), আমি বলতে চাইছি আল-ওয়াছিক বিল্লাহর খিলাফত এমন একটি যুগ যা একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক, রাজনীতি ও সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। উমাইয়া রাজ্যের সমাপ্তি ও আব্বাসীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছিল।^{৩০}

তিন: যুহরুল ইসলাম (ظهر الاسلام): এটি আহমাদ আমীনের আরও একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ খ্রি. পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।^{৩১} যার সবকটিই দ্বিতীয় আব্বাসীয় যুগে আবির্ভূত সামাজিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত আলোচনা। প্রথম অংশের বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু সামাজিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে। আল-মুতাওয়াক্কিলের যুগ থেকে পরবর্তীদের ব্যক্তিত্ব, আন্দোলন ও বিদ্যালয়সহ তাদের মানসিক অবস্থা। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই সময়কালকে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্তৃত এবং উৎপাদনে সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় অংশে, লেখক চতুর্থ শতাব্দীতে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। এতে একটি সার্বজনীন গবেষণা যেখানে তিনি তাফসীর, হাদিস, আইনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, সুফিবাদ, ব্যাকরণ, রূপবিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র, সাহিত্য, ভূগোল, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের বর্ণনা রয়েছে। তৃতীয় অংশে, লেখক আন্দালুসিয়ায় মানসিক জীবন অধ্যয়ন করার জন্য নিবেদন করেছেন যখন মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হওয়ার সময় থেকে তাদের বহিষ্কার করা পর্যন্ত। চতুর্থ অংশটি ইসলামিক মতবাদ ও বিশ্বাস, তাদের বিকাশ, রাজনৈতিক দৃষ্টি ও ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, এই অংশটিই আহমাদ আমীনের মৃত্যুর আগে লেখা শেষ কথা।^{৩২}

গ্রন্থটিতে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল থেকে শুরু করে স্পেনের সোনালি সময়ের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাস অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে

আলোচনা করেছেন। “ইসলামের পটভূমি বা যুহরুল ইসলামে” সামাজিক বর্ণনা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, সার্বজনীন গবেষণা, মানুষিক জীবন ও ইসলামী মতবাদ ও বিশ্বাস, তাদের বিকাশ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ভবিষ্যত নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেন।

৭.২ ইসলামী দর্শনের উপাদান সমৃদ্ধ সাহিত্য

এক: ইয়াওমুল ইসলাম (يوم الاسلام): আহমাদ আমীনের একটি অনবদ্য সাহিত্যিক অবদান। গ্রন্থটি ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, মুসলমানদের সাথে খ্রিষ্টানদের ও খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের আচরণ, সংলাপ ইত্যাদি এ গ্রন্থটির আলোচ্যবিষয়।^{৩০} এই গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক নথিপত্র ও ধর্মীয় সমৃদ্ধি বহনকারী একটি চিত্র হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। যা এটিকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে স্থান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট করে তুলবে।

তাঁর এ গ্রন্থটির মূল বিষয় ইসলামী দর্শন। “ইসলামের দিন” এমন একটি গ্রন্থ যেখানে আহমাদ আমীন আমাদের জন্য ধারাবাহিক যুগের আয়নার মাধ্যমে ইসলামের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের মৌলসম্বন্ধ ও আইনী নীতিগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। যার উপর ভিত্তি করে ইসলাম বর্তমান দিন পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে এর লক্ষণগুলি বিদ্যমান। আমাদের কাছে ইসলামী সভ্যতার মানবিক অবদানের কথা তুলে ধরেন। যা অন্যান্য সভ্যতা থেকে আলাদা করেছে। যে এই গ্রন্থটি পড়বে সে দেখতে পাবে যে লেখক বিভিন্ন সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থার অনুসন্ধান করেছেন।

দুই: কিতাবুল আখলাক (كتاب الاخلاق): আহমাদ আমীনের অনন্য অবদান নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ কিতাবুল আখলাক। যেটি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মৌলিক দার্শনিক বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল নীতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন। নৈতিক জীবন তাঁর দার্শনিক ভিত্তির উপর ভিত্তি করে ন্যায়সঙ্গত ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়। আহমাদ আমীন এই বিষয়টি অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করতে বেছে নিয়েছেন একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি। তিনি দর্শনের পূর্বে নীতিশাস্ত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব দেখান।

আহমাদ আমীন নীতিশাস্ত্রকে একটি তাত্ত্বিক বক্তব্য হিসাবে বিবেচনা করেন না, যা দার্শনিকদের ভাষায় প্রচারিত হয়। বরং এটিকে একটি জীবন্ত সামাজিক অনুশীলন হিসাবে দেখা হয়। যা আমাদের জীবন্ত বাস্তবতায় উপলব্ধি করা হয় ও আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত লেনদেনে এর প্রভাব সরাসরি অনুভব করি। অতএব, এটি প্রধানত কার্যকর নৈতিক ধারণাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেমন: বিবেক, ন্যায়বিচার, সত্যতা, আনুগত্য, সহযোগিতা ইত্যাদি।^{৩১}

তিন: হায় ইবন ইয়াকজান (حي بن يقظان): “হায় ইবন ইয়াকজান” প্রাচীন আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কারণ, এটি একজন মানুষের গল্প বলে, যে একটি শিশু অবস্থায় এমন একটি ভূমিতে স্থির হয়েছিল, যেখানে তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষ ছিল না। তাই তিনি প্রাণীটিকে তার সেবিকা হিসাবে ও প্রকৃতিকে তার আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে বাস করেছিলেন। আর আকাশের প্রাকৃতিক জিনিস তার আশ্রয় হয়েছিল। যখন তিনি বড় হয়েছিলেন, তার মন শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও তার চিন্তাভাবনা পরিপক্ব হয়। তিনি মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যা তাকে এই মহাবিশ্বের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অনিবার্যতার দিকে নিয়ে যায়।^{৩২} এটি লক্ষণীয় যে, এই গল্পটি আমাদের আরব ঐতিহ্যে ইবনে সিনা, শিহাব আল-দিন আল-সোহরাওয়ার্দী, ইবনে আল-তুফাইল এবং ইবনে আল-নাফিস দ্বারা চারবার পুনঃলিখিত হয়েছিল। পরবর্তীরা এটির সাথে একমত অন্য নামে এটি পুনরায় লিখেছেন। তার দার্শনিক বিশ্বাস, তাই তিনি এটিকে “ফাদিল ইবনে নাতিক” বলেছেন।

এখানে আহমাদ আমীন ইবনে আল-তুফাইলের দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও শিক্ষাকে একত্রিত করেছেন। এটি গভীর দার্শনিক নিহিত্যের আশ্রিত একটি গল্প। আমরা আমাদের সমসাময়িক পরিভাষায় বিশ্ব

দৃষ্টিভঙ্গি বা জ্ঞানীয় মডেল বলি কারণ, গল্পটিতে জ্ঞানীয় মডেলের উপাদান রয়েছে। মৌলিক জ্ঞান (দৈশ্বর/মানুষ/প্রকৃতি) এর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের মাত্রাগুলিকেও সংশোধন করে। এই মহাবিশ্বের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.৩ আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য

এক: হায়াতী (حياتي): আহমাদ আমীনের এক অনবদ্য রচনা হলো তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘হায়াতী’ (আমার জীবন) এতে লেখক তাঁর জীবনী, মতবাদ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করেছেন। বিদ্যা-বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে আধুনিক মিসরের উদ্ভব হয়েছে আহমাদ আমীনের আত্মজীবনীতে তাঁর স্পষ্ট ও জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।^{৩৬} যেখানে তিনি তাঁর শৈশব ও যৌবন থেকে শুরু করে উন্মে আব্বাস মডেল প্রাইমারি স্কুলে কাটিয়েছেন এমন অভিজ্ঞতাগুলিকে তিনি একটি আকর্ষণীয় উপায়ে বর্ণনা করেছেন।^{৩৭} যা রাজপ্রাসাদের একজন রাজকন্যা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তারপরে তিনি আল-আজহারে অধ্যয়ন করতে চলে যান। বিচার বিভাগীয় বিদ্যালয় অধ্যয়ন শেষে, যৌবন এবং পুরুষত্বের পর্যায় অতিক্রম করে যেখানে তিনি বিচারিক এবং শিক্ষকতার পেশায় নিজে থেকে নিয়োজিত করেন। তখন আহমাদ আমীন মিসরীয় মহান চিন্তাবিদদের একটি অভিজাত গোষ্ঠীর সাথে অবস্থান করতেন। যেমন: ড. তাহা হুসেইন, আহমেদ লুৎফি আস-সায়িদ ও অন্যান্যদের সাথে। তাঁর লেখা উপন্যাস, প্রবন্ধ, দর্শন, ঐতিহাসিক অধ্যয়ন এবং সাহিত্য সমালোচনাসহ বিভিন্ন ধারায় বিস্তৃত।

“হায়াতী” বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আহমাদ আমীনের একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটির উপকারী দিকটি একমাত্র লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়না। বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ও বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আমাদেরকে অবহিত করে।^{৩৮}

৭.৪ প্রবন্ধ-সাহিত্য

এক: ফায়দুল খাতির (فيض الخاطر): এটি আহমাদ আমীনের লেখা সাহিত্যিক, সামাজিক নিবন্ধগুলির একটি সংগ্রহমালা। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদের মধ্যে সংগৃহীত, যাকে তিনি “ফায়দুল খাতির” নামে অভিহিত করেছেন। এই রচনাটি মূলত মননশীল, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে। তাঁর চিন্তাভাবনা ও আবেগগুলি তাঁর শৈলীর সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায়, যাতে তাঁর অভিব্যক্তিগুলি একত্রিত হয়। যতটা সম্ভব ধারণা, আবেগ, অসুবিধা ও অস্পষ্টতা ব্যতীত নিবন্ধগুলি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে অর্থের সৌন্দর্য্যে অবাক হতে হয়।^{৩৯} এটি মোট দশ খণ্ডে সমাপ্ত।

‘ফায়দুল খাতির’ প্রবন্ধসমগ্রটি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ইসলামী সংস্কৃতি, আধুনিক বিজ্ঞান, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাত্যহিক জীবন-যাপন সম্পর্কে প্রকাশিত মাসিক ‘আল-হিলাল’ (الهلال), ‘আর-রিসালাহ’ (الرسالة), ও ‘আল-মুক্তাতাব’ (المقتطف) সহ অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর একটি অনবদ্য সংকলন। এই প্রবন্ধসমগ্রটি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতীভার স্বাক্ষর বহন করে।

দুই: কামুসুল ‘আদাত ওয়াত তাকালীদ ওয়াত তা’আবীরিল মিসরিয়্যাহ: (قاموس العادات والتقاليد والتعبير المصرية)

এ গ্রন্থ রচনায় আহমাদ আমীন গবেষণার নতুনত্বকে এক উপভোগের স্থানে একত্রিত করেছেন। পাঠক সবেমাত্র গ্রন্থটি হাতে পেলেন, তার আগে তিনি নিজেকে আরও জানতে আগ্রহী করে তুলেন। গ্রন্থটি ব্যাখ্যা করেন একটি বিনোদনমূলক ও মসৃণ পদ্ধতিতে মিসরীয় রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও অভিব্যক্তির

অভিধান হিসেবে। এটি মিসরের জনগণের খাদ্য, পানীয়, পোশাক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে সম্বোধন করে। নিজেদেরকে নম্র করে, সেইসাথে কথোপকথনের ভাষাগত অভিব্যক্তিগুলি যা তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে। এই অভিব্যক্তিগুলি আরব বা বিদেশী উৎস থেকে সংকলিত। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বর্ণনাত্মকভাবে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পাঠক যা চান তা সহজে পেতে পারেন।^{৪০} ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে, আমাকে রেডিও ম্যাগাজিনে একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ লিখতে বলা হয়েছিল। আমি একটি বিষয় নির্বাচন করার ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়েছিলাম যা ধারাবাহিক নিবন্ধগুলিতে কভার করা হবে। আমার চিন্তাভাবনা আমাকে মিসরীয় বিষয়ে একটি সিরিজ নিবন্ধ লিখতে পরিচালিত করেছিল। মিসরীয় বিশ্বকোষ শিরোনামে যা প্রথা ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রবন্ধ। আমি বিশেষভাবে এতে মিসরীয়দের বিশ্বাসের কথা মনে রাখি।

আহমাদ আমীন গ্রন্থটিকে ব্যাখ্যা করেন একটি বিনোদনমূলক ও মসৃণ পদ্ধতিতে মিসরীয় রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও অভিব্যক্তির অভিধান হিসেবে। এটি মিসরের জনগণের খাদ্য, পানীয়, পোশাক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে সম্বোধন করে। এটি আরবী সাহিত্যের মিসরীয় সাংস্কৃতিক অভিধান হিসেবে পরিচিতি পায়।

তিন: জু'আমাউল ইসলাম ফিল 'আসরিল হাদীস: زعماء الإصلاح في العصر الحديث

আহমাদ আমীন এই গ্রন্থটিতে মূলত ইসলামী বিশ্বের দশজন মুসলিম সংস্কারকের জীবন-চরিত আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটি তিনি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। ইসলামী চিন্তাবিদ আহমাদ আমীন আধুনিক যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যা বিভিন্ন আরব ও অনারব দেশ থেকে তিনি নির্বাচন করেছেন। যেমন-বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব, মাদহাত পাশা, জামালুদ্দীন আফগানী, স্যার সৈয়দ আহমাদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, আব্দুল্লাহ আন-নাদীম, আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকিবী ও শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল্ প্রমুখ। আফগানিস্তান থেকে জামাল উদ্দীন আল-আফগানি, মিসর থেকে মুহাম্মদ আবদুহ ও আলী মুবারক, ভারত থেকে জনাব আমির আলি ও জনাব আহমেদ খান এবং অন্যান্যরা হিজাজ, লেভান্ট ও অন্যান্য দেশের ছিলেন। যাতে এ গ্রন্থটি দুর্বল হয়ে পড়া স্বদেশের জন্য একটি নবজাগরণ ও গৌরবের সূচনা হয়।^{৪১}

আহমাদ আমীন এই গ্রন্থটি রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে তরুণরা, বিবেককে জাগ্রত করতে, আকাজক্ষাকে তীক্ষ্ণ করতে, জাতিকে সংগঠিত করতে ও হৃদয়ে আশা জাগিয়ে তুলতে পারে। ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশা ও হতাশা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার পর: এই সংস্কারকদের জীবনী পড়ার পরে, তাদের উদাহরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন।

চার: হারুনুর রশীদ: هارون الرشيد খলিফা “হারুনুর রশীদ” জনগণের মধ্যে আব্বাসীয় যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ও সুপরিচিত খলিফা ছিলেন। তাঁর যুগে যে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক নবজাগরণ অর্জিত হয়েছিল। সেই কারণে তিনি কবি, লেখক ও পণ্ডিতদেরকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সমাবেশে। তাঁর শাসনামলে বৈদেশিক বাণিজ্য আন্দোলনের বিকাশ ঘটে, খিলাফত রাজ্য ও ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। হারুনুর-রশীদ মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন সম্রাট শারমানের মজার গল্প, যা সেই সময়ে আরব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটায়। খলিফা হারুনুর রশীদের খ্যাতি পশ্চিমেও ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, “এক হাজার ও এক রাত” গল্পগুলি খলিফার প্রাসাদের অসামান্য জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছিল।

আহমাদ আমীন এই গ্রন্থটিতে হারুনুর রশীদের শাসনামলের অনেক বড় রাজনৈতিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন-বারামুকদের উত্থান ও তাদের প্রভাবের বৃদ্ধি। তারপর তাদের বিরুদ্ধে খলিফার অভ্যুত্থানের কারণে তাদের বিখ্যাত সেই অগ্নিপরীক্ষা বর্ণনা করেছেন।^{৪২}

৭.৫ সমালোচনামূলক সাহিত্য

আন-নাকদুল আদাবী: النقد الأدبي আহমাদ আমীন এই গ্রন্থটি একটি রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে লিখেছেন। তাঁকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ফুয়াদ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে বক্তৃতা শেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারপর আহমাদ আমীন বলেন, আমি চলে যাই ইউরোপ ও আরব পণ্ডিতরা অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে সমালোচনার বিষয়বস্তু ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি। আমি ইংরেজিতে এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ অনুসন্ধান করেছি এবং আমি বিষয়টি খুব পছন্দ করেছি। আমি ইবনে সালামের তাবাকাত আশ-শুআরা, ইবনে কুতায়বার তাবাকাত আশ-শাইর, আবু হিলাল আল-আসকারির আল-সিনাতাইন, কবিতার সমালোচনা ও কুদামার গদ্যের সমালোচনা, প্রবাদ আল-ইবনে আল-আখিরের সাইর, আল-আমিদির দ্বারা আবু তাম্মাম ও আল-বুহতুরির মধ্যে ভারসাম্য, আল-জুরজানির দ্বারা আল-মুতানব্বি ও তার বিরোধীদের মধ্যে মধ্যস্থতা সম্পর্কে ধারণা নিয়েছি। আমি এই সমস্ত গ্রন্থের পদ্ধতি জানতাম। আমি নিয়ম-নীতিসহ সমালোচনাকে একটি সংগঠিত বিজ্ঞানে রূপান্তর করার একটি বড় প্রচেষ্টা চালিয়েছি। যদিও আমি যে আরবী গ্রন্থগুলির কথা বলেছি সেগুলির নীতিগুলি প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং সমালোচনার ক্ষণস্থায়ী বলক যা আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, যে সমালোচনার বিজ্ঞান কলেজ অফ আর্টসে পড়ানো হবে ও এটি আরবী সাহিত্যে প্রয়োগ করা হবে। আমি এটি দিয়ে শুরু করেছি, পাঠক গ্রন্থটিকে অধ্যয়নের সময় দেখতে পাবে যে, এটিতে আমাদের মতামত এই নিয়মগুলি আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমনটি পশ্চিমা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা এর পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলাম, তাই এই বিষয়ে এই পাঠটি ছিল আমি যতদূর জানি মিসরে আধুনিক শৈলীতে সাহিত্য সমালোচনার প্রথম পাঠ। কলেজে আমার কিছু সহকর্মী দয়া করে আমার পরে এই বিষয়টি অধ্যয়ন করেছিলেন। এটি আহমাদ আমীনের সর্বশেষ গ্রন্থ।^{৪০}

আহমাদ আমীন ‘আন-নাকদুল আদাবী’ নামক গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কিত অনেক বিষয়কে স্পর্শ করেছেন। তিনি সমালোচনার উৎস, মূলনীতি, উদ্দেশ্য, এর তত্ত্ব ও বিশ্লেষণাত্মক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এগুলোর অধ্যয়ন, শিল্প ও বিজ্ঞানের সাথে এদের সংযোগ স্থাপন। লেখক এখানে ঐতিহাসিক দিকটিও সম্বোধন করেছেন। আরব ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাহিত্য সমালোচনার বিষয়ে একটি পশ্চিমা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। আরব সভ্যতার সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসকে স্পর্শ করার পাশাপাশি প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে শুরু করে উমাইয়া যুগের মধ্য দিয়ে ও আব্বাসীয় যুগের শেষ পর্যন্ত সাহিত্য সমালোচনাকে ক্লাসিক্যাল স্কুল ও রোমান্টিক স্কুলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছেন।^{৪১} এছাড়াও আহমাদ আমীনের ‘আশ-শার্ক ওয়াল-গারব’, ‘ইলা ওয়ালিদী’, ‘মাহদী ওয়াল-মাহদুইয়াহ’, ‘ইবতাসামু লিল হায়াতী’ জীবনের জন্য হাসি, ‘হরবুশ শাররি’ মন্দ যুদ্ধ, ‘আল্লাম তানী আল-হায়াতু’ জীবন আমাকে শিখিয়েছে, গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়।

৭.৬ অনুবাদ সাহিত্য

গ্রন্থ রচনা ও প্রণয়নে আহমাদ আমীনের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। যেমন-নিচে তাঁর অনূদিত গ্রন্থের আলোচনা করা হলো:

মাবাদিউল ফালসাফা: مبادئ الفلسفة এ কাথা বলতে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের জীবনে দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা যা কিছু করি তা জীবনে আমাদের দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং দর্শনের এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, দর্শনের জটিলতাগুলি আমাদের দর্শন সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং শিক্ষা অর্জন থেকে দূরে রেখেছে। যাইহোক, লেখক গ্রন্থটি দর্শনের বিষয়ে একটি সরলীকৃত ও মসৃণ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন ‘দর্শনের নীতিমালা’ নামে। সাধারণ পাঠককে এটি দেখতে ও অধ্যয়ন করতে সক্ষম করার জন্য, গ্রন্থটি ছোট আকারের সত্ত্বেও ভাল উপস্থাপন ও দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলিকে পূর্বাভাস দেয়।

মূল্যায়ন: গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল; প্রথমটি, দর্শনের বিষয়বস্তু ও শাখাগুলি এবং দর্শনের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়টি, লেখক বেশ কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্ব ও তাদের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটির শেষে আহমাদ আমীন তাঁর অনুবাদের একটি বাড়তি প্রচেষ্টা উপস্থাপন করেছেন। তিনি গ্রন্থটিতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের একটি অভিধান তৈরি করেন, যাতে পাঠকের জন্য তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণের মাধ্যমে তাদের জানা সহজ হয়।^{৪৫} আহমাদ আমীনের আরও দুটি দর্শন বিষয়ক অনূদিত গ্রন্থ রয়েছে। যেমন-‘কিস্সাতুল ফালসাফাতিল ইউনানিয়্যাহ’, ‘কিস্সাতুল ফালসাফাতিল হাদিসাহ’ ইত্যাদি।

৮. আহমাদ আমীনের সাহিত্যকর্ম সার্বিক মূল্যায়ন

ড. আহমাদ আমীন ইসলামের মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামী চিন্তা, গবেষণা ও ইসলামী দর্শনের উর্বর ক্ষেত্র হলো তাঁর গ্রন্থগুলো। তাঁর মৌলিক রচনাবলী, আত্মজীবনী, অনূদিত গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আহমাদ আমীন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার করতে চেয়েছেন। বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার কারণ ও উপকরণ তিনি আলোচনা করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর দর্শনের আধুনিক যুগে মুসলিম জাতির জাগরণের উপায় তিনি অনুসন্ধান করেছেন। ইসলাম আধুনিক বিশ্বকে দিতে পারে সার্বিক নিরাপত্তার বিধান ও মুসলমান তথা মানব জাতির জন্য দিতে পারে প্রশান্তি ও সমৃদ্ধির আবাসস্থল। এ ক্ষেত্রে মহানবী সা. এর যুগ ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগ সফল ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।^{৪৬} ড. আহমাদ আমীন ইসলামের বিষয়বস্তুকে তাঁর সাহিত্য রচনার মূল উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সাহিত্য ও রচনাবলীতে লক্ষণীয়, তিনি উমাইয়া খিলাফাহ, আব্বাসীয় খিলাফাহ, উসমানী শাসন ব্যবস্থাসহ মুসলিমদের সফল শাসনকার্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। ড. আহমাদ আমীন তাঁর সাহিত্য রচনায় মুসলিম শাসনামলের দ্রুতি-বিচ্যুতি ও সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সেখান থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ চিত্র রূপায়ণ করেছেন। তাঁর আলোচনাগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি মূলত বিশ্বকে একটি সফল ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থা উপহার দিতে চেয়েছেন। এ লক্ষ্যেই তিনি ইসলামের নাগরিক আইন, সামাজিক আইন, রাষ্ট্রনীতি, নৈতিকতা ও পররাষ্ট্রনীতি বেশি আলোচনা করেছেন। ইসলামের ইবাদাতের বিধিগুলোতে তিনি বাহ্যিকতার সাথে রুহ বা আধ্যাত্মিকতা ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানান। ব্যাপকহারে মুসলিম সমাজ আজ যে পাশ্চাত্যমুখী আর আধুনিকতার নামে ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, এটার তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। মুসলিম সমাজকে তাদের আদর্শ, সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে আকুল আবেদন করেন। ইসলামে বিশ্বাস আর কর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন।^{৪৭} পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আহমাদ আমীন-এর অবদান, সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য প্রতিভা আরবী সাহিত্য প্রেমীদের মুগ্ধ ও মোহিত করেছে।

৯. উপসংহার

আধুনিক মিসরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী গবেষণার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, প্রবন্ধকার ও সাহিত্য সমালোচক আহমাদ আমীন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. আহমাদ আমীন আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন মিসরীয় সাহিত্যিক ও ইসলামী গবেষক। তিনি আরবী সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা সংযুক্ত করেছে এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঠক হৃদয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলামের উপাদান, প্রাচীন মিসর, আরব, ইউরোপ, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দুর্লভ ইতিহাস, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উপজীব্য করে, রচনা করেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ সঞ্চিত সম্পদ ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। আহমাদ আমীন স্থায়ী গবেষণা, জ্ঞান-সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারকে ইসলামের গবেষণা ও ঐতিহ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন। উন্নত গবেষণা উপস্থাপন ও সুন্দর সাহিত্য কাঠামো তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় সমাসীন করেছে। ‘আহমাদ আমীন-এর সাহিত্যকর্ম: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন’ প্রবন্ধটিতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও

পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর প্রথর মেধা, অধ্যাপনা ও গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ড. আহমাদ আমীন ইসলামের বিষয় বস্তুকে তাঁর সাহিত্য রচনার মূল উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সাহিত্য ও রচনাবলীতে লক্ষণীয়, তিনি উমাইয়া খিলাফাহ, আব্বাসীয় খিলাফাহ, উসমানী শাসন ব্যবস্থাসহ মুসলিমদের সকল শাসনকার্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। যা আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের পটভূমিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম, অধ্যাপনা ও গবেষণার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যানুরাগীদের নিকট তিনি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেন। বর্তমান অবধি আহমাদ আমীনের সাহিত্যকর্ম অধ্যয়ন, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, অনুশীলন ও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। তাঁর এ অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যে চিরস্মরণীয় ও ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ উমর রিয়া কাহালাহ, মুজাম্মুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুআসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১০৭; ইউসুফ কাওকান, আল-আলামুন নাহর ওয়াশ শি'র ফী 'আসরিল 'আরাবিয়াল হাদীস, ৩য় খণ্ড (মাদ্রাজ: দারু হাফিয়া, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৮৬; হান্না আল-ফাখুরী, আল-জার্মি ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী আল হাদীস (বৈরুত: দারু জাইল, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩০৭; *Encyclopedia of Islam*, vol-1, Edited by an Editorial Committee Consisting of H. A. R. Gibb, J. H. Kramers, E. Lévi-Provençal, J. Schacht, Assisted by S. M. Stern B. Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht, Assisted by C. Dumont and R. M. Savory 1960) p. 279.
- ^২ মুজাম্মুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; হান্না-আল-ফাখুরী, পৃ. ৩০৭; ইউসুফ কাওকান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯।
- ^৩ উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ, ২য় খণ্ড (লাহোর: পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৮৮; Dr. A.M.H. Mazyad, *Ahmad Amin, Advocate of Social and Literary Reform in Egypt* (London: E.J. Brill, 1963), p. 5.
- ^৪ ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৬৯; আহমাদ আমীন, হায়াতী (মিসর: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২২।
- ^৫ ফাহীম হাফীজ আদ-দানাসুরী, আহমাদ আমীন ওয়া আছরুহ ফিল লুগাতি ওয়ান নাকদিল আদাবী (মিসর: মাকতাবাতুল মুলক ফায়সাল আল-ইসলামিয়া, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৫।
- ^৬ মুজাম্মুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৮১-৮২।
- ^৭ ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৭১।
- ^৮ খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১০০।
- ^৯ আনওয়ার আল-জুনদী, মিন 'আলামিল ফিকরিল ওয়াল আদাব (বৈরুত: মাকতাবাতুন নাহদাহ, তা.বি.), পৃ. ৩১; মুজাম্মুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।
- ^{১০} ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৭৪; *Encyclopedia of Islam*, vol-1, p. 279.
- ^{১১} 'উমর আদ-দাসুকা, ফীল আদাবিল হাদীস (কায়রো: দারুল মাকতাব, তাবি); হান্না আল-ফাখুরী, পৃ. ৩০৮।
- ^{১২} ড. মুহাম্মদ রজব আল-বায়ুমী, আহমাদ আমীন মুয়াররিখুল ফিকরিল ইসলামী (দামেস্ক: দারুল কলাম, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৪।
- ^{১৩} *Encyclopedia of Islam*, vol-1, p. 279.
- ^{১৪} ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৭৬।
- ^{১৫} সালাহ যাকী আহমদ, 'আলামুন নাহদাহ আল-'আরাবিয়্যা (কায়রো: মারকাযুল হাদারাতিল 'আরাবিয়্যা, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১২-১৩; মুজাম্মুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।
- ^{১৬} *Encyclopedia of Islam*, V-1, P. 279.
- ^{১৭} হান্না আল-ফাখুরী, পৃ. ৩০৮; ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৮০।
- ^{১৮} আহমাদ আমীন, হায়াতী, পৃ. ৩৭।
- ^{১৯} প্রফেসর লাম'ঈ আল-মুতিঈ, মাওসু'আতু হাযার রজলু মিন মিসর (কায়রো: দারুশ শুরুক, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৯-১৫।
- ^{২০} ড. শাওকী দাইয়িব, শাওকী শা'য়িরুল 'আছরিল হাদীস (কায়রো: আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-'আম্মাহ, ২০১০ খ্রি.); হান্না আল-ফাখুরী, পৃ. ৩০৮; ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৮৩।
- ^{২১} তদেব।
- ^{২২} যাকী আল মাহসিন, মুহাদারাতু 'আল আহমাদ আমীন (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪০; মুজাম্মুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।
- ^{২৩} হান্না আল-ফাখুরী, পৃ. ৩০৮; *The Encyclopedia of Islam*, vol-1, p. 279; আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল 'আলাম, পৃ. ৭১; ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৮১।

- ^{২৪} ‘আমীরুল্ল ‘আক্কাদ, আহমাদ আমীন ওয়া হায়াতুহু ওয়া আদাবুহু (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ‘আসরিয়াহ, তাবি), পৃ. ৭২; ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা (রাজশাহী: সালেহা পাবলিকেশন্স, নভেম্বর-২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৬২।
- ^{২৫} আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ^{২৬} তদেব।
- ^{২৭} ড. এম. কবির, দিরাসাতুন ফী নাজারাতি আহমাদ আমীন (ইউনিভার্সিটি অব কেরালা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৮।
- ^{২৮} তদেব।
- ^{২৯} ইউসুফ কাওকান, পৃ. ৮৪।
- ^{৩০} আহমাদ আমীন, দুহাল ইসলাম (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৩।
- ^{৩১} তদেব।
- ^{৩২} আহমাদ আমীন, যুহরুল ইসলাম (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৬।
- ^{৩৩} আহমাদ আমীন, ইয়াওমুল ইসলাম (মিসর: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৩৭-১৮৭।
- ^{৩৪} আহমাদ আমীন, কিতাবুল আখলাক (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৫।
- ^{৩৫} আহমাদ আমীন, হায়াতু ইবন ইয়াকজান (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৮।
- ^{৩৬} আহমাদ আমীন, হায়াতী, পৃ. ৩৫৫-৪০০।
- ^{৩৭} ‘আমীরুল্ল ‘আক্কাদ, আহমাদ আমীন, পৃ. ৬৪।
- ^{৩৮} আহমাদ আমীন, হায়াতী (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৫-৫৪।
- ^{৩৯} আহমাদ আমীন, ফায়দুল খাতীর (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯।
- ^{৪০} আহমাদ আমীন, কামুসুল ‘আদাত ওয়াত তাকলীদ ওয়াত তা‘আবীরিল মিসরিয়াহ (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯৭।
- ^{৪১} আহমাদ আমীন, জু‘আমাউল ইসলাম ফীল ‘আসরিল হাদীস (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৩।
- ^{৪২} আহমাদ আমীন, হারুনুর রশীদ (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৮৭।
- ^{৪৩} আহমাদ আমীন, পৃ. ২০।
- ^{৪৪} আহমাদ আমীন, আন-নাক্বদুল আদাবী (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৬।
- ^{৪৫} আহমাদ আমীন, মাবাদিউল ফালসাফা (কায়রো: হিনদাবী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৮।
- ^{৪৬} ‘আমীরুল্ল ‘আক্কাদ, আহমাদ আমীন হায়াতুহু ওয়া আদাবুহু, পৃ. ১০।
- ^{৪৭} তদেব।

কাজী নজরুল ইসলামের গানে মূল আরবী শব্দের ব্যবহার [Use of Original Arabic Words in Kazi Nazrul Islam's Songs]

মো: আসাদুল ইসলাম*

[Abstract: Kazi Nazrul Islam was a versatile talent. Nazrul, the trumpeter of the time, was a poet, storyteller, essayist, dramatist, novelist, lyricist, composer, musician, singer, filmmaker, actor, organizer, politician and journalist. He has made outstanding contributions in every branch of literature. Nazrul's musical career started mainly through Letogan. Nazrul sang the song of human liberation throughout his life. He rebelled against evil, untruth, injustice and tyranny. Nazrul took Bengali music to a new height. Every category of music regained its freshness under his touch. He wrote numerous songs including Hamad, Naat, Kawalisangeet, Shyamasangeet, Samyavadi, Bhakti Geeti, Premergan, Ghazal, Ragshri, Ragapradhan and Kirtan. The use of original Arabic words can be seen in all his songs. Among them are especially Allah, Ilahi, Gafur, Muhammad, Ahmad, Al-Arabi Saki, Ambiya, Kawsar, Mahal, Minar, Kuwat, Duldul, Aswar, Ejid, Karbala, Waj, Zikir, Iftar, Qiamat, Musafir, Satan, Awaz, Haider, Ummat, Bahar, Kisim etc. are notable. Baxman article discusses the use of original Arabic words in the songs of Kazi Nazrul Islam.]

Keywords: kazi Nazrul Islam, Song, Original Arabic Word.

১. ভূমিকা

বাংলা গানের আধুনিক যুগের এক অসাধারণ প্রতিভা হলো কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি ও যুগশ্রুষ্ঠা সঙ্গীতকার। আধুনিক মননে নিবিষ্ট থেকেও প্রাচীন কিংবা মধ্য যুগের বহুবিধ সঙ্গীত উপকরণ দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টি গান ঋদ্ধ করেছেন। ফলে কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত গান সমূহ এক স্বতন্ত্র ধারার বাংলা গান হিসেবে সর্বমহলে সর্বজনীনতা লাভ করেছে। কখনো মাগীয় আবার কখনো দেশী ভাবধারায় তাঁর রচিত গান যুগের সীমাকেও অতিক্রম করেছে। ধর্মীয়, পার্থিব, সামাজিক বিভিন্ন উৎসবতায় কবি নজরুল তাঁর সৃজিত গানকে উপযুক্ত বিষয় ও প্রেক্ষাপটে সাজিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নজরুল সঙ্গীত সকলের কাছে সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, ও ছোটগল্প সহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তিনি দর্পিতভাবে বিচরণ করেছেন। তাছাড়া সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও চলচ্চিত্র জগতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। সৃষ্টি কর্তার প্রতি অকৃতিম বিশ্বাস তাকে জাতি-বর্ণ ইত্যাদির বৃত্তে না আটকিয়ে তাকে করেছে অসাম্প্রদায়িক। তাই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মীয় উৎসবের বিষয়াবলী নিয়ে তিনি যে গান রচনা করেছেন তা সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছে পেয়েছে সমান গ্রহণযোগ্যতা। তাই প্রতিটি কালে মিশে থাকবে তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত কর্ম। বাংলা গানের এমন অসংখ্য ধারা আছে যা কবি কাজী নজরুল ইসলামের কলমের ছোঁয়ায় পেয়েছে পূর্ণতা। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুস্বাভাবিক দশটি গীতি সংকলন প্রকাশিত হয়। ‘বুলবুল’, ‘চোখের চাতক’, ‘নজরুল-গীতিকা’, ‘চন্দ্রবিন্দু’, ‘সুরসাকী’, ‘বনগীতি’, ‘জুলফিকার’, ‘গুলবাগিচা’, ‘গীতি-শতদল’, ও গানের মালা ইত্যাদি। এছাড়া কবি নজরুল একই সাথে হামদ, নাট, কাওয়ালী, শ্যামাসংগীত, শিবসংগীত, ভজন সংগীত, কীর্তন সংগীত, ঝুমুর সংগীত সহ অসংখ্য প্রেমের গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত এসকল গানে মূল আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মধ্যে বিশেষ করে ইয়া নাফসী, কাহহার, বাহার, ইলাহী, গফুর, আহম্মদ, মহল, মিনার, কুয়ত, দুলাল, আসওয়ার, এজিদ, ইফতার, শয়তান, হাইদর, মানার, ইনসান, আল-আরবী সাকি, মাহফিল, কিসিম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের গানে মূল আরবী শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

২. কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয়

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর বিরল প্রতিভার অধিকারী। তাঁর আবির্ভাবের সাথে সাথে তিনি তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে সকলের বাহবা কুড়ান ও সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া রবীন্দ্র যুগে জনগ্রহণ করেও সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাব বলয় মুক্ত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এজন্য তাকে যুগের নকীব বা যুগ প্রবর্তক কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়।^১

কবির প্রকৃত নাম কাজী নজরুল ইসলাম। উপনাম ‘দুখু মিয়া’। সাথীদের মাঝে অনেকেই তাকে ‘তারা খ্যাপা’ নজর আলী বলেও ডাকত। পিতা কাজী ফকির আহমাদ। মাতা জাহেদা খাতুন। দাদা কাজী আমিন উল্লাহ, মাতামহ তোফায়েল আলী। কাজী ফকির আহমেদের দুইজন স্ত্রী, সাত পুত্র, ও দুই কন্যা ছিল। নজরুলের পরিবারে তিন ভাই ও এক বোন ছিল। বড় ভাই কাজী সাহেবজান, মেজো ভাই কাজী আলী হোসেন ও বোন উম্মে কুলসুম। একথা নির্মম হলেও সত্য যে কাজী ফকির আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে পরপর চার পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু তারা সকলেই মারা যায়। এর পরে জন্ম নেয় কাজী নজরুল ইসলাম।^২ কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা পেশায় কাজী। পরিবারের মধ্যে অভাব অনটন থাকলেও তারা সকলেই ছিল খুবই মার্জিত স্বভাবের। মজবের মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। নয় বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ায় তাদের নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়। ফলে আর্থিক অনটনের কারণে তিনি মজবে শিক্ষকতা করেন। তাছাড়া মাজারের খাদেম ও মসজিদের ইমাম ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হন।^৩ এখানে থাকা অবস্থায় নজরুলের চাচা ফজলে করীমের কাছ থেকে আরবী ভাষার তালিম নেন এবং তার সহযোগিতায় কাজী নজরুল ইসলাম গান রচনা করার কাজটি রপ্ত করেন।^৪

হঠাৎ একদিন মাজারের খাদেম এবং মজবের শিক্ষকতা ছেড়ে লেটো গানে যোগদান করেন। তাঁর কাজ হলো গান রচনা করা ও সুর করা ইত্যাদি। এ সময় নজরুল শকুনিবধ, মেঘনাদবধ, চাষারসঙ, রাজপুত্র নামে কয়েকটি পালাগান রচনা করেন। নজরুল চারণ স্বভাবের হওয়ায় লেটো দলে বেশি দিন থাকা হলো না। এবার ভর্তি হলেন বর্ধমান জেলার মাথরুন হাইস্কুলে। কিছু দিন লেখাপড়া করলেন তবে স্কুলের বাধা ধরা নিয়ম মোটেই ভালো লাগলো না। ফলে আসানসোল শহরের একটি রুটির দোকানে কাজ নিলেন। সেখানে মাত্র ৫ টাকা বেতনে তিনি কাজ করতেন এবং কাজের ফাকে ফাকে গান রচনা করতেন। নজরুলের গানের এমন প্রতিভা দেখে আসানসোল শহরের পুলিশ অফিসার কাজী রফিকুল্লাহ তাকে নিজ গ্রাম ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিরামপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করান। কিছুদিন যেতে না যেতেই নজরুল কাউকে কিছু না বলে ময়মনসিংহ থেকে চলে গেলেন। এবার রানীগঞ্জে সিমারসোল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এখানে পড়া অবস্থায় নজরুল বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেবার মানসে উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টে ভর্তি হন। সৈনিক জীবনের অবসরে এখানে প্রচুর সময় কাব্যরচনা এবং সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।^৫

সৈনিক জীবন শেষে কলকাতা ফিরে দৈনিক ‘নবযুগ’ পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২১ সালের এপ্রিলে কুমিল্লার দৌলতপুরে আগমন করেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এ বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এ সময় রচনা করেন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা যা মোসলেম ভারত পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী কবিতার দুটি পংক্তি-

বল বীর -

বল উন্নত মম শীর!

শির নেহারী, আমারি মত শির ওই শিখর হিমাদ্রি!^৬

১৯২২ সালে মে মাসে কলকাতায় ফিরে ‘দৈনিক সেবক’ পত্রিকায় যোগদান করেন। ২২ সেপ্টেম্বর ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতার জন্য এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। এ সময় প্রকাশিত হয় ‘অগ্নিবীণা’ (কবিতা) এবং ‘ব্যথার দান’ (গল্প) ও যুগবানী (প্রবন্ধ)। তাঁর এ সাফল্যের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ‘বিদ্রোহী’ কবিতা থেকে তিনি পরিচিত হয়ে পড়েন বিদ্রোহী কবি হিসেবে। এরপর ১৯২৩ সালে

কুমিল্লায় প্রমিলা দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।^৭ তাছাড়া রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনশন ভঙ্গের জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ ও নজরুলের উদ্দেশ্যে ‘বসন্ত’ নাটক উৎসর্গ করেন। এ সময় ‘দোলন চাঁপা’ (কবিতা) প্রকাশিত হয়।

এরপর কবির সাহিত্য দুয়ার যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল। কবির লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে শুরু করল। এই সময়ে দৈনিক মধুমতি, মোসলেম ভারত, মাসিক প্রবাসী বিজলী ও ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি লেখা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সময়ে প্রকাশিত অগ্নিবীণা কাব্যের অন্তর্গত ‘খেয়াপারের তরণী’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবিতাটি সাহিত্য জগতে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এই সময় তিনি কবিতা, গজল, প্রবন্ধ, ইসলামী গান, বহু হামদ-নাত, আধুনিক গান ও উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গানে অতীতের ঐতিহ্য, প্রেরণা, জাগরণ, মাজলুমের আত্ননাদ ইত্যাদি বিদ্যমান। একটি বিখ্যাত গানে তাঁর প্রমাণ প্রতীয়মান-

আল্লাহতে যাঁর পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।

কোথা সে আরিফ, অভেদ যাঁহার জীবন মৃত্যু জ্ঞান।^৮

কবির রচিত বিখ্যাত গান যা বাংলাদেশ সরকার রণসংগীতের মর্যাদা দিয়েছে। যেমন-

চল্ চল্ চল্! উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,

নিম্নে উতারা ধরণী-তল, অরুণ পাতে তরুণ দল, চল্-রে চল্ রে চল্।^৯

তাছাড়া আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে লিখেছেন এই বিখ্যাত হামদ। যেখানে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী প্রস্ফুটিত হয়েছে গানের ভাষায়:

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি

খোদা তোমার মেহেরবাণী।

শস্যশ্যামল ভরা মাটির ডালিখানি

খোদার তোমার মেহেরবাণী।^{১০}

১৯৪২ সালে হঠাৎ কবি বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেন। অনেক চিকিৎসার পরে কবিকে সুস্থ করা সম্ভব হয়নি। অসুস্থ কবিকে চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে ১৯৭২ সালে ঢাকায় আনা হয়। ১৯৭৪ সালে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এ সময় তাকে দেওয়া হয় একুশে পদক ও জাতীয় কবির মর্যাদা। অবশেষে ১৯৭৬ সালে ২৯ আগস্ট ঢাকা পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।^{১১}

৩. কাজী নজরুল ইসলামের গানে মূল আরবী শব্দের ব্যবহার

গান হলো মানবীয় আবেদনের রূপায়ন। আর এই আবেগ ও অনভূতি হলো একজন কবি ও শিল্পির একান্ত নিজস্ব। তিনি সে অনুভূতিকে কোন সুরে মোহনীয় করে তুলবেন। আর শব্দই হলো সেই বিশ্বস্ততার একমাত্র মাধ্যম। শব্দের যথাযথ ব্যবহার ও উপযুক্ত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে আবেগের সার্থক রূপায়ন। এজন্য একজন সার্থক কবি ও বিদগ্ধ লেখকের একমাত্র প্রধান ও প্রথম শর্ত হলো তাকে শব্দ কুশলী হওয়া। একজন কবিকে শব্দ নিয়ে ভাবতে হয় শব্দের আদি থেকে অন্তে।

বাংলা গানের মূল শ্রোত শুরু হয় চর্যাগীতির মাধ্যমে। এই ধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত জনপ্রিয় ধারা হিসেবে বহমান। নিজের স্থান শক্ত করতে সক্ষম হয়েছে নানা রূপে নানা নামে। প্রতিষ্ঠালগ্নে সাধন ভোজন সম্প্রদায়ের তত্ত্বশ্রী সংগীত হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরে এ ধারাটি সাধারণ মানুষের সংগীত ধারা রূপে স্বীকৃতি পায়। এই গানের ধারাতেই ধর্মীয় চিন্তামূলক সংগীত ধারা রূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদবলী কীর্তন, মঙ্গল কাব্য, আশ্রয়ী গান, শাক্তগীতি প্রভৃতি বাংলা গানের মূল ধারা রূপে বিবেচিত হয়। এই সংগীতের ধারা শাস্ত্রমতে, দেশী সংগীত রূপেই পরিচিত হয় সংগীত সমাজে। দেশী সংগীতের ধারাই মূলত বাংলায় বাংলা গানের মূলধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা গানের এই জনপ্রিয় ধারায় সংগীত-সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি,

ইত্যাদি আজও আবর্তিত হচ্ছে। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের মূল ধারার সংগীত রচনা করে নিজেকে বাংলা গানের ধারায় যুক্ত করেন।^{১২} বাংলা ভাষার অন্যতম শক্তিমান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছেন, শব্দে শব্দে বিয়া দেয় যেইজন সেইজন কবি। আমরা প্রতিদিন নিত্য নৈমিত্তিক কাজে যে শব্দ ব্যবহার করি তা একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে আবদ্ধ। সেই ব্যবহৃত শব্দগুলো আমাদের মানবিক দিগন্তকে প্রসারিত করে না। কিন্তু গান, কবিতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ আমাদের পরিচিত করে একটি অজানা জগতের সাথে। তাই শব্দের মাধ্যমে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় একটি পৃথিবী। গানে ব্যবহৃত শব্দসমূহ রূপকথার সেই সোনার কাঠি, যাতে আমরা সাওয়ারী হয়ে ভিন্ন জগতে পৌঁছাতে পারি। এজন্য সংস্কৃত আলংকারিকগণ শব্দকে বাচ্যার্থে নয়, ব্যঙ্গার্থের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। শব্দ যখন তার সীমিত অর্থ অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা বহন করে নিয়ে আসে, তখনই গান, কবিতা হয়ে ওঠে সার্থক। নিম্নে কাজী নজরুল ইসলামের গানে মূল আরবী শব্দের ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ তাওহীদ বিষয়ক মূল আরবী শব্দের ব্যবহার

বিশ্বাস ও ধর্মের দিক দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম পূর্ণ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে আরবী-ফার্সি চর্চার অনুকূলে পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। শৈশবে চাচা ফজলে করীমের কাছ থেকে আরবী ভাষায় তালিম নেন। তাঁর সহযোগিতায় কাজী নজরুল ইসলাম পরবর্তীতে প্রচুর পরিমাণে আরবী শব্দ ব্যবহার করে গান রচনা করেন।^{১৩} তাছাড়া নজরুল পল্টন জীবনে এবং মুন্সি নুরুল্লাহর নিকট থেকেও আরবী-ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করেন। ফলে নজরুলের গান ও কবিতায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ অধিকতর প্রসিদ্ধ। বাংলা শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে বিদেশী শব্দ তথা আরবী শব্দের ব্যবহারের সুমম নজরুলের হাত ধরেই।^{১৪} তাঁর লেখনীতে আল্লাহর একত্ববাদ সুস্পষ্ট। ইসলামের মূলমন্ত্র তাঁর দেহমানে প্রতিয়মান। তাওহীদ হলো কবির চলার পথের মুক্তির সোপান। আল্লাহর প্রতি তাওহীদের স্বীকৃতি হলো নজরুলের পথের পাথর। আল্লাহর পরিচিতি অর্থাৎ তাওহীদের বর্ণনা খুঁজে পাই নজরুলের বিখ্যাত এই গানে,

ইয়া আল্লাহ্ তুমি রক্ষা কর দুনিয়া ও দীন।

শান শওকতে হোক পূর্ণ আবার নিখিল মুসলমিন।^{১৫}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম কতিপয় মূল আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। উল্লিখিত গানে আমরা ‘আল্লাহ’ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি। আল্লাহ শব্দটি পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। শব্দটি বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত হলেও মূলত শব্দটি মূল আরবী ভাষার। আল্লাহ তা’আলা কুরআনুল কারীমে এই শব্দের বহু পরিচয় তুলে ধরেছেন। **إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** [আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।]^{১৬}

আল্লাহ আমাদের উত্তম অভিভাবক। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সকল চাহিদা মিটিয়েছেন। পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষি। আল্লাহকে সাহায্যকারী হিসেবে পেয়ে কবির হৃদয়ে নেমে এসছে আনন্দের ফল্লুধারা। হারিয়ে গেছে সকল ভয়-উৎকণ্ঠা।

ইসলামের অনেক ঐতিহ্য বিদ্যমান কবি নজরুলের গান ও কবিতায়। যে গান মানব হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আরো বেশি আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে এমন অসংখ্য গান রচনা করেছেন কবি নজরুল। তিনি স্বীয় প্রভুর কাছে বারবার প্রার্থনা করেছেন রাত-দিন তাঁর তাসবি করার। যে গুণগানে নেই কোন লৌকিকতা বা কৃত্রিমতার সংমিশ্রণ।^{১৭}

অনুসূচনা আর পরিতাপ নিয়ে কবি বারবার সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সপে দিয়েছেন। সেই অনুসূচনার বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই নজরুলের এই গানের মাঝে,

শোন শোন ‘ইয়া ইলাহী’ আমার মুনাজাত।

তোমারি নাম জপে যেন, হৃদয় দিবস-রাত।^{১৮}

উপর্যুক্ত গানের মাঝে ‘ইয়া ইলাহী’ শব্দের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। ‘ইয়া ইলাহী’ অংশ টুকো আরবী ভাষার মূল আরবী শব্দ। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো প্রভু, উপাস্য, ইলাহ, ইত্যাদি।^{১৯} কবি নজরুল এই গানে ‘ইয়া ইলাহী’

বলে নিখিল জাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে বুঝিয়েছেন। অনুতপ্ত হয়ে বিষাদ ভরা মন নিয়ে জগৎ স্বামীর কাছে স্থায়ী আরাধনা প্রকাশ করেছেন। যেন জগৎ মাঝারে অহর্নিশি 'ইলাহীর' প্রশংসা করতে পারে।

নজরুলের কাব্যের কারুকার্যে এবং গানের শিল্পিত রূপ বৃদ্ধি করণে মূল আরবী শব্দের ব্যবহার অবাধ ও সুষমিত। এই ব্যবহৃত শব্দের শৈল্পিকরূপ গানের মাধুরীকে দিয়েছে নতুন এক সম্ভবনা। উন্মোচিত হয়ে গেছে নতুন দিগন্তের। কবিমন বিচরণ করেছেন গানের নতুন হাজারো শাখা-প্রশাখায়। নজরুল গানের মাঝেই খুঁজেছেন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা। প্রকৃত ধার্মিকের বিশ্বাস এমনই। আল-কুরআন ও হাদীসের মর্ম কবি নজরুল গ্রহণ করেছেন বলে কবির কাব্যবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস একটি থেকে অপরটি আলাদা নয়। অথও ধর্মীয় চেতনায় তিনি আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে রেখেছিলেন আমৃত্যুকাল। নিজের পাপরাশি থেকে আল্লাহকে সর্বসময় ক্ষমার অধিকারী জেনেছেন। জগৎবাসীর প্রতি তাঁর দয়া অসীম। তাইতো তাঁর বিখ্যাত গানের মাঝে আল্লাহকে পরম ক্ষমতাশীল প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বলেছেন,

ওরে কোকিল, কে তোরে দিল এ সুর,

কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর?

কহে কোকিল পাপিয়া, আল্লাহ গফুর,^{২০}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে কবি নজরুল আরবী ভাষার মূল শব্দ 'গফুর' ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তাওহীদ বিষয়ক এবং ব্যাপক পরিচিত এবং বিরাট অর্থবহনকারী একটি শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো, ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ন ইত্যাদি।^{২১} কবি নজরুল মহান আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়াবান হিসেবে তাঁর ক্ষমার প্রত্যাশা করেছেন। পৃথিবীতে তাঁর অসংখ্য সৃষ্ট নিয়ামতরাজির নিদর্শন দেখে কবি পুলকিত আবার পাপের নমুনা মনে হলে আল্লাহকে গফুর হিসেবে কামনা করেছেন। পবিত্র আল-কুরআনে আমরা গফুর শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ [এবং তিনি ক্ষমাশীল (গফুর) প্রেমময়।]^{২২}

৩.২ রিসালাত বিষয়ক মূল আরবী শব্দের ব্যবহার

কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে গায়ক, সংগীত রচয়িতা এবং প্রতিথ্যশা একজন সুরকার। গানের অভ্যুত্থানে ও সুরবৈচিত্রে নজরুলের গান এক অনন্য সাধারণ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। সংগীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরুলের অবাধ বিচরণ উল্লেখ করার মত। সংগীতজ্ঞনে কাজী নজরুল ইসলামের সব চাইতে বড় অবদান হলো গজল শৈলীর গান। তাঁর গীতি বৈচিত্রের কথা বলে শেষ করা যায় না। শ্যামা সংগীত, ভজন সংগীত এর পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন যেটি ইসলামী সংগীতের ধারা। এই ধারাটি নজরুলের একেবারেই নিজের সৃষ্টি। তখন বাংলায় ফকির লালন শাহ ও হাসন রাজার কিছু দেহতত্ত্বমূলক গান চলমান ছিল। কুয়াশা আছেন এই পরিবেশে নতুনত্ব দিয়ে সমাজের চাহিদা মেটালেন নজরুল। গানের কথা গুলো মধুর, সুরগুলো মধুরতর।^{২৩}

এই ইসলামী উপাদান ও ঐতিহ্য তাঁর গানের উল্লেখযোগ্য রসদ। মুহাম্মাদ সা. এর রিসালাত নিয়ে লিখেছেন বিখ্যাত অসংখ্য গান। মুহাম্মাদ সা. এর রিসালাত বিষয়ে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেখতে পাই এই গানটির মাঝে। তিনি বলেন,

ইয়া মোহাম্মদ, বেহেশত হতে

খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।

এই দুনিয়ায় দুঃখ থেকে

এবার আমার নাজাত দাও।^{২৪}

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির 'মোহাম্মদ' শব্দটি আরবী ভাষার মূল শব্দ। শাব্দিক অর্থ অনেক প্রশংসিত, সর্বোচ্চ প্রশংসিত, অনেক গুণের অধিকারী।^{২৫}

মোহাম্মদ সা. আল্লাহর মনোনীত প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহ তাকে হেদায়েত ও সত্যদীনসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানবতার আলোকবর্তিকা স্বরূপ। মানুষের মাঝে সত্য দীন পৌঁছানোর কাজ অর্থাৎ রেসালাতের গুরুদায়িত্ব প্রচারের কাজে তিনি নিবিষ্ট ছিলেন।^{২৬} পবিত্র কুরআনুল কারীমে তাঁর বর্ণনা পেশ করেছে মানব

জাতীর সামনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [মুহাম্মাদ সা. তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।] ২৭

গানের কবি নজরুল ইসলাম রেসালাতের বার্তাবাহক মুহাম্মদ সা. কাছে হেদায়েতের অমিয় সুধা পান করতে চেয়েছেন। ফলে সঠিক পথের দেখা পেয়ে সৃষ্টি কর্তার একান্ত অনুগত বান্দাহ হতে চান। পৃথিবীর সকল কালিমা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর মনোনীত বান্দা হতে চান, যেন বিচার দিবসে মুহাম্মাদ সা. এর শাফায়াত লাভে ধন্য হতে পারেন।

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মসূত্রে একজন বাঙালি কবি। তবে তাঁর ধর্মনিতে ইসলামী কালচার বিদ্যমান। ইসলামী সংস্কৃতি, সভ্যতার সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক চির অটুট। বিশেষ করে ইসলামের সুমাহন আদর্শ তাঁর কাব্য ও সংগীতকে করেছে জনমানুষের কাছে অধিক গ্রহণীয়। ইসলাম ধর্মের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি ও অনুশাসন নজরুলের চেতনায় সঞ্চারিত। নজরুল সংগীতে ইসলামী ঐতিহ্য এবং ইসলামী চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সর্বজনীন মানবতার রঙে রঞ্জিত। ইসলামের নবী সমূহের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান, পবিত্র কাবা, যুদ্ধের ময়দান, মুসলিম রাজা-বাদশাদের বীরত্বগাথা ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর গান তিনি রচনা করেছেন। ২৮ মুহাম্মদ সা. আগমন পূর্ব আরবের অবস্থা নিয়ে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এই গানের মাঝে। তিনি বলেছেন,

তুমি আসার আগে ধরার মজলুম
করিত ফরিয়াদ, চোখে ছিলনা ঘুম;
ধরার জিন্দানে বন্দী ইনসানে
আজাদী দিতে এলে, হে প্রিয় আল-আরাবি। ২৯

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মাঝে আমরা কতিপয় মূল আরবী ভাষার শব্দ লক্ষ্য করি। বিশেষ করে এ অধ্যায়ে আমরা রিসালাত বিষয়ক শব্দ নিয়ে আলোচনা করছি। আল-আরাবি অংশটুকো আরবী ভাষার মূল শব্দ। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হল আরবী, আরব, আরব রাষ্ট্রবর্গ। ৩০ কবি নজরুল ‘আল-আরাবি’ শব্দ দিয়ে মুহাম্মদ সা. কে বুঝিয়েছেন। তাঁর আগমনের পূর্বে আরব দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা কোন ভাবেই ভালো ছিল না। আদম গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ‘খুন-কা বদলা খুন’ এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিল গোত্র প্রধানেরা। সামাজিক জীবন ছিল মদ, জুয়া ও কুসংস্কারে ভরা। ঐতিহাসিকগণ ইসলামের আবির্ভাব পূর্ববর্তী সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। ৩১ ইসলাম আগমনের পূর্বে এমন পাপাচারিতায় লিপ্ত সভ্যতাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন মুহাম্মাদ সা. আল-আরাবি। মাজলুম মানবতা ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো অধিকার।

নজরুল মানবতার কবি। মানবতার জয়গান গেয়েছেন সারা জীবন। পাশাপাশি মহামানবকে নিয়েও লিখেছেন অনেক। পৃথিবীর প্রথম নবী থেকে শেষ নবী প্রত্যেকের দায়িত্ব এক এবং অভিন্ন। তাদের অনুসারীরা আল্লাহর ক্ষমা ও পুরস্কার পাবে। আশিয়াগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা জমিনে তাঁরই নির্দেশে মানব জাতিকে তাঁর উপাসনা করার আহ্বান করেছেন। আল্লাহ স্বীয় আশিয়াগণকে তাঁর পরেই সম্মান দিয়েছেন। ৩২ কবি নজরুল আশিয়াগণের সম্মান ও কিয়ামাতে আল্লাহর দেওয়া কাওসারের বর্ণনা দিয়েছে তাঁর গানে,

আউলিয়া আশিয়া দরবেশ যঁার নাম
খোদার নামের পরে জপে অবিরাম
কেয়ামতে যঁার হাতে কাওসর পিয়াল। ৩৩

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মাঝে কতিপয় মূল আরবী শব্দের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। বিশেষ করে উদ্ধৃতির ‘আশিয়া’ ও কাওসর উল্লেখযোগ্য। প্রথমে আমরা ‘আশিয়া’ শব্দ নিয়ে ব্যাখ্যা করব। আশিয়া শব্দটি মূল আরবী ভাষার শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো নবী, পয়গম্বর, ইত্যাদি। ৩৪

কবি নজরুল আল্লাহর পরে প্রতিনিধি আশিয়াগণের প্রতি সালাম পৌছানোর আহ্বান করেছেন। তাদের আনুগত্য করলে সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব। আশিয়াগণের দেখানো পথে পাওয়া যাবে আল্লাহর নৈকট্য। পবিত্র

কুরআনুল কারীম আশ্বিয়া সম্প্রদায়কে সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আল-কুরআনে আমরা আশ্বিয়া শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾ [তারা আল্লাহর আয়াত সমূহ প্রত্যাখান করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে (আশ্বিয়া) হত্যা করত; ইহা এজন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত]।^{৩৫}

৩.৩ যুদ্ধ বিষয়ক মূল আরবী শব্দের ব্যবহার

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় জাগরণের বলিষ্ঠ একজন কবি-কণ্ঠ। তিনি তাঁর রচিত অসংখ্য গান ও কবিতার মাধ্যমে ঘুমন্ত একটি জাতিকে জেগে উঠার অসীম প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি পরাধীন মুসলিম জাতির বাক স্বাধীনতা হরণ, পশ্চাৎপদ, জেল-জুলুম, শোষণ-নিপীড়নসহ নানা প্রকার দুর্ভোগ থেকে জাতিকে নব উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। নজরুল ইসলামী পুনর্জাগরণের কথা উচ্চারণ করেছেন প্রাণভরা ভালোবাসা ও আবেগ উচ্ছ্বাসের সাথে।^{৩৬} মুসলিম জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করেছেন। নজরুলের গানের মাঝে তাঁর বর্ণনা আমরা খুঁজে পাই।

বাজল করে ভোরের সানাই

নিদ-মহলার আঁধার পুরে।

শুনছি আজান গগন তলে

আধার রাতের মিনার চূড়ে।^{৩৭}

গানের উদ্ধৃতির মাঝে কতগুলো মূল আরবী শব্দের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। আজান শব্দটি কবি নজরুল এখানে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি মূলত আরবী ভাষার। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো আযান দেওয়া, ঘোষণা করা, অবহিত করা, নামাজের আহবান জানানো, ইত্যাদি।^{৩৮} কবি নজরুল যুদ্ধের আহবানের সাথে আজানের ধ্বনির তুলনা করেছেন। নামাজের প্রস্তুতির জন্য আযান যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের সমবেত করার পূর্বে তাদের ডাকা প্রয়োজন। গগন তলে উচ্চশিত কণ্ঠের আহ্বান শুনে সৈনিক রণঙ্গনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিবে এমন প্রত্যাশা কবির। কবি নজরুল আজানের ধ্বনিকে রূপক অর্থে যুদ্ধের প্রস্তুতির পূর্ব আহবান এর সাথে তুলনা করেছেন গানের চরণে।^{৩৯}

গানের শেষ চরণে একটি মূল আরবী শব্দের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। শব্দটি হলো মিনার। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো বাতিঘর, আলোকস্তম্ভ, মিনার, ইত্যাদি।^{৪০} কবি নজরুল উদ্ধৃতির মাঝে আরবী শব্দ মিনার ব্যবহার করেছেন। যখন রাতের আধারের ঘনঘটায় সব কিছু অস্পষ্ট তখন রাতের আধার দূর করার জন্য মিনারের সুউচ্চ আহ্বান প্রয়োজন। গানের উদ্ধৃতির মাঝে ‘আযান’ ও ‘মিনার’ আরবী ভাষার এমন মূল শব্দ ব্যবহার করে সর্বসাধারণের কাছে তাঁর রচিত গানগুলো সর্বজনীন এর আসনে সমাসীন করেছেন।

কবি নজরুল তাঁর কবিতা ও গান অর্থাৎ সমগ্র রচনা দিয়ে মুসলমানদেরকে দুর্জয় সাহস এবং অকুতোভয় চেতনার রসদ জুগিয়েছেন। স্বাধীনতার সপক্ষে, নিপীড়িত জনগণের পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ সর্বজন বিদিত ও প্রসংশনীয়। এজন্য তাকে তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকের রোষানলে পড়তে হয়েছে। জমিদার-মহাজন ও শোষক শ্রেণীর বা স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছেন। তবুও শোষিত-নিপীড়িত মানবতার পক্ষে স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে। খালিদ, তারিক, ও মুসার ন্যায় নিজেদের স্বাধীনতা এবং জাতির স্বকীয়তা যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই, তাহলে তাদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।^{৪১} তিনি তাঁর রচিত গানে বিমিয়ে পড়া মুসলমানদেরকে জাগরণের মঞ্চে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন,

আজি বিশ্ব-বিজয়ী জাতি যে, বেহুঁশ,

দাও তারে নব কুয়ত ও জোশ;

এস নিরাশার মরু-ধূলি উড়ায়ে

দুলদুল-আস্‌ওয়ার^{৪২}

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মাঝে কতগুলো মূল আরবী শব্দের সুসম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ‘কুয়ত’ ‘দুলদুল’ ও আস্‌ওয়ার উল্লেখযোগ্য। এখন আমরা এক এক করে প্রতিটি শব্দ নিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাব।

প্রথমে আমরা এই গানের ‘কুয়ত’ শব্দ নিয়ে আলোচনা করি। শব্দটি আরবী ভাষার একটি মূল শব্দ। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো শক্তি, ক্ষমতা, বল, প্রবলতা, ইত্যাদি।^{৪৩} মুসলিম জাতি বিশ্ববিজয়ী। তাদের বীরত্বের বর্ণনা পৃথিবী বিদিত। মুসলিম জাতির শিরা-উপশিরাই স্বজাতীর গৌরবময় চেতনা প্রবহমান। এই বীরের জাতি হঠাৎই নুইয়ে পড়ায় শত্রু পক্ষ তাদের উপর খড়গহস্ত। এই বিমিয়ে পড়া জাতির একমাত্র মুক্তির উপায় হলো শক্তি সঞ্চয়, নিজেদের সুসংগঠিত করা। মরীচিকার পিছনে মশগুল এই জাতির হারানো বিজয় নিশ্চিত করার একমাত্র উপকরণ হলো জোশ ও ‘কুয়ত’।^{৪৪} কবি নজরুল বেহুঁশ জাতির নবউদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুয়ত বা শক্তির প্রয়োজন অনুভব করেছেন বলেই এমন আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃতির শেষ চরণে মূল আরবী শব্দ ‘দুলদুল’ এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ‘দুলদুল’ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো শজারু (প্রাণী)।^{৪৫}

নজরুল এখানে ‘দুলদুল’ শব্দের অবতারণা করেছেন। শব্দটি অধিকাংশে ঘোড়া অর্থে ব্যবহার হয়। গানে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের দাবী এমনটাই। মুসলিম জাতির সকল হতাশা-দুঃচিন্তার প্রাচীর ভেদ করে মরু-ধূলি-বালি শূন্যে উড়িয়ে আসবে দুলদুল। দুলদুলের পদাঘাতে শূন্যে ভাসমান ধূলি যেন অপসারণ করবে সকল নিরাশার চাদর। পরিশেষে ‘আসওয়ার’ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শব্দটি মূল আরবী ভাষার। শাব্দিক অর্থ হলো প্রাচীর, দেয়াল, বেড়া ইত্যাদি।^{৪৬} এখানে ‘আসওয়ার’ শব্দের ব্যবহার পুরো উদ্ধৃতির আবেদন পূর্ণ করেছে। মূলত একদিকে ভোগ-বিলাসে মত্ত মুসলিম জাতির পরাধীনতা অপরদিকে অত্যাচার নিপীড়ন ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম জাতির সামনে যে শক্তি মিথ্যার প্রাচীর দাড় করিয়েছে, তা পূর্ণ কুয়ত বা শক্তি দিয়ে ধ্বংস করার আহ্বান করেছেন গানের কবি নজরুল। আত্মপ্রত্যায়া মুসলিম জাতী দুলদুল নিয়ে ছুটেবে রণাঙ্গনে। দুলদুলের তেজস্বী গতির ছুটে চলায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে সকল প্রাচীর।^{৪৭}

জাতীয় কবি নজরুল তাঁর কাল ও সমাজের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় জাতীয় ভাবধারা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আদর্শ এবং তিনি সর্বোপরি একটি সাধারণ জাতির বোধ-বিশ্বাস, স্বপ্ন-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে অসামান্য আবদান রেখেছেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন আমৃত্যু কাল। জালিমের বন্দিশালা ভেঙ্গে ফেলার আহ্বান করেছেন কালের স্বরণীয় এই গানে।

কারার ঐ লৌহ কবাট
ভেঙ্গে ফেল, কর রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পূজার পাষান-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি।^{৪৮}

ইসলাম এদেশের তথা পৃথিবীর অসংখ্য মুসলিমের দেহমানে মিশে আছে। নজরুলের সংগীত অধ্যায়ে ইসলামী গান এক অনন্য অবদান। বস্তুত সৎ ও মহৎ শিল্প সাধনায় মগ্ন হয়ে রচনা করেছেন অজস্র কালজয়ী গান। তাঁর রচিত ইসলামী গানগুলো কালের চাহিদা পূরণ করেও অদ্যবধি জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। এসকল গানে অনিয়ম, অন্যায়, কুসংস্কার, অসত্যের কথা যেমন বলেছেন ঠিক তেমনি জাতীয়তা ও জাতীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সংগ্রাম ও জিহাদে সম্পৃক্ত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।^{৪৯} তিনি বলেছেন,

দাও দখিনা, দাও গো বিদায়, কারবালাতে যায়।
রণ ডংকা বাজিয়ে গেল, এজিদের সিপাহী^{৫০}

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে কতিপয় মূল আরবী ভাষার শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ‘কারবালা’ ও ‘এজিদ’ উল্লেখযোগ্য। শুরুতে আমরা ‘কারবালা’ শব্দ নিয়ে আলোচনা করব। কারবালা শব্দটি আরবী ভাষার মূল শব্দ। শাব্দিক অর্থ বালা-মুসিবত, সংকট ইত্যাদি।^{৫১}

নজরুল তাঁর গানের মাঝে মুসলিম স্মৃতি-বিজড়িত স্বরণীয় স্থান ‘কারবালা’ শব্দের ব্যবহার করেছেন। স্থানটি মুসলিম ইতিহাসে এক বিয়োগান্ত ঘটনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে। মুসলিম সৈন্যরা কারবালা প্রান্তরে

যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় চাই, নিজ পরিজনের কাছে। নজরুল তাঁর গানে কারবালা শব্দ ব্যবহার করে মুসলিম ইতিহাসের এই নির্মম অধ্যায়টি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে আমরা এজিদ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। ‘এজিদ’ শব্দটি মূলত আরবী ভাষার। ইতিহাসে তিনি এজিদ ইবন মু‘আবিয়া নামে পরিচিত। উমাইয়া খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা। উত্তরাধিকার সূত্রে খেলাফত লাভকারীদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি। তাঁর পিতা মু‘আবিয়ার মৃত্যুর পরে তিনি মসনদে আরোহণ করেন।^{৫২}

কারবালার যুদ্ধের রন ডংকা যখন এজিদের সৈন্যরা বাজিয়ে গেল, তখন মুসলিম বাহিনী এজিদের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কবি নজরুল নিজ গানে ‘এজিদ’ ও ‘কারবালা’ দুটো আরবী শব্দ ব্যবহার করে ইতিহাসের এক নির্মম হৃদয় বিদারক অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। হুসাইন রা. ও তাঁর সাথীরা ইসলামকে সঠিক পথে রাখতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইতিহাসের ঘৃণিত এজিদ বাহিনীর কাছে মাথা নত না করে ইসলামের সম্মান অক্ষুণ্ন রেখেছেন।^{৫৩}

৩.৪ ইবাদত বিষয়ক মূল আরবী শব্দের ব্যবহার

আল্লাহ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত সূনিপুণভাবে। আর এই সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা। মহান আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন। ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لَعِبْتُ﴾[আমি সৃষ্টি করেছি জীন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমার ইবাদত করবে।]^{৫৪}

প্রত্যহিক জীবনে মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। এমনভাবে সুদ, ঘৃষ, গিবত, মিথ্যা ইত্যাদি বিষয় থেকে নিজে সতর্ক থাকবে। মূলত আল্লাহর ইবাদত তথা উপাসনার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়। আল্লাহর কাছে নিজেকে সপে দেওয়ায় হলো ইবাদতের হাকিকত বা প্রকৃত ব্যাপার।^{৫৫} কাজী নজরুল ইসলাম মনে প্রাণে একজন মুসলিম কবি। তাঁর হৃদয়ে, মননে আল্লাহর ইবাদতের মূলমন্ত্র বিদ্যমান। তাইতো আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদতের প্রতি অধিকবার মুসলমানদেরকে প্রেরণা দিয়েছেন। স্বীয় সংগীতে পবিত্র হওয়ার জন্য ওজুর বর্ণনা পেশ করেছেন। যে পবিত্রতার মাধ্যমে মুসলিম হৃদয় ও মন সতেজ হয়। অন্তরের প্রফুল্লতা ফিরে আসে। তিনি বলেছেন।

তোমার ওজুর পানি মোছ আমার পিরান দিয়ে

আমার এ ঘর হোক মসজিদ তোমার পরশ নিয়ে।^{৫৬}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে আমরা ইবাদত বিষয়ক আরবী শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। ‘ওজু’ শব্দটি মূলত আরবী ভাষার মূল শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো ওজু, পবিত্রতা, মুখমণ্ডল, চেহারা, উপরিভাগ, দিক, ইত্যাদি।^{৫৭}

কবি নজরুল গানের মাঝে ‘ওজু’ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। ইসলামি বিধানযায়ী ওজু হলো পবিত্রতা অর্জনের মূল মাধ্যম। তাছাড়া পবিত্র থাকলে মনে শান্তি লাগে। ভালো কাজ সৃষ্টির আত্ম প্রবল ভাবে তৈরী হয়। ওজু তথা পবিত্র থাকলে সালাত আদায় ও কুরআনুল কারীম স্পর্শ করা যায়। রাসূল সা. ওজু কারীর জন্য পাপমুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্রতা অর্জন কারীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন, لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصل إلى صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها [যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওজু করে সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাঁর সেই সালাত এবং পরবর্তী সালাতের মধ্যকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।]^{৫৮}

নজরুলের একাডেমিক শিক্ষা কম থাকলেও তিনি স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর পড়ালেখার অঙ্গন ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। যতদূর জানা যায়, খুব অল্প বয়সেই নজরুল আন্ত-ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী হয়ে ওঠেন। যার দৃষ্টান্ত অসংখ্য গান ও কবিতায় দেখা মেলে। এ বিষয়ে নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, “খুব কম বয়স থেকে নজরুল বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন।”^{৫৯}

পরবর্তীকালে এসকল শিক্ষা ও ইসলামী চেতনা কবিকে বাংলা গীতি-সাহিত্যের ইতিহাসে ইসলামী একটি স্বতন্ত্র নতুন ধারা উন্মোচন করতে সাহায্য করে। ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাঁর সংগীতে দৃষ্টমান। তিনি বলেছেন,

ফতেমার মেয়েদের হেরি' আঁখি-নীর
বেহেশত কেমনে আছ তুমি থির!
যেতে নারি মসজিদে গুনিয়া আজান,
বাহিরে ওয়াজ হয়, ঘরে কাঁদে প্রাণ^{৬০}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে কবি নজরুল কতিপয় আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে ‘ওয়াজ’ শব্দটি উল্লেখযোগ্য। শব্দটি আরবী ভাষার মূল শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো বক্তৃতা, উপদেশ, হিতোপদেশ ইত্যাদি।^{৬১}

গানের কবি নজরুল ইসলাম ইবাদত বিষয়ক শব্দ ‘ওয়াজ’ এর অবতারণা করেছেন। রাসূল সা. এর ওফাতের পরে ফাতেমার পরিবারে শোকের ছায়া। সেই বেলালের আজানের ধ্বনি, বাহিরে সাহাবাদের উপদেশ মূলক বক্তৃতা সবই আছে শুধু রাসূল সা. পৃথিবীতে জীবিত নেই। মুহাম্মাদ সা. যদিও জীবিত নেই তবুও ওয়াজ বা বক্তৃতার মাধ্যমে ইবাদতের দিকে উৎসাহ দেয়ার প্রচলন আছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশল্লে (ওয়াজ) তাহার পুত্রকে বলেছিল, ‘হে বৎস! আল্লাহর কোন শরীক করিও না।’]^{৬২}

শৈশবের আরবী শেখা, মাজারের খেদমত, কুরআন তেলওয়াত, খুত্বা পাঠ ইত্যাদি নজরুলকে ধর্মীয় চেতনায় প্রবুদ্ধ করতে পেরেছিল। এজন্য স্বীয় গান ও কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ আজ দৃশ্যমান।

ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকটাও কবি নজরুল ইসলাম গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আমরা অনেক গানের উদ্ধৃতিতে দেখতে পাই। এ বিষয়ে কবি আবদুল কাদিরের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

“আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ সকল
কথা বলেছেন, তাঁর অন্তর্গত রস-রসহ্য পৃথিবীর একমাত্র
মর্মবাদী সুফী সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,
সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্ত হলেও তাঁর
রহস্য অনুভব করতে অক্ষম”

এ সকল নানা কারণে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ ছিল না নজরুলের। সম্ভব ছিলনা ইসলামের মমতাবাদী আদর্শ, গণতান্ত্রিক শিক্ষা, নবী-রাসূল ও মুসলিম মণীষীদের সম্পর্কে নিবেষ্ট থেকে গান ও কাব্যচর্চা করা। সঙ্গত কারণেই নজরুল সাহিত্যের একটি বড় অঙ্গন জুড়ে ইসলামী সংস্কৃতি, মননশীলতা এবং ইসলাম প্রীতির অজস্র দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট।^{৬৩}

এমন আধ্যাত্মিকার দালিলিক উপস্থাপনা নজরুলের এই গানে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্ ॥
তোমার দেহ মন হবে রে ভাই নূরুতে রওশন
তখন আমির ফকির চাইবে সবাই তোমার দরশন
মাতোয়ারী হও যিকির করো খোদার প্রেমে মেতে।^{৬৪}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতির মাঝে কাজী নজরুল ইসলাম কতিপয় আরবী ভাষার মূল শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে “যিকির” শব্দটি উল্লেখযোগ্য। শব্দটি আরবী ভাষার মূল একটি শব্দ। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো স্মরণ, স্মৃতি, বর্ণনা, উপদেশ ইত্যাদি।^{৬৫}

কবি নজরুল গানের শেষ অংশে ইবাদত বাচক শব্দ ‘যিকির’ এর ব্যবহার তুলে ধরেছেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম হলো যিকির। ইমাম কুরতুবী রহ. মতে, “জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধ এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য হলো যিকির।”^{৬৬}

আল্লাহর প্রিয় নৈকট্যশীল বান্দা হতে তাঁর স্মরণ সবদা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা অপরিহার্য। মানুষের হৃদয়ে মহান আল্লাহর স্মরণ তথা যিকির থাকলে পাপ থেকে বেঁচে থাকা যায়। আল্লাহর নাম মুখে-অন্তরে স্বীকারকারীর জন্য রয়েছে ক্ষমা ও পুরস্কার। তাছাড়া সৃষ্টিকর্তাকে বেশি বেশি স্মরণ বা তাঁর নিয়ামতরাজী দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করলে প্রভু তাঁর বান্দার নিয়ামত-রিযিক বহুগুণে বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন, فَادْكُرُونِي [সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ (যিকির) কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করিব।]^{৬৭}

কবি নজরুলের গান ও কবিতায় মানুষের জয়গান ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বর্ণনা ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি জাত ও সম্প্রদায়ের নামে বাড়াবাড়িকে তিরস্কার করেছেন। আন্তঃধর্মীয় সমন্বয় ও বিচিত্র ধর্মীয় উপাদানের সংমিশ্রণে সাহিত্য সাধনা নজরুলের পূর্বে আর কেউ দেখাতে পারেনি। তাঁর গান ও কবিতায় ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে। জগৎবাসীকে মুহাম্মাদ সা. আনিত আদর্শ অনুসরণ করতে বলেছেন। পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে এবং এটায় মুক্তির একমাত্র পথ।^{৬৮}

ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দিয়ে রচনা করেছেন এই গান। তিনি বলেছেন,

এসো হে মোমিন কর হে ইফতার
প্রেমের বাঁধনে করো গেরেফতার
খোদার রহম নামিবে বেশক ৷^{৬৯}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম মূল আরবী ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন। গানের চরণে ‘ইফতার’ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। শব্দটি মূলত আরবী ভাষার এবং ইবাদত বিষয়ক একটি শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো রোযা ভাঙ্গন, সৃষ্টি, উদ্ভাবন, ইত্যাদি।^{৭০} রোযা রাখার পরে যথা সময়ে খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ইসলামি শরি’আতের পরিভাষায় ইফতার বলে। সুনানে আবু দাউদের হাদীস থেকে ইফতারের সাওয়াব ও ফজিলত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। মহানবী সা. যথা সময়ে খাদ্য গ্রহণ অর্থাৎ ইফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন।^{৭১} কবি নজরুল নিজ গানে ইসলামী শব্দের অঙ্গুলি ব্যবহার করেছেন। শব্দের এই অধিকতর প্রমিত ব্যবহার গানের গুরুত্ব বহুলাংশে যেমন বৃদ্ধি করেছে ঠিক তেমনি ইসলামের মূল ইবাদতের প্রতি জুগিয়েছেন অসীম প্রেরণা।^{৭২}

৩.৫ ইসলামী পরিভাষা বিষয়ক মূল আরবী শব্দের ব্যবহার

পরিভাষা সুদৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট একটি শব্দ। এর অর্থের সংকোচন বা প্রসারণ নেই। আলংকারিক ভাষায় এর অভিধা শক্তি আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা শক্তি নেই। যে শব্দ দ্বারা অতি সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় হলো তা হলো পরিভাষা। পরিভাষা হলো বিশেষ অর্থ প্রকাশকারী শব্দ বা শব্দরাশি।^{৭৩}

এখন আমরা নজরুলের গানে ইসলামী পরিভাষা বিষয়ক শব্দের ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। ইসলামি কালচার ও ঐতিহ্য তাঁর মর্মে মর্মে প্রবাহিত। তাইতো ইসলাম ধর্মের রীতি, আদর্শ, ইসলামী অনুশাসন ইত্যাদি তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত। শৈশব থেকে তিনি গুণু পারিবারিকভাবে ইসলামী শিক্ষা লাভ করেছেন এমন নয়, বরং তাত্ত্বিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হয়ে ওঠেন।^{৭৪}

এসকল কারণে তিনি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গান ও কবিতায় প্রচুর পরিমাণে ইসলামী পরিভাষা বিষয়ক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে কিয়ামত, মুসাফির, শয়তান, এজিদ, খালেদ, তাজমহল, তওরাত, দরগাহ, উম্মত, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।^{৭৫}

কাজী নজরুল ইসলাম ইসলাম বাংলার ইসলামী সংগীতে দিয়েছেন নতুন প্রাণ নতুন সুর। এর নেপথ্যে রয়েছে লোকগীতি সম্রাট আব্বাস উদ্দীন আহমেদের একান্ত অনুরোধ ও প্রেরণা। সমসাময়িককালে কবি গোলাম মোস্তফা ও ইসলামী গান রচনা করেছেন, কিন্তু কবি নজরুলের মতো সামগ্রিকভাবে জনচিত্ত গ্রাস করতে পারেন নি অনেকেই। বস্তুত কবি নজরুলের গানে রয়েছে উন্নত উপমা, চিত্রকল্প, দর্শন, ও ইসলামী চেতনা। বাংলার পথে-প্রান্তরে যে ইসলামী গান ছড়িয়ে পড়েছিল সুরের মূর্ছনায় তাঁর সবই সৃষ্টি হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের হাত ধরে।^{৭৬} নজরুলের সাহিত্যে আমরা ইসলামের পথনির্দেশনা দেখতে পাই। তাঁর কাব্য ও গানে ইসলামের পরিভাষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুনিপুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন,

ঐ হের রসূলে-খোদা এলো ঐ॥
কাঁদিয়া কেয়ামতে গুনাহগার সব,
নবীর কাছে শাফায়াতী করিবেন তলব।^{৭৭}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে আমরা বেশ কতগুলো আরবী ভাষার শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি। শব্দগুলো আরবী ভাষার ইসলামি পরিভাষা বিষয়ক। বিশেষ করে ‘কিয়ামত’ শব্দটি উল্লেখযোগ্য। কিয়ামত শব্দটি আরবী ভাষার একটি শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, প্রলয় দিবস ইত্যাদি।^{৭৮}

‘আকাইদ শাস্ত্রে কেয়ামতের দুটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো মহাপ্রলয় বা ধ্বংস দিবস। যেদিন আল্লাহ এ পৃথিবী ধ্বংস করে দিবেন। অপর অর্থটি হলো দাঁড়ানো। পৃথিবী ধ্বংসের বহুদিন পর আল্লাহর নির্দেশে মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে হিসাবের জন্য সমবেত হবেন। ঐ সময়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়ানোকে বলা হয় কিয়ামত।^{৭৯}

কবি নজরুল এই ইসলামী পরিভাষা বিষয়ক শব্দ কিয়ামত ব্যবহার করেছেন বক্ষমান গানে। শব্দটি ব্যবহার করে মানুষের মাঝে কেয়ামতের ধ্বংসের ভয়াবহ চিত্র উল্লেখ করেছেন। আবার বিচার দিবসে আল্লাহর ইচ্ছায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষমান থাকার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মহা প্রলয়ের বিভৎস ক্ষতির ভয়াল থাবা থেকে তিনি আমাদেরকে আত্মরক্ষার বার্তা পৌঁছিয়েছেন গানে উল্লিখিত শব্দের সিঁড়ি দিয়ে।

কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম জাতিকে আত্মিক প্রেরণা ও মানসিক শক্তি যুগিয়েছেন। তাঁর প্রেরণাদায়ী অসংখ্য গান ও কবিতায় স্থান পেয়েছে ইসলামের গৌরবমাখা অতীত-ভবিষ্যৎ। ইসলামের মূল্যবোধ ও বিশ্বনবীর শাস্ত বাণীর মর্মার্থ জাতির সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। মুমূর্ষ মুসলিম সমাজকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন।^{৮০} জাগতিক চাওয়া-পাওয়া থেকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে রয়েছে স্বর্গীয় অনুপম ভালোলাগা। তাঁর দৃশ্যমান চিত্র ফুটে উঠে এই গানের উদ্ধৃতিতে।

মুসাফির! মোছ রে আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপনারে নিয়া
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়েছে আপনি ঝরিয়া।^{৮১}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে আমরা কতিপয় আরবী ভাষার শব্দের সুষম ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকি। বিশেষ করে ‘মুসাফির’ আরবী ভাষার উল্লেখযোগ্য একটি শব্দ। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো সফরকারী, ভ্রমণকারী, যাত্রী, সফররত ইত্যাদি।^{৮২}

কবি নজরুল ইসলাম গানের চরণে মুসাফিরের পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা, প্রিয়জন বিয়োগের অবর্ণনীয় যন্ত্রনা বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম কখনো ঘটে না। বাগানে ফুল ফোটে সুবাস ছড়ানোর জন্য। অতঃপর তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরে আপনি ঝরে যায়। মুসাফির ব্যক্তি স্বজন হারানোর বেদনা যেমন মুছে ফেলে। এরপর আপন সফর অব্যাহত রাখে, ঠিক তেমনি প্রকৃতির উদ্দান-পতনে গন্তব্য ভুলে না গিয়ে যাত্রা রাখবে চির বহমান নদীর মতোই স্থির।

নজরুল ব্যাখাতুর মুসাফিরকে শ্রান্ত দিচ্ছেন ‘বিদায়-বেলায়’ কবিতায়। তিনি এমনি বলেছেন,

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদে না।^{৮৩}

কাজী নজরুল আমাদের জাতীয় কবি, ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা স্বাৰ্ভৌমত্ব রক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লিখেছেন অসংখ্য গান ও কবিতা। তাঁর স্বাধীকার আদায়ে অনলবর্ষী গান ও আবৃত্তি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকেও রীতিমত অবাক করে দেয়। নজরুল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অকুতভয় সৈনিকের মতোই তাঁর লেখনী তথা গান ও কবিতা দিয়ে যুগিয়েছে সীমাহীন প্রেরণা। তিনি কৃষক, শ্রমিক, মজুর, সর্বহারা সকলের জন্য লিখেছেন। কথা বলেছেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে।^{৮৪} দরদ ভরা হৃদয় নিয়ে লিখেছেন মুসলিম গোষ্ঠীর জন্য। তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তিনি বর্ণনা করেছেন গান ও কবিতার মধ্যে দিয়ে।

আবার মহান আল্লাহকে ভুলিয়ে দেওয়ার প্রকাশ্য দুশমন শয়তান সম্পর্কে করেছেন সতর্ক বাণী। শয়তানের ফন্দি-ফিকিরের বর্ণনা খুঁজে পাই এ গানের মাঝে,

যে শয়তানের ফন্দিতে ভাই,

খোদায় ডাকার সময় না পাই

সেই শয়তান যাক দূরে, শুনে তকবীরের আওয়াজ ৷^{৮৫}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে কতিপয় ইসলামী পরিভাষা বিষয়ক শব্দ কবি নজরুল ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে শয়তান শব্দটি উল্লেখযোগ্য। শব্দটি আরবী ভাষার মূল শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো দূরাচারী, দূরাত্মা, দূর্বৃত্ত, ইবলীস, ইত্যাদি।^{৮৬}

ঈমানদার ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করতে চায় শয়তান। তার ঘৃণিত ষড়যন্ত্র মানুষকে বিপদগামিতার দিকে ধাবিত করে। সৃষ্টির আদি থেকে সে মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু। পৃথিবীতে রক্তপাত, হত্যা, সন্ত্রাস, জুলুম ইত্যাদির পিছনে রয়েছে পথভ্রষ্ট শয়তানের গোপন ষড়যন্ত্র। সে মানুষকে মহান আল্লাহ তথা ইসলামী জীবন বিধান থেকে দূরে রাখতে বদ্ধ পরিকর।^{৮৭} মহান আল্লাহ এজন্য তাকে মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন, ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

﴿[এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ৷]﴾^{৮৮}

কবি নজরুল আমাদের নিজস্ব ভাব, ভাষা ও ঐতিহ্য বক্ষে ধারণ করে আছেন। মানবতার দরদী কবি ও সাহসী এক অকুতভয় বীরযোদ্ধা হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন আনন্দ-গৌরব, আবেগ অভীক্ষায় ও অর্ন্তলোকের গভীর সত্যানুসন্ধানী হয়ে।^{৮৯} এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, কাব্যটি তখনই মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়, যখন তাঁর বাণীতন্ত্রীতে অনুরণিত হয়ে ওঠে মহাজাতির মহাবেদনার গান।”

তিনি কবিতা, গানে মুসলমানদের সমাজের দুর্াবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। একদা মুসলিম জাতি শৌর্যে, বীর্যে, জ্ঞান-গরিমায় সারা পৃথিবীতে শির উন্নত করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর বাস্তবিক চিত্র ফুটে ওঠে গানের এই অংশে।

নহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের

শাহাদত ছিল কাম্য মোদের,

ভিখারির সাজে খলিফা যাদের

শাসন করিল আধা জাহান।^{৯০}

উপর্যুক্ত গানের উদ্ধৃতিতে কতিপয় ইসলামী পরিভাষা বিষয়ক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে খলিফা শব্দটি উল্লেখযোগ্য। শব্দটি আরবী ভাষার মূল শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো-

প্রতিনিধিত্ব করা, উরাধিকারী হওয়া, খলিফা হওয়া ইত্যাদি।^{৯১}

ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করায় হলো খলিফার কাজ। খলিফাদের সবাই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, মিত্যচারী ও সত্যপ্রিয়। ভোগ বিলাসিতা তাদেরকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। প্রায় পুরো পৃথিবী শাসিত করেছেন শাহাদতের তামান্না নিয়ে। কাজী নজরুল ইসলাম বক্ষমান প্রবন্ধে ইসলামী পরিভাষার শব্দাবলী ব্যবহার করে ইসলামের গৌরবমাখা ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বিরল ইতিহাস।

৪. উপসংহার

পরিশেষে সব মিলিয়ে বলা যায় যে, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গানে আরবী ভাষার মূল শব্দ যে পরিমাণ ব্যবহার করেছেন, এককভাবে এতো সমৃদ্ধ শব্দ কি আগে, কি পরে আর কোন কবির কাছ থেকে আমরা পাই নি। অবশ্য একথা ঠিক যে, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আজ অবধি বাংলা ভাষাভাষি যতো কবি-সাহিত্যিক এসেছেন তাদের প্রায় অনেকেই কম-বেশি আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে কাজী নজরুল ইসলামের গানে বিদেশী ভাষার যে মূল আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি তা বাংলা সংগীত ও কাব্য ধারাকে করেছে বহুলাংশে সমৃদ্ধ। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যধারাকে অনুসরণ করে কবি জীবনানন্দ দাশ, পল্লী কবি

জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক তাদের কাব্যে ও সংগীতে প্রচুর পরিমাণে মূল আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ মো. ফয়সাল বার্ক, *নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস ও জীবন প্রকৃতি ও চরিত্রায়ণ* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সাইত্রিশতম সংকলন, ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রি.) পৃ. ৭৫।
- ^২ রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি* (কলকাতা: কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৮; মোহাম্মাদ মাহফুজ উল্লাহ, *নজরুল কেন জাতীয় কবি*, 'কাদারী হুশিয়ারী, *নজরুল জন্মশত বার্ষিকী স্মারক ১৯৯৯* (ঢাকা: নজরুল জন্মশত বার্ষিকী স্মারক ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৬৯।
- ^৩ আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল* (কলকাতা: ডিএম লাইব্রেরী, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ৪; অরুণ কুমার বসু, *নজরুল-জীবনী* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২০; ড. অমৃতলাল বাল্লা, *কৃপাণ ও বীণা কাজী নজরুল ইসলাম* (রাজশাহী: ফ্রব সাহিত্য প্রকাশন, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৮৬।
- ^৪ মোবশ্শের আলী, *নজরুল প্রতিভা* (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৫।
- ^৫ আতাউর রহমান, *নজরুল কাব্য সমীক্ষা* (ঢাকা: শুভা প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬; এস. এম. হাবিবুর রহমান, *শিশুদের কবি নজরুল* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৫।
- ^৬ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, অগ্নিবীণা, 'বিদ্রোহী' আব্দুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৭-১০; কাজী নজরুল ইসলাম, *সম্বিতা* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ১১।
- ^৭ ড. বেগম জাহান আরা, *দুখু মিয়া থেকে কাজী নজরুল* (ঢাকা: হাবীব প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২০-২৪।
- ^৮ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২৩২; কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, সম্পাদনা: রশিদুন নবী, অক্টোবর, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৭৭; *নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান*, সম্পাদনা: আবদুল মুকীত চৌধুরী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫৭।
- ^৯ কাজী নজরুল ইসলাম, *সম্বিতা*, পৃ. ১৬৩; <https://bn.wikipedia.org/wiki>।
- ^{১০} শিশুদের কবি নজরুল, এস.এম. হাবিবুর রহমান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৬৪; কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, ৭ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১১৮।
- ^{১১} তদেব; আতাউর রহমান, *নজরুল কাব্য সমীক্ষা*, পৃ. ৬০; নাসির হেলাল, *নজরুল ইসলাম: জীবন ও প্রকাশনা* 'মাসিক অগ্রপথিক' (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৬২।
- ^{১২} করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৮।
- ^{১৩} মোবশ্শের আলী, *নজরুল প্রতিভা* (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৫।
- ^{১৪} ড. মো. হারুন-অর-রশীদ, *শিল্পিত নজরুল অন্তর্বেষিত অপচয়* (ঢাকা: অ, আ, প্রকাশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯।
- ^{১৫} কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২১৫।
- ^{১৬} সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৫৫।
- ^{১৭} আতাউর রহমান, *নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৪।
- ^{১৮} কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পৃ. ১৭৯; *নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান*, সম্পাদনা: আব্দুল মুকিত চৌধুরী (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২৭।
- ^{১৯} ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১১০; সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৫৫।
- ^{২০} কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পৃ. ৯৯।
- ^{২১} ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, পৃ. ৫৩৭।
- ^{২২} সূরাহ বুরজ: ১৪।
- ^{২৩} *নজরুল ইসলাম ও জসীম উদ্দীন*, সম্পাদনা: আব্দুর মান্নান সৈয়দ (ঢাকা: কবি নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৩২।
- ^{২৪} কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।
- ^{২৫} ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৯০৩।
- ^{২৬} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *আস-সীরাতুল নববীয়া সা*. (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২০।
- ^{২৭} সূরাহ আল-আহযাব: ৪০।
- ^{২৮} আতাউর রহমান, *নজরুল ইসলাম*, পৃ. ৫৫।

- ২৯ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।
- ৩০ আবু তাহের মিসবাহ, *আল-মানার আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান* (ঢাকা: মোহাম্মদ লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২২৩।
- ৩১ *ইসলামের ইতিহাস*, সম্পাদনা: অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ নুরুল করিম ও মুহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ (ঢাকা: বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১২.১৩।
- ৩২ ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলাম পরিচিতি* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫৬।
- ৩৩ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৩২।
- ৩৪ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, পৃ. ৭৭২।
- ৩৫ সূরাহ আলে ইমরান: ১১২।
- ৩৬ কৃপাণ ও বীণা কাজী নজরুল ইসলাম, সম্পাদক ড. অমৃতলাল বাল্লা (ঢাকা: ফ্রুভ সাহিত্য প্রকাশন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৯০।
- ৩৭ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা, রশিদুন নবী, পৃ. ২; আব্দুল মুকীত চৌধুরী, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান*, পৃ. ৪১।
- ৩৮ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৬২।
- ৩৯ <https://bn.wikipedia.org/wiki>।
- ৪০ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, পৃ. ৭৪৩।
- ৪১ মোস্তাক আহমাদ, *নজরুল কাব্য প্রবন্ধে সাম্যবাদ ও সুফিরহস্য* (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১০২।
- ৪২ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।
- ৪৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, পৃ. ৫৯৫।
- ৪৪ ড. রিটা আশরাফ, *নজরুল সাহিত্যে তৎকালীন বিশ্ব* (ঢাকা: কালি কলম প্রকাশনা, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২১৪।
- ৪৫ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৪৭৪; সজারু তীক্ষ্ণ দত্ত বিশিষ্ট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী হিসেবে হিস্ট্রিসিডে পরিবার ভুক্ত সদস্য। সজারুকে দেখা যায়। কখনো কখনো এটাকে তীক্ষ্ণ দত্তবিশিষ্ট ইঁদুর হিসেবে গণ্য করা হয়। তাছাড়া বণাঞ্চলে দেশী সজারু দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই এর দেখা মেলে। পহাড় পর্বত উষ্ণমণ্ডলীয় ও নাতিবীতোষ মণ্ডলীয় এলাকার সমতল ভূমিতে ও বনাঞ্চলে দেখা যায়।
- ৪৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫৮১।
- ৪৭ <https://bn.wikipedia.org/wiki>।
- ৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা: বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১২৫।
- ৪৯ ড. মাফরুহা হোসেন সৈজুতি, *নজরুল সংগীতে মিথ*, প্রবন্ধ (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সম্পাদক: রশীদ হায়দার, ৩০ তম সংখ্যা, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৯৮-৯৯।)
- ৫০ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পৃ. ৮৮০; মো: জেহাদ উদ্দীন, *নিখিলের চির সুন্দর মুহাম্মদ সা.* (ঢাকা: বাঙলা কথা, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৪৮।
- ৫১ <https://bn.wikipedia.org/wiki>।
- ৫২ *Ibid.*
- ৫৩ ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুতবাতুল ইসলাম* (বিনাইদহ: আস্ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪-৩৫।
- ৫৪ সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১: ৫৬।
- ৫৫ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, সম্পাদনা: ডক্টর মো: আখতারুজ্জামান (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯৭।
- ৫৬ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা: রশিদুন নবী, পৃ. ৯৩।
- ৫৭ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-ক্বামুসুল ওয়াজীয* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮৩০।
- ৫৮ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: হাদীস একাডেমি, ২০০২ খ্রি.), হাদীস নং-৪২৮, পৃ. ২২৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদীস নং- ৪৩১, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং- ৪৪৭।
- ৫৯ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮১।
- ৬০ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা: রশিদুন নবী, পৃ. ৯৩; আবদুল মুকীত চৌধুরী, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান*, পৃ. ৮৩।
- ৬১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ১১৩৩।
- ৬২ সূরাহ লুকমান: ১৩।
- ৬৩ মাহমুদ নূরুল হুদা, *চিরঞ্জীব নজরুল* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৫৮; নাসির হেলাল, “নজরুল সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ সা.”, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৫৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ১৬৬।
- ৬৪ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা: রশিদুন নবী, পৃ. ১২৬।
- ৬৫ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৩৪৫।

- ৬৬ ড. মো: ইব্রাহীম খলিল, *ইসলাম পরিচিতি* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৯১।
- ৬৭ সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৫২।
- ৬৮ সৌমিত্র শেখর, *নজরুল আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি এবং শিল্পীর বোধ* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২০।
- ৬৯ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা: রশিদুন্ নবী, পৃ. ১২৮।
- ৭০ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, পৃ. ৩৪৬।
- ৭১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৭৬০।
- ৭২ <https://bn.wikipedia.org/wiki>.
- ৭৩ বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ৭ম খণ্ড, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৮।
- ৭৪ কামরুল আহসান, *নানা ভাবনায় নজরুল* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংখ্যা), পৃ. ৫৩।
- ৭৫ শাহাবুদ্দীন আহমদ, *শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ১২৫-১২৭।
- ৭৬ গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রনকান্ত, নজরুল-জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩৯৮; <https://bn.wikipedia.org/wiki>.
- ৭৭ কাজী নজরুল ইসলাম, জুলফিকার, ২য় খণ্ড, গান নং- ৪৯, পৃ. ৪৮; কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা, রশিদুন্ নবী, পৃ. ৪৫।
- ৭৮ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, পৃ. ৫৯৫।
- ৭৯ ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুতবাতুল ইসলাম* (বিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৮২।
- ৮০ মোস্তাক আহমাদ, *নজরুল কাব্য প্রবন্ধে সাম্যবাদ ও সুফিরহস্য* (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৭৯।
- ৮১ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা রশিদুন্ নবী, পৃ. ৫৯।
- ৮২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৯৩৪।
- ৮৩ কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিত*, পৃ. ৪৫; কাজী নজরুল ইসলাম, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সম্পাদনা: বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৫।
- ৮৪ এস.এম, হাবিবুর রহমান, *শিশুদের কবি নজরুল*, পৃ. ৫০-৫১।
- ৮৫ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা রশিদুন্ নবী, পৃ. ৯৩; আবদুল মুকীত চৌধুরী, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান*, পৃ. ৫৭।
- ৮৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫১৪।
- ৮৭ আল্লামা ইবনুল জাওয়ী রহ., *নেক সুরতে শয়তানের ধোকা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: আল-আরব প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১১।
- ৮৮ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২০৮।
- ৮৯ পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা* (ঢাকা: অনন্য প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১২১।
- ৯০ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা: রশিদুন্ নবী, পৃ. ৪৮৮; আবদুল মুকীত চৌধুরী, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান*, পৃ. ৬১।
- ৯১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, পৃ. ৩২১; আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান* (ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৮৪।

আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী-পুরুষ সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা [Man-Woman Relationship in the Light of al-Quran and al-Hadith: An Overview]

ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম^{১*}

[Abstract: Men and Women have equal contribution in the development of human civilization. Society, civilization and culture have been developed through the combined efforts of both. Allah Ta'ala created both to complement each other. So they are the perfect companion forever. There is no difference between them as created beings. Rather, both have their proper status and rights in their respective places. However, just as women are dependent on men, so men are dependent on women. Their interdependence, familial, social and psychological equality pervade in all spheres of human life. That is why there has been a deep relationship between the two since the beginning of creation. However, due to some fundamental differences and opposite characteristics, Islam has defined the boundaries of legal validity and illegality in this relationship. If the prescribed boundaries of the relationship between men-women are not fully followed in the present age, then the human society will become mentally exhausted despite having thousands of means of abundance and comfort. Therefore, in order to overcome this situation, the need to determine the right place of men and women in the society and the right form of their mutual relationship are felt today. As the issues are very important, an attempt has been made to discuss the nature and form of man-woman relationship in the light of al-Quran in the discussion section.]

Keywords: Man-Woman Relationship, Light of al-Quran, al-Hadith: An Overview.

১. ভূমিকা

মানব সভ্যতার উন্নয়নে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক শরীরের এক অঙ্গের সাথে অন্য অঙ্গের সম্পর্কের মত। কোন একটি অঙ্গ বিনষ্ট হলে বা ভেঙ্গে গেলে শরীর যেমন প্রতিবন্ধী হয়ে যায়, তেমনি সমাজে নারী-পুরুষের ন্যায্য-সঙ্গত অবস্থান না থাকলে সে সমাজও প্রতিবন্ধী হতে বাধ্য। এমন কোন সমাজের কল্পনাও করা যায় না, যা শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারী দ্বারা গঠিত হতে পারে। অতএব সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের চাহিদা হলো নারী ও পুরুষ স্ব স্ব অবস্থান থেকে পরস্পরের সহযোগী হয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর এর মাধ্যমেই কাজিত সাফল্য অর্জিত হবে।

মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এবং ঘৃণা-উপেক্ষার দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তারা কারো জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত; আবার কারো নাম শুনলেই ঘৃণায় আত্মকে ওঠে। নারী-পুরুষের কেউই স্বভাবসম্মত এ গুণ-বৈশিষ্ট্যের বাইরে নয়। পুরুষ নারীকে নিয়ে ঘর বাঁধে, বাইরে শ্রম দেয়, আর নারী এক্ষেত্রে পুরুষের গড়া সে ঘর আগলে রাখে পরম মমতায়। এটা শুধুমাত্র পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা ও গভীর সম্পর্কের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। পরে এ গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসার নিদর্শন একসময় ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। প্রত্যেকটি সন্তান তা হোক পুত্র কিংবা কন্যা পিতা-মাতার কাছে ফুলের মতই সুন্দর, সুরভিত, প্রিয় ও চক্ষুশীতলকারী। এরপর সন্তান যখন বড় হতে থাকে ভালবাসার বলয়ও তত বর্ধিত হতে থাকে। এভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। জন্মগতভাবে বাবা-মা, দাদা-দাদি, পরদাদা-পরদাদি, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রি, প্রপৌত্র-প্রপৌত্রি, নানা-নানি, পরনানা-পরনানি, খালা-খালু, ফুফু-

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

ফূফা, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগ্নে-ভাগ্নি, মামা-মামি, চাচা-চাচি ইত্যাদি আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিবাহের মাধ্যমে শ্বশুর-শাশুড়ী, দাদাশ্বশুর-দাদাশাশুড়ী, নানাশ্বশুর-নানাশাশুড়ী ইত্যাদি সম্পর্ক তৈরি হয়। আবার শিশু অবস্থায় দুধপানের মাধ্যমে শিশুর দুধ-মা ও তার আত্মীয়দের সাথে একটা সম্পর্কের জগত তৈরি হয়। এ ধরনের সম্পর্কের বাইরেও মানব-মানবীর মধ্যে এক ধরনের আবেগীয় বিবেক বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়, যার কোন বৈধতা ইসলামে নেই। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও তার সীমারেখা বিষয়ে নতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. নারী-পুরুষের বিভিন্ন সম্পর্ক

মূলত: নারী-পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। এর মধ্যে কতিপয় সম্পর্ক ইসলামে অনুমোদিত এবং কতিপয় সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। সার্বিক বিবেচনায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত: সাধারণ মানবিক সম্পর্ক; দ্বিতীয়ত: বৈধ সম্পর্ক; তৃতীয়ত: অবৈধ সম্পর্ক।

২.১ সাধারণ মানবিক সম্পর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ হচ্ছে একই সত্ত্বার দু'টি রূপ। এ উভয় সত্ত্বাকে পরস্পর মিলিয়ে রাখার জন্য ইসলাম মানুষ হিসেবে যে সাধারণ সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করেছে তা-ই সাধারণ মানবিক সম্পর্ক। তাই এ সম্পর্ক রক্তধারা কিংবা বিবাহজনিত বা দুগ্ধপান জনিত সম্পর্কের বাইরের সম্পর্ক। সাধারণ মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক এখানে তাকেই বুঝানো হয়। যে সম্পর্কের কারণে কোন মানুষ বিপদগ্রস্থ হলে অন্য মানুষের অন্তরে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমবেদনা ও মর্মপীড়া অনুভূত হয় তাই মানবিক সম্পর্ক। সভ্যতার ক্রান্তিকালে অতীতে ধর্মভিত্তিক কিংবা ধর্মহীন অনেক সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক মুনিব-ক্ৰীতদাসী বা তার চেয়েও নীচে নেমে গিয়েছিল। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে ইতিহাসের কোন কোন সময়ে নারীদের মর্যাদা একেবারেই নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তারা আত্মাহীন নাকি পুরুষের মতই আত্মসম্বলিত মানুষ তা নিয়ে ঢের বিতর্ক হয়েছে। নারী পুরুষের মত উপাসনা করতে পারবে কিনা? তারা পুরুষের ন্যায় পরকালীন জীবনে প্রবেশ করবে কিনা? এ বিষয়গুলো ছিল ধূয়াশা ও নানা দ্বিধাদন্দে জড়িত। তবে একটি বিষয়ে অধিকাংশের অভিমত ছিল যে, নারীও মানুষ; তবে পুরুষের মত পূত-পবিত্র-পূর্ণ মানুষ নয়। তাদেরকে শুধুমাত্র পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জননের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এ ধরনের আরও অনেক অযৌক্তিক ও নীচু মানসিকতার শিকারে পরিণত হয়েছিল প্রাচীন পৃথিবীর নারী সম্প্রদায়। সে যুগে নারীর জন্মই ছিল যেন, আজন্ম অপরাধ ও অভিশাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী না ছিল তার পিতার কাছে স্নেহের, না ছিল আপন ভাই কিংবা স্বামীর কাছে ভালবাসার পাত্র। না তার সন্তানের কাছে ছিল সম্মানের; বরং সকলের কাছে ছিল চরম উপেক্ষার পাত্রী। অন্যদের কাছে যৌনক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম ও যৌন লালসার উপজীব্য মাত্র; অবজ্ঞা, অনাদর, অবহেলা, নির্যাতন ও নিপীড়ন ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। এ ধরনের অমানবিক ও অযৌক্তিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ যখন চরম সীমায় পৌঁছে তখনই নির্যাতিত নারী সমাজের চিরমুক্তির বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে ইসলামের শুভাগমন ঘটে।^১

এক. মুমিন নারী-পুরুষ একে অপরের সঙ্গী ও অভিভাবক

ইসলামই প্রথম নারীজাতিকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। পুরুষের সাথে নারীর ভালবাসার ও মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। নির্ধারণ করে তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা করে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার। পুরুষের পাশাপাশি নারীকে যুগোপযোগী অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা হয়। পুরুষজাতি কর্তৃক নারীজাতির উপর হাজার হাজার বছরের শাসন-শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন, অবিচার ও অধীনতার নির্মম নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের এসব ঘোষণা ও ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। ইসলাম নারীদেরকে পূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয় সহস্র বছরের নিষ্ঠুর শোষণের নাগপাশ থেকে স্বাধীন করে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম নারীকে সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশীদার গণ্য করে তার উপর সমাজ বিনির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তবে তাদের পরস্পরের কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা পালনের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে

কিছুটা অগ্রাধিকার; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে একটু বেশি অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে কাউকে খাট বা হ্রাস করে দেখা হয়নি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হলো, নারী ও পুরুষের ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক পুনর্বহালের সাথে সাথে তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ভারসাম্যপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।^২ এ ভারসাম্যতা শুধু মুখের বুলিতে নয় বরং ইসলামের সংবিধানে অর্থাৎ আল-কুরআনেও বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এভাবে বলা হয়েছে যে, মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ একে অপরের বন্ধু। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।”^৩

দুই. সকল নারী-পুরুষ একই সত্ত্বা হতে সৃষ্ট

আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষকে একই সত্ত্বা হতে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রথম মানব আদমকে আ. সৃষ্টি করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে খিলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ “আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে চাই।”^৪

মূলত: সে প্রতিনিধিত্বের ধারণাই হলো, পৃথিবীতে আজকের মানব সম্প্রদায়। মানবজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম একজন পুরুষ সৃষ্টি করলেন। তিনি হলেন মানব জাতির আদিপিতা আদম আ.। এরপর আদম আ. এর পাজর থেকে তার সঙ্গিনী হিসেবে এক নারীকে সৃষ্টি করেন। তিনি হলেন মানবজাতির আদিমাতা হাওয়া আ.। এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا

“আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাজরের একটি হাড় দিয়ে। সে তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে উপকৃত হতে চাও তবে তার বক্রতা অবশিষ্ট রেখেই তাকে দিয়ে উপকৃত হতে হবে। আর যদি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হলো তাকে তুলাক দেওয়া।”^৫

পরবর্তীতে এ দম্পতি হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ জন্ম লাভ করে। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে বসতি গড়ে তোলে। এভাবে তাদের মাধ্যমেই মানবজাতির বংশ বৃদ্ধি শুরু হয়ে যায়। এ দিকেই ইঙ্গিত করেই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে হক আদায় করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।”^৬

অত্র আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গোটা বিশ্বের সব মানুষ একটি মাত্র মানব সত্ত্বা তথা আদম আ. থেকে সৃষ্টি। নারী-পুরুষ মানবতার একটি উৎস থেকে উৎসারিত দু'টি গতিধারা। নারী কোন স্বতন্ত্র জীবসত্ত্বা নয়। আর পুরুষও নয় ভিন্ন কোন কিছু।

২.২ সৃষ্টিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সকলেই ভাই-বোন

পৃথিবীর সকল মানুষ আদি পিতা-মাতা আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর সন্তান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পর ভাই-বোন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

‘হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।’^৭

উল্লেখিত আয়াতে বিশ্বমানবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ একজন পিতা ও একজন মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তাই সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণে বলা যায় যে, পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষ পরস্পর ভাই-বোন। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষ একই আদি পিতা-মাতার সন্তান। এ সূত্রে বলা যায় যে, দুনিয়ার সকল মানুষ পরস্পর ভাই-বোনের মতই। এ স্থানে ধর্মীয় সীমারেখা টেনে কাউকে পৃথক করা হয়নি। এ মর্মে আল-কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

“তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চারণ করে দিয়েছেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।”^৮

উল্লেখিত আয়াতে পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া আল্লাহ তা‘আলার অশেষ নে‘আমতের একটি; একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। মহানবী সা.-এর হাদীসেও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে।^৯

উপরে বর্ণিত আয়াতদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বলতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। সাথে সাথে ভ্রাতৃত্ব বলতে পুরুষ পুরুষের সাথে যেমন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তেমনি পুরুষের সাথে নারীর ভাই-বোনের সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণে নারী-পুরুষ উভয়কেই পিতা-মাতার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।^{১০} ইসলামের দৃষ্টিতে এদের কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়। কারও মর্যাদা কারও থেকে কম বা বেশি নয়। উভয়ে মানবিক দৃষ্টিকোণে সমানভাবে একে অন্যের সাথে সমানভাবে সম্পৃক্ত।

২.৩ পৃথিবীর সকল মানুষ এক ও অভিন্ন

মানুষ হিসাবে পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষ একই মর্যাদা ও মানের। সকলের মৌলিক কর্তব্য ও চাহিদা এক ও অভিন্ন। সকলের জন্যে একই নির্দেশ ও বিধান প্রযোজ্য।^{১১} সকলেরই মান-সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া বা খোদা-ভীতি। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

“হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেযগার।”^{১২}

এ সম্পর্কে মহানবী সা. এরশাদ করেন, “النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ” “মানবজাতি আদম হতে আর আদম মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছে।”^{১৩} এ সম্পর্কে মহানবী সা. আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ , وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ , كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ , وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ , أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক এক এবং নিশ্চয়ই তোমাদের পিতাও একজন। তোমরা সকলেই আদম হতে আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সন্মানিত সে-ই যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু।”^{১৪}

২.৪ নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল চেষ্টা-সাধনা ও উত্থান-পতনে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে যুগ যুগ ধরে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছে। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই সমাজ, সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সৃষ্টির উষালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, এর প্রচার ও প্রসারে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক ও বন্ধুপ্রতিম হিসাবে কাজ করে এসেছে। এ মহাসত্যটি পরিস্ফুটিত হয়েছে আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত আয়াতে,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“ঈমানদার নারী ও পুরুষ একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা’আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল সুকৌশলী।”^{১৫} উল্লেখিত আয়াত পর্যালোচনায় বলা যায় যে, নারী ও পুরুষ যেন একটি বৃক্ষের দুটি শাখা। ভাল-মন্দ ও নায়-অন্যায় কাজে এরা একে অপরের পরিপূরক এবং পরস্পরের সহযোগী।

৩. নারী-পুরুষ বৈধ সম্পর্ক

পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক চিরন্তন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের সাথে অন্য যে-কোন একজন মানুষ, সে যত দূরেরই হোক না কেন উর্ধ্বতন কোন এক স্তরে গিয়ে সম্পর্ক মিলেই যাবে।^{১৬} বলা যায় এ সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক। এ জন্যই আল্লাহ তা’আলা আল-কুরআনে মানুষকে আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। এর সাথে মহানবী সা.ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতি হিসেবে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

“আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঁওনা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।”^{১৭} এ সম্পর্কে মহানবী সা. জোরালোভাবে ঘোষণা করেন,

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ

“জুবায়র ইবন মুত’ইম রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল সা. বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”^{১৮}

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক রক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা সর্বোত্তম উপায়ে রক্ষা করতে হবে। তবে এ সম্পর্কের মধ্যে বৈধবৈধের বিভিন্ন সীমা ও পরিসীমা রয়েছে। বৈধ সম্পর্ক বলতে নারী-পুরুষের এমন সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে যেখানে তাদের মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ এবং তাদের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইসলাম স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। মূলত: আল-কুরআন, হাদীস, অন্যান্য ইসলামি গ্রন্থ বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এবং এ বিষয়ের অভিজ্ঞ জ্ঞানতাপসদের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় নারী-পুরুষের মধ্যে তিন ধরনের বৈধ সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ :

ক. ঔরসজাত (পারিবারিক ও বংশগত) সম্পর্ক

খ. বৈবাহিক সম্পর্ক

গ. দুধপানজনিত সম্পর্ক।

উল্লেখিত তিনটি প্রকরণের ক্ষেত্রে আল-কুরআন, আল-হাদীস ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে আল-কুরআনে নিম্নরূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾

“তিনিই মানুষকেই পানি হতে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এবং তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।”^{২৯} অত্র আয়াতের মাধ্যমে প্রথমোক্ত দু’প্রকারের ভিত্তি প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া নিম্নে বর্ণিত আয়াতের অংশবিশেষ ও হাদীসের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের সাথে সাথে তৃতীয় প্রকরণও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الرُّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلِيلٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতৃকন্যা; ভগিনী কন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।”^{৩০} উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ‘দুধ মাতা’ ‘দুধ বোন’ শব্দগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা দুধপানজনিত সম্পর্কে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

তৃতীয়ত : হাদীসে এ সম্পর্কে মহানবী সা. এরশাদ করেন, الْوَلَادَةُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ: يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ
“আয়িশা রা. বলেন, জন্মসূত্রে যারা হারাম, দুধ সম্পর্কেও তারা হারাম।”^{৩১}

বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুধ পানজনিত সম্পর্ক ঔরসজাত সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই ঔরসজাত সম্পর্কের মাধ্যমে যা প্রমাণিত হবে দুধপানজনিত সম্পর্কেও তাই প্রমাণিত হবে।

৩.১ ঔরসজাত বা বংশগত সম্পর্ক

ঔরস শব্দটি বিশেষ্যবাচক বা নামপদ: শাব্দিক অর্থ বীর্য। ঔরস থেকে ঔরসজাত বিশেষণবাচক পদ; অর্থ স্ত্রীয় বীর্যে স্ত্রীর গর্ভজাত।^{৩২} জাত অর্থ জন্মেছে এমন কিছু; উৎপন্ন, সঞ্জাত, উদ্ভূত ইত্যাদি।^{৩৩} তাহলে ঔরসজাত অর্থ দাঁড়ায়, আপন বীর্যে নিজ স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছে এমন। সে ছেলে হতে পারে, মেয়ে হতে পারে, এমনকি উভয়লিঙ্গ বা হিজড়াও হতে পারে। এদের সকলের সাথেই রয়েছে ঔরসজাত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক সৃষ্টিগত সম্পর্ক। মূলত: ঔরসজাত শব্দের আরবী প্রতিশব্দ النسب এর পরিচয় প্রদানে বিখ্যাত ভাষা বিশারদ ইবনুল ‘আরাবী বলেন, النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر الأنثى على وجه الشرع, ‘আরাবী বলেন, ‘আরাবী-স্ত্রী দু’জনের পানির মিশ্রণ-ই হলো ঔরস।”^{৩৪} আর এ ঔরস এর মাধ্যমে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তা-ই ঔরসজাত বা বংশগত সম্পর্ক। ‘আল্লামা ইবন ‘আতিয়া বলেন,

النسب هو أن يجتمع أنسان مع آخر في أب أو في أم قرب ذلك أو بعد

“ঔরস হলো একজন মানুষ অন্যের সাথে পৈত্রিক বা মাতৃক সূত্রে একত্রিত হওয়া; হতে পারে তা নিকটবর্তী সম্পর্ক হোক বা দূরবর্তী সম্পর্ক।”^{৩৫} ঔরসজাত সম্পর্ক বা রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মহানবী সা. এরশাদ করেন, “عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطع الله الله
“আয়িশা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সা. এরশাদ করেন, ‘রাহম’ অর্থাৎ আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সাথে বুলন্ত রয়েছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।”^{৩৬}

যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ এ ধরনের ঔরসজাত বা রক্তের সম্পর্ক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাত প্রকারের হতে পারে। যথা: মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, ভাই-বোন, ফুফু-ভতিজা, খালা-ভাগ্নে, চাচা-ভাইবি, মামা-বোনবি। এদের কারোর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইসলামী শরী'আত সম্মত নয়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

৩.২ মা-ছেলে সম্পর্ক

মা-ছেলে সম্পর্ক পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম সম্পর্ক। এখানে মা-বলতে শুধু মা নয় বরং তার সাথে বাবার মা বা দাদী, একইভাবে মায়ের মা বা নানী, দাদা বা দাদীর মা তথা পরদাদী, নানা বা নানীর মা তথা পরনানী, এভাবে যত উর্ধ্বেই যাক, সকলেই মায়ের পর্যায়ভুক্ত।^{২৭} অন্যদিকে আবার ছেলে বলতে শুধু ছেলে নয় বরং ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে তথা পৌত্র, তাদের ছেলে প্রপৌত্র এভাবে যত নিম্নেই যাক, সকল ছেলেই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এদের সকলের সাথে রয়েছে রক্তের সম্পর্ক, আর এটাই হচ্ছে ঔরসজাত সম্পর্ক। সাথে সাথে এ সম্পর্কটি অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানজনক সম্পর্ক।

মূলত: মা ও ছেলের সম্পর্কটি এমন যে, তাঁর দিকে তাকানো নিষেধ তো নয়ই বরং সন্তান যদি মায়ের দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেজন্যে পুরস্কার দিবেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَتِهِ نَظْرَةً رَحْمَةً إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ "، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ "

“আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. এরশাদ করেন, কোন নেক সন্তান তার মায়ের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকালে আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মাবরুর হজ্জের সওয়াব প্রদান করে থাকেন। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরামগণ) জিজ্ঞাসা করলেন: প্রতি দিন যদি সন্তান তার দিকে শতবার তাকায়? রাসূল সা. বললেন: হাঁ! যদি শতবারও তাকায়। আল্লাহ মহান ও অতি পবিত্র।”^{২৮}

৩.৩ বাবা-মেয়ে সম্পর্ক

বাবা সাথে মেয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও পবিত্র। এখানে মেয়ে বলতে শুধু মেয়ে নয় বরং তার সাথে মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে তথা পৌত্রী, তাদের মেয়ে তথা প্রপৌত্রী, এভাবে যত নিম্নে যেতে পারে। একইভাবে বাবা বলতে শুধু বাবা বোঝাবে না, বরং বাবার বাবা দাদা, মায়ের বাবা নানা এভাবে যত উর্ধ্বে যাক সকলেই বাবার পর্যায়ভুক্ত। আর এদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাও ঔরসজাত সম্পর্ক। শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও হৃদয়তার সম্পর্ক এদের সকলের মধ্যে বিদ্যমান।

শুধু এতটুকুই নয় আল্লাহ তা'আলা এতদুভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও দায়িত্বশীলতার বন্ধন এভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, মেয়েকে উত্তমভাবে লালন-পালনের প্রতিদানে বাবার জন্য পরকালে জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী সা. এরশাদ করেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْدُهَا، وَلَمْ يُهْنِهَا، وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: يَغْنِي الدُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

“কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয় এবং তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”^{২৯}

৩.৪ ভাই-বোন সম্পর্ক

পৃথিবীতে ভাই ও বোনের মধ্যে সবচাইতে গভীর ভালবাসা-আন্তরিকতার সম্পর্ক থাকে। ভাই-বোন সম্পর্ক তিন প্রকারের হতে পারে। যথা: সহোদর-সহোদরা, বৈমাত্রেয়-বৈমাত্রেয়ী, বৈপিত্রেয়-বৈপিত্রেয়ী। এ তিন প্রকার ভাই-বোনের পুত্র ও কন্যাগণ যত নিম্নে যাক, তা ভাই বোনের সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্যে মাহরাম তথা বিবাহ নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

أَخَوَاتُكُمْ - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের ভগ্নী।”^{৩০}

শুধু তাই নয় মহানবী সা. এতদুভয়ের মধ্যেও ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী সা. ঘোষণা করেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

“যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্ক আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।”^{৩১}

৩.৫ ফুফু-ভাতিজা সম্পর্ক

পিতার সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন, বৈপিত্রের বোন, এভাবে বাপ-দাদা যত উর্ধ্বেরই হোক এদের সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী, বৈপিত্রের, সকলেই ফুফুর পর্যায়ভুক্ত। এমনিভাবে সহোদর ভাইয়ের পুত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, বৈপিত্রের ভাইয়ের পুত্র, এ তিন প্রকার ভাইয়ের পৌত্র, তাদের প্রপৌত্র এভাবে যত উর্ধ্ব হোক সকলের সাথে ফুফু-ভাতিজা সম্পর্কের পর্যায়ে যাবে। এদের মধ্যেও বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে হারাম। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ عَمَّاكُمْ﴾ “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের ফুফুদেরকে।”^{৩২}

৩.৬ খালা-বোনপো সম্পর্ক

মায়ের সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রের বোন এভাবে মা-নানী ও তদুর্ধ্ব বংশ পর্যন্ত সকলেরই উক্ত তিন প্রকার বোন-খালার পর্যায়ভুক্ত। এমনিভাবে সহোদরা অথবা বৈপিত্রের কিংবা বৈমাত্রেয় বোনের পুত্র, পুত্রের পুত্র তথা পৌত্র, পৌত্রের পুত্র তথা প্রপৌত্র এভাবে যত নিম্নে হোক সকলেই বোনপো পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। এদের মধ্যেও বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে হারাম। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿حُرِّمَتْ﴾ “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের খালাদেরকে।”^{৩৩}

৩.৭ চাচা-ভাইঝি সম্পর্ক

সহোদর ভাই, বৈপিত্রের ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এ তিন প্রকার ভাইয়ের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে-এভাবে যত নিম্নে পর্যায়ের হোক, সকলেই ভাইঝি এর পর্যায়ভুক্ত। এমনিভাবে বাবার উক্ত তিন প্রকারের ভাই, একইভাবে দাদার উক্ত তিন প্রকারের ভাই এবং এভাবে যত উর্ধ্ব যাক সকলেই চাচার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ চাচা-ভাইঝি সম্পর্কও পবিত্র ঔরসজাত ও বংশগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণে এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে অবৈধ। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ بَنَاتُ الْأَخِ﴾ “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের ভ্রাতৃপুত্রীদেরকে।”^{৩৪} মূলত: চাচা বাবার সমতুল্য। চাচা ভাতিজা-ভাতিজীদের নিকট বাবার মতই শ্রদ্ধেয়। নিজ চাচা ‘আব্বাস রা. সম্পর্কে ‘উমার রা. কে উদ্দেশ্য করে মহানবী সা. বলেন, أَمَا شَعَرْتُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوهُ, وَمِثْلُهَا مَعَهَا «تَمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوهُ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا» “আর ‘আব্বাস রা. তো আমারই এবং তার সাথে অনুরূপ। অত:পর রাসূল সা. বললেন, হে ‘উমার! তুমি কি জাননা? কোন পুরুষের চাচা তার পিতৃতুল্য?”^{৩৫}

৩.৮ মামা-বোনঝি সম্পর্ক

উপরে বর্ণিত তিন প্রকার বোনের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, এভাবে যত নিম্নের দিকে যাক সকলেই বোনঝি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে উক্ত তিন প্রকার ভাইয়ের ছেলে, তাদের ছেলের ছেলে এভাবে যত উর্ধ্ব যাক না কেন সকলেই মামা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। এদের সকলের সাথে পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। আল-কুরআনে এসেছে ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ بَنَاتُ الْأَخِ﴾ “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের ভাগিনেয়ীদেরকে।”^{৩৬}

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সন্তানদের করণীয় তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার ও আচরণ করা। মায়ের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে মামা সবচেয়ে কাছের মানুষ। মামার সাথে বোনঝিদের দেখা সাক্ষাৎ বৈধ; বরং এদের সাথে পর্দা করা ফরজ নয়। মামা শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দু’টি মা শব্দ পাওয়া যায়। তাই মামা সম্পর্কটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। মামার মর্যাদা এমনই যে কোনো কোনো অবস্থায় ভাগ্নে-ভাগ্নেয়ীদের সম্পর্কেও তাদের উত্তরাধিকার করার বিধান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী সা. ঘোষণা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

“‘আয়িশা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, যার কোন ওয়ারিশ নাই, মামাই তার ওয়ারিশ।”^{৩৭} অর্থাৎ যে মৃতব্যক্তির কোন যাবিল ফুরুয বা আসাবা^{৩৮} উত্তরাধিকারী থাকবে না তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে তার মামা।

৩.৯ বৈবাহিক সম্পর্ক

মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন হচ্ছে পরিবার। পরিবার গঠনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে বিবাহ। বিবাহ মানব জীবনের অর্থবহ একটি সামাজিক সংগঠন। ইসলামে নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে আল-কুরআনে বর্ণিত মাহরাম নারী, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক ও আহলে কিতাব দাসী ব্যতীত অন্য নারীকে সম্বোগ বৈধ করার বন্ধনই হচ্ছে বিবাহ। নারী-পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেটাই হচ্ছে বিবাহ।^{৩৯} বিবাহের মাধ্যমে জ্ঞান, বিবেক, শরী‘আত ও মানব প্রকৃতির চাহিদা পূরণের সকল দিক ও বিভাগের চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়। এটা অন্য কোন মতাদর্শে সাধারণত: পরিলক্ষিত হয় না। বিবাহ ব্যতীত এ ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা অন্য কোন পন্থায় পূরণ করতে গেলে সমাজে অনাচার, অশ্লীলতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য বিবাহের কোন বিকল্প নেই। আর বিবাহের মাধ্যমে যে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা-ই বৈবাহিক সম্পর্ক। মূলত: যে সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামীর সাথে স্ত্রী এবং উভয়ের আত্মীয়-স্বজনদের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাই বৈবাহিক সম্পর্ক।^{৪০}

৩.১০ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

ইসলাম দু’জন নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে এমন এক বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, কিছুক্ষণ পূর্বে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ ছিল তারা এখন পরস্পরের ইজ্জত-আবরূর জিম্মাদার। এখন তাদের পরিচয় তারা স্বামী-স্ত্রী। তাদের মধ্যে এমন হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, যেমন হয়ে থাকে শরীর ও পরিধেয় পোষাকের মধ্যে। তারা দু’জন মিলে এমন ঘনিষ্ঠ অবস্থান করতে পারবে যে, যত কাছাকাছি অবস্থান হয় পোষাকের সাথে পোষাক পরিধানকারীর। আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা স্বামী-স্ত্রী দু’জনকে একে অপরের পোষাকতূল্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন, আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾^{৪১} “তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।”^{৪২}

পরিচ্ছদ বা লেবাস এর ব্যাখ্যায় আল্লামা রাগেব আল-ইস্পাহানী বলেন, “এখানে পরিচ্ছদ বা লেবাস বলতে স্ত্রীর জন্যকে স্বামীকে এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ধারণা করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একে অপরের জন্যে পোষাকতূল্য। এরা কেউই কারো দোষ প্রকাশ করে না। যেমন, পোষাক স্বামী-স্ত্রী কারও গোপন অঙ্গ প্রকাশ হতে দেয় না।”^{৪৩}

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে দিয়েই ইসলাম তার দায়িত্ব শেষ করেনি বরং তাদের সম্পর্ক যেন অটুট থাকে সেজন্যে স্বামীর কাছে স্ত্রীর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“যে ব্যক্তি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সেই হলো পরিপূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম (চরিত্রের অধিকারী) মানুষ, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম ব্যক্তি।”^{৪৪}

এ সম্পর্কে হাদীসে মহানবী সা. বলেন,

فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَجُلًا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا.

“রাসূল সা. এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই যদি আমি কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদাহ করার নির্দেশদাতা হতাম তাহলে স্ত্রীদের নিজ নিজ স্বামীকে সিজদাহ করতে নির্দেশ প্রদান করতাম। যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তার শপথ করে করে বলছি, নারী স্বীয় স্বামীর হক আদায় করা ব্যতীত কোন অবস্থাতেই স্বীয় রবের হক আদায় করতে সক্ষম হবে না।”^{৪৫}

৩.১১ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর অবিচ্ছেদ্য যুগল

মানব ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় যে, সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী-পুরুষের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মূলত: পৃথিবী সৃষ্টির মূলে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের এক সুচিন্তিত মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা অনুসারে তিনি পৃথিবীর সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“আর প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”^{৪৫}

সমগ্র সৃষ্টিলোকের যাবতীয় জীবজন্তু ও বস্তুসমূহ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। বস্তুত দু’টো জিনিসের মধ্যেই সৃষ্টির মূল রহস্য নিহিত রয়েছে। যখনই এ দু’টো জিনিসের মিলন ঘটে; তখনই তা থেকে একটা তৃতীয় জিনিসের উদ্ভব হয়। এটি সৃষ্টির অমোঘ বিধান। সৃষ্টিলোকের কোন কিছুই এ বিধানের বহির্ভূত নয়। তাই এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

“পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।”^{৪৬}

৩.১২ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক শান্তি-সুখের উৎস স্থল

দাম্পত্য জীবনে নর-নারীর দায়িত্ব যদিও কিছুটা ভিন্নতর। তথাপি তা পরস্পর সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। তাইতো কবি নজরুল বলেছেন,

“দিবসে দিয়াছে শক্তি সাহস, নিশিথে হয়েছে বঁধু

পুরুষ এসেছে মরণতৃষা লয়ে নারী যোগায়েছে মধু।”^{৪৭}

নারীর দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান লালন-পালন ও স্বামীর ঘরের সম্পদ সংরক্ষণ। আর পুরুষের দায়িত্ব হলো দেশ গড়া; নিত্য-নতুন আবিষ্কারে অংশগ্রহণ করা। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারী-পুরুষ একটি সীমাবদ্ধ নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলার মধ্যে চলে আসে। সে আত্মীয়-স্বজনের আতিথেয়তা, তাদের সম্মান সংরক্ষণ, অর্থ-উপার্জন, পরিবার লালন ইত্যাদি সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে হয়। বৈবাহিক জীবনে শান্তির মূল পুঁজি হলো ভালবাসা। সংসারে ভালবাসা, মায়া-মমতা আছে কিন্তু তারা যদি তা প্রয়োগ করতে না জানে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এজন্য বৈবাহিক জীবনে নারী-পুরুষের আচার-আচরণ সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। কেউ কাউকে সহ্য করতে না পারলে বিবাহ ভাঙতে সময় লাগে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ “আমার বান্দাগণকে যাহা উত্তম তা করতে বল।”^{৪৮}

৩.১৩ বৈবাহিক সম্পর্ক পবিত্র

নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ বা পবিত্র সম্পর্ক হিসাবে গড়ে ওঠে তা চার ধরনের হয়ে থাকে। এ ছাড়া আর এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা হলো অস্থায়ী নিষিদ্ধ সম্পর্ক। সুতরাং বৈবাহিক কারণে সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

৩.১৪ শাশুড়ী-জামাতা সম্পর্ক

স্ত্রীর মা বা শাশুড়ী, শাশুড়ীর মা, শ্বশুরের মা, শাশুড়ীর দাদী-নানী, শ্বশুরের দাদী-নানী, এভাবে উর্ধ্বতন যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় সকলের সাথে সম্পর্ক শাশুড়ী-জামাতার সম্পর্ক। এ সম্পর্কও মা-ছেলে কিংবা বাপ-মেয়ের সম্পর্কের মতই অত্যন্ত কাছাকাছি ও সন্মানের বিষয়। এ সূত্রে এদের সকলের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾

“তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা বা শাশুড়ী প্রভৃতি।”^{৪৯}

৩.১৫ শ্বশুর-পুত্রবধু সম্পর্ক

পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র কিংবা কন্যার পুত্র তথা পৌত্রের স্ত্রী, এমনিভাবে যতই নিম্নে যাওয়া যায় তারা শ্বশুর-পুত্রবধু হিসেবে পরিচিত হবে। তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত পবিত্র ও সন্মানজনক। একজন নারী যখন স্বামীর বাড়িতে আসে তখন স্বামীর মাকে নিজের মা, আর স্বামীর বাবাকে নিজের বাবা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। আর শ্বশুর-শাশুড়ীও তাকে নিজের মেয়ের মত মনে করে। আর এভাবেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা পুত্রবধু ও শ্বশুরের মধ্যে মাহরামের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ - وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أَبْنَاءُكُمْ﴾

“তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে --- তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী।”^{৫০}

মাহরাম^{৫১} ঘোষণার কারণে শ্বশুর ও পুত্রবধুদের ভিতরে শ্রদ্ধা ও স্নেহ-মমতায় কোন প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় থাকে না। আর এ কারণেই পুত্রবধু বা তার অধঃস্তনরা স্বামীর পাশাপাশি তার পিতা ও দাদার খেদমত করার সুযোগ পায়।

৩.১৬ সৎমা-সৎপুত্র সম্পর্ক

বাবা বা তার উর্ধ্বতন যে কোন পিতার অন্য স্ত্রী যার সাথে এ সন্তানের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। অথবা মায়ের বাবা বা তার উর্ধ্বতন যে কোন পিতার স্ত্রী যার সাথে উক্ত সন্তানের কোন রক্তের কোন সম্পর্ক নেই; এরা পরস্পর সৎমা সৎপুত্রের পর্যাযভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে পিতা বা উর্ধ্বতনদের উক্ত নারীর সাথে ‘আকদ সম্পন্ন হওয়াই যথেষ্ট হবে; এক্ষেত্রে শারীরিক মিলন হওয়া জরুরী নয়। এ সকল পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না। তবে পূর্বে যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।”^{৫২}

উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পিতার স্ত্রীকে, অনুরূপ দাদার স্ত্রীকে আরও উর্ধ্বতন হলেও বিবাহ করা হারাম। কেননা ‘আল-আব’ শব্দটি পিতা ও উর্ধ্বতন পুরুষগণকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩.১৭ সৎকন্যা-সৎবাবা সম্পর্ক

স্ত্রীর সাথে যদি স্বামীর দৈহিক সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে ঐ স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া কন্যা, কন্যার কন্যা, পুত্রের কন্যা যত নিম্নগামী হোক, সকলের সাথে তার বর্তমান স্বামীর সৎকন্যা, সৎবাবা সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক বাবা-মেয়ের মতই হবে। তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে হারাম। কিন্তু যদি স্বামীর সাথে স্ত্রীর শুধু বিবাহের ‘আকদ হয় আর দৈহিক মিলন হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী মারা যায় কিংবা স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে ঐ কন্যার সাথে ঐ স্বামীর বাবা-মেয়ে সম্পর্ক স্থাপিত হবে না। বরং সে আজনবী বা অপরিচিত বলেই বিবেচিত হবে। এর ফলে তার সাথে উক্ত স্বামীর বিবাহ বন্ধনও বৈধ হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ - وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। তবে যদি তাদের সহিত সংগত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।”^{৫৩}

সাময়িক নিষিদ্ধ বৈবাহিক সম্পর্ক

বৈবাহিক কারণে সাময়িক নিষিদ্ধ^{৫৪} নারী-পুরুষ সম্পর্ক আরও এক ধরনের হয়ে থাকে। আর তাহলে শ্যালিকা-দুলাভাই কিংবা সমবিধানভুক্ত নারীদের সাথে পুরুষের সম্পর্ক। স্ত্রীর বর্তমানে বা ইদত পালনকালে এদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম। কিন্তু যেহেতু অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে পরবর্তীতে বিবাহের বৈধতা এবং সম্ভাবনা আছে এজন্য এদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ নয়; এদের মাঝে পর্দা অবলম্বন করা ফরয।

৩.১৮ শ্যালিকা-দুলাভাই সম্পর্ক

স্ত্রীর সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী, বৈপিত্রেয়ী বোন সে যদি স্ত্রীর ছোট হয় তার সাথে সম্পর্ক হয় শ্যালিকা ও দুলাভাইয়ের সম্পর্ক; আর যদি বড় হয় তাহলে সম্পর্ক হয় জ্যৈষ্ঠ বোন-জামাই। এদের সাথে অস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। অর্থাৎ দুই সহোদরা এক সাথে বিবাহ করা বা স্ত্রীর বর্তমানে তার বোন বিবাহ করা যাবে না। তবে বোন মারা যাওয়ার পর অথবা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইদতকাল অতিক্রান্ত হলে তখন তাদের মাঝে বিবাহ বৈধ হবে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ - أَنْ تَحْبِسُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

“তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে--- দুই বোনকে একত্রে (বিবাহ) করা, কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে (তা ক্ষমার)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।”^{৫৫}

৩.১৯ সমবিধানভুক্ত নারীদের সাথে পুরুষের সম্পর্ক

এমন দুজন নারীকে একত্রে বিবাহ করা যাদের একজনকে পুরুষ ধরা হলে অপরজন উক্ত পুরুষের জন্যে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়। যেমন স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভাইবো ও বোনবো ইত্যাদি। অর্থাৎ দুই সহোদরা একসাথে বিবাহ করা বা স্ত্রীর বর্তমানে তার ফুফু, খালা, ভাইবো ও বোনবো ইত্যাদি আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। তবে ঐ স্ত্রী মারা গেলে অথবা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইদতকাল অতিক্রান্ত হলে তখন তাদের মাঝে বিবাহ বৈধ হবে। এ সম্পর্কে মহানবী সা. এরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَئِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»

“আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে অথবা কোন মহিলাকে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে এবং ছোট বোনের সাথে বড় বোনকে অথবা বড় বোনের সাথে ছোট বোনকে একত্রে (সতীনরূপে) বিবাহ করতে রাসূল সা. নিষেধ করেছেন।”^{৫৬}

৩.২০ দুধপানজনিত সম্পর্ক

দুধপানের পরিচয়: দুধপানের সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

هو وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين - أربعة وعشرين - ولا فوق بين أن يصل اللبن إلى جوف من طريق الفم بمص الثدي أو يصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه فمقى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين كان رضاعاً شرعياً

“কোন নারীর দুধ অনুর্ধ্ব দুই বছর তথা চব্বিশ মাস শিশুর পেটে পৌঁছায়; তবে এ দুধপান সরাসরি স্তনে মুখ লাগিয়ে হোক অথবা দোহন করে গলার মধ্য দিয়ে হোক কিংবা নাক দিয়ে হোক তবে উল্লেখিত দুই বছর বয়সের মধ্যে তার পেটে পৌঁছালেই শরী‘আতে দুধপান জনিত সম্পর্ক হবে, এতে কোন পার্থক্য নেই।”^{৫৭}

দুধপানজনিত কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তা বৈধ। মা-এর সাথে ছেলে বা মেয়ের সাথে যে সম্পর্ক দুধ পানের কারণে দুধ মা বা দুধ গ্রহণকারী ছেলে বা মেয়ের ঐ একই সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, مَا تُحْرَمُ الْوَلَادَةُ تُحْرَمُ الرِّضَاعَةُ দুধপান তা-ই হারাম করে, যা জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।”^{৫৮}

৪. অবৈধ সম্পর্ক

নারী-পুরুষের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধরনের বৈধ সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি রয়েছে কতিপয় অবৈধ সম্পর্ক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

৪.১ জাহিলি যুগে প্রচলিত নিষিদ্ধ বৈবাহিক সম্পর্ক

জাহিলি যুগের প্রচলিত বিবাহসমূহের যেমন ইসলাম স্বীকৃতি দেয়নি, তেমনি সেগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর ঐ সকল বিবাহের সকল সম্পর্ক অবৈধ। ইসলাম তা হারাম ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে ‘আয়িশা রা. হতে এক দীর্ঘ হাদীসে তিন প্রকারের অবৈধ সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ:

প্রথমত: কোন ব্যক্তি উন্নত জাতের সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় তার স্ত্রীকে মাসিক খতু হতে মুক্ত হওয়ার পর এ কথা বলবে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সঙ্গে যৌন মিলন কর। এ সময় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে পৃথক থাকত। **দ্বিতীয়ত:** দশ জনের কম কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে কোন মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত। এতে গর্ভবতী হয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ঐ মহিলা সকলকে ডেকে পাঠাত এবং বলত এটি অমুকের সন্তান। পরবর্তীতে তা সকলের কাছে গৃহীত হত। **তৃতীয়ত:** এটি মূলত: পতিতার সাথে সম্পর্ক। কোন পতিতার কাছে বহু পুরুষ আসত। এতে গর্ভবতী হয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে একজন ‘কাফা’ (এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি সন্তানের মুখ ও শরীরের গঠন দেখে বলতে পারত-এটি অমুকের ওরসজাত সন্তান) ডেকে আনা হত। ‘কাফা’ বিশেষজ্ঞ সে সন্তানটির যে লোকটির সাথে সাদৃশ্য দেখতে পেত, তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান এবং এটি সকলের কাছে স্বীকৃতি পেত।^{৬০}

৪.২ শিগার বিবাহ

শিগার বিবাহ হলো এমন বৈবাহিক সম্পর্ক যাতে কেউ নিকটাত্মীয়কে (যার উপর অভিভাবকত্ব প্রযোজ্য) অন্যের নিকট এ শর্তে বিবাহ দিবে যে, সেও তার নিকটাত্মীয়কে তার কাছে বিবাহ দিবে এবং তাদের এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্কে কোন মাহর থাকবে না। ইসলামী আইন তত্ত্ববিদগণ এ বৈবাহিক সম্পর্ককে মাহর বিহীন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। শিগার বিবাহের পরিচয় সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক সাইয়েদ সাবেক বলেন,

فهو عند الفقهاء أن يتزوج إثنان إمرأتين علي أن تكون أحدهما في نظير صداق الأخرى.

“দু’জন নারীকে দু’জন পুরুষের এ শর্তে বিবাহ করা যে তাদের একজন অন্যের মাহর সাদৃশ্য বিবেচিত হবে।”^{৬০}

রাসূল সা. এ জাতীয় বিবাহের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتُهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

“আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সা. ‘শিগার’ বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। আর শিগার বিবাহ হলো কোন পুরুষ যদি তার মেয়েকে অন্যের কাছে এভাবে বিয়ে দেয় যে, সেও তার মেয়েকে তার নিকট বিয়ে দিবে এবং এই দুই বিয়েতেই কোন মাহর থাকবে না।”^{৬১}

৪.৩ মুত’আ বিবাহ

মুত’আ বিবাহ হলো অর্থ বা অন্য কিছু বিনিময়ে সাময়িক উপভোগ করার শর্তে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা। এ ধরনের বিবাহ জাহিলি যুগের বিবাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটি মুবাহ ছিল। পরে এটিকে হারাম ঘোষণা করা হয়। আর মুত’আ বিবাহের সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়েছে,

نكاح المتعة هو قول الرجل للمرأة: أعطيك كذا علي أن أمتع بك يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك سواء قدر المتعة بمدة معلومة كما هو الشأن في الأمثلة السابقة، أو قدرها بمدة مجهولة كقوله: أعطيك كذا علي أن أمتع بك موسم الحج أو ما أقمت في البلد أو حتي يقدم زيد، فإذا انقضي الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق.

“কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলবে যে, আমি তোমাকে এ পরিমাণ অর্থ দিব এ শর্তে যে, আমি তোমাকে একদিন অথবা এক মাস অথবা এক বছর অথবা এ ধরনের কোন একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করব। তাই সে ভোগের সুনির্দিষ্ট

সময় উল্লেখ করুক যেমন উপরে বর্ণিত উদাহরণ অথবা অনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুক। যেমন বলল, হজ্জের মওসুমে অথবা যতদিন আমি এ শহরে অবস্থান করি অথবা যায়েদের আগমন পর্যন্ত তোমাকে উপভোগ করব। উভয় অবস্থাতেই মূর্ত'আ বিবাহ সাব্যস্ত হবে। যখন নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাবে তখন তালাক ছাড়াই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যাবে।”^{৬২} এ ধরনের বিবাহ মুসলিম উম্মাহর ‘আলিমগণের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে ‘আলী রা. বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. নিষেধ করেন,

نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرٍ، وَعَنْ أَكْلِ حُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

“রাসূল সা. খায়বর যুদ্ধের সময় মূর্ত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।”^{৬৩}

৪.৪ মুআক্কাত বা নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ

মুআক্কাত বা নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ হলো এমন বিবাহ পদ্ধতি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করা থাকে। এটিও জাহিলি যুগের বিবাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইসলাম এ ধরনের বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। *النكاح الموقت و هو أن يتزوج امرأة عشرة أيام مثلاً فهو باطل*, মুআক্কাত বিবাহের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “নির্ধারিত সময়ের জন্যে বিবাহ হলো এমন বিবাহ যেমন কেউ বলল আমি তোমাকে দশ দিনের জন্যে বিবাহ করলাম। এ ধরনের বিবাহ বাতিল বা অবৈধ।”^{৬৪}

৪.৫ মুহাল্লিল বা হালালকারীর বিবাহ

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বৈধ ঘৃণিত কাজ হচ্ছে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। তালাকের প্রতি নিরুৎসাহিত করা এবং খুবই সতর্ক ও সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ পথে অগ্রসর হয়, সে জন্যেই স্ত্রীকে পরিপূর্ণ তালাক দেওয়ার পর পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে যদি পরবর্তী স্বামী পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য উক্ত নারীকে বিবাহযোগ্য বা হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে তাহলে এ ধরনের বিবাহ হালালকারী বিবাহ। এ ধরনের বিবাহ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এ ধরনের বিবাহের হুকম সম্পর্কে বলা হয়েছে, *فهو حرام باطل مفسوخ، ولا يصح ولا تحل لزوجها الأول*, বাতিল ও ফাসিখ। এর দ্বারা সে তার পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য বৈধ হবে না।”^{৬৫} এ সম্পর্কে রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, *لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ، وَالْمُحْلَلُ لَهُ*, অর্থাৎ “আল্লাহ তা‘আলা লা‘নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্যে হালাল করা হয়েছে উভয়ের প্রতি।”^{৬৬}

৪.৬ মুহরিম তথা ইহরামকারীর বিবাহ

হজ্জ বা ‘উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ইহরাম পরিধান করে সেই মুহরিম। ইহরাম অবস্থায় বিবাহ-শাদী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জমহুর ‘আলিমগণের মতে মুহরিম এর বিবাহ সहीহ হবে না। এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন, *رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ*, “রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে না, তাকে বিবাহ করানো যাবে না এবং সে প্রস্তাবও দিতে পারবে না।”^{৬৭}

৪.৭ গোপন বিবাহ

অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত স্বাক্ষীগণের অনুপস্থিতিতে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় তাকে গোপন বিবাহ বলে। জমহুর ‘আলিমগণের মতে সাক্ষী না থাকায় এ ধরনের বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نكاح إلا بولي و شاهدي عدل.

“ইমরান ইবন হুসাইন রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল সা. বর্ণনা করেছেন, অভিভাবক ও দু’জন ন্যায়পরায়ন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হবে না।”^{৬৮}

৪.৮ পরস্ত্রী বা ইন্দত পালনকারী নারীর সাথে বিবাহ

কোন বিবাহিত নারীকে বিবাহ করা, স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত, স্বামীর মৃত্যু, স্বামী হারিয়ে যাওয়া, ফাসেদ বিবাহ-ঘটিত সহবাস, সন্দেহ জনিত সহবাসের কারণে ইন্দত পালনরতা থাকলে এমতাবস্থায় তাকে বিবাহ করা হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾

“এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্যে ইহা আল্লাহর বিধান।” ৬৯

৪.৯ ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর বিবাহ

ব্যভিচার অর্থ পুরুষ ও নারীর অবৈধ সম্পর্ক। আর পরিভাষায়, পুরুষ কর্তৃক বিবাহ বা বিবাহের অনুরূপ সম্পর্ক বহির্ভূত কোন নারীর সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হওয়া। এটি অত্যন্ত গর্হিত, অশ্লীল ও জঘন্য কাজ। পুত: পবিত্র মুমিন পুরুষ বা নারীর সাথে ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের বিবাহ হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

“ব্যভিচারী, ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারী ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিনী, ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত বিবাহ করবে না। মু'মিনদের জন্যে এটি নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।” ৭০

৪.১০ অমুসলিম নারী ও পুরুষের সাথে বিবাহ

যে নারী কোন ঐশী গ্রন্থ বা ধর্মের অনুসারী নয়, কোন রাসূল ও ঐশী কিতাবে বিশ্বাসী নয় বরং মুশরিক, মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক, এ ধরনের নারীকে বিবাহ করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে এসেছে,

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَئِنَّكُمْ مُؤْمِنَةً حَبِيرٍ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

“আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ কর না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষাও উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোষখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।” ৭১

৪.১১ একই সাথে চার এর অধিক স্ত্রী গ্রহণ

একজন পুরুষ চারজন পর্যন্ত নারীকে একত্রে বিবাহাধীনে রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذُنٌ أَلَّا تَغُولُوا﴾

“তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।” ৭২ এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একজন পুরুষকে চারজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে; এর অধিক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা কোন পুরুষের জন্যে বৈধ নয়।

৫. উপসংহার

মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বলা যায় মানব সমাজের সূচনাকাল থেকেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় নারী ও পুরুষ পাশাপাশি ভূমিকা পালন করে আসছে। পৃথিবীতে কখনও উভয়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হলে বা করা হলে সেখানে সুখম উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। পরিবার ও সমাজ

নামক এ দুইটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত, বিনষ্ট হয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা। পৃথিবীকে গড়ার ক্ষেত্রে উভয়ের অংশিদারিত্বই সমান। আবার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পতনের কারণ হিসেবে উভয়ের ভূমিকা অথবা নির্লিপ্ততা সমানভাবে দায়ী। তাই নারী-পুরুষের মধ্যে সুষ্ঠু ধারার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রে উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। এজন্য নারী-পুরুষকে পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। মূলতঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা হবে একে অন্যের সহযোগী; প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু নয়, পরম বন্ধু ও সহমর্মী। তাই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নারী কবিতায় যথার্থই বলেছেন- “বিশ্বে যা কিছু সুন্দর চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নয়।”

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ মোয়াল্লাম মোরশেদা বেগম, আল-কুরআনে নারীদের ২৫ সূরাহ (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, ২০১৪ খৃ), পৃ. ৫।
- ^২ সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪০৭-৮ ও ৪৩৮।
- ^৩ সূরাহ আত-তাওবা: ৭১।
- ^৪ সূরাহ আল-বাকারাহ: ৩০।
- ^৫ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড (তুরক: দারুত তাবাতাতিল ‘আমিরাহ, ১৩৩৪ হি:), পৃ. ১৭৮, হাদীস নং ৬১(১৪৬৮)।
- ^৬ সূরাহ আন-নিসা: ১।
- ^৭ সূরাহ আত-তাওবা: ১৩।
- ^৮ সূরাহ আল-ইমারান: ১০৩।
- ^৯ আবু ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারুশ শু‘আব, ১৯৮৭ খ্রি./১৪০৭ হি:), পৃ. ২৮, হাদীস নং ১৬৮৯।
- ^{১০} আশ-শায়খ ড. আবদুল্লাহ ইবন ওয়াকিল, আল-মারআতু ওয়া কায়দুল আ‘দাই, ১ম খণ্ড (দামেস্ক: মাকতাবাতু আলুকাহ, তা. বি.), পৃ. ৪।
- ^{১১} ড. মুহাম্মদ আস-সিবানী, আল-মারআতু বাইনা ফিকহি ওয়া কানুন (কায়রো: দারুস সালাম, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৯; ড. ওয়াবাহ আয-যুহায়লি, আল-উসরাতুল মুসলিমাতু ফীল ‘আলামীল মু‘আসির (বৈরুত: দারুল ফিকর আল-মু‘আসির, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৫।
- ^{১২} সূরাহ আত-তাওবা: ১৩।
- ^{১৩} সদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ‘আলাউদ্দিন ‘আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিল ‘ইয়জু আল-হানাবি আদ-দিমাশকী, শারহ ‘আকীদাতুত তুহাবী, ১ম খণ্ড, (আস-সা‘উদিয়াহ: আল-আওকাফ, ১৪১৮ হি:), পৃ. ৩৪৯।
- ^{১৪} আবুল হাসান আল-মাওয়াদি, কিতাবুল হাবি আল-কাবীর, ১৪শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ১৮৭।
- ^{১৫} সূরাহ আত-তাওবা: ৭১।
- ^{১৬} আবু মুহাম্মদ ‘আব্দুল হক ইবন ‘আতিয়াহ, আল-মুহররারুল ওয়াজিয, পঞ্চম খণ্ড, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ৩.৮ সংস্করণ), পৃ. ১১৩।
- ^{১৭} সূরাহ আন-নিসা: ১।
- ^{১৮} মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ৮ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৮; হাদীস নং ৬৬৮৫।
- ^{১৯} সূরাহ আল-মায়দা: ৫৪।
- ^{২০} সূরাহ আন-নিসা: ২৩।
- ^{২১} আবু ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯; হাদীস নং ৫২৩৯।
- ^{২২} ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলার অভিযান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২০৩।
- ^{২৩} তদেব, পৃ. ৪৬৩।
- ^{২৪} এ সম্পর্কে ইবনুল ‘আরাবী আরও বলেন, وَلَٰذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَوْلِهِ "حَرَّمَ" فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ كَانَ خَلْقًا مَّطْلَقًا وَلَمْ يَكُنْ نَسَبًا مُحَقَّقًا، وَلَٰذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَوْلِهِ "حَرَّمَ" عَلَىٰكُمْ أَهْلُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ" بَنَتْهُ مِنَ الزَّانِي، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ، فِي الْأَصْحَاحِ الْقَوْلِينَ لَعَلَّمَانَا وَالْأَصْحَاحِ الْقَوْلِينَ فِي الدِّينِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَسَبًا شَرْعًا فَلَا صَهْرَ شَرْعًا، فَلَا يَحْرَمُ الزَّانِي بَنَاتِ أُمِّهِ وَلَا أُمَّ بَنَاتِ، وَمَا يَحْرَمُ مِنَ الْحَلَالِ لَا يَحْرَمُ مِنَ الْحَرَامِ، لِأَنَّ اللَّهَ آمَنَ بِالنَّسَبِ وَالصَّهْرَ عَلَىٰ عِبَادِهِ رَفَعَ قَدْرَ هُمَا، وَ عُلِيَ الْأَحْكَامُ فِي الْحَلِّ وَالْحَرْمَةِ عَلَيْهِمَا فَلَا يَلْحَقُ الْبَاطِلُ بِمَا وَلَا يَسَاوِيهِمَا- আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি‘ লি আহকামিল ১৩ খণ্ড, (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাখিল ‘আরাবী, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৫৯; আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবন মাস‘উদ আল-বাগাবী, মা‘আলিমুত তানযীল, ষষ্ঠ খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ৩.৮), আবু মুহাম্মদ ‘আব্দুল হক ইবন ‘আতিয়াহ, আল-মুহররারুল অজীয, ৫ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ৩.৮ সংস্করণ),

- ^{২৬} আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, ১৪৩৩ হি:), পৃ. ৮১; হাদীস নং (২৫৫৫)-১৭।
- ^{২৭} 'উম্মুন' শব্দের অর্থ: মূল। যেমন: মক্কাকে বলা হয় 'উম্মুল কুরা' বা জনপদসমূহের মূল। সুতরাং এর দ্বারা ছেলের মূলসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আর এর মধ্যে মা, দাদী, নানী এবং তদূর্ধ্ব সকলেই অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেছে।
- ^{২৮} আবুবকর আহমদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, ১০ম খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুত রাশদি লিন নাশরি ওয়াত তাওজি'উ, ২০০৩ খৃ/ ১৪২৩ হি.), পৃ. ২৬৬; হাদীস নং. ৭৪৭৫।
- ^{২৯} ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানি, *সুনানু আবু দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়াহ, তা.বি), পৃ. ৩৩৭, হাদীস নং-৫১৪৬।
- ^{৩০} সূরাহ আন-নিসা: ২৩।
- ^{৩১} আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড (মিশর: মাতবা 'আতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৭৫ খৃ./ ১৩৯৫ হি.), পৃ. ৩২০; হাদীস নং- ১৯১৬।
- ^{৩২} সূরাহ আন-নিসা: ১৭৬।
- ^{৩৩} সূরাহ আন-নিসা: ২৩।
- ^{৩৪} সূরাহ আন-নিসা: ২৩।
- ^{৩৫} মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাখিল 'আরবী, তা.বি), পৃ. ৬৭৬; হাদীস নং-(৯৮৩) ১১।
- ^{৩৬} সূরাহ আন-নিসা: ২৩।
- ^{৩৭} আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড (মিশর: মাতবা'আতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৭৫ খৃ./ ১৩৯৫ হি.), পৃ. ৪২২; হাদীস নং- ২১০৪।
- ^{৩৮} উত্তরাধীকারিগণ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: ১. যাবিল ফুরুজ বা অংশীদার: যাদের অংশ শরী'আত দ্বারা নির্ধারিত, ২. আসাবা: যাবিল ফুরুজদের মধ্যে অংশ বন্টিত হওয়ার পর যারা অবশিষ্টাংশ পায়। ৩. যাবিল আরহাম: দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন, উপরের দুই শ্রেণীর অনুপস্থিতিতে যারা অংশীদার হয়।
- ^{৩৯} আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল হক ইবন 'আতিয়াহ, *আল-মুহররারুন্না ওয়াজিয*, ৫ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১১৩।
- ^{৪০} এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, *إسم لما بين المرأة وبين قرابة زوجها وأقاربه من العلاقة* "বৈবাহিক সম্পর্ক হলো এমন সম্পর্কের নাম যা ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্ক।" বিবাহ শব্দের 'আরবী প্রতিশব্দ 'নিকাহ' (النكاح)। অর্থ: মিলানো, একত্র করা, সহবাস ও চুক্তি ইত্যাদি। ইবন ফারিস ও অন্যান্যরা বলেন, শব্দটি সঙ্গম ও সঙ্গমহীন 'আকদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় *نكحت المرأة* 'সে (স্ত্রী) বিবাহ করেছে'। আবার (*نكح فلان امرأة*) অর্থাৎ 'তাকে (স্ত্রী) বিবাহ করেছে। এ শব্দটি আল-কুরআনেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন আল-কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, *فَانكِحُوا مَا طَابَ* "তবে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের যাদের ভাল লাগে তাদের বিবাহ কর।" (সূরাহ আন-নিসা: ৩); দ্র. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবন মুহাম্মদ আত-তিউনিসি, *আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর*, ১৯ খণ্ড (তিউনিস: দারুত তিউনিসিয়া, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৭০৯; সা'দী আবু জাইব, *আল-কামুসুল ফিকহী*, ১ম খণ্ড (দামিশক: দারুল পিকার, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩০; ইবন মানযুর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল 'আরব*, ২য় খণ্ড, (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাখিল 'আরবী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৬২৫।
- ^{৪১} সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৮৭।
- ^{৪২} মাওলানা মুফতি মুহাম্ম শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন* অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্ম মহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫৩৪।
- ^{৪৩} আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩১৫; হাদীস নং-১১৭২।
- ^{৪৪} আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাযাহ, *সুনানু ইবন মাযাহ*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৫৯৫; হাদীস নং-১৮৫৩।
- ^{৪৫} সূরাহ আয-যারিয়াত: ৪৯।
- ^{৪৬} সূরাহ ইয়াসীন: ৩৬।
- ^{৪৭} কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ, নারী কবিতা)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, তা.বি), পৃ. ৯০।
- ^{৪৮} সূরাহ বনী-ইসরাঈল: ৫৩।
- ^{৪৯} সূরাহ আন-নিসা: ২৩।
- ^{৫০} সূরাহ আন-নিসা: ২৩।
- ^{৫১} মাহরাম: মাহরাম শব্দটি আরবী হারাম শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় মাহরাম শব্দ দ্বারা বুঝায়, যাদেরকে বিবাহ করা হারাম বা অবৈধ। তবে তাদের সাথে দেখা করা বা দেখা দেওয়া জায়েয বা বৈধ। পুরুষদের জন্য মাহরাম হলো ১৪ জন। তারা হলেন, মায়ের মত ৫ জন। যথা: মা, ফুফু, (বাবার বোন), খালা (মায়ের বোন), শ্বাশুড়ি, (স্ত্রীর মা), দুধ মা (যে মা ছোট বেলায় দুধ পান করিয়েছিলেন) বোনের মত ৫ জন, যথা: নিজের বোন, নানি (মায়ের মা), দাদি (বাবার মা), নাতনি (আপন ছেলে ও মেয়ের কন্যা), দুধ বোন, মেয়ের মত ৪ জন, যথা: মেয়ে, ভাতিষি (আপন ভাইয়ের মেয়ে) ভাণ্ডি (আপন বোনের মেয়ে), ছেলের বউ, এসব ব্যক্তি ছাড়া পুরুষরা বাকী সবার সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতে

পারবে। এ ছাড়া স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় স্ত্রীর আপন বোনকে বিবাহ করা যাবে না। মহিলাদের মাহরাম হলো ১৪ জন। তারা হলেন, বাবার মত ৪ জন। যথা: পিতা চাচা মামা ও শ্বশুর এবং ভাইয়ের মত ৫ জন। যথা: সহোদর ভাই, নিজ দাদা, নিজ নানা, নিজ নাতি ও দুধ ভাই। ছেলের মত ৫ জন, যথা: ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, মেয়ের জামাই এবং দুধ সম্পর্কের ছেলে। একজন নারীর জন্য উল্লেখিত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা যাবে না। এমনকি অন্যদের সাথে প্রয়োজন ছাড়া অথবা কথাবার্তা বলাও গোনাহের কাজ। দ্র. সূরাহ আন-নিসা: ২৩।

৫২ সূরাহ আন-নিসা: ২২।

৫৩ সূরাহ আন-নিসা: ২৩।

৫৪ والنساء المحرمات حرمه موقنة : هن الاتي حر من علي الإنسان لسبب من الأسباب، فإذا
 زال هذا السبب زالت المحرمه ، و عاد الحل، فإذا عقد على واحدة منهن قبل زوال سبب المحرمه كان العقد باطلا
 “যে ধরণের বিবাহ কোন কারণে হারাম করা হয়েছে, যখন হারাম কারণটি দূরীভূত হয়ে যাবে তখন বিবাহের হুরমতও দূর হয়ে যাবে এবং হিলাত ফিরে আসবে। হুরমতের কারণ দূর হওয়ার পূর্বেই যদি কারও সাথে বিবাহের আকদ সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে সে আকদ বাতিল বলে গণ্য হবে।” দ্র. ড. মুস্তফা আল-বুগা, আল-ফিকহুল মানহাজি ‘আলা ইমাম আশ-শাফেয়ী, ৪র্থ খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৭।

৫৫ সূরাহ আন-নিসা: ২৩।

৫৬ আবু সৈদ মুহাম্মদ ইবন সৈদ আত-তিরমিযী, আস-সুনান, ৩য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৪৩৩; হাদীস নং-১১২৬; আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশ‘আস আস-সিজিস্তানী, সুনানু আবী দাউদ, ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৮৩; হাদীস নং-২০৬৭।

৫৭ ‘আব্দুর রহমান আল-জাযাইরী, কিতাবল-ফিকহ ‘আলা মাযাহিবিল আরবা‘আ, ৪র্থ খণ্ড, তদেব, পৃ. ১২৬।

৫৮ আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড (দেমাশক: দারু তাওকিন নাজাত, ১৪২২ হি.), পৃ. ৮২ হাদীস নং ৩১০৫; মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৬২; হাদীস নং-৩৬৪২।

৫৯ আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, ৭ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৫ হাদীস নং-৫১২৭; আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশ‘আস আস-সিজিস্তানী, সুনানু আবী দাউদ, ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ২৪৯; হাদীস নং-২২৭৪; আবুবকর আহমাদ ইবন হুসাইন ইবন ‘আলী আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১১।

৬০ সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুনান, ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৮; ‘আব্দুর রহমান আল-জাযাইরী, কিতাবিল ফিকহি‘আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৬১ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১০৩৪; হাদীস নং (১৪১৫)৫৭।

৬২ আল-মাউসু‘আতুল ফিকহিয়াহ, ৪১শ খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৩৩।

৬৩ আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, ৫ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৩৫ হাদীস নং-৪২১৬।

৬৪ ড. ওয়াহাব আহ-যুহায়লী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ, ৯ম খণ্ড (দেমাশক: দারুল ফিকার, তা.বি.), পৃ. ১০৭।

৬৫ তদেব।

৬৬ আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশ‘আস আস-সিজিস্তানী, সুনানু আবী দাউদ, ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ২২৭; হাদীস নং-২০৭৬।

৬৭ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ১০৩০; হাদীস নং-(১৪০৯) ৪১।

৬৮ আবু ‘আব্দিল মালিক ইবন মুহাম্মদ, দারাকাতুন নার মিনাল কিতাবি ও সহীহিল আখবার, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকার, তা.বি.), পৃ. ৮২।

৬৯ সূরাহ আন-নিসা: ২৪।

৭০ সূরাহ আন-নিসা: ৩।

৭১ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২২১।

৭২ সূরাহ আন-নিসা: ৩।

মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনীর রচনাবলি : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন [The Works of Muhammad Ali As-Sabuni: Review and Evaluation]

ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান*

[Abstract: Presently in the history of Muslim Ummah, Muhammad Ali As-Sabuni is regarded as one of the greatest scholars among all the scholars of Islam. In the present generation, he is found to be the rare and versatile talented scholar. He is an experienced and expert scholar in different branches of knowledge such as Tafseer, Ulumul Quran, Hadits, Fiqh, Farayez, Ilmul Arud, History, Akeedah, Chemistry, Biology, Geometry and Science. His writings are worldly appreciated and recognized. Moreover, he is an experienced and expert personality. His written works are considered to be the highly appreciated research works in the Arab Muslim world. He is given the title '*Khademul Kitab Waas Sunnah*'. He wrote about 51 books, most of which are about Tafseer. His tafseer books are used as the academic books in different Universities and also used as text books and reference books in different Universities and Madrasah of Bangladesh. Muhammad Ali As-Sabuni is a successful Mufasssir, Islamic preacher, a burning example in Islamic literature, researcher, ideal teacher, prominent writer and a mystic of a higher level. He writes eleven books on tafseer and also briefs it. Among these tafseer books '*Safwatus Tafseer*' and '*Rawaiul Bayan Fee Ayati Ahkam*' are most famous. The book '*At-Tibayyan Fi Ulumil Qur'an*' is an excellent book on Uloomul Qur'an. In it, the description of various knowledge-sciences of Al-Quran has been presented in an orderly and beautiful manner. His books encourage the Muslim Ummah to understand and practice the Quran correctly.]

Keywords: Works of Muhammad Ali As-Sabuni, Review, Evaluation.

১. ভূমিকা

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনী। সিরিয়ার আলেক্সেন্দ্রিয়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি সিরিয়ায় আট বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর সৌদি আরবের 'কিং আব্দুল আযীয' ও 'উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৮ বছর শিক্ষকতা করেন। উক্ত সময়ে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উলুমুল কুর'আন, ফারাইযসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় ক্লাসে যে সব বক্তব্য প্রদান করেছেন সেগুলোর সমন্বয়ে তিনি পরবর্তীতে গ্রন্থ সংকলন করেন। যা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য অনন্য সাধারণ। তাঁর আলোচনাসমূহ অত্যন্ত সুন্দর ও উপকারী হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আলোচ্য প্রবন্ধে মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনী র.-এর রচনাবলি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২. সাবুনী র.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাবুনী র.-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনী, উপাধি 'খাদিমুল কিতাব ওয়াস্-সুন্নাহ'। পিতার নাম শায়খ মুহাম্মাদ জামিল। মাতার নাম সাইয়েদা আসমা'। তিনি সিরিয়ার আলেক্সেন্দ্রিয়া নগরীর প্রসিদ্ধ আলিম পরিবারে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।^১ তিনি অত্যন্ত ছোট বয়সেই আল-কুর'আনুল কারীম মুখস্থ করেন। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পাশাপাশি কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইলমুল ফারাইয, ইলমুল আরুদ, নবীগণের কাহিনী ও ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞানার্জন করেন।^২

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

সাব্বী শরী'আহ্ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি বাড়ির আগিনায়, মাসজিদের বারান্দায় বিভিন্ন দ্বীনি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণের নিকট থেকে পরিপূর্ণভাবে বুৎপত্তি অর্জন করতে শুরু করেন। তাঁর শিক্ষা 'মুখদরম' পর্যায়ের ছিল। শরী'আতের বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানও সমন্বয় সাধনের আওতায় নিয়ন্ত্রণে আনতে লাগলেন। একদিকে শরী'আতের জ্ঞান থেকে কুর'আন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, ফারাইয এবং হিফযুল কুর'আন; অপরদিকে আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডার থেকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা, গণিত, ভূগোল, অর্থনীতি এবং কারিগরিসহ বহুসংখ্যক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৪৯ সালে শরী'আহ্ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।^৭ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ্ অনুষদ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে উক্ত অনুষদ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী সমাপ্ত করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি আলেপ্পোতে প্রত্যাবর্তন করেন।^৮ ১৯৬০ সালে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু মিসর এবং সিরিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক সংকট ও সম্পর্কের অবনতির কারণে গবেষণাকর্ম সম্পাদন না করেই দেশে ফিরে আসেন।^৯

মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বী মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরী'আহ্ আইন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন শিক্ষা সমাপ্ত করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ১৯৫৫-১৯৬২ সাল পর্যন্ত আট বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সৌদী আরব সরকার কর্তৃক সিরিয়ার শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকের চাহিদা পেশ করায় মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বীকে 'বাদশাহ্ ফাহাদ ইবন আদিল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে' শিক্ষকতার জন্য সিরিয়া থেকে ডিপুটেশনে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে দীর্ঘ ২৮ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষাদান কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের প্রতি আগ্রহ দেখে সৌদী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে মক্কার 'উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন।^{১০}

বর্তমানকালের বিশিষ্ট তাফসীরবিদ, বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বী র. ২০২১ সালের ১৯ মার্চ জুমু'আবার মোতাবেক ৬ শা'বান ১৪৪২ হিজরীতে তুরস্কের ইয়ালোভায় ইন্তিকাল করেন। ঐতিহ্যবাহী মসজিদুল ফাতিহ প্রাঙ্গণে তার জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

৩. মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বী রচনাবলি পর্যালোচনা

মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বী আল-কুর'আনুল কারীমের একজন সার্থক মুফাস্সির ও উচুমানের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। বর্তমান সময়ে ইসলামী গ্রন্থাবলি রচনায় তিনি অনন্য স্থান দখল করে আছেন। একজন গবেষক হিসেবে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাফসীর, উলুমুল কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আরবী সাহিত্য, কবিতা ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে।^{১১} সাব্বী গবেষক ড. মুহাম্মাদ আমীন উল্লাহ বলেন,

“ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রণয়নকৃত ছোট-বড় ৫১টি গ্রন্থ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছে। প্রচুর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর গবেষণাকর্মের অধিকাংশই আল-কুর'আনুল কারীমের তাফসীরকে কেন্দ্র করেই। তিনি প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থসমূহের তাহকীক-তাখরীজ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিল। সহজ পদ্ধতিতে ফিকহ সিরিজ জাতিকে উপহার দিয়েছেন। মানুষের জীবন-যিন্দেগীর পাওয়া-চাওয়ার আঙ্গিকে কম-বেশি সব বিষয়ে কলম ধরেছেন।”^{১২}

মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বী লিখিত গ্রন্থসমূহ অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে,

قام بتأليف عدد من الكتب في عدد من العلوم الشرعية والعربية، وقد تم ترجمة مؤلفاته لعدد من اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والتركية.

“সাব্বী ইসলামী শরী'আহ্ ও আরবী সাহিত্য বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো আরবী ব্যতীত ইংরেজি, ফার্সি, তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।”^{১৩}

৩. ১. ক. সাফওয়াতুত-তাফাসীর (صَفْوَةُ التَّفَاسِيرِ)

এটি তাফসীর বিষয়ক একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। প্রাচীন তাফসীরসমূহের সারনির্যাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে উলুমুল কুর'আনের নিয়মানুযায়ী গ্রন্থটি রচনা করেন। এ তাফসীর গ্রন্থটির উপস্থাপনা চমৎকার, ভাষা সহজ-সরল ও সাবলীল, শাব্দিক ও বাক্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা, সর্বাধুনিক বিন্যাস, বাচনরীতি, বাগধারার প্রতি গুরুত্বারোপ, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির অনুসরণ এবং তথ্য সমৃদ্ধ। এটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়েছে। সাব্বুনী উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটির লেখা সম্পন্ন করেন। তিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর কঠোর অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করে 'সাফওয়াতুত-তাফাসীর' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ তাফসীরটি বেচিগ্রাময়, সাহিত্যমান এবং তথ্যসমৃদ্ধ ভাষাশৈলীতে পরিপূর্ণ।^{১০} এ সম্পর্কে সাব্বুনীর বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

قضيت خمس سنوات في هذا الكتاب صفوة التفاسير أجمع فيه أقوال المفسرين، لا أكتب شيئاً حتى أراجع أكثر من خمسة عشر تفسيراً من أمهات كتب التفاسير لأني أريد أن يشترك معي في هذا أدمغة هؤلاء العلماء الأجلاء، خمس سنوات أوصل الليل بالنهار.

“এ গ্রন্থটি প্রণয়নে আমি পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি, আমি এতে মুফাস্সিরগণের বক্তব্যগুলো একত্রিত করেছি, তাফসীরের মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কমপক্ষে ১৫টি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ব্যতীত আমি কোন কিছুই লেখিনি। আমার ইচ্ছা এ কাজে সেরা এবং শীর্ষ আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হোক, পাঁচ বছর রাতকে দিনের সাথে মিলিয়ে নিয়েছি।”^{১১}

সাফওয়াতুত-তাফাসীর গ্রন্থটি তাফসীর মিল-মা'ছুর^{১২} ও তাফসীর বির রায়^{১৩}-এর সমন্বয় করে রচনা করা হয়েছে। এ তাফসীরটি রচনায় লেখক বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে উৎস নিয়ে নতুন ও সহজ পদ্ধতি আলোচনা উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে সাব্বুনী নিজেই মন্তব্য করেন,

صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم، جامع بين المأثور والمعقول، مستمد من أوثق كتب التفسير الطبري والكشاف والقرطبي، والألوسي، وابن كثير، والبحر المحييط وغيرها بأسلوب ميسر، وتنظيم جديد، مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية.

“সাফওয়াতুত-তাফাসীর আল-কুর'আনুল কারীমের তাফসীর আল-মা'ছুর ও আর-রায়ের মাঝে সমন্বয়কারী একটি তাফসীর গ্রন্থ। এটি তাফসীরুত-তাবারী, আল-কাশশাফ, আল-কুরতুবী, আল-আলুসী, ইবন কাছীর এবং আল-বাহরুল মুহীতসহ গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এটি সহজ পদ্ধতিতে নব সংযোজনায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভাষা এবং বর্ণনাগত দিক বিবেচনায় রেখে প্রণীত।”^{১৪}

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আল-কুর'আনুল কারীমের বড় বড় তাফসীরসমূহ দুষ্প্রাপ্য। আবার যে তাফসীরগুলো সহজলভ্য ও কল্যাণকর সেগুলো এতই বিস্তারিত যে, একজন ব্যক্তি সারাজীবন অধ্যয়ন করেও কুর'আনের অর্থ অনুধাবন ও উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই তিনি প্রাচীন তাফসীরসমূহের সার-নির্যাস নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে ‘উলুমুল কুর'আনের আলোকে ‘সাফওয়াতুত-তাফাসীর’ গ্রন্থটি রচনা করেন।

খ. সাফওয়াতুত-তাফাসীর-এর রচনা পদ্ধতি

মুহাম্মাদ আলী আস-সাব্বুনী র. কর্তৃক রচিত ‘সাফওয়াতুত-তাফাসীর’-এর রচনা পদ্ধতি অভিনব ও স্বমহিমায় ভাস্বর। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বহু তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ মন্বন করে এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। শায়খ আমল খায়রী এ তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

“সাফওয়াতুত-তাফাসীর গ্রন্থটি রচনায় সাব্বুনী পরিপূর্ণ পাঁচ বছর সময় ব্যয় করে ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি এটি রচনায় রাতকে দিনের সাথে মিলিয়েছেন। এতে তিনি মুফাস্সিরগণের মন্তব্যগুলো সমন্বয় করেন। কমপক্ষে পনেরটি মৌলিক তাফসীরগ্রন্থের বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতামতের সাথে না মিলিয়ে কোন কিছু লিখিনি। সাব্বুনী তাঁর তাফসীরে আত-তাবারী, আল-কাশশাফ, আল-কুরতুবী, আল-আলুসী, ইবন কাছীর এবং আল-বাহরুল মুহীতসহ বিভিন্ন গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। আয়াতের বাক্যগত ভাবার্থ এবং অভিধানগত অর্থের দিকটির ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তিনি তার তাফসীর গ্রন্থটি মুফাস্সিরগণের অভ্যন্তরীণ মতভেদ এবং ইসরা'ঈলী কিংবদন্তি থেকে মুক্ত রাখেন।”^{১৫}

মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বীকে দুবাই আন্তর্জাতিক কুর'আন এওয়ার্ড-২০০৭'-এর জন্যে বর্ষসেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে দূর্লভ সম্মাননায় অভিষিক্ত করার অনুষ্ঠানে তাঁর রচিত 'সাফওয়াতুত-তাফাসীর' সম্পর্কে উপর্যুক্ত মূল্যায়ন পেশ করা হয়।

গ. সাফওয়াতুত-তাফাসীর-এর বৈশিষ্ট্য

সাফওয়াতুত-তাফাসীর গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। গ্রন্থটির প্রথমে ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। এতে কুর'আনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, তার সময়ে বিশ্বে 'ইলমুত-তাফসীর' বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী ও তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সূরার প্রথমে *بين يدي السورة* শিরোনামে এক অভূতপূর্ব আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এতে সূরার বিষয়বস্তু, মাক্কী, মাদানী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ধারণা, সূরার নামকরণ এবং মাঝে মাঝে সূরার ফযীলত পেশ করেছেন। সূরার পূর্বাপর আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামঞ্জস্য বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সুন্দরভাবে সংযোজন করেছেন। আরবী অভিধান, প্রামাণ্য কবিতা, বচন ইত্যাদি পেশ করে আয়াতের মাঝের বিভিন্ন জটিল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। শানে নুযূল বর্ণনায় হাদীস উপস্থাপন করেছেন। আয়াতের বাক্যগত ভাবার্থ ব্যাখ্যা, 'ইলমুল বালাগাতের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যাখ্যা করেছেন। আয়াতের ব্যাখ্যার স্বপক্ষে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত আয়াত এবং হাদীস ব্যবহার করেছেন। এ তাফসীরটির সর্বত্রোম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাফসীরের মাঝে মাঝে লা তাইফ ও ফাওয়াইদ (الفوائد واللطائف) শিরোনামে আয়াতের সূক্ষ্ম ও দিকনির্দেশনামূলক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করেন।

ঘ. সাফওয়াতুত-তাফাসীর সংস্করণ

সাফওয়াতুত-তাফাসীর গ্রন্থটির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার কারণে বিশ্বের বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা থেকে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বী ১৪০০ হিজরী সালে এটি রচনা সমাপ্ত করেন। ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বৈরুতের দারুল কুর'আনিল কারীম সংস্থা থেকে বড় বড় তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রথম খণ্ড ৬০৮+দ্বিতীয় খণ্ড ৫৯১+তৃতীয় খণ্ড ৬৩৮=সর্বমোট ১,৮৩৭ পৃষ্ঠা। কায়রোর দারুস-সাব্বী থেকে প্রথম সংস্করণ ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে এর বিশটি অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচিভুক্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি পাঠ্যসূচিতে রয়েছে অথবা রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে রয়েছে।

৩. ২. ক. রাওয়াই'উল বায়ান তাফসীর আয়াতিল আহ্‌কামি মিনাল কুর'আন *رَوَايعُ الْبَيَانِ تَفْسِيرُ آيَاتِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْقُرْآنِ*

সাব্বী র. মক্কা আল-মুকাররামায় আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশীত্বে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে কয়েকটি আল-কুর'আনুল কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে গ্রন্থটি পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি সাব্বীর উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে প্রদত্ত লেকচারের সমষ্টি। আল-কুর'আনের ৫০০টি আহ্‌কামের আয়াতের মধ্যে তাঁর গ্রন্থটিতে ২৩৩টি আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তাই এটিকে পুরোপুরি 'আহ্‌কামুল কুর'আনের' গ্রন্থ বলা যায় না। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে ৪০টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০টি সর্বমোট ৭০টি লেকচারের সমষ্টি। গ্রন্থটি অতীত ও বর্তমানকালের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধুনিক পদ্ধতিতে সুন্দর সহজ-সরল, সুশৃঙ্খলভাবে গভীর গবেষণায় সম্পাদিত। তিনি পুরো কুর'আন থেকে আহ্‌কামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু নির্বাচিত অংশ চয়ন করে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে সাব্বী বলেন,

ولست أزعم أن ما جاء في هذا الكتاب هو من جهدي الشخصي فحسب، بل هو خلاصة لأراء مشاهير المفسرين في القديم والحديث. وتناخ لأدمغة جبارة من فطاحل العلماء، وجهابذة المفسرين، سهرت على خدمة الكتاب العزيز ابتغاء وجه الله، منهم : الفقيه والمحدث واللغوي، والأصولي، والمفسر لكتاب الله، والمسنيط للأحكام، وغيرهم ممن كتبوا في القرآن العظيم.

“আমি এ ধারণা পোষণ করি না যে, উপর্যুক্ত গ্রন্থ আমার ব্যক্তিগত প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফসল; বরং এটি হচ্ছে নতুন-পুরাতন খ্যাতিমান মুফাস্সিরের মতামতের সারনির্ঘাস। যাঁরা আল-কুর'আনুল কারীমের আহ্‌কামের গবেষক,

ফকীহ, মুহাদ্দিছ, উসুলী এবং ভাষাবিদ, তাঁদের জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও মতামতসমূহ এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।”

এ গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রতিটি লেকচারের উপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। মাসজিদুল হারামের খতীব ও সৌদী আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী উপদেষ্টা শায়খ আব্দুল্লাহ খাইয়্যাৎ আলোচিত কিতাবটির ভূমিকায় লিখেন,

“শায়খ মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বুনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার কারণে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন, জ্ঞানগর্ভ সঠিক মান নির্দেশক তথ্য উপস্থাপনে অগ্রসর ব্যক্তিত্ব। এটি তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমে সু-দীর্ঘ সময়ে অবস্থান করে নিবিড় অনুসন্ধান, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, টানা সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতার মহান পেশায় লেগে থাকা এবং ধারাবাহিক গবেষণায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখারই সুফল। যেমনভাবে তাঁর গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক এবং উলামার জন্যে উপস্থাপিত মজবুত দু'খণ্ডে সম্পাদিত গ্রন্থটি আমাদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ সংযোজন। সাব্বুনী র. গ্রন্থটির উভয় খণ্ডের মাঝেই পুরানো পদ্ধতির গভীর জ্ঞান এবং আধুনিককালের সরল-সহজ, সাজানো, গোছানো পদ্ধতির সংমিশ্রণে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজটি চূড়ান্ত করেন। কিতাবটির গ্রন্থনা, দলীল-প্রমাণের উপস্থাপন, ১০টি বিষয়ের আওতায় ভূমিকার বক্তব্য এবং গ্রন্থকারের প্রয়াস-প্রচেষ্টার আঙ্গিকে আমাদের নিশ্চিত ধারণা এটি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচক্ষুর জ্যোতিতে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে আল-কুর'আনুল কারীমের নিগূঢ় তত্ত্ব উন্মোচনে প্রজ্ঞা এনে দেবে।”^{৩৬}

আস্-সাব্বুনী র. গ্রন্থটিকে মূলত দশটি মৌলিক বিষয়ের আঙ্গিকে বিন্যাস করেছেন। মূল গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর প্রতীয়মান হয় যে, যদিও গ্রন্থটি কুর'আনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর হিসেবে রচিত হয়নি, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লেখক তার পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের লেখকগণের মতামত তুলে ধরে যুগ সমস্যার সমাধানে দক্ষতার সাথে চেষ্টা করেছেন। আয়াতের মূল বক্তব্য নির্দেশ করে প্রতিটি লেকচারের জন্যে ভিন্নভিন্ন শিরোনাম প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কারও উপর কোন প্রকার আক্রমণাত্মক বক্তব্য প্রদান করেননি। কারও মতামত উপেক্ষা না করে নিরপেক্ষ মূল্যায়নে দলীল-প্রমাণের পক্ষাবলম্বন করে বিভিন্ন মতানৈক্যের সমাধান করেছেন। গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ গ্রন্থে ব্যবহৃত উক্তিসমূহের উল্লিখিত গ্রন্থ, খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান করেছেন। যা দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে উল্লিখিত হয়েছে। এতে তিনি ১৯টি গ্রন্থ, গ্রন্থকারকের নাম ও মৃত্যু সন উল্লেখ করেন। আলোচনাকে অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত করেছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, গ্রন্থটি নিরপেক্ষ গবেষণামূলক পদ্ধতিতে লিখিত হয়েছে। মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বুনী র. গ্রন্থটির রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকায় লিখেন,

কুর'আনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি জাতির মর্যাদা শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করান, অপর জাতিকে কুর'আনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রেক্ষাপটে ধ্বংসের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যান। আমার আশ্রয় সে মর্যাদাবানদের কাতারে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাঁদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা, যদিও আমি তাদের সমকক্ষ নই। মর্যাদাবানদের সাথে সমন্বয় সাধনে কল্যাণের পাল্লাই ভারী হয়। মৃত্যুর পরের সঞ্চয়-সঞ্চল সংগ্রহের মানসেই আমার দীর্ঘ তাওফীক দান করেন, যার আঙ্গিকে আমি জাতির কল্যাণে কিছু গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করব। যেমন

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفُطَع عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

“মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। যথা, সাদাকাহ জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান।”^{৩৭}

খ. পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

ইসলামের সঠিক ঘটনাসমূহ সরাসরি উপস্থাপন আয়াতের মূলপ্রতিপাদ্য হৃদয়ঙ্গমে এবং ইসলামের শত্রুদের আরোপিত-উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলীল। রাসুলুল্লাহ সা.-এর পারিবারিক জীবন ও একাধিক বিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যের অমুসলিম মনীষীদের সমালোচনার দাঁত ভাঙ্গা জাওয়াব প্রদান করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। প্রথম খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় **والرد عليها** শিরোনামে উত্থাপিত অভিযোগ পুরোপুরি খণ্ডন করে এর হিকমাত এবং কারণগুলো বুদ্ধিভিত্তিক এবং দলীল পেশ করেন। ৩১৮-৩২৭ পৃষ্ঠায় পর্দার শার'ঈ বিধান মায়হাবের ইমাম ও ফকীহগণের মতামত এবং দর্শনসহ বর্ণনা প্রদান করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৩-১৭৪ পর্যন্ত পর্দার বিধানের প্রেক্ষাপটে অপর যুবকের সামনে চেহারা খোলা রাখার বিপজ্জনক পরিণতি এবং কুফলের

ব্যাপারে ইউরোপের শিক্ষাবিদদের চিন্তা-চেতনার অসারতা তুলে ধরেন। আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার উপর এবং জটিল সমস্যার সমাধানে মুফাসসিরগণের বক্তব্যের নিরিখে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। বিশেষকরে ছবি এবং প্রতিকৃতি নিষিদ্ধের কারণ ও এর দলীল বিষয়ক বিতর্কের নিখুঁত সমাধান তিনি প্রদান করেন, যা আরব জাহানসহ পুরো পৃথিবীর গবেষকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ইসলামের বিধি-বিধানের সঠিক নীতিমালার আলোকে কারো নিন্দা কিংবা সমালোচনা তাঁকে সত্য প্রকাশে বিরত রাখতে সক্ষম হয় নি।

৩.৩. ক. কাবাসুম মিন নূরীল কুরআনিল কারীম ﴿قَبَسٌ مِّنْ نُورِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ﴾

গ্রন্থটিতে আল-কুর'আনুল কারীমের সূরাসমূহের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, আল্লাহর নির্দেশনার আওতায় শিষ্টাচারিতা, আইন-প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-সন্ধি এবং ইবাদতের নিয়ম-নীতিসহ সার্বিক বিষয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেন,

فهذه دراسة موضوعية تحليلية موسعة لسور القرآن الكريم، تبين مقاصدها وأهدافها وتضع الخطوط العريضة لما احتوته من آداب وأحكام وتشريع وما هدفت إليه من توجيه وإرشاد في إطار إصلاح الفرد والمجتمع.

“এই গ্রন্থটি কুর'আনুল কারীমের সূরাসমূহের মধ্যে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর বিস্তারিত বিশ্লেষণাত্মক বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা এবং সূরাসমূহের মাঝে যেসকল শিষ্টাচার, শারঈ বিধি-বিধান এবং ব্যক্তি ও সমাজের সংস্কারের প্রেক্ষিতে নির্দেশনাবলী অন্তর্ভুক্ত করেছে।”^{১৮}

আয়াতের বর্ণনায় বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে শানে নুযূল উল্লেখিত হয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মতামত তাফসীর গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রাত্যহিক প্রয়োজন ও চাহিদার আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে আল-কুর'আনের নির্দেশনা সম্বলিত পাঠ সাবুনী গ্রন্থটি উপস্থান করেন। গ্রন্থটি আট খণ্ডে মোট ১৯৮৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এটি বৈরুতের দারুল কুরআনিল কারীম থেকে ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি. প্রকাশিত হয়। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে:

১ম খণ্ড: এ খণ্ডটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সূরাহ আল-ফাতিহা, আল-বাকারা ও আল-ইমরান। দ্বিতীয় অংশে সূরাহ আন-নিসা, আল-মায়িদা ও সূরাহ আল-আন'আম-এর তাফসীর পেশ করেছেন। প্রথম খণ্ডে ৪০৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করেছেন। শরী'আতের আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ, কুর'আনে নবী করীম সা.-এর সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য মু'জিয়া হওয়ার প্রেক্ষাপটে 'কুর'আনের অলৌকিকত্ব' শিরোনামে সুবিশাল আলোচনা প্রদান করেন। যেমন সূরাহ বাকারার প্রথম আয়াত ১-এর ব্যাখ্যায় আস-সাবুনী র. উল্লেখ করেন,

“আরবদের সাথে সম্পৃক্ততা নেই এমন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত আশ্চর্যজনক পন্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের সূচনা করেছেন। সূরার প্রারম্ভটি বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে, যারা কুর'আন এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন নির্দেশনার দলীল-প্রমাণের আয়াতসমূহ আসমানী কিতাবের প্রেক্ষাপটে এমন নবীর মাধ্যমে দৃশ্যপটে সমুদ্ভাসিত হলো যার লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ততা নেই। এ সব বিচ্ছিন্ন এবং সমকক্ষ অক্ষরের মাধ্যমে আল-কুর'আনের চিরন্তন মু'জিয়া বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। আরবী ভাষা-সাহিত্যের উজ্জ্বল দিক পালরা এর সমকক্ষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম হওয়ায় প্রমাণিত হলো-আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সেরা ব্যক্তিত্বের অক্ষম তাই ই'জাযুল কুর'আনের বড় দলীল। এমনভাবে সাবুনী র. ঈমানদার, কাফির ও মুনাফিকের গুণাবলী সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। এর মাঝে কুর'আনের অত্যর্চ্য ব্যাখ্যা ইলমুল বালাগাহ-এর التمثيل সুন্দরভাবে সমন্বিত করে নিয়ে আসেন।”^{১৯}

২য় খণ্ড: এতে সূরাহ আল-আ'রাফ থেকে সূরাহ ইউনুস পর্যন্ত ৩৯৬টি বিষয়ে অত্যন্ত দলীল ভিত্তিক আলোচনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানবতার সম্মাননা প্রদর্শন এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্কীকরণ। আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, তার আওতায় আস-সাবুনী র. অত্যন্ত সুন্দরভাবে চারটি অনুগ্রহের বিষয়ে উপস্থাপন করেন।

খ. পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

কাবসুম-মিন নূরীল কুর'আন গ্রন্থে মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রায় প্রতিটি বিষয়ে শরী'আতের অকাট্য, সুদৃঢ় এবং গ্রহণযোগ্য দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহবৃন্দের মতামত বিশ্লেষণের আওতায় প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত ২,৯৪৮টি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সার্বিক দিক পর্যালোচনায় এনে যথাযথ এবং তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ পেশ করা হয়, যা প্রাজ্ঞ, তথ্যবহুল এবং বিশুদ্ধ আলোচনার এক আকর। এতে হাদীসের স্তর ভিত্তিক তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসের নম্বর প্রদান করা হলে গ্রন্থটির মান আরো বৃদ্ধি পেত। এরপরও বলা যায় যে, গ্রন্থটির আলোচনা উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক সহায়ক। এর ভাষা সহজ-সরল ও উপস্থাপনা সুন্দর।

৩.৪. ক. আত্-তাফসীরুল ওয়াদিহ্ আল-মুইয়াস্সার (التفسير الواضح الميسر)

সহজ-সরল ভাষা, বিশুদ্ধ বর্ণনা এবং রায়ের মাঝে সমন্বয়, আয়াত ও সূরাসমূহের অবতরণের উপলক্ষ, বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে আস্-সাব্বুনী 'আত্-তাফসীরুল ওয়াদিহ্ আল-মুইয়াস্সার' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। সাব্বুনী র. সর্বসাধারণের বোধগম্য করে আল্লাহর কিতাবের মূল উদ্দেশ্যকে সহজভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি নিজেই গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

فإنَّ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فِي أَمْسٍ الْحَاجَّةِ. إِلَى فَهْمِ كِتَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَالتَّمَسُّكِ بِهِ، فِي عَصْرِ طَغَتْ فِيهِ الْمَادَّةُ، وَتَاهَتْ فِيهِ الْبَشَرِيَّةُ فِي خِطْمِ الْمَادِيَّةِ، فَاحْرَفَتْ عَنْ هِدَايَةِ اللَّهِ، مَعَ أَنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، هَذَا النُّورَ الْإِلَهِيَّ الْوَضَاءَ، الْمُنْقِذَ لَهُمْ مِنَ الشَّقَاءِ، لَذَا كَانَ لَزَامًا عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَعِيدُوا الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، إِلَى مَرْكَزِ عِزِّهَا وَسَيَادَتِهَا، وَذَلِكَ بِالْإِرْتِبَاطِ بِكِتَابِ رَبِّهَا، الَّذِي فِيهِ السَّعَادَةُ، وَالنَّجَاحُ وَالْفَلَاحُ.

“বর্তমান এ সমাজে যখন বৈষয়িক কর্মকাণ্ড সীমা ডিঙ্গিয়ে মানবতাবোধ বিসর্জিত হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের নিকট আল্লাহ তা'আলা কিতাব হৃদয়ঙ্গম করত তা আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হলো। মানব মণ্ডলী যখন সঠিক পথ নির্দেশনা হতে বিচ্যুতি হলো, তখন তাদের সম্মুখে মহান মালিকের এ প্রোজ্ঞল শিখা-জ্যোতি, যা তাদেরকে দূর্ভাগ্য হতে পরিব্রাণ প্রদানকারী। তাই জাতির প্রাজ্ঞ উলামাদের উচিৎ মুসলিম উম্মাহকে তাদের হৃত গৌরব এবং নেতৃত্বের দিকে ফিরিয়ে আনা। আর তা সম্ভব হবে নিজেদেরকে আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সৌভাগ্য, সফলতা এবং কল্যাণ।”^{২০}

১৬২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থটি ১৪২০ হিজরীর রমযান মাসের শেষার্ধ্বে মসজিদুল হারামে বসে সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি এক খণ্ডে ২০০১ সালে বৈরুতের মুআস্সাসাতুর রাইয়ান এবং লেবাননের মাতাবি'উল উফূক থেকে প্রকাশিত হয়।

খ. পর্যালোচনা

এ তাফসীরটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি সমন্বিত একটি তাফসীর গ্রন্থ। এতে দীনের জ্ঞানের বিষয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে ঠিক তেমনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন- তিনি উল্লেখ করেন,

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের তিনটি মৌলিক নিদর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।^{২১}
২. সৃষ্টি জগতের জ্ঞানের অধিকারীরা আল্লাহর কুদরতের বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়ার সমূহ সুযোগ রয়েছে।^{২২}
৩. আধুনিক বিজ্ঞান ও উল্মুল ইলাহিয়ার সমন্বয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।
৪. এ তাফসীর গ্রন্থটির অধিকাংশই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দাওয়াতী সফরে থাকাবস্থায় লিপিবদ্ধ করেন। তার সফরে থেকে গ্রন্থ প্রণয়নের বাস্তবতা সূরাহ যিলযালের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি যখন বড় ধরনের ভূমিকম্পের বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন ছোট ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি লিখেন,

والسورة تحدث عن الزلزلة الكبرى وقيام الساعة، وبهذه المناسبة فقد حدث في تركيا زلزال عنيف، ذهب ضحيته ما يزيد على ٤٠٠٠٠ (أربعين ألف) نسمة، ودمرت عشر الآف من المنازل، حدث ذلك ليلة الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى سنة ١٤٢٠ هـ الموافق عام ١٩٩٩ م وكان يومًا عيبًا، مفزعًا حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت. وقد كنت في تلم المنطقة، التي حصل فيها الزلزال، وأنا أشتغل في هذا التفسير، واهزت بناء الأرض اهتزازا عنيفًا، أيقنا في تلك الساعة بالهلاك والتموت، ولكن الله نجاني ونجى من معي من المئتمنين ببركة خدمتي لكتابه العزيز، الذي كنت قد قاربت علي الإنتهاء منه، وكان يومًا عصيبًا، والكرب فيه شديد والحمد لله على فضله وإتمامه، وفي ذلك عبرة وأء عبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار.

“সূরাটিতে বড় ধরণের ভূমিকম্প এবং কেয়ামতের বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ/০৭/০৫/১৪২০ হিজরীর মঙ্গলবার রাতে তুরস্কে এক মারাত্মক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। যাতে চল্লিশ সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয় এবং দশ সহস্রাধিক বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত হয়। ভয়ঙ্কর এ রাতে আমি আলোচিত তাফসীর প্রণয়নের কাজে লিপ্ত ছিলাম। ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতায় বাড়ি-ঘরের ভিত্তি কেঁপে উঠল, আমরা ঐ সময়ে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি ছিলাম। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এবং আমার সাথী ঈমানদারগণকে কুর‘আনুল কারীমের বদৌলতে রক্ষা করলেন। এর মাঝে যথেষ্ট শিক্ষণীয় নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে গ্রন্থটি আমি শেষ করেছিলাম, এটি একটি অসহনীয় ও তীব্র যন্ত্রণাময় দিন ছিল। আমাদের প্রতি আল্লাহর করুণা ও উদারতার জন্য সকল প্রশংসা। এতে একটি উদাহরণ ও শিক্ষা বিষয় রয়েছে, তা এই, ‘অতএব হে অন্তরদৃষ্টি সম্পন্নগণ সতর্ক হও।’”^{২৩}

গ. মূল্যায়ন: এ সুবিশাল তাফসীর গ্রন্থটিতে লেখক কোনো ফুটনোট ও টীকা ও তথ্যনির্দেশা প্রদান করেননি। পুরো গ্রন্থের কোথায়ও আল-কুর‘আনের কোনো সূরাহ নাম উল্লেখ করেননি। হাদীসের স্তর ভিত্তিক কোনো তথ্য পেশ করেননি। গ্রন্থটিতে সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলেও সকল শ্রেণির পাঠক মহলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এর শব্দাবলী ও বাক্য গঠন সহজ-সরল ও সাবলীল। গ্রন্থটি বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। যা গ্রন্থটির মানকে বৃদ্ধি করেছে।

৩.৫. ক. মা‘আনিউল কুরআনিল কারীম লিন্-নাহাস ﴿مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِلنَّحَّاسِ﴾

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা অবস্থায় আস-সাব্বুনীকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সেল ইমাম আবু জা‘ফর আন-নাহাস (মৃ. ৩৩৮ হি.) কর্তৃক রচিত তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থ ‘মা‘আনিল কুর‘আন’ গ্রন্থটি তাহকীক-তাকরীজ করান। সাব্বুনী চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থটির সম্পাদনা সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি. উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ অর্থায়নে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করে।

খ. মূল্যায়ন: সাব্বুনী এ তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত আল-কুর‘আনের আয়াত সূরার নাম ও নাম্বার সংযোজন করেন। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স উল্লেখ করেন। যেমন- তাফসীরুত-তাবারী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, দুররুল মানসূর। হাদীসগুলোর স্তর বিন্যাস করে তথ্যসূত্র প্রদান করেন। গ্রন্থে উল্লেখিত কবিতাগুলো মূল দিওয়ানের সাথে মিলিয়ে তার প্রেক্ষাপট ও প্রমাণপঞ্জি উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন আরবী অভিধান-এর সাথে মিলিয়ে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থগুলো উল্লেখ করেন। যেমন- লিসানুল আরাব, আসই-সিহাহ, কামুসুল মুহীত, তাজুল আরুয, তাহযীবুল লুগাহ। পাদটীকা ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন। গ্রন্থটির তাহকীক করার জন্য সাব্বুনী প্রায় দু’হাজার গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। গ্রন্থটি সম্পন্ন করতে তার চার বছর সময় ব্যয় হয়েছিল। সাব্বুনীর তাহকীক-এর উদাহরণ নিম্নরূপ,

والنص من صفحة ١١٥، قول النحاس قيل: معنى الحج مأخوذ من قولهم: حججت كذا أي تعرفت كذا فالج يأتي مواضع يتعرفها.

“নুসখাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৫। আন-নাহাস বলেন, “এতে বলা হয়েছিল: হজ্জ শব্দের অর্থ তাদের বক্তব্য থেকে নেয়া হয়েছে: আমি অমুক-অমুক হজ্জ করেছি, যার অর্থ আমি অমুক-অমুককে চিনতে পেরেছি, তাই হজ্জযাত্রী আসে। যে জায়গাগুলো সে চিনেছে।”^{২৪}

৩.৬. ক. মুখতাসারু তাফসীর ইবন কাছীর (مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ ابْنِ كَيْثِر)

এ গ্রন্থটি আস্-সাব্বুনী র.-এর এক যুগান্তকারী তাখরীজ ও তাহকীককর্ম। এটি তিন খণ্ডে ২০৫২ পৃষ্ঠায় দারুস্-সাব্বুনী থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহকীক করার ক্ষেত্রে আস্-সাব্বুনী হাদীসের দীর্ঘ সনদ বাদ দিয়ে শুধু মূল বর্ণনাকারী সাহাবী রা.-এর নাম উল্লেখ করেছেন। কুর'আনুল কারীমের যে সব আয়াত 'কুর'আনের তাফসীর কুর'আন'-দ্বারা করার নীতিতে কাজিফত অংশটুকু রেখে অবশিষ্ট অংশ বাদ দিয়েছেন। বিশুদ্ধ হাদীস রেখে দুর্বল হাদীসগুলো বাদ দিয়েছেন। তাবী'ঈগণের মধ্যে যাদের বর্ণনা বিশুদ্ধতম সেগুলো উল্লেখ করেছেন। ইসরা'ঈলী বর্ণনাগুলো পরিপূর্ণভাবে কাট-ছাঁট করেছেন। অপ্রয়োজনীয় ফিক্‌হী মতভেদগুলো বাদ দিয়েছেন।

খ. মূল্যায়ন: আস্-সাব্বুনী র.-এর তাখরীজ ও তাহকীকৃত 'মুখতাসারু ইবন কাছীর' গ্রন্থটিতে সামান্য কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এটি মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর একটি বড় দলীল ভিত্তিক কর্ম। হাদীসের স্তর ভিত্তিক তথ্য পেশ করেছেন কিন্তু নাম্বার প্রদান করেননি। গ্রন্থটিতে প্রকাশের সন উল্লেখিত হয়নি। সূচিপত্র প্রতিটি খণ্ডে প্রদান না করে তৃতীয় খণ্ডে প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭. ক. মুখতাসারু তাফসীরুত-তাবারী (مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الطَّبْرِيِّ)

গ্রন্থটি তাহকীকের পর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৪৯০+৫৬৮= ১০৫৮ পৃষ্ঠায় মিশরের দারুত-তুরাস আল-আরাবীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটির প্রথমার্ধ (সূরাহ আল-বাকারা থেকে বনী ইসরাঈল পর্যন্ত) সাব্বুনী সম্পাদন করেন। বাকী অংশ ইমাম মুহাম্মদ ইবন সা'উদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের প্রফেসর ড. সালেহ আহমাদ রেজার মাধ্যমে প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংযোজন করে পুরোপুরি সম্পাদনা করেন। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯০, দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬৮। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৫৮। সাব্বুনী কর্তৃক গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। যা দ্বারা পাঠকবৃন্দ জ্ঞান আহরণ করতে তৃপ্তিবোধ করেন। তার কর্মটি চাটিভাগে সম্পাদিত হয়েছে- ক. তিনি এ তাফসীরটি যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকী অংশগুলো বাদ দিয়ে দেন। খ. হাদীসের বিশুদ্ধ মান ও অবস্থান তুলে ধরেন। গ. ইসরা'ঈলী বর্ণনা মুক্ত করেন। ঘ. প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পোনী সংযোজন করেন।

খ. মূল্যায়ন: মুখতাসারুত তাবারী গ্রন্থটি সাব্বুনী র.-এর এক যুগান্তকারী কর্ম। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ড. রাশিদ রাজিহ এবং শরী'আহ অনুমোদন ডীন ড. আলী আব্বাস আল-হাকামী গ্রন্থটির ভূয়শী প্রশংসা করে মন্তব্য লিখে দিয়েছেন। একটি বিশাল প্রতিষ্ঠিত তাফসীরের মৌলিক ত্রুটি চিহ্নিত করা এক দুঃসাধ্য কাজ। এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করণের জন্য বিশ্বের আলিম সমাজের নিকট সাব্বুনী র. একজন মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত লাভ করেন।

৩.৮. ক. তানবীরুল আযহান ফী তাফসিরি রুহুল বায়ান লিল-বুরসুতী (تَنْوِيرُ الْأَذْهَانِ فِي تَفْسِيرِ رُوحِ الْبَيَانِ (لِلْبُورْسُوتِيِّ))

রুহুল বায়ান গ্রন্থটি দশ খণ্ডে প্রকাশিত। এর রচয়িতা শায়খ ইসমাঈল হাক্কানী। তিনি প্রসিদ্ধ একজন মুফাস্সির হিসেবে পরিচিত। আস্-সাব্বুনী র. এ গ্রন্থটিকে তাহকীক ও তাখরীজ করেন, যা চার খণ্ডে প্রকাশ করেন। এটি দিমাশকের দারুল কলম সংস্থা থেকে ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩২, দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৬, তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪১ ও চতুর্থ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬৩। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৫২।

আরবী ভাষায় রচিত এ তাফসীর গ্রন্থটিতে বহু সংখ্যক ফার্সী কবিতা উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। ফার্সী ভাষার সাথে সম্পৃক্ততা নেই তাদের পক্ষে এ গ্রন্থ থেকে উপকার লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ। সৌদী আরবের জিদ্দার কয়েক ইসলামী বিশেষজ্ঞ বিশেষত শায়খ আব্দুল্লাহ আব্বুল হাসান আস্-সাব্বুনীকে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংক্ষিপ্তকরণ ও বিশ্লেষণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধক্রমে আস্-সাব্বুনী এ অসাধ্য কর্মটি সম্পাদন করেন।

খ. মূল্যায়ন: গ্রন্থটিতে বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে তাখরীজ করা হয়েছে। হাদীস ও সাহাবীগণের বর্ণনার মধ্যে যে সব দুর্বল উক্তি অনুপ্রবেশ করেছে তা থেকে মুক্তকরণ করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। কবিতার উদ্ধৃতি পৃষ্ঠা নম্বরসহ সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থের অভ্যন্তরে ফার্সীভাষার আলোচনা ও বিভিন্ন ফার্সী কবিতার উদ্ধৃতিগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে সাব্বনী মতামতসমূহের মধ্যে দৃঢ় এবং প্রাধান্য প্রাপ্ত মতামত গ্রহণ করেন।

৩.৯. ক. আল-মুক্তাতাফ মিন উয়ুনিত-তাফসির লিল-মানসুরী (الْمُقْتَطَفُ مِنْ عُيُونِ التَّفَاسِيرِ لِلْمَنْصُورِيِّ)

গ্রন্থটি আল-কুর'আনুল কারীমের তাফসীর বিষয়ক। ১৩৮৩ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের দ্বিতীয় তারিখে বুলগেরিয়ার 'সোফিয়া' নামক স্থানে 'আল-মুক্তাতাফা' নামে তাফসীরের পাণ্ডুলিপিটি চূড়ান্ত করেন। সাব্বনী র. উম্মুল কুররী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শাখায় কর্মরত অবস্থায় তাঁর এক তুর্কি বন্ধু সদ্য ইত্তিকাল পাওয়া এক প্রখ্যাত তুর্কি আলিমের রচিত আলোচিত তাফসীরের বিশাল এক পাণ্ডুলিপি জাতির কল্যাণে বিশ্লেষণপূর্বক ছাপিয়ে দিতে অনুরোধ জানান। তিনি জিদদার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শায়খ আব্দুল্লাহ আবুল মুহসিনের অর্থায়নে গ্রন্থটিকে দুই বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম করত তাহকীক ও তাখরীজ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।^{২৫} গ্রন্থটি দামেশকের দারুল কলম এবং বৈরুতের দারুল-শামিয়াহ থেকে ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি. পাঁচ খণ্ডে সম্পাদিত হয়ে ২৯২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

খ. মূল্যায়ন: গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ সমতুল্য। এতে তাফসীর বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ভিত্তিহীন যে সব উক্তি ছিল তিনি তা বাদ দিয়েছেন। গ্রন্থটি বহু সংখ্যক হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। সাব্বনী র. উক্ত হাদীসগুলোর তাখরীজ করে এগুলো মান বিন্যাস করেন। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় সাব্বনী র.-এর দক্ষ হাতের সম্পাদনায় তাফসীর গ্রন্থটি গবেষকবৃন্দের জন্য একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৩.১০. ক. আত-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন (الَّتَيْبَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ)

সাব্বনী কর্তৃক উলুমুল কুর'আন বিষয়ক একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ 'আত-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন'। এতে আল-কুর'আনের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়সমূহ অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর পর্যন্ত মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদে শিক্ষকতা করেন। সে সময়ে শিক্ষার্থীদেরকে তিনি উলুমুল কুর'আন বিষয়ক ক্লাস গ্রহণ করতেন। তাঁর উলুমুল কুর'আন বিষয়ে পাঠদানে শিক্ষার্থীগণ তাদের পাঠ্যসূচির প্রয়োজন পূরণে এসব শ্রেণিকক্ষের বক্তব্য অন্যন্ত উপকারী হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ করে আস-সাব্বনী তাঁর শ্রেণিকক্ষের বক্তব্যগুলো একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকগণ কুর'আনের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভে ধন্য হয়। গ্রন্থটির অধ্যায়সমূহ এই- গ্রন্থকার প্রথমে ভূমিকা প্রদান করেছেন। এতে তিনি গ্রন্থটি রচনার পটভূমি উল্লেখ করেছেন। প্রথম অধ্যায়: উলুমুল কুর'আন। দ্বিতীয় অধ্যায়: আসবাবুন নুযূল। তৃতীয় অধ্যায়: হিকমাতু নুযূলিল কুর'আনিল কারীম। চতুর্থ অধ্যায়: জাম'উল কুর'আন। পঞ্চম অধ্যায়: আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন। ষষ্ঠ অধ্যায়: আল-মুফাস্সিরুন মিনাত্ তাবিস্। সপ্তম অধ্যায়: ই'জাযুল কুর'আন। অষ্টম অধ্যায়: মু'জিয়াতুল কুর'আন আল-ইলমিয়াহ্। নবম অধ্যায়: নুযূলুল কুর'আন আলা সাবআতিন আহরুফিন ওয়াল-কিরাআতু আল-মাশহূর।

খ. গ্রন্থটির উৎসাবলি

মুহাম্মাদ আলী আস-সাব্বনী র. আত-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন গ্রন্থটি রচনায় কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, উলুমুল কুর'আন, ফাতাওয়া, আকাঈদ, ইলমুর রিজাল ও জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ থেকে উৎস গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের পাদটীকায় এসকল সহায়ক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থপঞ্জি প্রদান করেননি এবং এ গ্রন্থগুলোর পূর্ণ ঠিকানা অর্থাৎ প্রকাশনা স্থান, প্রকাশনা সংস্থা, সংস্করণ ও

প্রকাশনার সাল ইত্যাদি কোনো স্থানে উল্লেখ করেননি। আমরা আত্-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করে ৩৩টি সহায়ক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ. সংস্করণ, মুদ্রণ ও অনুবাদ

আত্-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন গ্রন্থটির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশ্বের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা থেকে একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটি ইংরেজি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আরবী ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত সংস্থাগুলো এই- ১. বৈরুত থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ২. বৈরুতের আলামুল কুতুব থেকে ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি. প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৯। ৩. মিশরের দারুস সাব্বুনী থেকে ২০০৩ খ্রি./১৪২৪ হি. দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪। ৪. বৈরুতের আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ্ থেকে ২০১৬ খ্রি./১৪৩৭ হি. প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৯।

ঘ. 'আত্-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন' গ্রন্থ মূল্যায়ন

বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ আল-কুর'আনুল কারীম। এটি ঐশি গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মার জন্য মহাগ্রন্থটি জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃত। এ গ্রন্থসম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো উলুমুল কুর'আন। সাহাবী ও তাবিঈগণের পরবর্তী যুগ থেকে অদ্যাবধি উলুমুল কুর'আন সম্পর্কিত বহু সংখ্যক মনীষী উলুমুল কুর'আন বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ আলী আস্-সাব্বুনী উলুমুল কুর'আন বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নামকরণ করেন আত্-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন'। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থটির মূল্যায়ন করা কষ্টসাধ্য। এরপরও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা গ্রন্থটির নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন সাধন করতে পারি। যেমন- ক. আত্-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুর'আন আধুনিক যুগে উলুমুল কুর'আন বিষয়ক একটি সময়োপযোগী গ্রন্থ। খ. এর ভাষা ও বিষয়বস্তুসমূহ সহজ, সরল ও প্রাজ্ঞ। গ. এটি রচনায় লেখক ৩৩টি গ্রন্থ থেকে উৎস ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। ঘ. গ্রন্থটি সংক্ষেপ হলেও এর থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকগণ সহজে উলুমুল কুর'আন বিষয়ে অবহিত হতে পারেন। এটি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কুর'আন গবেষণার ফসল তার এক সার্থক সংযোজন। ঙ. গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। যা দ্বারা জানা যায় যে, পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। চ. উলুমুল কুর'আন বিষয়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের পাঠ্যসিলেবাসে এটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা দ্বারা আমরা নির্দিষ্টায় বলতে পারি যে, গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে কুর'আনুল কারীমের বিজ্ঞান ভিত্তিক মু'জিয়া, তাফসীর বিদ-দিরায়াহ, তাফসীর বিল ইশারা, গারাইবুত তাফসীর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বিশং শতাব্দীতে এসে যা বলছে কুর'আনুল কারীম অনেক পূর্বেই তা ব্যক্ত করেছে। সাব্বুনী বিজ্ঞানের সাথে এ সমন্বিত আলোচনা দিয়ে কুর'আনুল কারীমের চিরন্তন মু'জিয়ার প্রমাণ পেশ করেন। সাব্বুনী গবেষক ড. মুহাম্মদ আমীনুল্লাহ বলেন,

“বিজ্ঞানের সর্বশেষ মতবাদ যা কুর'আনুল কারীমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাব্বুনী আধুনিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করে তাঁর আলোচিত গ্রন্থে কুর'আনুল কারীমের চিরন্তন অলৌকিকত্ব বিষয়ে সমন্বিত আলোচনা পেশ করে বলেন,

فالقرآن صور مصدر هذا الكون (بالدخان) فهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء الملموسة. أيكون في مقدور امي- منذ أربعة عشر قرناً- أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون شيئاً عن هذا الكون وخفاياه؟

“অতঃপর কুর'আন এ সৃষ্টি জগতের উৎসমূল বিষয়ে যে চিত্র উপস্থাপন করেছে, তা হলো, ধুমপুঞ্জ। এটি এমন এক উদগীরণ হওয়া বস্তু যা স্বাভাবিক হিসেবেই আরবরা অনুভব করে। যখন সৃষ্টিতত্ত্বের সুপ্ত রহস্য বিষয়ক জটিল বিষয় সম্পর্কে কেউই অবহিত ছিল না, চৌদ্দশত বছর পূর্বের একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে তা কি অনুধাবন করা সম্ভব?”^{১৬} এতে প্রতীয়মান হয় সাব্বুনী ‘কুরআনিক সায়েন্স’-এর আওতায় তাঁর আলোচিত এ গ্রন্থে প্রচুর বিজ্ঞান ভিত্তিক সমন্বিত উপাদান রেখেছেন।”

৩.১১. ইজায়ুল বায়ান ফী মাকাসিদী সুওয়ারিল কুর'আন ﴿إِيجَازُ الْبَيَانِ فِي مَقَاصِدِ سُورِ الْقُرْآنِ﴾

গ্রন্থটিতে কুর'আনের মৌলিক লক্ষ্য এবং মুখ্য উদ্দেশ্য বিষয়ে সাবলীল ভাষায় তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেন। প্রতিটি সূরার আয়াত সংখ্যাসহ মাকী না মাদানী তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাষার ক্ষেত্রে আল-কুর'আনের প্রভাব, শব্দগত নির্দেশনা ও ভাবগত দর্শন, সম্বোধনের নির্গত দিক, ইশারা ইঙ্গিত, সূরার ব্যাখ্যায় কুর'আন নির্গত জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ, আয়াতসমূহের আন্তঃমিল, কুর'আনের বিভিন্ন নাম, কুর'আনের যুক্তিতর্ক প্রক্রিয়া, কুর'আনের বিভিন্ন নাম, উপনাম, কুর'আনের মাহাত্ম্য, কতিপয় বৈচিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আয়াত ও কুর'আনের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ-রাষ্ট্রে, যুদ্ধে, সন্ধিতে, মানুষের চরিত্র ও উন্নত নৈতিকতা গড়ার প্রেক্ষাপটে সার্বিক কল্যাণ অর্জনের নিমিত্তে এটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও সাহিত্যমান অক্ষুন্ন রেখে কুর'আনের শিক্ষণীয় ঘটনাপ্রবাহের উপস্থাপনায় অত্যন্ত সহজ ধারণা পাওয়ার এক অনুপম সহযোগী এ এ গ্রন্থটি। গ্রন্থটি পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৩। এটি 'মাকতাবাতুল গাযালী' প্রকাশনী থেকে এক খণ্ডে ১৩৯৯ হিজরী/১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩.১২. ক. মিন কুনুযিস্-সুন্নাহ (مِنْ كُنُوزِ السُّنَّةِ)

গ্রন্থটি চল্লিশটি হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত ২০৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এটি সাব্বুনীর মক্কা মুকাররামার শরী'আহ কলেজে প্রদত্ত আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের মাঝে যে ক্লাস লেকচার প্রদান করেছিলেন তার সমষ্টি। ১৩৯০ হিজরী সালে মক্কানগরীতে বসে এর পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন। এর ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান উন্নত, বালাগাত বিষয়ে নিয়ে বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন, চমৎকার শব্দচয়ন, হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা এবং সুস্বভাবে হাদীসের ভাব পেশ করা হয়েছে। যা থেকে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হতে পারেন। ১৪০৯ হিজরী/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে দিমাশক ও বৈরুতের দারুল কলম থেকে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।^{২৭}

খ. মূল্যায়ন: মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাদীসগুলোকে বিষয় ভিত্তিক সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। এতে হাদীসের শাব্দিক বিশ্লেষণ, বালাগাতের সমন্বিত আলোচনা, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, হাদীসের বর্ণনাকারীর পরিচয় এবং সাহিত্যমান ঠিক রেখে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায় তাঁর আলোচিত হাদীসগুলোর চয়ন চমৎকার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুবই সমৃদ্ধ। সাহিত্যের মান সম্পন্ন বিশ্লেষণধর্মী। হাদীসের বিশ্লেষণে বহুসংখ্যক কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যেমন- কুর'আনের আয়াতের নম্বর ও সূরার নাম উল্লেখ করেননি। হাদীস গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। বাব, অনুচ্ছেদ, হাদীস নাম্বার ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করেননি। হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই। গ্রন্থের কোথাও ফুটনোট ব্যবহার করেননি।

৩.১৩. আন্-নুবুওয়াত ওয়াল আশ্বিয়া (النُّبُوَّةُ وَالْأَنْبِيَاءُ)

আল-কুর'আনে বর্ণিত নবীগণের জীবন বিষয়ক গ্রন্থটি। এতে নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী জীবন, মানবীয় প্রজ্ঞার ভাব-বিশ্লেষণে তাঁদের দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের প্রভাব নিয়ে সহজ-সরল ভাষায় আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনা সম্পর্কে সাব্বুনী র. নিজেই বলেন,

هذه محاضرات في تاريخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القى عليها على طلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة قسم التاريخ، وقد راعيت فيها الإيجاز والتنقيح للأخبار فتركت الغث وأخذت الصحيح السمين، واعتمدت على أوثق المصادر، ألا وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأكثر من الاستشاد به ثم على أقوال المفسرين الموثوقين.

“এটি নবীগণের ইতিহাসের উপর প্রদত্ত বক্তৃতামালা, যা আমি পবিত্র মক্কার শরী'আহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছিলাম। এতে তথ্য উপস্থাপনে সংক্ষিপ্তকরণ, নির্ভরযোগ্য এবং স্বচ্ছ বিবরণ গ্রহণ করত বিতর্কিত, অপ্রামাণ্য এবং ত্রুটিযুক্ত উৎস বর্জনে পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সবথেকে নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য উৎস আল্লাহর কিতাব যার সম্মুখে বাতিল

কল্পনিকালেও টিকতে পারে না, তা থেকে অধিকাংশ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। অতঃপর নির্ভরযোগ্য তাফসীরকাগণের সুদৃঢ় উক্তিসমূহের উপর আস্থা রেখেছি, যেমনিভাবে সাইয়েদুল মুরসালীন সা.-এর নিকট থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় আসা অথ্যের উপর নির্ভর করেছি।”^{২৮}

এটি মূলত মক্কা আল-মুকাররমার শরী‘আহ্ অনুষদের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সমন্বিত রূপ। গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে নুরুওয়্যাতের পরিচয়, এর বৈশিষ্ট্য, গুণাবলীসমূহ দলীল দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়: নবীগণের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় অধ্যায়: ইসমাতুল আম্মিয়া, চতুর্থ অধ্যায়: কাসাসুল আম্মিয়া, পঞ্চম অধ্যায়: আল-কুর‘আনে আদম (আ), ষষ্ঠ অধ্যায়: পাঁচজন দৃঢ়চেতা রাসুলের বর্ণনা এবং সপ্তম অধ্যায়: ১৯ জন নবী-রাসুলের জীবন-কর্ম সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে কাল্পনিক কাহিনী ও ইসরাঈলী কিংবদন্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০। এটি ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার ‘মাকতাবাতুল গায়ালী’ থেকে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩.১৪. ক. আল-মাওয়ারিছ ফীশ্-শারীআতিল ইসলামীয়াতি ফী দাউ‘ইল কিতাব ওয়াস্-সুন্নাহ্ (الْمَوَارِثُ فِي)

(الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ)

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে কুর‘আন-সুন্নাহর দলীল, সাহাবী, তাবি‘ঈ, তাবে-তাবি‘ঈ এবং আয়িম্মা-মুজতাহিদীন এর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তসূচক ফয়সালাসহ যুক্তিভিত্তিক একটি গ্রন্থ। সাব্বুনী গ্রন্থটি ১৩৮৮ হিজরী সালে রচনা সম্পন্ন করেন। এটি মক্কার ‘উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়’-এর কুর‘আন ক্লাসে প্রদত্ত বক্তৃতামালা। দিমাশকের দারুল কলম থেকে ১৪১৩ হিজরী/১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ১০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত।^{২৯} অধ্যায়গুলো এই- প্রথম অধ্যায়: আয়াতুল মিরাহ্। এতে মিরাহ্ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়: তারীফুল মিরাহ্। এ অধ্যায়ে মিরাহ্‌র পরিচয়, এর সাথে সম্পর্কিত অধিকারসমূহ, ওয়ারিশদের শ্রেণি বিন্যাস এবং কারা মিরাহ্‌র হকদার তাদের সম্পর্কে ফিক্‌হবিদগণের মতামত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়: আল-কুর‘আনের বর্ণিত মিরাহ্‌র হকদার। চতুর্থ অধ্যায়: আসাবা ও তার প্রকার। পঞ্চম অধ্যায়: উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। ষষ্ঠ অধ্যায়: মিরাহুল জাদি মা‘আল ইখওয়াত। ভাইদের সাথে দাদার সম্পত্তিতে অংশীদার হওয়া সম্পর্কিত বিষয়। সপ্তম অধ্যায়: আহকামুর রাদ্ ওয়াল আউল। এতে পাওনাদার বেশি হলে আনুপাতিক হার বহাল রেখে সকলশ্রেণির ওয়ারিশের সম্পদ বন্টন করা এবং উদ্ধৃত অংশ পুনঃবন্টন সম্পর্কিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়: আল-হিসাব ওয়া তারীকু তাসহীহ আল-মাসাইল অর্থাৎ সঠিক হিসাব এবং বন্টন বিশুদ্ধকরণ সম্পর্কিত আলোচনা। নবম অধ্যায়: আহকামুল মুনাসিবাত ও দশম অধ্যায়: যাবিল আরহামদের ওয়ারিশ অর্থাৎ অংশীদার হওয়া, নিরুদ্দেশ ব্যক্তি, নিমজ্জিত এবং আপঘাতে মৃত্যুবরণকারী সম্পর্কিত আলোচনা প্রদান করা হয়েছে।

খ. মূল্যায়ন: সাব্বুনী র. ইলমুল ফারাইয বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কঠিন কঠিন মাসআলার সমাধান দিয়েছেন উক্ত গ্রন্থে। বিভিন্ন দেশের শরী‘আহ্ আদালত ও তাঁর শরণাপন্ন হতো উত্তরাধিকার আইনের মাসআলা নেয়ার জন্য। তিনি অত্যন্ত সজহ ভাবে কঠিন মাসআলার সমাধান দিতেন। এ গ্রন্থটি আরব বিশ্বের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও এ গ্রন্থটি সিলেবাসভুক্ত করে পাঠদান করা হয়।

৩.১৫. ক. আল-ফিক্‌হ্-শ-শার‘ঈ আল-মুয়াস্সার ফী দুইল-কিতাব ওয়াস্-সুন্নাহ্ (أَلْفَهْمُ الشَّرْعِيِّ الْمُسَرَّر: فِي)

(ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ)

গ্রন্থটি চার মাযহাবের মতামতগুলো বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থটি ছোট ছোট আট খণ্ডে বিভক্ত। বেরুতের দারুল কুরআনিল কারীম সর্বপ্রথম ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি. প্রথম প্রকাশ করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৩০।^{৩০} এ গ্রন্থটিতে বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সাথে কুর‘আন-সুন্নাহ্, ফিক্‌হ, আকাইদ, ফারাইয, ইসলামের দেওয়ানী এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও কার্যবিধির সাথে কাজিত সম্পৃক্ততা না থাকায় তারা

সার্বিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহ ইসলামের তাহযীব-তামাদ্দুন, ইসলামী ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে কুর'আন-সুন্নাহ অনুসৃত নীতিমালার অনুপস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের প্রভাব মারাত্মকভাবে ভোঁকে বসে। যার প্রেক্ষিতে তারা বৈষয়িক কর্মকাণ্ডে সীমাহীন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তারা ইসলামের ফিক্‌হী দিকটাও বিস্মৃত হতে তাকায় বিশাল ডিগ্রী অর্জন করার পরও অতি সাধারণ বিষয়ে উম্মাহর অজ্ঞতা ফুটে উঠে। তাই সাব্বুনী র. 'আল-ফিক্‌হুশ্-শারঈ আল-মুয়াস্সার ফী দাউইল-কিতাব ওয়াস্-সুন্নাহ' শিরোনামে মানুষের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয়কে সমন্বয় করে, বিশেষ ইবাদাত-মু'আমালাত সম্পর্কে স্বচ্ছ অভিহ্যতা অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুর'আন-হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষ ইমাম-মুজতাহিদদের প্রজ্ঞালব্ধ গবেষণা কর্মের আওতায় হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেয়ার নিয়্যতে ধারাবাহিক এ ফিক্‌হ সিরিজটি জাতির সামনে উপস্থাপন করেন।

খ. মূল্যায়ন: সাব্বুনী র. গ্রন্থটি পুরোপুরি পর্যালোচনায় তাঁর দাবীর যথার্থতা প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থটিতে চার মাহহাবের মতামতগুলো বিশুদ্ধ হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুর'আন-হাদীস ও ফকীহ সাহাবী এবং তাবিঈগণের অবস্থান ব্যাখ্যা করে সাব্বুনী র. স্বীয় অবস্থান সুস্পষ্ট করেন। সার্বিক মূল্যায়নে গ্রন্থটি সাব্বুনীর সব মহলে স্বীকৃত একটি যুগান্তকারী অবদান।

৩.১৬. শারহু রিয়াদিস্-সালিহীন মিন কালামি সায্যিদিল মুরসালীন (شَرْحُ رِیَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ)

গ্রন্থটির মূল সংকলক ইয়াহইয়া ইব্ন শারফ আন-নববী আদ-দিমশকী। সাব্বুনী গ্রন্থটির বিশ্লেষণ করে তাখরীজ করত প্রয়োজনীয় পাদটীকা সংযোজন করেন। জটিল ও দুবোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। এটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করেন। সাব্বুনী র. এ সম্পর্কে বলেন,

“সর্বসাধারণের বোধগম্য করে মুসলমান পুরুষ-মহিলার কল্যানার্থে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সিদ্ধান্ত এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলাম, যেন তারা নুবুওয়্যাতের আলোক স্বস্তি হতে লুফে নিয়ে কল্যাণ এবং সৌভাগ্যের জ্যোতির্ময় পথে অগ্রসর হতে পারে।”^{৩১}

গ্রন্থটি লেবাননের আল-উফূক থেকে ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. ৭০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

৩.১৭. মাওকাফুশ্-শারীআতিল গাররা মিন নিকাহিল মুতআহ (مَوْكُفُّ الشَّرَائِعِ الْغَرَاءِ مِنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ)

গ্রন্থটিতে মুতআ বিয়ের কুফল, শারঈ অবস্থান অকাট্য দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে ২৯টি শিরোনামে স্বল্প পরিসরে সঠিক বিয়ে এবং মুতআ বিয়ের পার্থক্যসহ এর পরিচয়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সংজ্ঞা, এতদসংক্রান্ত ইসলামের সঠিক অবস্থান, রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঘোষণা, ইমাম জা'ফর সাদিকের মন্তব্য ইমামুল মুফাস্সির ইব্ন জারীর আত-তাবারী, ইব্নুল জাওয়ী, আলুসী, শানকিতীর মতামত পর্যালোচনা পূর্বক সাব্বুনী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি লেবাননের দারুল কুর'আনুল কারীম থেকে ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. ৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

৩.১৮. আয-যাওয়াজ আল-ইসলামী আল-মুবাক্কর, সা'আদাহ ওয়া হিসানাহ (الزَّوْجُ الْإِسْلَامِيُّ الْمُبَكَّرُ، سَعَادَةٌ وَحِصَانَةٌ)

গ্রন্থটি ইসলামের দাম্পত্য সম্পর্ক-সম্বন্ধের বিধি-বিধান, নীতিমালা, রাসূলুল্লাহ সা.-এর একাধিক বিয়ে করার হিক্মাত, মাহ্র নির্ধারণ, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, বর-কনের আনন্দদায়ক জীবন এবং ইসলামে নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনা সমৃদ্ধ। গ্রন্থটি কলেবরে খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর আলোচনা অত্যন্ত চমৎকার। ইসলামী শরী'আর প্রোজ্জ্বল নীতিমালার প্রেক্ষাপটে পারিবারিক বন্ধন অটুট রেখে সামাজিক শৃঙ্খলা সুদৃঢ়করণে এর প্রভাব সর্বোত্তমভাবে স্বীকৃত। সাব্বুনী র. ইস্তামুল সফরে গিয়ে গ্রন্থটির রচনা সূচনা করেন এবং ১৪১০ হিজরীর রজব মাসে মক্কায় সমাপ্ত করেন। এটি চ দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ: বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিয়ের প্রকৃতি দাবী এবং নবীদের সুন্নাহ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ, পদ্ধতি, শর্ত এবং কনে দেখার বিধান, চতুর্থ পরিচ্ছেদ: শরী'আতের বিধান মেনে আত্মীয়তা এবং বিয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার নীতিমালা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মাহ্র-এর বিধান, মাহ্র নারীর মর্যাদার প্রতীক, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইসলামের নিরিখে দাম্পত্য অধিকার, সপ্তম পরিচ্ছেদ: বিয়ের প্রচার এবং বিয়ে অনুষ্ঠানে আনন্দ ফুটি করা,

অষ্টম পরিচ্ছেদ: ইসলামের দৃষ্টিতে একাধিক বিয়ে এবং হিকমাত, নবম পরিচ্ছেদ: দাম্পত্য কলহের মিমাংসা পদ্ধতি ও দশম পরিচ্ছেদ: ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং নর-নারীর সমান অধিকারের দাবীদার বক্তব্য খণ্ড। উপসংহার: এগার জন নবীর কাহিনী ও শা'এর তায়বাহ্ এর কাসিদা এতে আলোচনা করা হয়েছে।^{৩২} গ্রন্থটি দিমাশকের দারুল কলম থেকে ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. ২৪৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩.১৯. হারকাতুল আরদি ওয়া দাওরানুহা (حَرَكََةُ الْأَرْضِ وَدَوْرَانُهَا)

গ্রন্থটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, রাত-দিনের আগমন-প্রস্থান, ঋতুর পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে দলিল পেশ না করে কুর'আনের নির্দেশনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। মূলত সাব্বুনী এ গ্রন্থটিতে পৃথিবী নামক গ্রন্থটি যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তা কুর'আনের দলিল-প্রমাণ দিয়ে উপস্থান করেন। আধুনিক বিজ্ঞান অনেক গবেষণার পর যে তথ্য পেশ করছে কুর'আন এ ব্যাপারে ১,৪০০ বছর পূর্বেই এ বিষয়ে আল্লাহর কুদরাতের নিদর্শনের আওতায় তা বলে রেখেছে। এ পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করার বিষয়ে সাব্বুনী চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ, রাত-দিনের আগমন-প্রস্থান কিংবা ঋতুর পরিবর্তনকে দলীল হিসেবে পেশ না করে কুর'আনের নির্দেশনার গুরুত্ব তুলে আনেন। এর প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার বাণী উল্লেখ করেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

“তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।”^{৩৩} উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এর আন্তঃভাব জ্যোতি-পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের সাহায্যেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। সাব্বুনী র. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশনার মর্ম হলো,

﴿فَكَانَ تَعَالَى يَقُولُ: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. أَيُّ كُلِّ مِنَ الْأَرْضِ،

والشمس والقمر، يسبح في هذا الفضاء الشاسع الواسع﴾

“সবগুলোই অর্থাৎ পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য নিজস্ব কক্ষ পথে ঘুরছে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা এখানে বহু বচনের শব্দ প্রয়োগ করায় প্রতীয়মান হয় চন্দ্র এবং সূর্যের সাথে পৃথিবীও রয়েছে।”^{৩৪}

গ্রন্থটি দিমাশকের দারুল কলম থেকে ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি. ৯৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

৩.২০. ক. জারিমাতুর-রিবা : আখতারুল জারাইম আদ-দীনিয়াহ্ ওয়া-ইজতিমাইয়াহ্ (جَرِيمَةُ الرِّبَا : أَخْطَرُ الْجَرَائِمِ الدِّينِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ)

﴿الْجَرَائِمِ الدِّينِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ﴾

গ্রন্থটি সুদের কুফল বিষয়ে কুর'আনের আয়াত, হাদীসে রাসূল এবং তাফসীরকারদের উক্তি দিয়ে তুলে ধরেছেন। সুদ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাব্বুনী র. এ গ্রন্থটি রচনা করেন। সৌদী আরব ও মিশরের কিছু সংখ্যক মুফতী যারা ব্যাংকের সুদকে হালাল মনে করেন, তাদের ফাতওয়ার শক্ত ভাষায় জবাব দিয়েছেন গ্রন্থটিতে। আলোচিত গ্রন্থে আল-কুর'আন ও আস্-সুন্নাহর আলোকে সুদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা চিহ্নিত করেন তিনি। এতে আলোচিত বিষয়গুলো হলো- ১. আল-কুর'আনের বর্ণিত সুদ সম্পর্কিত আয়াত উল্লেখের মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির মুখোশ উন্মোচন করা। ২. রিবা আল-মুহাররাম এবং রিবা আল-ইদতীরার-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, ৩. সুদের সাথে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে আল্লাহর যুদ্ধের ঘোষণা সম্পর্কিত নির্দেশনার প্রমাণভিত্তিক বর্ণনা, ৪. সুদের ব্যক্তিগত ক্ষতি, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং সমাজ জীবনে এর অনিষ্টকর প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে, ৫. সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি, ৬. সুদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ও ইসলামের ব্যাংকিং নীতিমালা, ৭. মুদারাবা, মুরাবাহা এবং মুশারাকাহ সম্পর্কিত আলোচনা, ৮. উপসংহারে ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর ‘ব্যাংকের লাভ’ ভোগ করা যাবে কিনা প্রবন্ধটি সাব্বুনী সংযোজন করেন। গ্রন্থটি দিমাশকের দারুল কুর'আনুল কারীম থেকে ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. ১০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

খ. মূল্যায়ন: গ্রন্থটিতে সুদ সম্পর্কিত কুফল বর্ণনায় অতুলনীয় একটি সংযোজন। বর্তমান বিশ্বের চলমান সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কুফল বর্ণনায় এটি যুগান্তকারী একটি রচনা। সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে গ্রন্থটি

অসামান্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত শরী'আহ বোর্ডের সদস্যদের জন্যে বহু উপকরণ রয়েছে গ্রন্থটিতে।

৩.২১. ক. কাশফুল ইফতিরাআত (كَشْفُ الْإِفْتِرَاءَاتِ)

গ্রন্থটি সাব্বুনীর লিখিত গ্রন্থ 'সাফওয়াতুত-তাফাসীর'-এর বিরুদ্ধে ড. বকর আবু যায়দ, শায়খ সালিহ আল-ফাওয়ান, জামিল যায়নুসহ লিখিত 'তাম্বিহাত' গ্রন্থের জওয়াব। সাব্বুনী তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আকীদাগত এবং কুর'আন আল্লাহ তা'আলার সিফাত বিষয়ক আয়াতের তাফসীরের সালাফগণের অভিযোগগুলো খণ্ডন করেছেন। এতে ৫৮টি শিরোনামে বক্তব্য পেশ করেন। গ্রন্থটি ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি. মিশরের দারুস-সাব্বুনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ. মূল্যায়ন: সাব্বুনী র. আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে আরোপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডনে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিছু কিছু বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ এবং সমালোচনা উদার মনে গ্রহণ করে নিয়েছেন, এটি তাঁর বিশাল হৃদয়ের পরিচয়। অভিযোগ খণ্ডনের পদ্ধতি বড়ই অনুপম।

৩.২২. আল-মুকতাতাফ মিন উয়ুনশ-শিরি (الْمُقْتَطَفُ مِنْ عُيُونِ الشَّعْرِ)

গ্রন্থটি সাব্বুনীর কবিতা বিষয়ক। ১৫৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে ১৬২টি শিরোনামে বিভিন্ন কবির ব্যাপক বিষয়ের আওতায় ৮৭৪টি পংক্তি রয়েছে। অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাওয়ার উপক্রম সমাজকে সংরক্ষণের জন্যে কুর'আন-সুন্নাহ প্রভাবিত সংস্কৃতির বিকল্প নেই। সাব্বুনী র. নিজেই একজন প্রসিদ্ধ কবি। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সময় তিনি এ কবিতার গ্রন্থটি চূড়ান্ত করেন। জ্ঞানের ব্যাপক চর্চা, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি, প্রজ্ঞাময় কবিতা এবং আল্লাহর নিকটে বিনয় থাকার জন্যে কাজিত উপাদান সাব্বুনী র. এতে উপস্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রশংসা গাঁথা, অনুমোদিত কাব্যিক কর্ম এবং সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখার মানসে তিনি এ কাজে ব্রতী হন। গ্রন্থটিতে গবেষক, লেখক, মুহাদ্দিস ও ওয়াইয়গণের জন্যে বহু সংখ্যক উপাদান রয়েছে। গ্রন্থটি ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি. সিরিয়ার দারুল কলম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩.২৩. শুবহাত ওয়া আবাতীল হাওলা তা'আদুদি যাওজাতির্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (شُبُهَاتُ وَأَبَاتِيلُ حَوْلَ تَعَدُّدِ زَوَاجَاتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর বহুবিবাহ: সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি নিরসন। এ গ্রন্থটিতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে সন্দেহের জবাব বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। এটি সাইয়েদ হাসান আব্বাস শারবাতালী কর্তৃক প্রকাশিত ও আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফকৃত। গ্রন্থটি ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ সা.-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে বলেন,

“এখানে দুটি অতি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যা নবী করীম সা.-এর উপর সন্দেহকে দূরীভূত করবে এবং মিথ্যা রটনাকারীদের নির্লজ্জ মুখের উপর পাথর ছুঁড়ে মারবে। পক্ষান্তরে উম্মাহাতুল মুমিনীন তথা রাসূলুল্লাহ সা.-এর বহু বিবাহের কারণসমূহকে যুক্তির কষ্টি পাথরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে। প্রথমত: রাসূলুল্লাহ সা.-এর বার্বক্যে পৌছানোর পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে একাধিক বিবাহ করেননি। দ্বিতীয়ত: একমাত্র আয়িশা রা. ব্যতীত অবশিষ্ট সকল স্ত্রীগণই বিধবা ছিলেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের মধ্যে একমাত্র আয়িশা রা. অল্প বয়স্কা কুমারী ছিলেন। উল্লেখিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি গভীর বিশ্বাস, অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা ও সুন্দর মন দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ ব্যাপারে সকল সমালোচনা ও অপবাদ ভিত্তিহীন, মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং শত্রুতামূলক।”৩৫

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বহুবিবাহের কারণ বা দর্শন অনেক। সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা হয়েছে- এক. শিক্ষাগত দর্শন, ২. ধর্মীয় দর্শন, ৩. সামাজিক দর্শন, ৪. রাজনৈতিক দর্শন।

৩.২৪. আল-হাদী আন্-নাবাতী আস-সহীহ ফী সালাতিহ-তারাবীহ (الْهَادِي النَّبَوِيُّ الصَّحِيحُ فِي صَلَاةِ التَّارَوِيحِ)

এ গ্রন্থে হাদীসের আলোকে সালাতুত-তারাবীহ-এর হুকুম ও ফযিলত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে সালাতুত-তারাবীহ, কখন ও কীভাবে সালাতুত-তারাবীহ শুরু হয়, সালাতুত-

তারাবীহর কত রাকাআত, এ সম্পর্কে মুজতাহিদগণের দলিল, ইমাম তিরমিযী র.-এর মতামত, হারামাইন শরীফাইন, ইবন তায়মিয়ার ফাতওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৪০৩ হিজরীতে রচনা করেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৪।

৩.২৫. দাওরাতুত-তাফসীর : আলা হামিশি আল-মুসহাফ (دَوْرَةُ التَّفَاسِيرِ عَلَى هَامِشِ الْمُصْحَفِ) : গ্রন্থটিতে কুর'আনের পাশে সংক্ষিপ্ত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৪৪২ হিজরীতে আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ্ থেকে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২৮।

৩.২৬. তাফসীরুদ-দাওয়াহ্ আল-মুবারাকাত (تَفْسِيرُ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَاتِ) : এ গ্রন্থে বরকতময় দাওয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.২৭. ফাতহুর রহমান বি কাশফি মা ইয়ালতাবিসু ফিল কুর'আন (فَتْحُ الرَّحْمَنِ بِكَشْفِ مَا يَلْتَبِسُ فِي الْقُرْآنِ) : আল-কুর'আনের ব্যাপারে উথিত অভিযোগসমূহের খণ্ড করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়াহ্ আল-আনসারী রচনা করেন। মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনী গ্রন্থটির তাহকীক ও টীকা সংযোজন করেন।

৩.২৮. আকীদাতু আহলিস-সুন্নাহ্ ফী মীযানি ওয়াশ্-শারঈ (عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي مِيزَانِ وَالشَّرْعِ) : শরী'আতের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ্ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১১। গ্রন্থটি বৈরুতের মু'আসসাযাতুর-রাইয়ান থেকে প্রকাশিত হয়।

৩.২৯. আল-মাহদী ওয়া আশরাতিস্-সাআহ্ (الْمَهْدِيُّ وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ) : গ্রন্থটিতে ইমাম মাহদী ও কিয়ামতের নির্দশনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩০. রিসালাতু ফী হুকায-তাসতীর (رِسَالَةٌ فِي حُكْمِ التَّصَوُّيرِ) : ছবি ও তার শরী'আতের বিধানাবলী সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। দারুন নাসীহাহ্ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

৩.৩১. আল-মুনতাকা আল-মুখতার মিন কিতাবিল আযকার (الْمُنْتَقَى الْمُخْتَارُ مِنْ كِتَابِ الْأَذْكَارِ) : গ্রন্থটিতে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে দুআ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৩.৩২. রিসালাতুস-সালাত (رِسَالَةُ الصَّلَاةِ) : এতে সালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩৩. আল-বিদআহ্ ফী ছাওবিহা আশ্-শারঈ (الْبِدْعَةُ فِي ثَوْبِهَا الشَّرْعِيِّ) : এ গ্রন্থটিতে শরী'আতের পোষাকে বিদআত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩৪. আল-ইবাদাত ফিল ইসলাম ওয়া আহ্দাফুহা ওয়া মাকাসিদুহা (الْعِبَادَاتُ فِي الْإِسْلَامِ وَأَهْدَافُهَا وَمَقَاصِدُهَا) : এতে ইসলামে ইবাদাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.৩৫. আত-তাবসীর বিমা ফী কিতাবিত-তাআলিম মিনাত-তায়তীর (التَّبَصُّيرُ بِمَا فِي كِتَابِ التَّعْلِيمِ مِنَ التَّزْوِيرِ) : এটি ড. বকর আবু যায়দ-এর কিতাব আত-তাআলুম' এ উত্থাপিত সমালোচনার জবাব ও প্রতিবাদমূলক গ্রন্থ।

৩.৩৬. নিকাছল-মুতাআহ্ ফিল ইসলাম হারামুন (نِكَاحُ الْمُتَعَةِ فِي الْإِسْلَامِ حَرَامٌ) : গ্রন্থটিতে মুতা বিয়ে ইসলামের নিষিদ্ধ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩৭. আমানতু বিল্লাহ্ (أَمْنْتُ بِاللَّهِ) : গ্রন্থটি আকীদাহ্ বিষয়ক। এতে প্রথমে আকীদাহর পরিচয়, ইসলামে আকীদাহর বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এটি তারীখ বিহীন আল-আফাক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৮।^{৩৬}

৪. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনী র. ছিলেন বর্তমান যুগের একজন প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক। তিনি জ্ঞানের জগতে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তাঁর শ্রেষ্ঠ গবেষণাকর্ম দিয়ে মুসলিম বিশ্বকে আন্দোলিত করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পঞ্চাশোর্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। এ গ্রন্থগুলোর ভাষা সহজ-সরল, সাবলীল, বিন্যাস অত্যাধুনিক ও উপস্থাপনা অতীব সুন্দর। এগুলোতে আল-কুর'আনের আয়াত, হাদীস ও বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত ও দলীলদ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থা থেকে গ্রন্থগুলো বহুসংখ্যকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো ইংরেজি, উর্দু, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। যা দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক ও পাঠকবৃন্দ উপকৃত হচ্ছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ উইকিপিডিয়াতে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ١٩٣٠م. “وُلِدَ الصَّابُونِيُّ فِي مَدِينَةِ حَلَبِ السُّورِيَةِ عَامَ ١٩٣٠م. سِيرِيَا رِ الْهَلْبِ نَامِكِ شَهْرٍ اَسْ-سَابُونِيَّ جَنَّمَحْهَن كَرَن.” দ্র. মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবুনী, উইকিপিডিয়া, আল-মাওসু'আহ্, পৃ. ১; <http://www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=26209.p.83/https://ar.wikipedia.org/wiki>.
- ^২ “সাবুনী খুব কম বয়সেই কুর'আনুল কারীম হিফয করেন এবং তাঁর পিতার নিকট থেকে অনেকগুলো আরবী ও দ্বীনি বিষয়ের শিক্ষা নিশ্চিত করেন।” দ্র. উস্তায আহমাদ সালিম বা'আতাব, আল-ইসনাঈনিয়াহ্, ৮ম খণ্ড (১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫১।
- ^৩ উইকিপিডিয়া, আল-মাওসু'আহ্, পৃ. ১; <http://www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=26209.p.84>.
- ^৪ উইকিপিডিয়া, আল-মাওসু'আহ্, পৃ. ১; <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- ^৫ আল-ইসনাঈনিয়াহ্, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫২।
- ^৬ He (Shaykh al-Sabuni) was appointed as at the Faculty of Shariah at the Umm al-Qura' University and at the Faculty of Education of the King Abdul Aziz University both in Mecca, Where he taught for about 28 years. Many prominent scholars graduated under his guidance. www.marifah.net 1428H. “শায়খ আস্-সাবুনীকে মক্কার উম্মুল কুরা ও বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা ২৮ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনেক নামকরা ফক্বার উস্তায বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করেন।”
- ^৭ <http://www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=26209>
- ^৮ ড. মুহাম্মাদ আমীন উল্লাহ, মুহাম্মাদ আলী আল-ছাবুনী : জীবন ও অবদান (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৭
- ^৯ উইকিপিডিয়া, আল-মাওসু'আহ্, পৃ. ২; <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- ^{১০} আমল খায়রী, www.almeshkat.net/books/open.
- ^{১১} আল-ইসনাঈনিয়াহ্, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭১।
- ^{১২} তাফসীর বিল মা'ছুর হলো, আল-কুর'আন, আস্-সুন্নাহ্ ও সাহাবীগণের কথা মালার উপর ভিত্তি করে তাফসীর লিপিবদ্ধ করা। দ্র. মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম আয-যারকানী, মানাহিলুল ইরফান, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ২য় সং., ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৪; মানাহজুল মাদরাসা আল-আকলিয়াহ্ আল-হাদীসাহ্ ফীত তাফসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩; দ্র. ড. মুহাম্মাদ যফযাফ, আত-তারিফ কিল কুর'আন ওয়াল হাদীস (কায়রো: আল-মাকাতাবাতুল মিসরিয়াহ্, ১৩৯৬ হি.), পৃ. ১৬৮।
- ^{১৩} রায় শব্দটির আভিধানিক অর্থ অভিমত, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত, উপদেশ, প্রস্তাব, চিন্তা, ধারণা। যখন কোন তাফসীরকারক আরবদের কথাবার্তা, বক্তব্যের ধরণ, আরবী শব্দগুলো সম্পর্কে জ্ঞান এবং এর বিভিন্ন ইঙ্গিত যেগুলো সে জাহিলী যুগের কবিতার সাহায্যে জ্ঞাত হয় এবং কুর'আনের আয়াতসমূহ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান এবং মুফাস্সিরের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী আয়ত্ত্ব করে, তখন এর দ্বারা ইজতিহাদের মাধ্যমে পবিত্র কুর'আনের যে তাফসীর করে তাকে ‘তাফসীর বির রায়’ বলা হয়। দ্র. ড. হুসাইন আয-যাহাবী আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান ও সংস্থার উল্লেখ নেই, তা. বি.), পৃ. ২৬৫।
- ^{১৪} সাফওয়াতুত-তাফসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।
- ^{১৫} আম'লী খায়রী, www.almeshkat.net/books/open
- ^{১৬} তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

- ^{১৭} মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কাশায়রী, সহীহ মুসলিম (বৈরুত: দারুল ইবন হায়ম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), মা ইউনহাকুল ইনসানু মিনাছ-ছাওয়াবি বি হাদ্দি ওয়াফাতিহী, হাদীস নং ৩০৮৪; সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, সুনানু আবী দাউদ (দিমাশক : মাকতাবাতু ইবন হাজার, ১ম সং., ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), মা জা'আ সাদাকাতি আনিল মাইয়িতি, হাদীস নং ২৪৯৪; মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি'উত-তিরমিযী (দিমাশক : মাকতাবাতু ইবন হাজার, ১ম সং., ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), ফিল ওয়াকতি, হাদীস নং ১২৯৭; আহ্মাদ ইবন শুআয়ব আন-নাসাঈ, সুনানুন-নাসাঈ (দিমাশক: মাকতাবাতু ইবন হাজার, ১ম সং., ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), ফায়লিস-সাদাকাতি আনিল মাইয়িতি, হাদীস নং ৩৫৯১।
- ^{১৮} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, কবসুম মিন নূরিল ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুরআনিল কারীম, ৫ম সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৫।
- ^{১৯} তদেব, পৃ. ১৯।
- ^{২০} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, আত-তাকসীকুল ওয়াদিহ্ আল-মুইয়াস্‌সার (১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ^{২১} আত-তাকসীকুল ওয়াদিহ্ আল-মুইয়াস্‌সার, পৃ. ১০৮৮।
- ^{২২} তদেব।
- ^{২৩} তদেব, পৃ. ১৬২২।
- ^{২৪} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, মা'আনিউল কুরআনিল কারীম লিন-নাহাস, ভূমিকা (সৌদী আরব, মারকাযু ইহুইয়াইত-তুরাস, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৭।
- ^{২৫} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, আল-মুকতাভাফ মিন উয়ুনিত-তাফাসির লিল-মানসূরী, ১ম খণ্ড (দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫-৬।
- ^{২৬} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল পৃ. ১২৯।
- ^{২৭} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, মিন কুনুযিস-সুন্নাহ (বৈরুত: দারুল কলম, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরী/১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৬।
- ^{২৮} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, আন-নুবুওয়্যাত ওয়াল আম্মিয়া (সিরিয়া: মাকতাবাতুল গাযালী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ^{২৯} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, আল-মাওয়ারিছ ফীশ-শারীআতিল ইসলামিয়াতি ফী দাউইল কিতাব ওয়াস্-সুন্নাহ (দিমাশক: দারুল ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৯।
- ^{৩০} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, আল-ফিকহুশ্-শারঈ আল-মুয়াস্‌সার ফী দাউইল-কিতাব ওয়াস্-সুন্নাহ (বৈরুত: দারুল কুরআনিল কারীম, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৯।
- ^{৩১} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, শারহু রিয়াদিস্-সালিহীন মিন কালামি সায্যিদিল মুরসালীন (লেবানন: ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪।
- ^{৩২} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, আয-যাওয়াজ আল-ইসলামী আল-মুবাক্কর, সা'আদাহ ওয়া হিসানাহ (দিমাশক: দারুল কলম, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৪।
- ^{৩৩} সূরাহ আল-আম্মিয়া, ২১, ৩৩।
- ^{৩৪} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, হারকাতুল আরদি ওয়া দাওরানুহা (দিমাশক: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৭।
- ^{৩৫} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, শুবহাত ওয়া আবাতীল হাওলিত-তা'দাদ যাওজাতির্ রাসূলিল্লাহ্ সালাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম (১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১০।
- ^{৩৬} মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী : জীবন ও অবদান, পৃ. ১৬০-২৩৫; মুহাম্মাদ আলী আস্-ছাব্বুনী, উইকিপিডিয়া, আল-মাওসুআহ, পৃ. ২; <https://ar.wikipedia.org/wiki>

ইহুদী ধর্মে একত্ববাদের স্বরূপঃ একটি পর্যালোচনা [Nature of Monotheism in Judaism: An Overview]

মোঃ মাহবুবুর রহমান*

[Abstract: Researching the concept of the oneness of Allah in Judaism helps individuals understand the theological foundations of Judaism, emphasizing the monotheistic nature of the faith. Monotheism in Judaism is the fundamental belief in the existence of only one God. This concept distinguishes Judaism from polytheistic religions and underscores the oneness, uniqueness, and absolute sovereignty of the divine power of God. In Judaism, the concept of oneness, known as "Echad" in Hebrew, emphasizes the indivisible unity of God. It signifies not just numerical oneness but a profound, absolute unity. The Shema, a central declaration in Judaism, encapsulates this monotheistic principle with the proclamation: "Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one." This foundational belief has shaped Jewish theology, law, and spirituality throughout history. This is an analytical research that is conducted following the content analysis method. No work of this title has been done before. Although partial work around this title, which is not enough to bring out the main point. If this research is done well, mess people especially the students of Islamic Studies will benefit.]

Keywords: Judaism, Monotheism, Shirk, Worship, Allah.

১. ভূমিকা

ইহুদী এমন একটি সম্প্রদায় যারা নিজেদেরকে মুসা আ.এর অনুসারী বলে বিশ্বাস ও দাবী করে। তবে মুসা আ.-এর সময়ে এ শব্দটি প্রচলিত ছিল না। ইহুদী বলে সে সময়ে কোন নামের অস্তিত্বও ছিল না, বরং তা পরবর্তী সময়ের সৃষ্টি। ঐ সময় মুসা আ.এর অনুসারীরা বনী ইসরাইল নামেই প্রসিদ্ধ ছিল এবং তাদেরকে কওমে মুসা বা আহলে কিতাব নামেও আখ্যায়িত করা হত। আল-মাওসুয়াতুল মু'আসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল-মাসহিবিল -মু'আসারাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, “ইহুদী হল ইবরাহীম আ.-এর বংশোদ্ভূত বনী ইসরাইল নামে পরিচিত হিব্রু ভাষাভাষী ঐ সমস্ত লোকদের ধর্ম, যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা মুসা আ.কে তাওরাত কিতাব দ্বারা শক্তিশালী করে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন”^১ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যায় যে, নবী সুলাইমান আ.-এর পর বনী ইসরাইলদের রাষ্ট্র দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটার নাম হয় জুডিয়া বা ইয়াহুদিয়া আর একটার নাম হয় ইসরাইল। ইয়াকুব আ.এর চতুর্থ পুত্র ‘ইয়াহুদার’ লোকেরা ইহুদীরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। বনী ইসরাইলের অন্য সকলে মিলে ইসরাইল রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে আসিরিয়দের ব্যাপক ধ্বংসলীলার ইসরাইল রাষ্ট্রটি ধ্বংস হয়ে যায়। পরে ইয়াহুদিয়া রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকায় এবং ঐ রাষ্ট্রের উপর ইহুদী গোত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকায় পুরো জাতিকে ইহুদী নামে নামকরণ করা হয়। এ বংশের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ নিজেদের চিন্তা, চেতনা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বোঁক প্রবণতা অনুযায়ী, বিশ্বাস, রেওয়াজ ও ধর্মীয় নিয়ম-নীতি শত শত বৎসর ধরে তৈরী করেছিল, তার নাম ইহুদীবাদ বা ইহুদী ধর্ম। যা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত শক্ত ভিতের উপর অবস্থান করে।^২ এটি একটি ঐশী ধর্ম হওয়ায় এরা মহান ঈশ্বর কর্তৃক ধর্মদূত বা নবী ও রাসূল পেয়েছিলেন। সাথে সাথে তারা আসমানী গ্রন্থও পেয়েছিলেন। আর প্রত্যেকটি আসমানী ধর্মের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। ইহুদী ধর্মেরও ভিত্তি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা ছিল। কিন্তু সময়ের পালাক্রমে বিভিন্ন ধর্ম যাজকের পালায় পড়ে তাদের ধর্ম অনেকটাই বিকৃত হয়ে যায়। তাই বর্তমান বিশ্বে ইহুদিরা শুধু নামেই ঐশী ধর্ম কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আল্লাহর একত্ববাদে কোন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

২. ইয়াহুদী ধর্মের পরিচয়

ইয়াহুদ (يهود) শব্দটি আরবী ভাষার অন্তর্গত একটি শব্দ। এটি هاد শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। আল-শাহরাস্তানী বলেন, কোন ব্যক্তি তার কাজ কর্ম থেকে ফিরে আসলে তখন আরবরা বলে থাকে هاد الرجل অর্থাৎ رجوع و تاب। মূসা আ. এর পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীদের উপর শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। আব্দুল কাদির শাইবা ও কতিপয় মুফাসসির বলেন, ইয়াহুদ (يهود) শব্দটি আরবী শব্দ হুদ (هود) থেকে নিষ্পন্ন।^৪ এর অর্থ হলো- তওবা করা, প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা।^৫ যেমন মূসা আ. এর অনুসারীগণ বলেছিল, (إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ) ‘নিশ্চয়ই আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।’^৬ এ প্রত্যাবর্তন থেকেই তারা ইয়াহুদ নামে পরিচিত।^৭ এ শব্দটি আল-কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।^৮ সেখানে শব্দটি দ্বারা ইয়াহুদী ধর্ম-বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে।^৯ ভাষাবিদ ইবনু মানযূর শব্দটির উৎপত্তিগত দিক বিশ্লেষণ করে বলেন, واليهود أن يصير ، حوله إلى ملة يهود ، هاد سميت اليهود فيه هادوا أى تابوا وهود الرجل ، حوله إلى ملة يهود ، واليهود أن يصير ، الإنسان يهوديا। ইয়াহুদ (يهود) শব্দটি আরবী هادود শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো- ঝুঁকে পড়া।^{১০} কারণ তারা তাওরাত পাঠ করার সময় ঝুঁকে ঝুঁকে পাঠ করত।

আবার ইয়াহুদ (يهود) শব্দটি তাহবীদ (تهود) শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো- স্বর নরম করে, গলায় শব্দ করে বার বার উচ্চারণ করা। ইয়াহুদীগণ যখন জনগণের সামনে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করত তারা তখন সুরেলা আওয়াজে, টেনে টেনে উচ্চারণ করে পাঠ করত।^{১১} এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

‘আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে।’^{১২}

ইয়াহুদ (يهود) অনারবী শব্দ। যা বনী ইসরাঈল গোত্রের গোত্রপতি ইয়াহুয়া নামক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত।^{১৩} তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেই তাদেরকে ইয়াহুদী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।^{১৪} ইয়াহুদী ধর্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Judaism। ইসরাঈলগণ যোহাভাকে Yahauh বা Jehovan বলে থাকে। তারা যোহাভাকে সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর মনে করেন। Juba নামক স্থানে এই ধর্ম গড়ে উঠেছিল। কারো কারো মতে, Juba ছিল ইয়াহুদীদের নেতা তাই এই ধর্মকে Judaism বলা হয়।^{১৫} ইয়াকুব আ. এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুয়া (يهودا) এর প্রতি এ ধর্ম আরোপ করা হয়। আরবেরা الدال কে الدال উচ্চারণ করত।^{১৬} সুলায়মান আ. এর পরে ফিলিস্তিনে যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল ইয়াহুদী রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রের দিকে সম্পৃক্ত করেই তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়ে থাকে।^{১৭}

ইয়াহুদীদের সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ হাসান বারাকাত বলেন,

فأتباع موسى عليه السلام اشتهروا باليهود، وما جاء به عليه السلام عرف باليهود

‘মূসা আ. এর অনুসারীরা ইয়াহুদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং মূসা আ. যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাতে যারা বিশ্বাস করে তারাই ইয়াহুদী।’^{১৮}

ইবন জুরায়জ বলেন যে, মূসা আ. এর ৪০ দিন তুর পর্বতে অবস্থান কালে বনী ইসরাঈলরা তাঁর অবর্তমানে একটি স্বর্ণের গো-বৎস তৈরী করে তার উপাসনা করে। অতঃপর মূসা আ. ফিরে এসে তাদের এ ঘৃণ্য কার্যকলাপে ভীষণ রাগান্বিত হন এবং তাদেরকে পুনরায় আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানান।

ফলে তাদের অধিকাংশই গো-বৎসের উপাসনা থেকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে এবং তওবা করে। তখন মূসা আ. তাদেরকে হুদ নামে সম্বোধন করলেন। এর পর থেকে তারা ইয়াহুদী নামে পরিচিতি লাভ করে।^{১৯}

ইয়াহুদীদের নামকরণ মূসা আ. এর মৃত্যুর অনেক পরে করা হয়েছে। কারণ ইয়াহুদী নামটি তাদের ধর্মের অনুসারীদের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে সর্বপ্রথম এ নামটি উল্লেখ দেখা যায়, তাদের প্রসিদ্ধ যাজক আজরা রচিত গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে নাসের ইবন আব্দুল্লাহ আল-কিফারী বলেন,

كان اليهود ايام موسى عليه السلام اما يعرفون بيني اسرائيل ثم اطلق عليهم يهود فيما بعد

‘মূসা আ. এর যুগে ইয়াহুদীরা বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে তাদের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী শব্দটি প্রয়োগ করা হয়’।^{২০}

মূসা আ. এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবীগণ যে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, তা ছিল মূলত ইসলাম ধর্ম। তাঁদের মধ্যে কেউ ইয়াহুদী ছিলেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾

‘আর মূসা আ. বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক।’^{২১}

ইবরাহীম আ. সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

‘ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন ‘হানীফ’ অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।’^{২২}

৩. ইহুদী ধর্মে একত্ববাদ

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে (দেবত্ব) বিশ্বাসের বিষয়ে ইহুদিদের বিশ্বাস তাঁর একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে। তবে এটি সেই পরম একেশ্বরবাদ নয় যা আমরা আমাদের ইসলাম ধর্মে জানি। বরং এটি একটি একেশ্বরবাদ যা অসম্পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য দ্বারা কলঙ্কিত। যা তারা তাঁর সাথে সংযুক্ত করেছে সেগুলো প্রকাশ্য অপবাদ।

ইহুদী ধর্মে দেবত্বের মতবাদ (এটির বিকৃতির আগে) একটি সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদী মতবাদ ছিল।^{২৩} কিন্তু বেশিরভাগ ইহুদিরা প্রায়শই সেই উজ্জ্বল একেশ্বরবাদী সত্যগুলি ভুলে যায় তাদের আত্মায় বিশ্বাসের অগভীরতার কারণে, এবং পরে তারা পৌত্তলিক জনগণের ধর্মীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মিশরীয়, কেনানাইট^{২৪}, ফিনিশিয়ান^{২৫}, ব্যাবিলনীয়^{২৬}, ম্যাগিয়ান^{২৭} এবং অন্যান্য লোকদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কারণ তারা তাদের উপাসনা করেছিল দেবতাসহ অন্যান্য প্রভুর।^{২৮} তারা লিপ্ত হয়েছিল শিরকে। তারা মহান এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়েছিল। তাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস থাকলেও একত্ববাদ থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছিল।

৩.১ একত্ববাদের পরিচয়

একত্ববাদ কে আরবীতে তাওহীদ বলে। এটা ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি। তাওহীদ-এর আভিধানিক অর্থ: একত্ববাদ বা কাউকে একক বলে স্বীকার করা। আরবীতে توحيد (তাওহীদ) শব্দটি وحده মূল ঋতু হতে নির্গত। এর অর্থ হল-একক বলে স্বীকার করা, এক বলে মেনে নেওয়া, কোন সত্তাকে এক বা একক বলে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রচলিত অর্থে তাওহীদ শব্দের অর্থ আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ।^{২৯} পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ তা‘আলাকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করাই তাওহীদ। ইসলাম ধর্মকেও তাওহীদ বলা হয়।^{৩০} কেননা, এর ভিত্তি হল, আল্লাহ তা‘আলা এক এবং একক তাঁর ক্ষমতায় এবং কর্মে কোন অংশীদার নেই। তিনি সত্তাগতভাবে একক এবং গুণগতভাবেও একক, যার কোন সমতুল্য নেই। আর তিনি উপাসনার দিক থেকেও একক এবং ইবাদাত ও দাসত্বের ক্ষেত্রেও একক। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।^{৩১}

আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদের অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ বারো মুখাপেক্ষী নয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তাওহীদের বাণী “কালেমার নির্যাসই হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ”। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করে। তাওহীদের আলোকেই একজন মুমিন বান্দার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মানব ইতিহাসের প্রাথমিক অবস্থা থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তখন পৌত্তলিকতা বলতে কিছুই ছিল না। কেননা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করাটা ছিল মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবগত বিষয় আর এ ধারাই সকল নবী রাসূল তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছেন। আদম আ. থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী ও রাসূল স. পর্যন্ত প্রত্যেকেই আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচার করেছেন। সমগ্র মানবজাতি তখন একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। যদিও পরবর্তীকালে মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে একত্ববাদের স্থলে বহুত্ববাদে (গাইরুল্লাহ ইবাদত করা) বিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। নিম্নে আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হলঃ

আল্লাহ তা’আলাই একমাত্র উপাস্য। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তুর স্রষ্টা। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে সমস্তসৃষ্টির একচ্ছত্র অধিকারী আল্লাহ। তিনিই বিশ্বজগতের একক স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। তাঁর অস্তিত্বের গুণাবলীতে, কার্যপ্রণালী ও বিধি-বিধানে অংশীদারীত্বের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে উপাস্য হিসেবে আহ্বান করা হয়, তারা শক্তিহীন এবং দুর্বল। যেমন, আল্লাহ তা’আলা নিকৃষ্ট একটি প্রাণির উদাহরণ দিয়ে তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمُطْلُوبِ. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

“হে মানুষ! একটি উপমা বর্ণনা করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে এ উদ্দেশ্যে একত্র হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাও উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ই দুর্বল। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।”^{৩২} আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদে অবিশ্বাসীদের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ তা’আলা নিকৃষ্ট এবং ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, তারা এতই দুর্বল ও অসহায় যে, তারা সকলে মিলে একটি নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্রপ্রাণী মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। আর সৃষ্টি করা তো দূরের কথা বরং ক্ষুদ্র মাছি তাদের খাদ্য দ্রব্যের উপর যখন বসে এবং তা ভক্ষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তারে নেই। অতএব তারা তোমাদের বিপদ থেকে কীভাবে উদ্ধার করবে? স্বচ্ছ বিবেক ও প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে সত্যের দ্বারা প্রাপ্তে নিয়ে যায়। এ জন্য আল্লাহ তা’আলার অস্তিত্বের প্রমাণই আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদের প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

“যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।”^{৩৩} আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ এ আয়াতটি আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদের প্রমাণ যা স্বভাবগত ও যুক্তিগত। এ আয়াত দ্বারা একাধিক ইলাহ এর অসারতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। একাধিক ইলাহ বা উপাস্যের ধারণা ভ্রান্ত, যার কোন মৌলিক ও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই। পৃথিবী ও আকাশে দু’জন সৃষ্টিকর্তা থাকলে উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকর হওয়া উচিত। স্বভাবগতভাবে এটা

অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজন সেই একই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যসম্ভাবী।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা আরো প্রমাণ পাই। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

“আমি তো নূহকে আ. তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম এবং সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।”^{৩৪} হুদ আ. বলেন,

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।”^{৩৫} সালেহ আ. বলেন,

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।”^{৩৬}

আল্লাহ তা’আলা বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ “আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আশেই দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।”^{৩৭} আল্লাহ তা’আলা তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে নিজেই ঘোষণা করেন,

﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ “তোমারা দু’জন ইলাহ গ্রহণ করে না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ।”^{৩৮} আল্লাহ তা’আলা আরো ঘোষণা করেছেন,

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

“তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে কত পবিত্র!”^{৩৯}

মানুষ তার চারপাশে তাকালে খেতে পায় যে, সৃষ্টির আদি হতেই নিখিল বিশ্বের সব কিছু একই নিয়মে চলছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না, কোনো অনিয়ম ঘটছে না, কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে না। এ নিয়মের ব্যাঘাত ঘটাবার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, একই সৃষ্টি কর্তার নির্দেশে ও আনুগত্যে বিশ্বের সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে। একের অধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান থাকা কখনও সম্ভব হতো না। মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একাধিক নয় এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নন।

সুতরাং তাওহীদ হচ্ছে আসমানী ধর্মসমূহের বিশ্বাসের মূলভিত্তি। আদম আ. থেকে নিয়ে সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের প্রথম কথা, ইসলামের প্রথম মঞ্জিল। যেখান থেকে একজন মুমিন আল্লাহর পথে ধাবিত হয়।^{৪০} তাই, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানবান নারী-পুরুষের উপর আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব। আর সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, ‘সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট, তা হল আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা।

৩.২ আল্লাহর সত্তাগত স্বরূপ

চিরন্তনতা মহান আল্লাহর অবিচ্ছেদ্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি এবং আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই চিরন্তন। কোনো কিছুই নবসৃষ্টি বা ধ্বংসযোগ্য নয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا﴾

‘ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা। যিনি মহিমাময়, মহানুভব’।^{৪১}

আল্লামা বাজ্জাজ রাহ. বলেন, চিরন্তনতার গুণে কেবল আল্লাহই গুণায়িত। তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য ‘ফানা’ বা ধ্বংস নির্ধারণ করেছেন।^{৪২}

আল্লাহ মা আবুল কাসেম ইম্পাহানি রহ. বলেন, ‘বাকি’ অর্থ চিরন্তন বা অবিনশ্বর। যাকে ধ্বংস কখনো স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহর অবিনশ্বর হওয়ার বিষয়টি জান্নাত ও জাহান্নামের চিরন্তন হওয়ার মতো নয়। কেননা আল্লাহর অবিনশ্বর হওয়ার অর্থ হলো তিনি এমন অবিনশ্বর যার কোনো সূচনা ও সমাপ্ত নেই। জান্নাত-জাহান্নাম চিরন্তন কিন্তু সূচনা আছে। আল্লাহ জান্নাত-জাহান্নামকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন।^{৪০}

আল্লাহর জন্য ‘বাকি’ (চিরন্তনতার) গুণ প্রমাণিত হলেও ‘বাকি’ শব্দটিকে আল্লাহর নাম বলার অবকাশ নেই। মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আল-শায়খ রহ. বলেন, অবিনশ্বরতা আল্লাহর এমন গুণ যা কোনো মানুষের দিকে সম্বোধন করলে শিরক বলে গণ্য হবে। অনেকে ‘আল-বাকি’-কে আল্লাহর গুণবাচক নাম মনে করে, কিন্তু এ ব্যপারে কোনো দলিল নেই।^{৪১} আল্লাহর গুণাবলী দু’ভাবে বিভক্ত। সত্তাগত গুণাবলী। যেমন তাঁর চেহারা, হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, ﴿وَيُنْفِیْ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ‘কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা। যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী’।^{৪২} এখানে চেহারাকে আল্লাহর সত্তাগত গুণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে কারণেই ‘যুল জালালে’ বলা হয়েছে। নইলে ‘যিল জালালে’ বলা হ’ত। তিনি বলেন, ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ ‘সবকিছুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত’^{৪৩} কর্মগত গুণ। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ‘আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা’।^{৪৪} এর মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টিগুণ বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর সত্তা হ’ল আদি। তাঁর পূর্বে কিছুই ছিলনা। পরে তিনি পানি সৃষ্টি করেন এবং আরশ সৃষ্টি করেন, যা পানির উপরে ছিল।^{৪৫} সত্তাগত ও কর্মগত গুণ সমূহ যখন আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত হয়, তখন সেটি আল্লাহর সত্তা হিসাবে গণ্য হয়। পৃথক কোন সৃষ্টি হিসাবে নয়। যদিও বাহ্যতঃ এগুলি পৃথক। যেমন মসজিদে প্রবেশের সময় রাসূল সা. বলতেন, ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ﴾ ‘আমি বিতাড়িত শয়তান হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর নিকটে এবং তাঁর সম্মানিত চেহারার মাধ্যমে’^{৪৬} এখানে তাঁর চেহারা ও ক্ষমতাকে পৃথকভাবে বলা হ’লেও তার অর্থ আল্লাহর সত্তা। সেটি পৃথক কোন মাখলুক নয়, যেমন আল্লাহর কালামও মাখলুক নয়। যেটি বলে থাকেন জাহমিয়া, মু’আত্তিলাহ, মু’তায়িলা প্রভৃতি দ্রাবুত ফিরকার লোকেরা। ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণ আল্লাহকে তাঁর নিজস্ব চেহারা দেখতে পাবেন^{৪৭} কিন্তু অবিশ্বাসীগণ ও কপট বিশ্বাসীগণ তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে^{৪৮}

বস্তুতঃ আল্লাহর গুণাবলী কুরআন ও সহীহ হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করতে হবে কোনরূপ পরিবর্তন, সামঞ্জস্যকরণ, শূন্যকরণ, প্রকৃতি নির্ধারণ, তুলনাকরণ বা আল্লাহর উপরে ন্যস্তকরণ ছাড়াই। আল্লাহর নিজস্ব আকার আছে, যা কারোর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ‘তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনে ও দেখেন’^{৪৯} আয়াতটি ‘তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাতে’র অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ব প্রমাণিত হয়। যা অনন্য ও অতুলনীয়।

৩.৩ গো-বৎসের আচনা

বাহুরকে ইহুদিরা পবিত্র প্রাণী বলে মনে করে। তাঁর উপাসনা তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতার সূচনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন মূসা আলাইহিস সালাম সিনাই পর্বতে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিলেন ঠিক সে সময়ে তাদের একটি দল গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে,

“যখন লোকেরা দেখল মূসা আলাই সালাম সিনাই পর্বত থেকে নামতে দেরি করছেন তারা অস্থির হয়ে হারুনকে বলল, “ওঠ, আমাদের সামনে এমন দেবতা তৈরি কর যারা আমাদেরকে দেশ (মিশর) থেকে তুলে এনেছে। আমরা জানি না তার কী হয়েছে।” তখন হারুন তাদের বললেন, “তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের ছেলে ও মেয়েদের কানে যে সোনার দুল আছে তা খুলে আমার কাছে নিয়ে এস।” তখন লোকেরা তাদের কানের সোনার দুল খুলে নিয়ে আসল হারুনের কাছে। তিনি তাদের হাত থেকে তা নিয়ে ছেনি দিয়ে তৈরী করলেন

একটি গলিত বাছুর। তখন তারা বললেন, “হে ইস্রায়েল, এরা তোমাদের দেবতা, যারা তোমাদের মিশর দেশ থেকে তুলে এনেছে।” হারুন তার সামনে একটি বেদী তৈরি করে তাদেরকে ডেকে বললেন, “আগামীকাল প্রভুর জন্য একটি উৎসব।” তাই তারা পরের দিন খুব ভোরে উঠে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য নিবেদন করল এবং লোকেরা খেতে বসল অতঃপর তারা খেলতে উঠেছিল।^{৫৩}

ওল্ড টেস্টামেন্টের লেখকরা এভাবেই নবী হারুন আ. কে মূর্তি পূজক বলে কলঙ্কিত করেছেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই জঘন্য কাজটির (বাছুর পূজা) প্রকৃত অপরাধী সামরিতানকে^{৫৪} প্রকাশ করেন এবং হারুন আ. কে অপবাদ থেকে মুক্ত করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর তাঁর নবী মুসা আ.-কে সম্বোধন করে বলেন, “আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর মুসা ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায় তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন। তিনি বললেনঃ “হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? তারা বললঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপর ফেরউনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনি ভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরী করে বের করল একটি গো-বৎস, একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বললঃ এটা তোমাদের উপাস্য এবং মুসার ও উপাস্য, অতঃপর মুসা ভুলে গেছে।”^{৫৫}

সময়ে সময়ে ইহুদিদের জীবনে বাছুরের উপাসনা নবায়ন হতে থাকে। অনুসারীদের তাদের উপাসনা করার জন্য যারবিয়াম বিন নেবাত, ইসরায়েলী রাজ্যের রাজা শেকমের সামরিয়া, দুটি সোনার বাছুর তৈরি করেছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, “যারবিয়াম শিখিম মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। আর যারবিয়াম মনে মনে বললেন, “এখন রাজ্য দায়ুদের বংশের কাছে ফিরে আসবে।” এই লোকেরা যদি জেরুজালেমে সদাপ্রভুর গৃহে বলি উৎসর্গ করতে যায়, তবে এই লোকদের হৃদয় তাদের প্রভুর দিকে, যিহূদার রাজা যারবিয়ামের দিকে ফিরে যাবে এবং তারা আমাকে হত্যা করে যিহূদার রাজা যারবিয়ামের কাছে ফিরে আসবে। তাই তিনি রাজার সাথে পরামর্শ করে দুটি সোনার বাছুর বানিয়ে বললেন, তোমার জন্য জেরুজালেমে যাবার অনেক কিছু আছে, দেখ, হে ইস্রায়েল, তোমার দেবতারা তারা তোমাকে মিসর দেশ থেকে তুলে এনেছে।”^{৫৬} ইহুদিরা ৫৮৬ এবং ৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ব্যাবিলনীয় বন্দিত্বের সময় মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সাথে তাদের যোগাযোগের পর বাছুরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করেছিল, তখন ক্যালদীয়রাও বাছুরকে পবিত্র করত।^{৫৭}

৩.৪ নাপাক প্রাণীর পূজা

সাপকে ইহুদিরা পূজার যোগ্য একটি পবিত্র প্রাণী বলে মনে করে। কারণ তাদের মতে এটি প্রজ্ঞা এবং ধূর্ততার প্রতিনিধিত্ব করে এবং এটি এর দুটি পক্ষকে মিলিত করতে পারে।^{৫৮} এজন্যই তারা এটাকে ধর্মীয় প্রতিক আখ্যা দিয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, “আহসের পুত্র হিষ্কিয়, ইস্রায়েলের রাজ্যের রাজা। তিনি উচ্চ স্থানগুলি সরিয়ে ফেললেন, মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেললেন, খাঁজগুলি কেটে ফেললেন এবং মোশির (মুসার) তৈরি ব্রোঞ্জের শস্যগুলিকে চূর্ণ করলেন। সেই দিন পর্যন্ত তিনি ইসরাইল এর জন্য ধূপ জ্বালাত। ওল্ড টেস্টামেন্টের লেখকরা আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালামকে মূর্তিপূজক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তি কি কল্পনা করতে পারেন যে মুসা আ. নবি হয়ে তিনি মূর্তিগুলির উকিল হবেন?”^{৫৯} তিনি কেবল ইস্রায়েলের সন্তানদের এটি ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করার আহ্বান জানিয়ে এসেছেন। অথচ তারা নবীদের সাথে মিথ্যা অপবাদ সংযুক্ত করতে দ্বিধা করেন নি।

৩.৫ প্রতিমা পূজা

ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের পর ইহুদিরা তাদের প্রতিবেশীদের দেবতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল (বা'ল)^{৬০}, (আন্তার্ত)^{৬১}, (মোলেক)^{৬২}, এবং অন্যান্য পৌত্তলিক দেবতা। তারা সেসব দেবতার পূজা করত।^{৬৩} ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, “এবং ইস্রায়েলের সন্তানরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা মন্দ ছিল তা করতে ফিরে এসেছিল, এবং তারা বালিম, আন্তার্ত, আরামের দেবতা এবং সিডনের দেবতাদের সেবা করেছিল, তারা বনি অম্মোনের

দেবতা মোলেক এবং প্যালেস্টাইনদের প্রভুর সেবা করেছিল।^{৬৪} তারা উপাসনা না করে প্রভুকে ছেড়ে গিয়েছিল।^{৬৫} কিন্তু তাদের বিশ্বাসের মধ্যে যদি কোন বিচ্যুতি ঘটে তা সংশোধন করার জন্য নবীর পর নবী পাঠিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের রহমত প্রায়শই তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু ইহুদিদের মধ্যে “দেবত্বের” সঠিক মতবাদটি ইহুদি ধর্মের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) সংবিধানের বিকৃতির পরে পৌত্তলিকতার মতো কিছুতে বিচ্যুত হয়েছিল। পরবর্তিতে এটি অনেকগুলি রূপ নেয়, যা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়:

ক. তারা ঈশ্বরের নামের শব্দগুলিকে অতি সামান্য মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সাথে গণনা করে^{৬৬} এই নামগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল: (ই'ল)^{৬৭}, ইলোহিম^{৬৮}, অ্যাডোনাই^{৬৯}, এবং ইয়াহওয়ে^{৭০}। এই শেষ নামটি (ইয়াহওয়ে) যা তাওরাতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে নিয়ে যেসব জায়গায় আলোচনা করছিল যেখানে এটি তাকে একা ইহুদিদের জন্য ঈশ্বর বলে মনে করেছিল।^{৭১} ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মুসাকে বললেন, “ইস্রায়েলের সন্তানদের এইভাবে বল: যিহোবা, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর, আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই চিরকাল আমার নাম, এবং আমার স্মরণ সব প্রজন্মের জন্য অব্যাহত থাকবে।^{৭২} এটা ভাবা উচিত নয় যে ইহুদিদের মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামের বহুগুণ শব্দ মুসলমানদের মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর নামগুলির বহুবিধতার অনুরূপ। যেহেতু মুসলমানদের মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর নামগুলি নির্দিষ্ট। তাই তাদের ঈশ্বরের নাম মুসলমানদের খোদার নামের সাথে মিলে যাওয়া অসম্ভব এবং তারা তাদের প্রভুর বিভিন্ন নাম দিয়েছিল যা তাওরাত ও তালমুদেও বর্ণিত হয়নি।^{৭৩} তারা তাদের ঈশ্বরের নাম বিভিন্ন গোত্র অনুসারে ঠিক করেছিল এবং তাদের ঈশ্বরের নাম নির্বাচনেও আদিকাল থেকে মতনৈক্য ছিল যা আজ পর্যন্ত একমত পোষণ করতে পারেনি।

খ. তাদের বিশ্বাস যে এই (জাতীয়) ঈশ্বর তাদের জন্য অনন্য, এবং কেউ তাদের সাথে ভাগ করে না।^{৭৪} তাওরাতে বলা হয়েছে: তোমরা, তোমাদের ঈশ্বর পবিত্র লোক। তোমাদের ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁর থেকে মনোনীত করেছেন। তোমরা পৃথিবীর সমস্ত জাতি অপেক্ষা বিশেষ এক জাতি।^{৭৫} এই বিশেষত্বের কারণে তারা নিজেদের দেবতার “সন্তান” বলে দাবি করেছিল। তাওরাতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের সম্বোধন করে বলেছেন, “তোমরা, তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের সন্তান।”^{৭৬} এবং তারা তাকে সম্বোধন করে বলল: “আপনি, প্রভু, আমাদের পিতা”।^{৭৭} তাদের দাবি এবং বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, এতে কোন সন্দিহান নেই। তারা এই বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। যা আল্লাহর সাথে জুলুম করার ন্যায়।

গ. তাদের দাবি যে এই তারা ঈশ্বরের কাছে নৈতিকতার আইন অনুসারে জবাবদিহি করেন না। তারা একে অপরের সাথে অন্যায় আচরণ ব্যতীত, অন্যদের (বিধর্মীদের) সাথে তারা কোন আচরণ করেছে তার জন্য ঈশ্বর তাদের দায়বদ্ধ করবেন না। তাওরাতে বলা হয়েছে: “আপনার ভাইকে সুদ: রৌপ্যের সুদ, খাদ্যের সুদ বা সুদের উপর ধার, এমন কোন কিছু দিও না। একজন বিদেশীকে তুমি সুদে ধার দিতে পার, কিন্তু তোমার ভাইকে তুমি সুদে ধার দিতে পার না, যাতে সে তোমাকে আশীর্বাদ করে”।^{৭৮} তালমুদে বলা হয়েছে: “কোন ব্যক্তির কাছ থেকে (অর্থাৎ ইহুদিদের কাছ থেকে) চুরি করা জায়েজ নয়, যারা ইহুদী ধর্ম থেকে চলে যায় তাদের কাছ থেকে চুরি করা জায়েজ”।^{৭৯} সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সত্য বলেছিলেন যখন তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, এর কারণ হল তারা বলেছিল, “আমাদের অশিক্ষিতদের সাথে আচরণ করার কোন উপায় নেই” এবং তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা জানে তা মিথ্যা।^{৮০}

৩.৬ ঈশ্বরের আকৃতি

তাদের মতো ঈশ্বরের একটি রূপ আছে। সেরকম অনেকটা মানুষের রূপের মত। যদিও মহান ঈশ্বর এসব কিছুর উর্ধ্বে। তাদের ঈশ্বরের আকৃতিতে বিশ্বাস করা ঈশ্বরকে মানুষের কাতারে নামানোর মত। ঈশ্বর কখনো মানুষের মতো হতে পারে না। তোরাতে বলা হয়েছে: “জ্যাকব একাই রইলেন, এবং একজন লোক ভোর পর্যন্ত তার সাথে কুস্তি চালিয়েছিল। যখন তিনি দেখলেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন না, তখন তিনি তার উরুর সকেটে আঘাত করলেন। তার সাথে কুস্তি করতে গিয়ে জ্যাকবের উরুর সকেটটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি বললেন, “আমাকে যেতে দাও, কারণ ভোর হয়ে এসেছে।” তিনি বললেন, “তুমি

আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি তোমাকে যেতে দেব না।” তখন তিনি তাকে বললেন, “তোমার নাম কি?” ইয়াকুব বললেন, “তোমার নাম কি? তারপর তিনি বললেন, “তোমার নাম আর যাকোব নয়, বরং ইস্রায়েল বলা হবে, কারণ তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছ এবং জয়ী হয়েছ।” আর জ্যাকব জিজ্ঞেস করলেন, “আমাকে তোমার নাম বল।” তিনি বললেন, “তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করছ কেন?” এবং সেখানে তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন। তখন যাকোব সেই জায়গার নাম পনিয়েল রেখে বললেন, “কারণ আমি ঈশ্বরকে সামনাসামনি দেখেছি এবং আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে।” ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন।^{৮১} তিনি তার নবী ইয়াকুব আ.-এর সাথে কুস্তি করেন। তারপরে তাকেও কুস্তি করে অক্ষম করেন। আল্লাহ যালিমরা যা বলে তার চেয়ে মহান। ঈশ্বরের পরিপূর্ণতার গুণাবলী রয়েছে যা কেবলমাত্র তাঁর মহিমার যোগ্য, প্রতিনিধিত্ব, তুলনা বা বাঁধা ছাড়াই। যেমন তিনি বলেছেন, “এবং এর মত কিছুই নেই”।^{৮২} আল্লাহর এই কথার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহর মত কখনো কেউ হতে পারেন না। আল্লাহ কোন মানুষের রূপে রূপ নিতে পারেন না। তাই তাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণ ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট।

৩.৭ আল্লাহর বিষয়ে বিতর্ক

আল্লাহর রসূল যখন ইহুদীদেরকে সকল মানুষের জন্য এক ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন এর অর্থ হল অন্যান্য মানুষ তাদের সমান এবং এতেই তাদের আপত্তি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের এই বলে জবাব দেন: “এবং বল, “তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক কর, যখন তিনি আমাদের প্রভু ও তোমাদের পালনকর্তা এবং আমরা আমাদের কাজের জবাব দিব তোমরা তোমাদের কাজের প্রতি আন্তরিক হও। আমরা তাঁর প্রতি আন্তরিক”। ইহুদীরা এতে সন্তুষ্ট ছিল না, বরং তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবস্থানকে আক্রমণ করেছিল যা নির্দেশ করে তাদের দুঃসাহসীকতা এবং তার প্রতি তাদের খারাপ আচরণের”।^{৮৩}

৪. আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে ইয়াহুদীদের ধারণা

ইহুদী ধর্ম প্রভু ঈশ্বরকে অপমানিত করেছে এবং দোষারোপ করেছে, এবং তাঁর প্রতি এমন গুণাবলী আরোপ করেছে যা তাঁকে এবং তাঁর মহান গুণাবলীকে হ্রাস করার একটি কারণ হবে, কিন্তু এটি সম্ভব নয়। ইহুদিরা মহান আল্লাহর শানে যে অপবাদ গুলো দিয়েছেন এবং মহান আল্লাহর গুণাবলীকে যেভাবে বিকৃত করেছেন অন্য কোন ঐশী ধর্ম এতটা বিকৃত করেনি। তারা আল্লাহর তাওহীদকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর জাতিগত গুণাবলী কে অস্বীকার করেছে এবং সেগুলো বিকৃত করেছে। এটি তাদের পরিবর্তন ও বিকৃতির কারণে হয়েছে যা ইহুদিদের ইচ্ছা অনুসারে হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে তাওরাতে অনেক অপবাদমূলক কাহিনী, অশ্লীল বক্তব্য আরোপিত করা হয় এবং সেগুলিকে নবী ও ধার্মিকদের সাথে যুক্ত করা হয়। তাই, ইহুদী ধর্ম তার নবী এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের অশ্লীল কাজ এবং অপরাধের সাথে সংযুক্ত করে। অনেকাংশে তারা ঈশ্বরকে দায়ী করে, যা তাঁদের অজ্ঞতার ফলস্বরূপ। তাই, ইহুদী ধর্মও সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বরের জ্ঞানের গুণকে অস্বীকার করেছিল।

৪.১ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মধ্যে তাদের জড়িত করা

ইহুদীরা দাবী করে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে অন্য ঈশ্বর আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস র. বলেন, আল-নাহাম বিন যায়েদ, কারদাম বিন কাব, এবং বাহরি বিন আমর এলেন। তারা বললেনঃ হে মুহাম্মাদ, আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, এজন্যই আমাকে প্রেরিত করা হয়েছে এবং আমি তাকে ডাকি।^{৮৪} সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, “বলুন, “সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কী?” বলুন, “আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যার কাছে এটি পৌঁছায় তাকে সতর্ক করতে পারি। তোমরা কি বহন করবে? সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর ছাড়া অন্য উপাস্য নেই”।^{৮৫} বলুন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।” বলুন, “নিশ্চয়ই তিনি এক ইলাহ এবং তোমরা যাকে তাঁর সাথে শরীক কর আমি তা থেকে বিচ্ছিন্ন।” সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইহুদিদের প্রতি জবাব দিয়েছেন- তাদের এ দাবি যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য আরো একজন উপাস্য আছে, যেমনটি আগের আয়াতে বলা হয়েছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর উত্তরে বলেন, এবং বল, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি না।” বলুন, “নিশ্চয়ই তিনি এক

ইলাহ এবং তোমরা যাকে তাঁর সাথে শরীক কর আমি তা থেকে বিচ্ছিন্ন”। অর্থাৎ: হে মুহাম্মাদ এই ইহুদিদের বলুন: আপনি যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন আমি তার সাক্ষ্য দিচ্ছি না যে আল্লাহর অন্য উপাস্য আছে, বরং তিনি তা অস্বীকার করেন। তিনি এক যার কোন শরীক নেই।^{৮৬}

৪.২ ঈশ্বরের সন্তান এবং প্রিয়জন

ইহুদিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় এমন মিথ্যা দাবিগুলির মধ্যে তাদের এই কথাটি হল আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁর প্রিয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বলেন, রসূলুল্লাহ সা. নুমান বিন আদা, শাস বিন আদী এবং বাহরি বিন আমরের কাছে এলেন। তারা তার সাথে কথা বলল এবং আল্লাহর রসূল তাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্কে কথা বললেন ও তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। তিনি তাদের প্রতিশোধের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, তাই তারা বলেছিল: হে মুহাম্মদ, আপনি আমাদের কেন ভয় করেন? আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহর সন্তান আর তার প্রিয়জন।^{৮৭} অতঃপর আল্লাহ বলেন, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলেছিল, “আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।” বলুন, “তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের শাস্তি দেন? বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর আধিপত্য এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।^{৮৮} ইহুদিরা যখন বলে: “আমরা আল্লাহর পুত্র” তখন “পুত্রত্ব” বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে ভাষ্যকারগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ঈশ্বরের সন্তানদের দুটি মত আছে:

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত যে, ইহুদীরা পুত্রত্ব বলতে যা বোঝায় তা হল পুত্রত্ব।^{৮৯} তাওরাতে বলা হয়েছে: “প্রভু এইভাবে বলেন, ‘ইস্রায়েল আমার প্রথমজাত পুত্র।’^{৯০} ইহুদীরা ইয়াকুব (ইসরায়েল)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত-তারা দাবি করে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। অতএব, তারা ঈশ্বরের সন্তান। তাওরাতে আরও বলা হয়েছে: “তোমরা, তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের সন্তান।^{৯১}” এটিও এসেছে: “আপনি, প্রভু, আমাদের পিতা”।^{৯২} ইহুদিরা এই গ্রন্থগুলিকে তাদের ব্যাখ্যা না করে প্রামাণিত বলে ধরে নিয়েছিল। কারণ তাদের দ্বারা যা বোঝায় তা সত্য নয় (পুত্রত্ব) এবং (পিতৃত্ব)। কারণ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান একটি সন্তান গ্রহণের উর্ধ্বে, কিন্তু এটি একটি রূপক অভিব্যক্তি, যা শিক্ষক ছাত্রকে বলে: হে পিতা, এবং এটি তাকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে। শায়খ তার ছাত্রকে বলেন, আমার ছেলে।^{৯৩} এটা স্পষ্ট যে এই গ্রন্থগুলি (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বিকৃত। যেমন আমরা অতীতে খুঁজে পেয়েছি।

২. কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, ইহুদীরা পুত্রসন্তান বলতে বোঝায় যে তারা তাঁর অনুসরণ করে।^{৯৪} সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইহুদিদের সম্পর্কে একটি গল্প বলেছিলেন: ইহুদিরা বলেছিল, “তারা শক্তিশালী ঈশ্বরের পুত্র।”^{৯৫} ইহুদিরা (আজিজের) অনুসারী যাকে তারা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করে,^{৯৬} এটি প্রকৃতির নিয়মে নয়, বরং প্রেম দ্বারা।^{৯৭} এবং তাই তারা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান জালেমরা যা বলে তার উর্ধ্বে। সবচেয়ে সঠিক মতামত প্রথম মতামত, যে ইহুদিরা পুত্রত্ব বলতে যা বোঝায় তা সত্য পুত্রত্ব। কারণ এই অর্থটি তালমুদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল। যাতে তারা বিশ্বাস করে যে ইহুদিদের আত্মা অন্যান্য আত্মা থেকে আলাদা। তারা ঈশ্বরের অংশ, পাশাপাশি পুত্র তার পিতার অংশ।^{৯৮} ইহুদিরা তাদের দাবির দ্বারা যা বোঝায় তাতে এই দুটি মতের মধ্যে পার্থক্য যাই হোক না কেন, তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একমত যে তারা অন্য সমস্ত মানুষের চেয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার সুবিধা রয়েছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সত্য কথা বলেছেন, “আপনি কি তাদের দেখেননি যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন”।^{৯৯} প্রমাণ: তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য পবিত্র কুরআন থেকে কিতাবি এবং যৌক্তিক প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে ইহুদিরা মিথ্যাবাদী। তা নিম্নরূপ:

১. কিতাবি প্রমাণগুলি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একত্বকে নির্দেশ করে, এবং তাঁর একজন সঙ্গী, পিতামাতা, বা একটি সন্তান থাকা অসম্ভব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণী: “এবং তারা বলল, “আল্লাহ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। বরং তিনি পবিত্র। তিনি ধনী। আসমানে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর আছে। আসলেই এর উপর কী তোমাদের কোন প্রমাণ আছে? তোমরা ঈশ্বর সম্পর্কে এমন কথা কেন বল যা তোমরা জানো না”।^{১০০} এবং তিনি আরও বললেন-তিনি পবিত্র, এবং তারা বললেন: পরম করুণাময় একটি পুত্র গ্রহণ

করেছেন। আপনি এমন সময়ে এসেছেন যখন আসমান প্রায় ছিন্ন হয়ে গেছে এবং পৃথিবী উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং পর্বতমালা ভেঙে পড়ছে। তারা ডাকে পরম করুণাময়ের একটি পুত্র আছে। পরম করুণাময়ের একটি পুত্র গ্রহণ করা উপযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেই পরম করুণাময়ের দাস।^{১০১}

২. যৌক্তিক প্রমাণও কিতাবি সাক্ষ্যের মত একই অর্থ নির্দেশ করে। এটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে সৃষ্টির যে কোন সম্পর্কে অস্বীকার করে। যার মধ্যে রয়েছে: ঈশ্বরের সাথে পিতা পুত্রের সম্পর্ক ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ইহুদিদের মিথ্যা দাবির জবাব দিয়েছিলেন যে তারা ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর প্রিয়জন, যা হতে পারে না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন, বলুনঃ কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন? বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহরই।^{১০২} এই ঐশ্বরিক প্রশ্নের উত্তর ইহুদিদের কাছ থেকে দু'ভাবে আসতে পারে;

ক. হয় তারা বলে: হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দেন। তখন তাদের বলা হয়: তাহলে তোমরা তার সন্তানও নন, তার বন্ধুও নন। কেননা প্রেয়সী তার প্রেয়সীকে অত্যাচার করে না,^{১০৩} এবং তোমরা তার আযাবের সাথে যুক্ত, যেমন তোমরা দাবি করেছ। এটা তোমাদের মিথ্যাচারের প্রমাণ।^{১০৪} খ. হয় তারা বলে: যে তিনি আমাদের অত্যাচার করবেন না, তখন তাদের বলা হয়: তোমাদের কিভাবে যা বলা হয়েছে তা অস্বীকার করছ? কেননা ওল্ড টেস্টামেন্টে ইহুদীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

৪.৩ ক্লাস্তি

তাওরাতের বলা হয়েছে: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং অন্যান্য সৃষ্টি ষষ্ঠ দিনে সম্পূর্ণ হয়েছিল। তিনি তাঁর সমস্ত কাজ থেকে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিলেন। ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করলেন এবং পবিত্র করলেন। কারণ এই দিনে তিনি তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।^{১০৫} ইহুদীরা মনে করে যে মহান আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করার পর ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তারপর তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। আর যালিমরা যা বলে আল্লাহ তার থেকে অনেক উঁচুতে। পৃথিবীতে বা স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যেখানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে বলেছেন, “তারা কি দেখেনি যে আল্লাহই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তারা সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান”।^{১০৬} সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরও বলেন, “আমি নভোমন্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি”।^{১০৭}

৪.৪ ভুল ও অনুশোচনা

এটি তাওরাতের বলা হয়েছে: প্রভু তার লোকদের প্রতি যে মন্দ কাজটি করবেন তার জন্য তিনি অনুতপ্ত হন।^{১০৮} ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অভ্রান্ত নন। যদি তার থেকে কোন ত্রুটি হয়, তবে তিনি তার ভুলের জন্য অনুশোচনা করেন। অত্যাচারীরা যা বলে তার থেকে তিনি অনেক উঁচুতে। ইহুদির এই বিশ্বাস ঈশ্বরের মর্যাদা কে নষ্ট করে। ঈশ্বর কখনো ভুল করতে পারে না এবং এটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব। কারণ ঈশ্বর সমস্ত বিদ্যমান জিনিসগুলি অস্তিত্বের কথা আগে জানেন, যেমন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলেছেন, “আর ঈশ্বর সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন”।^{১০৯} এইভাবে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইহুদীদের দুঃসাহসিকতার এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় দেবত্বের মর্যাদা সম্পর্কে ইহুদিদের উপলব্ধিতে বিচ্যুতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়েছে। এ কারণে তারা ঈশ্বর সম্পর্কে রাসূল সা. এর সাথে তর্ক করেছিল এবং তারা দাবি করেছিল যে, তাদের নিজস্ব ঈশ্বর আছে, তারা এটি অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ করে না।^{১১০}

৪.৫ আল্লাহ গরীব

ইহুদিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় এমন মিথ্যা দাবিগুলির মধ্যে তাদের বক্তব্য হল আল্লাহ গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : আবু বকর আল-সিদ্দিক ঘরে প্রবেশ করেন এবং অনেক লোককে দেখতে পান যারা তাদের মধ্যে ফানহাস বিন আজুরা নামে একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে জড়ো হয়েছিল। তিনি তাদের একজন পণ্ডিত এবং রাব্বি ছিলেন। তারপর আবু বকর বললেন, “আল্লাহর কসম, আপনি ভাল জানেন”- ফানহাস কে বলেন, থিক্ তোমাকে, হে ফানহাস, আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয়ই

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন এবং তোমরা তা তোমাদের কাছে লিখিত দেখতে পাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে। তিনি প্রতি উত্তরে বলেছেন, আল্লাহর কসম হে আবু বকর, আমরা আল্লাহর কাছে গরীব নই, বরং তিনি আমাদের জন্য গরীব এবং আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি না যেভাবে তিনি আমাদের কাছে প্রার্থনা করেন এবং আমরা তাঁর থেকে ধনী। তিনি যদি আমাদের পক্ষ থেকে ধনী হতেন, তিনি আমাদের কাছ থেকে ধার নিতেন না। তিনি সুদ নিষেধ করেন এবং আমরা ধনী হলেও তা আপনাকে দিই।” যতক্ষণ তিনি আমাদের সুদ দিয়েছেন ততক্ষণ তিনি আমাদের প্রয়োজনে নেই।

আবু বকর রাগান্বিত হয়ে ফানহাসকে আঘাত করলেন। কড়া মুখে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, যদি আমাদের ও তোমার মধ্যে চুক্তি না থাকত, তাহলে হে আল্লাহর শত্রু, আমি তোমার ঘাড়ে আঘাত করতাম। সুতরাং যতটা পারো আমাদের সাথে মিথ্যা বল। তুমি সত্যবাদী। অতঃপর ফানহাস আল্লাহর রসূলের কাছে গেলেন এবং বললেন: হে মুহাম্মাদ, দেখ তোমার বন্ধু আমার সাথে কি করেছে। আবু বকরকে আল্লাহর রসূল বললেন: আমি যা দেখছি তা কি তোমাকে করতে বাধ্য করেছে? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর দুশমন একটি কঠিন কথা বলেছে। সে দাবী করেছে যে, আল্লাহ গরীব এবং তারা তাঁর থেকে ধনী। যখন সে এ কথা বলে, তখন আমি তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে তার মুখে আঘাত করেছি। অতঃপর ফানহাস তা অস্বীকার করে এবং বললেন: আমি তা বলিনি।^{১১৬} অতঃপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন এবং ঈশ্বর তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছিল, “ঈশ্বর গরীব, এবং আমরা ধনী।” তারা যা বলেছিল আমরা তা লিখে রাখব, এবং তারা নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল এবং আমরা বলব, “শাস্তির স্বাদ নিন”^{১১৭}।

ইহুদিরা যে কারণে ঈশ্বরকে গরীব বলে দাবি করত তার কারণ হল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয় সে কে? অতঃপর তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং আল্লাহ তা গ্রহণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।^{১১৮} ইহুদীরা বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভু দরিদ্র, তাই তাঁর বান্দাদের কাছে ঋণ চায়।^{১১৯} তাই আল্লাহ কুরআনে পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল করে বলেন, “আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছিল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি গরীব এবং আমরা ধনী।’^{১২০} আর ঋণ অর্থ: একজন মানুষ তার অর্থ অন্য কাউকে তার সম্পত্তি হিসেবে প্রদান করে; যাতে সে প্রয়োজনে খরচ করতে পারে। যেহেতু একজন মুসলমান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য অভাবহীন লোকদেরকে দান করেন। আর ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাকে কেয়ামতের দিন বহুগুণ বেশি শোধ করবেন, তাই তিনি একে ঋণ বলেছেন, এবং এটি এই কারণে নয় যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তার সৃষ্টির কোন প্রয়োজন আছে। যেমন ইহুদিরা বলেছিল যে তারা ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা দয়ালু। বরং তাঁর কাছে ধনের কোন অভাব নেই, যেমন তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন “আর আমার কাছে ধন ভান্ডারের কোন অভাব নেই।” আবু যার-এর বরাতে নবী সা. বলেন, আল্লাহ বলেছেন, “হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি, তোমরা মানুষ এবং তোমরা জ্বীন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে এবং আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা চেয়েছিল তা দিয়ে দেই, তবে তাতে আমার ধন একটুও হ্রাস পাবে না”।^{১২১}

৪.৬ ঈশ্বর অজ্ঞ

ইহুদিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অপবাদ দেয় এমন মিথ্যা দাবির মধ্যে তাদের অন্যতম দাবি হল: ঈশ্বর অজ্ঞ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কর্তৃত্বে বর্ণিত : তিনি বলেন, যখন তারা (ইহুদীরা) ঈমানদারদের সাথে দেখা করত, তখন তারা বলত: আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের সঙ্গী আল্লাহর রাসূল, কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য বিশেষ। আর যখন তারা থেকে অপরের সাথে মিলিত হত তখন তারা অন্য কথা বলত।^{১২২} আল্লাহ বলেন, “আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, “আমরা ঈমান এনেছি” এবং যখন তারা একে অপরের সাথে একাকী থাকে, তখন বলে, “আল্লাহ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা কি তোমরা তাদের জানাবে? যাতে তারা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে পারে তোমার

﴿وَلَنْ * شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾
 تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنَّ آتِئْتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ يَبْغَدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا
 سُرَّاهُ آل-إِمْرَان: ১১৩, ১২০।

- ^৯ তুলনামূলক ধর্ম, তদেব, পৃ. ২০৪।
- ^{১০} আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও আব্দুল কাদের, তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৯১।
- ^{১১} আল-আদইয়ান ওয়াল ফিরাক ওয়াল মাযাহিবিল মু'আসিরাহ, তদেব, পৃ. ২১।
- ^{১২} সূরাহ আল-ইমরান: ৭৮।
- ^{১৩} ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, বিশ্বে প্রচলিত ধর্মমত (রাজশাহী: রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১১০-১১
- ^{১৪} তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা, তদেব, পৃ. ১৯১।
- ^{১৫} তদেব, পৃ. ১৯২; ড. মোঃ শাজাহান কবির, বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি (ঢাকা: দিক দিগন্ত প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৭ :
 প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ধর্ম দর্শন (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশাস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩২১।
- ^{১৬} ড. জাওয়াদ 'আলী, তারীখ আল-'আরব কাবলাল ইসলাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ইরাক: মাতবা'আহ আল-মাজমা 'আল-'ইলমী আল
 'ইরাকী, ১৯৫৬ খ্রি.), পৃ. ৯৪-৯৫।
- ^{১৭} তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা, তদেব, পৃ. ১৯২।
- ^{১৮} প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ হাসান 'আলী বারাকাত, আল-ইয়াহুদীয়াহ (কায়রো: দারুত তাকওয়া, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১১।
- ^{১৯} মাজমা 'আল-বায়ান, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১২৫; নাসির ইবন আদিল্লাহ আল-কিফারী ও নাসির ইবন 'আবদ, আল-কারীম
 আল-'আকল আল-মু'আসিরাহ (রিয়াদ: দার আল-সামীঈ লিল-নাশার ওয়া আল তাওয়া, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৮-২০
- ^{২০} তদেব, পৃ. ১৮।
- ^{২১} সূরাহ ইউনুস: ৮৪।
- ^{২২} সূরাহ আল-ইমরান: ৬৭।
- ^{২৩} তুলনামূলক ধর্ম, তদেব, পৃ. ২৩১
- ^{২৪} ইসরাইলের প্রাণ কেন্দ্রে হারিশ শহরের কাছে শ্যারন অঞ্চলে ছয় লাখ বর্গ কিলোমিটারের একটি প্রাচীন শহরের নাম
 কেনানাইট। ব্রোঞ্জ যুগের গোড়ার দিকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষ পর্যায়ে গড়ে ওঠে এই পরিকল্পিত মহানগর। এর
 চারপাশে ছিল দুর্গ প্রাচীর এবং তাতে ছিল আবাসিক ও সাধারণ এলাকা, সড়ক এবং গলি। প্রাচীন এ শহরে ছয় হাজারের
 মতো বাসিন্দা ছিলেন এবং তারা কৃষি ও সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চল, সংস্কৃতি ও রাজ্যের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায়
 রেখে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ড্র. ইন্টারনেট, <https://bn.m.wikipedia.org/wiki/Kenaio>
- ^{২৫} লেবানন পর্বত এবং ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি এক ফালি সরু ভূমিতে ফিনিশীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ করার মত
 এখানে উর্বর জমি ছিলনা। তাদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল বাণিজ্য। ফিনিশীয়দের অবদান: প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে
 ফিনিশীয়দের পরিচয় শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসাবে। ধ্রুবতারা (North Star) দেখে তারা দিক নির্ণয়
 করত। এ কারণে ধ্রুবতারা অনেকের কাছে 'ফিনিশীয় তারা' (Phoenician Star) নামে পরিচিত ছিল। সাংস্কৃতিক
 উন্নতি: সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান হল বর্ণমালা (Alphabet) এর উদ্ভাবন। তারা ২২ টি
 ব্যঞ্জনবর্ণের (Consonants) উদ্ভাবন করে। আধুনিক বর্ণমালার সূচনা হয় এখান থেকে। ফিনিশীয়দের উদ্ভাবিত
 বর্ণমালার সাথে পরবর্তীতে গ্রিকরা স্বরবর্ণ (Vowels) যোগে করে বর্ণমালাকে সম্পূর্ণ করে। ড্র. উইকিপিডিয়া,
<https://bn.m.wikipedia.org/wiki/Finishio>
- ^{২৬} ব্যাবিলন ছিল দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার একটি রাজ্য, যা আধুনিক ইরাকের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে
 যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেগুলোর অন্যতম হলো ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। অ্যামোরাইট নামের এক জাতি খ্রিস্টপূর্ব
 ১৮৯৪ অব্দে মেসোপটেমিয়ার সুমের ও আক্কাদ নগরীর মাঝামাঝি অবস্থিত ব্যাবিলন নামক স্থানে একটি সভ্যতা গড়ে
 তোলে। এটিই ব্যাবিলনীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। ড্র. উইকিপিডিয়া, <https://bn.m.wikipedia.org/wiki/Babilion>
- ^{২৭} আরবী ভাষায়, ম্যাগিজিনস (মাজুস) হল জরথুষ্ট্রীয়দের পরিভাষা। শব্দটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরাহ আল
 হাজ্জের ১৭ নং আয়াত এ, যেখানে কেয়ামতের দিন বিচার করা হবে এমন ধর্মের তালিকায় ইহুদি, সাবায়ান এবং
 খ্রিস্টানদের পাশাপাশি "জাদুকরদের" উল্লেখ করা হয়েছে। ড্র. উইকিপিডিয়া 'Magi' নামক শিরোনামে থেকে তথ্য
 সংগৃহীত, <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magi>
- ^{২৮} ড. ফাতিহ মুহাম্মদ আল-জাগবী, তা'আসসুরুল ইয়াহুদীয়াহ বিল আদইয়ানিল ওসানিয়াহ (বৈরুত: দারুল আফাক
 আল-'আরাবিয়াহ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১০৪।

- ^{২৯} নাবিল মুহাম্মদ, “একত্ববাদ: ইসলামিক বিশ্বাসে এর বৈশিষ্ট্য”, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি, সংখ্যা ২য় খণ্ড, ৪৯, পৃ. ৭-৩৩।
- ^{৩০} আবু হামিদ আল গাযালী, এহইয়াউ ‘উলুমিদ দীন, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল মা‘রেফা, তা.বি), পৃ. ৮৯-৯১।
- ^{৩১} আব্দুল্লাহ বিন ফাহাদ বিন আদ্রির রাহমান, যুহুদুল মালিকিয়াহ ফি তাকরিরি তাওহিদিল ইবাদাহ (বৈরুত: দারুল তাওহিদ লিন নাশর, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬৯-৬০।
- ^{৩২} সূরাহ আল-হাজ্জ : ৭৩-৭৪।
- ^{৩৩} সূরাহ আল-আম্বিয়া : ২২।
- ^{৩৪} সূরাহ আল-আরাফ : ৫৯।
- ^{৩৫} সূরাহ আল-আরাফ : ৬৫।
- ^{৩৬} সূরাহ আল-আরাফ : ৭৩।
- ^{৩৭} সূরাহ আল-আম্বিয়া : ২৫।
- ^{৩৮} সূরাহ আন-নাহল : ৫১।
- ^{৩৯} সূরাহ আল-মুমিনুন: ৯১।
- ^{৪০} ড. আদিল ইবন আলী ও আহমদ ইবন উসমান, আল মাউসুয়াতুল মুয়াসসারাহ ফিত-তারিফ বি-নাবিয়ার রাহমাহ, (সাউদী: ফারিকুল আমল ফিল মুসায়াহ, তা.বি), পৃ. ৯৯২।
- ^{৪১} সূরাহ আর-রহমান: ২৬-২৭।
- ^{৪২} শায়খ আব্দুর রহমান আস সা‘দী, তাফসির আল আসমাউল হুসনা (আল মদিনা: জামিয়া ইসলামিয়া, তা.বি), পৃ. ৬৪।
- ^{৪৩} ইসমা‘ইল ইবন মুহাম্মদ আত তাইমী আল আসবাহানী, আল হুজ্জাত ফি বায়ানিল মাহাজ্জাত, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারুল বাই‘আহ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ১৪০।
- ^{৪৪} শায়েখ মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম, আল-ফাতাওয়া ওয়ার-রাসায়িল, ১ম খণ্ড (মাক্কা: মাতবাতুল হুকুমাহ, তা.বি), পৃ. ২০৭।
- ^{৪৫} সূরাহ আর-রহমান: ২৭।
- ^{৪৬} সূরাহ আল ক্বাছাছ: ৮৮।
- ^{৪৭} সূরাহ আয যুমার: ৬২।
- ^{৪৮} বায়হাকী, আল-ই‘তিক্বাদ (সৌদি: আল জামি‘আতুল ইলমিয়াহ, তা.বি), পৃ. ২৯-৩০; ইবনুল কাইয়ুম, মুখতারাসুস ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ, ২য় খণ্ড (মিশর: দারুল হাদিস, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৭৯-১৮০।
- ^{৪৯} সলায়মান ইবনুল আশ‘আছ আবু দাউদ, সুনানু আবী দাউদ (দামিশক: মাকতাবাহ ইবন হাজার, ২০০৩ খ্রি.), হাদিস: ৪৬৬; মুহাম্মদ ইবন আদিল্লাহ আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবিহ (দেওবান্দ: আসাহু মাতাবি, তা.বি.), হাদিস নং: ৭৪৯।
- ^{৫০} মিশকাতুল মাসাবিহ: ৫৫৫৫।
- ^{৫১} সূরাহ আল মুত্বাফফেফীন: ১৫।
- ^{৫২} সূরাহ আশ-শূরা: ১১।
- ^{৫৩} ওল্ড টেস্টামেন্ট, এক্সোডাস, অধ্যায় ৩২, অনুচ্ছেদ: ১-৬।
- ^{৫৪} আল-সামারি: (খ্রিস্টপূর্ব ১২ শতকের কাছাকাছি) তিনি হলেন মুসা বিন জাফর, সামারিয়া গোত্রের একজন কেনানীয়। তিনি বনী ইসরাঈল এর সাথে মিসরে গিয়েছিলেন এবং মুসা আ.-এর সাথে ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন মূনাফিক ছিলেন। তাই তিনি মুসা আ.-এর অনুপস্থিতির সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ইস্রায়েলের সন্তানদেরকে তার তৈরি বাছুরের পূজায় মুগ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ জাদুগর মূর্তি তৈরির বিষয়ে। দ্র: ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনীল ‘আযীম, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল মারিফাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬১-১৬৭; মুহাম্মদ ইসমাঈল ইব্রাহীম, মু‘জামুল আলফাজ ও ‘আলামুল কুরআনিয়াহ (মিশর: দারুল ফিকর আল-আরাবি), পৃ. ২৫১।
- ^{৫৫} সূরাহ ত্বাহ: ৮৫-৮৮।
- ^{৫৬} কিতাবুল মুকাদ্দাস, সফরুল মুলুকিল আওয়াল, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ: ২৫-২৮।
- ^{৫৭} গুস্তাভ লে বোন, আল ইয়াহুদ ফিত তারিখিল হাদারাতিল ‘উলা (মিশর: মু‘য়াসসাসাতুল হিন্দা লিত ‘তালিমি ওয়াস সাকাফাহ, তা.বি), পৃ. ৬১।
- ^{৫৮} ড. আহমাদ শালাবী, মুকারানাভুল আদইয়ান, ১ম খণ্ড, আল ইয়াহুদিয়াহ (মিশর: মাকতাবাতুল নাহদাহ, তা.বি), পৃ. ১৮২।
- ^{৫৯} আল মুলুকুস সানি, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ: ৪।
- ^{৬০} বা‘ল: সেমেটিক ভাষাতে এর অর্থ হল (মালিক), ওল্ড টেস্টামেন্টে কানানীয়দের একটি দেবতাকে বোঝানোর জন্য উল্লিখিত একটি নাম, যেখানে প্যালেস্টাইনের কেনানে বিভিন্ন অংশে বা‘ল পূজা করা হত। এটা একটা ঈশ্বর শব্দের সমার্থক শব্দ হয়ে গেছে। যাতে সেখানে স্বর্গের বা‘ল, অর্থাৎ স্বর্গের ঈশ্বর এবং বা‘ল বজ্র (যার অর্থ বজ্রের দেবতা)

- ইত্যাদি। দ্র: মুহাম্মাহ নাসার, আল মাওসু'আতুল 'আরাবিয়াহ আল মুয়াসসিরাহ, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আসারিয়াহ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৮২।
- ৬১ Astarte: ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত একটি নাম। তিনি উর্বরতা, প্রেম এবং সৌন্দর্যের সেমেটিক দেবী। তিনি ছিলেন ফিনিশিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাত*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: আল মানযামাতুল আরাবিয়াহ লিত তারবিয়াহ ওয়াস সাকাফাহ ওয়াল উলুম, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১০৫।
- ৬২ মোলোচ: অর্থ (রাজা), ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত একটি নাম। ফিনিশিয়ানরা তাকে একটি “ভয়ংকর দেবতা” মনে করত তারা একটি মন্দিরের সামনে তাদের সন্তানদের জীবন্ত পুড়িয়ে তার কাছে যেতেন। উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাত*, তদেব, পৃ. ১১৫।
- ৬৩ ড. ফাকি মুহাম্মদ আল-জাগবী, *তা'য়াসসুরুল ইয়াহুদিয়াহ বিল আদিয়ানিল কাদিমাহ* (সৌদি: আল জামি'আতুল ইলমিয়াহ, তা. বি), পৃ. ৬৭৬-৬৯২।
- ৬৪ এটি ওল্ড টেস্টামেন্টে এসেছে: “এবং মোলোচের কাছে অন্মনের সন্তানদের জঘন্য কাজ”। *আল মুলুকুল আউয়াল*, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ: ৭।
- ৬৫ ওল্ড টেস্টামেন্ট, বিচারক, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ: ৬।
- ৬৬ আব্দুল লতিফ আল খিদর, *আকাইদুল ইয়াহুদ বাইনাল হাক ওয়াল বাতিল* (সৌদি: আল জামি'আতুল ইলমিয়াহ, তা. বি), পৃ. ২১৮।
- ৬৭ ইল: সেমেটিক ভাষাতে এর অর্থ হল: (ঈশ্বর), এবং এটি সত্যের দ্বারা ব্যবহৃত একেশ্বরবাদী উপাধি। সুহাইল দীব, *আত তাওরাত বাইনাল ওসানিয়াহ ওয়াত তাওহীদ* (বৈরুত: দারুন নাফায়েস, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৬: জাকী শানুদাহ, *আল ইয়াহুদ* (মিশর: মাকতাবাতুন নাহদাহ আল মিসরিয়াহ, তা. বি), পৃ. ৩৯৪-৩৯৫।
- ৬৮ ইলোহিম: একটি হিব্রু শব্দ, যার অর্থ বহুবচনে (দেবতারা), এবং সম্ভবত এটি বহুবচনবাদীদের দ্বারা দেওয়া নাম যারা একে অন্যের সাথে সমস্ত দেবতার সংমিশ্রণ বলে মনে করতেন। *আত তাওরাত বাইনাল ওসানিয়াহ ওয়াত তাওহীদ*, তদেব, পৃ. ১৬; *আল ইয়াহুদ*, তদেব, পৃ. ৩৯৪।
- ৬৯ অ্যাডোনাই: সেমেটিক ভাষাতে অর্থ-আমার প্রভু, এটি একটি উপাধি, যা কানানীয়রা তাদের দেবতাকে (তামুজ) দিয়েছিল, যিনি গ্রীকদের কাছে গেলে তার নাম হয়: (অ্যাডোনিস)। *আত তাওরাত বাইনাল ওসানিয়াহ ওয়াত তাওহীদ*, তদেব, পৃ. ১৬; *আল ইয়াহুদ*, তদেব, পৃ. ৩৯৪।
- ৭০ ইয়াহওয়ে একটি হিব্রু শব্দ যার অর্থ “যিনি বিদ্যমান” বা “যিনি আছেন।” কারণ এটি হিব্রু শব্দ (Heh) বা (Huh) থেকে এসেছে যার অর্থ অস্তিত্ব বা সত্তা। তোরাহ-এ “ঈশ্বর” কে “ইলয়াহওয়ে” নাম দিয়েছে। *আল ইয়াহুদ*, তদেব, পৃ. ২৯৩; *আত তাওরাত বাইনাল ওসানিয়াহ ওয়াত তাওহীদ*, তদেব, পৃ. ১৬-১৭; (Yahweh) সম্পর্কে আরো বিস্তারিত, ড আহমাদ শালাবী: *তুলনামূলক ধর্ম*, খণ্ড ১, আল ইয়াহুদিয়াহ, পৃ. ১৮৩-২০০।
- ৭১ *আল ইয়াহুদ*, তদেব, পৃ. ২৯৩; *মুকরানা তুল আদইয়ান*, খণ্ড ১, আল ইয়াহুদিয়াহ, তদেব, পৃ. ১৮৮।
- ৭২ এক্সোডাস, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ: ১৫।
- ৭৩ ‘আকাইদুল ইয়াহুদ বাইনাল হাক ওয়াল বাতিল, তদেব, পৃ. ২২০; *আত তাওরাত বাইনাল ওসানিয়াহ ওয়াত তাওহীদ*, তদেব, পৃ. ২২।
- ৭৪ *আল ইয়াহুদ*, তদেব, পৃ. ২৯৩; *তা'য়াসসুরুল ইয়াহুদিয়াহ বিল আদইয়ানিল কাদিমাহ*, তদেব, পৃ. ৫২।
- ৭৫ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *E Deuteronomy*, অধ্যায় ৭, ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণবাদী প্রকাশ, অনুচ্ছেদ: ৬।
- ৭৬ ওল্ড টেস্টামেন্ট, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ: ১০।
- ৭৭ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *ইশাইয়া*, অধ্যায় ৬৩, অনুচ্ছেদ: ১৬।
- ৭৮ *আকাইদুল ইয়াহুদ বাইনাল হাক ওয়াল বাতিল*, তদেব, পৃ. ২২৪।
- ৭৯ *E Deuteronomy*, অধ্যায় ২৩, অনুচ্ছেদ: ১৯-২০, ১১ খণ্ড, পৃ. ৯৪১।
- ৮০ সূরাহ আল ইমরান: ৭৫।
- ৮১ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *জেনেসিস*, অধ্যায় ৩২, অনুচ্ছেদ: ২৪-৩২।
- ৮২ সূরাহ আশ-শুরা: ১১।
- ৮৩ সূরাহ আল বাকারা: ১৩৯।
- ৮৪ আল-তাবারী, *জামি'উল-বায়ান*, খ. ৭ (বৈরুত: মু'য়াসসাতুর রিসালাহ, তা.বি), পৃ. ১৬৪; আল-সুয়ুতি, *লুবাব আল-নাকুল* (বৈরুত: দারুন কুতুবুল ইলমিয়াহ, তা.বি), পৃ. ১০০। ইমাম আল-তাবারী- সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর প্রতি রহম করুন- পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে এর নাযিলের আরেকটি কারণ হল ইহুদীদের ব্যাপারে, তিনি বলেন, আয়াতটি ইহুদীদের একটি দল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে,

- যার মধ্যে তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিও রয়েছে, আল-তাবারী, *জামি'উল-বায়ান*, খণ্ড ৭ (বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছির আরাবী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৬৪।
- ৮৫ সূরাহ আল-আনআম: ১৯।
- ৮৬ *জামি'উল-বায়ান*, খ. ৭, তদেব, পৃ. ১৬৩।
- ৮৭ *জামি'উল-বায়ান*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৬৪; হাফেজ ইবন কাছির, *তাফহিরুল কুরআন আল-আযিম*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইবনে হজম, তা.বি), পৃ. ৩৪-৩৫।
- ৮৮ সূরাহ আল-মায়িদাহ: ১৮।
- ৮৯ *জামি'উল-বায়ান*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৬৪; *তাফহিরুল কুরআন আল-আযিম*, ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৪।
- ৯০ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *এক্সোডাস*, অধ্যায় ৪, অনুচ্ছেদ: ২২।
- ৯১ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *Deuteronomy*: অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ: ১।
- ৯২ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *ইশাইয়া*: অধ্যায় ১৩, অনুচ্ছেদ: ১৬।
- ৯৩ *তাফহিরুল কুরআনিল আযিম*, ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৪; আবদুল ওয়াহাব আন-নাজ্জার, *কাসাসুল আযিয়া* (মিশর: মাতবা'য়াতুন নাসর, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৫৪১-৫৪২; ড. আহমাদ হিজাযী আল-সাক্বা, *আক্বানিমুন নাসারা*, তদেব, পৃ. ২৩ ও ২৫।
- ৯৪ আল যামাখশারী, *আল কাশশাফ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল মারিফাত, তা. বি), পৃ. ৬০৩।
- ৯৫ সূরাহ আত তওবা: ৩০।
- ৯৬ *জামি'উল-বায়ান*, ১০ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ২১১।
- ৯৭ *নাকদুদ তাওরাত*, তদেব, পৃ. ১২৩।
- ৯৮ ড. ইউসুফ নাসরুল্লাহ, অনুবাদ, ড. অগাস্ট রোহলিং, *আল কানজুল মাওসুত ফি কাওয়াইদিত তালমুদ* (লেবানন: আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ আয-যাহাবিয়াহ, ১৮৩০ খ্রি.), পৃ. ৬৬।
- ৯৯ সূরাহ আন-নিসা: ৪৯।
- ১০০ সূরাহ ইউনুস: ৬৮।
- ১০১ সূরাহ মরিয়ম: ৮৮-৯৩।
- ১০২ সূরাহ আল-মায়িদা: ১৮।
- ১০৩ এবং যখন তার মা লোকদের দেখলেন, তখন তিনি তার ছেলের জন্য ভয় পেলেন। ছুটে এসে বললঃ আমার ছেলে, আমার ছেলে। সে দৌড়ে তাকে নিয়ে গেল এবং লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এই মহিলা তার ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করবে না। তখন রাসূল তাদের বলেন, মহান আল্লাহ কখনো তার প্রিয় বান্দাদের আগুনে ফেলবে না। *মুসনাদে আহমাদ*, খ. ৩, তদেব, পৃ. ১০৪।
- ১০৪ আল-কুরতুবী, *আল-জামি'উ লি আহকামিল ১ম খণ্ড* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ১২০।
- ১০৫ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *তাকবিন*, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ: ১-৩।
- ১০৬ সূরাহ আল-কাহাফ: ৩৩।
- ১০৭ সূরাহ ক্বাফ: ৩৮।
- ১০৮ ওল্ড টেস্টামেন্ট, *এক্সোডাস*, অধ্যায় ৩২, অনুচ্ছেদ ১৪।
- ১০৯ সূরাহ আন-নিসা: ১২৬।
- ১১০ *তা'য়াসুফুল ইয়াহুদিয়াহ বিল আদইয়ানিল কাদিমাহ*, তদেব, পৃ. ৬১৮-৭০২।
- ১১১ *জামি'উল-বায়ান*, খ. ৪, তদেব, পৃ. ১৯৪; *তাফহিরুল কুরআনিল আযিম*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৪৩৪।
- ১১২ সূরাহ আল-ইমরান: ১৮১।
- ১১৩ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৪৫।
- ১১৪ *তাফহিরুল কুরআনিল আযিম*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪; লুবাব আল-নাকুল, তদেব, পৃ. ৬২।
- ১১৫ সূরাহ আল-হিজর: ২১।
- ১১৬ ইমাম মুসলিম, *আস সাহীহ*, কিতাবুল বিররী ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ৪৫, বাবু তাহবিমিয যুলুম, হাদিস নং ৫৫, পার্ট ২, পৃ. ১৯৯৪ - ১৯৯৫।
- ১১৭ লুবাব আল-নাকুল, তদেব, পৃ. ২০; *জামি'উল-বায়ান*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৭০; *তাফহিরুল কুরআন আল-আযিম*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১১৫।
- ১১৮ সূরাহ আল বাকারাহ: ৭৬।
- ১১৯ *জামি'উল-বায়ান*, খণ্ড ১, তদেব, পৃ. ৩৭০-৩৭৩; *তাফহিরুল কুরআনিল আযিম*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১১৫-১১৬।
- ১২০ সূরাহ আল বাকারাহ: ৭৭।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইবনুল হায়ছামের অবদান [Contribution of Ibnul Haytham in Various Branches of Science]

গুলশান আকতার*

[Abstract: Ibn al-Hytham (354-430 AH/ 965-1040 AD) was the best scientist of the East and the West. (He considered as) one of the pioneers of basic scientific research in the Islamic golden age, the bright star of Basra. He was the first to correctly explain the theory of vision, and to argue that vision occurs in the brain, pointing to observations that it is subjective and affected by personal experience. Although he was a pioneer in optics, he has made unprecedented contributions in almost every branch of epistemology. Western scientists have laid the foundations of modern science based on his basic research in science. Despite this, the common people trapped in the web of delusion of Western scientists, have forgotten the contribution of Ibn al-Hytham. Therefore, in order to present Ibn al-Hytham's contribution to the next generation, it is very important to compose his biography and scientific contributions. This article highlights on Ibn al-Hytham's biography and his contributions to various branches of science.]

Keywords: Ibnul Haytham, Contribution, Various Branches of Science.

১. ভূমিকা

যুগে যুগে যে সকল মুসলিম মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের সাথে কালোত্তীর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে ইবনুল হায়ছাম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রখর মেধা শক্তির অধিকারী ইবনুল হায়ছাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে যখন এক নিশ্চলতার ভাব বিজ্ঞান জগতকে প্রায় ছেয়ে ফেলেছিল, তখন যাদের অক্লান্ত সাধনায় জ্ঞান-বিজ্ঞান সে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় তাদের মধ্যে ইবনুল হায়ছাম উল্লেখযোগ্য। তাইতো মধ্যযুগে বিজ্ঞান জগতে যে সমস্ত কীর্তিমান পুরুষ নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করে নব ধারায় বিজ্ঞানকে চালিত করেন, ইবনুল হায়ছামকে তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান বললেও অত্যুক্তি হবে না। সময়ের আবর্তনে যারাই জীবনের সোনালী ক্ষণগুলোকে একটি নীতিবোধ ও আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করেন এবং স্বীয় জীবনকে সে লক্ষ্যে গড়ে তোলার প্রত্যাশী হন তাদের জন্য ইবনুল হায়ছাম এক অনুসরণীয় নাম। তার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল মানাযির (كتاب المناظر) তাকে বিজ্ঞান জগতে অমর করে রেখেছে। তার এ গ্রন্থটি পরবর্তীতে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞানে তার মৌলিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে নিত্য-নতুন তথ্যের আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে। অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতা বলেই ইবনুল হায়ছাম বিশ্ব সেরা বিজ্ঞানীর আসনে সমাসীন হয়েছেন।

২.১ নাম ও বংশ পরিচয়

তঁার নাম আল-হাসান ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আল-হায়ছাম আবু আলী।^১ তিনি একজন পার্সী মুসলিম বিজ্ঞানী। পাশ্চাত্যে তিনি আল-হাজেন (Al-Hazen) নামে পরিচিত। তবে আল-বাসরী^২ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। আলোকবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে আলোকবিদ্যার জনক তথা Father of optics নামে অভিহিত করা হয়।^৩ তঁার ডাক নাম ছিল দ্বিতীয় টলেমী (بطليموس الثاني)/(Second ptolemy)।^৪

২.২ জন্ম ও জন্মস্থান

তিনি আব্বাসীয় খলীফা দ্বিতীয় হাকাম আল-মুনতাসির বিল্লাহ (৯৬১-৯৭৬ খ্রি.)-এর শাসনামলে ৩৫৪ হিজরী মোতাবেক ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই ইরাকের বসরায়^৫ এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^৬

* পিএইচডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

২.৩ শিক্ষা জীবন

তৎকালীন বসরা ছিলো বুয়েদীয় পারস্য^৭ সাম্রাজ্যের অংশ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। তিনি বসরা ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে^৮ শিক্ষা লাভ করেন।^৯ এছাড়া উমাইয়া খলীফাদের শাসনামলে পৃথিবীর শোভাসম্পদময়ী শ্রেষ্ঠ নগরী কর্ডোভা^{১০} ধন সম্পদে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উন্নীত হয়। তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছিলেন। ইবনুল হায়ছামের জন্ম হয় চিকিৎসক পরিবারে। ফলে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় ও পদার্থবিদ্যায় বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর যশ কেবল আন্দালুসেই^{১১} সীমাবদ্ধ ছিল না, সুদূর মিসর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।^{১২}

২.৪ খলীফা আল-হাকিম বি-আমর ইল্লাহ-এর সাহচর্যে

মিসরের ফাতেমীয় খলীফা আল-হাকিম^{১৩} (৯৯৬-১০২০ খ্রি.) অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে দারুল হিকমাহ^{১৪} (বিজ্ঞানের শিক্ষায়তন) স্থাপন করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ থাকায় আল-মুকাত্তমে তিনি একটি মানমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল হায়ছাম জ্যোতির্বিদ্যায় ও পদার্থবিজ্ঞানের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এ কথা খলীফা জানতে পারেন। তাই ইবনুল হায়ছামকে তিনি তার দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এখানে ইবনুল হায়ছাম আবহাওয়া ও জ্যোতির্বিদ্যায় গভীর গবেষণা করেন। এ সময় নীলনদের বাৎসরিক প্লাবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য খলীফা ইবনুল হায়ছামকে আদেশ দেন। এবং তিনিও খলীফার ইচ্ছামাফিক কাজটি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইবনুল হায়ছাম কাজটি করতে অসমর্থ হওয়ায় খলীফা আল-হাকিম তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তখন প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে ইবনুল হায়ছাম পাগলামির ভান করেন এবং আল হাকিমের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এরকম পাগল সেজেছিলেন। এই সময়েই তিনি গোপনে অনন্যমানে গ্রীক ও ল্যাটিন থেকে প্রাচীন অংকশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি তর্জমা (অনুবাদ) করেন। এছাড়া কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। জীবনের শেষদিকে তিনি আলোক বিজ্ঞানে গভীর গবেষণা করেন এবং এ বিষয়ে বহু গ্রন্থও রচনা করেন।^{১৫}

২.৫ কর্মজীবন

ইবনুল হায়ছাম বুয়েদীয় ইরানে আবস্থান করার সময় তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং বহু ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তিনি খলীফা আল-হাকিম এর অধীনে রাজস্ব আদায়ের চাকুরী করেন। একসময়ে তিনি মুসলিম স্পেন^{১৬} ভ্রমণ করেন এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহু সময় ব্যয় করেন। তাঁর হাতের লেখা অতিশয় চমৎকার হওয়ায় চাকুরিচ্যুতির পর তিনি অন্যের পুস্তক নকল করেই জীবিকা অর্জন করতেন।^{১৭}

২.৬ ছাত্রবৃত্ত

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে দুজন ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি। একজন হলেন সোহরাব এবং অপরজন হলেন আবু আল-ওয়াফা মুবাশ্শির ইবন ফাতেক। মিসরীয় মুবাশ্শির তাঁর কাছে গণিত শিক্ষা লাভ করেন। সোহরাব ছিলেন সিরিয়ার একজন অভিজাত ব্যক্তি। সোহরাব তাঁর নিকটে শিক্ষা লাভ করতে চাইলে তিনি সম্মত হন। তবে তিনি ১০০ দিনার মাসিক বেতন দাবি করেন। বেতনের পরিমাণ বেশি হলেও সোহরাব রাজি হন। বছরের অধিক সময় ইবনুল হায়ছামের কাছে অধ্যয়ন শেষে সোহরাব তার কাছে বিদায় চাইলে হায়ছাম তাকে সামান্য অপেক্ষা করতে বলেন। বিদায় জানানোর আগে তার হাতে ৩৬০০ দিনার ফেরত দিয়ে বলেন,

“এ অর্থ তোমার। আমি তোমার আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য মাসিক বেতন দাবি করেছিলাম।” তিনি উপদেশ দেন, “মনে রেখো কোন ভালো কাজের জন্য কোন পুরস্কার কি দান গ্রহণ করা বা ঘৃণা নেওয়া উচিত নয়।”^{১৮}

২.৭ রচনাবলি

ইবনুল হায়ছাম চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে ৯৬টি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর লেখা। তাঁর অধিকাংশ বই হারিয়ে গেলেও ৫০টিরও বেশি কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাঁর বেঁচে যাওয়া বইগুলোর অধিকাংশ তথা ৪১টি গণিতের ওপর লেখা। জ্যামিতিতে ২৬টি গ্রন্থ, ২৩টি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ১৪টি আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক

গ্রন্থ। হায়ছামের সবগুলো গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়নি। তবে ল্যাটিন অনুবাদের মধ্য দিয়ে আলোকবিজ্ঞানের ওপর তার লেখা কয়েকটি গ্রন্থ টিকে আছে। মধ্যযুগে মহাজগতের ওপর লেখা কয়েকটি গ্রন্থ ল্যাটিন, হিব্রু ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়।^{১৯} তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের বর্ণনা নিম্নরূপ-

১. কিতাবুল মানাযির (كِتَابُ الْمَنَاطِرِ): দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ কিতাবুল মানাযির তাঁকে বিজ্ঞানজগতে অমর করে রেখেছে। কিতাবুল মানাযিরে তিনি যেভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতির ব্যবহার করেছেন তার পূর্বে কেউই তেমনটি করেননি। মধ্যযুগে কিতাবুল মানাযির আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার একমাত্র অবলম্বন ছিলো। রজার ব্যাকন, কেপলার লিউনার্ডো প্রমুখ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলোকবিজ্ঞান বিশারদরা তার দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন। রজার ব্যাকন তাঁর রচনাবলীর উপর ভিত্তি করেই দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। তবে গ্রন্থটির বর্তমানে ল্যাটিন তর্জমা (অনুবাদ) বিদ্যমান রয়েছে। এই ল্যাটিন তর্জমা (অনুবাদ) টি ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ইবনুল হায়ছামের প্রধান শিষ্য কামালউদ্দীন কিতাবুল মানাযিরের ভাষ্য তানকূলুল মানাযির (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِرِ) আলোকবিজ্ঞানের ক্লাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।^{২০}
২. রিসালাতু ফিশ্-শাফাক (رِسَالَةُ فِي الشَّفَقِ)/Courses of twilight: এ গ্রন্থে তিনি বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা নির্ণয় করেছেন। বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণের সঙ্গে গোখুলিলয়ের মনোরম দৃশ্যের আলোকপাত করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এতে তিনি সপ্রমাণ করেন যে, এই দৃশ্যের (গোখুলিকালের নৈসর্গিক দৃশ্য) উচ্চতা প্রায় দশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।
৩. মাক্বালাতু কী কাওস ফাযহে ওয়াল হালাত (مَقَالَةٌ فِي قَوْسِ فَحْ وَالْحَالَةِ)/Memoir on the Rainbow and the Halo: এ গ্রন্থে তিনি রংধনু, বস্তুর ছায়াপথ, চন্দ্র-সূর্যের দূরশোভা ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।
৪. মাক্বালাতু ফিল মিরায়াল মুহরিকা বিদ দাওয়াইরে (مَقَالَةٌ فِي الْمِرَايَا الْمُخْرِقَةِ بِالْذَوَائِرِ)/Memoirs on circular burning Glasses: এ গ্রন্থে তিনি আলোক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন।
৫. মাক্বালাতু ফী দুইল কামার (مَقَالَةٌ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ)/Memoir on the light of the moon: এ গ্রন্থে তিনি আলো সম্বন্ধে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অকাট্যযুক্তি প্রদর্শন করেছেন।
৬. মাক্বালাতু ফিল মিরায়াল মুহরিকা বিল-কুত্ব (مَقَالَةٌ فِي الْمِرَايَا الْمُخْرِقَةِ بِالْقُطُوعِ)/Memoir on Coni al burning mirrors: ডাই অপট্রা প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনায় আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রতিবিম্বের স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে।
৭. কাওলু ফী ইসতিখরাজ খাত্তা নিসফুন নাহার বেজুলে ওয়াহিদ (قَوْلٌ فِي اسْتِخْرَاجِ خَطِّ نِصْفِ النَّهَارِ بِظَلِّ وَاحِدٍ): এ গ্রন্থে সূর্যের ছায়া নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন।
৮. মাক্বালাতু মুখতাছার ফী সামতুল ক্বিবলা (مَقَالَةٌ الْمُخْتَصَرِ فِي سَمْتِ الْقِبْلَةِ): এ গ্রন্থে তিনি ক্বিবলা নির্ণয় করার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।
৯. মিজান আল-হিকমাহ (مِيزَانُ الْحِكْمَةِ)/Balance of wisdom: এ গ্রন্থে তরল পদার্থের গতি (Dynamics) ভারী ও হালকা তরল পদার্থে এ গতির পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।^{২১}
১০. ইত্তিফাকুল হাইওয়ানি নাতিকুছ ছাওয়াব (اتَّفَاقُ الْحَيَوَانَ النَّاتِقِ الثَّوَابِ): এ গ্রন্থে তিনি Socio-political বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বাতন্ত্র্য। এতে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, মানুষের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি কার্যকলাপে ভিন্নতা থাকলেও সবাই চায় মানুষের সর্বাত্মক ভালো হোক।

১১. কিতাবু ফিস-সিয়াসাত (كِتَابُ فِي السِّيَاسَةِ): এ গ্রন্থে তিনি রাজনীতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।
১২. মাক্বালাতু ফী আদাবিল কিতাব (مَقَالَةُ فِي آدَبِ الْكِتَابِ): ইবনুল হায়ছাম ছিলেন একজন সুদক্ষ হস্তলিপিবিদ। এই হস্তলিপি সম্বন্ধে তিনি এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি পূর্বতীকালের ও তার সমসাময়িক পণ্ডিতদের মতামতও উল্লেখ করেছেন।^{২২}
১৩. নাফসী হাইওয়ানিয়াহ (نَفْسُ حَيَوَانِيَّة): এ গ্রন্থে তিনি জীব-জন্তুর (পশু-পাখির আত্মার ওপর সঙ্গীতের প্রভাব) ওপর গানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।^{২৩} ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পণ্ডিত বিশ্বাস করতেন, মানুষ ছাড়া অন্য কারো সাথে সঙ্গীতের কোনো সম্পর্ক নেই। তখন থেকে পরিচালিত গবেষণাগুলো ইবনুল হায়ছামের অভিমত সমর্থন করে বলছে, পশু-পাখির ওপর সঙ্গীতের প্রভাব রয়েছে।^{২৪}
১৪. তশরীফুল ইনসান ইলাল মাউত (تَشْرِيفُ الْإِنْسَانِ إِلَى الْمَوْتِ): এ গ্রন্থে তিনি মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
১৫. কিতাবু ইলমুল খিয়াল (كِتَابُ عِلْمِ الْخَيَالِ): এ গ্রন্থে তিনি বলবিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এছাড়া যন্ত্রপাতি যেমন লিভার (Lever) এর ব্যবহার পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং নীলনদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।
১৬. মাক্বালাতু ফী মারাকিয়ুল আছক্বাল (مَقَالَةُ فِي مَرَكَزِ الْأَثْقَالِ): তিনি এ গ্রন্থে প্রযুক্তি (Technology) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।^{২৫}
১৭. মাক্বালাতু ফিল মাকান (مَقَالَةُ فِي الْمَكَانِ): এ গ্রন্থে তিনি 'স্থান'-এর প্রকৃতি এবং তার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন।^{২৬}
১৮. মাক্বালাতু ফিল কারাসতুন ইয়া কাবান (مَقَالَةُ فِي الْقَرَسْطُونِ بِأَقْبَرِ): এ গ্রন্থে তিনি আর্কিমিডিসের বিখ্যাত তত্ত্ব 'পানিতে ডুবন্ত দ্রব্য সমান ওজনের পানি অপসারণ করে'-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।^{২৭}
১৯. মাক্বালাতু ফী হাইয়াতিল ইলম (مَقَالَةُ فِي هَيْئَةِ الْعِلْمِ): এ গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।^{২৮}
২০. মাক্বালাতু ফির-রাদে আলা আবী হাশিম (مَقَالَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ): তিনি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের সাথে তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মু'তাযিলা নেতা আবু হাশিমের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করে তিনি এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।^{২৯}

এছাড়াও পাশ্চাত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর বহু গ্রন্থ ল্যাটিন, হিব্রু, স্প্যানিশ, ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিশ্বের খ্যাতনামা মিউজিয়াম ও লাইব্রেরীসমূহে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থের অর্ধশতাধিক পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।^{৩০}

২.৮ তাঁর সম্মান

ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল অর্গানাইজেশন (আই.এ.ইউ) ১৯৩৫ সালে ইবনুল হায়ছামকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ভিত্তিতে তাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে হায়ছামের নামে। ১৫.৯ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ৭১.৮ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৩২.০৫ কিলোমিটার। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি আবিষ্কৃত একটি তারকার নাম রাখা হয় '৫৯৩২৯ আল-হাজেন'। ইবনুল হায়ছামের সম্মানে পাকিস্তানে আগা খান বিশ্ববিদ্যালয়ের অপথালমোলজি (চক্ষু-বিজ্ঞান) বিভাগের চেয়ারম্যানের নামকরণ করা হয়েছে "দি ইবন আল-হায়ছাম এসোসিয়েট প্রফেসর এন্ড চিফ অব অপথালমোলজি"। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের ১০ হাজার দিনারের ব্যাংক নোটে আল-হায়ছামের ছবি মুদ্রণ করা হয়। এর পূর্বে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সে দেশে ১০

দিনারের নোটে তাঁর ছবি মুদ্রিত হয়েছিল। ইরাকের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছিলো তাঁর নামে। সন্দেহ করা হতো যে, এ গবেষণাগারে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরি করেছিলেন।^{৩১}

২.৯ ইস্তিকাল

ইবনুল হায়ছাম মিসরের কায়রোতে ৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্তিকাল করেন।^{৩২} কথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফেরান এবং আল-কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন।^{৩৩}

৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইবনুল হায়ছামের অবদান

মুসলিম সভ্যতার ক্রমবিকাশে মুসলিম মনীষীদের অবদান অবিস্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে গবেষণা ও সৃজনশীল কাজে তাদের একাত্মতা প্রমাণিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সভ্যতার বিকাশকে করেছে আরও গতিশীল। রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস সর্বত্র ছিল তাদের অগ্রণী পদচারণা। বহু মুসলিম বিজ্ঞানী দিগন্ত উন্মোচনকারী আবিষ্কার করে গোটা বিশ্বের চেহারাই বদলে দিয়েছেন। সেসব আবিষ্কার ও গবেষণার আধুনিকীকরণ ঘটেছে, তার সুফল ভোগ করছে আজকে বিশ্ববাসী। দুনিয়ায় সাড়া জাগানো মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম হলেন ইবনুল হায়ছাম। তিনি একাধারে চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, জ্যামিতি, দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখেছেন। নিম্নে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ আলোকপাত করা হলো-

৩.১. ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান

ইবনুল হায়ছাম ছিলেন পদার্থবিদ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তিনি অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে এক যুগপৎ অবদান রেখেছেন। Physics (পদার্থবিজ্ঞান) ও Mathematics (গণিতশাস্ত্র) সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, তিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইবনুল হায়ছাম চোখের এনাটমি পর্যবেক্ষণ করে এর বিভিন্ন অংশের সঠিক ও স্বচ্ছভাবে ধারণা দিয়েছেন। তিনি চোখের Sclera, Cornea, Choroid, iris, retina, optic nerve, aqueous humor এবং vitreous humor প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।^{৩৪} বর্তমানে ইংরেজি লেন্স (lens) শব্দটি এসেছে ইবনুল হায়ছামের চোখের পরকলার জন্য ব্যবহৃত আরবী আদাসা (عدسة) শব্দ থেকে। আরবী আদাসা (عدسة) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মসুরের ডাল। চোখের লেন্স (Lens) মসুরের ডালের মতো biconvex, ল্যাটিন অনুবাদকরা আরবী আদাসা শব্দকে লেন্টিকুলাম- (lenticulum) বলে অনুবাদ করেন। লেন্টিকুলাম শব্দটি শেষ পর্যন্ত লেন্সে পরিবর্তিত হয়। চোখের পরকলাই লেন্স নামে পরিচিত।^{৩৫} ইবনুল হায়ছামের তাত্ত্বিক মতবাদ প্রযুক্তির মাধ্যমে চশমা আবিষ্কারে সাহায্য করে বলে তাকে চশমা আবিষ্কারের আদি পুরুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। C. Elgood-এর মতে,

In certain experiments he approaches the theoretical discovery of magnifying glasses which was actually made in Italy three centuries later.

“নির্দিষ্ট গবেষণা (পরীক্ষা) অনুসারে, তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাসসমূহের তাত্ত্বিক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন, যা প্রকৃতপক্ষে তিন শতাব্দী পরে ইতালিতে তৈরি হয়েছিলো।”^{৩৬}

এজন্যই তাঁকে চশমা এবং ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কারের অগ্রদূত বলা হয়। C. Elgood বলেন,

So far did he (Alhazen) carry his theory of vision that he was within an ace of the discovery of the spectacles ... with al-Hazen began modern physiological optics.

“আল-হাজেন দৃষ্টিশক্তি তত্ত্বের (Theory of vision) প্রবক্তা ছিলেন এবং তিনি চশমা আবিষ্কারের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন ... আল-হাজেনের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিলো আধুনিক শারীরবৃত্তীয় অপটিক্সের (Physiological optics) যাত্রা।”^{৩৭}

ইবনুল হায়ছামই সর্বপ্রথম দৃষ্টিশক্তি ও তার প্রতিফলন ও প্রতিসরণ বিষয়ে গ্রীকদের ভুল ধারণার নিরসন করেন, এবং হাতে কলমে পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করেন যে, আমাদের চোখে আলোকরশ্মি বাহ্য পদার্থ

থেকেই প্রতিফলিত হয়, চক্ষু থেকে আলো বের হয়ে বাহ্য বস্তুকে দৃষ্টি গোচর করায় না। আমাদের অক্ষিপটের (Retina) অর্থাৎ চক্ষুগোলকের পিছনে যে ঝিল্লী আছে, তার অবস্থান দৃষ্টি স্থানের ঠিক কোন জায়গায়, তিনি সঠিকভাবে তা নির্ধারণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে এখানে যে বাহ্য বস্তুর প্রতিফলন হয়, তাই আমাদের দৃষ্টিশিয়ার ভিতর দিয়ে মগজে পৌঁছায়।

তিনি বায়ু ও পানির মতো স্বচ্ছ ও তরল পদার্থের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিশিয়ার ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত আলোকের বিষয় নিয়ে গভীর গবেষণা করেন।^{৩৮}

৩.১. খ. চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক রচিত গ্রন্থ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে রচিত ইবনুল হায়ছামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- (চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ) কিতাবুল মানাযির (كتاب المناظر)/(Book of optics). এটি বিশ্বের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। ইহুদী বৈজ্ঞানিক যোসেফ ইবন জুদাহ ইবন আর্কানন কিতাবুল মানাযিরকে ইউক্লিড টলেমির গ্রন্থের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলে ইউরোপের নব জাগরণের যুগে পুস্তকটি ব্যাপক প্রচার-প্রসার পায় ও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। পাশ্চাত্যের মনীষী বৈজ্ঞানিকগণ মুক্ত কণ্ঠে পুস্তকটির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন।

১২৭০ সালে পোলিশ পদার্থ বিজ্ঞানী উইটেলো ল্যাটিন ভাষায় হায়ছামের বুক অব অপটিক্স অনুবাদ করেন। বইটি সাতটি খণ্ডে রচিত। ল্যাটিন ভাষায় তার মূল কর্ম কিতাব আল-মানযির (Book of optics) পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ দার্শনিক রজার ব্যাকন এবং জার্মান গণিতজ্ঞ জোহানেস কেপলারের ওপর তার প্রভাব অপরিসীম।

রজার ব্যাকন ‘পারস্পেকটিভ’ শিরোনামে কিতাব আল-মানজিরের একটি সারসংক্ষেপ রচনা করেন। বইটিতে তিনি আল-হায়ছামের নাম উল্লেখ করেছেন। বুক অব অপটিক্স (Book of optics)-এর সার সংক্ষেপ গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়া হয়। কিতাব আল-মানযির গবেষণামূলক পদ্ধতিতে বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বুক অব অপটিক্স আধুনিক আলোক বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রায়োগিক পদার্থবিদ্যা এবং প্রায়োগিক মনস্তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পদার্থবিদ্যায় বইটি আইজাক নিউটনের “ফিলোসফি ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিশিয়ার” সমকক্ষ। পরবর্তীকালে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত ইবনুল হায়ছামের বই রবার্ট গ্রোস্টেস্ট, রজার ব্যাকন, জন পেকহ্যাম, উইটেলো, ওকহামের উইলিয়াম, ইতালীয় চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ফ্রাঁসোয়া ব্যাকন, রেনি ডেসকার্টেস, জোহানেস কেপলার, গ্যালিলিও এবং আইজাক নিউটনের মতো ইউরোপের বহু বিজ্ঞানীর কর্মকে প্রভাবিত করেছে। বুক অব অপটিক্স চশমা, ক্যামেরা, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপি, রেটিনার অস্ত্রোপচার এবং রোবটিক দৃষ্টিশক্তির মতো পশ্চিমা প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। বইটি ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্যান্য দিকও প্রভাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয়ক্ষেত্রে প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনের অগ্রদূত জন ওয়াইক্লিফ দ্য এসপেকটিবাস- এ বিশ্লেষিত সাত প্রকার আয়নায় সাতটি ভয়াবহ বিকৃতি নিয়ে আলোচনাকালে ইবনুল হায়ছামের নাম উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যে ‘গিলাউম দ্য লরিসের “রোমান দ্য লা রোজ” এ ইবনুল হায়ছামের বুক অব অপটিক্সের প্রশংসা করা হয়। শিল্পে বুক অব অপটিক্স রৈখিক চিত্রাঙ্কন কৌশল এবং রেনেসাঁ আর্টে চশমা ব্যবহারের ভিত্তি স্থাপন করেছে। সমুদ্র অভিযানের যুগে ইউরোপের ভৌগোলিক মানচিত্রে রৈখিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। নয়া বিশ্ব আবিস্কারে বের হওয়ার সময় ক্রিস্টোফার কলম্বাস এরকম একটি মানচিত্র ব্যবহার করেছিলেন।

১৫৭২ সালে জার্মান গণিতজ্ঞ ফ্রেডারি রাইসনার বাসিলে “অপটিকা দ্য সাউরাস: আল-হাজেন আরাবিস লাইব্রি সেপটেম, নানক্রিপাম ইডিটি: আইসডেম লাইবার দ্য ক্রেপাসকিউলিস ইট নুবিয়াম এসেনসিয়নিবাস” শিরোনামে বইটি মুদ্রণ করেন। তিনি মুদ্রিত কপিতে ইবনুল হায়ছামের নাম দেন আল-হাজেন। তার আগে আল হায়ছাম পাশ্চাত্যে ‘আল-হাচেন’ নামে পরিচিত ছিলেন। আল হাচেন হলো ল্যাটিন ভাষায় আল-হায়ছাম নামের সঠিক অনুবাদ। ১৮৩৪ সালে ই.এ সেডিলট প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জ্যামিতির ওপর আল হায়ছামের পাণ্ডুলিপিগুলো উদ্ধার করেন। অন্য পাণ্ডুলিপিগুলো অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান লাইব্রেরি এবং লাইডেনের আরেকটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।^{৩৯}

৩.২ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান

জ্যোতির্বিজ্ঞান হলো পৃথিবীর বাইরের জ্যোতির্বিজ্ঞানিক বস্তুসমূহ (Astronomical/Celestial objects)। যেমন- গ্রহ (Planets), নক্ষত্র (Stars), ধূমকেতু (Comets), নীহারিকা (Nebula), নক্ষত্রপুঞ্জ (Star clusters), ছায়াপথ (Galaxy) প্রভৃতি এবং বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ঘটনা (Astronomical) সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আর জ্যোতিষশাস্ত্র হলো কিছু পদ্ধতি, প্রথা এবং বিশ্বাসের সমষ্টি যাতে মহাকাশে জ্যোতিষ্কসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদির মাধ্যমে মানব জীবন, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং মানবীয় ও বহির্জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীদের মাঝে এই দুই শাস্ত্রের সমান্তরাল চর্চা দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানের অনগ্রসরতা, গৌড়ামি এবং সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানবিমুখতা গ্রহ-নক্ষত্রের পাঠকে ঠিক মতো বৈজ্ঞানিক ধারায় চালিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি। মুসলমানদের মাঝেও এই দুই শাস্ত্রের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তারা এই চর্চাকে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেননি এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে একে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, যা এক কথায় অভূতপূর্ব। এক্ষেত্রে ইবনুল হায়ছাম অগ্রগণ্য। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল মানাযির (كتاب المناظر) এর ১৫ থেকে ১৬ নম্বর অধ্যায়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে সুদূর প্রসারী আলোচনা করেছেন। যা এর পূর্বে কেউ করেনি। ইবনুল হায়ছামই প্রথম প্রমাণ করেছেন, মহাকাশ কঠিন পদার্থে গঠিত নয়। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন, মহাকাশ বাতাসের চেয়ে কম ঘন। পরবর্তীকালে পোলিশ পদার্থবিজ্ঞানী ইউটেলো তার এ মতাবাদের পুনরাবৃত্তি করেন। ইবনুল হায়ছাম কোপার্নিকাস এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে সৌরজগতের ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।^{৪০}

ইবনুল হায়ছাম এস্ট্রোফিজিক্স (Astrophysics)^{৪১} নিয়েও আলোচনা করেছেন। এই এস্ট্রোফিজিক্স জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শাখা। গ্রীক ভাষায় (Astro) শব্দের অর্থ হলো তারকা এবং Physics শব্দের অর্থ হলো পদার্থ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গঠন নিয়ে আলোচনা করাই এস্ট্রোফিজিক্স (Astrophysics)-এর লক্ষ্য। মুসলিম বিজ্ঞানী বিশেষ করে ইবনুল হায়ছামের হাতে এ বিজ্ঞান পরিপুষ্ট লাভ করে। তিনি এস্ট্রোফিজিক্স এবং পদার্থ বিজ্ঞানের মহাজাগতিক কলাকৌশলে তার এপিটোম অব এস্ট্রোনমি (Epitome of Astronomy) প্রয়োগ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, ল'স অব ফিজিক্সের (Laws of Physics)-এর জন্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দায়ী। তিনি তার মাকালাতু ফী দুইল কামার (مقالة في ضوء القمر) নামক গ্রন্থে গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে পদার্থ বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও এস্ট্রোফিজিক্সে গবেষণামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। সে সময় বিশ্বাস করা হতো, একটি কাঁচের মতো চাঁদ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তিনি এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করেন এবং সঠিকভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চন্দ্র পৃষ্ঠের যে অংশে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়, কেবলমাত্র সেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। চাঁদের আলোকিত পৃষ্ঠের সব অংশ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়, আর একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি সাধারণ গবেষণামূলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন।

১০২৫-১০২৯ সালের মধ্যে তিনি আশ্-শুকুক আলা বাতলিমূস (الشكوك على بطليموس) (Doubts on Ptolemy) নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে আলমাজিস্ট, প্ল্যানেটারি হাইপোথিসিস এবং অপটিক্সসহ টলেমির বেশ কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। টলেমির এসব গ্রন্থে তিনি বহু পরস্পরবিরোধিতা খুঁজে পান এবং সেগুলো উল্লেখ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমি যেসব গাণিতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন সেসব যন্ত্রপাতি একই ধরনের বৃত্তাকার গতির বাহ্যিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে ইবনুল হায়ছাম মনে করতেন। তিনি টলেমির এস্ট্রোনমিক্যাল সিস্টেমের (Astronomical System)-এর বাস্তব প্রয়োজনের কঠোর সমালোচনা করেন এবং অনুমানসিদ্ধ গাণিতিক বিন্দু, রেখা ও বৃত্তের সাথে প্রকৃত ফিজিক্যাল গতির তুলনাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন। ইবনুল হায়ছাম টলেমির অন্যান্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক যুক্তিরও সমালোচনা করেন। তবে অন্যান্য বিজ্ঞানীর মতো টলেমির মডেলকে এরিস্টোটলের প্রাকৃতিক দর্শনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত না করলেও তিনি তার গ্রন্থাবলীর পরস্পর বিরোধিতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন বেশি।^{৪২}

মাক্কুলাতু ফী হাইয়াতিল ইলম (مَقَالَةُ فِي هَيَاةِ الْعِلْمِ) নামক গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এতে তিনি পূর্বোক্ত গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের ভ্রান্ত মতবাদ সমর্থন করেন। ফলে এ দিক দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনেকদিন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।^{৪৩}

৩.৩ দৃষ্টিশক্তি তত্ত্ব অবদান

প্রাচীনকালে দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে দুটি প্রধান তত্ত্ব প্রচলিত ছিলো।

প্রথম তত্ত্ব: নিষ্ক্ষেপ বা প্রেরণ তত্ত্ব (Emission theory) নামে পরিচিত। ইউক্লিড ও টলেমির মতো বিজ্ঞানীগণ প্রথম তত্ত্ব সমর্থন করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, চোখ থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি কাজ করে।^{৪৪}

দ্বিতীয় তত্ত্ব: প্রবিষ্টকরণ তত্ত্ব (Intromission theory) নামে পরিচিত। এরিস্টোটল ও তার অনুসারীরা এ খিওরি সমর্থন করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি চোখে প্রবেশ করে। ইবনুল হায়ছাম যুক্তি দেন যে, চোখ কিংবা বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। কারান্তরালে অবস্থান করার সময় তিনি এ সত্য আবিষ্কার করেন। একাদশ শতাব্দীতে মিসরীয়রা এরিস্টোটলের খিওরি সত্য বলে মনে করত। হায়ছাম অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শুয়ে শুয়ে এরিস্টোটলের খিওরি সত্যতা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, এরিস্টোটলের কথা সত্য হলে প্রকোষ্ঠের জিনিসগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে না কেন? তিনি নিজের কাছে আরো জানতে চান, এরিস্টোটলের মতো বিজ্ঞানী কি ভুল করতে পারেন? এ জিজ্ঞাসা থেকে তিনি মোমবাতি ও কপার নিয়ে শুরু করেন গবেষণা। কারা প্রকোষ্ঠে এ যুগান্তরকারী গবেষণা তাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তিনি এরিস্টোটলের খিওরি ভুল বলে প্রমাণ করেন। তিনি দেখতে পান যে, চোখ থেকে কোনো আলোকরশ্মি বের হতে পারেনা। আমরা চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমাদের দৃষ্টিশক্তি দূরবর্তী তারকায় পৌঁছে যায়। তিনি আরো বলেছেন, অতি উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকালে আমাদের চোখ ঝলসে যেতে পারে কিংবা চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। আল হায়ছাম দর্শনের ব্যাখ্যা দানে একটি সফল খিওরি আবিষ্কার করেন যাতে বলা হয়, কোনো বস্তুর সব পিঠ থেকে আমাদের চোখে আলোক রশ্মি ছুটে আসে। তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে তার খিওরি প্রমাণ করেন। তার ফিলোসফিক্যাল ফিজিক্সের সঙ্গে জামিতিক আলোক বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ আধুনিক ফিজিক্যাল অপটিক্সের ভিত্তি স্থাপন করেছে। হায়ছাম তার বুক অব অপটিক্সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন, আলোক রশ্মি সরলরেখায় গমন করে। তিনি লেন্স, কাঁচ, প্রতিসরণ ও প্রতিফলন নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনিই প্রথম লম্বালম্বি ও আড়াতাড়ি বস্তুতে প্রতিসারিত ও প্রতিফলিত আলোক রশ্মি সংকোচনে সক্ষম হন। জ্যামিতিক অপটিক্সে তার এ সাফল্য ছিলো একটি মৌলিক অবদান। তার এ মডেলের ফলাফল ল অব রিফ্রাকশন (Law of Refraction)-এর অনুরূপ মডেলের ফলাফল ছাড়িয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তিনি এ ফলাফল লাভে তার মডেলের যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটাতে পারেননি।

বাতাসের সঙ্গে আলো ও রংয়ের সংমিশ্রণ ঘটে না, এ ধারণা প্রমাণে ইবন হায়ছাম ক্যামেরা অবসকিউরা (একদিকে ছিদ্রবিশিষ্ট বাক্স আকৃতির ক্যামেরা) উদ্ভাবন করেন। এবং পাশাপাশি পিনহোল ক্যামেরার (লেন্সবিহীন ক্যামেরা) স্পষ্ট ও সঠিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে তার আগে এরিস্টোটল, গ্রীক পণ্ডিত থিওয়েন অব আলেক্সান্দ্রিয়া, আল-কিন্দি ও চীনা দার্শনিক মোজি পিনহোলের মধ্য দিয়ে আলো কণা গমনের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই একথা প্রমাণ করতে পারেননি যে, পর্দায় প্রতিফলিত আলো ছিদ্রের বিপরীত দিকের একটি ছবি। ইবনুল হায়ছাম প্রথম বাতি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান যে, ছিদ্র দিয়ে বিভিন্ন উৎসের আলো প্রবেশ করে একটি বিরাট জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই প্রথম ক্যামেরা অবসকিউরার সাহায্যে ভিতরের একটি পর্দায় বাইরে থেকে প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ ছবি প্রদর্শনে সফল হন।

ফিজিক্যাল অপটিক্স ছাড়াও ‘দ্য বুক অব অপটিক্স’ ফিজিওলজিক্যাল অপটিক্সে গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে। ইবনুল হায়ছাম চিকিৎসা, অপথালমোলজি, এনাটমি ও ফিজিওলজির বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। তিনি দর্শন প্রক্রিয়া, চোখের গঠন, চোখের ছবির প্রতিফলন এবং ভিউচুয়াল সিস্টেমের বর্ণনা দেন। তিনি ‘হেরিংয়ের ল’ অব ইকুয়েল ইনারভেশন, লম্বালম্বি বাইনোকুলার ভিশন ও বাইনোকুলার

ডেসপারিটির বর্ণনাও দিয়েছেন এবং বাইনোকুলার ভিশন, মোশন পারসেপশন ও বাইনোকুলার ভিশন এর উন্নতি করেন।

একটি অপটিক্যাল সিস্টেম (optical system) অথবা অপটিক্যাল যন্ত্র হিসেবে চোখের ফাঙ্কশনাল এনাটমির বর্ণনা হলো তার সবচেয়ে মৌলিক এনাটমিক্যাল অবদান। চোখ ও অবসকিউরা ক্যামেরার মধ্যে তিনি যে পার্থক্য নির্ণয় করেন তা তাকে এনাটমি ও অপটিক্সের সংশ্লেষণ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। সংশ্লেষণ হলো ফিজিওলজিক্যাল অপটিক্সের ভিত্তি। পিনহোল ক্যামেরার সহায়তায় ছিত্রের মধ্য দিয়ে আলোক প্রক্ষেপণে অপরিহার্য নীতিমালা আঁচ করতে পারায় হায়ছাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, চোখের ভেতর ছবি উল্টো হয়ে প্রতিফলিত হয়। হায়ছাম চোখের তারার সঙ্গে একটি ছিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পান। ছবি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি ভুলক্রমে ইব্ন সিনার সঙ্গে একমত হয়ে ধারণা করেছিলেন, লেন্স হলো ছবি ধারণাকারী একটি অঙ্গ। তবে এ প্রক্রিয়ায় তিনি রেটিনার সংশ্লিষ্টতার সঠিক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ক্যামেরা অবসকিউরা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিন্দুর মধ্য দিয়ে আলো প্রক্ষেপণে পূর্ববর্তী তত্ত্বের উন্নয়নে ইবনুল হায়ছাম পর্যাপ্ত তথ্য ও যুক্তি লাভ করেন।^{৪৫}

৩.৪ গণিতে অবদান

গণিত শাস্ত্রে ইবনুল হায়ছামের অবদান তাকে বিজ্ঞান জগতে বিশিষ্টতা দান করেছে। পদার্থবিদ্যার সাথে উচ্চমানের গণিতের এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে, তাই তিনি উভয়টি একসাথে আলোচনা করে পূর্ণতা দিয়েছেন। ত্রিকোণমিতিকে তিনি বেশ উপাদেয় অবদান রেখেছেন। কিবলা নির্ণয় করার বিষয়ে তার অন্যতম গ্রন্থ মাকালাতু মুখতাসারু ফী সামতুল কিবলা(مَقَالَةُ مُخْتَصَرٌ فِي سَمْتِ الْقِبْلَةِ) সম্পর্কে একটি থিওরেম উদ্ভাবন করেন।

$$\cot \alpha = \frac{\sin \alpha_1 \cos (\lambda_2 - \lambda_1) - \cos \phi_1 \tan \phi_2}{\sin (\lambda_2 - \lambda_1)}$$

তেমনি কাওল ফী ইসতেখরাজ খাতা নিসফুন নাহার বেজুলুওয়াহিদ (قَوْلٌ فِي اسْتِخْرَاجِ حُطِّ نِصْفِ النَّهَارِ بِطَلِّ) গ্রন্থে একটি ছায়া থেকে মধ্যরেখা নির্ণয় করা, দৃষ্ট ছায়া থেকে সূর্যের উচ্চতা বের করে নিতে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তা ত্রিকোণমিতির সমাধানে বের করেছেন এভাবে—

$$\cos A = \frac{\sin h \sin \phi \sin \xi}{\cos h \cos \phi^{86}}$$

ইবনুল হায়ছাম মূলত ইউক্লিড এবং ছাবিত ইব্ন কোররাহ এর গাণিতিক রচনাবলীর ভিত্তিতে কাজ করেছেন। এলজেব্রা ও জ্যামিরি মাঝে সম্পর্কের সূত্রপাতের উপরও গবেষণা করেন। তিনি কোণ ছেদনকারী বক্ররেখা এবং সংখ্যা তত্ত্ব সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এনালিটিক্যাল জ্যামিতির ওপর কয়েকটি প্রাথমিক গবেষণা চালান। গণিতে তার গবেষণা রেনিডেসকার্টেসের জ্যামিতিক বিশ্লেষণ এবং আইজাক নিউটনের ক্যালকুলাসের উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে। এছাড়া গণিতশাস্ত্রে তার অন্যতম অবদান হচ্ছে গণিতকে ব্যবহার করে ভৌতবিজ্ঞানের আলোচনা।^{৪৭}

ইবনুল হায়ছামের ত্রিকোণমিতির পাশাপাশি বীজগণিত নিয়েও গবেষণা করেছেন। বীজগণিতে তার অসামান্য অবদান প্রমাণিত হয় পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের গ্রন্থে বীজগণিত সম্পর্কে তার উদ্ধৃতির উল্লেখ থেকেই প্রখ্যাত গণিতবিদ ওমর খৈয়াম তার গ্রন্থে ইবনুল হায়ছামের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। বীজগণিতে ইবনুল হায়ছামের রচিত তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো:

এক. কিতাবু ফী তাহলীলুল মাসায়েলিল আদাদিয়াত বেজেহাতিল জাবর ওয়াল মুকাবিলাহ বুরহানা (كِتَابٌ فِي تَحْلِيلِ الْمَسَائِلِ الْعَدَدِيَّةِ بِحَقِّهِ الْجَبْرِ وَالْمَقَابِلَةِ بَرَهَانًا) সমীকরণের সাহায্যে নানা আঙ্কিক ও বীজগাণিতিক সমাধান।

দুই. কিতাবু জামায়াতে ফিহিল কাওলে আলা তাহলীলিল মাসায়েলিল হিন্দসায়াতি ওয়াল আদাদিয়াতি জামিয়ান লাকিনা আল-কাওলা আলল মাসায়েলিল আদাদিয়াত গায়রে মাবাররিহীনা বাল হয়্যা

كِتَابُ جَمَعَتْ فِيهِ الْقَوْلَ عَلَى الْمَسَائِلِ الْهَنْدَسِيَّةِ (মাওদু'উ আলা উসূলিল জাবর ওয়াল-মাকাবিলাহ) والعديدية جميعًا لكن القول على تَحْلِيلِ المسائل العددية غير مبرهن بل هو موضوع على أصول الجبر (এছকার বলেছেন যে) তিনি এ গ্রন্থে জ্যামিতিক ও আঙ্কিক উভয় প্রকার সমস্যাকেই বীজগণিতের মাধ্যমে সমাধান করেছেন। ইবনুল হায়ছাম বীজগণিতে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতেন সেগুলি তার অন্যতম ছাত্র ইসহাক ইব্ন ইউনুস নোট করতেন। ইসহাক এমনিভাবে ৫টি নোট তৈরি করেন। এ সবই ছিল বীজগণিতের নানা সমস্যার সমাধান বিষয়ক। এমনি একখানা নোট তৃতীয় গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। গ্রন্থটি নিম্নরূপ-

তিন. তালীক আলকাহ ইসহাক বিন ইউনুস আলমোততাকি বি মিসর আন ইবনুল হায়ছাম ফী تعلق علقه إسحاق بن يونس المتطبيب بمصر عن ابن الهيثم (ফি كتاب ديوفينطس في مسائل الجبر) ডাওফেন্টের বীজগাণিতিক সমস্যা সম্বন্ধীয় ইবনুল হায়ছামের ভাষ্য মিসরের চিকিৎসক ইসহাক ইব্ন ইউসুফের নোট থেকে।^{৪৮}

৩.৫ জ্যামিতিতে অবদান

ইবনুল হায়ছাম জ্যামিতিতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। তিনি এনালিটিক্যাল জ্যামিতির উন্নয়ন ঘটিয়েছেন এবং জ্যামিতি ও বীজগণিতের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনিই প্রথম স্বাভাবিক ১০০ সংখ্যা যোগ করার একটি ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি ইউক্লিডের ইলিমেন্টস (*Euclid's Elements*) নিয়ে গবেষণা করে জ্যামিতির মাঝে গতির ধারণা প্রচলন করেন। এছাড়া তাঁর আবিষ্কৃত চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের উপপাদ্য এবং ল্যামবার্ট চতুর্ভুজ ছিল ডিম্বাকৃতি জ্যামিতির প্রথম উপপাদ্য। জ্যামিতিতে তাঁর গবেষণা পরবর্তীকালে পাসী জ্যামিতত্ত্ব ওমর খৈয়াম, নাসিরউদ্দীন আত-তুশী এবং ইউরোপীয় জ্যামিতত্ত্ব উইটেলো, ফরাসি দা নিক গাবসোনাইডেস, আলফানসো, জন ওয়ালিস, ইতালীয় জেসুইট যাজক গিওভানি গিরলামো সাচারি ও জার্মান জেসুইট গণিতত্ত্ব ক্রিস্টোফার ক্লাভিয়াসের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এলিমেন্টারী জ্যামিতিতে ইবনুল হায়ছাম অর্ধচন্দ্রাকৃতির আয়তন ব্যবহার করে বৃত্তের বর্গ বের করার প্রচেষ্টা চালান। পরে তিনি এ অসম্ভব কাজ পরিত্যাগ করেন। ইবনুল হায়ছামের এলিমেন্টারী ও এডভান্সড জ্যামিতির অন্যান্য সমস্যাও সমাধান করেন।

জ্যামিতিতে ইবনুল হায়ছামের অবদান সম্পর্কে *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

Ibn Al-Haytham's mathematical research was particularly in the fields of geometry and not of algebra. The contribution's of Ibn al-Haytham in geometry can be divided into several groups, the most important of which are in infinitesimal mathematic's and the theory of Conic sections and their applications. He composed twelve treatises on infinitesimal mathematics and then on conic theory Of the twelve papers on infinitesimal mathematics, only seven have survived.^{৪৯}

“ইবনুল হায়ছামের গাণিতিক গবেষণা বিশেষত জ্যামিতির ক্ষেত্রে ছিল, বীজগণিতে নয়। জ্যামিতিতে ইবনুল হায়ছামের অবদানসমূহ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো ইনফিনিটেসিম্যাল গণিত এবং কৌণিক অংশ ও তার প্রায়োগিক তত্ত্ব। তিনি ইনফিনিটেসিম্যাল গণিত এবং কৌণিক তত্ত্বের ওপর ১২টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে ৭টি বর্তমানে টিকে আছে।”

৩.৬ আলোকবিজ্ঞানে অবদান

আলোকবিজ্ঞান হলো পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা, যা আলোর আচরণ, বৈশিষ্ট্যাবলী এবং বস্তুর সাথে আলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা করে।^{৫০} আর এই আলোকবিজ্ঞানের জনক বলা হয় ইবনুল হায়ছামকে। আলোকবিজ্ঞানের ওপর তার কর্ম বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণায় নয়া দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। আলোকবিজ্ঞানে তার অবদান ছিল যুগশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগত ও বাস্তবে আলোকবিজ্ঞানে তার গবেষণা একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ইবনুল হায়ছাম আলোকবিজ্ঞানের গবেষণায় কাঁচ ব্যবহার করেছেন।

এতে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এঙ্গেল অব ইনসিডেন্স (Angle of Incidence) এবং প্রসিরণ স্থির থাকে না। একটি লেন্সের ম্যাগনিফাইং ক্ষমতাও তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। কাঁচের ওপর প্রতিফলিত আলো ও ছায়া নিয়ে গবেষণায় তিনি সমস্যার সম্মুখীন হন। তার এ সমস্যা আল-হাজেস প্রবলেম (Al-Hazan's Problem)^{৫১} নামে পরিচিত। ইবনুল হায়ছাম আবিষ্কার করেন যে, আলোর আপতন ও প্রতিসরণ পথ এবং দুই মাধ্যমের অন্তর্বর্তী সমতলের ওপর অঙ্কিত সরল রেখা একই সমতল ক্ষেত্রের ওপর অবস্থিত। পদার্থ বিজ্ঞানের সকল শাখায় তার অবাধ বিচরণ ছিল। তবে আলোর বিষয়ে (আলোকে বিজ্ঞানে) অবদানই তাঁকে বিজ্ঞান জগতে অমর করে রেখেছে। তিনি আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধে ইউক্লিড ও টলেমির প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং তার স্বপক্ষে প্রমাণও উপস্থান করেন।^{৫২}

ইবনুল হায়ছামের আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ হলো কিতাবুল মানাযির (كتاب المناظر)। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগে আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার একমাত্র অবলম্বন ছিল। রজার ব্যাকন তাঁর রচনাবলীর ওপর ভিত্তি করেই দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছে। রজার ব্যাকন, কেপলার, লিউনার্ডো প্রমুখ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলোকবিজ্ঞান বিশারদগণ তার (গবেষণা) দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন।^{৫৩} ইবনুল হায়ছামের গবেষণা আলোকবিজ্ঞানে ইবনু রুশদের কর্মকে প্রভাবিত করেছে। পার্সী বিজ্ঞানী কামাল উদ্দীন মানাযিরের ভাষ্য তানকীলুল মানাযির গ্রন্থে ইবনুল হায়ছামের অসমাপ্ত কাজের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনুল হায়ছামের কিতাবুল মানাযির এর ওপর ভিত্তি করে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী কুতুবদীন সিরাজী ও আল-ফারাসী এবং জার্মানির ফ্লাইবার্গের থিওডরিক রংধনুর সঠিক ব্যাখ্যা দেন। ১৫৭৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তাকী উদ্দীন তার *Book of the light of the pupil of vision and the light of the truth of the sight* গ্রন্থে ইবনুল হায়ছাম এবং আল-ফারাসীর গবেষণাকে আরো উন্নীত করেন।^{৫৪}

কিতাবুল মানাযির ছাড়াও আলোকবিজ্ঞানের ওপর রচিত তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো মাক্বালাতু ফিল জুয়েল ক্বামার (مقالة في الضوء القمر) রিসালাতু ফিশ্ শাফাক্ব (رسالة في الشفق), মাক্বালাতু ফী কাওস ফাজ্জিন ওয়াল হালাত (مقالة في قوس فج والحالة), মাক্বালাতু ফিল মারআতিল মুহরিকা বিল-কুত্ব (مقالة في المرآة), (مقالة في المرايا المخوفة بالدوائر), মাক্বালাতু ফিল মিরায়াল মুহরিকা বিদ দাওয়াইরে (مقالة في المرايا المخوفة بالدوائر), মাক্বালাতু ফিল দুঈ (مقالة في الضوء) প্রভৃতি।^{৫৫}

৩.৭ দর্শনে অবদান

দর্শন এমন একটি বিদ্যা যা অনুদার মতবাদ, ভাবাবেগ ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান বা সত্যের অনুসন্ধানে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, অনুধ্যান, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে সত্তা, জগৎ ও জীবনের সাথে জড়িত চিরন্তন সমস্যাবলির সূষ্ঠ, যুক্তিসম্মত ও দৃঢ় আলোচনা করার একটা প্রচেষ্টা। ইবনুল হায়ছাম দর্শন শাস্ত্রের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। যিনি মূলত এরিস্টোটলীয় দর্শন প্রকৃতির একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। ইবনুল হায়ছাম এরিস্টোটলের ছাত্র হওয়ায় তার উপর এরিস্টোটলবাদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তার মতে, দর্শন সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি। আর এমনটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণকে একটি সুসংবদ্ধ জ্ঞানে বিন্যস্ত করাই দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্য। তিনি ডেকার্টের ন্যায় সংশয় পদ্ধতির (Method of Doubt) প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, প্রারম্ভিক সংশয় থেকেই দর্শনের আরম্ভ সূচিত হয়ে থাকে। সত্য আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়কেই বিচার বিশ্লেষণের কষ্টপাথরের যাচাই করে নেওয়া দরকার। বোধ (Understanding) বা বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপকেই জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞানের উপাদান ও আকার সরবরাহ করে যথাক্রমে ইন্দ্রিয় সংবেদন ও প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি। এ অর্থে জ্ঞান মাত্রই যৌক্তিকভাবে সম্প্রসারিত প্রত্যক্ষণ।^{৫৬} সুতরাং বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান যে, ইবনুল হায়ছাম কান্টের জ্ঞান তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেছিলেন। ইবনুল হায়ছামের অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয় নীতির পূর্বভাস পরিলক্ষিত হয়।^{৫৭} অতএব ইবনুল হায়ছামের জীবন দর্শনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে তার সাথে ইমাম গাযালীর সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়। ইবনুল হায়ছাম দুনিয়ায় আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার

মাধ্যমে সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর এই (দর্শন ভিত্তিক) 'সত্য' আবিষ্কারের উপায় হলো ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার।^{৫৮}

৪. উপসংহার

আলোকবিজ্ঞানের জনক (Father of optics) দ্বিতীয় টলেমী (بطليموس الثاني) নামে খ্যাত ইবনুল হায়ছাম ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। ইসলামী স্বর্ণযুগের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইবনুল হায়ছাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই জনকের আসন অলংকৃত করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণায় তাকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে। তার মতো মনীষীদের রেখে যাওয়া আবিষ্কার ও পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে বিশ্ব এগিয়ে চলছে বিদ্যুতের গতিতে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কারণে তিনি ইতিহাসের পাতায় অমরবীণ ও বরবীণ হয়ে আছেন। তার সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ সালিবা ১০০১ ইনভেনশন সংগঠনকে বলেন, 'ইবনুল হায়ছাম সারা বিশ্ব জুড়ে ইসলামী সভ্যতার সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন হিসেবে সমাদৃত।'

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ইসমাইল পাশা আল-বাগদাদী, হাদিয়াতুল আরেফীন, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইহইয়াত-তুরাখিল আরাবী, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ৬৬-৬৭; ইসমাইল পাশা আল-বাগদাদী, ইয়াহুদ মাকনুন ফী যাইলি আলা কাশফিয়-যুনুন, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২৩; উমার রিদা কাহালাহ, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: মু'আসাসাতুর-রিসালাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৪০; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, আল-আ'লাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লীলমালান্টিন, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩১৪; কাদরী হাফিয তাওকান, আল-খালিদুন আল-আরাব, পৃ. ১১৭-১২৬; আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ১০০; সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৯৯; *The New Encyclopedia of Britannica*, vol.9 (London: Encyclopedia of Britannica Inc., 2007), p. 267; Board of Researchers, *Muslim contribution to Science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation, Second Edition, 2012), p. 262; E.B, Ibn Al-Haytham, Edited by M. Zaki Kirmani & N.K. Singh, *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, Vol. 2 (New Delhi: Global Vision publishing house, 2005), p. 374.
- ^২ তিনি ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় তাকে আল-বাসরী (البصري) বলা হয়। দ্র. উমার রিদা কাহালাহ, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০।
- ^৩ Al-Hazen, Who made the first significant contributions to optical theory since the time of ptolemy (Plourished and century). Cf. *The New Encyclopedia of Britannica*, Vol. 9, p. 267; International year of light:Ibn al-Hytham pioneer of modern optics celebrated at UNESCO, 2 June, 2018; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: মল্লিক লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩০৫।
- ^৪ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫; সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ১৯৯; উমার রিদা কাহালাহ বলেন, *المؤلفون في القرن العاشر، ويلقب ببطليموس الثاني (أبو علي)*, *مؤجামول মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী বলেন, *المؤلفون في القرن العاشر، ويلقب ببطليموس الثاني (أبو علي)*, *مؤجামول মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০; আল-আ'লাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৩।
- ^৫ বসরা বা আল-বসরা (البصرة) ইরাকের একটি শহর। এই শহরটি কুয়েত এবং ইরানের মধ্যবর্তী শাত-ইল-আরবে অবস্থিত। এখানে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। এ শহরটি অতি প্রাচীন। দ্র. ইয়াকূত আল হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুস-সাদির, তা.বি.), পৃ. ১-৭।
- ^৬ ইবন আবী উসায়বিআ, *উয়ুনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিক্বা*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, তা.বি.), পৃ. ৯১; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৪; আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১০০; মুহাম্মদ নুরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* (ঢাকা: রায়কস পাবলিকেশন্স, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৩; *The New Encyclopedia of Britannica*, vol. 9, p. 267; উমার রিদা কাহালাহ বলেন, *هو ولد حوالي سنة ٣٥٤ هـ* *مؤجামول মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০।

- ^৭ পারস্য ইরানের প্রাচীন নাম। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বহির্বিশ্বে ইরান পারস্য নামে পরিচিত ছিলো, যদিও ইরানিরা বহুযুগ ধরে নিজেদের দেশকে ইরান নামেই অভিহিত করেছে। দ্র. ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৫।
- ^৮ বাগদাদ (الْبَغْدَاد) ইরাকের রাজধানী। দজলা নদীর তীরে অবস্থিত এ শহরটি ৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে এটি রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসাবে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলো। কালক্রমে এ শহরটি জ্ঞানের শহর হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলো। দ্র. *মু'জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২।
- ^৯ সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৯৯।
- ^{১০} কর্ডোভা (قُرْطُبَة) এটি দক্ষিণ স্পেনীয় অঞ্চল আন্দালুসিয়ার একটি শহর। মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই কর্ডোভা হয়ে উঠেছিলো গোটা বিশ্বের অগ্রণী নগর। ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে কর্ডোভার খ্যাতি ছিলো বিশৃঙ্খল। এছাড়া এটি রোমানদের শহর হিসাবে পরিচিত ছিলো। দ্র. মো: আবু তাহের, *স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৪৭-১৪৯।
- ^{১১} আল-আন্দালুস (الأَنْدَلُس) বলতে মুসলিম স্পেন বা ইসলামি ইবেরিয়া দ্বারা মধ্যযুগে মুসলিম শাসিত ইবেরিয়ান উপদ্বীপ বোঝানো হয়। বর্তমানে এটি স্পেন ও পর্তুগালের অংশ। কর্ডোভা খিলাফতের সময় আন্দালুস জ্ঞানের আলোকে পরিণত হয় এবং কর্ডোভা ইউরোপসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। দ্র. মো: আবু তাহের, *স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ২০-২১।
- ^{১২} আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১০০-১০১।
- ^{১৩} আবু আলী মানসুর (৯৮৫-১০২১ খ্রি.) আল-হাকিম বি আমরিলাহ (الْحَكِيمُ بِأَمْرِ اللَّهِ) নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ ফাতেমীয় খলীফা এবং ১৬তম ইসমাইলী ইমাম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.)।
- ^{১৪} দারুল হিকমা : (The house of knowledge) ফাতেমীয় খলীফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শি'আ মতবাদের বিকাশ সাধন করা। তবে শি'আ মতবাদের বিকাশ ও প্রচারের জন্য দারুল হিকমা নির্মিত হলেও পরবর্তীতে তা আর সংকীর্ণতার বন্ধনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কবিতা, আইন শাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র প্রভৃতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দারুল হিকমায় দেয়া হতো। তাই জ্ঞান, বিজ্ঞানে, শিল্পকলা ও সাহিত্যের অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য দারুল হিকমা (الْحِكْمَةُ) এক উন্মুক্ত পাঠশালা হিসেবে পরিগণিত।
- ^{১৫} আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১০১; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৯৯-২০০; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১৫৬-১৫৭; উমার রিদা কাহহালাহ বলেন, *لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملاً يحصل به النفع في حالتي زيادته ونقصه فدعاه الحاكم إليه وخرج للقائه وبالحق في إكرامه، ثم طالبه بما وعد من أمر النيل واختبره من جانبيه ولم يستطع الاتيان بشئ جديد في هندسته فاعتذر بما لم يقنع الحاكم، فولاه بعض الدواوين، فتولاه خائفاً، ثم تظاهر بالجنون، فضبط الحاكم ما عنده من مال ومتاع، وفيد وترك في منزله إلى ان مات الحاكم، فأظهر العقل، وأعيد إليه ماله.* *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০; *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists* গ্রন্থে আছে, Ibn Al-Haytham arrived in cairo, under the reign of Fatimid al-Hakim. He proposed a hydraulic project to control the waters of the Nile, but it was rejected by the Caliph. Cf. *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, vol. 2, p. 374.
- ^{১৬} স্পেন: ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। মধ্যযুগে স্পেন ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পাদপীঠ। এখানে অনেক বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিকের আগমন ঘটে। দ্র. <https://en.m.wikipedia.org>.
- ^{১৭} সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ২০০; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১৫৬।
- ^{১৮} নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১৫৭-১৫৮; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ২০০।
- ^{১৯} উমার রিদা কাহহালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০; *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১৫৯; স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২১৩; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী র. তাঁর গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা উল্লেখ করেন। *وكثيره كثيرة تزيد على سبعين، منها (المناظر-خ) نُشرت ترجمته إلى اللاتينية سنة ١٥٧٢ م، وكان لها- كما يقول سوتر-، تأثير بالغ في تعريف الغربيين بهذا العلم في العصور الوسطى. ومن كتبه (كيفية الإطلال) ترجم إلى الألمانية ونشر بها مختصراً، H Suter (وتهديب المجسطي) و (الشكوك على بطليموس-خ) رسالة، و (الأخلاق) رسالة، قال البيهقي: ما سبقه بها أحد، و (مساحة المجسم المتكافئ) نشر بالألمانية، و (الأشكال الهلالية-خ) و (تربيع الدائرة-خ) و (شرح قانون إقليدس-خ) و (مساحة الكرة-خ) و (المرايا*

- المخرقة) ترجم إلى الألمانية ونشر بها، و(تفسير المقالة العاشرة لأبي جعفر الخازن) و(ارتفاعات الكواكب) إلخ. ومصطفى نظيف كتاب (الحسن بن الهيثم - ط).
- ২০ আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, পৃ. ১০১-১০২; নূরুল হোসেন খান্দকার, বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান, পৃ. ১৬০; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী (ঢাকা: র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ৩৩; সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২০১; P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan st martins press, 1970), p. 629; *The New Encyclopedia of Britannica*, vol. 9, p. 267; *Muslim contribution to Science and Technology*, p. 262.
- ২১ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
- ২২ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২।
- ২৩ তদেব।
- ২৪ সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২১২।
- ২৫ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২-৩২৩।
- ২৬ তদেব, পৃ. ৩৪৪।
- ২৭ তদেব, পৃ. ৩২৩।
- ২৮ তদেব, পৃ. ৩৪০, ৩৫২।
- ২৯ তদেব, পৃ. ৩১৭।
- ৩০ আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, পৃ. ১০৩।
- ৩১ সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২১৪।
- ৩২ উমার রিদা কাহ্‌লাহ বলে, *د. مؤيد بن الجليل في حدود سنة ٤٣٠ هـ أو بعدها بقليل*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০; ইসমাঈল বাগদাদী বাশা বলেন, *د. محمد بن الحسن بن الهيثم البصري الفيلسوف المتوفى بمصر سنة ٤٣٠ هـ ثلاثين وأربعمائة*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩; *Muslim contribution to Science and Technology* গ্রন্থে আছে, Ibn Al-Haitham was died in 1039. Cf. *Board of Researchers, Muslim contribution to Science and Technology*, p. 263; *The New Encyclopedia of Britannica*, vol. 9, p. 267.
- ৩৩ সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ১৯৯।
- ৩৪ এম.এ ওয়াহেদ, *চোখের চিকিৎসার বিকাশে ইসলামের অবদান* (The contribution of Islam in ophthalmology), (খুলনা: ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৯।
- ৩৫ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৩৭৫।
- ৩৬ C.Elgood, *A Medical History of persia and the Eastern Caliphate* (cambridge: 1951), p. 137.
- ৩৭ P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 629.
- ৩৮ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪-২৭৫; আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, পৃ. ১০২-১০৩।
- ৩৯ আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, পৃ. ১০১-১০২; সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২০১-২০২; P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 629; *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, vol. 2, p. 374, 377-378.
- ৪০ সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২০৬।
- ৪১ Astrophysics is a branch of space science that applies the laws of physics and chemistry to explain the birth, life and death of stars, planit, galaxies, nebulae and other objects in the univers. It has two sibling Sciences, astronomy and Cosmology and the lines between them blur. Cf. <https://www.space.com>
- ৪২ সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২০৭-২০৯।
- ৪৩ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০, ৩৫২।
- ৪৪ কাজী আখতার উদ্দীন, 'আলোক বিজ্ঞানের জনক আল-হাজেন', মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৭৬।
- ৪৫ কাজী আখতার উদ্দীন, 'আলোক বিজ্ঞানের জনক আল-হাজেন', পৃ. ৭৬-৭৭; সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২০২-২০৪।
- ৪৬ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৪১; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী, পৃ. ৩৩-৩৪।

- ^{৪৭} সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২১১; কাজী আখতার উদ্দীন, ‘আলোক বিজ্ঞানের জনক আল-হাজেন’, পৃ. ৮১।
- ^{৪৮} এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।
- ^{৪৯} *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, vol. 2, p. 375.
- ^{৫০} Optics is the branch of physics that studies the behaviour and properties of light, including its interactions with matter and the construction of Instruments that use or detect it. Cf. <https://en.m.wikipedia.org>
- ^{৫১} কিতাবুল মানাযির (كتاب المناظر)-এর পঞ্চম অধ্যায়ে ক্যাটোপট্রিক্স বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তা বর্তমানে আল-হাজেন্স প্রবলেম (Al-Hazen’s problem) বা আল-হাজেনের সমস্যা নামে পরিচিত। দ্র. সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২০৫।
- ^{৫২} P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 629; এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬।
- ^{৫৩} আব্দুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, পৃ. ১০২।
- ^{৫৪} সাহাদত হোসেন খান, স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, পৃ. ২০১।
- ^{৫৫} এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭-৩২৮।
- ^{৫৬} ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩; ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১ম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৩৭।
- ^{৫৭} ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪।
- ^{৫৮} এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩-৩১৫।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে বিবাহ উৎসব: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা [Marriage Festivals in Hinduism and Buddhism: A Comparative Study]

মোঃ আবু তোরাব*

[Abstract: Marriage Festivals have been regarded as the most significant part of every religions. Hinduism and Buddhism, are two major global religions, possesses different and diversified marriage festivals. The paper explores the cultural significance and ceremonial aspects of marriage festivals in Hinduism and Buddhism through a comparative study. Examining rituals, traditions and symbolic elements, the paper aims to uncover similarities and differences in the celebration of marriage within these two major Asian religions. The paper applies qualitative method in conducting the study using secondary sources of data. The findings of the paper conclude that while both religions share a common thread in emphasizing the sacredness of marriage, distinctions emerge in the specific rituals and cultural expressions associated with matrimonial celebration.]

Keywords: Comparative study, Marriage Festival, Hinduism, Buddhism.

১. ভূমিকা

বিবাহ হল সামাজিক পবিত্র বন্ধন যার মাধ্যমে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাতি, ধর্ম বর্ণ ও সামাজিক শ্রেণিভেদ নির্বিশেষে বিবাহ প্রথা ও রীতিনীতিতে ভিন্নতা থাকলেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দমুখর পরিবেশে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিবাহ সাধারণত কোন রাষ্ট্র, সংস্থা, ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, গোষ্ঠী বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হতে পারে। একে প্রায়শই একটি চুক্তি হিসেবে দেখা হয়। মূলত এটি একটি অন্যতম আলোচিত অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে বর-কনেকে সাজিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়। বিয়েতে কনের সম্মতি, কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ বিবাহ নিবন্ধন ও উপস্থিত সবার প্রাণ খোলা আশীর্বাদ কিংবা যাজকের সামনে সম্মতি ধ্বনি বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর মঙ্গলবার্তা অথবা অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ ও উলুধ্বনির আবহে মালাবদল এবং পাত্রের হাতে রঙিন হয়ে ওঠা কন্যার সিঁথি এভাবেই খুশির জোয়ারে বিয়ের রঙে রঙিন হয়ে উঠে সবাই। জমকালো উৎসবে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলিত হয়ে পোশাকের জাঁকজমক উপভোগ করা হয়। এ উপলক্ষে পোলাও, রোস্ট, রেজালা, কাবাব, বোরহানিসহ নানা রকম সুস্বাদু খাবারের আয়োজন থাকে, যা বিবাহ উৎসবের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কন্যাদান এ দিনই হয়। মা-বাবার আদুরে কন্যাকে অশ্রুজলে বিদায় দিয়ে রিক্তমনে সবাই বাড়ি ফেরেন। ওদিকে গুরু হয়ে যায় বরপক্ষের আনন্দ। নতুন বউ, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশির মুখরতায় বাড়ি হৈ হৈ রবে পূর্ণ হয়। এভাবে নানা আমোদে ও আয়োজনে দুই-একটি দিন পার হয় বরের বাড়িতে। বরের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয় কনে পক্ষের লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে ভোজন উৎসবে একত্রিত হন। আনন্দ হাসি শেষে বর ও কনেকে নিয়ে কনের বাবা-মা নিজ বাড়িতে নিয়ে আবার আনন্দের জোয়ার জাগিয়ে তুলেন। এমনভাবেই বিবাহ উৎসব উদযাপিত হয়। সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। হিন্দু ধর্মের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন ও বৌদ্ধধর্মের বিবাহের পদ্ধতি ও নিয়মকানুনে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়।

২. হিন্দু ধর্মের পরিচয়

হিন্দু ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন চিন্তাধারার পরিণতি হিন্দু ধর্ম নয়। কোন ধর্ম প্রবর্তক, ঈশ্বরের অবতার বা মুনি, ঋষি ও ধর্ম সংস্কারকের সুমহান বাণীর উপর এ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন।^১ তবে প্রখ্যাত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ ড. আহমাদ শালাবী এ প্রসঙ্গে বলেন,^২

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

فالهند وسية دين منظور ومجموعة عن التقاليد والاولضاع تولدت من تنظيم الاربين جيلا بعد جيل.

“হিন্দু ধর্ম এমন কতিপয় ঐতিহ্য ও পরিস্থিতির সমন্বিত ও সংগৃহীত রূপ যা যুগযুগান্তর থেকে আরবীনের বিন্যাস থেকে জন্মলাভ করে।”

প্রাচীনকালে এ ধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় বলে এর নাম সনাতন ধর্ম। বেদ এ ধর্মের মূল ধর্ম গ্রন্থ বলে, এ ধর্মের নাম বৈদিক ধর্ম হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়।^{১০} হিন্দু শব্দটি সংস্কৃত সিদ্ধ শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করে।^{১১} ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নদীর নাম সিদ্ধ। এ নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে হিন্দু নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের অনুসৃত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে হিন্দুধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।^{১২} হিন্দুধর্ম মূলত এমন একটি ব্যবহারিক ধর্ম চেতনা যেখানে অনেক প্রথা, সংস্কার ও আদর্শ সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে এধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

এতদসত্ত্বেও মনীষীগণ বিভিন্নভাবে এধর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন,

ড. টি. কে ভেনকটেশ ওর্যান (Venkates Waran) বলেন,

Hinduism is the oldest and perhaps the most complex of all the living, historical world religions. It has no one single identifiable founder. The actual names found for the religion in the Hindu scriptures are Vedic Religion.^{১৩} “পৃথিবীর সকল ঐতিহাসিক ধর্মগুলোর মাঝে হিন্দুধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন ও জটিল। এ ধর্মের একক কোন প্রতিষ্ঠাতা নেই। এই ধর্মের প্রকৃত নাম খুঁজে পাওয়া যায় বেদের শাস্ত্র গুলোতে।”

স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরি রচিত *হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা* গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে তিনটি বিশেষণে সংজ্ঞায়িত করেছেন: ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্মে যিনি বিশ্বাস করেন, সিদ্ধ নদ থেকে সাগর পর্যন্ত সুবিভূত ভারত ভূমিকে যিনি পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে স্বীকার করেন, হিংসায় যার চিন্তা ব্যথিত হয় তিনিই হিন্দুধর্মাবলম্বী। নিঃসন্দেহে এই সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। যিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান, গো-বৎস, দেবকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন, দেবমূর্তির অবজ্ঞা করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, মুক্তিপ্রিয়সী এবং সর্বজীবনকে আত্মবৎ মনে করেন তিনিই হিন্দুধর্মাবলম্বী।^{১৪} আবার কারো কারো মতে সিদ্ধ নদ থেকে সাগর পর্যন্ত সুবিভূত ভারত ভূমিকে যিনি পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে স্বীকার করেন তিনিই হিন্দু।^{১৫}

বাংলাপিডিয়ায় হিন্দুধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রচলিত অর্থে যাকে হিন্দু ধর্ম বলা হয়, তা মূলত সনাতন ধর্ম। যুগযুগ ধরে মুনি-ঋষি এবং মহামনীষীরা জীবন, জগৎ ও জগতের স্রষ্টা সম্পর্কে যেসব চিন্তা-ভাবনা করেছেন সেসবেরই সমন্বিত রূপ হিন্দুধর্ম। তাঁদের চিন্তা-ভাবনা প্রথমে বেদের আকারে প্রকাশ পায় এবং পরে এই বেদের উপর ভিত্তি করেই যে ধর্মের বিকাশ ঘটে, মূলত সেটাই হিন্দুধর্ম।^{১৬} তবে জন্মলাভ থেকেই এর নাম হিন্দু ধর্ম ছিল না। এর প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম।^{১৭} তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এদেশে হিন্দু ধর্ম কোন একজন ব্যক্তির মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। কত বছর পূর্বে, কখন, কোথায় এ ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রাচীনকালে হিন্দু ধর্ম আর্য ধর্ম নামে পরিচিত ছিল।^{১৮} বেদ ধর্মের মূল বলে একে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। মধ্য দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল থেকে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর আগন্তুকরা প্রথমে ‘উন্ডাস’(সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধ) নদের উপকূলে আসে এবং দক্ষিণ ভারতে তাদের প্রসার ঘটাতে থাকে, তখন সিদ্ধ এলাকায় আর্যরা স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে সুন্দর ও সুশীল সমাজ গঠন করে। তারা ‘স’ কে ‘হ’ উচ্চারণ করে ‘সিদ্ধ’ হিন্দু উচ্চারিত হয়। এই নদীর উভয় পাশে বা সপ্ত সিদ্ধ (হপ্ত হিন্দু) প্রদেশে বসতি স্থাপনকারী আর্যদের নাম হয় ‘হিন্দু’।^{১৯}

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৫০০ সময়টি পরিচিত বৈদিক যুগ নামে। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৫ শতকের দিকে। আবার কেউ কেউ ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের উল্লেখ করেছেন।^{২০} আর্যরা হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বিদ্যমান ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্মচার, প্রাচীন পারসিকদের ধর্মরীতি সমূহ এবং সামাজিক উপাদান সমূহের বৈদিক সংমিশ্রণে হিন্দু ধর্মের বিকাশ শুরু হয়।^{২১} খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে আর্য জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বে সিদ্ধ অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে আর্যদের নিয়ে আসা ধর্মবিশ্বাসের বিয়ুজিত হিন্দুত্বের উদ্ভব। এই দৃষ্টিকোণ বিচারে হিন্দুধর্ম পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সনাতন ধর্ম।^{২২} তবে

অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ মনে করেন, আর্য ও ইরানি জাতিগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমন ও তাদের সংস্পর্শে এতদ অঞ্চলের বসবাসরত মানুষের সংশ্রবে তাদের নতুন বিশ্বাস ও ধর্মচারের সংযুক্তি থেকে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল।^{১৬}

৩. বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম অন্যতম। সিদ্ধার্থ গৌতম এর প্রবর্তক। খ্রিস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে তাঁর শিক্ষা এবং উপদেশকে কেন্দ্র করে এ ধর্মের উদ্ভব ঘটে।^{১৭} সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম ৫৬৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। বুদ্ধ কোন ঈশ্বর ছিলেন না। কিংবা কোন নবী বা ঈশ্বরের অবতারও ছিলেন না। রাজকুমার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ এবং নিজের চেষ্টায় জীবনের চরম সত্যকে তিনি জেনেছিলেন। বুদ্ধ মানব জাতির কোন ত্রাণকর্তাও ছিলেন না। বুদ্ধের চিন্তা-ভাবনা মানুষের দুঃখকে কেন্দ্র করেই।^{১৮} বুদ্ধ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত, জাগরিত মানুষ। উপাসনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক এবং পরমজ্ঞানকে বোধি বলা হয়। এ অর্থ বিবেচনায় কোন মানুষ বোধিপ্রাপ্ত ও জাগরিত হতে পারে। যেমন অশ্বথ গাছের নীচে বসে বুদ্ধদেব তপস্যার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন বলে তাঁকে বুদ্ধদেব এবং বৃক্ষকে বোধিবৃক্ষ বলা হয়ে থাকে। নেপাল সীমান্তবর্তী রাজ্য কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধ ভোগবিলাসকে তুচ্ছ করে স্ত্রী-পুত্র, পরিবার- পরিজনের মায়া ছিন্ন করে মানবকল্যাণে পরম সত্য আবিষ্কারের জন্য সংসারত্যাগী হয়েছিলেন। অমৃত্যু কঠোর সাধনা ও তপস্যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে তার দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য যে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন তাকে বৌদ্ধধর্ম বলে।^{১৯} এ ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

Buddhism is a path of practice and spiritual development leading to insight into the true nature of reality.^{২০} “বৌদ্ধধর্ম হলো প্রকৃত বাস্তবতার জ্ঞানলাভের অনুশীলন ও আত্মাধিক উন্নয়ন।”

এ ধর্মের সংজ্ঞায় আব্দুর রায়যাক আল-আসওয়াদ বলেন, “দর্শনের উপর ভিত্তি করে এ ধর্মকে একটি নৈতিক ও চিন্তাশীল মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ধর্মের শিক্ষাগুলো ঐশ্বরিক নয়; বরং এটি ধর্মীয় কিছু বিশ্বাস ও মতামতের সমষ্টি।”^{২১}

বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা শুধু পরমেশ্বরে অবিশ্বাসই নয়, বরং সৃষ্টি তত্ত্ব, আত্মার অমরত্ব, শেষ বিচার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আস্থাহীনতা।^{২২} বৌদ্ধ ধর্ম একান্তই যুক্তি নির্ভর। বুদ্ধ বলেছেন, “আমার কথা তোমরা গ্রহণ করবে, যুক্তি দিয়ে বিচার করে, কেবল আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধার কারণেই নয়।”^{২৩} খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত, যা পূর্বে প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে উদ্ভূত হয়ে মগধ রাজ্যের (যা বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশ) চারিদিকে প্রসারিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব মূলত সিদ্ধার্থ গৌতম এর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। জৈন ধর্মের সিদ্ধপুরুষ মহাবীরের ৩৬ বছর পর খ্রিঃপূর্ব ৬২৩ মতান্তরে ৫৬৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধের (সিদ্ধার্থ) জন্ম হয়।^{২৪} কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের রাজা শুদ্ধোদন ও মাতারানী (মায়াদেবী) মহামায়ার গৃহে জন্মের পর সপ্তম দিবসে মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং বিমাতা গৌতমীর গৃহে প্রতিপালিত হন; সম্ভবত বিমাতার আদর স্নেহের প্রকাশার্থে মূল নাম সিদ্ধার্থের সঙ্গে গৌতম নামটি যুক্ত করা হয়।^{২৫} জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ‘তিনি সংসার ত্যাগী হবেন’ এই আশঙ্কায় রাজপুত্রকে সংসারী করার যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। এমনকি তাকে পরমাসুন্দরী রমণী গোপা (যশোধরা) এর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। তার স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব ছিল না। তথাপি তিনি স্ত্রী সন্তান ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে বিচলিত হয়ে মুক্তির উপায় দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির উপায় বের করতে গভীর ধ্যান মগ্ন হন।^{২৬} আর এই গৌতম বুদ্ধ-ই হলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। বৌদ্ধ ধর্ম আজ পালনকৃত প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু হয়ে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। একসময় এই ধর্ম পুরো এশিয়া মহাদেশের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক সময় তার ইচ্ছা হল তিনি দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পৃথিবীর মানুষকে পরিত্রাণ করবেন। তিনি তাঁর চিন্তা ভাবনা থেকে চারটি মূল সত্য লাভ করেন এবং এগুলো প্রচার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধ যে চারটি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তা নিম্নরূপ-^{২৭}

ক. জগতে দুঃখ আছে

খ. দুঃখের কারণ আছে

গ. দুঃখকে প্রতিরোধ করা যায় এবং

ঘ. দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে।

ভোগ, বাসনা, কামনা, লোভ, লালসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি চিরতার্থ করণে মানুষ যে সব অপকর্ম সম্পাদন করে সেটাই জগতে দুঃখের কারণ। অশুভ কর্ম হল জগতের দুঃখ এবং ভোগ বাসনা চিরতার্থ করার অস্থিরচিত্ততা হল দুঃখের কারণ। বুদ্ধের শিক্ষা হল ব্যক্তিক বা সমষ্টিকভাবে যাবতীয় অপকর্ম হতে বিরত থেকে চিত্তকে পরিশুদ্ধ রেখে সুকর্ম সম্পাদন করা। তাহলে দুঃখকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সন্ধান দিয়েছেন। মার্গ বা পন্থা হলো:^{২৮}

ক. সম্যক দৃষ্টি: বিদ্যাহীনতা থেকে মিথ্যার জন্ম। অবিদ্যাই অন্ধকার। অন্ধকার হল পাপ-পঙ্কিল জগৎ। সম্যক দৃষ্টিই হল জ্ঞান প্রদীপ যা সকল অন্ধকার ও পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করে।

খ. সম্যক সংকল্প: সম্যক দৃষ্টির ফলে যে সত্য উপলব্ধি হয় তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্পই সম্যক সংকল্প।

গ. সম্যক বাক্য: মিথ্যা, অপবাদ, পরনিন্দা, কটু কথা, গালমন্দ পরিহার করে সংযমী হওয়া।

ঘ. সম্যক সমাচার: পরিশীলিত আচার, সুআচার, নীতি নৈতিকতা অবলম্বন করা।

ঙ. সম্যক প্রচেষ্টা: কুচিন্তার বিনাশ সাধন এবং সুকর্মের পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা।

চ. সম্যক জীবিকা: সং পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করা। প্রবঞ্চনা পরিহার করা।

ছ. সম্যক স্মৃতি: সং চিন্তা ও মানসিকতা অবলম্বন করা। এতে স্মৃতি শানিত হবে, সাধনা সফল হবে, অবসাদ দূরীভূত হবে।

জ. সম্যক সমাধি: একাত্মচিন্তে, মনোযোগ সহকারে, গভীর ধ্যান সহযোগে লক্ষ্যে পৌছা। এতে চরম মুক্তি বা 'নির্বাণ' লাভ হয়।

৪. বিবাহ উৎসব পরিচিতি

বিবাহ উৎসব দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি বিবাহ অপরটি উৎসব।

৪.১ বিবাহের পরিচয়:

বিবাহ হলো দুই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হওয়ার ধার্মিক, সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক এবং আইনগত প্রক্রিয়া। এটি একটি আধুনিক সমাজে সামাজিক প্রাথমিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন এবং সামাজিক নীতির ভিত্তিতে বিবাহের সার্থকতা এবং প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করা হয়।^{২৯}

Ferguson (2019) বলেন, "Marriage is a socially sanctioned union typically marked by a ceremony and legal contract." Furthermore, Schwartz and Scott (2020) elaborate that marriage involves "the establishment of a partnership recognized by society, often accompanied by legal rights and responsibilities."^{৩০}

Ferguson (২০১৯) এর মতে, "বিবাহ হল সমাজ অনুমোদিত ঐক্য যেটি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বৈধ চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। Schwartz এবং Scatt বলেন, বিবাহ হল সমাজ স্বীকৃত অংশিদারিত্ব যেখানে বৈধ অধিকার ও দায়িত্ববোধ রয়েছে।"

৪.২ উৎসবের পরিচয়

উৎসব হলো একটি আনন্দময় অথবা ধারাবাহিক উদ্যোগ যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এটি সামাজিক একত্রিত হওয়া, উল্লাস বা উৎসাহের সৃষ্টি করা, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।^{৩১}

Cohen (1992) mentions, "Festivals are periodic celebrations that commemorate, symbolize, or honor an aspect of communal life" (p. 1). Furthermore, in the context of cultural anthropology, Turner (2017) describes festivals as "ritual performances that temporarily invert or disrupt social norms and hierarchies, allowing participants to experience a sense of communitas and collective effervescence."^{৩২}

Cohen (১৯৯২) এর মতে, “উৎসব হলো, কোন সম্প্রদায়ের স্মৃতি, চিত্র কিংবা শ্রদ্ধার জন্য পর্যায়ক্রমিক উৎসাপন। Turner বলেন, উৎসব হলো ধর্মীয় রীতিনীতি পালন যা সাময়িকভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে নিষ্ক্রিয় করে সকল সদস্যকে সামষ্টিকভাবে এক হয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়।”

৪.৩ বিবাহ উৎসব পরিচিতি

বিবাহ উৎসব হলো একটি সামাজিক উৎসব যা দুই ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্ক প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য আয়োজিত হয়। এটি বিশেষভাবে দুই ব্যক্তির এই পবিত্র সম্পর্কের ঘোষণাও উল্লেখ করে। বিবাহ উৎসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং প্রথার অনুসারে অনেকভাবে আয়োজিত হতে পারে। এটি একটি উদাহরণ হিসেবে ব্যক্তিগত আদর্শ, ধর্মীয় গুরুত্ব এবং সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে।^{৩৩}

Smith (2018) argues, “A marriage festival is a cultural event that marks the beginning of a married couple's journey together, often featuring rituals and ceremonies specific to the couple's cultural or religious traditions.”^{৩৪}

স্মিথ (২০১৮) বলেন, “বিবাহ উৎসব হলো একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন যা দ্বারা বিবাহিত দম্পতির একসাথে পথচলা শুরু হয় এবং যেখানে দম্পতিদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফুটে ওঠে।”

Brown and Lee (2021) says, “A public declaration of commitment and love, bringing together family, friends, and community to celebrate the union of two individuals.”^{৩৫}

ব্রাউন ও লি (২০২১) এর মতে, “বিবাহ হলো দুটি ব্যক্তির একত্র হওয়া, ভালোবাসা এবং প্রতিশ্রুতির প্রকাশ্য ঘোষণার উৎসাপন।”

৫. হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে বিবাহ উৎসব

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে বিবাহ উৎসবটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেও তার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। সেখানে বিবাহ উৎসবটিও খুব সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রীয় মোতাবেক প্রত্যেক নর-নারী বিবাহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। হিন্দু বিবাহ একটি ধর্মীয় আচারিক বা আধ্যাত্মিক বিষয় এবং এজন্য কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয় না।^{৩৬} আর বিবাহের মূল উদ্দেশ্য বৈধ পন্থায় যৌনতৃপ্তি লাভ করা এবং সন্তান-সন্ততি উৎপাদন। বিবাহ মানব সমাজের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানটি এর আদি রূপ থেকে বর্তমান কাঠামোয় উপনীত হয়েছে। বিবাহ প্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে প্রধানত ধর্ম। বিয়ে সংক্রান্ত সকল নিয়ম কানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনে। মনুষ্মতি ও অর্থশাস্ত্রে আট প্রকারের হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ‘ব্রাহ্ম’, ‘দৈব’, ‘আর্য’, ‘প্রজাপত্য’, ‘আসুর’, ‘রাক্ষস’, ‘পৈশাচ’ ও গান্ধর্ব এই আট ধরনের বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহই শুধু গ্রহণযোগ্য ছিল।^{৩৭}

যৌতুক প্রথা বিয়ের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিয়েতে পণপ্রথা হিন্দুধর্মে একটি স্বীকৃত রীতি।^{৩৮} বাংলার হিন্দু পরিবারগুলির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজে ছেলে-মেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের, বাল্যকালে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই বিবাহ দেওয়াকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো। তবে বর্তমানে পরিণত বয়সেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। হিন্দু বিবাহ উৎসব উদযাপনকালে তারা বেশ কিছু শাস্ত্রীয় রীতি-নীতিও মেনে চলে। বিবাহকর্ম আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মাস্তলিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি: শুভদৃষ্টি, মাল্যদান, মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ সম্পাদন, কন্যা সম্প্রদান, পাণি গ্রহণ, অগ্নিপ্রদক্ষিণ, সপ্তপদীগমন এবং স্বস্তিবচন।^{৩৯}

হিন্দু বিবাহ উৎসবের ন্যায় বৌদ্ধ বিবাহ উৎসবেও বাড়িতে আনন্দের লহরী খেলে যায়। প্রতিটি সম্প্রদায়ে বিবাহের প্রচলন রয়েছে কিন্তু বৌদ্ধ বিবাহ আলাদা এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিবাহ বরের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। পাত্রীর বাড়িতে বিবাহ প্রশস্থ নয়। বাড়ি নতুনভাবে সাজানো হয়। বাড়ির সম্মুখে তৈরি হয় আকর্ষণীয় তোরণ। রাত্রি চলে আলোর ঝলকানি। তোরণের দুপাশে দু’টি মংগলঘট স্থাপন করা হয়। পোতা হয় দু’টি কলা গাছ। বাড়ির উঠানের মাঝখানে তৈরি হয় বিয়ে আসর।^{৪০}

বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মাঝে প্রজাপতি বিবাহই বিদ্যমান। উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় তাকে প্রজাপতি বিবাহ বলা হয়। আর এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদনকালে আনুষঙ্গিক অনেকগুলো উৎসব পালন করতে হয়। সেগুলো পালনের মাধ্যমে বিবাহের সম্পূর্ণ কাজ সমাধা হয়।^{৪১} বিবাহের আনুষঙ্গিক উৎসবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আশীর্বাদ উৎসব, গদ বা গং

গৃহে প্রবেশকরণ উৎসব, পানসল্লা উৎসব, নগধি উৎসব, তেলোয়াই (গায়ে হলুদ) উৎসব, সাত পাকে বাধা উৎসব, ফুলশয্যা উৎসব প্রভৃতি।^{৪২}

৬. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিবাহ উৎসবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিবাহ উৎসবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। যা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৬.১ বিবাহ পূর্ব উৎসবসমূহ

৬.২ বিবাহকালীন উৎসবসমূহ

৬.৩ বিবাহোত্তর উৎসবসমূহ

৬.১ বিবাহ পূর্ব উৎসবসমূহ

ক. আশীর্বাদ উৎসব

বিবাহের ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী বিচার করে দেখার রীতি আছে। পাত্র-পাত্রীর অন্য কোন বিষয়ে আপত্তি না থাকলেও কোষ্ঠী বিচারে যোটক না মিললে বিবাহের আর অগ্রগতি হয় না। হিন্দু সমাজে বিয়ের আগে কথা পাকাপাকি করার অনুষ্ঠানকে ‘আশীর্বাদ’ বলে। পাত্র-পাত্রী পছন্দ হলে সোনার আংটি বা টাকা দিয়ে পাকা কথা হয়ে থাকে। নতুন পাটি, নতুন খাতা, কলম দিয়ে পুরোহিতের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের কর্তব্যজ্ঞিতরা বিয়ের কথা চূড়ান্ত করেন। এটাকে অনেকে ‘পাটিপত্র’ বা ‘মঙ্গলাচরণ’ বলে থাকেন। এতে উল্লেখিত থাকতো বিয়ের দিন-ক্ষণ-লগ্ন এবং দেনা-পাওনার কথাও। বিয়ের আগের দিনকে বলা হয় ‘আদিবাস’ ঐ দিন বর-কনেকে পূজা করতে হয় এবং মধ্যরাতে নতুন কাপড়, গহনা আর পাঁচ পদ দিয়ে খাবার খেতে হয়। বর-কনে উভয়ের বাড়িতেই অধিবাসের দিন একই আয়োজন হয়ে থাকে।^{৪৩}

হিন্দু বিবাহ উৎসবের আশীর্বাদের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও আশীর্বাদ উৎসব রয়েছে। বিবাহের প্রথম ধাপে এটি পালিত হয়। বিবাহের প্রথম কাজ হলো পাত্রী নির্বাচন করা। ঘটকের মাধ্যমে অথবা অভিভাবকদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে পাত্রের জন্য পাত্রী নির্বাচন করা হয়। তারপর শুক্লাপক্ষে উভয় পক্ষের সম্মতি ও উপস্থিতিতে কনের বাড়িতে যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম আশীর্বাদ।^{৪৪} আশীর্বাদের প্রচলিত নাম জোড়নী অথবা জোড়াগাথা। উভয় পক্ষের নিকটতম আত্মীয় এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিয়ের কথা পাকা হওয়ার জন্য এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উৎসবের মাধ্যমে বর-কনের, জোড়া (মিলন) লাগানোর সূত্রপাত হয় বিধায় এর নাম জোড়ানীভাত।^{৪৫} স্থিরীকৃত একটি দিনে বরপক্ষ কনেকে আশীর্বাদ করতে কনের বাড়ি যায়। সাথে নিয়ে যায় মিষ্টি, অলংকার, শাড়ী, ব্লাউজ, শাঁখা-সিঁদুর ও প্রসাধন সামগ্রী। কনে বরপক্ষের অলংকার ও শাড়ী পরেই বরপক্ষের সামনে হাজির হয়। তখন বরপক্ষ কনেকে আশীর্বাদ করে। সেদিনই কনে প্রথমে সিঁদুর দেবে এবং একে প্রথম বিবাহ বলেও উল্লেখ করা হয়।^{৪৬}

খ. বিয়ের দিন নির্ধারণ

হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাহে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের পর বিয়ের দিন নির্ধারণ করা হয়। সেক্ষেত্রে বর ও কনে উভয় পক্ষের নিকটতম আত্মীয় ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পঞ্জিকা অনুসারে শুভলগ্ন দেখে এবং পাত্র-পাত্রীর জন্মকোষ্ঠী বিচার করে বিয়ের দিন নির্ধারিত হয়।^{৪৭}

গ. পানখিল/পানসল্লা উৎসব

হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাহে ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক রীতি, ভদ্রতা এবং আচার অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবেই পানের ব্যবহার চলে আসছে। হিন্দু বিবাহে পানখিল ও বৌদ্ধ বিবাহে পানসল্লা নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। এটি আশীর্বাদ উৎসবের পরেই পালিত হয়। পানখিল অর্থ হলো পান পাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে খিল দেয়া বা খড় দেয়া অর্থাৎ মসলা দিয়ে পানকে খাওয়ার উপযোগী করে তৈরি করা এবং সেই পানপাত্রকে কেন্দ্র করে বাড়ির মেয়েরা ও প্রতিবেশিনীরা বিয়ের গান ও নেচে-গেয়ে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করে থাকে। অনুষ্ঠানটি বর ও কনে উভয়ের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।^{৪৮} বৌদ্ধ বিবাহে পানসল্লা উৎসবটি বর ও কনের বাড়িতে বিবাহের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার কৌশল কী হবে সে সম্পর্কে সল্লা পরামর্শ করার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আহ্বান করা হয়। পান খেয়ে সল্লা বা পরামর্শ করা হয় বলে এই অনুষ্ঠানের নাম পানসল্লা। পানের পাশাপাশি অন্যান্য আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা থাকে এটি মূলত সামাজিক বন্ধন ও দৃঢ়তার প্রতীক।^{৪৯}

ঘ. গায়ে হলুদ উৎসব

বিবাহে নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে গায়ে হলুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। গায়ে হলুদের জন্যও দিনক্ষণ আছে। বর-কনের দাম্পত্য জীবনকে যে কোন ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তির অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকেই এসব লোকাচার পালন করা হয়। গায়ে হলুদ এ সবেই একটি এবং এটি মূলত একটি মাস্টিক অনুষ্ঠান, যা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। হিন্দু সমাজে এ লোকাচার গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস নামে অভিহিত।^{৫০} হলুদ একদিকে পবিত্রতার প্রতীক, অন্যদিকে প্রসাধনী হিসেবেও উৎকৃষ্ট। আধিভৌতিক ও অপশক্তির প্রভাব দূর করতে হলুদ অত্যন্ত কার্যকর বলে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে।^{৫১} তেমনিভাবে বৌদ্ধ বিবাহে গায়ে হলুদ উৎসব যাকে তেলোয়াই নামে অভিহিত করা হয়।^{৫২} বৌদ্ধ ধর্ম মতে এটি একটি বাধ্যতামূলক মাস্টিক অনুষ্ঠান। গায়ে হলুদ বর ও কনের বাড়িতে পৃথকভাবে পালন করা হয়। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আড়ম্বর করে গায়ে হলুদের উপকরণ নিয়ে যাওয়া হয়। দু বাড়িতেই বর ও কনেকে বসানোর জন্য তৈরি করা হয় সুসজ্জিত মঞ্চ। আনুষ্ঠানিক আচার পালনের জন্য গায়ে হলুদের উপকরণগুলি ডালা-কুলায় রাখা হয়। হিন্দু বিবাহে হলুদ অনুষ্ঠানে হলুদ ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে রয়েছে: ধান, দুর্বা, তিল, যব, সরিষা, মাষকলাই, সোন্দা, মেথি, গিলা, সুঁট, চন্দন, সিঁদূর, মেহিদি, মিষ্টি, মাছ, পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি।^{৫৩} বৌদ্ধ বিবাহে গায়ে হলুদের উপকরণে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে তা হলো, বরণকুলা, আর বরণকুলার উপাদান হলো নিম্নরূপ:

একটি সাজানো কুলা, ৫ (পাঁচ) পোয়া সাইল ধান, একগুচ্ছ দুর্বাঘাস, ৫ (পাঁচ) টি কাঁচা কলা, ৫ (পাঁচ) টি কাঁচা পেয়ারা, তিন টুকরা কাঁচা হলুদ, শিলা (ছোট পাথরের টুকরা) একটি, একটি ঘিলা, সরিষা তৈলের মাটির সেজ দীপ একটি, জলপূর্ণ সাজানো মাটির পাত্র (কুন্ডি) একটি। সেই পাত্রে থাকবে এক থোকা অশ্বথ পাতা, এক থোকা বাঁশ পাতা, এক থোকা মুঝারী পাতা, আম্রপল্লব একটি। ফলগাছের ডিক (অক্ষুট কচি পাতা) একটি। এছাড়া দু'টি কঙ্কির উপর দু'টি মোমবাতি ও একখানি নতুন গামছা বিবাহের আসরে বরণকুলায় যুক্ত হবে।^{৫৪}

মা, দাদী, নানী এবং অন্যান্য মুকুর্বি স্থানীয় আত্মীয়-স্বজন প্রথমে বর-কনের কপালে হলুদ মাখেন। এ সময় তাদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়। অতিথিদের বিশেষ খাবার ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। পরে বর-কনের সারাসরীরে হলুদ মাখানো হয় এবং সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এমনই এক আনন্দঘন পরিবেশে আড়ম্বরের সাথে হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাহে গায়ে হলুদ উৎসব পালিত হয়।

ঙ. আইবুড়ো ভাত উৎসব

হিন্দু বিবাহে এটি একটি লৌকিক আচার যা বর-কনেকে পালন করতে হয়। অনুষ্ঠিতব্য বিবাহিত জীবনের পূর্বে সর্বশেষ ভাত খাওয়া যা 'আইবুড়ো ভাত' নামেই পরিচিত। প্রথা অনুযায়ী বিবাহিত জীবনে কন্যাকে তার স্বামীর বাড়ি থাকতে হবে। আপেক্ষিক অর্থে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। তাই পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজন ভালবাসা ও মমত্ববোধের স্মৃতিস্বরূপ তাদের কন্যাকে ভাত খাওয়ান। ছেলের বাড়িতেও এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সেদিক থেকে তারও অবিবাহিত জীবনের শেষ আনুষ্ঠানিক খাওয়া।^{৫৫} অপরপক্ষে বৌদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে এ ধরনের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান দেখা যায় না।

চ. দধি মঙ্গল উৎসব

হিন্দু বিবাহের লোকাচার হিসেবে বিবাহের দিন বর ও কন্যার উপবাস থাকতে হয়। বিয়ের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে বর ও কনেকে বেশ অনেকটা পরিমাণে দই, চিড়ে, কলা ও সন্দেশ দিয়ে মেখে খেতে দেওয়া হয়। বিয়ের সমস্ত বিধি শেষ হলে তবেই তারা খেতে পারে।^{৫৬} পক্ষান্তরে বৌদ্ধ বিবাহ উৎসবে এ ধরনের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় না।

ছ. গদ বা গৎ এর গৃহে প্রবেশকরণ উৎসব

অন্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ এ উৎসবে বৌদ্ধরা কনের বাড়ি থেকে আনীত অষ্টদূর্বা বরের বাড়িতে প্রবেশ করান যার স্থানীয় ভাষায় গদ গলানো অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়।^{৫৭} গদ প্রবেশ করানোর সময় বধুরা এবং যুবতী মেয়েরা বরের বাড়ির উঠানে সমবেত হয়ে উলু ধ্বনির মাধ্যমে তা বাড়ির অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। সে সময় মেয়েরা এক ধরনের গান পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের আপ্যায়ন করেন। এক বাড়ির সাথে

অন্য বাড়ির পরিবেশের খাপ খাওয়ানোর জন্য এ আয়োজন হয় বলে মনে করা হয়।^{৫৮} পক্ষান্তরে এ ধরনের উৎসব হিন্দু বিবাহে দেখা যায় না।

জ. নগধি উৎসব

বৌদ্ধ বিবাহের প্রাথমিক উৎসবসমূহের মধ্যে অন্যতম উৎসব। বিবাহের পূর্বে তথা বিবাহ কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার আগে বরের বাড়িতে আশে পাশের মানুষদের আকর্ষণ করণার্থে সানাই বাজানো উৎসব। বরের বাড়ির আশে পাশে উঁচু বৃক্ষে অস্থায়ী ঘর বেঁধে আশীর্বাদের পর বিবাহের এক মাস পূর্ব থেকে বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত সন্ধ্যায় সানাই বাজানো হয়, এর নামই নগধি উৎসব।^{৫৯} এটি বৌদ্ধ বিবাহ উৎসব, যা হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়।

ঝ. নামানী উৎসব

বৌদ্ধদের দ্বারা পালিত আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব। বাঙ্গালী বৌদ্ধ বিবাহ বরের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। এ জন্য বিবাহের পূর্বদিন অথবা বিবাহের দিন সকালে কনেকে সালংকারে সজ্জিত করে বাজনাবাদ্য সহযোগে বরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কনের বাড়ি থেকে কনেকে বরের বাড়িতে নামিয়ে আনা হয় বলে এর নাম নামানী।^{৬০} নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বরপক্ষ বরযাত্রী সহযোগে বাজনাবাদ্য নিয়ে কনের বাড়িতে উপস্থিত হয়। সাথে সাথে অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মিষ্টি নিয়ে আসে এবং বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে শাখা সিঁদুর আবশ্যিক জিনিস।^{৬১} কনের বাড়িতে প্রবেশ মুখে মংগলঘট বসানো হয়। বরপক্ষ মংগলঘটের জল ছিটিয়ে বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করে। বর-কনের উভয়ের বাড়িতে আকর্ষণীয় তোরণ নির্মাণ করা হয়। বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে আহ্বান করে নিয়ে যায় এবং উঠানে বসার ব্যবস্থা করে। বরপক্ষ নিজেদের সাথে করে আনীত অলংকার, পোশাক এবং প্রসাধনী সামগ্রীসহ অন্যান্য জিনিস সকলের সামনে প্রদর্শনের জন্য থালায় স্থাপন করে। এভাবে আড়ম্বরের সাথে নামানী উৎসব পালিত হয়।^{৬২} পক্ষান্তরে হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে কনের বাড়িতে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান হিন্দু বিবাহে দেখা যায় না।

৬.২ বিবাহকালীন উৎসবসমূহ

ক. মূল বিবাহ অনুষ্ঠান

গায়ে হলুদের পর এবার বিয়ের অনুষ্ঠান। হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে দুই পর্বের অনুষ্ঠানের একটি ‘সাব বিয়ে’ অন্যটি ‘বাসি বিয়ে’ দু’টি আসরই কনের বাড়িতে বসে। তবে কোন কোন সময় ‘বাসি বিয়ে’ বরের বাড়িতেও হয়ে থাকে। ‘সাব বিয়ে’ হচ্ছে মূলত বিয়ের মূল পর্ব। তবে বৌদ্ধ বিবাহের মূল কার্য সাধারণতঃ রাত্রেই সংঘটিত হয়। দিনের বেলায় আশীর্বাদ, নামানীসহ ছোট খাটো অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। বিবাহের দিন বর নিজেদের বৌদ্ধ বিহারে যায়, বুদ্ধমূর্তিকে বন্দনা করে, পূজা দেয় এবং মূর্তির সম্মুখে বাতি জ্বালায়। ঠিক তেমনি কনেও নামানীর আগে বৌদ্ধ বিহারে যায়। সে সময় বর কনে ভিক্ষুকে বন্দনা করে এবং শীল গ্রহণ করে। বিয়ের দিন সন্ধ্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আমন্ত্রিত হয়ে বরের বাড়িতে উপস্থিত হয়। বর কনেকে শীল প্রদান করতঃ মংগলসূত্র আবৃত্তি করে। ভিক্ষুরা নবদম্পতিকে গঠনমূলক উপদেশ দেয় এবং হিতকর অন্যান্য সূত্রেরও ব্যাখ্যা প্রদান করে।^{৬৩}

খ. বিয়ে যাত্রী ও বরণ উৎসব

বিয়ের কয়েকদিন পূর্ব থেকে বরের বাড়িতে এমনকি কনের বাড়িতেও প্রস্তুতি শুরু হয়। আত্মীয় স্বজন আসতে থাকে, প্রবাসীরা এসে যায়। হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষের আমন্ত্রণে বরের বাড়ির সদস্যদের পাশাপাশি তার বন্ধুরা তাদের ভালো পোশাক পরিধান করে এবং কনের বাড়িতে যাত্রা করে যেখানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। বরকে কনে পক্ষ থেকে একটি গাড়ি পাঠানো হয়। এতে বর সাথে একজন কনে পক্ষের লোক, তার নিজের বাবা, পাশাপাশি তার পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ সদস্যকে সাজিয়ে নিয়ে চলে। বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলে যাওয়ার আগে বরকে তার মা আশীর্বাদ করেন এবং বর আনুষ্ঠানিকভাবে শীঘ্রই তার ‘অর্ধাঙ্গী’কে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার অনুমতি চান। বর বিবাহ করতে এলে তাকে স্বাগত জানান কন্যাপক্ষ। সাধারণতঃ কন্যার মা তার জামাতাকে একটি থালায় প্রদীপ, ধান, দুর্বা ও অন্যান্য বরণ সামগ্রী নিয়ে বরণ করেন। এরপর বরকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়ার পর এবং মধু এবং মিষ্টি খাওয়ানো হয়।^{৬৪} তবে বৌদ্ধ বিবাহ এক্ষেত্রে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যেখানে পাত্রীর বাড়িতে বিবাহ প্রশস্ত নয়। বিবাহ বরের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে

যোগদানের জন্য কন্যাপক্ষ বরপক্ষের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হয়ে বরের বাড়িতে আগমন করলে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে স্বাগত জানিয়ে নির্ধারিত আসনে বসায়। কন্যাপক্ষের লোকের উঠানে প্রবেশের সময় মংগলঘট থেকে জল নিয়ে মাথার উপর ছিটিয়ে দেয়। উভয় পক্ষ আসন গ্রহণের পর কুশল বিনিময় হয়। ভাবের আদান-প্রদান হয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি মিলন উৎসব।^{৬৫} প্রাথমিক পর্বে চলে পানমিঠা, পরে জলযোগ। পানমিঠার পূর্বে পানসুপারী দ্বারা সাজানো থালা বিনিময় হয় উভয় পক্ষের মধ্যে। থালায় যে মিঠা বা চিনি থাকে তা সকলেই একটু একটু করে মুখে দেয়। তারপর বিবাহের কাজ শুরু হয়।^{৬৬}

গ. পোশাক ও অলংকার

বিবাহের ক্ষেত্রে পোশাক ও অলংকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিন্দু বিবাহে বৈদিক যুগে বরের পোশাক ছিল পট্টবস্ত্র।^{৬৭} পরবর্তীতে পোশাকে ভিন্নতা এসেছে। লাল রংকেই হিন্দুদের শুভ রং মনে করা হয়।^{৬৮} সেক্ষেত্রে কনের জন্য লাল শাড়ী, লেহেঙ্গা, ঘাগরা চোলি এবং ওড়নাকে বিবাহের পোশাক হিসেবে গণ্য করা হয়। বরের ক্ষেত্রে গায়ে হলুদে রয়েছে হলুদ রঙা পাঞ্জাবি। বিয়ের প্রধান পোশাক হিসেবে শেরওয়ানিই সব থেকে বেশি প্রচলিত। পাগড়ি হতে হয় লাল। বরকে ছাদনাতলায় (বিয়ের বেদি ও ছাউনি) বসানো হয় ছাদনাতলাতে কেবল বর, কনে এবং পুরোহিত বসে। বরকে সেই ব্যক্তির দ্বারা নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয় যিনি সম্প্রদান করতে চান। পরিবারের প্রবীণ পুরুষ সদস্য যিনি সম্প্রদান করেন তিনি কনের দায়িত্ব বরকে প্রদান করেন। এছাড়া সামুদ্রিক শঙ্খ থেকে তৈরি ও হিন্দু ধর্মীয় বৈবাহিক রীতির একটি হল অলংকার। হাতের বালার মতো এই অলংকার বিবাহিত মহিলারা ব্যবহার করেন। বিবাহের মন্ত্রপড়ার সময় কনের পিতা কনের হাতে দুটি শাখা দিয়ে থাকে।^{৬৯} অপরদিকে বৌদ্ধ বিবাহে বরের পোশাক হয় আকর্ষণীয়, পরে থাকে পাতলা ফিনফিনে ধূতি, গায়ে দামী শাল, মাথায় পাগড়ী, পায়ে নাগরা, এছাড়া ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবী। হাতে রাখতে হয় কারুকাজ করা হাত পাখা। মাথায় শোভা পায় মুকুট। যার প্রচলিত নাম শেয়রা। বরের পর কনেকে আসরে আনা হয় তার গায়েও দামী পোশাক, অলংকার, চাদর এবং মাথায় মুকুট থাকে। কনেও হেঁটে আসরে আসে না। ভগ্নিপতিরা কোলে করে বরকনেকে আসরে আনে। বরের বাম পাশেই কনেকে বসানো হয়। গৃহকে সামনে রেখে তারা আসন নেয়। সামনে থাকে বরণকুলা।^{৭০}

ঘ. সপ্তপদী, শুভদৃষ্টি ও মালা বদল উৎসব

এ সকল উৎসবসমূহ হিন্দু বিবাহ ও বৌদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ উৎসব। হিন্দু বিবাহে এ পর্বেই কনে তার বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বরণ করে নেয়। এক্ষেত্রে বরকে প্রথমে বিবাহের মণ্ডপে আনা হয়। তারপর কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে আনা হয়। সাধারণতঃ কন্যার বিবাহিত বন্ধুরা পিঁড়ি ধরে থাকে। কন্যা পান পাতা দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রাখেন। কন্যাকে পিঁড়িতে করে বরের চারপাশে সাতপাক ঘোরানো হয়। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী এই সাতপাক সম্পূর্ণ হলেই আইনত বিবাহ সম্পূর্ণ হয়ে যায়।^{৭১} সাত পাকের সঙ্গে সাতটি মন্ত্র উচ্চারিত হয়। তেমনি ভাবে বৌদ্ধদের বিবাহ উৎসবের আনুষঙ্গিক একটি উৎসবের নাম হলো সাত পাকে বাঁধা উৎসব। এটি বিবাহ তথা মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে প্রথাগত বিয়ের পর অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হলে বরকনেকে ঘরের ভিতরে নেয়া হয়। আঙ্গুলে জোড়া লাগানো এবং চাদর গিট থাকা অবস্থায় নবদম্পতি পায়ে হেঁটে যায়। যে কক্ষে ফুলশয্যা হবে সে কক্ষে নবদম্পতিকে বসানো হয়। আর সেখানে হয় শুভদৃষ্টি এবং মালাবদল। তারপর কনে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণপূর্বক সাতবার প্রণাম করে। এটাই সাত পাকে বাঁধা উৎসব।^{৭২} তেমনিভাবে হিন্দু বিবাহে সপ্তপদীর পর অনুষ্ঠিত হয় শুভদৃষ্টি ও মালাবদল উৎসব। আবার অনেক সময় এ পর্ব বিবাহ আসরেই সম্পন্ন হয়। এ সমস্ত পর্ব শেষ হলে নবদম্পতিকে পাশাপাশি বসানো হয়। তারপর অভিভাবকেরা উপস্থিত হয়ে তাদের আশীর্বাদ করে। তারা আবার তাদের প্রণাম করে। কনিষ্ঠরা বরকনেকে প্রণাম করে এবং মালা পরিয়ে দেয়।^{৭৩}

ঙ. কন্যাসম্প্রদান উৎসব

বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি বসাতে হয়। বর পূর্বমুখী কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসবেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আশ্র পল্লবে সুশোভিত, গাঙ্গাজল পূর্ণ একটি ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান

হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদান কর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।^{৭৪} অপরদিকে বৌদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে বরের বাম পাশেই কনেকে বসানো হয়। গৃহকে সামনে রেখে তারা আসন নেয়। সামনে তাকে বরণকুলা। বিবাহমন্ত্র শুরু হওয়ার পূর্বে সকলে বিবাহ আসরে চতুর্দিক সমবেত হয়। সকলেই আসন গ্রহণের পর কন্যাপক্ষ থেকে উঠে আসেন মন্ত্রদাতা। তিনি আসরে এসে হাত মুখ ধুয়ে নেন এবং সকলকে অভিষেক করেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধদের জন্য যে বিবাহমন্ত্র আছে তা তিনি আবৃত্তি করেন এবং বিবাহকর্ম সম্পন্ন করেন। মন্ত্রপাঠের এক পর্যায়ে হয় কন্যা সম্প্রদান। কনের পিতা অথবা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি সকলের সামনে বরের হাতে কনেকে সম্প্রদান করেন। এই সম্প্রদানের সময় মন্ত্রদাতা মুখে মুখে কন্যার অভিভাবক ও মন্ত্র উচ্চারণ করে। সেই মন্ত্র হলো তোমার দীর্ঘ জীবনের সুখ ও মঙ্গল কামনা করে আমার কন্যাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করছি।^{৭৫}

চ. সিঁদুর দান উৎসব

হিন্দু বিবাহে এরপর সিঁদুর দান বা 'বাসি বিয়ের' পর্ব। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বাসি বিয়েতে বিভিন্ন দেব-দেবীর অর্চনা শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর লেপন করেন। বাঙালি হিন্দু নারীরা স্বামীর মঙ্গল কামনায় সিঁদুর পরেন। সিঁদুর দানের সময় কনের মাথা বরের পরিবারের দেওয়া নতুন শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে। অপরদিকে বৌদ্ধ বিবাহেও সিঁদুর বিয়ের একটি অনুষঙ্গ। বিবাহ সম্পন্ন হলে স্বামী তার অর্ধাঙ্গিনীর সিঁথিতে সিঁদুর দেন।^{৭৬}

ছ. অগ্নি ও যজ্ঞ উৎসব

অগ্নি ও যজ্ঞ হিন্দু বিবাহে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। বর ও কনের মধ্যে বিভিন্ন পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি অগ্নির সম্মুখে তৈরি করা হয় এবং অগ্নিটি বাস্তব বা প্রতীকী পদচারণার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বর পশ্চিম দিকে মুখ করে এবং নববধু তার সামনে পূর্বদিকে মুখ কর বসে। তিনি তার হাত ধরে রাখেন এবং অগ্নি সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করা হয়।^{৭৭}

৬.৩ বিবাহোত্তর উৎসবসমূহ

ক. বধু বরণ উৎসব

হিন্দু বিবাহে কনে বরের বাড়িতে পৌঁছলে এটি করা হয়। একটি থালা আলতা এবং দুধ দিয়ে পূর্ণ করে নানা উপকরণে নববধুকে বরণ করা হয়। নববধু এতে পা রাখে ও শাশুড়ির বরণ করে নেওয়ার পর বরের সাথে গৃহপ্রবেশ করে। বৌদ্ধ বিবাহেও কনেকে বরণ করে নেওয়া হয়। কনে যখন স্বামীর সাথে শশুরালয়ে ফিরে তখন তাকে বরণ করে নেয় এবং পরিধানের জন্য আলাদা শাড়ী দেয়া হয় যা বৈট কাপড় উৎসব নামেও পরিচিত।^{৭৮} এর আগে কনেকে পাক্কীতে উঠিয়ে দেওয়ার পর কনের পরিবারের যে কোন একজন প্রথমে একমুঠো চাউল, পরে একমুঠো কাটা সুপারী বাড়ির চালের উপরে ছড়িয়ে দেয়। তারপর যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা পথে যদি কোন বৌদ্ধ বিহার, তীর্থস্থান, শ্মশান থাকে তবে সেখানে পাক্কী নামানো হয়। পাক্কীর ভেতর থেকে কন্যা যুক্ত করে চাউল নিয়ে তাদের বন্দনা করে অর্থাৎ মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, মেয়ের সাথে ৪/৫ জন লোক বরের বাড়ি আসে।^{৭৯}

খ. বৌভাত উৎসব

হিন্দু বিবাহে নতুন বধুকে উপহার দেওয়া অতিথিদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করা হয়। নববধু রান্না করেন এবং তার স্বামীর পরিবারের সকল সদস্যদের পরিবেশন করেন। স্বামীকে নববধুকে একটি শাড়ি উপহার দিতে হয় এবং কনের মৌলিক চাহিদার দায়িত্ব নেওয়ার শপথ নিতে হয়।^{৮০} তেমনি বৌদ্ধ বিবাহেও এ উৎসব গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের পরদিন দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় বৌভাত অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান মেয়েদের মাঝে সীমাবদ্ধ। গ্রামাঞ্চল, পাড়াষ্ট, ভিটাষ্ট, পুরাতন বধুদের সাথে নববধুকে পরিচিত করিয়ে দেয়ার জন্য এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। পুরনো বধুরা নববধুকে স্বাগত জানিয়ে আলিঙ্গন করে এবং আশীর্বাদ করে তারপর একত্রে আহার করে এটিই বৌভাত উৎসব। এটিও উল্লেখ্য যে, বিবাহ যদি চলন্ত হয় অর্থাৎ কনের বাড়িতে হয় তখন বিবাহের পরে বরের বাড়িতে এক অনুষ্ঠান হয় তার নামও বৌভাত।^{৮১}

গ. ফুলশয্যা উৎসব

এটি সব ধর্মেই একটি গ্রহণযোগ্য উৎসব। হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এ রাতেই হয় নবদম্পতি প্রথম মিলন রাত বা ফুলশয্যা। ফুলশয্যা অন্যান্য সমাজেও বিদ্যমান। ফুলশয্যা আসলেই ফুলশয্যা,

শয্যাটি ফুলে ফুলে ভরে যায়। কক্ষটিকে সাজানো হয় নতুন সাজে। বৌদিরা এবং ঠাকুরমারা ফুলশয্যা উৎসবে অংশগ্রহণ করতঃ নববধূকে কক্ষে প্রবেশ করানোর পূর্বে তাকে নিয়ে নানা রঙ্গরস করে। এর অর্থ হলো মিলনের জন্য তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। নর-নারীর জীবনে এটি একটি স্মরণীয় রাত।^{৮২}

ঘ. কনকাজলি উৎসব

হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে এটি কনের বিদায় অনুষ্ঠান। যা আনন্দ এবং দুঃখের মিশ্র মুহূর্ত। কারণ এতে নববধূ তার পিতা-মাতা এবং আত্মীয়দের আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় নেয় তার স্বামীর সাথে নতুন জীবন শুরু করার জন্য। নববধূকে কিছু চাল দরজার দিকে পিছনে তাঁর মায়ের শাড়ির আঁচলে তিনবার ফেলতে হয় ও বলতে হয় মা-বাবার যাবতীয় ঋণ শোধ করে দিলাম।^{৮৩} পক্ষান্তরে বৌদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান দেখা যায় না।

ঙ. গোছল বা যুক্তস্নান উৎসব

বৌদ্ধ বিবাহ উৎসবের মধ্যেই যে ছোট-খাটো অনেক উৎসব থাকে তন্মধ্যে গোছল বা যুক্তস্নান উৎসব অন্যতম। বিয়ের পরদিন সকালে বর-কনেকে যুক্তস্নান করানো হয়। এই স্নান অনুষ্ঠানকে ‘গোছল’ অনুষ্ঠানও বলা হয়।^{৮৪} বৌদি, ভগ্নিপতি, ঠাকুর মা জাতীয় লোকেরা এতে অংশ নেয়। এখানে বর-কনের কিছু করার থাকে না। তারা স্নানকারীদের হাতে জিম্মি থাকে। প্রথমে সহযোগীরা বর-কনের গায়ে জল ঢেলে দেয় পরে বর-কনে একে অপরকে স্নান করিয়ে দেয়। সে সময় অন্যরা মজা করে এবং নানা রকম হাস্যরস পরিবেশন করে। গ্রামের সাত পুকুরের জল একত্রে এক পাত্রে মিশিয়ে ঐ জল দিয়ে গোছল করানো হয়। মনে হয় প্রকৃতি এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সাত পুকুরের জল একত্র করা হয়।^{৮৫} কিন্তু হিন্দু বিবাহে এরূপ যুক্তস্নান উৎসব দেখা যায় না।

চ. শিকলী (ছি অলী) বা শৃঙ্খলী উৎসব

শিকলী (ছি অলী) বা শৃঙ্খলী উৎসব বৌদ্ধদের বিবাহ উৎসবেরই একটি অন্যতম উৎসব। স্নান সেরে বর কনে যখন ঘরের ভেতরে এক সঙ্গে বসে তখন বরের নিকটতম আত্মীয় স্বজনেরা বর কনেকে কোলে তুলে নিয়ে অর্থ এবং স্বর্ণ দিয়ে আশীর্বাদ করে। একে শিকলী (ছি অলী) বা শৃঙ্খলী উৎসব বলা হয়। সর্বপ্রথম মা ছেলেকে এবং পুত্র বধূকে কোলে নিয়ে ছেলেকে মর্যাদাবান, ঐশ্বর্যবান এবং বধূকে পুত্রবধূ হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করে।^{৮৬} পক্ষান্তরে হিন্দু বিবাহে এধরনের লোকাচার লক্ষণীয় নয়।

ছ. পিণ্ডদান উৎসব

বিবাহ উৎসবের মধ্যে পিণ্ডদান উৎসবও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট অতি জনপ্রিয়। বিবাহের পরদিন দুপুরে ভিক্ষুদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করা হয় এবং পিণ্ডদান করা হয়। নবদম্পতি নিজ হাতেই ভিক্ষুদের পরিবেশন করে। পিণ্ডদানের পর শীল গ্রহণ করা হয়। নবদম্পতি নিজ হাতে ভিক্ষুদের দক্ষিণা দেয়। ভিক্ষুরা সূত্র পাঠের মাধ্যমে তাদের সুখী দীর্ঘজীবন কামনা করেন।^{৮৭} বিবাহের পর বর ও কনের ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার কামনায় ভিক্ষুদের আমন্ত্রণের মাধ্যমে বৌদ্ধরা পিণ্ডদান উৎসব পালন করে।

জ. দ্বিরাগমন (মাডিহোড়ানী) উৎসব

বৌদ্ধদের বিবাহ উৎসবের মধ্যে দ্বিরাগমন (মাডিহোড়ানী) উৎসবও অন্যতম। বিবাহের পরদিন বিকেলে, সন্ধ্যা অথবা রাত্রে বর তার নব পরিণীতাকে নিয়ে বন্ধু-বান্ধবসহ কনের বাপের বাড়িতে আগমন করে। সে সময় বরের সাথে বন্ধু ভগ্নিপতি বৌদিরা ছোট ভাই-বোন, ঠাকুরদা এবং ঠাকুরমা সম্পর্কিত ব্যক্তির সহগামী হয়। এতে পিতৃস্থানীয়-মাতৃস্থানীয় কেউ যায় না। বর সে রাত্রে কনের বাড়িতে সহগামীসহ অতিবাহিত করে। পরদিন বিকেলে আবার নিজের বাড়িতে সহগামী হয়ে ফিরে আসে।^{৮৮} কনের বাড়িতে বান্ধবীরা, বৌদিরা, ভগ্নিপতিরা, ভাই বোনেরা অতিথিদের স্বাগত জানায়। আনন্দে উৎসবে সমস্ত বাড়ি ভরে যায়। অনেকেই বরকে দেখার জন্য আগমন করে। নানা ধরনের পিঠা ও উত্তম খাদ্য পরিবেশিত হয়। বরের শালা, শালীরা বরকে নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকে। শশুরালয় থেকে পিত্রালায়ে যাওয়ার পূর্বে বধূকে শাশুড়ীর অনুমতি নিতে হয়।^{৮৯} পক্ষান্তরে হিন্দুবিবাহের সাথে এখানেই বৌদ্ধ বিবাহের বৈচিত্র্য, হিন্দু বিবাহ হয় কনের বাড়িতে। আর বৌদ্ধ বিবাহ হয় বরের বাড়িতে। তাই দ্বিরাগমন উৎসবটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ঝ. জামাইভাতা বা নদিন্যা উৎসব

জামাইভাতা বা নদিন্যা উৎসবও বৌদ্ধদের দ্বারা পালিত বিবাহ উৎসবের অন্যতম। এই উৎসবটি উদযাপিত হয় কন্যার বাড়িতেই। বিবাহের নয়দিন পর বধু তার পিত্রালয়ে যায় এটা তার প্রথম নাইয়র। এটা কখনও ১৫/২০ দিনের হয়। বধু পিত্রালয়ে যাওয়ার পর কন্যাপক্ষের আমন্ত্রণে নির্দিষ্ট দিনে বর বধুকে আনার জন্য বন্ধুসহ কনের বাড়িতে যায়। তখন বরের পক্ষ থেকে আগত মেহমানদের খাওয়ানো তথা উৎসব উদযাপন করা হয়। যার নাম জামাইভাতা নদিন্যা তথা নদিন্যা উৎসব।^{১০}

৭. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে বিবাহ উৎসব দুইটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অংশ। তবে তাদের বিবাহ উৎসব অনেকদিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও জাতিভেদ ও অঞ্চলভেদে এই রীতি কিছু পরিবর্তিত হয়। মৌলিক আচারগুলো অঞ্চল, ধর্ম, বর্ণ বা উপবর্ণ ভেদে এক এক প্রকার হয়। হিন্দু বিবাহে নানা রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক ঐক্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বিবাহে আত্মিক ও পার্থিব ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থাকে, যেখানে ধর্মীয় বিভিন্ন রীতিনীতি, মন্ত্রপাঠ ও পারিবারিক ঐতিহ্য প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে, বৌদ্ধ বিবাহ সাধারণত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে তুলনামূলকভাবে কম ধ্রুপদী হয়। এখানে জীবনবৃত্তান্তের উন্নতি ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৌদ্ধ বিবাহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা হয়। এমনকি সম্পর্ককে পবিত্র ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। দুই ধর্মের বিবাহ উৎসবের মধ্যকার মূল পার্থক্য হচ্ছে আচার-অনুষ্ঠানের ধর্মীয় গুরুত্ব এবং ঐতিহ্যগত গুরুত্ব। হিন্দু বিবাহের ন্যায় বৌদ্ধ বিবাহেও সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব থাকে কিন্তু ধর্মীয় রীতির ভিন্নতা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক। সুতরাং এই তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, বিবাহ শুধু একটি সামাজিক অনুষ্ঠানই নয় বরং এটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি অঙ্গও।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ইবন হাযম আল-আন্দালুসী, *কিতাবুল-ফিসাল ফিল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* (কায়রো: মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৭৫-৭৬; প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত, *ধর্ম দর্শন* (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৪৪২-৪৪৩।
- ^২ ড. আহমাদ শালাবী, *মুকাদ্দারাতুল আদইয়ান: আদইয়ানুল-হিন্দ আল-কুবরা*, (মিসর: মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৯৭), পৃ. ৪৩।
- ^৩ প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত, *ধর্ম দর্শন, তদেব*, পৃ. ৪৪৪
- ^৪ প্রতিমা ব্যোভজ, *হিন্দু ধর্মের স্বরূপ* (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৩
- ^৫ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩৫৪
- ^৬ Joel D. Beversluis, *A Source Book for Earths Community of Religions* (New York: Global Education Associates, 1995), p. 40.
- ^৭ স্বামী বিশ্ব শিবানন্দ গিরি, *হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা* (কলিকাতা: আনন্দ বুক হাউজ, তা.বি.), পৃ. ১০।
- ^৮ প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত, *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫; *Encyclopedia of Religion and Ethics* বলা হয়েছে- *Hinduism* is the title applied to that form of Religion which prevails among the vast majority of the present population of the Indian Empire. Cf. *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. 6, P. 686; এ প্রসঙ্গে Archib J. Baham বলেন, *Hinduism* is of outstanding significance to the student of Religion because it combine so many durable characteristics in superlative ways. Cf. *The World Living Religion*. p. 51.
- ^৯ মো: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, চতুর্দশ খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ও এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৭২।
- ^{১০} ড. আহমাদ শালাবী, *মুকাদ্দারাতুল আদইয়ান: আদইয়ানুলহিন্দ আল-কুবরা*, তদেব, পৃ. ৪৩।
- ^{১১} ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৫৬।
- ^{১২} ড. এফ এম এ এইচ তাকী, *ধর্মের ইতিহাস* (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০১৮), পৃ. ১৬৯; আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার ও আব্দুল কাদের, *তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা* (ঢাকা: ইউ.জি.সি. ২০১৪), পৃ. ২৪৬।
- ^{১৩} Ganga Somany, *World Religions* (India: O.M. Somany Charity Trust, 1995), p. 12.
- ^{১৪} ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *বিশ্বে প্রচলিত ধর্মমত* (রাজশাহী: রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ২৭৩; ড. রোমিলা খপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (কলিকাতা : ঘোষ এন্ড ব্রাদার্স, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১১-১২।
- ^{১৫} ড. আহমাদ শালাবী, *আদইয়ান আল হিন্দ আল-কুবরা*, পৃ. ৯৯।
- ^{১৬} তদেব, পৃ. ৪৩।

- ^{১৭} নাসির ইবন আব্দুল্লাহ আল-কাফারী ও নাসির ইবন আব্দিল কারীম আল আকল, *আল-মু'জায ফীল-আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব আল-মু'আসারাহ* (রিয়াদ: দারুস সুমই'য়ী লিননাশার ওয়াত-তাওয়া, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৮-২০; মো: আবদুল ওদুদ, *ধর্মদর্শন* (ঢাকা: মনন পাবলিকেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০১১), পৃ. ৩১১।
- ^{১৮} Michael Pye, *Comparative Religion* (Great Britain: Britol Typesetting Company limited, 1972), p. 8; Arnold Toynbee, *An Histrian's Approach to Religion* (London: Oxford University Press, 1959), pp. 311-316; A. C. Bouquet, *Comparative Religion* (Great Britanin: Penguin Books Books Ltd., 1954, p. 12; *Studies in Buddhism*, pp. 50-51; Horidas Chaudhuri, *Modern Man's Religion* (New Delhi: Scutf Asian Publication PVT Ltd., 1966), p. 73; William James, *The Zarities of Religions Experience* (London: Langmans and Green and Company, 1952), pp. 25-28.
- ^{১৯} ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৬৮।
- ^{২০} What is Buddhism: The Buddhist centre, <https://thebuddhistcentre.com/buddhism>
- ^{২১} আব্দুর রায়হাক আল-আসওয়াদ, *মাদখাল ইলা দিরাসাতিল আদইয়ান* (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২০০৫), পৃ. ৭।
- ^{২২} *কিতাব আল-ফাসল ফীল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, পৃ. ৭৫-৭৬; ড. আব্দুর রহমান আমীরী, *আল-মাযাহিব আল-মু'আসারাহ ওয়া মাওকুফ আল-ইসলাম মিনহা* (বৈরুত: দারুল-জাবাল, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রী), পৃ. ৬০-৬২
- ^{২৩} মো: আবদুল ওদুদ, *ধর্মদর্শন*, পৃ. ৩১১-৩১২।
- ^{২৪} জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০১), পৃ. ৪-৫।
- ^{২৫} ড. মো. শাজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি* (ঢাকা: দিকদিগন্ত, ২০০৯), পৃ. ২১৩; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বৌদ্ধধর্ম* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৯-৩০।
- ^{২৬} Kader Nath Tiwari, *Comparative Religion* (Delhi: Motilal Banarasidass, 1992), p. 43.
- ^{২৭} ড. মুস্তফা হিলমী, *ইসলাম ওয়াল আদইয়ান* (কায়রো: দারুল ইবন আল-জাওয়া, ২০০৫), পৃ. ১১৩; ড. সুকোমল চৌধুরী, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম দর্শন* (কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪০৫ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৮।
- ^{২৮} ড. এফ এম এ এইচ তাকী, *ধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ১৭৭; A. C. Bouquet, *Comparative Religion* (Great Britanin: Penguin Books Books Ltd., 1954, p. 12, *Studies in Buddhism*, pp. 5-51; Horidas Chaudhuri, *Modern Man's Religion* (New Delhi: Scutf Asian Publication PVT Ltd., 1966), p. 73; William James, *The Zarities of Religions Experience* (London: Langmans and Green and Company, 1952), pp. 25-28.
- ^{২৯} শুভেন্দু বিশ্বাস ও মিতুন সরকার, *নিরাপদ বিবাহ কার্যক্রম* (প্রকাশনা: অনন্যা, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ^{৩০} Ferguson, S. (2019). *Sociology: A Down-to-Earth Approach*. Pearson. Schwartz, S. J., & Scott, J. E. (2020). Marriage. In A. C. Michalos (Ed.), *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*, pp. 317-321.
- ^{৩১} Mack, S. (2018). *Celebrations around the world: A multicultural handbook*, ABC-CLIO, p. 23
- ^{৩২} Cohen, E.H. (1992), *The Celebration of Society: Perspective on Contemporary Cultural Performance* Routledge. Turner, V. (2017). Festivals. In R. A. Barnouw, J. L. Kahn, & C. A. Moore (Eds.), *The Anthropology of Experience*, University of Illinois Press. p. 72.
- ^{৩৩} https://bn.wikipedia.org/wiki/বিবাহ_উৎসব Accessed on 06 February, 2024
- ^{৩৪} Smith, J. (2018). *The Cultural Significance of Marriage Festivals*, Oxford University Press. p. 37
- ^{৩৫} Brown, A., & Lee, C. (2021). Marriage Festivals: A Cross-Cultural Perspective. In S. Johnson (Ed.), *Celebrating Love: Rituals and Traditions Around the World*, Cambridge University Press. p. 112.
- ^{৩৬} *বাংলাপিডিয়া*, নবম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
- ^{৩৭} *তদেব*।
- ^{৩৮} *তদেব*।
- ^{৩৯} *তদেব*, পৃ. ৩৪১।
- ^{৪০} Nagendra KR Singh, *Internatioanl Encyclopeadia of Buddhism*, Vol- 35 (New Delhi: Anmol Publication Ltd., 1997), pp. 5287-5292.
- ^{৪১} E.B. Tylor, *Religion in Primitive Culture*, 1st part (New York: Harpean Roy Publication, 1963), p. 385.
- ^{৪২} *Ibid*, p. 386.
- ^{৪৩} *বাংলাপিডিয়া*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
- ^{৪৪} *The Encyclopaedia of Religion*, Vol-15, (New York: Millan Publications Company, 1987), p. 467.
- ^{৪৫} *বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন*, পৃ. ৭১; *The Elimentary Forms of the Religions Life*, pp. 90- 95; *Religion in Primitive Culture*, pp. 300-312.
- ^{৪৬} Edward Conze, *Buddhism: Its Essence and Development* (New York: Harper and Row Publishers, 1982), pp. 223; *An Histrian's Approach to Religion*, pp. 111-112.
- ^{৪৭} ড. আহমাদ শালাবী, *আদইয়ান আল-হিন্দ আল-কুবরা*, পৃ. ৯৯।
- ^{৪৮} আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি* (নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৯।
- ^{৪৯} শ্রী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, *বৌদ্ধদের দেবদেবী* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৯২ বঙ্গাব্দে), পৃ. ১৬।

-
- ৫০ বাংলাপিডিয়া, নবম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
- ৫১ তদেব।
- ৫২ Michael Pye, *Comparative Religion*, pp. 22-25.
- ৫৩ বাংলাপিডিয়া, নবম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
- ৫৪ বাংলাপিডিয়া, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-২৪৯; *Tibal Culture in Bangladesh*, pp. 301-317.
- ৫৫ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা লোক-সংস্কৃতি*, পৃ. ৬২।
- ৫৬ তদেব, পৃ. ৬৩।
- ৫৭ *The Encyclopedia of Religion*, p. 84.
- ৫৮ শ্রী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, *বৌদ্ধদের দেবদেবী*, পৃ. ২-১৮।
- ৫৯ সদ্ধর্ম শিক্ষানীতি, প্রথম সংস্করণ (চট্টগ্রাম: তেরাগী পাহাড়, মোমিনরোড, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ/২০০১ খ্রি.), পৃ. ২২৬-২৩০
- ৬০ শশীভূষণ দাস গুপ্ত, *বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্চাগীতি* (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ প্রিন্টার্স লিমিটেড, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৩-৮৭
- ৬১ তদেব।
- ৬২ তদেব।
- ৬৩ *Encyclopaedia of Americana*, Vol-11, pp. 41-45; *Encyclopedia of World Culture*, pp. 192-195.
- ৬৪ Sir Charles Eliot, *Hinduism and Buddhism*, Vol-1 (London: Kegan Paul Ltd. 1921) pp. 27-30.
- ৬৫ *The Encyclopedia of Religion*, Vol-12, pp. 83-89.
- ৬৬ *Comparative Religion*, pp. 61-63.
- ৬৭ *Hinduism and Buddhism*, p. 85.
- ৬৮ *Ibid.*
- ৬৯ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৬০।
- ৭০ Joseph Goldstein, *The Experience of Insight: A Simple and Direct Guide to Buddhist Meditation* (Boston: Shambhala Publication, 1989), pp. 330-336.
- ৭১ *Hinduism and Buddhism*, p. 85.
- ৭২ বাংলাপিডিয়া, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-২৪৯।
- ৭৩ Burett Hillman, *The Buddha and the Christ* (London: Mae Millan and Co. Ltd., 1932), p. 80-85.
- ৭৪ Arnold Toynbee, *An Histrian's Approach to Religion*, pp. 313-314.
- ৭৫ *Ibid.*
- ৭৬ *Ibid.*
- ৭৭ James G. Lochtefeld, *The Illustrated Encyclopedia of Hindums* (2001), p. 421.
- ৭৮ *International Encyclopaedia of Buddhism*, p. 5287.
- ৭৯ Niru Kumar Chakma, *Chittagong Hill Tracts and Buddhism* (Dhaka: Parbattva Buddha Sangha. 1983), pp. 237-250; *Word Religions*, p. 190.
- ৮০ প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত, *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪৪২।
- ৮১ *The Varities of Religions Experience*, PP. 25-38.
- ৮২ *The Buddha and the Christ*, pp. 5-6.
- ৮৩ প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত, *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪৪৩।
- ৮৪ সদ্ধর্ম শিক্ষানীতি, পৃ. ২২৫-২৩০; *The Encyclopedia of Religion*, p. 85.
- ৮৫ *The Encyclopedia of Religion*, p. 86.
- ৮৬ সদ্ধর্ম শিক্ষানীতি, পৃ. ২২৫-২৩০।
- ৮৭ Beni Madhab Borua, *Studies in Buddhism* (Calcutta: Saraswat Library, 1974), pp. 50-51.
- ৮৮ বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃ. ৬-১০।
- ৮৯ *Encyclopaedia of Britannica*, Vol-26, p. 566.
- ৯০ *Ibid.*

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর রচনাবলি : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন [The Works of Professor Dr. Muhammad Shafiqullah: Review and Evaluation]

মো. মোস্তফা নূর ইসলাম*

[Abstract: Professor Dr. Muhammad Shafiqullah is a name, a history. When talking about Islamic education in Bangladesh, his name comes up. He was a muhaddith, mufassir, faqih, Arabic linguist, eminent Islamic thinker and a shining star in the field of Islamic knowledge. He was especially well-known as an exemplary teacher, eminent researcher, eminent writer and eloquent speaker. His life is as busy as it is varied at the same time. He can be called the reformer of the era for his unique contribution in guiding the country and nation, spreading Islamic education and teaching. Dr. Shafiqullah has left an outstanding contribution in his long teaching career. People like him are rare in the field of education and culture. Besides teaching, he was a unique personality in research, book writing and essay writing. He has written 22 published and unpublished books and 150 articles. He was an author of the National Curriculum book 'Islam and Moral Education', which was taught in classes VI to X. Bengali speaking readers can be expected to benefit more if a research based on review and evaluation of the writings of such a scholar is prepared. For this reason, in the discussion article an attempt has been made to review and evaluate the works of Dr. Muhammad Shafiqullah.]

Keywords: Works of Professor Shafiqullah, Review, Evaluation.

১. ভূমিকা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার কথা বলতে গেলে তাঁর নাম চলে আসে। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, আরবী ভাষাবিদ, দেশবরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশেষ করে আদর্শ শিক্ষক, প্রাজ্ঞ গবেষক, বিশিষ্ট লেখক ও সুবক্তা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবন একই সাথে যেমন কর্মবহুল, তেমনি বৈচিত্র্যময়। দেশ ও জাতির পথপ্রদর্শন, ইসলামী শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে নির্দিষ্ট যুগ সংস্কারক বলা চলে। ড. শফিকুল্লাহ সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে তাঁর মতো ব্যক্তি বিরল। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি গবেষণা, গ্রন্থ রচনা ও প্রবন্ধ রচনায় ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি এবং প্রবন্ধের সংখ্যা ১৫০টি। তিনি জাতীয় পাঠ্যক্রম পুস্তক 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' গ্রন্থের একজন লেখক ছিলেন, যা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করানো হতো। এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির রচনাবলি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নভিত্তিক গবেষণাকর্ম প্রণীত হলে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দ আরও বেশি উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। এ কারণে আলোচ্য প্রবন্ধে 'ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর রচনাবলি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন' বিষয়ক আলোচনা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর রচনাবলি

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ছিলেন একনিষ্ঠ শিক্ষক ও গবেষক। তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ঘটে। ভাষাবিদ ড. শফিকুল্লাহর পাঁচটি ভাষা তথা বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজিতে সমান দখল ছিল। তিনি যে বিষয়ে কলম ধরতেন, তা যেমন হতো যুক্তিপূর্ণ তেমনি হতো তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর।

* পিএইচডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যে শুধু শিক্ষাদান করেছেন তা নয়, বরং তিনি লেখনীর জগতেও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার উপর তাঁর ক্ষুরধার লেখনী এদেশে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধন করেছে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর বহু পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা এখনো অপ্রকাশিত। তিনি যখন কোনো বিষয়ে লেখার ইচ্ছা করতেন, তখন উক্ত বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো আগে সংগ্রহ করে টেবিলে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করতেন। তারপর লেখা আরম্ভ করতেন। ফলে দেখা যেতো যে, তার লেখার সময় কোনো কাটাকাটি, র‍াফ বা ফেশের প্রয়োজন হতো না। একবারেই লিখে সম্পন্ন করতেন। তিনি বাংলায় অনূদিত বা বাংলা ভাষায় রচিত উপাত্ত-উপকরণ থেকে খুব কম তথ্যই গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, ‘বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এগুলোর অনুবাদক খুব প্রাজ্ঞ ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে প্রিন্টিং মিসটেকও থেকে যায়। তাই আমি মূল আরবী গ্রন্থকেই আমার লেখার উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করে থাকি।’ তাইতো এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি ছিলেন একাধারে একজন সুলেখক^১, অনুবাদক^২, শিক্ষক^৩ এবং ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে একটি প্রতিষ্ঠান স্বরূপ।

প্রকৃত ইসলামী জীবন-যাপন করলে মানুষ সুস্থ, জ্ঞানী, উন্নত এককথায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে। ইসলামের এ সার্বজনীন মাহাত্ম্য তুলে ধরে সুন্দর জীবন রচনায় এর মহিমাযিত ভূমিকা কতদূর প্রভাব সঞ্চারী হতে পারে তিনি তাঁর রচনায় তা গভীরতা ও আন্তরিকতা নিয়ে উপস্থাপন করেছেন। পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান^৪ হিসেবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রয়োগ ও বিকাশের লক্ষ্যে তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহুসংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেন। মূলত ১৯৯০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ২১ বছরে তিনি যা রচনা করেছেন, তার মধ্যে যা প্রকাশ হয়েছে তার চেয়ে অপ্রকাশিতের পরিমাণ বেশি। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। নিজে শত প্রচারবিমুখ হলেও কালের আবর্তে জাতি তাঁর মূল্যায়ন করেছে। তিনি মনে করতেন প্রকাশনা হলো কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর জাতীয় চেতনা, কৃষ্টি, আদর্শ, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রচারের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এটি জাতি গঠনের চালিকাশক্তিও। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ইসলামী শরী‘আতের কার্যক্রম, ইসলামী ভাবধারায় সেবামূলক সংগঠন-সংস্থা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি গ্রন্থ, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। তাই তিনি ধর্মীয় আদর্শিক প্রকাশনাকে বলিষ্ঠ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনঃজাগরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংস্থাটি তাঁর মায়ের নামের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখে নামকরণ করেন ‘আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া’। এ প্রকাশনা সংস্থা থেকে ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর পাঁচটি গ্রন্থ, বড় পুত্র ড. মাহবুবের চারটি গ্রন্থ, ড. মাসুম আলীর একটি গ্রন্থসহ মোট দশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে ‘উলুমুল কুরআন, ১ম খণ্ডটি পাঁচবার, হাদীসশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত তিনবার, কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিন জাতি ও ইবলীস তিনবার, সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা আওনুল বারী একবার এবং গুরুতুল আইম্মতিস্-সিন্তাহ্ একবার প্রকাশিত হয়।

ড. শফিকুল্লাহ ছিলেন একজন সুলেখক। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রচনায় তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উলুমুল হাদীস, উসূলুল ফিক্হ, ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থ ৯টি, অনূদিত ৪টি এবং পাণ্ডুলিপি ৯টিসহ সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি। তবে তাঁর যে সকল প্রবন্ধ রয়েছে সেগুলোর কিছু সংখ্যকও গ্রন্থ আকারে সংকলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলো সংকলিত হলে গ্রন্থের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি জাতীয় পাঠ্যক্রম পুস্তক ‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’ গ্রন্থের একজন রচয়িতা, যা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে পাঠদান করা হতো। এ গ্রন্থটি ১৯৯৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সিলেবাসভুক্ত ছিল। ২০১৩ সাল থেকে নতুন আঙ্গিকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর খুব কম বিষয়ই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। তাঁর রচনাসমূহকে আমরা দুভাগে ভাগ করব। যথা- প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপি।

২.১ ক. প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সাতটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ও একটি অর্ধাংশ। গ্রন্থগুলো হাদীস, তাফসীর, উলূমুল কুরআন ও জীবনী বিষয়ক। সমসাময়িক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও পাঠকমহলে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলি যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। শিক্ষকতার জীবনে তিনি মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন বিধায় হাদীসশাস্ত্রের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি হাদীসবিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত আটটি গ্রন্থের মধ্যে ছয়টি গ্রন্থই হাদীস বিষয়ক। নিম্নে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হলো:

১. ইমাম তাহাভী র. জীবন ও কর্ম

গ্রন্থটি হাদীস বিষয়ক। গ্রন্থটি মূলত তাঁর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ। এর শিরোনাম ছিল “ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান”। গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন সম্পর্কে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বলেন,

“বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী ফিকহের অনুসারী। ফলে অনেক দিন থেকেই ইমাম তাহাভীর ইসলামী গবেষণা পদ্ধতির ব্যাপক বিশ্লেষণের অভাব অনুভব করা হয়। সেই অভাব পূরণের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিশিষ্ট গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর “ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি “ইমাম তাহাভী র. জীবন ও কর্ম” শিরোনামে প্রকাশ করে।”

গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫+৩৪৪=৩৫৯। এটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৪ খ্রি./রজব ১৪২৫ হিজরী। তৃতীয় সংস্করণ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি পাঠক সমাজের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে গ্রন্থটি দুবার পুনঃমুদ্রণ করা হয়। তৃতীয় সংস্করণও শেষ হয়ে যাওয়ায় চতুর্থ সংস্করণের জন্য গ্রন্থটি অপেক্ষায় রয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. ছিলেন হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ হাদীসশাস্ত্রবিদ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময় সিহাহ সিতাহ সংকলকগণ নিজ নিজ পদ্ধতি ও শর্তানুসারে হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁদের প্রখ্যাত গ্রন্থসমূহ সংকলন করেন। এ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান মাপকাঠি ছিল ‘ইসনাদ’। ফলে হাদীসের মতনের তুলনায় ইসনাদের প্রতিই তাঁরা অধিক গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু তাহাভী র. এক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ও অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি সনদের সাথে সাথে মতনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ‘আহকাম’ সম্বলিত সকল হাদীস একত্রে সন্নিবেশ করে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করেন। হানাফী মাযহাব সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বী আলিমগণ অভিযোগ করে বলে থাকেন যে, এ মাযহাবের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত; হাদীসের উপর নয়। ইমাম তাহাভী র. এসব অভিযোগ খণ্ডনে সহীহ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হাদীস উপস্থাপন করেন। কিছু কিছু হাদীস বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী হওয়ায় একদল লোক হাদীসকে শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইমাম তাহাভী র. দুর্বীর দুঃসাহস নিয়ে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রমাণ করেন যে, তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া এতে আরও রয়েছে ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়ে ইমাম তাহাভী র.-এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম তাহাভী র.-এর জীবনী স্থান লাভ করেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ইমাম তাহাভী র.-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সম্পর্কে বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম তাহাভী র.-এর অবদান। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ইমাম তাহাভী র.-এর অবশিষ্ট অবদান। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রবিদ এবং ইমামগণের দৃষ্টিতে ইমাম তাহাভী র.।

কুরআন এবং হাদীস থেকে অতি সূক্ষ্মভাবে আহকাম উদ্ভাবন (ইস্তিহ্বাত) করার ক্ষেত্রে ইমাম তাহাভী র. ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি হাদীসের একজন ইমাম, হুজ্জাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত রাবী। আর হাদীস বর্ণনা, রিজালশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, অধিক শিক্ষকমণ্ডলী থেকে হাদীস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী র.,

ইমাম মুসলিম র. প্রমুখ সিহাহ সিদ্দাহ্ গ্রন্থ সংকলকের সমপর্যায়ের। তিনি একই বিষয়ে বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করে জটিল ২৩ দুরূহ হাদীসের ভাব ও অর্থ সহজতর করে তোলেন। ফিক্‌হশাফেও তিনি ছিলেন একজন ইমাম। ইবন হাজার আসকালানী র. তাঁর ‘আবনাউল গুমার’ গ্রন্থে ইমাম তাহাভী র.-কে পূর্ণাঙ্গ হাফিয উপাধিতে ভূষিত করেন। কারণ, তিনি ছিলেন হাদীস এবং ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী। এই দুই বিষয়েই তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে।

২. ‘উলূমুল-কুরআন (১ম খণ্ড)

‘উলূমুল কুরআন বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিরচিত ২০৬ পৃষ্ঠার এ অনন্য সাধারণ গ্রন্থটি ‘আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া’, রাজশাহী থেকে ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৮, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৪ খ্রি., ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৮ খ্রি. এবং সপ্তম মুদ্রণ ২০২০ খ্রি.। গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়গুলো ১৩টি বিষয়ে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটিতে ভূমিকা, গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থকার পরিচিতি রয়েছে। এটি ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ডটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। গ্রন্থকার এটি রচনায় প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটি সকল স্তরের পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দের নিকট সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। আমাদের জানা মতে বাংলা ভাষায় উলূমুল কুরআন বিষয়ক এত উচ্চমানের আর কোনো গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়নি।

কুরআন মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান এবং পৃথিবী থেকে সকল অনাচার দূরীভূত করে পৃথিবীতে সকল মানুষের জন্য সুখকর পরিবেশ স্থাপনে কুরআনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে এর জন্য কুরআনের উপলব্ধি প্রয়োজন। আমরা সবাই কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে আগ্রহী। এর জন্য কুরআনের জ্ঞানরাজি আহরণ করা পূর্বশর্ত। আর এ প্রয়োজনের তাগিদেই উলূমুল-কুরআন তথা কুরআনের জ্ঞানমালা সম্পর্কিত গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। আরবী ভাষায় রচিত এসব গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের জন্য উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বাংলা ভাষায় রচিত উলূমুল-কুরআন গ্রন্থটি লেখকের একটি অনবদ্য অবদান। এতে উলূমুল-কুরআন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। পাশাপাশি উৎসমালার তথ্য পাদটীকায় সংযোজিত হয়েছে। সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস ওহী অস্বীকারের নামান্তর। ওহী কী? এর অবতরণ পদ্ধতি, এর প্রকার, অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন ইত্যাদি বিষয়ের মনোজ্ঞ আলোচনা এতে স্থান লাভ করেছে। মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতের প্রেক্ষাপট, বৈশিষ্ট্য, মাদানী আয়াতের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক জীবনে এগুলোর গুরুত্ব, প্রথম ও সর্বশেষ আয়াত, কুরআন নাযিলের বিভিন্ন পর্যায়, খণ্ডকারে নাযিলের রহস্য, কুরআন সংরক্ষণ, একত্রিতকরণ, গ্রন্থাবদ্ধকরণ এবং এ সম্পর্কে সমালোচকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করার উদ্দেশ্যে কুরআনে অবতীর্ণ কিছু কিছু বিধান আল্লাহ তা‘আলা রহিত করেছেন। এটাকে নুসখ বলা হয়। কুরআন অনুধাবনের জন্য বিষয়টি জানা প্রয়োজন। এমনভাবে কুরআনের রচনাইশেলী, এর অভিনবত্ব, বিজ্ঞানের নিখুঁত আলোচনা, বিশ্বসৃষ্টির মৌল প্রক্রিয়া বিষয়ে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআনে রয়েছে বহু উপমা, শপথ এবং কুরআন অস্বীকারকারীদের সাথে বিতর্ক। এসব বিষয়েও এ গ্রন্থে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা রয়েছে। এটি সকল পাঠকের জন্য একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রণয়নের কারণ সম্পর্কে প্রকাশক বলেন,

‘উলূমুল-কুরআন একটি অনন্য সাধারণ বিষয়। এতে এমন সব বস্তুর আলোচনা করা হয়, যা কুরআন বুঝতে সহায়তা করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কুরআনের অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সঠিক অর্থ নির্ধারণ-এর ওপর নির্ভরশীল। আরবী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় ‘উলূমুল-কুরআনের ওপর বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত হলেও বাংলা ভাষায় এর ওপর তেমন কোন প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচিত হয়নি। অথচ বিশ্বে বাংলা ভাষা-ভাষীগণের সংখ্যা প্রচুর। এছাড়া এ বিষয়টি বাংলাদেশের দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন স্তরে পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে এ বিষয়টি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বহু গবেষক এবং জ্ঞান পিপাসুও বাংলা ভাষায় ‘উলূমুল-কুরআন-এর ওপর একটি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।’^৬

‘উলূমুল কুরআন গ্রন্থটি কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিম্নে এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো: এক. এ গ্রন্থের প্রতিটি বিষয় প্রয়োজন অনুযায়ী খুঁটিনাটিসহ পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করা

হয়েছে। দুই. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুযায়ী সহজ-সরল ভাষায় দলীল প্রমাণ ও যুক্তিসহ আলোচনা করা হয়েছে। তিন. মতভেদযুক্ত বিষয়সমূহে বিভিন্ন মতামত উল্লেখপূর্বক সমাধান করা হয়েছে। দলীল বা যুক্তির ভিত্তিতে কখনও অত্যাধিকার নীতি বা কখনও সামঞ্জস্যনীতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। কখনো যুক্তি ও দলীলের মাধ্যমে কোনো মতকে খণ্ডন করা হয়েছে। চার. প্রশ্ন ও সন্দেহ উত্থাপিত হতে পারে, এমন বিষয়গুলো সন্দেহ বা প্রশ্নের দিক উল্লেখপূর্বক সেগুলো নিরসন করা হয়েছে। পাঁচ. অধিকাংশ বিষয়ের মূল আলোচনার প্রারম্ভে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ছয়. জাদুলুল কুরআন (কুরআনের বিতর্ক)-এর গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, অনেক বাস্তব ও প্রকাশ্য বিষয় আছে, যা মানবজাতি সহজে সত্য ও বাস্তব বলে গ্রহণ করে। এ বাস্তবতার সাক্ষ্য সমস্ত সৃষ্টি জগতও বহন করে। এগুলোর সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণের জন্য নতুন করে কোনো দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তবুও সন্দেহবাদীদের অনেকেই এমন আছেন, যাদের এ সন্দেহপ্রবণতা তাদেরকে অযথা সন্দেহের ঘোড়ায় আরোহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই সকল বিষয়ে দলীল প্রমাণের অবতারণা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কুরআনুল কারীমের আবেদন আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবতার প্রতি, এ মহাগ্রন্থ বাতিলপন্থীদের মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। আর এমন পদ্ধতিতে তাদের মোকাবিলা করেছে এবং শক্তিশালী দলীল প্রমাণ উত্থাপন করেছে যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।^৭ সাত. গ্রন্থটির কোথাও কোথাও প্রয়োজন সাপেক্ষে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- ওয়াটার সাইকেল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, আল-কুরআন অবতীর্ণের যুগে পানির গতিপথ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রকম ভ্রান্ত মতবাদ চালু ছিল। মধ্যযুগে অ্যারিস্টটলের মতো মনীষীর মতবাদ অনুসারে, ঝর্ণাধারাসমূহ পরিপুষ্ট হয়ে থাকে ভূগর্ভস্থ হৃদের পানির দ্বারা। কুরআন মাজীদ পানির গতিপথ সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করেছে আজ থেকে বহু পূর্বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَخَلَّتِ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾

“তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। ফলে উপত্যকাসমূহ প্রবাহিত হয় তাদের পরিমাণ অনুসারে। আর প্লাবন তার উপরস্থিত আবর্জনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।”^৮

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾

“তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তাকে বিভিন্ন সূত্রে জমিনের ভেতরে নেন। আর তার দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন।”^৯

আধুনিক বিজ্ঞান বহু শতাব্দী পর পানির চক্রাকার গতিপথের জ্ঞান লাভ করে। বার্নার্ড পেলিশি তাঁর নেচার অব ওয়াটার্স অ্যান্ড ফাউন্টেনস বোথ ন্যাচারাল অ্যান্ড আর্টিফিসিয়াল গ্রন্থে (প্যারিস, ১৫৭০ খ্রি.) পানির চক্রাকার গতিপথ সম্পর্কে বিশেষত বৃষ্টির পানির দ্বারা ঝর্ণাধারাসমূহ পরিপুষ্ট সাধনের বিষয়ে প্রথম নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন।^{১০} কুরআন মাজীদে আয়াত পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তার এ ব্যাখ্যা কুরআনে প্রদত্ত তথ্যের সাথে মিলে যায়।^{১১}

৩. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা আওনুল-বারী

এ গ্রন্থটি হাদীসবিষয়ক। ইমাম বুখারী র.-এর ‘সহীহুল-বুখারী’ গ্রন্থটির বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। এটি আসমানী গ্রন্থের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। আরবী ভাষায় সহীহুল-বুখারীর ৬০টির উর্ধ্বে ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ দুর্লভ। দুএকটি অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। আওনুল-বারী গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় একটি নতুন সংযোজন। গ্রন্থটিতে সহীহুল-বুখারীর বাবু বাদইল ওহী অধ্যায়ের ছয়টি হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। আরবী, উর্দু, ইংরেজি ভাষায়ও ওহী অধ্যায়ের উপর এত বড় ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত বা সংকলিত হয়নি। এছাড়া গ্রন্থটিতে ইমাম বুখারী র.-এর বিস্তারিত জীবনালেখ্য এবং তাঁর সহীহ গ্রন্থের পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে সুন্দরভাবে। এরপর হাদীসগুলোর শাব্দিক বিশ্লেষণ,

সনদে উল্লিখিত সকল রাবীর জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে। বুখারীর প্রসিদ্ধ শারহ্ গ্রন্থাবলী থেকে হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশক বলেন,

“এতে রয়েছে হাদীসের সরল অনুবাদ এবং শাব্দিক বিশ্লেষণ। ফলে আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও শব্দের অর্থ জানতে পারবেন অতি সহজে। এতে হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে প্রামাণ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ থেকে। পাদটীকায় ঐসকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। ফিক্‌হী মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণের মতামত ও তাদের দলীল বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস থেকে ইস্তিহাতকৃত বিষয় এবং হাদীসের ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে।”^{১২}

বাংলাদেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘সহীহুল-বুখারী’ গ্রন্থের পাঠদান করা হয়। ইমাম বুখারী র.-এর জীবন চরিত, তাঁর সহীহ গ্রন্থের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে সবাই আগ্রহী। বাংলা ভাষায় এরূপ বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিরল। এটি ছাত্র-শিক্ষক এবং সকল শ্রেণির পাঠকের জন্য একটি আদর্শ গ্রন্থ। গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, গ্রন্থকার এটি রচনা করতে গিয়ে কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন, কত বিন্দু রজনী অতিবাহিত করেছেন। তথ্যসূত্রে তিনি ৮০টি গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এর কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত সবগুলোই আরবী ভাষায় হাদীসের গুরুত্ব ও রিজালবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১২। এটি সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি./১৪২৫ হি. প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি পাঠে পাঠক-পাঠিকা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ কোন্ পর্যায়ে মুহাদ্দিস ছিলেন এবং হাদীস পাঠদানে তাঁর কী পরিমাণ দক্ষতা ছিল। তিনি গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম বুখারী র. পর্যন্ত সনদেরও বর্ণনা প্রদান করেছেন, যা হাদীস বিশারদগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আওনুল বারী গ্রন্থটি কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাষ্যর। এসব বৈশিষ্ট্য একে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। নিম্নে এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো: হাদীসের মূল ইবারত উল্লেখকরত বঙ্গানুবাদ, হাদীসের রাবী পরিচিতি, হাদীসের শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ, ইমামগণের ফিক্‌হী অভিমত ও তাদের উপস্থাপিত দলীল পেশ, হাদীস সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর, হাদীস থেকে ইস্তিহাতকৃত মাসআলা ও হুকুম পেশ, হাদীসের ফায়দা উদ্ধৃতকরণ, সনদ সম্পর্কে আলোচনা, বাবে উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল, হাদীসের স্তর বা মান নির্ণয়, হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন হাদীসের মাঝে সমন্বয় পদ্ধতি, বিভিন্ন বর্ণনায় হাদীসের শব্দগত ভিন্নতা উদ্ধৃত করা, ব্যাকরণগত দিক উল্লেখ করা, বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক উল্লেখ, একই হাদীসের অন্যান্য উৎসের বিবরণ পেশ, হাদীসে উল্লিখিত ফেরেশতার পরিচয় পেশ, হাদীসের বাক্যের মধ্যে সংযোগ নির্ণয়, হাদীসে উক্ত বিভিন্ন নাম, স্থান ও বংশ পরিচয় পেশ করা, ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কে আলোচনা, গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সংযোজন, তথ্যসূত্রের ব্যবহার, গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ ইত্যাদি।

৪. কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিন জাতি ও ইবলীস

বহুকাল পূর্ব থেকে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে মানুষ জিন-পরীর কথা মুখে মুখে উচ্চারণ করে আসছে। কিন্তু কুরআন হাদীসে এ বিষয়ের আলোচনা আছে কি না? সে সম্পর্কে অনেকের বিরাগ ধারণা ছিল। তারা মনে করত, কুরআন হাদীসে জিন বিষয়ে কোনো আলোচনা বিদ্যমান নেই। এরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তিমূলক বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন হাদীসের নিরিখে ড. শফিকুল্লাহ্ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি রচনায় তিনি ৩৭টি গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেন। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি করেছে। এটি মার্চ ২০০২ মতান্তরে যিলহাজ্জ ১৪২২ প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮ এবং তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪ খ্রি.। ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থে ‘জিন’ বিষয়ক লেখাটিও তাঁরই। এটি ১১শ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

জিন আল্লাহ্ তা‘আলার একটি বিশেষ সৃষ্টি। পূর্ণ কুরআন জুড়ে রয়েছে তাদের আলোচনা। মানুষের পূর্বে পৃথিবীতে ছিল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। মানুষের মতো তাদেরও হিসাব হবে। তারা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। পৃথিবীই তাদের আবাসস্থল। তারা কখনো কখনো মানুষের ক্ষতি সাধন করে। তারা সকল নবীর যুগ লাভ করেছে। তাদের শারীরিক গঠন, ক্ষমতা ইত্যাদি বিচিত্র। সাপের আকৃতিতে তারা কখনো কখনো আমাদের গৃহে আসে। জিনরা দৃশ্যমান নয় বলে তাদের বিষয়টি রহস্যবৃত।

ইবলীসের নাম আযাযীল। তাকে অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে ফেরেশতাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না? এ নিয়ে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। অহংকারের কারণে তার পতন হয়েছে। তার অনুসারীর সংখ্যা অগণিত। মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল সর্বত্র প্রসারিত। সকলের অন্তরে ও মনের মুকুরে তারা অপ্রতিরোধ্য গুঁড় দিয়ে আক্রমণ করে। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়? সে সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বইটি সকল স্তরের মানুষের জন্য উপকারী।

৫. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী র. ও তার জামি'

ইমাম বুখারী র. হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করে বহুসংখ্যক মুহাদ্দিসের নিকট গমন করে হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ছয় বছর বয়সেই তিনি আল-কুরআনুল কারীম মুখস্থ করেন। কৈশোর বয়সেই তিনি সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেন। তিনি নিজেই বলেন, “আমার এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দুলক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ আছে।” ইমাম বুখারী র. প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে ‘সহীহুল-বুখারী’ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ গ্রন্থে তাকরারসহ ৭২৭৫টি হাদীস রয়েছে। তাকরার ছাড়া হাদীসের সংখ্যা ৪০০০টি। সহীহুল-বুখারী গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো: এতে তরজমাতুল বাব রয়েছে, যা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে নেই। এতে ২২টি ছুলাছিয়াত হাদীস রয়েছে। তিনি অত্যন্ত আবিদ, যাহিদ, মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। এ গ্রন্থটির স্থান কুরআনের পরপরই। জমহুর আলিমগণের মতে, **صَحِّحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَحْتَ السَّمَاءِ صَحِّحُ الْبُخَارِيِّ** “আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নীচে সর্বাধিক বিশ্বুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহুল-বুখারী।” এমন একজন হাদীসের ইমাম ও সহীহুল-বুখারীর মতো একটি গ্রন্থ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তথ্যবহুল ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা হয়নি। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ “মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী র. ও তার জামি'” শিরোনামে গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে লেখক ৫৪টি মৌলিক গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+৯২=১০২। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রকাশক বলেন,

“ইমাম বুখারী র.-এর আল-জামি গ্রন্থখানা হাদীসশাস্ত্রের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এতে শুধু হাদীসেরই সমাবেশ ঘটেনি, বরং এটিকে বহুবিধ জ্ঞানের খনি বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনামে গচ্ছিত আছে শরী‘আতের বিবিধ ইলমের দিক-নির্দেশনা। এর শিরোনামের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ রচিত মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী র. ও তার জামি' শীর্ষক শিরোনামের আলোচ্য গ্রন্থে ইমাম বুখারী র.-এর অনবদ্য সংকলন আল-জামি' আস্-সহীহ গ্রন্থের শিরোনামগুলোর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া, আলোচ্য গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী র.-এর জীবন পরিক্রমা, আল-জামি' আস্-সহীহ-এর পর্যালোচনা এবং আল-জামি' আস্-সহীহ-এর তরজমাতুল বাবের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।”^{১৩}

প্রকাশকের কথা পরবর্তীতে সত্যিই বাস্তবে পরিণত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই এর সকল কপি শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে এর কোনো কপি পাওয়া যায় না। আশা করা যায় এটি পুনঃমুদ্রণ হলে পাঠকগণ এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

আল-কুরআনের তাফসীর বিষয়ক রচনাবলি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য রেখে গেছেন এক অনন্য সাধারণ তাফসীর গ্রন্থ ‘বাংলা ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর’। তিনি সূরাহ ইয়াসীন, সূরাহ আল-ফাতহা, সূরাহ আর-রহমান, সূরাহ আল-ওয়াকি‘আহ ও সূরাহ আন-নূর এর তাফসীর রচনা করেছেন। সূরাহ নূরের তাফসীরটি ১৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখার পর তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাফসীর অভিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি প্রশংসনীয়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো বিভিন্ন মৌলিক তাফসীর গ্রন্থের সমন্বয়ে লিখিত হওয়ার কারণে এগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর তাফসীরগুলো বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনন্য

অসাধারণ অবদান হিসেবে গণ্য করা যায়। তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম, *تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ* (বাংলা ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর)। এ তাফসীর গ্রন্থগুলো তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তিনি এ গ্রন্থগুলো তার চাকরি জীবনের প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রফিটের অর্থ দিয়ে ছাপানোর জন্য তার বড় পুত্র প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানকে অসিয়াত করে যান। ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ র. আল-কুরআন ও আল-হাদীসে বর্ণিত অসিয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করত তাঁর মৃত্যুর পূর্বের দিন (২৬.০৫.২০১১) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন পুত্র, কন্যা ও সহধর্মিণীর উপস্থিতিতে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানকে অসিয়াত করে বলেন, ‘আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রফিটের টাকা দিয়ে আমার লিখিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করবে।’^{১৪} তার অসিয়াত অনুযায়ী প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থ এক হাজার কপি করে ছাপানো হয়। এগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। তাঁর রচিত তাফসীরগুলো নিম্নরূপ:

৬. সূরাহ ইয়াসীনের তাফসীর

সূরাহ ইয়াসীনের তাফসীর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ র. কর্তৃক প্রণীত অন্যতম একটি তাফসীর। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে তাফসীর শুরু করেছেন এভাবে, *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَفْسِيرُ سُورَةِ يَسَ بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ مَعَ تَحْقِيقِ الْأَلْفَاظِ*। গ্রন্থটির শুরুতে প্রথমে তিনি সূরাহ ইয়াসীন অবতীর্ণের স্থান, নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক, বিষয়বস্তু ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তারপর তিনি আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখকরত বাংলা সরল অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন। যেমন, *سُورَةُ يَسَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ.* ‘সূরাহ ইয়াসীন। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (সূরাহ ইয়াসীনের তাফসীর শুরু করলাম)। ইয়াসীন! শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।’ এরপর শব্দার্থ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তারপর আয়াতের বা আয়াতাত্মক তাফসীর উপস্থাপন করেন। উক্ত সূরার তাফসীর সমাপ্ত করে তিনি বলেন, *تَمَّ بِعَوْنِ اللَّهِ تَفْسِيرُ سُورَةِ يَسَ*। এরপর ডান পার্শ্বে নিচে তাফসীর রচনা সমাপ্তির বাংলা, ইংরেজি ও আরবী তারিখ এবং দিনের নাম উল্লেখ করেন; ২৫ নভেম্বর, ২০১০, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৭, ১৮ ফিলহাজ্জ, ১৪৩১ হিজরী, রোজ বৃহস্পতিবার। গ্রন্থটি জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক জমাদিউল আওয়াল, ১৪৪১ হিজরীতে ‘আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া’ বিনোদপুর, রাজশাহী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রকাশক বলেন,

“প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ র. রচিত ‘সূরাহ ইয়াসীনের তাফসীর’ গ্রন্থটি বিভিন্ন ধরনের তাফসীরের সমন্বয়ে রচিত হওয়ায় এতে সব ধরনের বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। ফলে এতে গ্রন্থকার প্রয়োজন অনুযায়ী আল-কুরআন, আল-হাদীস, সাহাবী ও তাবীঈগণের অভিমত এমনকি আরবী ভাষাভাষীদের বাক-রীতি থেকে গৃহীত অর্থের মাধ্যমেও তাফসীর করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে আরবী কবিতাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কতিপয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আলোকে তাফসীর করেছেন এবং শব্দের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরবী অভিধানসমূহ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই সার্বিকভাবে বলা যায় যে, বাংলা ভাষায় প্রণীত এ তাফসীর গ্রন্থটি এক অতীব চমৎকার তাফসীর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।”^{১৫}

৭. সূরাহ আল-ফাতহের তাফসীর

গ্রন্থকার তাঁর পাণ্ডুলিপিতে পৃষ্ঠার উপরে অত্র সূরার তাফসীর রচনার শুরুর তারিখ উল্লেখ করেছেন ১৭ মে, ২০০৯ খ্রি./৩ ফেব্রুয়ারি, ১৪১৬ হি./২১ ভাদ্র, ১৪৩০ ব., সন্ধ্যা: ৬.৪১। গ্রন্থটির শুরুতে প্রথমে তিনি সূরাহ আল-ফাতহের অবতীর্ণের স্থান, নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক, বিষয়বস্তু ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তারপর তিনি নিম্নোক্তভাবে আলোচনা উপস্থাপন করেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَتْحِ بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ مَعَ تَحْقِيقِ الْأَلْفَاظِ

গ্রন্থকার অন্যান্য সূরার তাফসীরের ন্যায় এ সূরার তাফসীরের সূচনাতেও সূরাহ আল-ফাতহের অবতীর্ণের স্থান, নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক, বিষয়বস্তু ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করার পর মূল তাফসীর শুরু করেন। তাফসীরের অভ্যন্তরে বিশেষ বিশেষ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনায় সীরাতে সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি উল্লেখ করেছেন। তিনি এ সূরার ২৯ আয়াতের তাফসীর ৬৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেছেন।^{১৬} গ্রন্থটি

জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক জমাদিউল আওয়াল, ১৪৪১ হিজরীতে ‘আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া’ বিনোদপুর, রাজশাহী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রকাশক বলেন,

“আল-কুরআনের ভাষ্য রচনা করে যে সকল কালজয়ী মনীষা এ জগতে অমর হয়ে রয়েছেন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম। তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি প্রশংসনীয়। তিনি ছিলেন একবিংশ শতাব্দির একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী পণ্ডিত, বিদ্বান মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, উচ্চ মানের প্রাবন্ধিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, প্রাজ্ঞ গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও একজন আদর্শ শিক্ষক। ইসলামের বিভিন্ন শাখায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় পারদর্শিতা ও সর্বোত্তম প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির পাথ্রে আল-কুরআনের অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবনের লক্ষ্যে তিনি মুসলিম জাতিকে বাংলা ভাষায় উপহার দিয়ে গেলেন এই অনন্য তাফসীর গ্রন্থ। জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি অফুরন্ত জ্ঞান সন্ধান রেখে গেছেন, যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।”^{১৭}

৮. সূরাহ আর-রহমানের তাফসীর

গ্রন্থকার তাঁর পাণ্ডুলিপিতে সূরাহ আর-রহমানের তাফসীর শুরু করেছেন এভাবে,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّحْمَنِ بِاللُّغَةِ الْبَنَغَالِيَّةِ مَعَ تَحْقِيقِ الْأَلْفَاظِ

গ্রন্থকার অন্যান্য সূরার তাফসীরের ন্যায় এ সূরার তাফসীরের সূচনাতেও সূরাহ আর-রহমানের অবতীর্ণের স্থান, নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক, বিষয়বস্তু ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করার পর মূল তাফসীর শুরু করেন। সূরাহ আর-রহমানের অবতীর্ণের স্থান তথা সূরাটি মাক্কী না মাদানী এ প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রিওয়াযাত বর্ণনা করার পর বিশুদ্ধ ও দুর্বল মতের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করে তন্মধ্যে একটি মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। সূরাহ আর-রহমানের মোট ৭৮ আয়াতের তাফসীর তিনি মোট ৯৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেন। সূরাহ আর-রহমানের তাফসীর সমাপ্ত করার পর নিচে ডান পার্শ্বে তাফসীর সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করেন; ২১ রবী‘উল আওয়াল ১৪৩১; ২৪ ফাল্গুন ১৪১৬; ৮ মার্চ ২০১১। গ্রন্থটি জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক জমাদিউল আওয়াল, ১৪৪১ হিজরীতে ‘আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া’ বিনোদপুর, রাজশাহী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। এ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রকাশক মন্তব্য করেন,

“বিভিন্ন যুগে প্রণীত তাফসীরের গ্রন্থসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেমন লেখকের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তেমনি তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যেও কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থই কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে, যা অন্য তাফসীরে দেখতে পাওয়া যায় না। ড. শফিকুল্লাহ প্রণীত অত্র তাফসীর গ্রন্থটিতেও কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।”^{১৮}

৯. সূরাহ আল-ওয়াকি‘আর তাফসীর

গ্রন্থকার তাঁর পাণ্ডুলিপিতে সূরাহ আল-ওয়াকি‘আর তাফসীর শুরু করেছেন এভাবে,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ بِاللُّغَةِ الْبَنَغَالِيَّةِ مَعَ تَحْقِيقِ الْأَلْفَاظِ

গ্রন্থকার এ সূরার তাফসীরের সূচনাতেও সূরাহ আল-ওয়াকি‘আর অবতীর্ণের স্থান, নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক, বিষয়বস্তু ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করার পর মূল তাফসীর শুরু করেন। অবতীর্ণের স্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ইমাম বায়হাকী র.-এর সনদে ইব্ন আব্বাস রা.-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, সূরাহ আল-ওয়াকি‘আহ মক্কায় নাযিল হয়েছে।^{১৯} আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের রা. এবং ইব্ন মারদূয়াহ র.ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।^{২০}

কোনো কোনো আয়াতের তাফসীরে বর্তমান যুগের সাথে আয়াতের বিধানের প্রয়োগ দেখিয়ে অভিনব আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি কোনো কোনো স্থানে ফিকহী মাসআলাও বর্ণনা করেছেন। তিনি এ সূরার তাফসীর রচনা কখন শুরু করেছেন তা উল্লেখ না করলেও তাফসীর সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করেন; ‘সূরাহ ওয়াকি‘আহ’ সমাপ্ত ১৭ মে ২০০৯; ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬; ২১ জুমাদাল আউয়াল ১৪৩০। তিনি এ সূরার ৯৬ আয়াতের তাফসীর ১৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক জমাদিউল আওয়াল,

১৪৪১ হিজরীতে ‘আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া’ বিনোদপুর, রাজশাহী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। এ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮। প্রকাশক বলেন,

“প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ র. রচিত ‘সূরাহ আল-ওয়াকি‘আর তাফসীর’ গ্রন্থটি বিভিন্ন ধরনের তাফসীরের সমন্বয়ে রচিত হওয়ায় এতে সব ধরনের বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। ফলে এতে গ্রন্থকার প্রয়োজন অনুযায়ী আল-কুরআন, আল-হাদীস, সাহাবী ও তাবি‘ঈগণের অভিমত এমনকি আরবী ভাষাভাষীদের বাক-রীতি থেকে গৃহিত অর্থের মাধ্যমেও তাফসীর করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে আরবী কবিতাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কতিপয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আলোকে তাফসীর করেছেন এবং শব্দের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরবী অভিধানসমূহ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই সার্বিকভাবে বলা যায় যে, বাংলা ভাষায় প্রণীত এ তাফসীর গ্রন্থটি এক অতীব চমৎকার তাফসীর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।”^{২১}

তাফসীরসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি

ড. শফিকুল্লাহ প্রণীত তাফসীর গ্রন্থসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

১. গ্রন্থগুলো চলিত ভাষায় রচিত এবং তাফসীর বির-রিওয়াযাত ও তাফসীর বিদ্-দিরাযাতের ভিত্তিতে সংকলিত।
২. তাফসীরের সূচনাতে সূরার ক্রমিক নম্বর, আয়াত সংখ্যা, রুকু সংখ্যা, শব্দ সংখ্যা, অক্ষর সংখ্যা এবং সূরাটি আল-কুরআনের কোন পারায় অবস্থিত সে সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।
৩. তাফসীরের সূচনাতে সূরার অবতীর্ণের স্থান, নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র, বিষয়বস্তু ও ফযীলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।
৪. তাফসীরের প্রারম্ভে আয়াত উল্লেখ করত প্রথমে সহজ-সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। অতঃপর প্রতিটি শব্দের অর্থ ও অর্থ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।
৫. তাফসীরের অভ্যন্তরে বিশেষ বিশেষ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সীরাত সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. ‘তাফসীর’ শিরোনামে সংশ্লিষ্ট আয়াতের উৎকৃষ্ট তাফসীর প্রদান করা হয়েছে।
৭. তাফসীর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহাবী, তাবি‘ঈ, তাবি-তাবি‘ঈ এবং পরবর্তী তাফসীর বিশারদগণের উক্তিও সংযোজিত হয়েছে।
৮. আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় স্থানে বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।
৯. তাফসীর গ্রন্থগুলো সংকলিত হওয়ায় গ্রন্থকার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। যেমন- আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, তাফসীর ইব্ন কাছীর, মা‘আলিমুত তানযীল, যাদুল মাসীর, লুববুল লুবাব ফী মা‘আনিত-তানযীল, মাদারিকুত তানযীল, আদ-দুররুল মানছুর, রুহুল মা‘আনী, আল-বাহরুল মুহীত, তাফসীরুল কাশশাফ, তাফসীরুল বায়যাতী, তাফসীরে মায়হারী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী, তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন, সাফওয়াতুত তাফসীর, সহীহুল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, জামি‘উত তিরমিযী, বায়হাকী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ।
১০. সবশেষে গ্রন্থকার মহান আল্লাহর প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে তাফসীরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

১০. হাদীসশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত

এটি ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর অনুবাদ ও সম্পাদনাকৃত গ্রন্থ। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+১৮২=১৯২। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৪২২ হিজরীতে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৪২৮ হিজরীতে এবং তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কিত অতুলনীয় একটি গ্রন্থ, যা সারা দেশে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে অনুবাদক বলেন,

“মিশরের ইসলামী আইন ইনস্টিটিউটের প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আল-খুলী র. কর্তৃক রচিত ‘মিফতাহু-সুন্নাহ্’ হাদীসশাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ের একটি বিরল ও মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থকার এতে হাদীসশাস্ত্রের বিষয়গুলো সংক্ষেপে তবে অতি সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় গ্রন্থটি হাদীস গবেষকগণের জন্য অতি কল্যাণকর বিবেচনায় আমরা গ্রন্থটির অনুবাদ করেছি। গ্রন্থটিতে এমন অনেক তথ্য রয়েছে যেগুলোর প্রামাণ্যতা যাচাই করা আবশ্যিক ছিল। এতে ‘উলূমুল-হাদীসের অনেক পরিভাষা এসেছে যেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এতে অনেক হাদীসবিদগণের শুধু নাম এসেছে, যাঁদের জীবন ও অবদান সম্পর্কে জানা জরুরি। আমরা অতীব প্রয়োজনীয় এসব দিকের বিবেচনায় গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছি এবং বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ মন্বন করে উল্লিখিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে পাদটীকায় সংযোজন করেছি।”^{২২}

নবী করীম সা.-এর মুখ নিঃসৃত বাণী, কর্ম এবং মৌনসম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর যুগে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তখন কীভাবে হাদীস সংরক্ষণ করা হয়েছে, এরপর কখন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ বিষয়ে আমরা অনেকেই ভালো জানি না। বিভিন্ন শতাব্দীতে হাদীস বিশারদগণ কীভাবে তাদের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছেন, হাদীস গ্রন্থগুলোর শ্রেণিবিন্যাস, তাদের সংকলিত গ্রন্থগুলোর মূল্যায়ন, গ্রন্থকারের জীবনী, ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলী এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। হাদীসকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- রাবীগণের জীবন ইতিহাস, হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার, হাদীসের পরিভাষামূলক গ্রন্থ সম্পর্কে এ গ্রন্থে যুগভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। এছাড়া আমরা সুন্নাহকে কীভাবে গ্রহণ করব, উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে সুন্নাহ দ্বারা কীভাবে সমস্যা সমাধান করা যাবে, সমকালীন যুগের সুন্নাহর অবস্থা এবং সুন্নাহকে কীভাবে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় এসব বিষয়ে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রণয়নে লেখক ১০৩টি সহায়ক গ্রন্থ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে পাদটীকায় সংযোজন করেছেন, যা গ্রন্থটির গুরুত্ব বহন করে। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রকাশক বলেন,

“‘মিফতাহু-সুন্নাহ্’ বা ‘হাদীসশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত’-এর ওপর প্রণীত এটি একটি অন্যতম গ্রন্থ। বিষয়টি অনেক দিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষার ফাযিল ও কামিল স্তরে এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটি মাতৃভাষায় অনূদিত হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। সাথে সাথে দেশের অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন। তাঁরা অনুধাবন করতে পারবেন হাদীস সম্পর্কিত অনেক জরুরি বিষয়। বিশেষ করে গ্রন্থকার তাঁর উপসংহারে হাদীসের প্রসার ও বিস্তারের ক্ষেত্রে যে মর্মস্পর্শী আবেদন ব্যক্ত করেছেন তা অনেকের হৃদয়ে দাগ কাটতে পারে। সর্বোপরি এটি একটি দ্বীনী খিদমত। হাদীসের বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। হাদীস অধ্যয়নের সময় তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক জরুরি বিষয় সরবরাহ করবে আমাদের এ গ্রন্থটি। এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করেই আমরা ‘মিফতাহু-সুন্নাহ্’ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ পাঠক সমাজে পেশ করলাম। সকল স্তরের পাঠকের নিকট বইটি সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।”^{২৩}

১১. আত্-তাকরীর লিভ-তিরমিযী

গ্রন্থটি মুহাম্মাদ মুসা কর্তৃক অনূদিত। এটি ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা থেকে ১৪১৪ হি/১৯৯৪ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর বহু সংখ্যকবার প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ফুটনোটে শায়খ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক ‘আত্-তাকরীর লিভ-তিরমিযী’ গ্রন্থটির অনূদিত অংশটি প্রকাশিত হয়। এটি ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ও অনুবাদ করেন। অনুবাদক মুহাম্মদ মুসা এ সম্পর্কে বলেন,

“পাঠকদের সুবিধার জন্য কিছু জরুরি টীকাও যোগ করেছি। শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান র. তিরমিযীর কতিপয় হাদীসের উপর আরবী ভাষায় টীকা লিখেছেন, যা তিরমিযীর ভারতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যোগ করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ এই অংশের অনুবাদ করেছেন। টীকাগুলো সংশ্লিষ্ট হাদীসের নিচে স্থাপন করা হয়েছে হুবহু অথবা সংক্ষেপে এবং শেষে ব্রাকেটে ‘মাহমুদ’ শব্দ যোগ করা হয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য।”^{২৪}

১২. তাফসীর আত্-তাবারী, ২য় খণ্ড (অর্ধেক)

এ গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।

১৩. গুরুতুল আইন্মাতিস্-সিতাহ্

হাফিয মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির ইব্ন আলী আল-মাকদিসী র. (৪৪৮-৫০৭ হি.) হাদীসের গুরুতুল সম্পর্কিত বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করে এর নামকরণ করেন ‘গুরুতুল আইন্মাতিস্-সিতাহ্’। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অতি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি মিসরের কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। এর বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা পাঠ না করলে বুঝা যায় না। সিহাহ সিতাহর সংকলকগণের প্রত্যেকেই তাঁদের হাদীস গ্রন্থগুলো সংকলনে কিছু নিয়ম-নীতি অবলম্বন করেছেন। হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা নিজেরা কোনো শর্তারোপ করেননি। তবে পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে শর্তগুলো পাওয়া যায় সেটিকে শর্ত হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে সিহাহ সিতাহর শর্ত, ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. কাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কতগুলো হাদীস মুখস্থ ছিল, কত সংখ্যক সংগৃহীত হাদীস থেকে এ গ্রন্থ সংকলন করেছেন, ইমাম আবু দাউদ র.-এর সুনান, ইমাম ইব্ন মাজাহ র. ও ইমাম তিরমিযী র.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ইমাম নাসাই র.-এর সুনান সংকলন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রকাশক মন্তব্য করে বলেন,

“গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ। গ্রন্থটি তিনি ২০০৪ সালে অনুবাদ করেছিলেন; গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রেও লেখকের একটি বিশ্ময়কর ঘটনা রয়েছে। সেটি হলো এ গ্রন্থটি তিনি মাত্র সাত দিনে অনুবাদ করেছিলেন। ২০০৪ সালের ১৩ নভেম্বর শনিবার দিন তিনি গ্রন্থটির অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৯ নভেম্বর শুক্রবার দিবসে তা সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি তিনি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার ‘চতরা’ গ্রামে নিজ বাড়িতে বসে অনুবাদ করেন, যেখানে আজ তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ড. শফিকুল্লাহ ছিলেন একজন দক্ষ অনুবাদক। পাঠক সমাজ যেন গ্রন্থটি সহজে বোধগম্য ও হৃদয়ঙ্গম করে এর থেকে উপকার লাভ করতে পারেন সেজন্য তিনি গ্রন্থটিকে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থটির শুরুতে হাফিয আল-মাকদিসী র.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন করেছেন। সর্বশেষে এ গ্রন্থটির আরবী ইবারত সংযোজিত করা হয়েছে। যেন পাঠক সমাজ এর দ্বারা বহুমুখী উপকার লাভ করতে পারেন।”

গ্রন্থটি আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, রাজশাহী থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৪৪১ হিজরীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। গ্রন্থটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী র.-এর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গুরুতুল আইন্মাতিস্ সিতাহর অনুবাদ প্রদান করা হয়েছে। এরপর গুরুতুল আইন্মাতিস্ সিতাহ্ গ্রন্থটির আরবী অংশটি প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদ অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় করা হয়েছে, যা সকল শ্রেণির পাঠক সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন।

২.২ খ. পাণ্ডুলিপি

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ রচিত এখনও যে সকল রচনা পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে, তার মধ্যে মৌলিক গ্রন্থ ৭টি এবং অনূদিত গ্রন্থ ৩টি। এছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে। সবগুলো মিলে তাঁর পাণ্ডুলিপির সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। নিম্নে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি উল্লেখ করা হলো:

১৪. তাফসীর সূরাহ আন-নূর (অসম্পূর্ণ)

গ্রন্থকার তাঁর পাণ্ডুলিপিতে সূরাহ আন-নূরের তাফসীর শুরু করেছেন এভাবে,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَفْسِيرُ سُورَةِ النُّورِ بِاللُّغَةِ الْبَنَغَالِيَّةِ مَعَ تَحْقِيقِ الْأَلْفَاظِ

গ্রন্থকার এ সূরার তাফসীরের সূচনাতেও সূরাহ আন-নূরের অবতীর্ণের স্থান, নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক, বিষয়বস্তু ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করার পর মূল তাফসীর শুরু করেন।

এ সূরাটি মাদানী সূরাহ এবং এতে রয়েছে ৬৪টি আয়াত। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ এ সূরার ব্যাখ্যায় দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতে আহকাম সম্পর্কিত মাসআলা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন করেছেন। এ সূরার তাফসীরে তিনি এত দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে শুধু ১-৪ আয়াতের তাফসীর ১০৯ পৃষ্ঠা বিস্তৃত। ৫-৬ নং আয়াতের তাফসীর ১৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, সূরাহ আন-নূরে পরিবার সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর পরিবার হলো সমাজের ভিত্তিমূল। এ সূরায় সামাজিক শিষ্টাচারের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। যেমন-

ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করা, চক্ষু অবনমিত রাখা, যৌনাঙ্গের হিফায়ত করা এবং অবৈধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকা। একটি মুসলিম পরিবারের সদস্যদের যে সকল গুণে গুণাবিত হওয়া উচিত সে বিষয়গুলো এতে আলোচিত হয়েছে। যেমন- পূতঃপবিত্র থাকা, পর্দা মেনে চলা, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা, পরিবারকে সংরক্ষণ করা এবং নৈতিক স্বলন থেকে রক্ষা করা। এতে শরীয়তের কিছু কিছু দণ্ডবিধির (الحدود الشرعية) উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- যিনার (ব্যভিচারের) হদ, অপবাদের (قذف) হদ, লি'আনের আহকাম (বিধি-বিধান)। এ সকল দণ্ডবিধি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সমাজকে বিপর্যয় এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত রাখা এবং উম্মাহকে ফিসক-ফুসকী ও উচ্ছৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা। কারণ অপকর্ম ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড বংশধারাকে নষ্ট করে এবং সম্মান ও ইয়্যতের হানি ঘটায়। এ সূরায় অশ্লীল কর্মকাণ্ডের প্রসার রোধের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা বিস্তার লাভ করতে না পারে। মুমিনগণের পারিবারিক জীবনে উন্নত চরিত্র এবং সুন্দর আচার-আচরণ লালনের জন্য এ সূরায় মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।^{২৫} মুহাম্মদ কুরতুবী র. বলেন,

مَقْصُودُ هَذِهِ السُّورَةِ ذِكْرُ أَحْكَامِ الْعَفَافِ وَالسِّتْرِ. وَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ: عَلِمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النَّورِ

“এ সূরার উদ্দেশ্য পূতঃপবিত্র বিধান এবং পর্দার আহকাম বর্ণনা করা। ‘উমার রা. কুফাবাসীদের প্রতি একটি পত্রে লিপিবদ্ধ করেন, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে সূরাহ আন-নূরের তা'লীম বা শিক্ষা দাও।”^{২৬}

১৫. তাফসীর চর্চায় মাহমুদ আল-আলুসী র.-এর অবদান

যে সকল মনীষী তাদের অনন্য সাধারণ অবদান ও অমর কীর্তি রেখে গেছেন তাদের মধ্যে মাহমুদ আলুসী আল-বাগদাদী র. ছিলেন প্রাচ্যের গণ্য। তিনি ছিলেন তাফসীর শাস্ত্রের এক মহান দিকপাল। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার রচিত গ্রন্থাদির মর্যাদা অতুলনীয়। এক সম্ভ্রান্ত ও দীনী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন বরেন্য আলিম। রাজনৈতিক এক অস্থির পরিবেশে তিনি বড় হন। কিন্তু তখন বাগদাদে জ্ঞানচর্চার আকাশ ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। তাই অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষার্জন সমাপ্ত করে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটে। কিন্তু তিনি কখনও নিরাস না হয়ে সর্বদা জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থ সংকলনে নিয়োজিত থাকেন। জ্ঞান পিপাসুদের জন্য তার জীবন এক উজ্জ্বল আদর্শ। গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়: মাহমুদ আল-আলুসী আল-বাগদাদী র.: জীবন, দ্বিতীয় অধ্যায়: রুহুল-মা'আনীর বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি এবং তৃতীয় অধ্যায়: তাফসীরে রুহুল-মা'আনীর উৎস।

১৬. উসুলুল ফিক্হ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ উসুলুল ফিক্হ বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো: উসুলুল ফিক্হের পরিচয়, আল ফিক্হের পরিচয়, উসুলুল ফিক্হের বিষয়বস্তু, উসুলুল ফিক্হের সহায়ক বিষয়াবলী, উসুলুল ফিক্হের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, উসুলুল ফিক্হের উৎস তথা আল-কিতাব, আস-সুন্নাহ, আল-ইজমা', আল-কিয়াস, আল-ইজতিহাদ, সাহাবীগণের অভিমত, আল-ইসতিহসান, আল-ইসতিহাব, আল-মাসালিহুল-মুরসালাহ, শার'উ মান কাবলানা, সাদ্দুয়-যারাদ্ঈ, আল-উরফ, আল-আমর, আন-নাহী, আম, খাস প্রভৃতি বিষয়।

১৭. জামি'উত্-তিরমিযীর কিতাবুস্-সালাত-এর ব্যাখ্যা

সিহাহ সিভাহর অন্যতম একটি গ্রন্থ হলো জামি'উত্-তিরমিযী। মুহাম্মদ ইব্ন ইসা আত্-তিরমিযী র. এটি সংকলন করেন। তিনি ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের অন্যতম একজন হাফিয। তাঁর সম্পর্কে শামসুদ্দীন আয-যাহাবী র. (মৃ. ৭৪৮ হি.) মীযানুল-ইতিদাল গ্রন্থে বলেন, تَقْدَةُ الْحَافِظِ الْعَالِمِ، صَاحِبِ الْجَمَاعِ، ثَقَّةٌ، مَجْمُوعٌ عَلَيْهِ، তিনি ছিলেন হাফিয, আলিম, জামি' গ্রন্থের সংকলক, ছিকাহ এবং তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই একমত।^{২৭} ইমাম তিরমিযী র. হাদীসশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করার পর একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি জামি'উত্-তিরমিযী নামে পরিচিত। এ গ্রন্থের মধ্যে সিয়ার, আদাব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম ও মানাকিব সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এটি জামি'। অপরদিকে এটি সুনাও। কারণ এ গ্রন্থে ফিক্হের তারতীব অনুযায়ী তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী র.-এর জামি' গ্রন্থটি ব্যাপকতার দিক থেকে সহীহুল-বুখারী এবং সুন্দর বিন্যাসের দিক থেকে সহীহ মুসলিম-এর পরে স্থান দখল করেছে। এদিক থেকে এ গ্রন্থটির স্থান তৃতীয়; কিন্তু বিশুদ্ধতা ও সনদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে জামি'উত্-তিরমিযী সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু-নাসাঈর পরে।^{২৮} ইমাম তিরমিযী র. জামি'উত্-তিরমিযী গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন,

صَنَّفْتُ هَذَا الْكِتَابَ، وَعَرَّضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ، فَرَضَوْا بِهِ، وَمَنْ كَانَ هَذَا الْكِتَابُ يَعْني الْجَمَاعَ فِي بَيْتِهِ، فَكَانَ فِي بَيْتِهِ نَحْيٌ يَتَكَلَّمُ

“আমি এ কিতাবটি হিজায়, ইরাক এবং খুরাসানের আলিমগণের নিকট পেশ করি, তাঁরা সকলেই এ গ্রন্থের উপর সম্মতি প্রকাশ করেন এবং এটিকে উত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করেন। অতঃপর বলেন, যার গৃহে এ আল-জামি' গ্রন্থটি রয়েছে, তার গৃহে যেন স্বয়ং নবী করীম সা. অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।”^{২৯} হাদীসশাস্ত্রের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থের কিতাবুস-সালাত অংশের কিছু অংশের ব্যাখ্যা করেন ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ। যেখানে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় মাসআলা সম্পর্কে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

১৮. কিয়ামতের নিদর্শন

গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে কিয়ামতের পরিচয়, কিয়ামতের সমার্থক নামসমূহ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিয়ামতের ছোট ও বড় নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কিয়ামতের ছোট নিদর্শনসমূহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সা.-এর নবুওয়াত লাভ, রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইত্তিকাল, উমার ইবনুল খাতাব রা.-এর ইত্তিকাল, মিথ্যাবাদী দাজ্জালের প্রকাশ, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, আমওয়াস নামক স্থানের মহামারী, মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত বিরাট যুদ্ধ, দাসী কর্তৃক নিজ মনীষকে জন্ম দেওয়া এবং সম্পদহীনদের দালান-কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করা, জ্ঞানের স্বল্পতা, মূর্খতা, ব্যভিচার ও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, অযোগ্যদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ, কাল সন্নিহিত হওয়া, আমল কমে যাওয়া, কৃপণতা, হত্যা, বিকৃতি, ভূমিধ্বস, প্রস্তর নিক্ষেপ, বৃষ্টির বিন্দুর ন্যায় ফিতনার অবতরণ, বাকহীন জন্তু ও বস্তুর কথোপকথন, পনেরটি নিদর্শন, ইমাম মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কিয়ামতের বড় নিদর্শনসমূহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাব্বাহ-এর আবির্ভাব, ধোঁয়া, দাজ্জালের অভ্যুদয়, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ইয়া'জুজ মা'জুজ, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং আরব উপদ্বীপে সংঘটিত ধ্বস এবং আদন থেকে নির্গত অগ্নি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯. বাংলাদেশে কাওমী মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা

এটি মূলত তাঁর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্প। লেখক বাংলাদেশের বিভিন্ন কাওমী মাদ্রাসা সফর করে প্রকল্পটি সম্পন্ন করেছিলেন। এটি প্রকাশিত হলে পাঠকগণ কাওমী মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

এটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো, কাওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা, সিলেবাস সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা করা এবং এর আলোকে সুপারিশ তৈরী করা। এ উদ্দেশ্যে লেখক বাংলাদেশের দেশের বিভিন্ন স্থানের কাওমী মাদ্রাসাসমূহ পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যথা- প্রথম অধ্যায়: কাওমী মাদ্রাসা এবং দরসে নিয়ামীর পরিচয় ও ইতিহাস। দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে কাওমী মাদ্রাসার জরিপ। তৃতীয় অধ্যায়: কাওমী মাদ্রাসার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর পর্যালোচনা। চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশে কাওমী মাদ্রাসার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ। পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের কাওমী মাদ্রাসা ও কাওমী আলিমগণের বিভিন্নমুখী অবদান।

২.৩ অনূদিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

অনূদিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

২০. তায়সীর মুসতাহলিহ হাদীস

মিশরের প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ড. মাহমুদ আত্-তাহহান উসুলুল হাদীস বিষয়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থকার গ্রন্থটি রচনা প্রসঙ্গে বলেন,

“কয়েক বছর যাবৎ আমি মদীনা মুনাওয়ারার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী‘আহ অনুষদে ইলমু মুসতাহলিহ-হাদীস পাঠদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। তখন সেখানে নির্দিষ্ট গ্রন্থ ছিল ইবনুস-সালাহ-এর কিতাব ‘উলুমুল-হাদীস’, এর পরিবর্তে নির্দিষ্ট গ্রন্থ নির্ধারিত হয়, এরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কিতাব ‘আত্-তাকরীব’, যার সংক্ষিপ্তকার হচ্ছেন মহিউদ্দীন আন-নববী (রহ)। গ্রন্থ দুটির মহত্ব ও ফায়দা অধিক হওয়া সত্ত্বেও এ দুটিকে অনুধাবনে ছাত্রদের মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোনো কোনো আলোচনা অতি দীর্ঘ। যা বিশেষ করে ইবনুস-সালাহ-এর কিতাবে পরিলক্ষিত হয়। আর কোনো কোনো আলোচনা অতি সংক্ষেপ। যা বিশেষ করে নববী র.-এর কিতাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কিতাবে কোনো কোনো বিষয়ের ভাষা খুব কঠিন আবার কোনো কোনো আলোচনা অসম্পূর্ণ। যেমন- তাতে সংজ্ঞা নেই অথবা উদাহরণ অনুপস্থিত অথবা আলোচনার সমাপ্তিতে ফায়দার উল্লেখ নেই অথবা এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কোনো উল্লেখ নেই এবং অনুরূপ আরও কিছু সমস্যা রয়েছে। এ দুটি ছাড়াও এ বিষয়ে পূর্ববর্তীগণের রচিত গ্রন্থে অনুরূপ সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। বরং এসব গ্রন্থের কোনো কোনোটি উলুমুল হাদীসের সকল বিষয়কে সন্নিবেশ করেনি। কোনো কোনোটি সুসংবদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে তাদের উত্তর হচ্ছে, যে সব বিষয়ের আলোচনা তারা ত্যাগ করেছেন সেগুলো তাদের নিকট ছিল অতি স্পষ্ট অথবা কোনো কোনো বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা তাদের যুগের চাহিদা ছিল অথবা এমন কোনো কারণ ছিল, যা উপলব্ধি করতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে আমার অন্তরে শরী‘আহ অনুষদের শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মুসতাহলিহ-হাদীস ও উলুমুল-হাদীসের একটি সহজ গ্রন্থ প্রণয়নের উপলব্ধি হয়, যাতে বিষয়ের ফায়দা-কানুন এবং পরিভাষা উপলব্ধি করা সহজ হয়। আর এতে প্রত্যেক বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ক্রমিক নম্বর দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভক্ত করা হয়। শুরুতে সংজ্ঞা, এরপর উদাহরণ, প্রকারভেদ এবং শেষে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়। তবে সকল আলোচনা সহজ-সরল, জ্ঞানগর্ভ ও সুস্পষ্ট ভাষায় হবে। এ গ্রন্থের নাম রাখা হয় ‘তায়সীর মুসতাহলিহ-হাদীস’।”

গ্রন্থকার আরও বলেন, আমার এ কিতাবের নতুনত্ব হচ্ছে,

- বিভাজিকরণ, প্রত্যেক আলোচনাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীর জন্য বিষয়টির উপলব্ধি সহজ করবে।
- প্রত্যেক বিষয়কে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে, যাতে রয়েছে সংজ্ঞা, উদাহরণ ইত্যাদি।
- মুসতাহলিহ উলুমুল-হাদীসের সকল বিষয় এতে সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ্রন্থটি সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি মিসর, বৈরুত, রিয়াদ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে বহুসংখ্যক বার মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটি বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া ও কাওমী মাদ্রাসায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারিত ও পঠিত হয়ে আসছে।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ২০০৭ সালে গ্রন্থটির অনুবাদ সমাপ্ত করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এটি প্রকাশিত হয়নি। আশা করা যায়, গ্রন্থটি অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য মহাসম্পদ হিসেবে অবদান রাখবে।

২১. ফিক্‌হুল হায়া

গ্রন্থটি রচনা করেন বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দিম। গ্রন্থটি মক্কাতুল মুকাররমাহর আদ-দারুল আল-আলামিয়াহ থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬। গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক বলেন,

“হায়া বা লজ্জা এমন একটি মহৎ গুণ, যা মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে এবং তাকে অসৎচরিত্র ও গুনাহের পাকে (কাঁদায়) পড়ে যাওয়া থেকে বাঁধা দেয়। একইভাবে লজ্জা মর্যাদা অর্জনের ও সম্মানিত পদ অর্জনের একটি শক্তিশালী উদ্দীপনা দানকারী। লজ্জা হলো সকল আখলাকের নিরাপত্তার চাবিকাঠি। এটি একটি মহান মর্যাদা, যা মানবজাতির চাল-চলন নিয়ন্ত্রণ করে, একটি নিরাপদ বেটনী যা মহামূল্যবান বস্তুসমূহ রক্ষা করে ও আখলাককে প্রহরায় রাখে। ইসলাম লজ্জার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং লজ্জার প্রতি উদ্বুদ্ধ

করেছে। কেননা এটি ইসলামেরই চরিত্র এবং মাকারিমুল আখলাকের মূল। ‘ফিকহুল হায়া’ গ্রন্থে আমরা যে সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করব তা হলো, হায়া পরিচিতি, ফযীলত, প্রকারভেদ, বিধি-বিধান ও সমাজে-এর প্রভাব। মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে এ প্রার্থনা জানাই, যেন গ্রন্থটি তার লেখক-পাঠক সকলের জন্য উপকারী হয়। মুসলিম জাতির অন্তরে ইসলামের মাকারিমুল আখলাকের প্রতি সুপ্রত্যাবর্তনের প্রেরণা প্রদান করেন এবং ইসলামী শরীয়তের মাধুর্যতার প্রতি নব জাগরণ তৈরী করেন। একমাত্র তিনিই এ কাজ করতে পারেন এবং একমাত্র তিনিই এ কাজে সক্ষম।”

ফিকহুল হায়া গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ এর অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

“মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইসমাইল ইবনুল মুকাদ্দিম আল-ইসকান্দারিয়াহ রচিত ‘ফিক্‌হুল হায়া’ গ্রন্থটি আমার পুত্র প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ২০০৮ সালে হজ্জ পালনের সময় মক্কাতুল মুকাররমাহ থেকে নিয়ে আসে। গ্রন্থটি আমি পাঠ করতে গিয়ে এটি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কারণ লজ্জাশীলতার উপর এটি একটি অনন্য গ্রন্থ হিসেবে আমার নিকট অনুভূত হয়। এতে গ্রন্থকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে লজ্জাশীলতার বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। বর্তমান যুগে মানুষের লজ্জাশীলতা কমে যাওয়ার কারণে সমাজে প্রতিনিয়ত অনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তাই চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়া প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় রুচিসম্মত, ভদ্র, সুন্দর ও মার্জিত গুণাবলীর অনুসরণ করার দ্বারা শালীনতা চর্চা করা যায়। লজ্জাশীলতার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হাদীসে লজ্জাশীলতাকে ঈমানের একটি শাখা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসকল দিক বিবেচনা করে এমন একটি গ্রন্থ পাঠক সমাজের সামনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আল্লাহ তা‘আলার অশেষ রহমতে গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন করি। আশা করি গ্রন্থটি দ্বারা বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক সমাজের সকল স্তরের মানুষ উপকার লাভ করবেন, যা দ্বারা ঈমানের কিছুটা হলেও উপকার সাধিত হবে। মানুষের মধ্যে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে বোধগম্যতা সৃষ্টি হবে। গ্রন্থটি সহজ, সরল ও প্রাজ্ঞ ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। এরপরও কিছু স্থানে দুর্বোধ্য থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে এ গ্রন্থটি পাঠে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ও তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন।”

ফিক্‌হুল হায়া গ্রন্থটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট (বিআইআইটি) থেকে প্রকাশের জন্য রিভিউ ও প্রুফ রিডিং সম্পন্ন হয়েছে। এটি যথাশীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমরা আশা করছি। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা অর্জনকরত সাধারণ পাঠকগণ উপকৃত হতে পারবেন।

২২. আর-রিসালাহ আল-মুসতাতরিফাহ

আর-রিসালাহ আল-মুসতাতরিফাহ লি বায়ানি মাশহূর কুতুবিস-সুন্নাতিল মুশাররাফাহ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবিল ফায়দ জা‘ফর ইবন ইদরীস আল-হাসানী আল-ইদরীসী আল-কাতানী র.। গ্রন্থটি আকারে ছোট হলেও হাদীসশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। কেননা এতে হাদীসশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস ও তাঁদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রন্থটির চাহিদা থাকায় ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ এটি অনুবাদ করার কাজে নিয়োজিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি গ্রন্থটির অর্ধেক অনুবাদ করার পর তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর গ্রন্থটির অবশিষ্ট অর্ধাংশ অনুবাদ করেন ড. মুহাম্মদ মুনাওয়ার হুসাইন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে হাদীসশাস্ত্রের পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

২৩. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, আরবী ভাষাবিদ, দেশবরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তিনি যে শুধু শিক্ষাদান করেছেন তা নয়, বরং লেখনীর জগতেও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিশেষত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত থাকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তা জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার উপর তাঁর ক্ষুরধার লেখনী এদেশে ইসলামী শিক্ষার

ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধন করেছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর রচনার হাত প্রসারিত করেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উলূমুল হাদীস, উসূলুল ফিক্হ, ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর বহু পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা এখনো অপ্রকাশিত। তাঁর রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি এবং প্রবন্ধের সংখ্যা ১৫০টি। এছাড়াও তিনি জাতীয় পাঠ্যক্রম পুস্তক ‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’ গ্রন্থের একজন লেখক ছিলেন, যা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করানো হতো। ভাষাবিদ ড. শফিকুল্লাহর পাঁচটি ভাষা তথা বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজিতে সমান দখল ছিল। এ কারণে তিনি যে বিষয়ে কলম ধরতেন, তা যেমন হতো যুক্তিপূর্ণ তেমনি হতো তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর। মূলত তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ র. রচিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী সবই ইসলাম সম্পর্কিত। তাঁর এ রচনার ভাষা প্রাঞ্জল ও সার্বলীল। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে শিক্ষক, গবেষক, পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী সকলেই প্রশংসা করেন। তারা বলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলো সহজবোধ্য ও সুখকর পাঠ্য। যে কেউ অতি সহজেই তাঁর লেখা থেকে পাঠ উদ্ধার করতে পারে।
- ^২ তিনি ছিলেন বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী। তিনি আরবী ভাষায় রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ হচ্ছে, মিস্তাহস-সুন্নাহ, গুরুত্ব আইন্যাতিস-সিতাহ, তায়সীর মুসতাহািল হাদীস ও ফিকহুল হায়া।
- ^৩ তিনি ছিলেন প্রথিতযশা ও অতি উচ্চমানের একজন শিক্ষক। দেশের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসাসমূহ তথা কুড়িগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসা, কুড়িগ্রাম, ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম, সৎপুর আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট, কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, রংপুর-এর মুহাদ্দিস ও প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের পাঠদান করেন। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।
- ^৪ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ দ্র. সূরাহ আলে ইমরান: ৩: ১৯; অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ দ্র. সূরাহ আল-মায়িদাহ: ৫: ৩।
- ^৫ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাজী র. জীবন ও কর্ম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. পাঁচ।
- ^৬ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ‘উলূমুল-১ম খণ্ড (রাজশাহী: আল-মাকাতাবাতুশ্-শাফিয়া, ৭ম মুদ্রণ, ২০২০ খ্রি./১৪৪১ হি.), পৃ. ৪।
- ^৭ তদেব, পৃ. ২৩২।
- ^৮ সূরাহ আর-রা‘দ: ১৭।
- ^৯ সূরাহ আয-যুমার: ২১।
- ^{১০} ড. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃ. ৩৭।
- ^{১১} ‘উলূমুল-১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।
- ^{১২} ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা ‘আওনুল বারী, ১ম খণ্ড (রাজশাহী: আল-মাকাতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি./১৪২৫ হি.), পৃ. ৪।
- ^{১৩} ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবন ইসামঈল আল-বুখারী ও তাঁর আল-জামি‘ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি./১৪২৬ হি.), পৃ. সাত।
- ^{১৪} ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, সূরাহ ইয়াসীনের তাফসীর (রাজশাহী: আল-মাকাতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ৩।
- ^{১৫} সূরাহ ইয়াসীনের তাফসীর, পৃ. ৫।
- ^{১৬} তদেব।
- ^{১৭} ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, সূরাহ আল-ফাতহের তাফসীর (রাজশাহী: আল-মাকাতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ^{১৮} ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, সূরাহ আর-রহমানের তাফসীর (রাজশাহী: আল-মাকাতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ^{১৯} জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আদ-দুরুল মানহুর, ৮ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩; মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, আল-জামি‘ লি আহ্কামিল-৯ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৩৮।
- ^{২০} মাহমূদ আল-আলুসী, রুহুল মা‘আনী, ১৪শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১২৮।

-
- ^{২১} ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *সূরাহ আল-ওয়াক্কি'আর তাফসীর* (রাজশাহী: আল-মাকাতাবাতুশ্ শাফিয়া, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ^{২২} ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *হাদীসশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত* (রাজশাহী: আল-মাকাতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি./১৪২২ হি.), পৃ. ১-২।
- ^{২৩} *হাদীসশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১-২।
- ^{২৪} আবু জৈসা তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অনুবাদ ও সম্পাদনা মুহাম্মাদ মূসা, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি./১৪১৪ হি.), পৃ. ২৮।
- ^{২৫} মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়াই'উল-বায়ান*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: আল-মাকাতাবাতুল-আসরিয়াহ, ১৪২৭ হি./ ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭।
- ^{২৬} মুহাম্মাদ আল-কুতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল-১২শ খণ্ড* (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৪৬।
- ^{২৭} শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *মীযানুল-ইতিদাল*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৬৭৮।
- ^{২৮} হাজী খলীফাহ, *কাশফুয়-যুনুন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৫৫৯।
- ^{২৯} শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা*, ১৩শ খণ্ড (বৈরুত: মুআসাসাতুর-রিসালাহ, ১১শ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৭৪; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল-হুফযা*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৬৩৪; তাশ-কুবরা যাদাহ, *মিফতাহুস-সা'আদাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ১২২-১২৩।

ইসলামের আলোকে যাকাত আদায়ের প্রতিদান ও অনাদায়ের পরিণতি: একটি বিশ্লেষণ [Consequences of Payment and Non-payment of Zakat in the Light of Islam: An Analysis]

মো. আশরাফুল ইসলাম*

[Abstract: As a balanced and complete system of life, Islam has highlighted all the important aspects of human life. One of the most important aspects of human life is economy. Detailed guidelines have been given in Islam regarding this. Zakat management is an important branch of Islamic economics. The main feature of this provision is to regularly collect a certain portion of the wealth from the rich and distribute it among the poor and deprived people. This provision has been described as the third pillar of Islam, one of the tools for building a society free from discrimination and poverty. One of the pillars of Islam is proven by the four main sources of Shari'ah namely Qur'an, Hadith, Ijma and Qiyas. Many directions have been described in the Qur'an and Hadith about this important provision of Islam. In all these guidelines, just as appropriate compensation has been described for paying zakat correctly; severe punishment has also been prescribed for those who do not pay zakat. That's why in the discussion article, mentioning the brief introduction of zakat, the payment of zakat in Islam and the tragic consequences of non-payment have been highlighted.]

Keywords: Islamic economics, Zakat, Collection of zakat, Reward, Non-payer of zakat, Punishment.

১. ভূমিকা

ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মানব জীবনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। এ সম্পর্কেও ইসলামে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থাপনা। সমাজের বিভবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উদ্ধৃত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈষম্য ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার এ বিধানকে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের অন্যতম এ রুকনটি শরী'আতের চারটি মূল উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এ বিধানটি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহু দিক-নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। এ সকল দিক-নির্দেশনায় সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের বিনিময়ে যেমনিভাবে উপযুক্ত প্রতিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে তেমনি যাকাত অনাদায়কারীদের জন্য কঠিন শাস্তির কথাও বিধৃত হয়েছে। এ কারণেই আলোচ্য প্রবন্ধে যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখপূর্বক ইসলামে যাকাত আদায়ের প্রতিদান ও অনাদায়ের করুণ পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে زَكَاةٌ^১ আভিধানিক অর্থে যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।^২ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, purification,^৩ purity, honesty, justification^৪ ইত্যাদি। আল-কুরআনে যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি বৃদ্ধি পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

“আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।”^৫ যাকাত পার্থিব জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও আখিরাতে ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলেও এর অর্থ বৃদ্ধি বলা হয়েছে।^৬ আল-কুরআনে যাকাত (زَكَاةً) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فَذِ الْأَفْلَحَ مِنْ تَرْكِي﴾ “যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সেই সফলকাম হয়েছে।”^৭ আল-কুরআন ও আল-হাদীসে যাকাত শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে সাদাকা (صَدَقَةً) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।^৮ যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ “আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন।”^৯ পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতীত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

ইবন আবিদীন আদ-দিমাশকী র. (১১৯৮-১২৫২ হি.) বলেন,

تَمْلِكُ الْمَالُ: أَيُّ الْمَعْهُودِ إِخْرَاجُهُ شَرْعًا مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمَمْلُوكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ فَلَا يُدْفَعُ لِأَصْلِهِ وَفَرَعِهِ لِلَّهِ تَعَالَى بَيَانٌ لِاشْتِرَاطِ النَّيَّةِ

“কোনো প্রকার উপকারের নিয়ত ব্যতীত (হাশেমী বংশ ও তাদের দাস-দাসী ব্যতীত অন্য) দরিদ্র মুসলিমদেরকে বার্ষিক নিসাবের নির্দিষ্ট অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়াকে যাকাত বলা হয়।”^{১০}

ড. ওয়াহাব ইবন মুত্তাফা আয-যুহায়লী (১৯৩২-২০১৫ খ্রি.) বলেন, الْمَالُ فِي الْمَالِ: حَقٌّ يَجِبُ فِي الْمَالِ “শরী‘আতের পরিভাষায়, সম্পদের মধ্যে অবধারিত হক তথা অধিকারকে যাকাত বলা হয়।”^{১১}

এম এ হামিদ বলেন, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকাত হলো বিভ্রাটের উপর আরোপিত এক ধরনের সুনির্দিষ্ট কর। বিভ্রাট বলতে যারা সম্পদের নিসাব অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা সময়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের মালিক তাদেরই বুঝায়।^{১২}

যাকাতের বিধান ইসলামী শরী‘আতের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا﴾

“আর তোমরা নামায কয়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।”^{১৩}

৩. যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলার হুকুম মেনে চলার নামই ইবাদত। এ ইবাদতকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা- দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত। দৈহিক ইবাদতের গ্রহণযোগ্য বাস্তব রূপ হচ্ছে নামায আদায় করা আর আর্থিক ইবাদতের বাস্তব রূপ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। এ দুটিই মুসলিম উম্মাহর সামর্থ্যবানদের প্রতি সমানভাবে ফরয বা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, যাকাত ইসলামের তৃতীয় ও অন্যতম স্তম্ভ। এ কারণেই ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। নবী করীম সা.-এর মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত। সকল মুসলিমের সামষ্টিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা স্বীকৃত। মুসলিম উম্মাহ যুগের পর যুগ বংশের পর বংশের মাধ্যমে তা পরিপালন করে আসছে।

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী বিধান পালিত হয়। এছাড়াও সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক জীবনে যাকাতের বহুবিধ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিদ্যমান। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি দুনিয়াবী ও পরকালীন কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়। অর্থাৎ যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করার পাশাপাশি পরকালীন জীবনে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ লাভের পথ সুগম হয়। যাকাতের নানাবিধ ইতিবাচক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকলেও যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾

“আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন। আপনি তার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দু‘আ করবেন।”^{১৪}

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْزُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

“মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সম্বলিত লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, তারা ই দ্বিগুণ লাভ করে।”^{১৫}

সাহাবীগণের সময় থেকেই বিশেষজ্ঞগণ একটি ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তা হলো, নামাযের পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ কুরআন মাজীদে অন্যতম একটি রীতি। এ দুটিকে পৃথকভাবে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম সা. বলেছেন,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ثَلَاثٍ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ أَطِيعُ اللَّهَ وَلَا أَطِيعُ الرَّسُولَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ৫৯] وَمَنْ قَالَ أَطِيعُ اللَّهَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

[البقرة: ৪৩] وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ شُكْرِ اللَّهِ وَشُكْرِ وَالِدَيْهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ১৪]

“যে ব্যক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করবে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার ও তাঁর রহমতের মধ্যে পার্থক্য করবেন। যে বলে, আমি আল্লাহর আনুগত্য করি, কিন্তু রাসুলের আনুগত্য করি না; অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো (সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৫৯)।” যে বলে, আমি নামায কয়েম করি, কিন্তু যাকাত দেই না, অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “নামায কয়েম করো ও যাকাত দাও (সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ৪৩)।” যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করে, অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও (সূরাহ লুকমান, ৩১ : ১৪)।”^{১৬}

আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা. বলেছেন, “আমরা আল্লাহর আদেশের মতো যাকাত দিই।”^{১৭} “তোমাদেরকে নামায কয়েম করা ও যাকাত দেওয়ার জন্য একসাথে আদেশ করা হয়েছে। তাই কেউ যাকাত না দিলে তার নামাযও হবে না।”^{১৮}

ইবন যায়দ র. (২১-৯৩ হি.) বলেছেন,

أَفْتَرَضَتِ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ جَمِيعًا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَقَرَأَ: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ. وَقَالَ: رَجِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ مَا كَانَ أَفْقَهُهُ

“নামায ও যাকাত একসাথে ফরয করা হয়েছে। এ দুটির মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন, “অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কয়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই (সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ১১)।” তারপর বললেন, যাকাত ছাড়া শুধু নামায গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আবু বকর রা.-কে রহম করুন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান ফিক্‌হবিদ।”^{১৯} কেননা তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন, আল্লাহ তা‘আলা যে দুটি জিনিসকে একত্র করেছেন, সে দুটিকে আমি কখনোই বিচ্ছিন্ন করব না।”^{২০}

৪. যাকাত আদায়ের প্রতিদান

যাকাত প্রদান ইসলামের অন্যতম আর্থিক ইবাদত হিসেবে গণ্য। সম্পদশালীরা যাকাত পরিশোধের মাধ্যমে সম্পদহীন দরিদ্রদের মুখে হাসি ফুটানোর ফলে আল্লাহ তা‘আলা যাকাতদাতাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। এছাড়া সম্পদশালী ব্যক্তির তাদের কষ্টার্জিত সম্পদের যথোপযুক্ত হিসাব করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ অসহায়-দরিদ্রদেরকে প্রদান করে থাকে, যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার আদেশের প্রতি মাথা নত করারই

বাস্তব প্রতিফলন। কেননা একদিকে যখন এক শ্রেণির মানুষ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে কেড়ে নিতে প্রস্তুত, ঠিক সেই মুহূর্তে আরেক শ্রেণির মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের সম্পদ হিসাব করে তার একটা অংশ নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত; তখন তো অবশ্যই তাদের জন্য কিছু একটা প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা থাকা উচিত এবং তা আছেও।

ক. ইহকালীন প্রতিদান

আল-কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানকারীদের জন্য ইহকালীন কিছু প্রতিদানের কথা ঘোষণা করেছেন। যাকাত প্রদানকারীকে মহাপুণ্য দান করা হবে মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

“কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও ঈমানদার, তারা তাও বিশ্বাস করে, যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যাকাত দানকারী এবং আল্লাহ ও আখিরাতে আস্থাশীল। বস্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করব মহাপুণ্য।”^{২০}

যাকাত প্রদানকারীর উপর আল্লাহ তা'আলার করুণা পরিবেষ্টিত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالٌ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

“আর পৃথিবীতে এবং আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, আমার শাস্তি- তা দিয়ে আমি আঘাত হানব যাকে ইচ্ছা করব, কিন্তু আমার করুণা- তা সবকিছুই পরিবেষ্টন করে। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।”^{২১}

যাকাত প্রদান করলে সম্পদ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়। যারা গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মতো তাঁর পথে ব্যয় করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা পরকালের পাশাপাশি ইহকালেও তাদের সমুদয় কাজ-কর্মে ব্যাপক বরকত, সচ্ছলতা ও উন্নতি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا

﴿أَرَىٰ لَكُمْ لِكُلِّ دِينٍ جُزْءًا بِمَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ دُونِهَا يُؤْتُونَ زَكَاةً تَرْيَدُونَ وَحَهُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ “আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যে যাকাত প্রদান কর, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।”^{২২}

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾

“যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সাওয়াব পুরোপুরি দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।”^{২৩}

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾ “আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন।”^{২৪}

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি যাকাতের অর্থ দরিদ্র শ্রেণি লাভ করার কারণে তাদের সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এভাবে উভয় শ্রেণির সম্পদই বৃদ্ধি পায়। যাকাত একদিকে যেমন যাকাতদাতার সম্পদকে পবিত্র করে তেমনি যাকাতদাতার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে সম্পদের প্রবৃদ্ধি সাধন করে। পাশাপাশি দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। কেননা মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়লে সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে

মানুষের অভাব-অনটন বেড়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, সর্বোপরি মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“তাদের সম্পদসমূহ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যেন এর মাধ্যমে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ করো, নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ তাদের জন্য সাভুনা স্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।”^{২৫}

যাকাত আদায়কারীর প্রতি নিয়মিত আল্লাহ তা'আলার রহমত বিশেষভাবে বর্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলার কারণে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের জন্য সুখ-শান্তির পথকে সুগম করে দেন। এছাড়া যাকাত প্রদানের কারণে যাকাতদাতার মনও থাকে উৎফুল্ল, স্বস্তি ও শান্তিতে ভরপুর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾

“অতএব, যে দান করে ও খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তার জন্য অবশ্যই সহজ করে দিব সুখ-শান্তির পথ।”^{২৬}

যাকাত প্রদানের ফলে যাকাতদাতার সাথে সকলেই ভালো আচরণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বিশেষ রহমত দান করেন। ফলে তাদের মনের সকল প্রকার কলুষতা আল্লাহ তা'আলা দূর করে তাদেরকে খাঁটি মুমিনে পরিণত করেন। এছাড়াও যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা পায় পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা। এতে একজন আরেকজনের বিপদাপদে এগিয়ে আসে। মানুষ মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে থাকে। সমাজ থেকে মানবতাবিরোধী সকল কর্মকাণ্ড দূরীভূত হওয়ার ফলে সমাজ ব্যবস্থা হয় সুন্দর। আর এরূপ সমাজের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহমত দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ “পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।”^{২৭}

যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ তা'আলা সত্যশ্রয়ী ও পরহেযগার বলে সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

“যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে ও যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যশ্রয়ী। আর তারাই হলো পরহেযগার।”^{২৮}

যাকাত প্রদান করা মুমিনের অন্যতম গুণাবলী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

“তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।”^{২৯}

যাকাত আদায়কারী হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ

يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

“নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করেছে, যাকাত আদায় করেছে ও আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”^{৩০}

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পদ পবিত্র ও বরকতময় হয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“আপনি তাদের (ধনীদের) সম্পদসমূহ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন। আপনি তার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দু'আ করবেন। নিঃসন্দেহে আপনার দু'আ তাদের জন্য সাভুনা স্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।”^{৩১}

আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্বীয় বান্দাদের যাকাত গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

“তারা কি এ কথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুত আল্লাহই তাওবা কবুলকারী, করুণাময়।”^{৩২}

যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবী ক্ষমতা দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ غَافِقُهُ الْأُمُورِ﴾

“তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন।”^{৩৩}

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো যাকাত প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

“আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।”^{৩৪}

পরকালীন প্রতিদান

আল-কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানকারীদের জন্য ইহকালীন প্রতিদানের পাশাপাশি পরকালীন বিশেষ প্রতিদানের কথাও ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

“নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার নিকট প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।”^{৩৫}

আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানকারীদের থেকে তাদের গুনাহ দূরীভূত করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَنِ أَقْمِتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

“যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরীসমূহ প্রবাহিত হয়।”^{৩৬}

যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ তা'আলা পরকালে উত্তম এবং বর্ধিতরূপে প্রতিদান প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রি পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং প্রতিদান হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”^{৩৭}

মোটকথা, আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাত আদায়কারী মুমিনদের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন প্রতিদানের ঘোষণা প্রদান করেছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো উক্ত প্রতিদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে সচেষ্ট হওয়া।

৫. যাকাত অনাদায়ের পরিণতি

আল-কুরআনে আয়াত ও রাসূল সা.-এর বহুসংখ্যক হাদীসে যাকাত অনাদায়কারীদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বিধৃত হয়েছে। এরূপ ভয় প্রদর্শনের কারণ হলো, চেতনাহীন মন-মানসে চেতনা সৃষ্টি এবং লোভী ও স্বার্থপর মানুষকে দানশীল হিসেবে তৈরি করা। কুরআন ও হাদীসে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহদানের পাশাপাশি ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদেরকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. পরকালীন পরিণতি

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় যাকাত অনাদায়কারীদের জন্য পরকালীন কঠিন শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে। স্বীয় মাল থেকে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কার্পণ্য করলে কিয়ামতের দিন উক্ত সম্পদকে তাদের গলায় বেড়ি হিসেবে পরিধান করানো হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ شَرًّا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

“যারা আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, তাদের জন্য তা মঙ্গলময়; বরং তা তাদের জন্য খুবই খারাপ। তারা যে মাল নিয়ে কার্পণ্য করে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে। আর আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।”^{৩৮}

যাকাতের ব্যাপারে কার্পণ্যকারীদের জন্য পরকালে লাঞ্ছনাদায়ক ও মর্মস্ফূট শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾

“যে কার্পণ্য করে ও লোকদের কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর লুকিয়ে রাখে আল্লাহ যা তাদের দিয়েছেন তাঁর করুণাভাণ্ডার থেকে। আর অবিশ্বাসীদের জন্যে আমরা তৈরি করেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।”^{৩৯}

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই লোকদের ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে গলাধঃকরণ করে, আর আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। বস্তুত যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে অথচ আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে মর্মস্ফূট শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন এগুলো উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনে, তারপর তা দিয়ে দাগ দেওয়া হবে তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পিঠে। এটিই তা যা তোমরা জড়ো করেছিলে, অতএব আশ্বাদন করো যা তোমরা জমিয়েছিলে।”^{৪০}

যাকাত অনাদায়কারীর জন্য পরকালে মহাদুর্ভোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

“আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।”^{৪১}

স্বীয় ধন-সম্পদ যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে রাখে কুরআনের ভাষায় তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَاؤُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী না করে। যারা এ কারণে অমনোযোগী হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল

অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি ব্যয় করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ খবর রাখেন।”^{৪২}

কৃপণতার কারণে যারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম আদায় করে না, তারা পরকালীন শাস্তির সম্মুখীন হবেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ “আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের (শাস্তির) জন্যে সহজ পথ দান করব।”^{৪৩}

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِنَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّصَدَّةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾

“খিক প্রত্যেক নিন্দাকারী কুৎসা রটনাকারীর প্রতি, যে ধনসম্পদ জমা করছে এবং তা গুনছে, সে ভাবছে যে তার ধনসম্পত্তি তাকে অমর করবে। কখনো না! তাকে অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে সর্বনাশা দুর্ঘটনায়। আর কীসে তোমাকে বুঝানো যাবে সেই হুতামাহ কী? তা আল্লাহ্র হুতামাহ, প্রজ্জ্বলিত রয়েছে; যা উদ্ভিত হয়েছে হৃদয়ের উপরে। নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে তাদের চারপাশে এক বেড়া। সারিসারি খুঁটির ভেতরে।”^{৪৪}

কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও যাকাত অনাদায়কারীদের জন্য পরকালীন কঠিন শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رِزْقَتَانِ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْمَتَيْهِ يَغِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

“যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দুপার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সা. তিলাওয়াত করেন, “যারা আল্লাহ্র দেওয়া ধন-সম্পদে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, তাদের জন্য তা মঙ্গলময়; বরং তা তাদের জন্য খুবই খারাপ। তারা যে মাল নিয়ে কার্পণ্য করে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে। আর আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহ্র। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৮০)।”^{৪৫}

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এর হুকুম (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরী করা হবে, অতঃপর তা দোষখের আগুনে গরম করা হবে। তারপর তা দিয়ে তার ললাট, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠান্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন একদিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোষখের দিকে।”^{৪৬}

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَيْكُوى بِهَا جَنْبَاهُ، وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ، كَأَوْفَرٍ مَا كَانَتْ، تَسْتَقُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ، كَأَوْفَرٍ مَا كَانَتْ فَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عُقْصَاءٌ وَلَا جُلْحَاءٌ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তাদের এ সম্পদ জাহান্নামের আগুনে গরম করে পাত তৈরি করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের দেহের উভয় পার্শ্ব ও ললাটে দাগ দেওয়া হবে। তার শাস্তি বান্দাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ সময়কার একটি দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোষখের দিকে। আর যেসব উটের মালিকেরা যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হবে এবং ঐসব উট স্থূল দেহ নিয়ে আসবে যেমনটি তারা পৃথিবীতে ছিল এবং এগুলো তাদেরকে পা দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে অগ্রসর হবে। এভাবে যখনই এর শেষ দলটি অতিক্রম করবে পুনরায় এর প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এগুলো এভাবে তাদেরকে মাড়াতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা তাঁর বান্দাদের বিচার শেষ করবেন। আর এ কাজ এমন একদিনে করা হবে, যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোষখের দিকে। আর যেসব ছাগলের মালিকেরা তার যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে এবং তার সে ছাগলগুলো মোটাতাজা অবস্থায় যেমনটি পৃথিবীতে ছিল— এসে তাদের খুর দিয়ে মাড়াবে এবং শিং মারতে মারতে অগ্রসর হবে। অথচ সেদিন কোনো একটি ছাগলই শিং বাঁকা, শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না। যখন এদের শেষ দল অতিক্রম করবে তখন পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। আর এভাবে আযাব চলতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা তাঁর বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করেন। এ শাস্তি এমন একদিনে হবে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাবানুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোষখের দিকে।”^{৪৭} আনাস ইব্ন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, *مَنْعَ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ* “যারা যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তারা জাহান্নামে যাবে।”^{৪৮}

খ. বৈষয়িক পরিণতি

কুরআনের দৃষ্টিতে যাকাত না দিয়ে কোনো ব্যক্তিই কল্যাণ লাভ করতে পারে না এবং সত্যবাদী নেককার ও মুত্তাকী লোকদের মধ্যেও গণ্য হতে পারে না। তা হতে হলে অবশ্যই নিয়মিত যাকাত আদায় করতে হবে। কোনো মুসলমান নিয়মিত যাকাত না দিলে অবিশ্বাসী মুনাফিকদের থেকে ভিন্নতর পরিচিতি লাভ করতে পারে না। এমনকি মুঠিবন্ধকারী এবং লোকদের জন্য ব্যয় করতে অস্বীকারকারী মুনাফিকদের থেকেও ভিন্ন পরিচয়ে ভূষিত হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যাকাত না দিলে কেউ আল্লাহ তা’আলার রহমত পাওয়ার যোগ্য অধিকারী হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা’আলা নিজেই যাকাত অনাদায়কারীদের জন্য রহমত লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَأَكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

“আর পৃথিবীতে এবং আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তিনি (আল্লাহ তা’আলা) বললেন, আমার শাস্তি— তা দিয়ে আমি আঘাত হানব যাকে ইচ্ছা করব, কিন্তু আমার

করণা- তা সবকিছুই পরিবেষ্টন করে। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।”^{৪৯}

যারা আল্লাহ তা’আলাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা’আলা কেবল তাদেরকেই সাহায্য করবেন। কিন্তু যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তি কখনোই এই সাহায্য পাবে না। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিদর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন।”^{৫০}

কৃপণতার দরুন যারা যাকাত আদায় করবে না, আল্লাহ তা’আলা দুনিয়াতে তাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

“শোনো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।”^{৫১}

যাকাত অনাদায়কারীদের জন্য রাসূল সা. কেবল পরকালীন শাস্তির ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং বৈষয়িক শাস্তির কথাও বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেছেন। সে শাস্তি যেমন শরী’আতসম্মত, তেমনি পরিণামগত। আর তা এমন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে, যে তার ধন-সম্পদে ধার্যকৃত আল্লাহ তা’আলা ও দরিদ্রদের হক আদায় করতে কার্পণ্য করবে। বুয়ায়দা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, **مَا مَنَعَ قَوْمٍ الزَّكَاةَ إِلَّا**

بِالسَّيْنِ “কোনো সম্প্রদায় যখন যাকাত আদায় করে না তখন আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে পতিত করেন।”^{৫২} আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের দিকে

এগিয়ে এসে বললেন, **وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا**, “যখন কোনো জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি ভূপৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তাহলে আর বৃষ্টিপাত হতো না।”^{৫৩} আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, **مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ**, “যে মালের সাথে সাদাকা (যাকাত) মিশ্রিত হবে, তা অবশ্যই ধ্বংস হবে।”^{৫৪}

এ হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত. সাদাকা অর্থাৎ যাকাত কোনো মালের মধ্যে রেখে দেওয়া হলে তা হিসাব করে মূল ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করা না হলে তা সেই ধন-মালের ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অপর একটি হাদীসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। উবাদা ইব্নুস-সামিত রা.

বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, **إِلَّا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ**, “হুলা ও জলভাগে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয় শুধু যাকাত আটকে রাখার দরুন। সুতরাং তোমরা তোমাদের মালের যাকাত সংরক্ষণ করো।”^{৫৫}

দ্বিতীয়ত. এমন ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করল, যে প্রকৃতপক্ষে যাকাতের উপর নির্ভরশীল নয়। সে এই কাজ করে তার নিজের ধন-মালের সাথে যাকাতকেও ধ্বংস ও বিনষ্ট করল। ইমাম আহমাদ র. (১৬৪-২৪১ হি.) হাদীসটির এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।^{৫৬}

আলী রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْمُخْلَلَّ وَالْمُخْلَلَّ لَهُ، وَالْوَاشِئَةَ وَالْمُؤَشُّومَةَ، وَمَنَعَ الصَّدَقَةَ

“নবী করীম সা. সুদ ভক্ষণকারী, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী, সুদী লেনদেনের লেখক, যে হালালকারী, যার জন্য হালাল করা হয়, যে অন্যের শরীয়ে নাম বা চিত্র অঙ্কন করে, যে অন্যের দ্বারা নিজের শরীয়ে চিত্র অঙ্কন করায়, যে যাকাত আদায় করে না, তাদের সবার উপর অভিশাপ দিয়েছেন।”^{৫৭} মোটকথা, যাকাত অনাদায়কারীদেরকে দুনিয়াতেও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

গ. শরী‘আতসম্মত শাস্তি

যাকাত অস্বীকারকারীদের জন্য দুনিয়াতে শরী‘আতসম্মত শাস্তির বিধান রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান এ শাস্তি প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল। বাহয় ইব্ন হাকীম র.-এর দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সা.-কে প্রত্যেক অবোধে বিচরণকারী উটের ব্যাপারে বলতে শুনেছি,

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَّبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حَسَبِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَلَى فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِأَيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ

“প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এই হিসাব থেকে কোনো উট বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়তে তা প্রদান করবে তাকে তার সাওয়াব প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা প্রদানে অস্বীকার করবে আমিই তার থেকে তা আদায় করে নিব এবং তার আরো অর্ধেক মাল (উট) আদায় করে নিব। এটি আল্লাহ্ তা‘আলার (অবশ্য পালনীয়) ওয়াজিবসমূহের একটি ওয়াজিব। যাকাতের কোনো বস্তু মুহাম্মাদ সা.-এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।”^{৫৮} উক্ত হাদীসে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

- যাকাত সম্পর্কে প্রকৃত কথা হলো, মুসলিম ব্যক্তি তা দিবে সাওয়াব পাওয়ার নিয়তে ও আশায়। সে সাওয়াব আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যাবে, এই দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করবে সে। কেননা সে তো তা নিয়ে আল্লাহ্ তা‘আলার নির্ধারিত ইবাদত পালন করছে মাত্র। কাজেই যে তা করবে, সে তার সাওয়াব ও শুভ কর্মফল অবশ্যই পাবে। আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে তাই তার ইবাদতের চূড়ান্ত প্রতিফল।
- যে লোক কার্পণ্য, লোভ-লালসা ও পার্থিব প্রেমে অন্ধ হয়ে পড়বে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, তাকে সে অবস্থায় থাকার সুযোগ দেওয়া যাবে না। তার কাছ থেকে তা জোরপূর্বক আদায় করতে হবে। আর উক্ত ক্ষমতা আসবে শরী‘আতের সার্বভৌমত্বের বলে। রাষ্ট্রই এই শক্তি প্রয়োগ করবে। তখন তার যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং শাস্তি ও দণ্ডস্বরূপ তার অর্ধেক ধন-সম্পদ নিয়ে দেওয়া হবে। কেননা সে তার ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তা‘আলার নির্ধারিত হককে গোপন ও অস্বীকার করছে। তা অন্যদের জন্যও শিক্ষামূলক হবে। ফলে আর কেউ যাকাত অনাদায়ের পথে অগ্রসর হবে না।
- কেউ কেউ বলেন, ইসলামের সূচনাকালে এরূপ শাস্তিদানের ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু এ কথার কোনো দলীল বা প্রমাণ নেই। কেবল সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে এই ধরনের কোনো কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র পরিচালকের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। যেখানেই দেখা যাবে লোকেরা যাকাত অনাদায়ের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, সেখানেই তা কার্যকর করা যাবে। কেননা এই কাজ থেকে তাদের বিরত রাখার বিকল্প কোনো পন্থা নেই।
- যাকাত আদায়ে এরূপ কঠোরতা ও দৃঢ়তা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে সমাজের গরীব ও মিসকীনদের অধিকার আদায়ের দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা। কেননা আল্লাহ্ তা‘আলাই তাদের জন্য যাকাত ফরয করেছেন। তা

তাদের প্রাপ্য। কিন্তু নবী করীম সা. এবং তাঁর বংশের লোকদের জন্য এই যাকাতের কোনো অংশ নেই। তাদের পক্ষে এ থেকে একবিন্দু গ্রহণ করাও হালাল নয়। এটি সাদাকা সম্পর্কে ইহুদীদের অবলম্বিত নীতিরও বিরোধী। কেননা তথায় যাকাতের দশমাংশ নবী হারুন (আ)-এর বংশধরদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর অপর একটি অংশ ধর্মীয় পদাধিকারী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।^{৫৯}

৬. যাকাত অনাদায়কারী ও অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে করণীয়

যাকাত অস্বীকারকারীদের শাস্তিদানের জন্য ইসলাম কোনো জরিমানার ব্যবস্থা চালু করেনি; বরং যাকাত অনাদায়কারী প্রতিটি শক্তিশালী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণাকেই ওয়াজিব করে দিয়েছে। আল্লাহর পথে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যে প্রাণ দান করা হয়, তা কখনোই মরে না বা মরতে পারে না। বস্তুত যাকাত অনাদায়কারী ও অস্বীকারকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বহুসংখ্যক হাদীস দ্বারা যেমন প্রমাণিত, তেমনি এর উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।^{৬০} ইবন উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

“আমি আদিষ্ট হয়েছি এজন্য যে, আমি যুদ্ধ করব লোকদের সাথে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।”^{৬১}

উক্ত হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা যাকাত দিতে স্বীকৃতি জানায় ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। রাসূল সা.-এর ইত্তিকালের পর প্রথম খলীফা আবু বকর রা.-এর আমলে বিভিন্ন গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। যদিও তারা নামায, রোযা পালনে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নামায ও যাকাত অভিন্নভাবে ফরয হওয়ার বিষয়টি তারা অস্বীকার করেছিল, যা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। মুসায়লামা কাযযাব, শাজাহ, তুলায়হা প্রভৃতি মিথ্যা নবুওয়াত দাবিদার এবং তাদের অনুসারীরা এ নীতিকে প্রবলভাবে সমর্থন জানালে সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়। এ সময় আবু বকর রা.-এর ভূমিকা ছিল অসামান্য। তিনি দৈহিক ইবাদত নামায এবং আর্থিক ইবাদত যাকাতের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর কোনো একটির প্রতি একবিন্দু উপেক্ষাও তিনি সহ্য করেননি। এমনকি একটি ছোট ছাগল বা উট বাঁধার একটি রশির ক্ষেত্রেও নয়। কেননা তাঁর পূর্বে রাসূল সা.-এর যুগে তা করা সম্ভব ছিল না।^{৬২} আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ فَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

“রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইত্তিকালের পর আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে আরবের কিছুসংখ্যক লোক মুরতাদ^{৬৩} হয়ে যায়। তখন উমার রা. (আবু বকর রা.-কে লক্ষ করে) বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেনি, বরং যাকাত দিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করেছে মাত্র)? অথচ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে, যে কেউ তা বলল, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে), আর তার অন্তরের গভীরে (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়।”^{৬৪}

তখন আবু বকর রা. জবাবে বললেন,

وَاللَّهُ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

“আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর শপথ! যদি তারা একটি মেস শাবক যাকাত

দিতেও অস্বীকৃতি করে, যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। উমার রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রা.-এর হৃদয়কে বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।”^{৬৫}

আবু বকর রা.-এর যুক্তির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, হাদীসের মূল বক্তব্য, যার সাথে এ নিরাপত্তার শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, তা হলো لَا يَجِدُكَ إِلَّا بِحَدِّهِ “তবে তার হক রক্ষার জন্য কিছু করতে হলে ভিন্ন কথা।” আর যাকাত হচ্ছে ধন-সম্পদের যাকাত। এ হক রক্ষার জন্য যুদ্ধও করা যাবে। এ কথা উমার রা. ও অন্যান্য অস্বীকার করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যাকাতকে নামাযের মতোই মনে করতে হবে। কেননা তা নামাযেরই সমগোত্রীয়। কুরআন ও হাদীসে সর্বত্র এ দুটি একসাথে ও পাশাপাশি উদ্ধৃত হয়েছে।^{৬৬} রাসূল সা.-এর ইত্তিকালের পর যে সব আরব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে প্রথম খলীফার অনুসৃত নীতির ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কিরাম রা. অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করে যুদ্ধে শরীক হন। এমনকি প্রথমে এ ব্যাপারে যাদের মনে সংশয় জেগেছিল তারাও তার মত গ্রহণ করেন। এ থেকে যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম একটি দলীল। ইমাম নববী র. (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, এক ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠী যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যুদ্ধ করতেও রাজি না হয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য।^{৬৭}

যাকাত অস্বীকারকারীরা কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা যাকাত না দেওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রদান করত। তা হলো, ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ “তাদের সম্পদসমূহ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যেন এর মাধ্যমে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ করো, নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ তাদের জন্য সাহুনা স্বরূপ। বস্ত্রত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।”^{৬৮}

উক্ত আয়াত দ্বারাই তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। এজন্য তারা দুটি যুক্তিও প্রদর্শন করেছিল। যথা:

প্রথমত: এ নির্দেশ বিশেষভাবে নবী করীম সা.-এর জন্য। তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রতি এই নির্দেশ ছিল না এবং অন্য কেউ সেই যাকাত আদায় করার অধিকারও রাখে না। তাই রাসূল সা.-এর ইত্তিকালের পরই যাকাত দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। **দ্বিতীয়ত:** রাসূল সা. আমাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের বিনিময়ে পবিত্রকরণ ও বিশুদ্ধকরণ কাজ করতেন এবং আমাদের জন্য রহমতের দু'আ করতেন। আর তাঁর দু'আ আমাদের জন্য শান্তি ও সাহুনার কারণ হতো। তাঁকে হারিয়ে আমরা এসব থেকেও বঞ্চিত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে তাদের এরূপ ধারণা ছিল মারাত্মক বিভ্রান্তিপ্রসূত এবং ভিত্তিহীন সংশয়মূলক একটি ব্যাপার।^{৬৯}

আবু বকর ইবনুল আরাবী র. (৪৬৮-৫৪৩ হি.) বলেন, কুরআনের ব্যাপারে এরূপ ধারণা মূর্খ লোকদের মনেই জাগতে পারে, যারা শরী'আতের উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থেকে বঞ্চিত অথবা যারা দীন নিয়ে খেল-তামাশায় অভ্যস্ত এবং যাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ।^{৭০} তাদের প্রথম যুক্তির জবাবে বলা যায়, উক্ত আয়াতের নির্দেশ যদিও রাসূল সা.-এর প্রতি ছিল, কিন্তু মূলত এই নির্দেশ সকল রাষ্ট্র পরিচালকের প্রতিই, যারা মুসলিম উম্মতের উপর কর্তৃত্ব লাভ করবে। আবু সুলায়মান আল-খাতাবী র. (৩১৯-৩৮৮ হি.) ও আবু বকর ইবনুল আরাবী র. বলেছেন, কুরআন মাজীদের সম্বোধন তিন প্রকারের। যথা:

এক. সাধারণ সম্বোধন, যার দ্বারা সমস্ত উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং পদযুগল গিটসহ ধৌত করো।”^{৭১}

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যে রূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।”^{৭২}

দুই. কিছু সম্বোধন বিশেষভাবে রাসূল সা.-এর জন্য নির্দিষ্ট। তাতে অন্য কেউই শরীক নেই। এরূপ সম্বোধনে সুস্পষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, যাতে অন্য কেউ উদ্দেশ্য না হওয়ার কথা বুঝা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ “রাত্রির কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাহত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত।”^{৭৩}

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মাহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।”^{৭৪}

তিন. কতিপয় সম্বোধনে রাসূল সা.-কে লক্ষ্য করে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে তিনিসহ সমস্ত মুসলিম উম্মত অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾

“সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কয়েম করুন এবং ফজরের কুরআন পাঠও।”^{৭৫} অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

“অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।”^{৭৬} আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بَأْسِلِحَتِهِمْ﴾

“যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়।”^{৭৭}

এ নির্দেশসমূহ বাহ্যত রাসূল সা.-এর প্রতি হলেও তা সকলের জন্যই পালনীয়। অনুরূপ যাকাত সম্পর্কিত আয়াতটিও ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ এ পর্যায়ের এবং সম্বোধনও বাহ্যত রাসূল সা.-এর প্রতি হলেও তা সাধারণভাবে সকল মুসলিমকেই পালন করতে হবে। এ ধরনের সম্বোধনে বিশেষ ফায়দা রয়েছে। যেমন রাসূল সা. আল্লাহর দিকে দীনের প্রথম আহবানকারী এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীর মূল ব্যাখ্যাদাতা। কাজেই এ ধরনের নির্দেশে তাঁকে সম্বোধন করা হলে দীনের শরী'আত প্রথমে তাঁরই দ্বারা পালিত হবে এবং তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে গোটা উম্মত তা পালনে সমর্থ হবে।^{৭৮}

তাদের দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলা যায়, এটা একটি ভিত্তিহীন কথা। কেননা এই পবিত্রকরণ ও পরিশুদ্ধকরণ যাকাতের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। কাজেই তা রাসূল সা.-এর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি তাঁর পরে অন্যদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবেই সম্পন্ন হবে। তাদের জন্য দু'আর ব্যাপারটিও অনুরূপ। রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসক যিনিই লোকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করবেন তিনিই যাকাতদাতাদের জন্য দু'আ করতে আদিষ্ট। আর এই দু'আতেই তাদের জন্য সাঙ্কনা নিহিত রয়েছে। এভাবে কার্য ও কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধান সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। এটি একটি সাধারণ ব্যাপার, শুধু রাসূল সা.-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাসূল সা.-এর দু'আর মর্যাদা সর্বোচ্চ এবং তার প্রভাবও মনে প্রাণে অনেক ব্যাপক ও গভীর, যার তুলনা হয় না। কিছু আলিম

বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল সা.-এর আনুগত্যের মাধ্যমে যাকাতদাতার জন্য রাসূল সা.-এর পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধকরণ ও দু'আ সবই লাভ করা সম্ভব। কেননা নবী করীম সা.-এর জীবদ্দশায় নেক আমলের যে সাওয়াব নির্ধারিত ছিল, তা চিরদিনই কার্যকর থাকবে, কোনোদিনই তা শেষ হবে না।^{৭৯}

৭. যাকাত অস্বীকারকারীর হুকুম

ইসলামী শরী'আতে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আলিমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানকে অস্বীকার করবে অথবা তার ফরয হওয়াকে অমান্য করবে, সে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে এবং ধনুক থেকে তীর যেমন বের হয়ে যায়, সেও ঠিক তেমনি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ইমাম নববী র. বলেছেন, যাকাত দেওয়া ফরয এ কথা স্বীকার করে কেউ যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে দেখতে হবে, সে কি নওমুসলিম হিসেবে এ সম্পর্কে এখনো জানতে পারেনি না কি সমাজসভ্যতা থেকে বহু দূরে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে এরূপ মনোভাব পোষণ করেছে? যদি তা হয়, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। তখন তাকে ভালোভাবে জানাতে ও বুঝাতে হবে এবং তারপর তার কাছ থেকে যাকাত নিয়ে নিতে হবে। তারপর যদি দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। আর যদি এমন হয় যে, প্রকৃত বিষয় তার নিকট সুস্পষ্ট, সে মুসলিম সমাজে মিলেমিশে বসবাস করে। এরূপ ব্যক্তি যাকাত অস্বীকার করলে কাফির হিসেবে গণ্য হবে এবং তার উপর মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কার্যকর হবে। প্রথমে তাকে তাওবা করতে বলা হবে, তাওবা না করলে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত এবং দীন ইসলামের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। কাজেই তা অস্বীকার করা হলে আল্লাহ্ তা'আলাকেই অস্বীকার করা হয় এবং রাসূল সা.-এর নির্দেশ অমান্য করা হয়। অতএব, এরূপ ব্যক্তির কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।^{৮০} ইবন কুদামাহ র. (৫৪১-৬২০ হি.) প্রমুখ ফিকহবিদও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।^{৮১}

শরী'আতের এই সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও ঐকমত্য সিদ্ধান্তের আলোকেই বলা যেতে পারে, যারা যাকাতকে অবহেলা ও উপেক্ষার চোখে দেখে এবং বলে, “এ যুগের জন্য যাকাত উপযুক্ত নয়।” তাদের এ জাতীয় কথাবার্তা সুস্পষ্ট মুরতাদের কাজ।^{৮২} যাকাতের এরূপ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করে না তা সম্ভব একমাত্র:

- নির্বোধ লোকদের পক্ষে।
- অল্প পণ্ডিত্য মূর্খ লোকদের পক্ষে।
- যারা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলাকে স্রষ্টা, রাসূল সা.-কে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেয় না এমন মুশরিকদের পক্ষে।
- দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত এবং আখিরাত সম্পর্কে অমনোযোগী লোকদের পক্ষে।
- মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড করার কারণে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অভিসম্পাত নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে।
- বিবেক বর্জিত, আদর্শহীন, মানবতাহীন যাদের সম্পদের পাহাড়ে ঘিরে আছে এবং ভালোবাসা, মমত্ববোধ, আদর-শ্রদ্ধা যাদের মন থেকে সরে গেছে এমন সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন অন্যের হক হরণকারী ব্যক্তিদের পক্ষেই যাকাত না দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে কি তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলার দুনিয়াতে অবস্থান গ্রহণ করে দম্ব করে চলবে! না তা তো হতেই পারে না। যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট নন তারা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আছে ও থাকবে, শুধু তাদের জ্ঞান চক্ষু নেই বলে তারা বুঝতে পারে না। তাদের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি সুনিশ্চিত।^{৮৩}

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত ইসলামের একটি বাধ্যতামূলক বিধান ও দীনের একটি মৌলিক স্তম্ভ। যাকাত প্রদান দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং তা দরিদ্রদের হক। আর উক্ত হক ধনীদের জন্য আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তাই অন্যান্য ইবাদতের মতো যাকাত আদান-প্রদানের বিষয়টিও খালিস নিয়তে করা উচিত।

৮. উপসংহার

মানুষের জীবনে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মেনে চলার নামই ইবাদত। আর যাকাতকে ইসলামের অন্যতম একটি ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামের তৃতীয় ও অন্যতম স্তম্ভ হওয়ায় ইসলামী শরী'আতে যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী বিধান পালিত

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ১ লুইস মালুফ, আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়ালা-আদাবি ওয়াল-উলুম (বৈরুত: আল-মাতবা'আতুল-কাছলীকিয়াহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা (বৈরুত: দারুল-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩।
- ২ ইবন মানযুর আল-ইফরীকী, লিসানুল-আরব, ১৪শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫৮; হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (বৈরুত: দারুল কলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; আশ-শরীফ আল-জুরজানী, আত-তারীফাত (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১৪; সম্পাদনা পরিষদ, আরবী-বাংলা অভিধান, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১০৮৭।
- ৩ Thomas Patrick Hughes, Dictionary of islam (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699.
- ৪ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379.
- ৫ সূরাহ আর-রুম: ৩৯।
- ৬ শামসুল আইয়্যাহ আস্-সারাখসী র. (মৃ. ৪৯০ হি.) বলেন, الرَّكَاءُ فِي اللَّعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الثَّمَاءِ وَالزَّيَادَةِ وَمِنْهُ يُقَالُ رَكَءَ الزُّرْعُ إِذَا مَّا فَسَمِيَتْ ﴿وَمَا أَنْتَقُمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلَفُهُ﴾ د. শামসুল আইয়্যাহ আস্-সারাখসী, আল-মাবসূত, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল মারিফাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৪৯; সায়্যিদ সাবিক র. বলেন, وَتَرْكِيَةُ النَّفْسِ وَتَمَتُّهَا بِالْخَيْرَاتِ وَاسْمٌ لَهَا زَكَاةٌ لَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَجَاءِ الْبُرْكِ، وَتَرْكِيَةُ النَّفْسِ وَتَمَتُّهَا بِالْخَيْرَاتِ د. সায়্যিদ সাবিক, ফিক্‌হুস-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩২৭।
- ৭ সূরাহ আল-আলা: ১৪।
- ৮ আল-মাওয়ারদী বলেন, যাকাত-ই সাদাকা এবং সাদাকা-ই যাকাত। নাম পার্থক্যপূর্ণ হলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে, তা এক ও অভিন্ন। দ্র. ইউসুফ আল-কারযাভী, ফিক্‌হুস-যাকাত, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাযাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৪০।
- ৯ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১০৩।
- ১০ ইবন আব্বাস আদ-দিমশকী, রাদ্দুল মুহতার আল্লাদ-দুররিহ মুখতার, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৫৮।
- ১১ ড. ওয়াহবাহ ইবন মুত্তাফা আয-যুহায়লী, আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ, ৩য় খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিকর, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ১৫২।
- ১২ এম এ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি, ভাষান্তর ও সম্পাদনা: প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৩৩।
- ১৩ সূরাহ আল-বাকারাহ: ৪৩।
- ১৪ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১০৩।
- ১৫ সূরাহ আর-রুম: ৩৯।
- ১৬ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, আল-জার্মি লি আহকামিল চম খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৮১।
- ১৭ মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তবারী, জামিউল-বায়ান ফী তা'বীলিল-তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ১৪শ খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাযাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৫৩; আল-জার্মি লি আহকামিল চম খণ্ড, পৃ. ৮১।

- ১৮ জামি'উল-বায়ান ফী তা'বীলিল-কুরআন, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫৩; আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
- ১৯ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।
- ২০ সূরাহ আন-নিসা: ১৬২।
- ২১ সূরাহ আল-আ'রাফ: ১৫৬।
- ২২ সূরাহ আর্-রুম: ৩৯।
- ২৩ সূরাহ ফাতির: ২৯-৩০।
- ২৪ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৭৬।
- ২৫ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১০৩।
- ২৬ সূরাহ আল-লায়ল: ৫-৭।
- ২৭ সূরাহ সাবা: ৩৯।
- ২৮ সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৭৭।
- ২৯ সূরাহ আল-মায়িদাহ: ৫৫।
- ৩০ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১৮।
- ৩১ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১০৩।
- ৩২ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১০৪।
- ৩৩ সূরাহ আল-হাজ্জ: ৪১।
- ৩৪ সূরাহ আন-নূর: ৫৬।
- ৩৫ সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৭৭।
- ৩৬ সূরাহ আল-মায়িদাহ: ১২।
- ৩৭ সূরাহ আল-মুযাযামিল: ২০।
- ৩৮ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১৮০।
- ৩৯ সূরাহ আন-নিসা: ৩৭।
- ৪০ সূরাহ আত-তাওবাহ: ৩৪-৩৫।
- ৪১ সূরাহ হা-মীম আস-সাজদাহ: ৬-৭।
- ৪২ সূরাহ আল-মুনাফিকুন: ৯-১১।
- ৪৩ সূরাহ আল-লায়ল: ৮-১০।
- ৪৪ সূরাহ আল-হুমাযাহ: ১-৯।
- ৪৫ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল-বুখারী (বৈরুত: দারু ইব্ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), সহীহুল-বুখারী, কিতাবু-যাকাত, বাবু ইছমি মানি'ইয-যাকাতি, হাদীস নং ১৪০৩।
- ৪৬ মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-কুরায়শী আন-নায়াসপুরী, সহীহ মুসলিম (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত-তুরাখিল-আরাবী, তা.বি.), কিতাবু-যাকাত, বাবু ইছমি মানি'ইয-যাকাতি, হাদীস নং ২৪ (৯৮৭)।
- ৪৭ সহীহ মুসলিম, কিতাবু-যাকাত, বাবু ইছমি মানি'ইয-যাকাতি, হাদীস নং ২৬ (৯৮৭)।
- ৪৮ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুস সগীর (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), বাবুল মীম, মান ইসমুহু মুহাম্মাদ, হাদীস নং ৯৩৫।
- ৪৯ সূরাহ আল-আ'রাফ: ১৫৬।
- ৫০ সূরাহ আল-হাজ্জ: ৪০-৪১।
- ৫১ সূরাহ মুহাম্মাদ: ৩৮।
- ৫২ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত (কায়েরো: দারুল হারামায়ন, ১৪১৫ হি.), বাবুল আয়ন, মান ইসমুহু আবদান, হাদীস নং ৪৫৭৭।
- ৫৩ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, সুনানু ইব্ন মাজাহ (মিসর: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়াহ, তা.বি.), কিতাবুল ফিতান, বাবুল উকূবাত, হাদীস নং ৪০১৯।
- ৫৪ আস-সুনানুল কুবরা, কিতাবু-যাকাত, বাবুল হাদিয়াতি লিল-ওয়ালী কিসাবাবিল ওয়ালায়াতি, হাদীস নং ৭৬৬৬।
- ৫৫ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত-তাবারানী, মুসনাদুশ-শামিয়ীন (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ইবরাহীম ইব্ন আবী আবলাহ আন উবাদা ইব্নুস-সামিত ওয়া লাম ইয়াসমা' মিনহু, হাদীস নং ১৮।
- ৫৬ ফিক্‌হু-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭।
- ৫৭ আল-মু'জামুস সগীর, বাবুল মীম, মান ইসমুহু মুহাম্মাদ, হাদীস নং ৭০৬৩।
- ৫৮ আহমাদ ইব্ন শু'আযব আন-নাসাঈ, সুনানু-নাসাঈ (বৈরুত: দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবু-যাকাত, বাবু উকূবাত মানি'ইয-যাকাত, হাদীস নং ২৪৪৪; সুনানু আবী দাউদ, কিতাবু-যাকাত, বাবুল ফী যাকাতিস-সাইমাহ, হাদীস নং ১৫৭৫।

- ৫৯ ফিক্‌হ্-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮।
- ৬০ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৭৯।
- ৬১ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুল-ঈমান, বাবুন ফা ইন তাবু ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আতাওয্-যাকাত ফা খালু সাবীলাহুম (সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ৫), হাদীস নং ২৫।
- ৬২ ফিক্‌হ্-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০।
- ৬৩ মুরতাদ: مَرْتَدٌ শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ হলো, স্বধর্মত্যাগী, স্বপক্ষত্যাগী ইত্যাদি। পরিভাষায়, যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায় তাকে মুরতাদ বলে। অর্থাৎ স্থায়ী ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগকারীকে মুরতাদ বলা হয়। দ্র. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), ৪৭৭; মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৪২১।
- ৬৪ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ওজুবিয্-যাকাতি, হাদীস নং ১৩৯৯।
- ৬৫ তদেব, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ওজুবিয্-যাকাতি, হাদীস নং ১৪০০।
- ৬৬ ফিক্‌হ্-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
- ৬৭ তদেব।
- ৬৮ সূরাহ আত-তাওবাহ: ১০৩।
- ৬৯ ফিক্‌হ্-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।
- ৭০ আবু বকর ইবনুল আরাবী, আহকামুল সূরাহ আল-বাকারাহ:য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৭৬।
- ৭১ সূরাহ আল-মায়িদাহ: ৬।
- ৭২ সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৮৩।
- ৭৩ সূরাহ বনী ইসরাঈল: ৭৯।
- ৭৪ সূরাহ আল-আহযাব: ৫০।
- ৭৫ সূরাহ বনী ইসরাঈল: ৭৮।
- ৭৬ সূরাহ আন-নাহল: ৯৮।
- ৭৭ সূরাহ আন-নিসা: ১০২।
- ৭৮ আবু বকর ইবনুল আরাবী, আহকামুল সূরাহ আল-বাকারাহ:য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৬-৫৭৭; আবু সূলায়মান আল-খাভাবী, মা'আলিমুস-সুনান, ২য় খণ্ড (হালব: আল-মাতবাতুল ইলমিয়াহ, ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ৫৭৬-৫৭৭।
- ৭৯ ফিক্‌হ্-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।
- ৮০ মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন-নববী, আল-মাজমু' শারহুল-মুহাযযাব, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৩৩১-৩৩২।
- ৮১ ইবন কুদামাহ আল-মুকাদ্দিসী, আল-মুগনী, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪২৭-৪২৮।
- ৮২ ফিক্‌হ্-যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫।
- ৮৩ জাবেদ মুহাম্মাদ, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৫ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঘরানার সূত্র [The Origin of Gharana in North Indian Classical Music]

ড. সোনিয়া শারমিন খান*

[Abstract: Several gharanas of music developed in different parts of the Indian subcontinent, especially North India. A gharana gets an individual identity based on vocal and instrumental characteristics of identical ragas. It is recognized only when this independent mutualism of individual tradition develops and is established among music lovers for at least three generations. Although the gharana of classical music clearly dates to the eighteen century, it has a long tradition. This tradition seems to have played a positive role to establish gharanas. An attempt has been made to highlight the involvement of the main gharana with the types of primitive songs, different opinions of ancient raga classification, distinctive styles of Kawal and Kalavanta sects, differences in the four styles of dhrupada and diverse singing characteristics of Kirtana through this research work.]

Keywords: Gharana, Different style, Origins, Generations, Classical music, Court Song, North Indian, Early Eighteenth and Nineteenth Century.

১. ভূমিকা

ভারতীয় সংগীতের মূলভিত্তি হলো রাগ। এই রাগ গায়ন বা বাদনের স্বতন্ত্র মত থেকে স্বতন্ত্র ঘরানার সৃষ্টি হয়েছিল। সংগীতের এ ঘরানাগুলো গড়ে উঠেছিল ভারতীয় উপমহাদেশ তথা উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে। উত্তর ভারতে যে সংগীত চর্চা হয়ে আসছে তাকে উত্তর ভারতীয় সংগীত বা হিন্দুস্থানী সংগীত হিসেবে অভিহিত করা হয়। উত্তর ভারতীয় সংগীত বা হিন্দুস্থানী সংগীত একদিনে গড়ে ওঠেনি। নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে উত্তর ভারতে খেয়াল ও ধ্রুপদ এই দুটি মূল ধারার সংগীতের প্রচলন রয়েছে। আর এ দুটি মূল ধারার সংগীতকে রাগসমূহের উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র রীতিবৈশিষ্ট্য, ঢং তথা স্টাইলে উপস্থাপন করার প্রয়াস থেকে সৃষ্টি হয়েছে ঘরানা। ভিন্নধর্মী এই ঢং তথা স্টাইলকে স্বতন্ত্র মত হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। উত্তর ভারতে গায়ন ও বাদনের ভিন্নধর্মী এই ঢং তথা স্টাইল বা স্বতন্ত্র মতই ঘরানার রূপ নেয়। উত্তর ভারতীয় সংগীতে শুধু ঘরানাই নয় এমন অনেক সাংগীতিক সূত্র পাওয়া যায় যা ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোকে পরিপুষ্ট হয়েছে ও বিস্তৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ১. আদিম গানের প্রকার, ২. প্রাচীন রাগ প্রকরণের ভিন্ন ভিন্ন মত, ৩. কাওয়াল ও কলাবন্ত সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র রীতি, ৪. ধ্রুপদের চার বাণীর ভিন্নতা, ৫. কীর্তনের বৈচিত্র্যধর্মী গায়নবৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত এই সূত্রগুলোও ঘরানার ধারণার সাথে অনেকটায় সাজসুপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, এই সূত্রগুলো উত্তর ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিবর্তনের ধারার সাথে একটি ঐক্য রক্ষা করে চলেছে যা ঘরানা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ না হলেও এটি ঘরানা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে।

২. উত্তর ভারতীয় সংগীতের পরিচয়

ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির একটি বৃহৎ অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংগীত। বর্তমানে ভারতীয় সংগীতের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অবশ্য একদিনে গড়ে ওঠেনি। যুগে যুগে বিভিন্ন উত্থানপতন ও বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে ভারতীয় সংগীতের দুটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি উত্তর ভারতীয় সংগীত বা হিন্দুস্থানী সংগীত এবং অপরটি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত বা কর্ণাটকী সংগীত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই দুটি ধারার মধ্যে কোন ভিন্নতা পরিলক্ষিত

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

হয়নি। ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশের হাত ধরে মধ্যযুগের বিস্তৃতির একটি পর্বে এ দুটি পৃথক ধারার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়।

উত্তর ভারতে যখন সঙ্গীতে অভিনব রীতির সন্ধান এসেছে তখন দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতিক গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের একটি ধারণা পাওয়া যায় সে সময়ে রচিত গ্রন্থ থেকে। ১৩২০-১৪১৩ তুঘলক বংশের রাজত্বকালে ১৩৯০ সালে সিংহভূপাল রচনা করেন সঙ্গীত রত্নাকরের টীকা। মাধব বিদ্যারণ্য (১৩০২-১৩৮৭) রচিত 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায় 'জনক-জন্য' রাগ বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচেষ্টা। পরে গোবিন্দ দীক্ষিত (১৬১৪) এবং ব্যঙ্কটমুখী (১৬২০) রাগ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে আলোকপাত করেন। এর ফলে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে ভিন্নমুখী ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয়, এমনকী উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর, শ্রুতির সাথে 'tonal quality'-রও পার্থক্য ঘটতে থাকে।^১

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সহজে অনুমান করা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই উত্তর ও দক্ষিণভারতীয় সংগীতের দুটি আলাদা পথ রচিত হয়েছিল। চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকে রচিত সঙ্গীতিক গ্রন্থের আলোকে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মধ্যে পার্থক্যের বেশ কিছু চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী সময় সপ্তদশ শতকে তা আরও প্রকটভাবে ভিন্নতার দিকে ধাবিত হয়। তৎকালীন গুণী সঙ্গীতজ্ঞ গোবিন্দ দীক্ষিত ও ব্যঙ্কটমুখীর রাগ বর্গীকরণের বিশ্লেষণে তা আরও স্পষ্টতর হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত একই গতিতে প্রবাহমান ছিল। এটি উত্তর ভারতীয় বা দক্ষিণ ভারতীয় বলে পৃথক দুটি ধারা নয় বরং একটি অভিন্ন সাংগীতিক অবকাঠামোরই চর্চা হতো সমগ্র ভারতে। তাই উত্তর ভারতীয় সংগীতের পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত সাংগীতিক কাঠামো থেকেই। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ভারতীয় সাংগীতিক অবকাঠামোটি আরও সমৃদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত কর্ণাটক অঞ্চলের আঞ্চলিক (ভাষার উচ্চারণে ভিন্নতা, সুর প্রয়োগের ভিন্নতা) প্রভাবযুক্ত হওয়ায় তা মূলধারার সংগীত থেকে ভিন্নতর আঙ্গিকের দিকে ধাবিত হয় কিন্তু উত্তর ভারতীয় সংগীত প্রাচীন মূলধারার সংগীত থেকে খুব একটা বিচ্যুত হয়নি। তাই উত্তর ভারতীয় সংগীতকে হিন্দুস্থানী সংগীত বা সর্বভারতীয় সংগীত বললে অত্যাুক্তি হয় না। এই সর্বভারতীয় সংগীতের ধারাটি কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে পূর্ণতা পেয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করলে হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো পাওয়া যায়।

প্রাকবৈদিক যুগ- বৈদিকযুগ- বৈদিকোত্তর যুগ- মধ্যযুগ (সুলতানী বংশ)- মধ্যযুগ (মুঘল বংশ)- আধুনিক যুগ। সময়ে সাথে সাথে পর্যায়ক্রমিক এ ধাপগুলোতে নতুন নতুন সংযোজন ঘটেছে, গায়নবৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা এসেছে, ব্যাকরণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তথাপি বলা যায় এই পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহের পুরো প্রক্রিয়ায় সামগ্রিকভাবে একটি ঐক্য রচিত হয়েছিল। পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস রাখা হলো:

বিভিন্ন যুগের পর্যালোচনায় দেখা যায় হিন্দুস্থানী সংগীতের ভিত্তি রচিত হয় মূলত বৈদিক যুগে। তবে বৈদিক যুগের অনেক পূর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে সংগীতের প্রচলন ছিল। প্রাকবৈদিক যুগে বিশেষ করে সিদ্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত সেটিই নির্দেশ করে। এ সম্বন্ধে সংগীতজ্ঞ ড. উৎপলা গোস্বামীর মতামত প্রণিধাযোগ্য:

সিদ্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খননকার্যে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ স্যার জন মার্শাল, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়াময় সাহানী প্রমুখের মতে সিদ্ধু সভ্যতাই প্রাকবৈদিক সভ্যতা।... বৈদিক যুগের আগেই ভারতে সংগীত কলার প্রসার ঘটেছিল। কারণ মহেঞ্জদারো এবং হরপ্পা থেকে সংগীতকলার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে সে যুগের সংগীত ও নৃত্যকলার একটা সুসম্বন্ধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।^২

সিদ্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে ছিদ্রযুক্ত বীণা, চামড়াচ্ছাদিত আনন্দ বাদ্য, নৃত্যরত নারীমূর্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, সিদ্ধু সভ্যতা সংগীতের বিকাশের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হয়েছিল। সে সময় যে গানের প্রচলন ছিল তাত্ত্বিকগণ সে গানকে আদিম গান হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই আদিম গানের আবার দুটি রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি ধর্মীয় রূপ ও আরেকটি সামাজিক রূপ। পরবর্তী সময় বৈদিকযুগের সংগীতে আদিম

গানের ধর্মীয় রূপের ছায়াপাত প্রত্যক্ষ করা যায়। কেননা বৈদিক সংগীতের সমগ্র প্রামাণ্য দলিল হলো বেদ ধর্মগ্রন্থ নির্ভর। তাই সে সময় বৈদিকযুগের গান ধর্মীয় ভাবধারার প্রভাববর্জিত ছিল তা ভাবার অবকাশ নেই। একই সাথে পূর্বোক্ত আদিমগানের ধর্মীয় রূপের সাথে পরবর্তী বৈদিকযুগের সংগীতের যোগসূত্র স্থাপিত হবে তা সহজে অনুমেয়।

বেদ রচনার সুদীর্ঘ কালকে বৈদিকযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এই বৈদিকযুগ তথা বেদের রচনাকাল প্রায় দীর্ঘ দেড় হাজার বছর বিস্তৃত ছিল। এর সূচনাপর্বে ভারতীয় সংগীতের সাতটি সুরের বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। বেদের মন্ত্র ও সুর করে গানের আকারে পাঠ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময় যে গানের প্রচলন ছিল তা ‘সামগান’ বলে পরিচিত ছিল। এ সম্পর্কে ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ বলেন, ‘আমরা সোজা সাপটা বলতে পারি যে ‘সাম’ হচ্ছে মূলতঃ ঋক্ বা ঋচ্ অর্থাৎ মন্ত্রের সমষ্টি যা সুরসহ বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদিতেই কেবল গাওয়া হতো।’^৩ অর্থাৎ ধর্মীয় উপাসনালয়ে যারা যাগযজ্ঞ করতেন তারাই এই সামগান গাইতেন। বৈদিক যুগ পরবর্তী যে সাংগীতিক ধারা বিকশিত হয়েছে তা বৈদিকযুগকে অনুসরণ করেই ঘটেছে। কেননা পরবর্তী যুগের সাংগীতিক অবয়বের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোও ধর্মীয় ভাবধারা সমৃদ্ধ। যেমন: বৈদিক পরবর্তীযুগ হলো পৌরানিক যুগ। পুরান সাহিত্যের আলোচনায় যে সাংগীতির বর্ণনার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় তা বৈদিক সামগান প্রভাবিত। একই সাথে পুরাণ পরবর্তী মহাকাব্যের (রামায়ণ, মহাভারত) যুগও এর পরিপন্থি নয়। উল্লেখ্য যে, মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত ধর্ম গ্রন্থ থেকে তৎকালীন সংগীতের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু বৈদিক পরবর্তী বৈদিকোত্তর যুগে সংগীতের ব্যাকরণবিধির আলোকে সংগীত গ্রন্থই রচিত হতে দেখা যায়। যেমন: নারদের শিক্ষাগ্রন্থ, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্রের গ্রন্থ, সঙ্গীত পারিজাত, সংগীত রত্নাকর প্রভৃতি। তৎকালীন গুণী সংগীতজ্ঞগণ এই গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে জানা যায়:

ভরতের পর সঙ্গীত শাস্ত্রী হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন স্বাতী, কোহল, শাভিল্য, বিশ্বাখিল, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি, শার্দূল, দন্তিল, নন্দিকেশর, তুম্বুরু, যাষ্টিত, মতঙ্গ প্রভৃতি। এরা খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশাস্ত্রী।^৪

উপরোক্ত তথ্যমতে বলা যায় বৈদিক পরবর্তী বৈদিকোত্তর যুগে সংগীত বিষারদ তাঁদের রচিত গ্রন্থের আলোকে তৎকালীন সাংগীতিক পটভূমি ও পরিসর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস রেখেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সে সময় গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীত বলে এক ধরনের গানের চর্চার কথা জানা যায়। অনেকে এটিকে বৈদিকযুগের সামগানের প্রকার বলেও অভিহিত করে থাকেন। এ সম্বন্ধে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন,

বৈদিক সঙ্গীত সামগানের অনুশীলন তখন মন্ত্র হলেও রাজদরবারে সাহিত্যিক ব্রাহ্মণদের সমাজে তার অনুশীলন বেঁচে ছিল। স্তোম, স্তোত্র, ঋক্, সাম, গাথা প্রভৃতি গানের পাশাপাশি সামগানের অনুকরণে ও নূতন ধারায় প্রবর্তিত আভ্যুদয়িক ও নিঃশ্রেয়মূলক গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। গান্ধর্বের মান ও কৌলিন্য তখন সামগানের মতোই সমুন্নত ছিল।^৫

এই গান্ধর্ব গান ছিল অভিজাত শ্রেণীর গান এবং একই সাথে ধর্মীয় রীতিনীতির যারা কর্ণধার ছিলেন তাঁরা এই গানগুলো সাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ধর্মীয় রীতিনীতির কর্ণধার ছাড়াও সমাজের অভিজাত শ্রেণীদের মধ্যেও ভিন্ন আঙ্গিকের গানের চর্চা ছিল। সেগুলো লৌকিক ষড়্জাদি স্বরের দেশী গান ও লৌকিকগান নামে পরিচিত ছিল। এই গানগুলো আঞ্চলিক প্রভাবসম্পন্ন ছিল। একটি অঞ্চলের আঞ্চলিক রীতিনীতি, জলবায়ু, উচ্চারণের ভিন্নতা এ গানগুলোকে প্রভাবিত করতো। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে স্বকীয় ধারা নিয়ে গড়ে উঠেছিল দেশীগান ও লৌকিক গানগুলো। তবে গান্ধর্বগান আবার দেশী-লৌকিক প্রভাব বিবর্তিত ছিল তাও বলা যায় না। গান্ধর্ব ও লৌকিক গানের আশ্রয়ে সে সময় পাঁচ ধরনের গীতেরও পরিচয় যায়। সেগুলো হলো: ‘শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী গীতি।’^৬ শুধু তাই নয় গান্ধর্ব গান ও সাথে দেশী-লৌকিক গানের মিশ্রণে বিভিন্ন রাগের উৎপত্তিও হয় এ সময়। এ সম্পর্কে জানা যায়:

গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের সঙ্গে সামগানের যেমন একটা নিশ্চিত সম্পর্ক ছিল, সেরকম ভরতের পরের যুগে গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীতের সঙ্গে আঞ্চলিক কলাশ্রয়ী সংগীতের সমন্বয় ঘটে উন্মোচিত হয়েছিল দেশী গানের। ‘দেশী’-

অর্থে লোক সঙ্গীত নয়, লোক প্রচলিত কলাশ্রয়ী গান যা মার্গ-সঙ্গীত থেকে সত্ত্ব। এই দেশী সঙ্গীতই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রাগ সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছে।^৭

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই রাগসমূহকে অবলম্বন করেই উত্তর ভারতীয় সংগীত ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে সৃষ্ট গায়নশৈলীগুলো বিকশিত হয়েছে। তাই, এই আলোচনার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে রাগের পরিচয় উপস্থাপনের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।

রাগের পরিচয়- রাগ হলো স্বরের বিন্যাসে সৃষ্ট একেকটি ভাব। এ সম্পর্কে জানা যায়- ‘রাগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো একটি ভাবকে প্রকাশ করা। সেই প্রকাশের মূল ভাষা হলো সুর যা সুনির্দিষ্ট স্বরসমাহারের ভিত্তিতে রূপায়িত হয় এবং একটি ভাবের অবতারণা করে।’^৮ অর্থাৎ একাধিক স্বর দ্বারা সৃষ্ট একটি বিশেষ ভাবসম্পন্ন সুরকাঠামোই হলো রাগ। তবে শুধু ভাবের পরিচায়ক রাগ নয় আবার স্বরসমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট সুর বিন্যাসের একেকটি রূপও রাগ নয়। এরমধ্যে স্বর ও সুর বিন্যাসের সাথে ভাবের একটি ঐক্য থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, রাগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাকরণভিত্তিক নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে আরও জানা যায়:

নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ বা নিয়ম মেনে রাগ-রূপায়ণ করা হয়। নিয়মে আবদ্ধ থাকলেও তার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট একটি ভাব বিরাজমান। এই ভাবটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করাই রাগের মূল উদ্দেশ্য। কোন কোন রাগের ব্যাপ্তি বা পরিধি থাকে সীমিত আবার কোন কোন রাগের পরিধি থাকে ব্যাপ্তি থাকে বৃহৎ। কিন্তু সব রাগেই একটি সীমানা নির্ধারণ করা থাকে। সুর একটি বাগন। কখনও কখনও বাণী সহযোগে আবার কখনও কখনও বাণী ছাড়া সুর সুর একাই সে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অবগাহন করে রাগের ভাবকে স্পষ্ট করে।^৯

রাগ সত্ত্বভাবেই একটি সুরের ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এজন্য সবসময় বাণীর আশ্রয় নিতে হবে এমন নয়। বাণীর আবহ ছাড়াই একেকটি রাগ একেকটি সুরের আবেশ তৈরী করতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত এই রাগের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ উত্তর ভারতীয় সংগীত ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত এ নামের পার্থক্য থাকলেও রাগের বিনির্মাণ কিন্তু একই। শুধু গায়নশৈলী বা পরিবেশনরীতিতে পার্থক্য থাকায় উত্তর ভারতীয় সংগীত ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত আলাদা দুটি যুগপথ রচনা করেছে। যেমন: উত্তর ভারতীয় সংগীতে গীতিশৈলীর মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল, তারানা, টপ্পা, ঠুমরী মুখ্য। এই গীতিশৈলীগুলো বিভিন্ন প্রকার রাগের আশ্রয়ে গাওয়া হয়। তেমনি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন প্রকার গীতিশৈলী বিদ্যমান যা বিভিন্ন প্রকার রাগের আবহে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এই আলোচনা থেকে বৈদিকোত্তর যুগের কিছু বিশেষ দিক প্রতীয়মান হয়। যা উত্তর ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

প্রথমত, এ যুগে সংগীতের ব্যাকরণভিত্তিক গ্রন্থ রচনা। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় ভাবধারা ব্যতিরেকে সমাজের অভিজাত ও সাধারণ মানুষ যে গানের চর্চা করতো সে সকল গানের সম্পর্কে স্পষ্টতর পরিচয় লাভ। তৃতীয়ত, গান্ধর্ব গান ও সাথে দেশী-লৌকিক গানের মিশ্রণে বিভিন্ন রাগের উৎপত্তি। চতুর্থত, ধর্মীয় ভাবধারা সম্বলিত গান্ধর্ব গানের সাথে দেশী ও লৌকিক গানের মিশ্রণ যা পরবর্তীতে যুগসমূহতে নতুন গানের প্রকরণ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। তন্মধ্যে অন্যতম হলো প্রবন্ধ গান।

প্রবন্ধ গান বৈদিককোত্তর যুগ ও মধ্যযুগের মধ্যে একটি সন্ধি রচনা করেছিল। যদিও খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত ‘নারদীয় শিক্ষা’ গ্রন্থ, ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও বৃহদ্দেশীতেও প্রবন্ধ গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তথাপি এই গানের ধারাটি সময়ের বৃহৎ একটি পরিসর নিয়ে ভারতীয় সংগীতের অংশ হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এটি কোন একক গান নয়। মূলত প্রবন্ধের তিনটি প্রকার ও অসংখ্য উপপ্রকার আছে যা পরবর্তীতে ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন সাংগীতিক ধারা বা সংগীতশৈলীর সৃষ্টি করেছিল। প্রবন্ধ বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ সংগীত। এই গানে সুর, তাল ও গানের কলি সুসংবদ্ধরূপে প্রযুক্ত হবে। এর সংজ্ঞায় বলা হয় :

প্রবন্ধ গান হলো “প্রকৃষ্টো যশ্য বন্ধঃ সাং স প্রবন্ধ নিগদ্যতে” এর অর্থঃ প্রকৃষ্টরূপে যে গানের বন্ধন আছে তাকেই প্রবন্ধ সঙ্গীত বলা হয়। এ গান ধাতু ও অঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ। তাই প্রবন্ধ গান বলতে রীতি ও নিয়মে আবদ্ধ ক্লাসিকাল গান (গীতি) বোঝায়।^{১০}

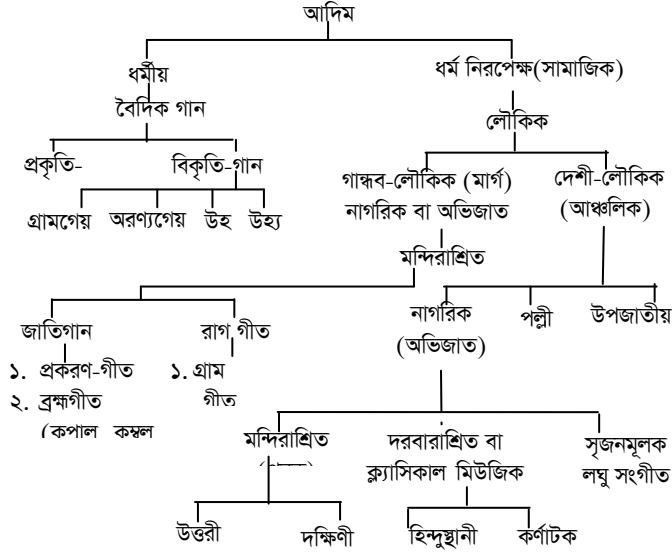
উল্লেখিত এই সংজ্ঞাটি থেকে প্রবন্ধগানের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এখানে যে ধাতুর কথা বলা হয়েছে তা হলো প্রবন্ধ গানের অবয়ব বা ভাগ। এগুলো হলো- উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ ও অন্তরা। অন্যদিকে অঙ্গ বলতে বোঝায় স্বর, বিরুদ্ধ, পদ, তেনক, পাট, তাল। প্রবন্ধ গানে এই ধাতু ও অঙ্গের সবগুলো প্রকার যে ব্যবহৃত হবে এমন নয়। প্রবন্ধের বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্নভাবে এই ধাতু ও অঙ্গকে প্রযুক্ত করা হতো সে সময়। ফলে প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন প্রকার (মূল তিনটি প্রকার। যেমন: ১. সূড়, ২. আলি ও ৩. বিপ্রকীর্ণ) ও উপ-প্রকারের সন্ধান পাওয়া যায়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে যে গানের প্রচলন আছে ভারতীয় উপমহাদেশ তা প্রবন্ধ গানের অনুরূপ। তবে সময়ের পরিক্রমা ও মিশ্রণ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হওয়ার কারণে হয়তো গীতশৈলীর কাঠামোগত অবয়ব পরিবর্তিত হয়েছে। আর এজন্যই প্রবন্ধ গানকে সংগীতের বৈদিকোত্তর যুগ ও মধ্যযুগের সন্ধি রচনাকারী সংগীতের ধারা বললে অত্যাুক্তি হয় না। ভারতীয় সংগীত মধ্যযুগে পদার্পনের সাথে সাথে যে সকল সংগীত গুণী বা সংগীতের ধারক ও বাহকদের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের অনেকেই প্রবন্ধ গানের চর্চা করেছেন। তন্মধ্যে স্বামী হরিদাস, নায়ক বৈজু, নায়ক গোপাল উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে জানা যায়-

প্রাচীন প্রবন্ধগানের প্রাথমিক রূপটি গড়ে উঠেছিল স্বামী হরিদাস, বৈজু বাওড়া প্রমুখ সাধক গায়কদের দ্বারা। এরা প্রবন্ধভিত্তিক ধ্রুবদ গান গাইতেন যার প্রকৃতি পঞ্চম-ষোড়শ শতকে সৃষ্ট রাজা মানসিংহ তোমরের ধ্রুপদ থেকে বেশ আলাদা প্রকৃতির ছিল। নায়কগোপাল এই সময় কঠিনতম প্রবন্ধ গানের অনন্য সাধারণ গায়ক ছিলেন।^{২১}

উপরিউক্ত তথ্য প্রবন্ধগানের ধারাবাহিকতা যে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে এ বিস্তৃতির মধ্যে সংগীতের অনন্য কিছু সংযোজন ঘটে ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশে। এ সংযোগটি ঘটান মধ্যযুগীয় সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু। তিনি ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের একজন অনন্য প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞ। তৎকালীন বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের রাজসভায় তিনি স্থান পেয়েছিলেন তাঁর প্রতিভাগুণে। বিশেষ করে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজদরবারে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভাসদ হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। খিলজীর দরবারে থাকাকালীন তিনি ভারতীয় সংগীতের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই উন্নতি সাধনকল্পে তাঁর একটি বিশেষ অবদান হলো পারস্য সংগীত ও ভাষার সাথে ভারতীয় সংগীতের মিশ্রণ। পারস্য সংগীতের যথেষ্টাচার প্রয়োগ নয় বরং পারস্য সংগীতকে ভারতীয় সংগীতের সাথে একটি মেল বন্ধনে তিনি আবদ্ধ করেন। যার ফলে নতুন নতুন গীতরীতি বা শৈলীর আবির্ভাব ঘটে ভারতীয় উপমহাদেশে। যেমন: কব্বাল বা কওয়াল বা কাওয়ালী গান। অনেকে মনে করেন বর্তমান সময়ে প্রচলিত খেয়াল গান (উত্তর ভারতীয় গীতরীতি) জন্ম লাভ করেছে এই কাওয়ালী গান থেকে। তাই অনেকে আমীর খসরুকে খেয়াল গীতরীতির প্রবক্তা মনে করেন। অন্যদিকে আমীর খসরু পূর্বাপর সময় বিশ্লেষণ করলে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, মোটামুটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্যেই উত্তর ভারতীয় সংগীতে দুটি মূল ধারার গীতিশৈলীর সৃষ্টি হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি হলো ধ্রুপদ ও আরেকটি খেয়াল। তবে এই দুটি ধারার সংগীতশৈলী আমীর খসরুর সময় থেকেই এর পূর্ণাঙ্গ রূপবৈচিত্র্য নিয়ে চর্চা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সেটি বিস্তারিত গবেষণা সাপেক্ষ। তবে আমীর খসরু পরবর্তী রাজা মানসিংহ তোমরের রাজত্বকালে, মুঘল দরবারে বিশেষ করে আকবরের রাজত্বকালে ধ্রুপদ সর্বোচ্চ আদ্রিত সংগীতের ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। আর আকবর পরবর্তী মুঘল শাসকদের সভায় খেয়ালেরও উত্তোরণ ঘটেছিল বেশ আড়ম্বরভাবেই। ক্রমবিকাশের বিস্তীর্ণ পথ পেরিয়ে মধ্যযুগে সৃষ্ট এ দুটি ধারার সংগীত বর্তমান সময় পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় সংগীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

প্রাচীন আদিম গান থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের পথপরিক্রমাটি ছকাকারে^{২২} নির্দেশ করা হলো। উল্লেখিত ছকে হিন্দুস্থানী সংগীতই উত্তর ভারতীয় সংগীতের নামান্তর। অপরদিকে কর্ণাটক সংগীত বলতে দক্ষিণভারতীয় সংগীতকে নির্দেশ করা হয়।



৩. ঘরানার স্বরূপ

ঘরানার আক্ষরিক অর্থ 'ঘর' এটি একটি হিন্দী শব্দ। অনেকে 'ঘরানা' শব্দটিকে ফার্সী শব্দ বলেও অভিহিত করে থাকেন যার অর্থ পরিবার। আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় 'সংস্কৃত গৃহ শব্দটি প্রাকৃত গৃহ থেকে বাংলায় ও হিন্দীতে ঘর শব্দটির সৃষ্টি'^{১০} তবে 'ঘরানা' শব্দটির প্রায়োগিক অর্থে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিকভাবে ঘরানা বলতে বংশ বা বংশীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। একজন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট বংশে জন্ম গ্রহণ করলে যেমন ঐ বংশের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয় তেমনি একজন ব্যক্তি একটি ঘরানার সদস্য বললে তাকে সে বংশের বংশীয় মর্যাদা বহনকারী হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ বংশ ও ঘরানা শব্দটিকে এক অর্থে সমার্থক বলা যেতে পারে। সামাজিকভাবে ঘরানাকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সংগীত ক্ষেত্রে বা সাংগীতিক পরিমণ্ডলেও ঘরানার অর্থকে একইভাবে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ সংগীতে ঘরানার প্রায়োগিক অর্থও বংশ বা বংশীয়। সামাজিক মানুষ যেমন বংশের রীতিনীতি বহন করে চলে তেমনি সংগীতের বংশ বা ঘরানার সদস্যও সংগীতের পরিবেশন রীতিনীতিকে বহন করে থাকেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সাংগীতিক পরিমণ্ডলে একজন ঘরানার সদস্যকে জন্মসূত্রে ওই ঘরানার অংশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘরানার সদস্য বা ঘরানাদার ব্যক্তি দুইভাবে ঘরানার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ১. বংশ পরম্পরায় অথবা ২. শিষ্য হিসেবে। বংশ পারম্পর্য মূলত জন্মসূত্রেই পাওয়া যায় তবে শিষ্য হিসেবে ঘরানার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সেই শিষ্যের ওই বংশে জন্মাবার আবশ্যিকতা নেই। এক্ষেত্রে একটি ঘরানার সদস্য হতে শিষ্যের সাংগীতিক দক্ষতাই তার প্রকৃত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। সামাজিক বংশীয় পারম্পর্য ও সাংগীতিক ঘরানার পরম্পরার মধ্যে এই পার্থক্যটিই হয়তো সংগীতের ঘরানার ধারণাকে স্বাভাবিক দান করেছে। তবে সংগীতে ঘরানার ধারণাটি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক ঘরানা বা পরম্পরার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয় এই ঘরানাসমূহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সংগীতে এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো গায়ন ও বাদনে বৈচিত্র্যতা। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় 'রাগ' গায়ন ও বাদনের ভিন্নতা। গায়ন বা বাদনে সৌকর্য প্রকাশের অনন্য ধরণ একটি ঘরানা থেকে আরেকটি ঘরানাকে স্বাভাবিক দান করেছে। বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকে ঘরানার সংজ্ঞা থেকে বিষয়টি সম্পর্কে আরও স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া যায়।

ইংরেজিতে ঘরানাকে 'school' বা 'genre' বলা হয়েছে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের বিদ্যালয়ের ধারণাকে এখানে প্রযুক্ত করলে চলে না। কেননা বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ মানে একেবারে শৈশবকালীন পাঠ গ্রহণের একটি পর্যায়। আর ঘরানার সমার্থক হিসেবে ইংরেজিতে যা 'school' তা সংগীতের উচ্চতর পাঠ গ্রহণের একটি ধাপ। অর্থাৎ সংগীতের ঘরানায় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিষ্যকে অবশ্যই পূর্ব থেকেই সংগীতের জ্ঞানলব্ধ হতে হবে। এক্ষেত্রে ঘরানার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হলো -

Literally, Family tradition school or musical culture established for instruction from master to pupil, at the same times by members of one family, perpetuated to succeeding generations.^{১৪}

অর্থাৎ ঘরানা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংগীতিক ঐতিহ্য যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে অথবা বংশানুক্রমে একেকটি অঞ্চলে দীর্ঘদিন চলতে থাকে। অন্তত তিন পুরুষ ধরে সে ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে তাকেই ঘরানা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অন্যদিকে ‘genre’ অর্থ বংশ পরম্পরা। musical genre অর্থ সংগীতের বংশ পরম্পরা। এক্ষেত্রে আরেকটি সংজ্ঞার অবতারণা করা যেতে পারে-

ঘরানা বলতে কোন সঙ্গীতসিদ্ধ বংশ বা তার শিষ্য পর্যায়কে শুধু নয়, একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীতের ধারাবাহিকতাকে বুঝায়। কয়েকটি প্রজন্ম সেই ঐতিহ্যবাহী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলে তবে তা ঘরানার মর্যাদা লাভ করে থাকে।...কোনও নির্দিষ্ট কেন্দ্র, স্থান বা কলাবতের মাধ্যমে তার ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও প্রয়োগবৈশিষ্ট্য অনুসারে গড়ে উঠেছে নানা ঘরানার ঐতিহ্য।^{১৫}

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় ঘরানার অর্থ শুধুমাত্র পারম্পর্য প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাগের শাস্ত্রতন্ত্রনীতিকে অনুসরণ করে গায়ন বা বাদনরীতিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশের প্রয়াস থেকে ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। আরও সংক্ষেপিত করে বলা যায় ঘরানা হলো সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল বা মত।

৪. উত্তর ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশের ধারায় ঘরানার সূত্র ও মূল ঘরানার ধারণার সাথে সম্পর্ক

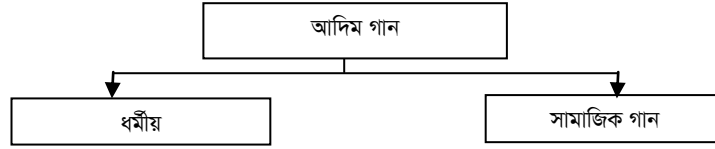
বিভিন্ন রীতিবৈশিষ্ট্য ও ঢং নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘরানাসমূহ গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ মূল ঘরানা হলো বিভিন্ন সংগীত উপস্থাপনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা রীতি বা ঢং। আবার সহজ করে বলা যায় ঘরানা হলো ভিন্ন ভিন্ন মত। তাই একেকটি ঘরানা সংগীতের ক্ষেত্রে একেকটি মত বললে তা ঘরানার ধারণাকে আরও সহজতর করে। তানসেন বংশীয় সংগীতজ্ঞগণ স্বীয় প্রতিভার দ্বারা একেকটি মতকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন এসকল ঘরানার মধ্যদিয়ে। বিভিন্ন রাগের কাঠামো অনুসরণ করে সংগীতের গায়ন ও বাদনশৈলীতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশের যে নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন তা সংগীতের স্বতন্ত্র রূপ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য সৃষ্টি। ভিন্ন ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠার এই ধারণাটি শুধু ঘরানাতেই নয় এই ধারণাটির প্রতিফলন দেখা যায় উত্তর ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধাপে। নিম্নে ঘরানার সূত্র হিসেবে উত্তর ভারতীয় সংগীতের বিশেষ বিশেষ পর্যায়কে তুলে ধরা হলো:

৪.১. আদিম গানের বিভিন্ন রূপ

বৈদিক যুগকে সংগীতের ভিত্তির যুগ বলা হয়। তবে বৈদিকযুগের অনেক পূর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে সংগীতের প্রচলন ছিল। সে সময়টি নিরূপন করা সহজতর নয়। তবে বৈদিকযুগ পূর্ববর্তী প্রাকবৈদিক যুগে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশে সংগীতের উপস্থিতি ছিল। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অসংখ্য সাংগীতিক উপকরণ এর সন্ধান পেয়েছিলেন যা থেকে অনুমান করা যায় সংগীতের বেশ উন্নতি সাধিত হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার পূর্ব থেকেই। সে সময় যে গানের প্রচলন ছিল তাকে আদিম গান হিসেবে অভিহিত করা হতো। আর এই আদিম গানের দুটি প্রকারেরও সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলো হলো: ১. ধর্মীয় গান ২. সামাজিক গান। ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন,

রাগাশ্রিত গীতের দুটি ধারা খ্রিষ্টজন্মের অনেক শত বছর আগে থেকেই আমাদের দেশেই প্রবাহিত হয়ে আসছে। একটি মন্দিরাশ্রিত গীত অপরটি রাজন্যবর্গ পুষ্টগীত। প্রথমটিকে সংগীত জ্ঞানীরা বলেন ধর্মীয় প্রকৃতির গান (Religious song) এবং অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ বিনোদনীয় গান (Secular song)^{১৬}

উপরোক্ত মতের আলোকে ধারণা করা যায় আদিম যুগে সমাজে দুটি শ্রেণির মানুষ বসবাস করতো। একটি ছিল সাধারণ জনগোষ্ঠী ও আরেকটি ছিল অভিজাত শ্রেণি। এই দুই শ্রেণি সামাজিকভাবে যেমন সতন্ত্র জীবনযাপন করতো তেমনি সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে তাদের ভিন্নধর্মী রুচিরও তৈরি হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণি স্বভাবতই ধর্মীয় চর্চা, পূজা অর্চনা, উপাসনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাই তাদের গানও ছিল মন্দিরাশ্রিত, সামাজিক মানুষের কাছে সেই গান ধরা ছোঁয়ার বাইরেই ছিল। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যে গানের চর্চা করতো সেটি ছিল সামাজিক মানুষের বিনোদনের বিষয়। এটি মূলত ধর্মীয় ভাবধারা বিবর্জিত সামাজিক গান হিসেবেই পরিচিত ছিল।



তাই বলা যায় শ্রেণিকরণ বা ভিন্ন ভিন্ন মতের ধারণাটি শুধু সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি সাহিত্য ও সংগীতকলাকেও প্রভাবিত করেছিল। আদিম মানুষের অভিরুচি, পছন্দ ও ভালো লাগার বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছিল আদিম গানের চর্চায়। যার ফলে অভিরুচি অনুযায়ী দুটি মতের সৃষ্টি হয়েছিল। মূল ঘরানার ধারণা যেমন ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোকে বিকশিত হয়েছে ঠিক তেমনি আদিম গানের বিভিন্ন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতকেই নির্দেশ করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪.২. প্রাচীন রাগ প্রকরণে স্বতন্ত্র মত

ভারতীয় সংগীতের মূলভিত্তি হলো ‘রাগ’। এই রাগ প্রকরণ ও বর্গীকরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকটি রাগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, ভাব আছে। তাই প্রতিটি রাগ একেকটি একক সত্ত্বা। প্রাচীন আলঙ্কারীকগণ সমপর্যায়ভুক্ত রাগগুলোকে একেকটি ছকে ফেলে রাগের একেকটি বর্গ কল্পনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত থেকে জানা যায়:

ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে কয়েকজন প্রামাণিক সংগীত শাস্ত্রীর মতবাদ উল্লেখিত হয়েছে। সেই মতবাদগুলি সংখ্যায় মোটামুটি পাঁচটি কিংবা ছটি। সাধারণভাবে গুণীরা ব্রহ্মা, ভরত, হনুমান, নারদ, সোমেশ্বর ও কল্লিনাথ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রীদের অনুশাসন, রাগ সংখ্যা ও তাঁদের রূপবিকাশ স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রহ্মা কে, ভরত কে-এসব প্রশ্ন নিয়ে গুণীদের ভিতর আজ পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে বলে জানা যায় নি। কোহল, ষাঠিক, নারদ, দুর্গাশক্তি, দত্তিল, মতঙ্গ, অভিনব গুপ্ত, নান্যদেব, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি পূর্বাপর সংগীত শাস্ত্রী ও গুণীদের নিজস্ব এক-একটির মতবাদের প্রচলন ছিল।^{১৭}

নারদ, ভরত, ব্রহ্মা, হনুমান প্রমুখ প্রাচীন আলঙ্কারীকগণ সংগীতের রাগ বিভাজনের বা বর্গীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁরা রাগ বর্গীকরণের যে পরিকল্পনা সমূহ উল্লেখ করেছিলেন তা সংগীতের পথ পরিক্রমার কয়েক যুগ অবধি মেনে চলা হত। রাগ বর্গীকরণের নিয়মানুযায়ী একই ছায়াপাত অবলম্বনে যে রাগ বা একই স্বরকাঠামো সম্বলিত রাগসমূহকে তৎকালীন আলঙ্কারীকগণ একেকটি বর্গ হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং একেকটি বর্গের বিশেষ কোন রাগকে মূল রাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিভেদে এই রাগ বর্গীকরণের মতবাদ স্বতন্ত্র ছিল। যেমন: নারদ মত, ভরত মত, ব্রহ্মা মত প্রভৃতি। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘গীতসূত্রসার’ গ্রন্থে রাগ বর্গীকরণের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

ভিন্ন ভিন্ন মতের আদি রাগিনীর বর্ণনা হইতেছে: হনুমন্ত মতে আদি ছয় রাগ যথা- ১. ভৈরব, ২. শ্রী, ৩. মেঘ, ৪. হিন্দোল, ৫. মালকৌশ ও ৬. দীপক। ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগ যথা- ১. ভৈরব, ২. শ্রী, ৩. মেঘ, ৪. বসন্ত, ৫. পঞ্চম ও ৬. নট নারায়ণ। ভরত মতে আদি ছয় রাগ হনুমান মতের ন্যায় ও কল্লিনাথ মতের ছয় রাগ ব্রহ্মার মতের অনুযায়ী। নারদ সংহিতা মতে ছয় রাগ- ১. মালব, ২. মল্লার, ৩. শ্রী, ৪. বসন্ত, ৫. হিন্দোল ও ৬. কর্ণাট। অন্যমতে অন্য প্রকার।^{১৮}

প্রাচীন আলঙ্কারীক হনুমন্ত যে রাগ পরিকল্পনা দেখিয়েছেন ভরত সেই মতকেই মেনেছেন, এভাবে কল্লিনাথ এর মতের সাথে ব্রহ্মার মতের মিল পাওয়া যায় এবং আরেকটি মত পাওয়া যায় নারদের। মূলরাগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমনই তিনটি স্বতন্ত্র মতের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে, প্রাচীন মূল রাগ থেকে যে উপরাগ বা রাগিনীর তালিকা আলঙ্কারীকগণ কল্পনা করেছিলেন সেক্ষেত্রেও ভিন্নতর রাগের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার্থে হনুমন্ত ও ব্রহ্মা মতের রাগ-রাগিনী পরিকল্পনা তুলে ধরা হল:

হনুমন্ত মত অনুযায়ী রাগিনী:

ভৈরব রাগের- ভৈরব, সৈন্ধবী, বাঙ্গালী, বৈরাটী ও মধুমাধবী।

শ্রী রাগের- মালশ্রী, মালবী, বনশ্রী ও আসাবরী।

মেঘ রাগের- সৌরটী, টঙ্কা, ভূপালী, গুজ্জরী ও দেশকারী।

হিন্দোল রাগের- রামকলী, বেলাবেলী, ললিতা, পটমঞ্জরী ও দেশাঙ্কী।

মালকৌশ রাগের- কুকুভা, খাম্বাবতী, গুণকলী, গৌরী ও তোড়ি।

দীপক রাগের- দেশী, কামোদী, কেরারী, কণাটি ও নাটিকা।

ব্রহ্মার মতানুযায়ী রাগিণী:

ভৈরব রাগের- ভৈরবী, গুজ্জরী, রামকলী, গুণকলী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী।

শ্রী রাগের- মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেরারা, মধুমাধবী ও পাহাড়ী।

মেঘ রাগের- মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশঙ্গারী।

বসন্ত রাগের- দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, তোড়ি, ললিতা ও হিন্দোলী।

পঞ্চম রাগের- বিভাষা, ভূপালী, কণাটি, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী।

নট রাগের- কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও হম্বারী।

রাগিণীর তালিকা অনুযায়ী হনুমন্ত মতে ভৈরব রাগের ছায়াপাত ঘটিয়ে ভৈরবী, সৈন্ধবী, বাঙ্গালী, বৈরাটী ও মধুমাধবী রাগিণী সমূহের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মার মতে ভৈরব রাগের ছায়াপাত ঘটিয়ে যে রাগিণী বা উপরাগ এর উল্লেখ পাওয়া যায় তা বেশ কিছু ভিন্নতর রাগিণীর নির্দেশ করে। যেমন: ভৈরবী থেকে গুজ্জরী, রামকলী, গুণকলী, সৈন্ধবী, বাঙ্গালী। অর্থাৎ হনুমন্ত ও ব্রহ্মা একই মূল রাগ ভৈরবকে নির্বাচন করলেও ভৈরব থেকে উদ্ভূত যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তাতে একেবারে স্বতন্ত্র রাগিণীর নির্বাচন করেছেন। উপরোক্ত রাগ বর্ণীকরণের যে তিনটি স্বতন্ত্র মত সম্পর্কে জানা যায় তা ঘরানার ধারণার সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। তাই বলা যেতে পারে রাগ প্রকরণের ভিন্নমত ঘরানা সৃষ্টির কারণ না হলেও এটি ঘরানার ধারণার সাথে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে।

৪.৩. কাওয়াল ও কলাবন্ত ঘরানা

কাওয়াল ও কলাবন্ত ঘরানার ধারণা সংগীতে ঘরানার সৃষ্টির অন্যতম একটি সূত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই দুটি ঘরানার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে। এ সময় আলাউদ্দিন খিলজী (শাসনকাল: ১২৯৬-১৩১৬খ্রি:) ভারতীয় সাম্রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন। এ সময় আমীর খসরুর ন্যায় একজন প্রতিভাধর সংগীত ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছিল আলাউদ্দিন খিলজীর দরবারে। উল্লেখ্য যে, আমীর খসরুর মাধ্যমেই চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীত একটি প্রথাবদ্ধ রূপ লাভ করে। তিনি পারস্য সংগীতের সাথে ভারতীয় সংগীতের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় সংগীতে নতুন কিছু গীতরীতির উদ্ভব হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম একটি গীতরীতি ছিল কওয়াল বা কব্বাল চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতানী শাসনামলে দরবারে যে গীতরীতির প্রচলন ছিল তাকে বলা হতো ‘কব্বাল’ বা ‘কওয়াল’। এই গানগুলো যারা করতেন তাদের বলা হত কাওয়াল এবং তাঁরা ছিল ‘কওয়াল বচে’ ঘরানার অন্তর্ভুক্ত একটি সম্প্রদায়। অন্যদিকে ‘কলাবন্ত’ বলা হতো ধ্রুপদ গাইয়েদের। জানা যায়, ধ্রুপদের চারটি ‘বান’ বা ‘বানী’র সৃষ্টি হয়েছিল যেমন: গওরহার, ডাগর, খাণ্ডার, নওহার। ধ্রুপদীয়াগণ যে বানীর গান গাইতেন তাদের নামের পাশে সেই বানীর নাম সংযুক্ত করা হতো। যেমন: তানসের গওরহারী, শাহাব খাঁ খাণ্ডারী প্রভৃতি। একইভাবে কওয়াল বচে সম্প্রদায়ের গাইয়েদের নামের শেষে ‘কওয়াল’ কথাটি যুক্ত হতো। যেমন: মখখন খাঁ কওয়াল, বড়ে মুহম্মদ খাঁ কওয়াল প্রভৃতি। কাওয়াল ও কলাবন্ত এই দুটি সম্প্রদায় কে ঘরানা হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। অনেক বিশ্লেষক মত প্রকাশ করেন যে, কাওয়াল ঘরানাটির প্রবক্তা ছিলেন আমীর খসরু।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ে চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম দুটি ঘরানা পদ্ধতির বা সম্প্রদায় এর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুটো হচ্ছে ‘কলাবন্ত ঘরানা’ এবং ‘কাওয়াল ঘরানা’ প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে, কলাবন্ত ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনৈক ‘বৈজু-বাওড়া’।...কাওয়াল ঘরানার পত্তন করেছিলেন আমীর খসরু। এই ঘরানার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পরিবেশনার শৈল্পিক স্বাধীনতা প্রদান এবং যথেষ্ট পদ্যাদি বিচরণ ও সুশোভিত করণের মাধ্যমে সুর-সুখমা সৃষ্টির সুযোগদান।^{১৬}

কাওয়াল ও কলাবন্ত মূলত দুটি পরম্পরা ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ বলেন, ‘লক্ষনীয়, মধ্যযুগে রচিত কোনও সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থে ‘ঘরানা’ ব্যাপারটি উল্লেখিত হয়নি। হয়নি এই জন্য যে, এর একটি ‘কলাবন্ত’

বা ধ্রুপদ-গায়ক পরম্পরা এবং অপরটি হলো ‘কঙল-বচে’ বা খয়াল-গায়ক পরম্পরা।^{২০} সুতরাং এই তথ্যের আলোকে বলা যায় চতুর্দশ শতকে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে ঘরানার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় যা বর্তমানে প্রচলিত ঘরানার ধারণার খুব কাছাকাছি একটি সূত্র বলা যায়।

৪.৪. ঘরানার সূত্র হিসেবে ধ্রুপদের চার বান বা বানী

আরেকটি সাংগীতিক উত্থান ঘরানার ধারণার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত আর তা হলো ধ্রুপদের বানীর বিভিন্নতা। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি:) ধ্রুপদের চারটি বানীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই চারটি বানী এই অর্থে নয় যে, পদ মধ্যস্থ বাণীর অর্থের বিভিন্নতা। পদমধ্যস্থ বাণীতে ‘ণ’ ব্যবহৃত হয় যার অর্থ বাক্য। অপরপক্ষে ধ্রুপদের ‘বানী’ অর্থ স্বতন্ত্র গায়নবৈশিষ্ট্য। ধ্রুপদের চার বানী মূলত ভিন্নধর্মী গায়ন বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে যা ঘরানার ধারণার পরিচায়ক। বানী চারটি হলো: গৌড়হার, খাণ্ডার, নওহার, ডাগর। চারটি বানীর এইরূপ নামকরণ হয়েছিল এক একটি অঞ্চলের নামানুসারে। জানা যায়, তৎকালীন চারজন বিশিষ্ট ধ্রুপদিয়া এই চারটি বানী প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাদের বাসস্থানের নামের উপর ভিত্তি করেই বানীগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। ডাগর ঘরানার ধ্রুপদ: সুরূপের সন্ধান শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখিত বিবরণ অনুসারে:

গৌড়হার বাণীর (বানী) প্রবর্তক মিয়া তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত বাণীর (বানী) নাম ‘গৌড়হার’। ‘ডাগর বানী’র প্রবর্তক ব্রীজচন্দ ডাগর (দ্বিগড়) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত বানীর নাম ‘ডাগর’। ‘খাণ্ডার’ বানীর প্রবর্তক রাজা সমোখন সিং রাজস্থানের খাণ্ডার (খণ্ডহর) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত বানীর নাম ‘খাণ্ডার’। ‘নওহার বানী’র প্রবর্তক শ্রীচন্দ পাঞ্জাবের নৌহার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত বানীর নাম ‘নওহার’।^{২১}

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধ্রুপদের চার বানীর উৎপত্তি হয়েছিল যে অঞ্চলগুলোতে সে অঞ্চলগুলো অবস্থান অনুসারে একটি থেকে অন্যটি বেশ দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের ধ্রুপদ গায়নরীতিতে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রভাব থাকাটা অসম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অঞ্চলভেদে ভাষার প্রয়োগে পার্থক্য ছাড়াও সুরের প্রয়োগ ও ধ্রুপদ গায়নের সামগ্রিক অবকাঠামোতে স্বাতন্ত্র্য থাকবে। ধ্রুপদের চার বানী’র ক্ষেত্রে সেই পার্থক্যটি স্পষ্ট বলেই প্রতিভাত হয়। আবার বানীগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলেও বানীগুলো মর্যাদার দিক থেকে কিছু মাত্র কম না। বানীগুলো ধ্রুপদগানেরই একেকটি সতন্ত্র ঢং তাই প্রত্যেকটি স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ এক একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান ঘরানার অর্থের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।

৪.৫. ঘরানার পূর্বসূত্র হিসেবে কীর্তনের ধারা

ধ্রুপদের চার বানী’র ন্যায় ঘরানার পূর্ব সূত্র হিসেবে কীর্তনের ধারা সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ধ্রুপদের সৃষ্টি এবং পরবর্তী এক থেকে দেড় যুগের ব্যবধানে বাংলায় কীর্তন গানের উত্থান হতে দেখা যায় এবং কীর্তনের বেশ কিছু ঘরানারও পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরানাগুলো হলো: ১) গরানহাটি ২) মনোহরশাহী ৩) রেণেটি ও ৪) মন্দারিণী। এই ঘরানাগুলোর পরিচয় পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। জানা যায় শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৪-১৫৩৩খ্রি:) ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কীর্তন গানকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ বৈষ্ণবীয় ধর্ম প্রচারণায় পথে পথে এ গান গেয়ে বেড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ‘সঙ্গীত চিন্তা’ গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়:

কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্ম সাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডেমোক্রোসির যুগ এলো। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তা ঘাটে।^{২২}

উল্লেখ্য যে, পঞ্চদশ শতকে এই কীর্তনের গায়ন রীতিতে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার হতে দেখা যায় এবং এটি একটি সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। যদিও কীর্তনে বাংলার রাঢ় ও মধ্যবঙ্গের লোকরীতির প্রভাবটি স্পষ্ট। তথাপি এই রীতিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পর্যায়ভুক্ত বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রী রাজেশ্বর মিত্র বলেন,

সম্মেলক এবং অনাড়ম্বরভাবে গীত হলেও আসলে কীর্তনের আঙ্গিক হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আঙ্গিক। অনিবদ্ধ এবং নিবদ্ধ পদের প্রতিটি অঙ্গ প্রাচীন কীর্তনে বর্তমান এর সঙ্গে তালপদ্ধতি নির্ণীত হয়েছে। তাও উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরূপ।^{২৩}

জানা যায় কীর্তনের এই প্রথাবদ্ধ রূপটি দেন বিশিষ্ট কীর্তনীয়া নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩৪-১৬১৫খ্রি:)। তিনি চৈতন্য পরবর্তী যুগের অন্যতম পদকর্তা। এই পদকর্তা ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৮২খ্রি:, ১৫৮৫খ্রি:) রাজশাহী জেলার অন্তর্গত খেতরী নামক স্থানে কীর্তনের মহা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য গুণী কীর্তনীয়া আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এটি খেতরীর মহাসম্মেলন নামে পরিচিত। করুণাময় গোস্বামীর বিবরণ থেকে জানা যায়:

১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে নরোত্তম তাঁর নিজ গ্রাম রাজশাহী জেলার খেতরীতে এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন আহ্বান করেন। নরোত্তম সম্মেলনে পদাবলী কীর্তন গাওয়ার প্রণালী সম্পর্কে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করলে সে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয় এবং নরোত্তমের পদ্ধতি সকলের অনুমোদন পায়।^{২৪}

নরোত্তম ঠাকুর প্রবর্তিত কীর্তনের নামকরণ ‘গরানহাটি’ মূলত একটি অঞ্চলের নামানুসারে হয়েছিল। গরানহাটি কীর্তনের বিশেষত্ব হলো এটি অনেকটাই ধ্রুপদের অনুসরণে সৃষ্ট, ধ্রুপদের ন্যায় এর রসও ছিল গম্ভীর প্রকৃতির। এই রীতি প্রায় ১০৮ প্রকার তালে গাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ‘ধ্রুপদ’ এর অনুসরণে সৃষ্ট বলতে এমন নয় যে এতে লোকজ ঢঙ্গের সুর মাধুর্যের ব্যত্যয় ঘটেছিল। নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনের যথোপযুক্ত মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রেখেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের (ধ্রুপদ) অনুপ্রেরণায় কীর্তন গানের ধারায় কিছু পরিবর্তন সাধন করে লোকপ্রিয় রীতি অবলম্বনে সৃষ্টি করেছিলেন গরানহাটি কীর্তনের ধারা। ‘মনোহরশাহী’ নামক আরেকটি রীতিকে কীর্তনের আরেকটি স্বতন্ত্র ঘরানা বলে অভিহিত করা যায়। কথিত আছে এই রীতির প্রবর্তক হলেন মনোহর দাস। তিনি গরানহাটি রীতিতে প্রাচীন রাঢ়ীয় ঢং মিশ্রিত করে নতুন প্রকারের কীর্তন সৃষ্টি করেন যা গরানহাটির চেয়ে কিছুটা সরল ও প্রকৃতিতে কিছুটা চঞ্চল। অনেকেই এর আঙ্গিকটা খেয়ালের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধারার কীর্তন ৫৪ প্রকার তালে গাওয়া হত বলে জানা যায়। কথিত আছে, বাবা আউলিয়া মনোহর দাস নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে এই রীতির নাম হয়েছিল মনোহরশাহী। এর পাশাপাশি কীর্তনের আরেকটি ঘরানা ‘রেণেটি’ সম্বন্ধে কথিত আছে, এটি সপ্তাহামের রাণিহাটি অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল যা বর্ধমানের সাতগাছিয়া থানার অন্তর্গত। বিপ্রদাস ঘোষ নামক একজন পদকর্তা এ ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন। এই রীতির কীর্তন ২৬ প্রকার তালে গাওয়া হত। কীর্তনের আরেকটি প্রকার ‘মন্দারিণী’র উৎপত্তি হয় মন্দারণের অন্তর্গত কোন এক স্থান থেকে। পরবর্তীতে আঞ্চলিক রীতির সংমিশ্রণে আরও দুটি প্রকার কীর্তনের কথা জানা যায়। সেগুলো হলো: ১. ঝাড়খণ্ডী, ২. ঢপ কীর্তন।

ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েই কীর্তনের এই ঘরানাগুলোর বিকাশ হয়েছিল। তাই প্রাথমিকভাবে কীর্তনের রীতিগুলোকে ঘরানা হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে প্রকৃত ঘরানা বলতে বোঝায় শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় একটি রীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। কীর্তনের রীতিগুলো সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে কীর্তনের এ রীতিগুলো বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীতে বিচ্ছিন্নভাবে এই রীতিগুলোর চর্চাও হতে দেখা যায়। তবে ঘরানা হিসেবে বিকশিত হওয়ার তেমন কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ধ্রুপদের চার বানীর উদ্ভব বা কীর্তনের উদ্ভব থেকে ঘরানার প্রাথমিক ধারণা সূচিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তবে প্রকৃত ঘরানা প্রথার আবির্ভাব হতে আরও দুইশত বছর তদূর্ধ্ব সময় লেগেছিল।

৫. ঘরানা সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ভিন্ন ভিন্ন মতধারার ঘরানাসমূহ। যদিও অঞ্চলভেদে ঘরানাগুলো গড়ে ওঠার পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত মুসলমান শাসকদের দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে সংগীতের অবস্থান সম্পর্কে যে সকল তথ্য জানা যায় তা থেকে অনুমান করা যায় দরবারে প্রচলিত সংগীত এক অনন্য উচ্চতায় আরোহণে সক্ষম হয়েছিল। নিম্নে বর্ণিত উক্তি থেকে তার প্রমাণ মেলে:

সম্রাট আকবর মোহময় এ শিল্প মাধ্যমের একজন পরম হিতৈশী ও প্রতিপোষক হিসেবে এর চর্চা, সাধনা ও পরিবেশনা উৎকর্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে সর্বত্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দরবারে সমুপস্থিত থাকতেন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুরুষ ও নারী ও সংগীতজ্ঞ।^{২৫}

উক্ত তথ্যের আলোকে আরও বলা যায় শুধু সম্রাট আকবরই নয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন সুলতানী শাসনামলের সূত্রপাত ঘটে তখন থেকে মুঘল শাসন অবসানের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় মূলধারার সংগীতের প্রকৃত অনুশীলন ও চর্চা হয়েছিল দরবারেই। সময় বিবেচনা করলে তা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ছয়শত বছর বিস্তৃত ছিল। তবে দরবারের বাহিরে সংগীতের যে একবারে চর্চা হতো না তা বলা যায় না। খুব সামান্য পরিমাণেই চর্চা হতো বলে জানা যায়। তাই বলা যায় সাধারণ জনগনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল রাগসংগীত চর্চার ক্ষেত্রটি। দরবারে প্রচলিত সংগীতচর্চার তুলনায় তা নগন্য। দরবারে প্রচলিত এই সাংগীতিক আবহকে ঐতিহাসিকগণ ‘দরবারী সংগীত’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। জানা যায় দিল্লী ও দিল্লীর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল শাসক ছিলেন তারাও এই দরবারী সংগীতের ঐতিহ্যকে লালন করেছিলেন সে সময় এবং সংগীতের প্রভূত উন্নতিতে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। মুঘল শাসনের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায় তানসেন বংশীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ এই এই দরবারী সংগীতের সদস্য ছিলেন। তানসেন ছিলেন তৎকালীন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান সংগীত ব্যক্তিত্ব। সম্রাট আকবরের দরবারে তিনি শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সংগীতের এই যুগকে বিশেষ করে মুঘল সম্রাট আকবরের যুগকে সংগীতের ‘স্বর্ণযুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেন ‘বিগত ছয়শত বছরে তানসেনের ন্যায় এমন প্রতিভাধর সঙ্গীতজ্ঞের আগমন ঘটেনি।’^{২৬} কেননা রাগ সংগীতের ধারাকে তানসেন এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য যে সকল সংগীতজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরাও একেজকজন সেই যুগের সংগীতের রত্ন ছিলেন। তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এবং শিষ্য-প্রশিষ্যরা সংগীতের সে ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন। আকবর পরবর্তী অন্যান্য মুঘল সম্রাটদের রাজসভায় সংগীতজ্ঞদের বেশ কদর করা হতো। তবে মুঘল শাসনকালীন সংগীতের এই ঐতিহ্য ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। মুঘল শাসনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজরা শাসন কায়েম করে। তারা দিল্লীর দরবার দখল করে নেন। ফলে সুলতানী আমল থেকে মুঘল শাসনামলে দিল্লীর দরবারে সুদীর্ঘ যে সাংগীতিক আবহের সৃষ্টি হয়েছিল তা ক্রমেই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সংগীতজ্ঞরা দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে থাকেন এবং এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে উপনীত হন। এই পরিস্থিতির বিবরণে জানা যায়:

দেশীয় নৃপতিরা ছিলেন ভারতীয় সংগীতের ধারক ও বাহক। তাহারা ছিলেন শিল্পী, সাহিত্যিক ও ধর্মপ্রচারকদের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির অবলুপ্তি ঘটালে এই সকল শ্রেণীর (শ্রেণি) মানুষও কর্মচ্যুত ও পেশাচ্যুত হইয়া পড়ে।^{২৭}

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় শুধু দিল্লীর দরবার নয়, দিল্লী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতেও সংগীতজ্ঞরা একটি নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হন। তারা পৃষ্ঠপোষকতা হারান, অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পতিত হন সর্বোপরি সাংগীতিক আবহ বিনষ্ট হয় ভারতীয় উপমহাদেশে। তাই সহজে অনুমান করা যায় সাংগীতিক আবহ বিনষ্ট হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক পালাবদলই ছিল মুখ্য কারণ। ইংরেজ শাসন পরবর্তী সময়ে সংগীত অঙ্গনে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

প্রথমত, দরবারী সংগীতজ্ঞরা এসময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। সংগীতজ্ঞরা যে সকল স্থানে সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ পান সে সকল স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দিল্লী থেকে দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে সংগীতানুরাগী রাজা ও শাসকদের দরবার অভিষিক্ত করেন। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপযুক্ত পরিবেশে সংগীত চর্চা শুরু করলেও দরবারী সংগীতজ্ঞরা অস্তিত্ব সংকটে পড়েছিলেন। কেননা সেসময় বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা তথা শাসকরা ইংরেজ শাসনামলে নিরাপদ ছিলেন না। অন্যদিকে যারা ব্যক্তিগতভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করতে শুরু করেন তাঁরাও অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে পারেন তেমন একটি ভীতি তাদের মধ্যেও কাজ করেছিল হয়তো। দ্বিতীয়ত, অস্তিত্ব সংকট কাটিয়ে ওঠার তাগিদে দরবারী সংগীতজ্ঞগণ সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে শুরু করেন। তাঁরা সংগীতশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী সাধারণ জনগণকে সংগীতের তালিম প্রদান করতেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ জনগণের সম্মুখে সংগীতের আয়োজন করতে শুরু

করেন। দরবারী সভাসদ থাকা অবস্থায় তাঁরা সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু অস্তিত্ব সংকটে সংগীতজ্ঞরা শিথিল হতে এক প্রকার বাধ্য হোন।

তৃতীয়ত, ইংরেজ শাসনকালে মুঘল দরবার বিলুপ্ত হওয়ায় সংগীতের সংগীতের প্রভূত উন্নতি ও চর্চা পরিবেশ ব্যাহত হয়। তথাপি বলতে হয় দরবারী সংগীতের সাথে সাধারণ জনগণের পরিচয় ঘটে এ সংকটকালে। এরূপ সংকটাপন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে হয়তো সাধারণ জনগণ দীর্ঘদিন দরবারী সংগীতের রস আন্বাদনে বঞ্চিত থেকে যেত।

চতুর্থত, দিল্লীর দরবারী সংগীতজ্ঞগণ (তানসেন বংশীয়) একেকজন ছিলেন সংগীতের একেকটি দিকপাল। তাঁরা ভারতের যে সকল স্থানে অবস্থান করেছেন সে সকল স্থানে সংগীতের একেকটি পীঠস্থান গড়ে তুলেছেন স্বীয় প্রতিভার দ্বারা। শুধু তাই নয় তাঁদের একেকজন একেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতি, ঢং বা স্টাইল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় দীর্ঘদিন (অন্তত তিন পুরুষ সময় পর্যন্ত) একটি স্থানে শিষ্য পরম্পরায় সংগীতের বিশেষ বিশেষ রীতি বা ঢং নিয়ে গড়ে ওঠা এই সাংগীতিক পীঠ স্থানই হলো ঘরানা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে ঘরানাগুলো গড়ে উঠেছে তা তানসেন বংশীয় সংগীতজ্ঞদের মাধ্যমে ঘরানা সূচনা লাভ করে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ঘরানা হলো সেনী ঘরানা। তনসেন পুত্র-কন্যা ও জামাতার মাধ্যমে এই ঘরানার তিনটি শাখা বিকশিত হয়েছিল। এগুলো হলো গৌড়হার বানীর ধ্রুপদ ঘরানা, ডাগর বানীর ধ্রুপদ ঘরানা, খান্ডার ও ডাগর মিশ্র ঘরানা। যদিও এই বানী সমূহের ঘরানাকে পরম্পরা হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এগুলো ঘরানার রূপ নেয়। অন্যদিকে সেনী ঘরানা ব্যতিরেকে আদি ঘরানা হিসেবে গোয়ালিওর ও আত্মা ঘরানাকেও মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। পরবর্তীসময় যে প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো হলো: কিরানা ঘরানা, পাতিয়ালা ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, লক্ষ্মী ঘরানা, জয়পুর ঘরানা, অত্রৌলি ঘরানা, সাহারানপুর ঘরানা ইত্যাদি।

৬. উপসংহার

শিল্প মাত্রই প্রকাশের ধরণে ভিন্নতা থাকবে, স্বাতন্ত্র্য থাকবে। আর প্রত্যেকটি গুণী ও প্রতিভাধর শিল্পীই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর সৃষ্টিকে তুলে ধরবেন। ঘরানার মূল ধারণা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরানারই সূত্রপাত হয় তানসেন বংশীয় প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞদের মাধ্যমে। এই প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞরা তাদের স্বীয় প্রতিভার দ্বারা সংগীতের ধারায় এনেছেন বৈচিত্র্য। একইভাবে উত্তরভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশের পথে আদিম গানের প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়, রাগ বর্গীকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মতের ধারণা পাওয়া যায়, কাওয়াল ও কলাবন্ত নামক দুটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, ধ্রুপদ ও কীর্তন গাওয়ার ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ভিন্নধর্মী গায়নবৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য চিন্তাধারা মূলত শিল্পীর বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভারই প্রকাশ। শিল্পী তার প্রতিভাকে বিকশিত করতে চাইবেন এই চিন্তাধারাটি প্রাচীন সময় থেকেই চলে আসছে। তাই বলা যায়, স্বতন্ত্র মত তথা চিন্তাধারাসমূহ প্রাচীনত্বের দাবী রাখে এবং ঘরানার সূত্রগুলোর সাথে একটি যোগসূত্র রক্ষা করে। তবে মূল ঘরানা সৃষ্টির কারণের সাথে তা অনেকাংশেই সাংঘর্ষিক। কেননা ঘরানা সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক পালাবদলের একটি সংকটময় অবস্থাকে পুঁজি করে। পরিশেষে বলা যায়, যে কারণেই ঘরানা সৃষ্টি হোক না কেন স্বতন্ত্র মতের বা চিন্তাধারার সূত্রগুলোর সৃষ্টি ও মূল ঘরানাগুলো ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশের ফলে উত্তরভারতীয় সংগীতের পরিসর হয়েছে বিস্তৃত, বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধশালী।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

^১ নবনীতা চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সঙ্গীত প্রকর্ষ, (কলকাতা: পত্রভারতী, ১য় সংস্করণ, মে ২০১৬), পৃ. ৯৮।

^২ উৎপলা গোস্বামী, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (কলকাতা: দীপায়ন প্রকাশনী, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪।

^৩ ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা (দ্বিতীয় পর্ব), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, বৈশাখ ১৪১২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১।

^৪ উৎপলা গোস্বামী, পৃ. ৩২।

- ^৫ স্বামী প্রভঞ্জনানন্দ, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ), (কলকাতা: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, আগস্ট ১৯৫৬), পৃ. ৫৩-৫৪।
- ^৬ তদেব, পৃ. ১৯।
- ^৭ নবনীতা চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৮৭।
- ^৮ ড. অসিত রায়, সংগীত অপ্লেসা, (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ডিসেম্বর ২০১৯), পৃ. ১৭৫।
- ^৯ তদেব, পৃ. ১৭৯।
- ^{১০} উৎপলা গোস্বামী, পৃ. ৩৮।
- ^{১১} নবনীতা চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৮৯।
- ^{১২} ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, পৃ. ৮।
- ^{১৩} উৎপলা গোস্বামী, পৃ. ২০১।
- ^{১৪} Mohan Nadkharni, *Great Masters: profile in Hindusthani Classical vocal Music* (India: Herper Collins publishers, 1999), p. 17.
- ^{১৫} ম.ন. মুস্তফা, আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৮১), পৃ. ১৪৪।
- ^{১৬} ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, বাংলায় রাগ সংগীত চর্চা ধারা (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, মার্চ ১৯৯৯), পৃ. ৩।
- ^{১৭} স্বামী প্রভঞ্জনানন্দ, রাগ ও রূপ (১ম খণ্ড), (কলকাতা: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ষষ্ঠ সংস্করণ, জুন ১৯৯৬), পৃ. ১৯৫।
- ^{১৮} কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীত সূত্রসার (কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, চতুর্থ সংস্করণ, পৌষ ১৩৮২ বঙ্গ.), পৃ. ৬৬।
- ^{১৯} ম.ন. মুস্তফা, পৃ. ১৯২।
- ^{২০} ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, ভারতীয় সংগীতে ঘরানার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ (সম্পা.) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী পত্রিকা, জুন ১৯৯৮), পৃ. ৯৮-৯৯।
- ^{২১} ড. অসিত রায়, ডাগর ঘরানার ধ্রুপদ: সুরপের সন্ধান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (সম্পা.) ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা ত্রিবিংশ বর্ষ, ১ম ও ২য় যুক্ত সংখ্যা (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৪২২ব.), পৃ. ৪৭।
- ^{২২} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত চিন্তা (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৯ বঙ্গ.), পৃ. ১২৪।
- ^{২৩} শ্রী রাজেশ্বর মিত্র, বাংলার সঙ্গীত [প্রাচীন ও মধ্যযুগ] (পশ্চিমবঙ্গ সরকার: সংগীত মেলা কমিটি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, এপ্রিল ২০০৬), পৃ. ১৩০।
- ^{২৪} উৎপলা গোস্বামী, পৃ. ১৭৯।
- ^{২৫} নবনীতা চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩২৭।
- ^{২৬} https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Music_of_India, viewed on 22jan, 2019
- ^{২৭} অতুল চন্দ্র ও প্রনব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস (কলকাতা: মৌলিক লাইব্রেরী, জুন ২০০০খ্রি:), পৃ. ২৬৫।

খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির আধ্যাত্মিকতা [Spirituality of Khajah Abdullah Ansari]

ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ*

ড. রিজওয়ানা ইসলাম সান্মী*

[Abstract: Khajah Abdullah Ansari (1006–1088 A.D) was a famous Persian Sufi who lived in the 11th century of Afghanistan. Ansari was born in the Kohandez, the old citadel of Herat, in 1006 A.D. His father, Abu Mansur, was a shopkeeper who had spent several years of his youth at Balkh. Ansari was a direct descendant of Abu Ayyub al-Ansari, a companion of the Prophet Muhammad (S), being the ninth in line from him. He is One of the outstanding figures in the 11th century: commentator of the Quran, traditions, polemicist, and spiritual master, known for his oratory and poetic talents in Arabic and Persian. He wrote several books on Islamic mysticism and philosophy in Persian and Arabic. His most famous work is "*Munajat Namah*", which is considered a master piece of Persian literature. After his death, his students and disciples compiled his teachings about the Tafsir of Quran, and named it "*Kashful Asrar*". This is the best and lengthiest Sufi Tafsir of Quran. He died in Herat in 1088 A.D. His shrine, built during the Timurid Dynasty, is a popular pilgrimage site.]

Keywords: Khajah Abdullah Ansari, Spirituality.

১. ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের অবস্থান বিশেষকরে ফারসি কাব্যসাহিত্যের অবস্থান শীর্ষস্থানীয়। ফারসি কাব্যসাহিত্যের মূল সূর সূফিবাদ। আর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সূতিকাগার বৃহত্তর ইরান সূফিবাদের উৎকর্ষতায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বৃহত্তর ইরানের যে সকল জ্ঞান তাপস ও আধ্যাত্মিক সাধকগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইসলামি বিশ্বে সূফিবাদের সিংহদ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তাঁদের অন্যতম হলেন বিশিষ্ট সূফিকবি খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি। তিনি ছিলেন একাদশ শতকের মধ্য এশিয়ার একজন বিখ্যাত সাধক ও আধ্যাত্মিক ফারসি কবি ও সাহিত্যিক। তিনি পিরে-হেরাত নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সাহাবি আবু আইউব আনসারি রা.-এর নবম বংশধর। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, আরবী ও ফারসি কবি। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থ ‘কাশফুল আসরার’ ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার হাদিস এবং প্রায় এক লক্ষ ফারসি কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। মাওলানা আব্দুর রহমান জামি তাঁকে ‘শায়খুল ইসলাম’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি আরবী ও ফারসি ভাষায় প্রায় ১৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর ত্রিশটিরও অধিক গ্রন্থের বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই ছন্দময় গদ্যরীতিতে রচিত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির অন্যতম কয়েকটি হল: কাশফুল আসরার, সাদ মেইদান, মুনাজাত নামে, যা’দুল আ’রেফিন, তাবকা’তুস সূফিয়ে, ইলাহি নামে, কানযুস সা’লেকিন প্রভৃতি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘মুনাজাত নামে’ গ্রন্থটিকে শ্রেষ্ঠ রচনা (Master Piece) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ গ্রন্থটি এযাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়-বস্তুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সূফি ভাবধারার কাব্য ও দার্শনিক চিন্তা চেতনার প্রভাব এতটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, শেখ সাদির ন্যায় বিশ্ব বিখ্যাত সূফি কবিও তাঁকে অনুসরণ করেন। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি ধর্মের মূলনীতি বা মৌলিক বিষয় এবং অমৌলিক বিষয়গুলো-এ উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর ছিলেন। জীবনীকারগণ লিখেছেন খাজা সব সময়ই সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

নিষেধ করায় মশগুল থাকতেন। তার মতে আল্লাহপ্রেম অর্জনের মূল শর্তই হল শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা। যেসব সুফি সাধক ধর্মের বিধানগুলোকে অস্পষ্ট রাখতেন খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি তাদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতেন। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি আল্লাহপ্রেমের আধ্যাত্মিক শিক্ষার পর্যায়গুলোকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস বা সুবিন্যস্ত করেছিলেন যাতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব যেন কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই সীমিত না থাকে বরং মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও আদব-কায়দায়ও আধ্যাত্মিকতা বা আল্লাহপ্রেমের আলোকিত জ্ঞানের প্রভাব পড়ে। এভাবে তিনি সুফি-ঘরানায় তরিকতকে শরিয়তের মধ্যে সমন্বিত করেছেন।

২. খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির সংক্ষিপ্ত জীবনী

খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি আবু আইউব আনসারি রা. এর নবম বংশধর। তার পূর্ণ বংশক্রম হল: আবু ইসমাইল খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বিন আবু মনসুর মুহাম্মাদ বালখি বিন জাফর বিন আবু মুয়াজ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জাফর বিন আবু মনসুর আত-তাবেয়ি বিন আবু আইউব আনসারি রা.। আবু আইউব আনসারি রা. সেই সৌভাগ্যবান সাহাবি যার বাড়িতে মুহাম্মদ সা. মক্কা হতে মদিনা হিজরতের সময় আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আহলে সুফ্যার অধিবাসী ছিলেন। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির পিতার নাম আবু মনসুর মুহাম্মাদ বালখি। তার মাতা বালখের অধিবাসী ছিলেন। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি ৩৯৬ হি. কা./৩৮৫ হি. শা./১০০৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পারস্যের আওতাভুক্ত বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু ইসমাইল, উপাধি ‘শাইখুল ইসলাম’।^১ তবে তিনি ‘পিরে হেরাত’ বা হেরাতের পির নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ‘পিরে আনসার’ বা সাহায্যকারী পির ও ‘আনসারি হারুবি’ নামেও খ্যাত ছিলেন।^২ তাঁর পিতা আবু মনসুর মুহাম্মাদ ছিলেন একজন দোকানদার যিনি তার যৌবনের বেশ কয়েক বছর বালুখে কাটিয়েছিলেন। আবু মনসুর মুহাম্মাদ মুসলিম সেনাপতি আহনাফ ইবনে কাইসের অধীনে খোরাসান জয়ে অংশ নেন এবং পরবর্তীকালে হেরাতে বসতি স্থাপন করেন। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি ছোটবেলা হতেই তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি খুব অনায়াসে আরবী কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি ছেলেবেলায় প্রায় ত্রিশ হাজার হাদিস এবং প্রায় এক লক্ষ ফারসি কবিতা মুখস্থ করেছিলেন।^৩ তিনি সমসাময়িক খ্যাতিমান আলেমগণের নিকট হতে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর কয়েকজন শিক্ষক শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তবে তিনি নিজে হাম্বলি মাযহাবের অনুসরণ করতেন এবং অন্যদেরকেও হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিতেন। তিনি তাঁর লিখনীর মধ্যেও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের অনুসরণ করতেন। তিনি ৪১৭ হি. কা. সালে/১০২৭ খ্রিস্টাব্দে ২১ বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের জন্য নিশাপুর গমন করেন। অতঃপর তুস ও বোস্তাম ভ্রমণ করেন। তিনি যৌবনকালে সাহিত্য ও ধর্মীয় জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি অনেক বিখ্যাত ওস্তাদগণের নিকট হতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করেন। ৪২৩ হি. কা. সালে /১০৩৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মক্কা যাওয়ার পথে তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন এবং ‘আবু মুহাম্মাদ খেলাল বাগদাদির’ (মৃত্যু: ৪৩৯ হি. কা.) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পবিত্র হজ্জব্রত সমাপনের পর ফেরার পথে তিনি বিখ্যাত সুফি সাধক ‘শাইখ আবুল হাসান খেরকানি’ (মৃত্যু: ৪২৫ হি. কা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ মহান সাধকের দর্শন তাঁর প্রতি গভীর প্রভাব ফেলে এবং তিনি নিজেকে নব উদ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করেন। এছাড়াও তিনি বিখ্যাত সুফি সাধক ‘শাইখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের’ (জন্ম: ৩৫৭ হি. কা.-মৃত্যু: ৪৪০ হি. কা.) এর নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন।^৪ পরিশেষে তিনি নিজ এলাকায় ফিরে আসেন এবং ভক্ত ও অনুসারীদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণে ব্যাপৃত হন। সত্তর বছর বয়সে তার দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ফলে পড়াশুনা করা ও শিক্ষাদান উভয়ই দূরূহ হয়ে পড়ে। এ সময়ে তিনি তার ছাত্র ও অনুসারীদের সাহায্যে স্বীয় কর্ম অব্যাহত রাখেন। পারিবারিক জীবনে তার মোট ৫ জন সন্তান ছিল। তারা হলেন: খাজা জাবির, খাজা আব্দুর রহমান, খাজা হাশিম বুজুর্গ, কাজি মোহাম্মাদ ইউসুফ এবং কাজি মোহাম্মাদ নেয়ামত। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির ছেলেদের বংশধররা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে চলে গিয়েছিল, কেউ কেউ হেরাতে থেকে গিয়েছিল। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির বংশধরদের কিছু বসতি হল, গোরখপুর, ইউসুফপুর, সাহারানপুর, পাঞ্জাব, কাকোরি এবং লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও ফিরাসি মহলের পণ্ডিতগণ। তিনি ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ/৪৮১ হি. কা. সালে ২২ জিলহাজ্জ শুক্রবার ৮৫ বছর বয়সে

স্বীয় জন্মভূমি হেরাতে পরলোক গমন করেন। তাঁকে হেরাত হতে দশ কিলোমিটার দূরে ‘গাযারগাহ’ নামক স্থানে দাফন করা হয়। তাঁর মাযার তীর্থ যাত্রীদের জন্য যিয়ারতের স্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফি সাধক খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি হেরাতে অবস্থানকালীন তার মাযারে দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে রাত্রী অতিবাহিত করতেন।^৭

৩. ফারসি সাহিত্যে অবদান

খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি ফারসি সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক যিনি ‘নাসরে মোসাজ্জা’^৮ তথা ছন্দায়িত ফারসি গদ্যকে ব্যাপকভাবে ফারসি সাহিত্যে প্রচলন করেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে উন্নতমানের ভাবধারা ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির এক চমৎকার সমাহার তাঁর রচনাবলিতে পরিলক্ষিত হয়।^৯ ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি শেখ সা’দি স্বীয় রচনায় খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির এ ছন্দায়িত ফারসি গদ্যরীতিকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেন।^{১০} ‘রিহানা তুল আদাব’ গ্রন্থের রচয়িতা ‘ওস্তাদ মোহাম্মদ আলি মোদাররেস’ উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করেছেন। গ্রন্থগুলো হল: ১. উনসুল মারিদ, ২. আনওয়ারুত তাহকিক, ৩. তাফসিরে আয়াতুল খালক, ৪. যামুল কালাম, ৫. শামসুল মাজালেস, ৬. মোনা’জা’তে ফারসি, ৭. মানা’য়েলুস সা’য়েরিন, ৮. আসরা’রুল কুলুব, ৯. ইলাহি না’মে, ১০. পারদে-এ হেজাবে হাকিকাতে ঈমান, ১১. রেসালেয়ে দেল ওয়া জান, ১২. রেসালেয়ে এরফানি, ১৩. রেসালেয়ে মোফাসসাল, ১৪. যা’দুল আ’রেফিন, ১৫. সোখানে কুতাহে আলি, ১৬. শেকের ওয়া সেকের, ১৭. সাদ মেয়দান, ১৮. তাবকা’তুস সুফিয়ে, ১৯. কালামদার না’মে, ২০. কানযুস সা’লেকিন, ২১. গাঞ্জ না’মে, ২২. মোহাক্কাত না’মে, ২৩. মাআ’রেফ, ২৪. মাকা’লা’ত, ২৫. মাকুলা’ত, ২৬. মায়মুনে, ২৭. নাসা’য়েহ ওয়াসা’য়া, ২৮. নাসিহাত না’মে, ২৯. ভরেদা’ত ও ৩০. হাফত হেসার প্রভৃতি।^{১১}

৪. খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির আধ্যাত্মিকতা

আধ্যাত্মিকতা হলো একটি ইসলামি অধ্যাত্ম দর্শন। আধ্যাত্মিকতার আলোচ্য বিষয় হলো আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা। এ দর্শনের মর্মকথা হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর তা’আলার সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উন্নয়ন।^{১২} শরিয়তের বিধি-বিধানের কঠোর অনুসরণ, আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন এবং পার্থিব স্বার্থবিমুক্ততার মাধ্যমে একজন আধ্যাত্মিক সাধককে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবর্ণনীয় দৃঢ়-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।^{১৩} এশক বা আল্লাহ প্রেমই আধ্যাত্মিকতার মূল সূর। মানুষ স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেদন-নিবেদন এবং আত্মিক অনুভূতির সবকিছুই আল্লাহ তা’আলার নিকট সমর্পণ করে থাকে। সুফিগণ আল্লাহর মাঝে আত্মবিনাশ করতে চান। কারণ একমাত্র আল্লাহই পরম সত্তা এবং অন্য সবকিছুই সেই আল্লাহরই অভিব্যক্তি। সুফিগণ প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে প্রেমময় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস পান। আর এক্ষেত্রে সুফির প্রেম বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ, স্বার্থশূন্য ও নিরাসক্ত। সুফিবাদের মূল সূর প্রেমের ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যেই রয়েছে।^{১৪} আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^{১৫}

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মহান দয়ালু।”

এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهی هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت.

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند * فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانه کنی هر دو جهان‌ش بخشی * دیوانه‌تو هر دو جهان را چه کند.^{১৬}

“হে আল্লাহ, যিনি তোমাকে চিনতেন এবং তোমার ভালবাসার জ্ঞান দান করেছিলেন, যা তোমার ছিল না তা সব ফেলে দিয়েছিলেন। যে তোমাকে চিনতে পেরেছে, সে তার জীবনকে কী করবে, সে তার সন্তান, পরিবার, স্ত্রীদের কী করবে? যদি তোমার পাগল বানাও এরপর দুই জগতেও দান করো তবে যে তোমার পাগল, দুই জাহানে তার কি কাজে আসবে?”

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ^{১৫} وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ “আর যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় ভালবাসা আছে।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي بر من آراستی خریدم و از هر دو جهان دوستی حضرت تو گزیدم^{১৬}.

“হে আল্লাহ! আমি আমার জন্য একটি সাজসজ্জা কিনেছি এবং আমি উভয় জগত থেকে তোমার বন্ধুত্ব নিয়েছি।” রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ^{১৭} مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ “যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي تو دوستان را بدشمنان می نمایي، درویشان را غم و اندوه دهی، بیمار کنی و خود بیمارستان کنی، درمانده کنی و خود درمان کنی، از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی، سعادتش بر سر دیوان کنی و یفردوس او را میهمان کنی، مجلسش روضه رضوان کنی، نا خوردن گندم با وی پیمان کنی، و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی، آنکه او را زندان کنی و سالها گریان کنی، جبّاری تو کار جبّاران کنی، خداوند تو کار خداوندان کنی، تو عتاب و جنگ همه با دوستان کنی.^{১৮}

“হে আল্লাহ! তুমি তোমার বন্ধুকে শত্রু বানাও, দরবেশদের দুঃখ দাও, তুমি তাদের অসুস্থ করো এবং হাসপাতালে পৌছে দাও, তুমি তাদের অসুস্থ বানিয়ে দাও আবার তাদের সুস্থ করে দাও, তুমি আদমকে মাটি দিয়ে বানাও এবং তুমি তার প্রতি দয়ালু হও। তুমি তাকে সৌভাগ্যবান করো এবং তাকে ফেরদৌসের মেহমান বানাও, তার সমাবেশকে আনন্দের উৎসবে পরিণত করো, তার সাথে জগতের আহরারের অঙ্গীকার করো এবং অদৃশ্যের জ্ঞানে এটি খাওয়া লুকিয়ে রাখো। তাকে বন্দী করে বছরের পর বছর কাঁদাও, তুমি অত্যাচারীদের কাজ করবে, তুমি ঈশ্বরকে দেবতার কাজ করবে, তুমি তিরস্কার করবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে লড়াই করবে।”

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবি-রাসূলগণের বিভিন্ন ঘটনাবলি হতে যুগে যুগে নবি ও রাসূলগণের সাথে আল্লাহ পাকের যোগাযোগের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। নবি-রাসূলগণের সাথে আল্লাহ পাকের যোগাযোগের ও সম্পর্ক উন্নয়নের যে মাধ্যম মূলত: তাই অধ্যাত্মবাদ। এই বিশেষ মাধ্যমে অর্জিত বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ সূফিবাদের জ্ঞান দিয়েই আল্লাহ পাক আদম আ. কে ফেরেস্তুদের চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী করেছিলেন এবং ফেরেস্তুদের দ্বারা আদম আ. কে সেজদা করিয়েছিলেন। নূহ আ. নৌকা তৈরী করে তাঁর সঙ্গীদের মহাপ্লাবন হতে রক্ষা করেছিলেন। ইব্রাহিম আ. জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিষ্কিণ্ট হওয়ার পরও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিলেন। ইউনুস আ. মাছের পেট হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। দাউদ আ. পশুপাখির ভাষা বুঝতেন। সোলায়মান আ. আকাশ পথে পরিভ্রমণ করতেন। মুসা আ. লাঠির ব্যবহার করে সাপ বানাতেন এবং নীল নদের পানি বিভক্ত করে স্থায়ী সম্প্রদায়কে রক্ষা করেন। ঈসা আ. জন্মের পরপরই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন এবং মৃতকে জীবিত, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান ও কুষ্ঠরোগীকে মুহূর্তেই মুক্তি দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ সা. বর্বর আরব জাতিকে একটি সুসভ্য ও সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারাই চাঁদকে দ্বি-খণ্ডিত করেছিলেন। এছাড়াও পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সা. হাদিসে অসংখ্য মোযেজা ও কারামতের বিবরণ পাওয়া যায়, যেগুলো সূফিবাদেরই পরিচায়ক। মুহাম্মাদ সা. এর উপর অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে এ রহস্য ফুটে উঠেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, ^{১৯} هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ

وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ “তিনি (আল্লাহ) হলেন আদি ও অন্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی، و نه آرزومند مکانی، نه کس بتو ماند و نه به کسی مانی، پیدا است که در میان جانی، بلکه جان زنده بیجیری است که تو آنی^{২০}.

“হে আল্লাহ, মহিমায় পরম দয়ালু, পূর্ণতায় মহাজাগতিক, তুমি কালের মুখাপেক্ষি নও, স্থানের প্রত্যাশী নও, কেউ তোমার অবস্থান নিতে পারে না, তুমি কারো মাঝে অবস্থিত নও, এটি স্পষ্টত তোমার অবস্থান প্রাণের মাঝে, বরং প্রাণ যে সত্ত্বা দিয়ে জীবন্ত সে তুমিই।”

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ²¹ ﴿سُئِرْهُمْ إِنَّا فِي الْإِفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ “আমি আল্লাহ আমার স্বীয় নিদর্শনসমূহ জগতে ও মানুষের শরীরে দেখাবার নিমিত্ত প্রকাশ করেছি। উদ্দেশ্য এই যে প্রকৃত অবস্থা যেন তাদের কাছে প্রকাশ পায়।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي هر كه ترا شناسد كار او باريك و هر كه ترا نشناسد راه او تاريك، تو را شناختن از تو رستن است و بتو پيوستن از خود گذشتن است.²²

“হে আল্লাহ! যে তোমাকে চেনে তার কাজ সুক্ষ, আর যে তোমাকে চেনে না তার পথ অন্ধকার, তোমাকে চেনা তোমার থেকে জন্মানো, আর তোমার সাথে মিলিত হওয়া মানে নিজেকে ভুলে যাওয়া।”

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ²³ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاتِّبِئْ، اجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ “হে মুহাম্মাদ সা.

! যখন আমার বান্দারা জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার আল্লাহ কোথায়? তখন আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিকটেই আছেন। কেউ যখন আমাকে আহ্বান করে আমি আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।”

এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي تا بتو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر جهان شيدا شدم نهان بودم پيدا شدم.²⁴

“হে আল্লাহ! আমি যখন তোমাকে চিনেছি, সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, জগতের সর্বত্র প্রেমাকুল হয়েছি, গুপ্ত ছিলাম প্রকাশ পেয়েছি।”

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ²⁵ ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ “যদি তোমরা আমি আল্লাহকে স্মরণ কর তবে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।”

এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي اى سزاي كرم و اى نوازنده عالم، نه باخر شاديست نه با ياد تو غم، خصمي و شفيعي و گواهي و حَكَم.²⁶

“হে আল্লাহ! বদান্যতার প্রতিদানদাতা এবং জগতের করুণা, তোমার স্মরণে সুখও নেই, দুঃখও নেই, তুমি পক্ষ-প্রতিপক্ষ ও মধ্যস্থতাকারী এবং সাক্ষী ও বিচারক।”

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ²⁷ ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ “আমি আল্লাহ তাঁর (আদম) মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي كجا بازيايم آن روز كه تو مرا بودى و من نبودم، تا باز به آن روز رسم ميان آتش و دودم اگر به دو گيتي آن روز يابم بر سودم و اگر بود خود را يابم به نبود خود خشنودم.²⁸

“হে আল্লাহ! কবে আবার পাব সেই দিন যেদিন তুমি আমার ছিলে আর আমি ছিলাম না, আমি আবার সেদিনে ফিরে যেতে চাই, যেখানে তোমার আগুন ও ধোয়ার মাঝে ঐদিনের সন্ধান পাবো, তৃপ্ত হবো, তাই নিজেকে যদি পাই আমার অনন্তিত্বসম্পন্ন থাকবো।”

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, ²⁹ ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَتَمُ وَجْهُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَلَيْهِ﴾ “পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। অতএব তোমরা যদিকেই মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান।”

এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي اداى شكر ترا هيچ زبان نيست و دريائى فضل ترا هيچ كران نيست و سر حقيقت تو بر هيچكس عيان نيست، هدايت كن بر من رهي كه بهتر از آن نيست.

يارب ز ره راست نشانى خواهم * از باده آب و خاک جاني خواهم

از نعمت خود چو بهره مندم كردى * در شكر گزاريت زباني خواهم.³⁰

“হে আল্লাহ! তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই এবং তোমার অনুগ্রহের সমুদ্রের কোনো কিনারা নেই এবং তোমার সত্য কারও কাছে দৃশ্যমান নয়, আমাকে এমন একটি পথ দেখান যা থেকে ভালো কিছু নেই।

হে প্রভু! সঠিক পথের ঠিকানা চাই, মাটি ও পানির সুখ থেকে জীবন চাই, যেহেতু তোমার নেয়ামত দিয়ে সৌভাগ্যবান করেছো, তাই তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার ভাষা কামনা করি।”

সূফিবাদের মূলকথা হল মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, রূহ বা আত্মার প্রকৃতি, জীবন, মৃত্যু এবং জগতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি।^{৩১} সূফিবাদে বিশ্বাসী সাধকগণ মনে করেন, কেবলমাত্র মানব মনের গতানুগতিক শক্তিবলে নয়; বরং এক ধরনের প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি তথা অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তির সাহায্যেই পারমাত্মিক ও পরমার্থিক ঐশী জ্ঞানের সন্ধান লাভ করা সম্ভব। এভাবে যে সকল অতিপ্রাকৃত উপায়ে আল্লাহর তথা পরমসত্তার সঙ্গে একাত্মতা অর্জনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তারাই ইসলামের ইতিহাসে সূফি নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।^{৩২} সূফিদের মতে জগৎ বাস্তব, কারণ পরম সত্তায় এই জগতের স্থান আছে এবং মানুষ সৃষ্টির চরম কারণ নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে পরম সত্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। আর এ কারণেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব তথা আশরাফুল মাখলুকাত।^{৩৩} আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন, **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** “আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে।”^{৩৪}

এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهی از هیچ همه چیز توانی و از همه چیز بهیچ نمایی که گویم چنین یا چنانی تو آفریننده این و آنی.

ما را سرو سودای کس دیگر نیست * از عشق تو پروای کس دیگر نیست

جز تو دگری جای نگیرد در دل * دل جای تو شد جای کس دیگر نیست.^{৩৫}

“হে আল্লাহ! তুমি শূন্য থেকে সব কিছুতে সক্ষম এবং সব কিছু থেকে শূন্যে সক্ষম যখন আমি বলি, প্রকৃত অর্থে- তুমি এই ও ঐ-এর সকলের স্রষ্টা। আমার বিশাল সবুজ বৃক্ষের উপটৌকন তুমি ভিন্ন কেউ নেই, তোমার প্রেম ভিন্ন আমার পরওয়া করার কিছু নেই তুমি ছাড়া হৃদয়ে জায়গা নেওয়ার কেউ নেই, হৃদয় তোমার হয়েছে, তাই এতে অন্য কারো ঠাঁই নেই।”

মূলত: আত্মার পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধিকেই অধ্যাত্মবাদ বলা হয়। দৈহিক ও মৌখিক বিশেষ কিছু কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে হয়। অধ্যাত্মবাদ ছাড়া ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী উপলব্ধি করা যায় না। অধ্যাত্মবাদ বলতে একজন মুমিনের পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সা. প্রদর্শিত বিধি-বিধানের যথাযথ অনুসরণকে বুঝায়। সূফিবাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের পথ সহজতর হয়।^{৩৬} সূফি দর্শনের দৃষ্টিতে, সূফির আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশের পথে পার্থিব জগৎ এক বিরাট অন্তরায় স্বরূপ। তাই সূফিগণ এ জগতের সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কৃতপাসমূহের জন্য অতীতকে অনুশোচনার সাথে স্মরণ করেন। সুতরাং বলা যায় অধ্যাত্মবাদী দর্শন একটি দুঃখবাদী দর্শন (Pessimistic)। তাদের মতে, কেবলমাত্র বৌদ্ধিক আলোচনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার এ পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আলোচনা অবশ্যই মানুষকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং চিন্তার প্রতি আগ্রহ তৈরী করে এ কথা ঠিক কিন্তু একজন আধ্যাত্মিক সাধকের জন্য আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি কেবলমাত্র গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই আত্মিক জ্যোতি লাভ করে থাকেন। আর এই জ্যোতির সাহায্যেই তিনি সত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবলোকন করেন। তিনি প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করেন এবং এর মধ্যেই ধ্যানমগ্ন থাকেন। অধ্যাত্মবাদ একজন সূফি সাধককে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন এবং আপাতমধুর ইন্দ্রিয় শক্তি থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় সার্থক করে তোলে। আর তাই সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অধ্যাত্মবাদ মানবজীবনের পরিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা আনয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।^{৩৭} সূফিবাদের পরিধি ব্যাপক। অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, যে বিশেষ জ্ঞান দ্বারা যুগে যুগে নবি ও রাসূলগণ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন তাই অধ্যাত্মবাদ। নবি ও রাসূলগণ ইলমে তাসাউফ বা সূফিবাদের বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন। জ্ঞান মূলত: দু’প্রকার। একটি হল জাগতিক জ্ঞান এবং অপরটি হল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আর অধ্যাত্মবাদ হল সেই আত্মিক মহাজ্ঞানের নাম। কারণ, আত্মায় জগতের যত বিশেষ জ্ঞান রয়েছে তা কেবলমাত্র

অধ্যাত্মবাদ চর্চার মাধ্যমেই অর্জন হয়। অধ্যাত্মবাদকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় ‘তাকিয়ায়ায়ে নাফস’ তথা আত্ম সংশোধন বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا تُنَدِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾^{৮৮}

“আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে তা স্বীয় কল্যাণের জন্যই করে থাকে। আল্লাহর নিকটেই সকলের প্রত্যাবর্তন।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهی خود را از همه بتو وابستم، اگر بدارى ترا پرستم و اگر ندارى خود پرستم نومید مساز بگير دستم^{৮৯}

“হে আল্লাহ! আমি তোমার সাথে নিজেকে বেধে ফেলেছি, যদি গ্রহণ করো তোমার বন্দেগীতে হবো রত, যদি গ্রহণ না করো, নিজেই নিজের প্রতি আসক্ত হবো, আমার হাত ধরো, নিরাশ করো না।”

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেন, ﴿فَذُفِّلَحْ مَنْ تَزَكَّى﴾^{৯০} “নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করেছে সে, যে নিজেকে সংশোধন করেছে।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

يارب دل پاک و جان آگاهم ده * آه شب و گريه سحرگاهم ده

در راه خود اول ز خودم بیخود کن * بیخود چو شدم ز خود بخود راهم ده

الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک میرایی، اصل هر دوائی، داروی دلہایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، معزز بتاج کبریایی، بتو رسد مُلکِ خدایی^{৯১}۔

“হে প্রভু! আমাকে একটি বিশুদ্ধ হৃদয় এবং একটি সচেতন আত্মা দিন, আমাকে রাতের আহাজারি ও ভোরের আত্নাদ দাও। আমাকে আমার থেকে ছাড়িয়ে তোমার পথে তুলে নাও, আমি যখন আমাকে ভুলে গেছি, নিজেই তুমি আপন করে নাও। এক এবং একমাত্র প্রতিপালক, ক্ষমতার অভিভাবক, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, দোষ-ত্রুটি থেকে শুদ্ধ, শিরক থেকে মুক্ত, সমস্ত ওষুধের উৎস, হৃদয়ের ওষুধ, আদেশকারী সম্রাট, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। সকল মুকুট এর মুকুট ও রাজত্ব কেবল তোমাকেই শোভা পাই।”

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾^{৯২}

“শপথ প্রাণের এবং তাঁর যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে সংশোধন করে, সে সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।”

এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نہایت ای ظاهر بی صورت وای —باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت ای مُعطی بی فطرت و ای بخشندہ بی منت، ای داندہ راز ها، ای شنونده آواز ها، ای بینندہ نماز ها، ای شناسندہ نامہا، ای رسانندہ گامہا، ای مُبرا از عوایق، ای مطلع برحقایق، ای مہربان بر خلائق عذر های ما بپذیر کہ تو غنی و ما فقیر و بر عیبهای ما مگیر کہ تو قوی و ما حقیر، از بنده خطا آید و زَلَّت و از تو عطا آید و رحمت۔^{৯৩}

“হে আল্লাহ! তুমি কারো সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টিকর্তা এবং তুমি গনণার উর্দে সংখ্যাবিহীন একক সত্ত্বা, তুমি পথপ্রদর্শন ব্যতীত প্রথম এবং তুমি অসীম শেষ, তুমি অকল্পরূপহীন চেহারার মালিক, চরিত্রহীন অভ্যন্তর, অপমানহীন জীবন, প্রকৃতি ছাড়া দাতা এবং আশীর্বাদ ছাড়া দাতা, হে গানের শ্রোতা, হে প্রার্থনার দৃষ্টা, হে নাম জ্ঞাতা, হে পদক্ষেপের পরিবাহক, হে বিভ্রান্তি মুক্ত, হে সত্যের জ্ঞানী, হে সৃষ্টির প্রতি করুণাময়, আমাদের অজুহাত গ্রহণ করুন যে তুমি ধনী এবং আমরা দরিদ্র, এবং আমাদের দোষের জন্য আমাদের দোষারোপ করবেন না, তুমি শক্তিশালী এবং আমরা নম্র, আমার বান্দার কাছ থেকে ভুল এবং বিভ্রান্তি থাকুক এবং তোমার কাছ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা হোক।”

সূফিবাদের ঐশী জ্ঞান অর্জন করতে হয় ‘ক্বালব’ তথা হৃদয়ের সাহায্যে। আর তাই এ বিদ্যাকে ক্বালবের বিদ্যা, সিনাই বিদ্যা বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা বলা হয়। নবি-রাসূলগণ এ ক্বালবের বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন তাঁরা আক্ষরিক বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

﴿هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ فِي الْأُمِّيَنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^{৪৪}

“আল্লাহ পাক নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও প্রজ্ঞা। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর অন্ধকারে লিপ্ত।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهی ای گشاینده زبان مناجات گویمان و انس افزای خلوتهای ذاکران و حاضر نفسهای راز داران. خداوند در حاجت کسی نظر کن که او تو را یک حاجت بیش نیست.^{৪৫}

“হে আল্লাহ! প্রার্থনাকারীগণের জিহ্বা উন্মুক্তকারী, স্মরণকারীদের একাকীত্ব বৃদ্ধিকারী এবং যারা গোপন রাখে তাদের নিঃশ্বাসের উপস্থিতি। হে আল্লাহ, তুমি তারই প্রয়োজনের দিকে তাকাও, যে কেবল তোমার মুখাপেক্ষি।” মানুষের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মানুষের রয়েছে আত্মিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়। মানব দেহ যেমন রোগ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, আত্মাও অনুরূপ রোগ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানব দেহ যেমন খাদ্য গ্রহণ করে, আত্মাও অনুরূপ খাদ্য গ্রহণ করে। দেহের খোরাক যেমন খাদ্য ও পানীয় অনুরূপ আত্মার খোরাক হলো আত্মিক প্রেরণা এবং আল্লাহর স্মরণ। সূফি সাধনার মাধ্যমে মানুষ আত্মিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে পারে। মানুষ যখন আত্মিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়, তখন পর্যায়ক্রমে তাঁর আত্মার সমস্ত চোখ খুলে যায়। এভাবে সাধনা করতে করতে এক সময় সাধক আল্লাহময় হয়ে যায়। এ অবস্থাকে সূফিবাদের ভাষায় ‘ফানাফিল্লাহ’ বা আল্লাহতে বিলীন হয়ে যাওয়া বলে। আর ফানাফিল্লাহতে অবস্থানকালীন সময়কে ‘বাকাবিল্লাহ’ বা আল্লাহতে স্থায়ী হওয়া বলা হয়।^{৪৬} এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهی شراب شوق در جان منصور حلاج افزون شد، آن شراب در آن نگنجید سر بیرون شد، ابلیس جرعه نیافت جاوید ملعون شد، بجرعه از آن شراب او پس قرنی میمون شد^{৪৭}।

“হে আল্লাহ! মনসুর হাল্লাজের জীবনে আবেসের মদিরা বেড়ে গেল, সেই মদিরা মাথায় ঢুকল না, ইবলিস এক চুমুক দিল না, জাভিদ অভিশপ্ত হলো, সেই প্রেম শরবের এক চুমুক খেয়ে ওয়ায়েস কারনী সৌভাগ্যবান হলো।”

অধ্যাত্মবাদ ইসলাম ধর্মের এমন একটি অভ্যন্তরীণ দিক যা উপলব্ধি করার জ্ঞান আল্লাহ পাক সবাইকে প্রদান করেন না। রাসূল সা. কর্তৃক এমন অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান সাধারণভাবে বুঝা যায় না। তিনি তাঁর তাসাউফ বিষয়ক বক্তব্য সকলের কাছে উপস্থাপনও করতেন না। তিনি তাঁর আত্মভাজন কিছু সংখ্যক সাহাবির নিকট এ সব তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে আলি রা. ছিলেন প্রধান। আলি রা. সম্বন্ধে রাসূল সা. বলেন, *ابها من المدينة فليأتها من بابها*^{৪৮}। “আমি জ্ঞানের মহানগরী, আর আলি এর দরজা, যে কেহ এই মহানগরীতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা পোষন করে তাকে এই দরজা ব্যবহার করতে হবে।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهی روی بنما تا در روی کسی نگریم و دری بگشا تا بر در کس نگذریم.

پیوسته دلم دم از رضای تو زند * جان در تن من نفس برای تو زند

گر بر سر خاک من گیاهی روید * از هر برگی بوی وفای تو زند.^{৪৯}

“হে আল্লাহ! তোমার জ্যোতির্ময় রূপ আমাকে দেখাও, যাতে অন্য কারো রূপে তাকানোর প্রবৃত্তি তৈরি না হয়। অনবরত হৃদয় তোমার সন্তুষ্টির শ্বাস ফেলে, তোমার জন্যই আমার দেহের প্রাণ বেঁচে থাকে। আমার মাটিতে যদি একটি গাছ জন্মায়, প্রতিটি পাতায় তোমার বিশ্বস্ততার ঘ্রাণ পাবে।”

অধ্যাত্মবাদ প্রধানত একটি আবেগাত্মক অভিজ্ঞতা, যা আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই সূফিবাদের এ পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। এ স্তরে উন্নীত হলে সত্যের জ্ঞান ও আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়। যখন কোনো সূফি এ অবস্থায় উপনীত হয় তখন তার চেতনার এমন এক নিখুঁত রহস্য উন্মোচিত হয়, যাতে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়ে ক্রমশঃ সীমাহীন ঐশী সত্তায় মিশে যায়। সূফির এ অবস্থাকে বর্ণনা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা এটিকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়।^{৫০} মহান আল্লাহ মানব জীবনের যাবতীয় কর্মসূচীকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য মহানবি মুহাম্মাদ সা. এর মাধ্যমে এ জীবন-বিধান পেশ করেছেন। সার্বিক বিচারে এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যাতে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। ইসলাম একদিকে যেমন আল্লাহ ও মানুষের সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে, অপরদিকে পার্থিব বিষয় যেমন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি মানব জীবনের সকল বিষয়ে ধর্মীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে। জীবনের এ সকল দিক সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত, একটি হলো বস্তুগত আর অপরটি হলো অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক। মানব জীবনের এ দ্বিতীয় দিকটি ইসলামে অধ্যাত্মবাদ নামে পরিচিত। সূফিবাদের অনুশীলন একজন সূফিকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার প্রেরণা দান করে। কিন্তু এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কোনো সহজ ব্যাপার নয়। সূফির এ যাত্রা পথ অনেক দীর্ঘ। এ পথে তাঁকে অনেক কষ্ট-ক্লেশ ও ত্যাগ-ত্যাগের মধ্য দিয়ে বিনয়ানত চিন্তে অগ্রসর হতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে সূফির যাত্রাপথের সূচনাপর্ব হলো শরিয়ত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন এবং যা অনুসরণ করে চলার আদেশ দিয়েছেন মূলতঃ তাই শরিয়ত।^{৫১} এতে জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ প্রদান করা হয়। শরিয়ত প্রদত্ত এ সকল আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপনের মধ্যেই বিশ্বমানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসূলগণকে এ শরিয়তসহ প্রেরণ করেছেন। পার্থিব কল্যাণ লাভ ও পরকালীন মুক্তির জন্য শরিয়তের বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য।^{৫২}

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.^{৫৩}

“অতঃপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মে এক বিশেষ শরিয়তের উপর। অতএব আপনি তা অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের খেয়াল খুশী অনুসরণ করবেন না।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي جز از شناخت و تو شادی نیست و جز از یافت تو زندگانی نه، زنده بی تو چون مُرده زندانی است و زنده به تو زنده جاودانی است.^{৫৪}

“হে আল্লাহ! তোমাকে চেনা ছাড়া আর কোনো সুখ নেই, তোমাকে পাওয়া ছাড়া জীবন নেই, তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা মৃত বন্দীর মতো, আর তোমার সাথে বেঁচে থাকা অনন্ত জীবন লাভ।”

মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামিন অন্যত্র বলেন, “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ”^{৫৫} “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের সা. আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর।”

এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي چه خوش روزگاری است روزگار دوستان تو با تو، چه خوش بازاری است بازار عارفان در کار تو، چه آتشین است نفسهای ایشان در یاد تو، چه خوش دردی است درد مشتاقان در سُوز شوق و مهر تو، چه زیباست گفت و گوی ایشان در نام نشان تو.

با صنع تو هر مورچه رازی دارد * با شوق تو هر سوخته سازی دارد

ای خالق ذوالجلال نومید مکن * آنرا که بدر گهت نیازی دارد.^{৫৬}

“হে আল্লাহ! তোমার সাথে তোমার বন্ধুদের সময় কত সুখের, তোমার কাজে অতীন্দ্রিয়দের বাজার কতটা আনন্দের, তোমার স্মরণে তাদের নিঃশ্বাস কতটা অগ্নিময়, তোমার আবেগ-ভালোবাসার জ্বালায় আশাবাদীদের

বেদনা কতটা মনোরম, কত সুন্দর। তোমার নাম-নিশানার আলোচনা তাদের জন্য কতই মধুর কতই সুন্দর। তোমার নৈপুণ্যের সাথে, প্রতিটি পিঁপড়ার একটি গোপনীয়তা রয়েছে, হে পরম মহিমান্বিত স্রষ্টা! আমাকে নিরাশ করো না, সে তো সব সময় তোমার দরগাহের মুখাপেক্ষি।”

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,^{৭৭} ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾, “আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সন্দর্শন কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার না করে।” এ প্রসঙ্গে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন,

الهي چه زیباست ایام دوستان تو با تو و چه نیکو است معاملت ایشان در ارزوی دیدار تو چه خوش گفت و گوی ایشان در راه جست و جوی تو، آن دیده که ترا دید به دیدن جز تو کی پرواز و آن جان که با تو صحبت یافت با اب و خاک چند سازد؟^{৭৮}

“হে আল্লাহ! তোমার সাথে তোমার বন্ধুদের দিনগুলো কত সুন্দর, এবং তোমার সাথে দেখা করার আকাঙ্ক্ষায় তাদের আচরণ কত সুন্দর, তোমাকে খুঁজতে যাওয়ার পথে তাদের কথোপকথন কত সুন্দর, যে তোমাকে দেখেছিল, যে তোমাকে দেখতে উড়ে এসেছিল এবং যে আত্মা তোমার সাথে কথোপকথন খুঁজে পেয়েছে পানি ও মাটি দিয়ে এর চাইতে আর কত সুন্দর হতে পারে?”

৫. উপসংহার

আধ্যাত্মিক দর্শনের ভিত্তিতে নতুন ধারার সাহিত্যচর্চার বিকাশে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মাধ্যমে প্রবর্তিত নতুন ধারার আধ্যাত্মিক সাহিত্য সূফিবাদী দর্শনের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে অনেক কবি সাহিত্যিক তাঁকে অনুসরণ করে ফারসি সাহিত্যে কাব্যচর্চা করেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ‘নাসরে মোসাজ্জা’ তথা ছন্দায়িত ফারসি গদ্যকে ব্যাপকভাবে ফারসি গদ্যরীতিতে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা যুগের চাহিদা অনুযায়ী দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁদের গ্রন্থসমূহে সূফি দর্শনের গূঢ় রহস্যাবলির সন্ধান পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে তাঁদের এ দর্শন মানুষকে পথ নির্দেশনা দিয়ে এসেছে। ফারসি যে সকল বিখ্যাত কবি খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ইরানের বুলবুল নামে খ্যাত শেখ সাদি। অন্যান্য কবি সাহিত্যিকও খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি অবদান স্বীকার করে থাকেন। তিনি এমন একজন সাহিত্যিক ছিলেন যিনি তাঁর লিখনীর মাধ্যমে শরিয়ত ও মারফতের বিষয়াবলিকে সাবলীল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ফারসি সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক যিনি ‘নাসরে মোসাজ্জা’ তথা ছন্দায়িত ফারসি গদ্যকে ব্যাপকভাবে ফারসি সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনাবলিতে উন্নতমানের ভাবধারা ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির এক চমৎকার সমাহার পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রায় রচনাকর্ম ‘নাসরে মোসাজ্জা’ তথা ছন্দায়িত গদ্যরীতি ও সংক্ষিপ্ত অবয়বে রচিত। তাঁর রচনার মধ্যে আনন্দ-বেদনা, সূক্ষ্ম রসবোধসূচক ছোট ছোট ঘটনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেম-ভালবাসা, আকর্ষণ, আত্মস্থকরণ ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলির সুর ঝংকৃত হয়। রচনাইশৈলীর দিক থেকে তাঁর রচনায় সামানি ও গহনবি আমলের বৈশিষ্ট্য তথা আরবীর ব্যবহার, কুরআনের আয়াত, কবিতা ও বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের রচনাইশৈলীকে মাসনুন বা মোকাল্লেফ বলা হয়। তার সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ‘যোহদিয়াত’ তথা দুনিয়া বিমূখতা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি, *রাসায়েলে জামে আরেফে কারনে চাহারম হিজরি খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি* (তেহরান: কেতাব ফুরুশিয়ে ফারুগি, ১৩৪৯ হি.শা./১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৬।
- ^২ John Arberry, *Sufism: an account of the mystics of Islam* (New York: Courier Dover Publications, 2001 A.D), p.69.
- ^৩ ড. সাইয়েদ যিয়াউদ্দিন সাজ্জাদি, *মোকাদ্দামে-ই-বর মাবানিয়ে এরফান ওয়া তাসাউফ* (তেহরান: এন্তেশারাতে সামত, ১৯৯৬ খ্রি./ ১৩৭৫ হি.শা./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯৫।
- ^৪ *রাসায়েলে জামে আরেফে কারনে চাহারম হিজরি খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি*, পৃ. ৯।

- ৫ তদেব, পৃ. ১১।
- ৬ নাসরে মোসাজ্জা হল ফারসি প্রাচীন সাহিত্যের একটি প্রকার। ফারসি প্রাচীন সাহিত্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হল: ১. নাসরে মোরসাল, ২. নাসরে ফান্নী, ৩. নাসরে তারসেল, ৪. নাসরে খোতাবা ও ৫. নাসরে দাস্তানী। নাসরে মোসাজ্জা নাসরে ফান্নীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রষ্টব্য: ড. মানসুর রাস্তগার ফাসায়ি, *আনওয়ায়ে নাসরে ফারসি* (তেহরান, দানেশগাহে সামেত, ১৩৯৫ হি.শা.), পৃ. ১১৫।
- ৭ ড. আহমাদ তামিমদারি, *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস* (তারিক জিয়াউর রহমান শিরাজী ও মুহাম্মদ ঈশা শাহেদী অনু.), (তেহরান: আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ১৩৮৫ হি.শা./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১১২।
- ৮ রাসায়নে জামে আরেফে কারনে চাহারম হিজরি খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি, পৃ. ১২।
- ৯ খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি, *যাদুল আ'রেফিন* (তেহরান: চাপখানেয়ে ফেরদৌসি, ১৩৫৩ হি.শা. ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৪।
- ১০ *বাংলাপিডিয়া*, ১০ খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২২২।
- ১১ ড. মোহাম্মাদ হোসাইন বায়াত, *মাবানিয়ে এরফান ওয়া তাসাউফ* (তেহরান: দানেশগাহে আল্লামা তাবাতবায়ী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৮।
- ১২ ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৫৭।
- ১৩ সূরাহ আল-ইমরান: ৩১।
- ১৪ খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি, *মোনাজাত নামে* (রাহিম ফুয়ালি সম্পা.) (তেহরান: এন্তেশারাতে মোজারাদ, ১৩৭৫ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২১।
- ১৫ সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৬৫।
- ১৬ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ৮১।
- ১৭ ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালাহীন*, ১ম খণ্ড, মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (অনু.) (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৪৬।
- ১৮ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ৬০।
- ১৯ সূরাহ আল-হাদীদ: ৩।
- ২০ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ৩১।
- ২১ সূরাহ হা-মিম-সাজদাহ: ৫৩।
- ২২ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ৩৩।
- ২৩ সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৮৬।
- ২৪ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ২৬।
- ২৫ সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৫২।
- ২৬ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ৭৭।
- ২৭ সূরাহ আল-হযর: ২৯।
- ২৮ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ৮৭।
- ২৯ সূরাহ আল-হযর: ১১৫।
- ৩০ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ২০।
- ৩১ মো. আব্দুল হালিম, *মুসলিম দর্শন: চেতনা ও প্রবাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮৭।
- ৩২ ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৭৭।
- ৩৩ *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, পৃ. ২৫৫।
- ৩৪ সূরাহ আত-ত্বিন: ৪।
- ৩৫ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ২২।
- ৩৬ Khwaja Hasan Sani Nizami, 'Sufism and Hindu Mysticism', *Indo-Iranian Thought: A World Heritage* (Delhi: Renaissance Publishing House, 1995), p. 111.
- ৩৭ *মুসলিম দর্শন: চেতনা ও প্রবাহ*, পৃ. ৮৭- ৮৮।
- ৩৮ সূরাহ আল-ফাতির: ১৮।
- ৩৯ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ২৭।
- ৪০ সূরাহ আল-আ'লা: ১৪।
- ৪১ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ২৬।
- ৪২ সূরাহ আল-শামস: ৭-১০।
- ৪৩ *মোনাজাত নামে*, পৃ. ৪৪।

-
- ^{৪৪} সূরাহ আল-জুমআ: ২।
- ^{৪৫} মোনাজাত নামে, পৃ. ১৮১
- ^{৪৬} ড. মোহাম্মাদ হাসান হায়েরী, *ইরফান ওয়া তাসাউফ* (তেহরান: এস্তেশারাতে বাইনুল মেলালি আল হুদা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১২৪।
- ^{৪৭} মোনাজাত নামে, পৃ. ৫১।
- ^{৪৮} আল মাকতাবুশ শামেলা, *জামেউল আহাদিস*, ৩১ খণ্ড, পৃ. ১১৬।
- ^{৪৯} মোনাজাত নামে, পৃ. ৬১।
- ^{৫০} মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৪০।
- ^{৫১} ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), পৃ. ৬১৬।
- ^{৫২} মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীআতের উৎস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৯।
- ^{৫৩} সূরাহ আল জাসিয়া: ১৮।
- ^{৫৪} মোনাজাত নামে, পৃ. ৫৫।
- ^{৫৫} সূরা আলে ইমরান: ৮৫।
- ^{৫৬} মোনাজাত নামে, পৃ. ৬৭।
- ^{৫৭} সূরা আল কাহাফ: ১১০।
- ^{৫৮} মোনাজাত নামে, পৃ. ৯১।

শেখ সাঁদির কাব্যে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধ [Humanism and Moral Values in the Poetry of Shaikh Sadi]

ড. মো. ওসমান গনী*

[Abstract: Shaikh Sadi (1191-1291) was the most brilliant, distinguished, acknowledged and popular ethical poet in Persian literature. He is also called the 'Master of both prose and verse'. The epical works of Sadi such as the *Bustan* (1257) and the *Gulistan* (1258) are deal with ethics, politics, state administration and sociology. His book *Bustan* is the ethical mirror of a political, social and family life. Sadi discussed about the duty of a ruler to his citizens, good behavior to orphans, neighbors, and dependents etc the moral ideas in his poetry. This article highlighted those topics on the light of his poetry.]

Keywords: Sheikh Sadi, Gulistan, Bustan, Humanism, Moral Value

১. ভূমিকা

শেখ সাঁদি (১১৯১-১২৯১) ছিলেন ফারসি সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ নৈতিক কবি। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়ধারায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। *বুস্তান* (১২৫৭) ও *গুলিস্তান* (১২৫৮) গ্রন্থদ্বয় কবিকে অমর করে রেখেছে। শেখ সাঁদির *বুস্তান* (بوستان) কাব্যগ্রন্থটি ফারসি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে সাঁদি নৈতিক শিক্ষাকে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় কাব্যিক রূপ দিয়েছেন। তিনি গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে একাধিক গল্প বর্ণনা করে উহা সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেছেন। শেখ সাঁদি *বুস্তান* গ্রন্থে যে সকল বিষয়ে নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন তা হলো- রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রজার প্রতি শাসক শ্রেণীর দায়িত্ব-কর্তব্য, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, দান-অনুদান দেয়া, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহার, সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন প্রভৃতি।

২. শেখ সাঁদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শেখ সাঁদির মূল নাম-‘মুসলেহ’, উপাধি- ‘মোশাররফ উদ্দিন’ এবং কাব্যনাম ‘সাদি’।^১ তিনি ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩ খ্রি.) ইরানের শিরায় নগরে জন্মগ্রহণ করেন।^২ তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতা মাইমুরা খাতুন। পিতার তত্ত্বাবধানে থেকেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতাকে হারান।^৩ এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন এবং নিয়ামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এখান থেকেই তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও তাসাওউফ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।^৪ শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে সাঁদি দেশ ভ্রমণের বাসনায় বেরিয়ে পড়েন। তিনি ১২২২-১২২৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং সিরিয়া, দামেশক, হেজাজ, লেবানন, রোম, মক্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রসিদ্ধ শহরসমূহ পরিভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন।^৫ সাঁদি তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছেন,

در اقصای عالم بگشتم بسی * بسر بردم ایام با همه کسی

تمتع بحر گوشه یی یافتم * هر خرمی خوشه یی یافتم.^৬

‘পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় অনেক ঘুরেছি, সকল শ্রেণীর লোকের সাথে দিনাতিপাত করেছি। প্রতি স্থানে জ্ঞান-রেণু আহরণ করেছি, সকল মৌসুমের শস্য উপভোগ করেছি।’

তিনি দামেশকে অবস্থানকালে ইয়াহিয়া আ.-এর সমাধি, মুয়াবিয়া রা., আবু বকর শিবলী রহ., শেখ ইব্রাহীম নবল রহ., শেখ এমাম উদ্দিন কাজার বহরী রহ. ও উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. প্রমুখ মহা পুরুষগণের

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

সমাধি যিয়ারত করেন। এর পর শেখ সাদি দামেশক নগরী ত্যাগ করে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি এক নিবিড় অরণ্যে বসে তন্ময় চিত্তে খোদার আরাধনায় মগ্ন হন। কিন্তু, সে সময় সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে লোমহর্ষক যুদ্ধ চলছিল। একদল খ্রিষ্টান সৈন্য তাঁকে বন্দী করে তারাবিলাসে (طرابلس) বন্দী ইহুদীদের সাথে পরিখা খননের কাজে নিযুক্ত করে।^৭ এ সময় তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। যেমন- এ বিষয়ে তিনি বলেছেন,

گر برسد ناله سعدی بکوه * کوه بنالد بزبان صدا.^৮

‘সাদির কান্না যদি পাহাড় শুনতো পাহাড়ও তাঁর কান্নায় উচ্চ কণ্ঠে কাঁদতো।’

তিনি কাশ্গর, নাজাফ, কারবালা, হিন্দুস্তান এবং তুর্কিস্তানও ভ্রমণ করেন। দীর্ঘকাল ভ্রমণের পর শেখ সাদি ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মভূমি শিরায় নগরীতে ফিরে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শিরায় নগরে এসে তিনি সর্বদা কাসিদা ও গয়ল রচনা এবং ওয়াজ-নসিহতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। শেষ জীবনে তিনি স্থায়ী খানকায় অবস্থান করতেন এবং সেখানেই ১২৯১ মতান্তরে ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।^৯ সাদির জীবনের দীর্ঘ সময় সফরে অতিবাহিত হলেও ফারসি সাহিত্যে বিশাল অবদান রাখতে সক্ষম হন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন হল তাঁর ‘সাদি নামে’ (سعدی نامه) যা পরবর্তীতে বুস্তান (بوستان) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।^{১০} তিনি ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন।^{১১} বুস্তান গ্রন্থটিকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এ কাব্যের প্রতিটি অধ্যায়ে কবি বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলি তুলে ধরেছেন এবং স্থায়ী অভিজ্ঞতার আলোকে একাধিক গল্প বর্ণনার মাধ্যমে সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেছেন। তাঁর এ কাব্য আলাদাভাবে এবং ‘কুল্লিয়াতে সাদি’ (সাদির রচনাবলী) নামে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ফারসি কাব্যসাহিত্যে শেখ সাদির অন্যান্য অবদানগুলো হলো: কাসায়েদ, দিওয়ানে গাযালিয়াত, মারসিয়া, সাহেবিয়া, খাবিছাত (বিদ্রূপাত্মক কবিতা), রুবাঈ (চতুষ্পদী কবিতা), মাসনাবি, কেতয়াত ও মুফরাদাত।^{১২}

শেখ সাদি রহ. শুধু ইরানের প্রথম সারির কবিদের অন্যতমই ছিলেন না, বরং গদ্য লেখক হিসেবেও তিনি সমান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর চিরঞ্জীব গদ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে গুলিস্তান (گلستان) গ্রন্থটি অন্যতম। তিনি ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এ গদ্য গ্রন্থটি রচনা করেন।^{১৩} এছাড়াও তিনি মাজালিসে পাঞ্জিগানা, রেসালে দার আকল ও ইশক, নাসিহাতুল মুলুক ও তাকরিরাতে ছালাছাও লিখেছেন।^{১৪}

৩. শেখ সাদির কাব্যে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধ

বাংলা নৈতিকতা শব্দের আরবী বা ফারসি প্রতিশব্দ আখলাক (اخلاق) বা আখলাকিয়াত (اخلاقیات)। ইংরেজি প্রতিশব্দ Ethics, Ethic, Ethical, যা গ্রীক শব্দ ethiko (moral) এবং ethos (character) হতে এসেছে।^{১৫} যার অর্থ: নীতি সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ নৈতিক আচার-ব্যবহার (conduct and behaviour), রীতি-নীতি (manners), মানুষের জীবনের কর্তব্য বিষয়ক জ্ঞান (Knowledge of the duties of man's life), সদগুণ (virtue) ইত্যাদি বুঝায়।^{১৬} মূলত: নৈতিকতা হলো এমন এক জীবন দর্শন, যা সত্য মিথ্যা ও ভাল মন্দ বিচার করার সূক্ষ্ম অনুভূতি যোগায়। সাদির নৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারা একজন মানুষকে সত্যিকারের আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর নৈতিক শিক্ষা মানবজীবনে দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, নীতিবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে মানুষকে সৎ, আদর্শ ও নান্দনিক জীবন দান করতে পারে।

৪. প্রজার সেবা

নৈতিক কবি হিসেবে শেখ সাদি প্রজাসাধারণের প্রতি শাসকশ্রেণীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, বাদশাহ হচ্ছেন একটি রাজ্যের রক্ষক এবং প্রজাদের আশ্রয়স্থল ও অভিভাবক। তিনি কখনও নিজের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের চিন্তায় মত্ত থাকতে পারেন না। আর যদি তিনি নিজের শান্তি ও আরামের চিন্তায় বিভোর থাকেন, তবে তার রাজ্যের প্রজারা কখনও সুখ-শান্তি পাবে না। কবি দায়িত্ববোধের দিক থেকে বাদশাহকে একজন রাখালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা, একজন রাখালের দায়িত্ব হচ্ছে মেঘ পালের রক্ষণাবেক্ষণ করা। আর সেই রাখাল যদি নিজের শান্তির জন্য সুখের নিদ্রায় বিভোর থাকে, তবে সে মেঘপালে হিংস্র বাঘের থাবা পড়বে এবং মেঘপাল উজার হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে কোন রাজ্যের বাদশাহ যদি গরীব প্রজাদের সুখ-শান্তির প্রতি অক্ষিপ না করে, তবে সে রাজ্যে শান্তি আসে না এবং বাদশাহর

রাজত্বও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কারণ, প্রজারাই হচ্ছে রাজ্যের মূল চালিকা শক্তি। সাসানী যুগের বাদশাহ নওশিরওয়ান^{১৭} তার পুত্র হরমুজকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, কবির ভাষায়:

نیاساید اندر دیار تو کس * چو آسایش خویش جویی و بس
نیاید بنزدیک دانا پسند * شبان خفته و گرگ در گوسفند
برو پاس درویش محتاج دار * که شاه از رعیت بود تاجدار.^{১৮}

‘তোমার রাজ্যে প্রজারা শান্তি পাবে না কখনো যদি নিজের শান্তি তালাশে থাক রত। জ্ঞানীজনে এ কথা কখনো পছন্দ না করিবে রাখাল থাকিবে ঘুমের ঘরে, বাঘ মেঘপালে পড়িবে। মুখাপেক্ষী গরীব প্রজার প্রতি নজর রাখিবে যবে তোমার রাজমুকুট স্থায়ী করিবে প্রজায় তবে।’

তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এমন এক অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন যে অভিজ্ঞতা তাকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব কল্যাণের পথে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন, ইয়াতিমের আত্ননাদ সাদির কোমল হৃদয়কে সবসময় দোলা দিত। তাই তাঁকে ‘মানবতার কবি’ বলা হয়।^{১৯} সাদির গুলিস্তান গ্রন্থে তাঁর মানবতাবাদের সূর শোনা যায়। কবির ভাষায়,

بنی آدم اعضای یکدیگرند * که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آرد روزگار * دگر عضوها را نماند قرار.^{২০}

‘মানব সন্তান একে অপরের অঙ্গ বিশেষ কেননা, তারা একই মৌলিক পদার্থ হতে সৃষ্টি। দেহের এক অঙ্গে কখনও ব্যাথা অনুভূত হলে অন্য অঙ্গও তাতে অস্থির হয়ে পড়ে।’

গরীব-দুঃখীর দুঃখে সমব্যথী হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

تندرستان را نباشد درد ریش * جز بهمدردی نگویم درد خویش
گفتن از زنبور بی حاصل بود * بایکی در عمر خود نا خورده نیش
تا ترا حالی نباشد همچو ما * حال ما باشد ترا افسانه پیش
سوز من با دیگری نسبت مکن * او نمک بردست و من بر عضو ریش.^{২১}

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না শীর্ষক কবিতায় সাদির এই কবিতার ভাবার্থ প্রতিধ্বনি করে বলেছেন,

চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিধে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিধে দংশন যারে?
যতদিন ভবে না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার সম;
ঈশ্বর হাসিবে শুনে না শুনিবে
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।^{২২}

কবি শেখ সাদি অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখে নিজের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর গুলিস্তান গ্রন্থে ব্যক্তিগত জীবন থেকে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়:

حکایت: "هرگز از دور زمان ننالیده‌ام و روی از گردش آسمان در هم نکشیده‌ام مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم به جامع کوفه در آمدم تنگ دل یکی را دیدم که پای نداشت سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم."^{২৩}

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার শেখ সাদির উল্লিখিত গল্পের কাব্যরূপ দিয়েছেন এভাবে:

একদা ছিল না জুতো চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয় বন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপিচুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।

দেখি তথা একজন পদ নাহি তার,
অমনি জুতোর খেদ ঘুচিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ?^{২৪}

৫. দয়া-দাক্ষিণ্য

الدنيا مزرعة الآخرة ‘দুনিয়া পরকালের শস্য ক্ষেত্র’। বাদশাহ ফকীর, ধনী-গরীব কেউ চিরদিন এখানে বেঁচে থাকে না। এ পৃথিবীতে কারো বাসনা পূর্ণ হবে না। এখানে যে যেমন কর্ম করবে, পরকালে সে তেমন প্রতিফল ভোগ করবে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সকল কর্ম ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় সে যত মাল-সম্পদ এবং রাজত্ব রেখে যাক না কেন, তা কোন কাজে আসে না। সে রেখে যাওয়া সম্পদ এবং অনর্থক নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়গুলোর জন্য আফসোস করতে থাকে। কবি শেখ সাদি ভাল-মন্দ, ধার্মিক-অধার্মিক সকল শ্রেণীর অসহায় গরীব-দুঃখীকে দান করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কবি মনে করেন যে, প্রত্যেক মানুষকে জীবিতাবস্থায় দান-খয়রাত করে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।^{২৫} নতুবা মৃত্যুর পরে তার রেখে যাওয়া সম্পদের জন্য আফসোস করতে হবে।

কবি মনে করেন যে, উত্তম ঐ ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ উপার্জন করে দান-খয়রাত করেছে এবং নিজেও ভোগ করেছে। কারণ, মৃত্যুর পরে রেখে যাওয়া সম্পদের জন্য তার কোন আফসোস থাকবে না এবং তাকে আল্লাহর কাছে কৈফিয়তও দিতে হবে না। যেমন তিনি বলেন,

پسندیده رایى که بخشید و خورد * جهان از بی خویشــــتن گرد کرد

در این کوش تا با تو ماند مقیم * که هرچ از تو ماند دریغ است و بیم.^{২৬}

‘যে ব্যক্তি দান করে ও খায়, সে নিশ্চয় উত্তম; সে ইহলোকে পরলোকের পাথেয় সঞ্চয় করেছে। চেষ্টা কর, যাতে সব সময় দান করতে পার নতুবা, মৃত্যুও পরে আফসোস করবে এবং কৈফিয়ত দিতে হবে।’

৬. ইয়াতিমের প্রতি সদাচার

শেখ সাদি নিজে একজন পিতৃ-মাতৃহীন লোক ছিলেন। তাই ইয়াতিমের প্রতি সামান্য আঘাত কবির হৃদয় পটে বিরাট বেদনার সঞ্চয় করত। কেননা পৃথিবীতে তারা আশ্রয়হীন এবং তাদের মাঝে সর্বদাই পিতা-মাতার স্নেহের শূন্যতা রয়েছে।^{২৭} শিকড় ছাড়া যেমন কোন বৃক্ষ বেঁচে থাকতে পারে না; ঠিক তেমনিভাবে মাতার উপর কোন আশ্রয়দাতা না থাকলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। এ পৃথিবীতে ইয়াতিমরা থাকে অবহেলিত ও বঞ্চিত। ফলে তারা সব সময়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই তাদের সামনে এমন কাজ-কর্ম করা উচিত নয়, যাতে তারা কষ্ট পায়।^{২৮} কবি বলেন,

چو بینى یتیمی سر افکنده پیش * مده بوسه بر روی فرزند خویش

الا تا نگردد، که عرش عظیم * بلرزد همی چون بگرید یتیم.^{২৯}

‘তুমি যদি ইয়াতিমকে তোমার সামনে মাথানত অবস্থায় দেখ তবে তোমার নিজের সন্তানকেও চুম্বন করো না। সাবধান! আল্লাহর আরশ যেন না কাঁপে কারণ ইয়াতিমের কান্নায় আরশ কাঁপতে থাকে।’

তাই কবি আশ্রয়হীন ইয়াতিমদেরকে নিজ ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কারণ কবির জীবনেও এমন অন্ধকার নেমে এসেছিল। এক সময় ছিল, যখন তাঁর শরীরে মশা-মাছি পড়লে অনেকে কষ্ট পেতেন। কিন্তু যখন তিনি পিতা-মাতাকে হারিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন তখন শত্রু আক্রমণ করলে কিংবা বন্দী করলেও দুঃখ করার মত কেউ ছিল না। দুঃখ ভারাক্রান্ত কবি শেখ সাদি এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন,

اگر بر وجودم نشستى مگس * پریشان شدی خاطر چند کس

کنون دشمنان گر برندم اسیر * نباشد کس از دوستانم نصیر

مرا باشد از درد طفلان خبر * که در طفلى از سر برفتم پدر^{৩০}

‘যদি আমার শরীরে কোন মশা মাছি পড়ত কতিপয় লোক তাতে পেরেশান থাকতেন। আর এখন যদি শত্রুও আমাকে বন্দী করে তবে কেহই আমার সাহায্যকারী ও সঙ্গী হবে না। কারণ শৈশবে আমার ব্যাথার সংবাদ হলো যে, শৈশবে আমার পিতাকে হারিয়েছি।’

৭. অধীনস্থদের প্রতি সদ্যবহার

সাদি ধনী লোকদেরকে তাদের অধীনস্থ দাস-দাসী ও চাকর-নকরের প্রতি সদাচারণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, তারাও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তাদেরকেও একই আল্লাহ তায়াল্লা সৃষ্টি করেছেন এবং ধনীদের অধীন করে দিয়েছেন। এটা সৃষ্টিকর্তার বিশেষ করুণা যে, তিনি দাস-দাসী ও চাকর-নকরের উপর ধনীদের কর্তৃত্ব দান করেছেন। তাই মহান আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত এবং অধীনস্থদের সাথে অসদাচারণ করা উচিত নয়। কারণ, এমনও হতে পারে যে, সে কিয়ামতের দিন উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আর তখন তার সামনে ধনী ব্যক্তির লজ্জিত হতে হবে। তাই কবি বলেছেন,

بربنده مگیر خشم بسیار * جورش مکن و دلش میازار
 او را تو به ده درم خریدی * آخر نه به قدرت آفریدی
 این حکم و غرور و خشم تا چند؟ * هست از تو بزرگتر خداوند.^{৩১}

‘নিজের অধীনস্থদের উপর অতি রাগান্বিত হইও না, তাদের উপর অত্যাচার করো না এবং তাদের মনে কষ্ট দিও না। তুমি তাকে মাত্র দশ দিরহামে খরিদ করেছ, তোমার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করতে পারনি। তুমি তাদের উপর কতদিন অত্যাচার করতে পারবে? তোমার উপরে একজন শক্তিশালী প্রভু আছেন।’
 এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন,

بر غلامی که طوع خدمت تست * خشم بی حد مران و طیره مگیر
 که فصیحت بود به روز شمار * بنده آزار و خواجه در زنجیر.

৩২

‘যে গোলাম হতে তুমি খেদমত পাবার ইচ্ছা রাখ, তাকে রাগান্বিত হয়ে শাস্তি দিও না। কেয়ামতের দিন তুমি লজ্জিত হবে, গোলাম মুক্তি পাবে, আর মনিব জাহান্নামে জিজিরাবদ্ধ থাকবে।’

৮. প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ

নৈতিক কবি শেখ সাদি প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার করা এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হয়ে পাশে দাঁড়ানোকে নফল নামাজের চেয়ে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি হেজাযের পথে যেতে প্রতি কদমে দুই রাকাত করে নফল নামাজ আদায় করত। আল্লাহর প্রেমে এতটা বেহুশ ছিল যে, যদি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হত তবুও সে অনুভব করতে পারত না। অবশেষে সে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজেকে একজন বড় আবেদ বলে মনে করতে লাগল। ফলে সে গোমরাহীর মধ্যে পড়ল। গায়েব হতে এক ফেরেশতা তাকে আওয়াজ দিয়ে শুনালেন, ‘হে নেক বান্দা! তুমি মনে কর না যে, আল্লাহর দরবারে অনেক এবাদত করেছ। প্রকৃত পক্ষে তুমি কিছুই করতে পারনি। তুমি জেনে রেখ যে, সদাচারণ দ্বারা তোমার প্রতিবেশীর মনকে সমৃদ্ধ করা, প্রতি মঞ্জিলে এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়ার চেয়েও উত্তম। কবির ভাষায়,

باحسانی آسوده کردن دلی * به از الف رکعت بھر منزلی.^{৩৩}

‘সদাচারণ দ্বারা একটি মানুষের মন সমৃদ্ধ করা প্রতি মঞ্জিলে হাজার রাকাত নামাজ হতে উত্তম।’

৯. সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন

শেখ সাদি বুস্তান (بوستان) কাব্যে মানব সেবার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি কুকুর বিড়াল এমনকি পিপীলিকার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করতে বলেছেন। তাই কবি বলেছেন,

توبا خلق سهلی کن ای نبکینحت * فردا نگبرد خدا بر توسخت.^{৩৪}

‘সৃষ্টি জীবের প্রতি ইহলোকে দয়া করলে খোদা তোমার প্রতি পরলোকে দয়া করবেন।’
 কবির দৃষ্টিতে, সৃষ্টিজীবের সেবার ন্যায় শ্রেষ্ঠ কাজ আর নেই। তাঁর মতে, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টার সন্ধান করা ভণ্ডামি মাত্র।^{৩৫} সৃষ্টিজীবের সেবা ছাড়া মানুষের নামাজ, রোযাও কোন কাজে আসবে না। কবির ভাষায়,

طریقت بجز خدمت خلق نیست * بتسبیح و سجاده و دلق نیست.^{৩৬}

‘সৃষ্টির সেবা ছাড়া তরিকত লাভ করা সম্ভব নয়, তসবিহ, জায়নামাজ ও ছিঁড়া পোশাকে তা অর্জন করা যায় না।’

১০. উপসংহার

নৈতিক শিক্ষা ছাড়া সৎ, আদর্শ ও নান্দনিক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। শুধু আইনের ভয় দেখিয়ে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরী এবং তাদের মধ্যে কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, মানবতাবোধ ও নৈতিকতাবোধ জন্মিত করা সম্ভব নয়। সাদির নৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারা একজন মানুষকে সত্যিকারের আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর নৈতিক শিক্ষা মানবজীবনে দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, নীতিবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ জন্মিত করে মানুষকে সৎ, আদর্শ ও নান্দনিক জীবন দান করতে পারে। যা মানুষের ব্যক্তিগতজীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনের সুশৃঙ্খল ও সমুন্নত পথ নির্দেশ। এর যথার্থ অনুসরণ মুসলিম সমাজকে সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে সহায়তা করবে এবং পরকালীন জীবনে মুক্তির পথকে সহজ করবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ মুহাম্মদ জাফর ইয়াহকি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (ইয়েক ও দো) (তেহরান: চাপখানেয়ে শেরকাত, ১৯৯৯), পৃ. ১৭০।
- ^২ E. G. Browne, *A Literary History of Persian Literature*, voll.ii (Cambridge: University press, 1969), p. 526; আবদুস সাভার, *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯), পৃ. ২৫০।
- ^৩ *The Cambridge History of Iran*, voll-5, p. 595.
- ^৪ মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: নিগারিশাত, তা.বি.), পৃ. ৪৩৭; W. G. Aroher and G.M. Wickens, *The Gulistan of Sadi* (New York: Capricorn Books, 1964), pp. 34,35; *A Literary History of Persian Literature*, voll.2, p. 528.
- ^৫ *A Literary History of Persia*, vol-ii, P. 529.
- ^৬ শেখ সাদি রহ., পৃ. ৬০।
- ^৭ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৪৩৯।
- ^৮ পারভেজ আতাবেকি, *বারগুযিদে ওয়া শারহে আছারে সাদি* (তেহরান: নাশরে পাজুহে ফারযান, ১৯৯৬), পৃ. ৬।
- ^৯ মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৯।
- ^{১০} হাসান আনওয়ারি, *গুরীদেহ ওয়া বিকারার দার বারেয়ে যিন্দেগী ওয়া আছারে সাদি* (তেহরান: নাশরে কাতরে), পৃ. ১৮।
- ^{১১} *গুরীদেহ ওয়া বি কারার দার বারেয়ে যিন্দেগী ওয়া আছারে সাদি*, পৃ. ১৭।
- ^{১২} আল্লামা শিবলি নোমানি, *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড (লাহোর: ইশরাত পাবলিশিং হাউস, তা.বি.), পৃ. ৪৪-৪৫।
- ^{১৩} *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৫১২।
- ^{১৪} *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৫।
- ^{১৫} *The Encyclopaedia Americana*, (Danbury: International headquarters, Grolier in Corporated, 1984), p. 610.
- ^{১৬} Ashu Tosh Dev, *Students Favourite Dictionary* (Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1990), p. 836.
- ^{১৭} **নওশিরওয়ান:** তিনি সাসানী বংশের একজন খ্যাতিমান বাদশাহ (শাসনকাল- ৫৩১-৫৭৯ খ্রি.) ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে সর্বসাধারণের নিকট প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছেন। এ মহান বাদশাহর শাসনকালে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সা. জন্ম (৫৭০ খ্রি.) গ্রহণ করেন। দ্র. মির্জা আব্দুল আযিম খান গারিব গুরগানি (সম্পা.), *গুলিস্তানে সাদি* (তেহরান: এনতেশারাতে ইরান মেহের, ১৩৮০ হি.শা.), পৃ. ২৬৬।
- ^{১৮} গোলাম হোসাইন ইউসুফি (সম্পা.), *বুস্তানে সাদি*, পৃ. ৪২।
- ^{১৯} গুরগানি (সম্পা.), *গুলিস্তানে সাদি*, পৃ. ভূমিকা, ৪৩।
- ^{২০} *তদেব*, পৃ. ১১৮।
- ^{২১} মোহাম্মদ আলি ফরুগি, *কুল্লিয়াতে সাদি*, পৃ. ৪২।
- ^{২২} সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ. ৭৩।
- ^{২৩} গুরগানি (সম্পা.), *গুলিস্তানে সাদী*, পৃ. ১৭৭।
- ^{২৪} সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ. ৭৩।
- ^{২৫} Donaldson, Dwight. M, *Studies in Muslim Ethics*, London: S.P.C.K.Great Britain, 1953 P. 236.
- ^{২৬} মোহাম্মদ আলি ফরুগি (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সাদি*, পৃ. ২৩৭।
- ^{২৭} আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯৪), পৃ. ১৯৬।
- ^{২৮} *মাওয়ায়েজ ওয়া হেকামে সাদি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯।
- ^{২৯} গোলাম হোসাইন ইউসুফি (সম্পা.), *বুস্তানে সাদি*, পৃ. ৮০।
- ^{৩০} মোহাম্মদ আলি ফরুগি (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সাদি*, পৃ. ২৫৫।
- ^{৩১} *তদেব*, পৃ. ১৬১।
- ^{৩২} *তদেব*, পৃ. ১৬২।
- ^{৩৩} *তদেব*, পৃ. ১৭২।
- ^{৩৪} *তদেব*, পৃ. ৮৫।
- ^{৩৫} *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১৯৮।
- ^{৩৬} গোলাম হোসাইন ইউসুফি (সম্পা.), *বুস্তানে সাদি*, পৃ. ৫৫।

হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানির লাবখান্দে আনার গল্পগ্রন্থে নৈতিক মূল্যবোধ
[Moral values in the Story Book *Labkhand-e-Anar* of Houshang
Muradi Kermani]

ড. মো. কামাল উদ্দিন*

[**Abstract:** Houshang Moradi-Kermani was born in 1944 in Sirch village near the city of Kerman in south central Iran. His famous contributions are *The Stories of Majid*, *Children of the Carpet Weaving House*, *The Palm*, *Fist on Hide*, *The Tandoor and Other Stories*, *Anar's Smile*, *Mommy's Guest*, *The Cruse*, *Like the Full Moon*, *Nine of Each Kind*, *You're No Stranger Here*, and *Rice and Stew*. Especially, *Labkhand-e-Anar* or *Anar's Smile* consists of fifteen stories and one message of Houshang Muradi Kermani. These stories are full of moral values, duties for the mankind, tradition and culture along with popular character. The moral values have been discussed through his stories in various ways. The children have been inspired to perform good deeds for the mankind. His works have been translated into various languages of the world. Thirty eight television serials episode and feature films for cinema have been produced following his books and have been entered in domestic and foreign film festivals. He has won many national and international awards for his creations. The moral values in the story book *Labkhand-e-Anar* of Houshang Muradi Kermani have been depicted in the article.]

Keywords: Houshang Muradi Kermani, Moral values, Story Book, *Labkhand-e-Anar*.

১. ভূমিকা

সাহিত্য মনের কথা বলে। আধুনিক ফারসি সাহিত্য হয়ে উঠেছে আরও বেশি জীবনমুখী। কবিতা গল্প ও উপন্যাস সবই একই ধারায় বহমান। সাহিত্যের পাঠক ছোট-বড় সবাই। আর শিশুরাই আগামীদিনের কারিগর। তাদের নিয়ে লেখার গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়; বরং আরও বেশি। ইরানের শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভা হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানি। তিনি লিখেছেন অসাধারণ গল্প ও উপন্যাস। শিশু-কিশোরদের নিয়ে তার রচনাবলি খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি তাদের জীবনের নানামুখী চিত্র এঁকেছেন গল্পের পরতে পরতে। তার অন্যতম গল্পগ্রন্থ *লাবখান্দে আনার* বা ডালিমের মুচকি হাসি। এতে গল্পের অন্তর্লোকে চিত্রিত হয়েছে মূল্যবোধের চেতনা। যা তাদের মনে ন্যায় ও সত্যের আলোকে জীবন গড়ার প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। তারা স্বপ্নময় জীবন গড়ার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। মূল্যমানের চেতনায় ভরে উঠে তাদের মনন। নতুন নতুন ভাবনায় এগিয়ে চলে তাদের জীবনের গতি। জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট পেরিয়ে চলতে হবে আগামী পথে এ শিক্ষাই পরিদৃষ্ট হয় গল্পগুলোতে। *লাবখান্দে আনার* বা ডালিমের মুচকি হাসি গল্পগ্রন্থে শিশুদের জীবনকথার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের চেতনাও প্রকাশ পেয়েছে।

২. হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানির জীবন ও সাহিত্যকর্ম

হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের কেরমান প্রদেশের শাহদাদ অঞ্চলের সিরাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন নিজ গ্রামেই। ছোটবেলায় মায়ের মৃত্যুতে পিতাও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় ছেলের পড়াশোনার প্রতি কোনো মনোযোগ দিতে পারেননি। দাদা-দাদির সাথে শৈশব কাটলেও লেখাপড়ার প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। চাচা ছিলেন একজন যুবক শিক্ষক। তারই সান্নিধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কেরমানে চলে আসেন। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন। তখনই তার মনে সিনেমার প্রতি বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে তেহরানে চলে আসেন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব অনুষদ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ইংরেজি অনুবাদ বিভাগ থেকেও।^{*}

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

হোশাজ মুরাদি কেরমানি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। এ সময় তিনি সৃজনশীল তথা শিশু-কিশোর গল্প-উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম গল্প ‘কুচে মা খোশবাখত হা’ (আমাদের গলিটা ভাগ্যবান) আহমদ শামলুর ‘খুশে’ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পসংকলন ‘মাসুমে’ প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে *কেসেসেহায়ে মাজিদ* (গল্পগুলো মাজিদের) শিরোনামে ধারাবাহিক গল্প প্রকাশিত হয়। ছোট ছেলে মাজিদের পড়াশোনার প্রতি খুবই অনুরাগ ছিল। পড়াশোনার অদম্য আগ্রহ ও আর্থিক প্রতিকূলতা ঘিরেই এ গল্পগ্রন্থের অবতারণা। এ গল্পগ্রন্থে মোট ৩৯টি গল্প রয়েছে।^২ প্রতিটি গল্পের একটি করে শিরোনাম রয়েছে। যেগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্রে মাজিদ সরলতা, অধ্যবসায়, দুষ্টুমি, কৌতুহল, দুঃসাহসিকতা ও মানবিকতা নিয়ে অগ্রসর হয়। মানবিক বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে গল্পগুলো খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কেরমানির উল্লেখযোগ্য রচনাবলি- *কেসেসেহায়ে মাজিদ* (১৯৭৯) *বাচ্ছেহায়ে কালিবাক খানে* (১৯৮০) *নাখল* (১৯৮২), *চাকমে* (১৯৮২), *খুমরে* (১৯৮৯), *মুশত বার পুস্ত* (১৯৯২), *দান্তানে অন খুমরে* (১৯৯৩), *তানুর* (১৯৯৪), *মুরাব্বায়ে শিরিন* (১৯৯৮), *লাবখান্দে আনার* (১৯৯৯), *মেহমানে মামান* (২০০১), *না তার ভা না খোশক* (২০০৩), *শোমা কে গারিবে নিস্তিদ* (২০০৫), *পলো খোরেশ* (২০০৭), *মেসলে মাহে শাবে চাহারদাহ* (২০০৭), *নাঙ্গে বালিশ* (২০০৯), *আবে আনার* (২০১২), *তাহে খিয়ার* (২০১৪), *ক্বাশোকে চায়েখোরি* (২০১৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^৩ সমকালীন ইরানের খুবই জনপ্রিয় শিশু-কিশোর কথাসিন্ধী হোশাজ মুরাদি কেরমানির সাহিত্যকর্ম জার্মান, স্পেনিশ, ফরাসি, ইংরেজি, হল্যান্ডি, আরবী, আরমেনীয়, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই গল্পগুলোর সংকলন ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচিত গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। কেরমানির অনন্য সৃষ্টিকর্ম *বাচ্ছেহায়ে কালিবাক খানে* (কার্পেট কারখানার ছেলেগুলো) ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থের জন্য ‘শিশু-কিশোর গ্রন্থ সমালোচনা পরিষদ পুরস্কার’ এবং ‘বিশ্ব হাস্য ক্রিস্টিন এ্যান্ডারসন পুরস্কার’ লাভ করেন। অভাবের তাড়নায় যেসব ইরানি শিশু লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে কার্পেট কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয় তাদের জীবনকথা চিত্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বিশ্ব শিশুসাহিত্যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি ‘বিশ্ব হাস্য ক্রিস্টিন এ্যান্ডারসন’ পুরস্কার পরিষদ মুরাদি কেরমানিকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচিত লেখক হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি ‘বার্লিন পুরস্কারে’ ভূষিত হন। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইরানের ‘চেহরেহায়ে মাদেগার’ বা ‘অবিনশ্বর মুখ’ উপাধিতেও ভূষিত হন।^৪

বিশ্বসাহিত্যজ্ঞানে শিশুতোষ সাহিত্য এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকায় অবতীর্ণ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশে রয়েছে কার্যকর পদক্ষেপ। শিশুদের আগামীদিনের চ্যালেঞ্জের বিপ্রতীপে গড়ে তোলায় শিশুতোষ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা ভাষায়ও শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের তুলনায় তা অপ্রতুল।^৫ তথাপি গত শতকে বাংলা সাহিত্যে অগণিত গল্প, উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, ভূতপ্রেতবিষয়ক জটিলতা, রহস্য উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন, কবিতা ও ছড়া প্রভৃতি শিশু-কিশোরদের মনে রেখাপাত করে আসছে।^৬ মননের গহিনে তা প্রভাব বিস্তার করে আসছে। চিরায়ত সাহিত্যের মতো ফারসি ও বাংলা শিশুতোষ সাহিত্যেও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যা তাদের কল্পনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করছে।

৩. লাবখান্দে আনার পরিচিতি

হোশাজ মুরাদি কেরমানির *লাবখান্দে আনার* বা ডালিমের মুসকি হাসি গল্পগ্রন্থটি ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তেহরানের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা এন্তেশারাতে মুদ্রিত থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে এর যথেষ্ট সংস্করণ প্রকাশ পায়। এতে ১৫টি গল্প ও একটি ম্যাসেজ রয়েছে। *লাবখান্দে আনার* মূল গল্পে তালাশ স্কুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ শেষে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ স্থান লাভ করে। কবি, লেখক, শিল্পী, গবেষক, প্রকৌশলী ও ডাক্তারসহ নানা পেশার ব্যক্তিবর্গ তাদের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন জনাব দাব্বাগ। তিনি ডালিম গাছের ডালা দিয়ে শিক্ষার্থীদের শাসন করতেন। তার শাসন ও শৃঙ্খলায় শিক্ষার্থীদের জীবন হয়ে ওঠে উন্নত। সমাজে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাদের অনুসরণে অন্যরাও নিজেদেরও গড়ে তুলতে চায়। মূলত একজন প্রধান শিক্ষকের জাতিগঠনে ভূমিকার প্রসঙ্গ বিধৃত

হয়েছে গল্পের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকেই তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় মহান শিক্ষকের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এই সাক্ষাৎকারে প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী এবং ছেলেও অংশগ্রহণ করেন। সর্বোপরি সবাই একজন সফল প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বানুভূতি ও প্রকৃত মানুষ গড়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

গোশভারে বা কানের দুল গল্পটি একটি এতিম মেয়ে শিশুর জীবন নিয়ে রচিত। একজন গরিব মেয়ে তার ধনী বান্ধবীর বাসায় জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে যে ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়ে তা ধাপে ধাপে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি অন্যান্য মেয়েকে নিয়ে যেতে সেই বাড়িতে অনেক নামীদামী গাড়ি আসে। কিন্তু তার কোনো দামী গাড়ি না থাকায় যে আবহ সৃষ্টি হয় তা-ই এ গল্পের মূল উপজীব্য। শিশু তা মওজ বা ছয়টি কলা গল্পে প্রথমবার কলা বিক্রেতার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। লানে বা বাসা একটি কবুতরের গল্প- যে কবুতরটি মরুভূমিতে বাস করে। পারভানে বা প্রজাপতি গল্পটি একজন অন্ধ ব্যক্তি ও তার তিন বছরের কন্যাকে নিয়ে আবর্তিত। বাজার গল্পে গ্রামের স্বামী-স্ত্রীর শহরে কেনাকাটা ও একজন ব্যবসায়ীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাখ বা সেলাই বা বোনার সুতা গল্পটি একজন নারী শ্রমিক ও তার সন্তানকে নিয়ে লেখা হয়েছে। বাচ্ছেহায়ে ইরানি বা ইরানি ছেলেমেয়েরা গল্পে ইরানের ছেলেমেয়েদের দেশের বাইরে বসবাস এবং মাতৃভূমি ইরান ও মাতৃভাষা ফারসি ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। শেরে তাযে বা নতুন কবিতা মূলত কবিতা পাঠ সম্পর্কে রচিত। ইয়াদগারে সাফার বা ভ্রমণের স্মৃতি গল্পটি একজন বৃদ্ধ কবির জীবন নিয়ে। মাদার বা মা বা আমাদের সাথে মা গল্পটি একজন মেয়ের তার মায়ের কাছে লেখা চিঠি, যার বাবা মেয়েটিকে ভূমিকম্পের হাত হতে বাঁচাতে নিজেই মৃত্যুবরণ করে। পাইয়াম বা ম্যাসেজ হলো একটি বার্তা। যা মূলত হেন্দ দার কেরমান বা কেরমানে ভারত নামে শিশু-কিশোরদের সামনে হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানির আশার আলো জাগানো একটি বক্তৃতা। লাবখান্দে আনার গল্পগ্রন্থটি রচিত হয়েছে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে। কিন্তু এগুলো এতটাই জীবনঘনিষ্ঠ যে, বড়রাও তাদের কর্তব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। গল্পের পরতে পরতে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়ের হাতছানি। প্রেরণার উৎস।

৪. হোশাঙ্গ মুরাদির লাবখান্দে আনার গল্পগ্রন্থে মূল্যবোধের চেতনা

শিশুর জগৎ স্বপ্নের জগৎ। শিশুর পৃথিবী এক রহস্যময় পৃথিবী। চাঞ্চল্যে ভরা ফুলের মতো সুন্দর। তাদের স্বপ্নগুলো হয় রঙিন। কালো বা ধূসর বলে কিছু থাকে না। যৌক্তিক বা অযৌক্তিক বলেও তাদের কিছু নেই। তারা যা দেখে আনন্দ নিয়ে দেখে। যা করে তাও আনন্দের সাথে। শিশু-কিশোরদের মনের আকাশজুড়ে থাকে নতুন পৃথিবী দেখার স্বাদ। তারা চায় স্বপ্নময় জীবন। জীবন নিয়ে ভাবনা নতুন কিছু নয়। রহস্য ঘিরে থাকে জীবন। এই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা মানুষকে স্বপ্নময় করে তোলে। আকাশের বিস্তৃত বলয়ও যেনো কেবলই আনন্দের তরে স্বপ্নের জগতকে জাগিয়ে তোলে। বেঁচে থাকার আশে মানুষের মন নতুনত্ব খুঁজে বেড়ায়। এসব গল্পে শুধু ছোটরা নয় বড়রাও সমানভাবে আগ্রহী। এখানেই একজন লেখকের সার্থকতা। গল্পের প্লটের বৈচিত্র্য অভাবনীয়। প্রতিটি মানুষেরই জীবনের গল্প আলাদা। এই গল্পের মাঝেই জড়িয়ে থাকে মানুষের জীবনকথা। যাপিত জীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয় গল্পের পাতায় পাতায়। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের বহমান জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে প্রতিটি গল্পে।

শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তাদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন সকলের দায়িত্ব। তাদের প্রতি অবহেলায় পরবর্তী প্রজন্ম ধাবিত হবে অবনতির দিকে। তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন করে তোলার প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে কেরমানির শিশু-কিশোর গল্পের মধ্য দিয়ে। যে বাচ্চাটি জীবনের দৌড়ে পিছিয়ে আছে। দুর্বল বলে কটাক্ষের স্বীকার হচ্ছে। কেউবা তার বন্ধুর মতো সুন্দর পোশাক পাচ্ছে না। আবার কেউ স্কুলের শিক্ষা বঞ্চিত হয়ে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। আর তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তার অন্তরের সুপ্ত প্রতিভা। অথচ এদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে আনন্দ নিয়ে বাঁচার। কেরমানি তার রচনায় তুলে ধরেন অবহেলিত শিশুর কথা। কারখানায় কর্মরত অসহায় শিশুর কথা। যে বয়সে তাদের যাওয়ার কথা শিক্ষাঙ্গনে, সে বয়সে তাদের দিন কাটে কার্পেটের দোকানের কর্মচারি হিসেবে। এমনই অনেক শিশুর জীবনকথা ফুটে ওঠে কেরমানির কথাসাহিত্যে।

৫. ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা

শিশুরা কাদা মাটির মতো। শৈশবে যে বীজ তাদের ভেতর বপন করা হয় পরিণত বয়সে সে ফলই তারা দেয়। বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তাদের ভেতর জগৎও আলোকিত করার প্রয়াস দেখা যায় কেরমানির গল্পে। বাজার গল্পে বাবা তার সন্তানকে দোকানে নিয়ে আসে ব্যবসা শেখাতে। বাবার অনুপস্থিতিতে ছেলেটি বেশি দামে ফ্রেতার কাছে কাপড় বিক্রি করে। বাবা দোকানে ফিরে এসে ছেলেকে তার এ কাজের জন্য কঠোরভাবে শাসন করে। এমনকি বলে যে, তোমাকে দোকানে এনেছি ব্যবসা শেখাতে; চুরিবিদ্যা শেখাতে নয়। এক পর্যায়ে বাবা ছেলের উদ্দেশ্যে বলছে:

" غلط کردی گران فروختی. تو را آورده ام کاسبی یاد بگیری، نه اینکه دزدی کنی، همین حالا می روی و آن زن و شوهر را پیدا می کنی و می آوری. تا نیاوردی توی دکان نیا. خانه هم نرو! فهمیدی؟"^৭

‘বেশি দামে বিক্রি করে ভুল করেছো। তোমাকে এনেছি ব্যবসা শেখাতে; চুরিবিদ্যা শেখাতে নয়। এখনই যাবে সেই স্বামী-স্ত্রীকে খুঁজের বের করে নিয়ে আসবে। যদি তাদের ফিরিয়ে আনতে না পারো তাহলে দোকানে আসবে না। বাসায়ও যাবে না! বুঝতে পারলে?’

৬. মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

বাজার গল্পে দৃষ্টিগোচর হয় একজন ব্যবসায়ীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সততা ও মূল্যবোধের ভাবনা প্রকাশ পায়। গ্রাম থেকে আসা স্বামী-স্ত্রী বাজারে আসেন। কেনাবেচার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী ও সেই পরিবারের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্যবসায়ী তখন গ্রামের লোকটির প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়ায়। সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। গ্রামে যেসব খাঁটি শস্য উৎপাদন হয় সেগুলো যেন বাজারে নিয়ে এসে তার কাছে দেন, তিনিই এগুলো বিক্রি করে দিয়ে তার সহযোগিতা করবেন। এই সহানুভূতিপূর্ণ গল্পের ভেতর দিয়ে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ জন্মিত হয়। ব্যবসায়ী বলেন,

قدمتان سر چشم. هروقت کشک، ماست محلی، روغن حیوانی، بادام و گردو، خلاصه هرچه داشتید، می خرم. من نخرم کسانی دارم که ازتان خوب می خرند. مبارک باشد.^৮

‘আপনার শুভ হোক। যখনই স্থানীয় দই, পশুর তেল, বাদাম, আখরোট অর্থাৎ যা কিছুই থাকবে আপনাদের কাছে কিনে নিব। আমি না কিনলেও কেউ না কেউ আছেন যিনি আপনার কাছ থেকে ঠিকই কিনে নিবেন। বরকতময় হোক।’

৭. আত্মীয়তার বন্ধন

মানুষের জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। তবে কখনও কখনও মানুষ এ সম্পর্ককে গুরুত্বহীন করে তোলে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সাহিত্যের ভেতরেও আত্মীয়তার বন্ধন সমৃদ্ধ রাখার প্রেরণা দৃষ্টিগোচর হয়। ছোট-বড় সবাই একে অপরের কল্যাণে এগিয়ে আসে। বড়দের দ্বারা ছোটরা যেমন সমৃদ্ধ হয়; ঠিক তেমনি ছোটদের সৌহার্দপূর্ণ আচরণে বড়দের মন ভরে যায়। আনন্দিত হয়। মনের কোণ থেকে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনা অনুরণিত হয়। লেখকের গল্পেও দাদা তার নাতীর আনন্দিক ব্যবহারে খুবই মুগ্ধ হন। আবেগে অভিভূত হয়ে বলেন,

«آفرین به این همه همت. امروزه کمتر نوه ای این قدر به فکر پدر بزرگش است. شما بچه ها باید از زندگی بزرگترها درس بگیرید.»^৯

‘সাবাস! তোমাদের এই সাহসের জন্য। আজকাল খুবই কম নাতী-নাতনী দাদার খবর নিয়ে থাকে। তোমরা বাচ্চারা অবশ্যই বড়দের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।’

৮. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

সমাজের চাকা গতিশীল হয়ে ওঠে সবার অবদানের মাধ্যমে। কাউকে পেশাকের কারণে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণে সামান্য একটি ইটের ভূমিকাও কম নয়। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত

রড সিমেন্টের ভূমিকাও অনেক বেশি। একইভাবে সমাজের মানুষের প্রতি প্রত্যেকের রয়েছে যথাযথ দায়। কেরমানির গল্পে নানা পেশার মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এমনকি সমান্য পরিচ্ছন্নতা কর্মীর প্রতি একজন ব্যস্ত ডাক্তারের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পে। ডাক্তার দেখতে পান, একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী এমনভাবে কাজ করছিল যে, তার হাটুর ক্ষতি হতে পারে। তাই ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তাকে শারীরিক কসরতের বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গাড়িতে ফিরে আসেন। গল্পে বলা হয়েছে-

دکتر پیش رفته بود و داشت با رفتگر حرف می زد. بچه ها صداهای نمی شنیدند. ولی می دیدنش. دکتر به زانوهایش اشاره می کرد و به کمرش. انگار داشت می گفت چه جوری از پاهایش برای این جور کارها استفاده کند نه از کمرش که عیب می کند.^{۵۰}

‘ডাক্তার সামনে চলে গিয়ে একজন বাডুদারের সাথে কথা বলছিলেন। বাচ্চারা তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না। শুধুই দেখতে পাচ্ছিল। ডাক্তার তার হাটুর দিকে ইশারা করছিলেন এবং কোমরের দিকেও। বলছিলেন, কীভাবে এ জাতীয় কাজে পায়ের ব্যবহার করা উচিত যেন কোমরে কোন আঘাত না লাগে।’

৯. আনন্দঘন পরিবেশ

শিশুরা খুশির জোয়ারে ভেসে বেড়ায়। সামান্য প্রাপ্তিতেই তাদের অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে। হারিয়ে যায় তাদের নিজেদের ভুবনে। অন্য কিছুর প্রতি থাকে না কোনো খেয়াল। গোশভারে বা কানের দুল গল্পে হোস্টেলের বাচ্চারা আনন্দে মেতে ওঠে। কারো জন্মদিনের উৎসবকে ঘিরে চলে নানা আয়োজন। বেলুন উড়ানো, কেক কাটা আর উপহার দেয়া নিয়ে চলে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম। হোস্টেলে বাচ্চাদের এই আনন্দময় পরিবেশ তুলে ধরেন গল্পের লেখক। বন্ধুর জন্মদিনে উপহার দেয়া নিয়ে তাদের অনুভূতির চিত্র প্রকাশিত হয়েছে এই গল্পে। এমনই খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে গল্পজুড়ে,

"امشب تولد مژده است. بچه ها دارند بالای تختش بادکنک می زنند. می خواهیم امشب حسابی حال کنیم و شاد باشیم. بدون تو نمی شد. تو شلوغی، مجلس را گرم می کنی. بقیه مثل ماست می نشینند."^{۵۱}

‘আজ মুজ্জদের জন্মদিন বাচ্চারা তাদের খাটের উপর বেলুন উড়াচ্ছে। আজকে ইচ্ছেমতো আনন্দ করব, উপভোগ করব। তোমাকে ছাড়া তা হবে না। তুমি খুবই মজা কর। আনন্দ ছড়িয়ে দাও। বাকিরা আমাদের মতো বসে থাকে।’

১০. অসহায় শিশুর প্রতি মমত্ববোধ

ধনী-গরীবের বৈষম্য চলমান আবহমান কাল থেকেই। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। একদিকে ধনীদের বিত্ত-বৈভব ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবন। অন্যদিকে হত দরিদ্রদের ছিন্নবস্ত্র-অনাহারক্লিষ্ট জীবন। একদিকে ধনীদের প্রাসাদ অটালিকা; অন্যদিকে গরীবের কুড়ে ঘর অথবা পথে প্রান্তরে ঠিকানাবিহীন জীবন। দেখা মেলে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনাহারী মানুষদের এক মুঠো অন্নের সন্ধানে আমৃত্যু সংগ্রাম। মুরাদি কেরমানির গল্পে সমাজের এতিম, অনুহীন, বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্তের প্রতি দৃষ্টি অব্যাহত করার প্রেরণা জাহত হয়। লাবখান্দে আনার গল্পে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনো শিক্ষককে কাবাব খেয়ে ক্লাসে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেননি। কেননা সবশিশুর কাবাব কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ্য নাও থাকতে পারে। যেমন গল্পে বলা হয়েছে,

یادم می آید، یک روز چندتا از معلمها باهم رفتند سر خیابان و نا هار کباب با پیاز و ریجان خوردند. وقتی آمدند آقای دباغ نگذاشتند بیايند سر کلاس. ما ديکته داشتيم گفتيم آقا چرا نمی آييد ديکته بگويد گفت آقای دباغ گفته شما بوی کباب می دهيد، و ممکن است دانش آموزی هوس کباب کند و حواسش پرت شود و ديکته را غلط بنويسد. همه که دستشان نمی رسد کباب بخورند.^{۵۲}

‘আমার স্মরণে আছে, একদিন কয়েকজন শিক্ষক সড়কের কোণায় গিয়ে দুপুরের খাবারে পিয়াজ ও সুগন্ধিযুক্ত পাতা দিয়ে কাবাব খেয়েছেন। যখন তারা ফিরে এলেন তখন জনাব দাবাগ তাদের ক্লাসে যাবার অনুমতি

দিলেন না। আর আমাদের শ্রুতলিপির ক্লাস ছিল। বললাম- স্যার, ক্লাসে আসছেন না কেন। শ্রুতলিপি লিখতে বলুন। উত্তরে তিনি জানালেন, জনাব দাব্বাগ বলেছেন, তোমার মুখ থেকে কাবাবের ঘ্রাণ আসছে। কোনো শিক্ষার্থীর কাবার খাওয়ার ইচ্ছে হতে পারে এবং তার মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। আর ডিকটেশন বা শ্রুতলিপি লিখতে ভুল করতে পারে। সবার তো সামর্থ্য নেই যে, কাবাব কিনে খাবে।’

১১. সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা

মায়েরা জীবনের বিনিময়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়েন। এতে দেশ কাল জাতিতে কোনো ফারাক নেই। পৃথিবীর সব মায়েরাই সন্তানের প্রতি এই ভালোবাসায় বিভোর থাকেন। যদিও মায়ের কঠোর আচরণে অনেক সময় সন্তান ভুল বুঝে। আবার তারাও বাবা-মায়ের জায়গায় পৌঁছলে সবই অনুভব করতে পারেন সঠিকভাবে। হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানির *মাদার* গল্পে মেয়ের প্রতি এক অসহায় মায়ের ভালোবাসার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মেয়ে অভিমানে আর কোনো দিন চিঠি লিখবে না বলে মাকে জানিয়ে দেয়। তথাপি মায়ের অবুঝ মন তা মানতে নারাজ। সব অভিযোগ অনুযোগ মেনে নিয়ে মেয়েকে আবারও অন্তত একবার চিঠি লেখার অনুরোধ জানায়। তবে মেয়ে যখন মা হবে তখনই যেন তাকে চিঠি লিখে এর আগে নয়। কারণ মায়ের প্রকৃত মর্ম যখন সে মা হবে তখনই উপলব্ধি করতে পারবে। মেয়ে হয়ে তা কিছুতেই অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। *মাদার* বা মা গল্পে মেয়ের প্রতি মায়ের ভালোবাসার কাতর অনুভূতি,

دختر گلم، معصومه جان! * سلام به روی ماهت.

آرزو دارم یک بار دیگر نامه ات را بنویسی. البته، وقتی خودت بچه داشتی!

مادر بدت، شمسی * می بوسمت»^{১০}

‘আমার ফুল মেয়ে, মাসুমা জান! তোমার চাঁদমুখে শান্তি বর্ষিত হোক। আশা রাখি আর একবার তুমি চিঠি লিখবে। অবশ্য যখন তুমি মায়ের আসনে বসবে। তোমার মন্দ মা, শামসি আদর নিও।’

১২. শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। তাদের হাতে গড়ে ওঠে আগামী প্রজন্ম। শিক্ষকের ভূমিকার উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ। *লাবখান্দে আনার* গল্পে জনাব দাব্বাগ শিক্ষার্থীদের সবকিছুর প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন। তাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় তিনি ছিলেন আপোষহীন। অসহায় দরিদ্র শিশুদের প্রতি ছিল তার বিশেষ নজর। তিনি নিয়মের প্রতি ছিলেন বিশেষ যত্নবান। তিনি কখনও স্কুলে দেরি করে আসতেন না। আবার অন্য কোনো শিক্ষকের দেরিতে আসাটাও তিনি সহ্য করতেন না। কোনো একদিন একজন শিক্ষক মাত্র পাঁচ মিনিট দেরিতে ক্লাসে এসেছিলেন। সেই শিক্ষকের জনাব দাব্বাগের কথা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

« در مدرسه تلاش هیچ وقت، هیچ معلمی نبود که دیر به مدرسه بیاید. یک روز من پنج دقیقه دیر آمدم. آقای دباغ جلوم را گرفت و گفت: «شما سه ساعت و بیست و پنج دقیقه تأخیر داشتید» گفتم « آقا من همه اش پنج دقیقه تأخیر کردم». گفت: شما معلم ریاضی هستید چهل و یک دانش آموز دارید و به هر کدام پنج دقیقه بدهکارید، روی هم می شود سه ساعت و بیست و پنج دقیقه». نظم، نظم، نظم دباغ نظیر نداشت.^{১১}

‘তালাশ স্কুলে কোনো শিক্ষক কোনো দিন দেরিতে ক্লাসে আসতেন না। একদিন আমি পাঁচ মিনিট দেরিতে এলাম। জনাব দাব্বাগ আমার সামনে এসে বললেন, “আপনি তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট দেরিতে এসেছেন। বললাম, আমি সর্বমোট পাঁচ মিনিট দেরিতে এলাম। বললেন, আপনি গণিতের শিক্ষক। একচল্লিশ জন শিক্ষার্থী আছে। প্রত্যেকের পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট করেছেন। ফল হচ্ছে তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলা, জনাব দাব্বাগের শৃঙ্খলা তুলনাবিহীন।

১৩. শিশুর স্বপ্নের ভুবন

শিশুদের জীবনের নানা দিক ধরা পড়েছে গল্পের মধ্যে। শিশুদের জীবন নিয়ে লিখেছেন অনেকেই, লিখে যাচ্ছেনও অবিরত। কিন্তু হোশাঙ্গ মুরাদির ভাবনার জগত সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলেন, ‘আমি শিশুদের জন্য

লিখি না; বরং নিজেকে শিশুই মনে করি।’ শিশুর স্বপ্ন তার নিজেরই স্বপ্ন। স্বপ্নময় জীবনে আছে শুধুই ভালোবাসার পরশ। পৃথিবীর সব কিছু একই মানব থেকে আবির্ভূত। পার্থক্য সৃষ্টির অবকাশ কোথায়। সারা পৃথিবীর সব শিশু কণ্ঠ উজাড় করে আনন্দের গান গাইতে পারলেই পৃথিবী হবে সুখময় নিবাস। বয়ে যাবে আনন্দের বান। সবাই মিলেই গড়ে তোলা যায় একটি শান্তির নীড়। সুখের ঠিকানা। হেন্দ দার কেরমান ম্যাসেজে দেখা যায়,

دلَم می خواهد ما بچه های ایران با بچه های هند، اصلاً با بچه های آسیا، نه چرا بچه ها را از هم جدا کنیم، اصلاً همه بچه های دنیا، دست همدیگر را بگیریم، توی دنیایی هرچند خیالی و رنگارنگ بچرخیم و بچرخیم و واژه های مشترک با را باهم فریاد بزنیم: « دنیا، زندگی، دوست، محبت».^{১৫}

‘আমার ইচ্ছে হয় আমরা ইরানের শিশুরা ভারতের শিশুদের সাথে, এশিয়ার শিশুদের সাথে, না কেনো শিশুদের একজন অন্যজন থেকে আলাদা করব। অবশ্যই আমরা পৃথিবীর সব শিশু পরস্পরের হাতে হাত রাখব। পৃথিবীজুড়ে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াব। একসাথে সমন্বরে উচ্চরব করব: পৃথিবী, জীবন, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা।’

১৪. উপসংহার

হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানির লাবখান্দে আনার গল্পগ্রন্থে মূল্যবোধের চেতনার নানা দিক বিধৃত হয়েছে। প্রতিটি গল্পের অন্তরালে রয়েছে নৈতিকতার ছোঁয়া। কাহিনির অবয়বে সত্য ও সুন্দর জীবনের প্রতি ধাবিত হয় শিশু-কিশোরদের মনন। জীবনের শত প্রতিকূলতায়ও টিকে থাকার প্রেরণা পাওয়া যায় তার গল্পে। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, পারিবারিক বন্ধন ও পারস্পরিক সহানুভূতির মানসিকতা প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। পিতা-মাতা, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আনন্দময় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের অবতারণা ঘটেছে প্রাণবন্তরূপে। গল্পগুলোর চরিত্র নির্মাণে লেখকের দক্ষতার পরিচয় মিলে। গল্পের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের জীবনকে করে তোলেন স্বপ্নময়। সফল ভবিষ্যৎ নির্মাণের নানা দিগন্তের উন্মোচন ঘটে গল্পের বাঁকে বাঁকে। মূল্যবোধের চেতনায় এগিয়ে চলে গল্পের চরিত্রগুলো। মানবিকতায় ভরে ওঠে গল্পের পুট। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত হলেও সমাজের সবশ্রেণির মানুষের রয়েছে এগুলোর প্রতি প্রবল আকর্ষণ। সর্বোপরি মূল্যমানের ভাবনাগুলো প্রকাশ্য হয়ে ওঠে গল্পগ্রন্থটিতে। যে ভাবনার ডুবে আলোময় হয়ে উঠবে আগামী প্রজন্ম। গড়ে উঠবে একটি সুখী সুন্দর সমাজ। দেশ কাল জাতি ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ধাবিত হবে সত্য ও সুন্দরের পথে। অনাবিল শান্তির প্রত্যশায়।

তথ্যনির্দেশ

^১ তালেব ফেইযি, বাররাসিয়ে অমুযেহায়ে আখলাকি-তারবিয়াতি দার পাঞ্জ আসারে হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানি, পায়ান নামেয়ে কারসেনাসিয়ে আরসাদ (তেহরান: দানেশগাহে পায়ামে নুর, ২০১৭), পৃ. ১০।

^২ হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানি, কেসসেহায়ে মাজিদ (তেহরান: এস্তেশারাতে মুঈন, একুশতম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.) পৃ. ৫-৮।

^৩ হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানি, নির্বাচিত গল্পগুলো মাজিদের, শাকির সবুর (অনু.) (ঢাকা: নবান্ন প্রকাশনী, ২০২৩), পৃ. ১৪।

^৪ তদেব, পৃ. ১৩-১৪।

^৫ আহমাদ মাযহার, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য : মনন ও মনীষা (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৯), পৃ. ৭।

^৬ হুমায়ূন আহমেদ, ছোটদের যত লেখা (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৯), পৃ. ৭।

^৭ হোশাঙ্গ মুরাদি কেরমানি, লাবখান্দে আনার (তেহরান: এস্তেশারাতে মুঈন, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৯০।

^৮ তদেব, পৃ. ৯৪।

^৯ তদেব, পৃ. ১৩৬।

^{১০} তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪।

^{১১} তদেব, পৃ. ৫৬-৫৭।

^{১২} তদেব, পৃ. ২১-২২।

^{১৩} তদেব, পৃ. ১৬২।

^{১৪} তদেব, পৃ. ১৯।

^{১৫} তদেব, পৃ. ১৮২।

চিরায়ত ফারসি কাব্যে ইসলামি ভাবধারা [Islamic Thoughts in Classical Persian Poetry]

ড. তাহমিনা বেগম*

[Abstract: Classical Persian poetry explores the humanity, eternal love, tradition and culture etc. Islamic themes are reflected in classical Persian poetry along with astheism as well. The spiritualism and moral values are also depicted in the poetry. Islamic thoughts, especially the impact of Al-Quran and Al-Hadith, the fear of Allah and the accountability in the Hereafter, human rights and morality are also seen in classical Persian poetry. The classical poets have tried to depict the Islamic ideology in their poetry along with spiritualism. Eternal love with Allah, the creator and Islamic tradition have been composed in the poetry. The world literature is also influenced by classical Persian poetry. Nowadays, the poetry has been translated into other famous languages of the world. The article attempts to discuss the Islamic themes that are enlightened in classical Persian poetry.]

Keywords: Islamic Thoughts, Classical Persian Poetry.

১. ভূমিকা

চিরায়ত ফারসি কাব্যে রয়েছে ইসলামি মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনার সমাহার। চিরায়ত প্রেমের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে কবিতার পরতে পরতে। কবিরা মানুষের জীবনের কথা ছন্দের সৌন্দর্যে প্রকাশ করেন। মহান স্রষ্টার সুর ভেসে বেড়ায় কবিতার ভুবনজুড়ে। ইসলামের শাস্ত্র ধারার মর্মবাণীর সন্ধান মেলে কবিতার ছন্দে। ইসলামি মূল্যবোধ ও নান্দনিক ছোঁয়ায় কবিতা হয়ে ওঠে জীবন্ত। দেশ কাল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কবিতা কাল হতে মহাকালের পথে ধাবিত হয়। মানুষ খুঁজে পায় মনের কথা। আল-কুরআনের মর্মবাণী, মহান স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা, সৃষ্টিজগতের রহস্য, মূল্যবোধের নানা দিক ও শৈল্পিক সুসময় কবিতা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। আলোকিত হয় মানুষের অন্তর। সত্য-সুন্দরের ঐশ্বর্যে কবিতা মানুষের জীবনকে উন্নত ও মহিমান্বিত করে তোলে। মহাজাগতিক ভাবনায় মনপ্রাণ নেচে ওঠে।

২. চিরায়ত ফারসি কাব্যে ইসলামি ভাবধারা

কবিরা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও পরিশীলিত করার প্রয়াস পান যুগ যুগে। কুরআনি চেতনা, হাদিসের মর্মবাণী, আধ্যাত্মিক প্রেমের স্বরূপ ও নৈতিক মূল্যমানের চেতনা প্রকাশ পায়। কবিরা ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাদের কাব্যে অনুরণিত হয় মানুষের জীবনের কথা। মানুষের কল্যাণ সাধন ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার অপরূপ সৌন্দর্য তাদের কবিতার উপজীব্য। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, ন্যায়পরায়ণতা, ঐশীপ্রেম ও পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি জেগে ওঠে। ইসলামি নৈতিকতার নানা দিকও এতে প্রাণবন্তভাবে চিত্রিত হয়। ইসলামি মূল্যবোধের চেতনায় সমৃদ্ধ কবিতা মানুষের জীবনকে আলোড়িত করে। সত্যের সৌরভে ভরে দেয়। ঐশীপ্রেমের বন্ধনে গেঁথে ফেলে। ইসলামি ভাবধারা প্রকাশের মাধ্যমে কবিরাও হয়ে উঠেন অমর। কাব্যেতিহাসের গৌরবময় স্মৃতিগাঁথায় প্রযুক্ত হয় তাদের নাম। কবিতাও হয়ে ওঠে কালজয়ী। মানুষের অন্তর মোহিত হয় তাদের কবিতার পরশে। ধাবিত হয় সত্য-সুন্দরের প্রেমময় পথে।

৩. আল-কুরআনের জ্যোতি

আল-কুরআনের মর্মবাণীর সুর বাৎকৃত হয় ফারসি কবিতায়। ইসলামি ঐতিহ্যে অবগাহনের মাধ্যমে সূচিত হয় ফারসি কবিতার নতুন দিগন্ত। আরবীর প্রভাবেই ফারসি ভাষা ও সাহিত্য গৌরবময় গতিপথ লাভ করে। বিশ্বসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় ফারসি। ধাবিত হয় কাল থেকে মহাকালের পথে। আজও ফারসি কবিতা মানুষের মনোজগতে আলো বিকিরণ করছে ব্যাপকভাবে। এগুলোর মূলে রয়েছে আল-

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

কুরআনের প্রেমময় অনুভূতির প্রকাশ। ফরিদ উদ্দিন আত্তার^১ তার মানতেকুত তেইর গ্রন্থের নামকরণও করেছেন আল-কুরআনের সূরাহ আন-নামলের ১৬ নম্বর আয়াতের অনুসরণে। আত্তারের ভাষায়,

ای به سرحد سبا سیر تو خوش * با سلیمان منطق الطیر تو خوش^২

‘ওহে! সাবা পর্বতে তোমার পরিভ্রমণ আনন্দময় হোক সোলায়মান আ. এর সাথে পাখিদের কথাবার্তা শুভ হোক।’
﴿كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله﴾^৩
‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।’
আল-কুরআনের মৌলিকতার প্রভাব দেখা যায় আত্তারের কবিতায়,

بهترین جمله ای وز حرمتت * بهترین امتان شد امتت^৪

‘আপনার সম্মানে অনুরণিত হয়েছে সর্বোত্তম বাণী আপনার উম্মত হয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।’
কবি হাফিজ শিরাজি^৫ও কাব্য রচনা করেন আল-কুরআনের দ্যুতিময় আভায়। তার অন্তরে গেঁথে ছিল আল-কুরআনের বাণী। কবি হাফিজ নিজেই ছিলেন কুরআনের হাফেজ। তার কবিতায়ও পরিদৃষ্ট হয় আল-কুরআনের জ্যোতি। কবির ভাষায়,

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ * بقرآنی که اندر سینه داری^৬

‘তোমার কবিতার চেয়ে মধুর কিছু দেখিনি হে হাফিজ! কুরআনের জ্যোতি যা তোমার অন্তরে সুস্থিত।’
হাফিজ অন্যত্র বলেন,

زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد * لطایف حکمی و با نکات قرآنی

عشق رسد فریاد از خود بسان حافظ * قرآن زیر بخوانی در چارده روایت^৭

‘পৃথিবীর কোনো হাফেজ আমার মতো গ্রন্থিত করেনি আল-কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বের সাথে প্রজ্ঞাময় অভিধা। তোমার এ আধ্যাত্মিক প্রেম ফরিয়াদ করে হে হাফিজ আল-কুরআন অধ্যয়ন কর তুমি চৌদ্দটি রেওয়ায়েতে।’

8. মহানবি সা. এর আদর্শ

ইরানের প্রায় সব কবিই মহান আল্লাহর প্রশংসার পর পরই মহানবি সা. -এর শানে কবিতা রচনা করেন। তারা মুহাম্মদ সা. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিয়ে নিজেদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটান। তাঁর আদর্শই মানবজাতিকে মুক্তির পথে ধাবিত করতে পারে। এসব বিষয়ের অবতারণায় কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণময়। শেখ সাদীর ‘কবিতায় অনুরণিত হয় মহানবি সা. এর শানে প্রেমময় অনুভব। কবির কণ্ঠে ঝংকৃত হয়-

بلغ العلی بکماله * کشف الدجی بجماله

حسنّت جمیع خصاله * صلوا علیه و آله^৮

‘চারিত্রিক সুষমায় সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন তিনি তাঁর সৌন্দর্যের আলোয় পৃথিবী দ্যুতিময় হয়। সর্বোত্তমভাবে প্রশংসার দাবিদার তাঁর গুণাবলি দরুদ পড় তাঁর প্রতি আর পরিবারের রহমত কামনা কর।’
কবি ফেরদৌসিও মহানবির আদর্শে উজ্জীবিত হতে অনুপ্রাণিত করেন,

به گفتار پیغمبرت راه جوی * دل از تیرگی ها بدین آب شوی^৯

‘রাসূলের বাণীতেই অব্বেষণ কর সঠিক পথ তাঁরই আদর্শেই বিধৌত কর হৃদয়ের অজ্ঞতা।’
মানবতার বন্ধু মহানবি সা. মানুষের প্রতি ছিলেন উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর এ স্বাতন্ত্র্য শুধু মানুষের জন্যই অব্যাহত ছিল না বরং সকল সৃষ্টির প্রতি ছিল তার বিশেষ ভালোবাসা। মহান আল্লাহ যেমন সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব তেমনি তিনিও বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। তিনি বিশ্ববাসীর প্রতি মানুষকে উদার ও হৃদয়বান হওয়ার আহ্বান জানান, ﴿ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء﴾^{১০}
‘লিস منا, (স.) আরও এরশাদ করেন, ‘যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে

আমাদের দলভুক্ত নয়।’ অন্য হাদিসে পরিদৃষ্ট হয়, ^{১৩} *من لم يرحم الناس لا يرحمه الله*, ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না।’

ফারসি কবিরাও মহানবির আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কবিতা রচনা করেন। শেখ সাদির ভাষায়,

آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت * سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد
خواهی که متع شوی از دینی و عقبی * با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد.^{১৪}

‘সে ব্যক্তি দিনার ও দিরহামে কোন কল্যাণ পায়নি খোঁজে যে অবশেষে ধন-সম্পদের মোহে ডুবে আছে জীবনভর। ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ পেতে চাইলে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ করেছেন তোমার প্রতি।’

৫. মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভালোবাসার স্বরূপ বিচিত্র রূপে প্রকাশ পায় কবিতার ছন্দে ছন্দে। ইরানি কবিদের অন্তরে লুপ্ত চিরন্তন ভালোবাসা ফুটে ওঠে কবিতার পাতায় পাতায়। প্রায় সব কবিই মহান আল্লাহর মহিমা তুলে ধরেন তাদের কবিতায়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা নিজেদের সঁপে দেন আল্লাহর কাছে। মহান স্রষ্টার প্রতি এই অনুভবের চিত্রায়ণ তাদের কবিতাকে মর্যাদায় আসীন করে তোলে। আবুল কাসেম ফেরদৌসি তার শাহনামার সূচনায় প্রাণ ও প্রজ্ঞার স্রষ্টা মহান সত্তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন এভাবে -

بنام خداوند جان و خرد * کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای * خداوند روزیده رهنمای^{১৫}

‘প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রভুর নামে শুরু করি কল্পনা অতিক্রমের ক্ষমতা রাখে না তাঁর নামের সীমা। তিনি নামের প্রভু আর তিনি স্থানেরও প্রভু তিনিই খাবার দান করেন তিনিই দেখান সঠিক পথ।’

জ্ঞানের আলোয় মানুষে জীবন দ্যুতিময়। অন্যান্য সৃষ্টির সাথে শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানের ভিত্তিতেই। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমহারে মানুষের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। সেই মহান সত্তাই মানুষকে এই সম্মানে ভূষিত করেন। জ্ঞানের সৌরভে মানুষ নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানের আলোয় মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। জ্ঞানের গুরুত্ব ফেরদৌসির কবিতায় প্রকাশ্য হয়ে ওঠে,

توانا بود هر که دانا بود * بدانش دل پیر برنا بود^{১৬}

‘শক্তিমান সেই যার রয়েছে জ্ঞানের আলো জ্ঞানের দ্যুতিতে জরাহস্ত প্রাণ ফিরে পায় প্রদীপ্ত যৌবন।’

৬. অধ্যাত্মচেতনা

ফারসি কবিতার অন্তর্গত বিষয়গুলোর মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। মহাজাগতিক ভাবনা মানুষের মনোলোকে ঐশীপ্রেম জাগিয়ে তোলে। কবির ঐশীপ্রেমের অনুভূতি কবিতার পরতে পরতে তুলে ধরেন। মহান স্রষ্টার প্রতি সমর্পণের নানা রূপ কবিতায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আল্লাহর নির্ধারিত পথেই অগ্রসর হয়ে একজন আধ্যাত্মিক সাধক তাঁকে পাবার নেশায় আরো বেশি মনোনিবেশ করেন। শরিআতের মূল বিধান উপেক্ষা করে কখনো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। মৌলিক এবাদতের পরিধি অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রকৃত সাধক এ পথে অগ্রসর হয়ে থাকেন। ফারসি কবিতায় এসব ভাবনা জীবন্ত রূপে ফুটে ওঠে। আন্তারের ভাষায়,

راه اول در شریعت رفتن است * در عبادت بی طبیعت رفتن است
پس دوم راهت طریقت آمدست * ور سیم خواهی حقیقت آمدست
در حقیقت گر قدم خواهی زدن * محو گردی تا که دم خواهی زدن^{১৭}

‘প্রথম ধাপ হল শরিআতের পথ অনুসরণ এবাদত-বন্দেগিতে নিবিড়ভাবে ডুবে যাওয়া। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো তরিকত তৃতীয় ধাপ হল হাকিকতের সৌরভ। হাকিকতের পথে যদি এগিয়ে চল তুমি তাহলেই অধ্যাত্মপ্রেমে মিশে হবে একাকার।’

হাফিজের কাব্য আধ্যাত্মিক দর্শনে ভরপুর। গজলের ছন্দে ছন্দের তালে তালে বেজে ওঠে প্রেমময় অনুভূতির ঝংকার। আধ্যাত্মিক প্রেমের বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশ পায় তার কবিতায়। মানুষ তাদের মনের কথা খুঁজে পায়

হাফিজের গজলে। উপমা ও শৈল্পিক মাধুর্যে কবিতা হয়ে ওঠে আরও প্রেমময়। সৌরভ ছড়িয়ে যায় বিশ্বব্যাপী। তার জীবদ্দশায় পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ তার কবিতায় মুখরিত হতেন। মহাজাগতিক ভাবনাগুলো মানুষের মনের ভেতর চিরন্তন প্রেমের শিখা জ্বালিয়ে দেয়। কবির ভাষায়,

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفتست * آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش^{১৮}

‘হাফিজের কবিতার সব পংক্তি মারেফাতের পরিচয় বয়ে বেড়ায় হৃদয়গ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাধারার প্রকাশ্য রূপ এ কবিতা।’

৭. মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। তাদের পক্ষে সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন সম্ভবপর নয়। সামান্য জ্ঞান দিয়ে অসীমের পথে পাড়ি দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। যেখানে মানুষ নিজেদেরই পরিচয় জানতে অপারগ সেখানে অসীম সৃষ্টিজগতের রহস্য উদ্ঘাটন কিভাবে সম্ভব হতে পারে। কবির যুগে যুগেই মানুষের এই অপারগতা অক্ষমতার কথা বর্ণনা করেন। এমনিভাবে কবি সানায়ির^{১৯} কবিতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায়,

ای شده از شناخت خود عاجز * کی شناسی خدا را هرگز

چون تو در علم خود زبون باشی * عارف کردگار چون باشی^{২০}

‘ওহে তুমি তো নিজেদেরই জানতে অপারগ কিভাবে তুমি আল্লাহর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবে। যখন নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করবে তখন স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে চেনার যোগ্য হয়ে উঠবে।’

৮. জাগতিক মোহ পরিহার

জাগতিক মোহ মানুষকে আরও বেশি প্রাপ্তির নেশায় বিভোর করে রাখে। বৈষয়িক চাওয়া পাওয়ার কোনো অন্ত নেই। একটি শেষ হলে অপরটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যার কোনো সীমা পরিসীমা নির্ধারণ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ লোভের জিহ্বা ক্রমাগতই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। জিহ্বার লাগাম শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই জাগতিক মোহ হতে বেরিয়ে আসা সম্ভব। অপার্থিব আনন্দ লাভের জন্য ক্ষণিকের চাওয়া পাওয়াকে সংকুচিত করার কোনো বিকল্প নেই। জালাল উদ্দিন রুমি নানা উপমার মাধ্যমে বাহ্যিক চাকচিক্যের বিপ্রতীপে এক অনাবিল প্রশান্তির চিত্র এঁকেছেন। উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমবায় জাগতিক বস্তুনিচয়ের অসারতা তুলে ধরেন। বিভিন্ন কাহিনি অবতারণায় তা হয়ে ওঠে আরও দ্যোতনাময়। এ জাতীয় আকাজক্ষা পরিহারে রুমির বলেন,

بند بگسل باش آزاد ای پسر * چند باشی بند سیم و بند زر

کوزه ی چشم حریصان پر نشد * تا صدف قانع نشد پر در نشد^{২১}

‘ধন-সম্পদের মোহ ছেড়ে মুক্ত হয়ে যাও হে বৎস আর কতকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে। লোভী ব্যক্তির চোখের পেয়ালা পূর্ণ হয় না কখনও অল্পে তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঝিনুক মুক্তায় পূর্ণ হয় না।’

৯. ইসলামি ঐতিহ্যের প্রকাশ

কবির অল্পকথায় মূল ভাব প্রকাশে দক্ষ শিল্পী। তাদের রচনায় ইঙ্গিতমূলক কথাও ব্যাপক বিশ্লেষণ দাবি রাখে। ফারসি কবিতা ইসলামি ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করে। বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে ঘিরে আবর্তিত হয় কবিতার নানা দিক। ইসলামি ভাবধারা চিত্রায়ণে ঐতিহ্যের স্বরূপ প্রকাশ্য হয়ে ওঠে কবিতার পরতে পরতে। যাতে স্বল্প পরিসরে মৌলিক শিক্ষণীয় দিক প্রস্ফুটিত হয়। ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ করে রচিত কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। কাহিনি বা গল্পাকারে তা আরও শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বীয় ঐতিহ্য ভুলে কোনো জাতি আগামীর পথে এগিয়ে চলতে পারে না। ফারসি কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্যের নানা দিক পরিদৃষ্ট হয় কবিতার ছন্দে ছন্দে। হাফিজের কবিতায় অনুরণিত হয়,

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح * هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

برو از خانه گردون به در و نان مطلب * کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

هر که را خوابگاه آخر مشتی خاک است * گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد * وقت آن است که بدرود کنی زندان را^{২২}

‘খোদাপ্রেমিকদের বন্ধু হও কেননা নুহের কিশতিতে এমন মাটি (নুহ) আছে যা তুফানের একবিন্দু পানিও স্পর্শ করবে না। আকাশের ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, সাহায্য প্রত্যাশা করো না কেননা এ কৃপণ অবশেষে

অতিথিকেই হত্যা করে। যার জীবনের শেষনিদ্রা এক মুষ্টি মাটির ওপর সীমিত বল কীইবা প্রয়োজন জীবনের তরে গগণচুম্বী আকাশের? কেনআনের চাঁদ (ইউসুফ) মিশরের রাজসিংহাসন তোমারই হলো ঐ তো সুসময় যখন কয়েদখানাকে বিদায় জানিয়ে দিলে।’

১০. সত্য ও ন্যায়ের উচ্ছ্বাস

সত্য সুন্দরের ছবি অঙ্কিত হয় কবিতায়। জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনায় কবিতা প্রাণবন্ত হয়ে যায়। সত্যের জ্যোতিতে কবিতার আত্মা শক্তিমান হয়। কবিতার শরীরেও দেখা যায় সত্যের দ্যুতি। ন্যায়ের বাণী উচ্চকিত হয় কবিতায় যুগে যুগে। অসত্যের বিপ্রতীপে কবিতা মানুষের ভাবনাকে শাণিত করেন। সুন্দরের আলো ছড়িয়ে দেন। অসত্যের বিপ্রতীপে কবিতা হয়ে ওঠে মজবুত হাতিয়ার। সাহিত্যও মানুষের সত্য ভাবনা লালনে নিয়ামক। কবিতায় চিত্রিত অনুভূতিগুলো নতুন মাত্রায় অনুবর্তিত হয়। ন্যায় ও সত্যের আলোয় অন্তর আলোকিত হয়। আর ফারসি কবিতার মূলসুরে রয়েছে জীবনের মৌলিক দর্শন। দুঃখময় অনুভূতিও কাব্যকলায় চিত্রিত হয় নিপুণভাবে। বিরহ-বেদনার অবতারণায়ও উচ্ছল-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় কবিতায়। সংস্কারমূলক কবিতায়ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে আশাবাদী জীবনের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। যা কবিতার পরতে পরতে পরিদৃষ্ট হয়। জীবনদর্শন অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিক চিত্রগুলোও দ্যোতনাময় হয়ে ওঠে। প্রতিকূলতার বিপ্রতীপে সংগ্রামী জীবনের অঙ্গিকার হাফিজের কবিতা। কবির ভাষায়,

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج * بلی به حکم بلا بسته اند روز الست^{২৭}

حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد * همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم^{২৮}

‘কাঁটাহীন পুষ্পলাভ হয় না কোনোকালে সৃষ্টিলগ্নে হ্যাঁ শব্দটি সব বিপদের মূলে। আশার বাণী মিশে একাকার কবিতার ছন্দে হাফিজের কবিতায় সুন্দরের ঝংকারে হৃদয় দোলে।’

১১. পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব

জাগতিক বিষয়াবলি মানুষকে প্রকৃত সত্য বিমুখ করে রাখে। বৈষয়িক সমৃদ্ধি লাভে চলে বিরামহীন প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার কোনো অন্ত নেই। একটি পূর্ণ হলে অপরটি এসে হাজির হয়। যার যত সম্পদের পাহাড় তার পাওয়ার মানসিকতাও যেন প্রবল। অথচ এ ভুবন মানুষের মূল নিবাস নয়। চলে যেতে হবে চিরতরে সব মায়া ত্যাগ করে। ক্ষণিকের এই নিবাসে রাজত্ব অথবা দারিদ্র্য- এতে কিইবা আসে যায়। বরং অপার্থিব জীবনকে সুশোভিত করার মাঝেই নিহিত সাফল্যের মূলমন্ত্র। বিষয়টি শেখ সাদির কবিতায় নতুন মাত্রায় প্রকাশ পায়,

جهان، ای برادر، نماند به کس * دل اندر جهان آفرین بند و بس

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت * که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

چو آهنگ رفتن کند جان پاک * چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک^{২৯}

‘পৃথিবী কারো কাছে চিরদিন থাকবে না, হে ভাই হৃদয়কে আবদ্ধ কর পৃথিবীর স্রষ্টার সাথে নিবিড়ভাবে। পৃথিবীর রাজত্বের পিছনে হেলান দিয়ে থেকো না তোমার মতো অনেককেই প্রতিপালন করেছে এবং হত্যা করেছে। যখন পবিত্র দেহ চিরবিদায় নেয়ার ঝংকার তুলবে তখন সিংহাসনে অথবা মাটির উপরে মৃত্যুতে কিইবা আসে যায়।’

১২. ধৈর্য ধারণ

পৃথিবীর নানাবিধ প্রতিকূলতায় ধৈর্য এক বিশেষ গুণ। জীবনের বাঁকে বাঁকে ধৈর্য ও পরমতসহিষ্ণুতায় খুবই গুরুত্বের দাবিদার। এটি উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। ধৈর্যশীলতা জীবনকে উন্নত ও পরিশীলিত করে। সুন্দরের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। জীবনের কঠিন মুহূর্তেও অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি মিলে এ মহৎ গুণের সমবায়। কবিতার ভেতরজগতেও এ ভাবনার প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কবি হাফিজের ভাষায়,

صبر کن حافظ به سختی روز و شب * عاقبت روزی بیایی کام را^{৩০}

‘দিন-রাতের এ দুর্গম পথেও ধৈর্য ধর হে হাফিজ অবশেষে তোমার ভাগ্যে জুটবে সাফল্য।’

১৩. বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা উন্নত চরিত্রের প্রকাশ। সামাজিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অপরিহার্য অনুঅঙ্গ বিনয় ও নম্রতা। গর্ব-অহংকার মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। মর্যাদাহীন করে তোলে। অহংকারের বিষ বাষ্প পৃথিবীর আকাশ-বাতাস কলুষিত হয়। সুখ শান্তি বিদায় নেয়। আল্লাহভীতি ও পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি মানুষকে তাদের কর্তব্য সচেতন করে তোলে। বৈষয়িক লোভ-লালসা, প্রদর্শনেচ্ছা পরিহারে সচেতনতা জাগায়। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে সৃষ্টিজগতের সবই হয় আবর্তিত। একটি গাছের পাতাও তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে নড়াচড়া করতে অপারগ। তাই একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে সবারই মাথা নত করা উচিত। এতেই নিহিত রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষের অব্যাহত কল্যাণ। শেখ সাদীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,

اگر بنده ای سر برین در بنه * کلاه خداوندی از سر بنه
 بدرگاه فرمانده ذو الجلال * جو درویش پیش توانگر بنال
 جو طاعت کنی بس شاهی مپوش * جو درویش مخلص برآور خروش
 که پروردگارا توانگر تویی * توانا و درویش پرور تویی
 نه کشور خدایم ونه فرماندهم * یکی از گدایان این در گهم.^{২৭}

‘একজন বান্দা হিসেবে তুমি স্বীয় মস্তক অবনত কর মাথা থেকে অহংকারের শাহী মুকুট নামিয়ে ফেল। সর্বময় ক্ষমতাবান শাসকের দরবারে সামান্য দরবেশের মতো সাদাসিদে জীবনযাপন কর। আনুগত্যের সময় শাহী গৌরবময় পোশাক পরিত্যাগ কর প্রকৃত দরবেশে বা সাধকের ন্যায় পোশাক পরিধান কর। হে পরওয়ারদেগার! তুমিই সর্বশক্তিমান দরবেশের প্রতিপালক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তুমিই। না আমি এ রাজ্যের প্রতিপালক না শাসক তোমার এক নগণ্য ভিক্ষুক ছাড়া আর কিছু নই আমি।’

১৪. পরকালীন জবাবদিহিতা

সময় এগিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত। একে থামাবার সাধ্য নেই কারো। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চেতনা ও চাহিদায় পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তা‘আলা সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার ও প্রজ্ঞার সত্ত্বাধিকারী। মানুষ নিজ নিজ অবস্থার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর আরও অধিক দয়াবান হয়ে থাকেন। নিজ নিজ অবস্থার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে সামগ্রিক কল্যাণ। পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতিই মানুষকে সত্যের পথে ধাবিত করতে পারে। সব মন্দের বেড়াভাল ছিন্ন করার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে। এ অনুভবের উপর ভর করে জীবন পরিচালনা করলে তা হবে সার্থক ও সফল। কবি হাকিম সানায়ির কবিতায় বাঞ্ছিত হয়,

الذين اتقوا و راست نجات * زنده دانش و گرچه از اموات
 گفت بی تقوی ار گران باریم * راه تقوی مگر بدست آرم
 راه تقوی رویم و ننديشیم * که ز یاران بمنزل پیشیم^{২৮}

‘আল্লাহকে ভয় করে পেয়েছে মুক্তির সন্ধান তাদেরকে জীবিত জেনো যদিও বাহ্যিকভাবে মৃত। তাকওয়াবিহীন জীবন যেন অন্তসারশূন্য খোদাভীতির অনুভব অর্জন করা উচিত। সঠিক পথে চলব আর অন্য কিছু নয় প্রকৃত বন্ধুদের কাছ থেকে এ পথের সন্ধান নেব।’

১৫. প্রতিশ্রুতি পালন

প্রতিশ্রুতি পালন মানুষের মৌলিক গুণ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। ওয়াদা পালনের মাধ্যমে সদগুণের চর্চা হয়, অপরদিকে ওয়াদাভঙ্গ মানুষকে প্রতারণাপূর্ণ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। সততা, আমানতদারিতা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতি সদগুণ মানুষের মর্যাদাকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করে। এসব নৈতিক গুণের অনুসরণে পরকালে পুরস্কার লাভের সুযোগ লাভ হয়। কবি জালাল উদ্দিন রুমির^{২৯} ভাষায়,

وعده ها باید وفا کردن تمام * و ر نخواستی کرد باشی سرد و خام

وعده کردن با وفا باشد بجان * تا ببینی در قیامت فیض آن^{৩০}

‘প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করা উচিত অন্যথায় জীবন হবে অলস ও অপরিপক্ব। প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত অন্তরের গভীর থেকে তাহলেই পরকালে এর সুফল দেখতে পাবে।’

১৬. উপসংহার

ফারসি কবিতা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। চিরায়ত ফারসি কবিতায় মানুষের জীবনের দর্শন ধ্বনিত হয়। মানুষের জীবনের মূলসুর বাৎকৃত হয় কবিতার ছন্দে ছন্দে। মহান সত্তার সাথে মানুষের সম্পর্কে নিবিড়তা প্রকাশ পায় কবিতার পরতে পরতে। ইসলামি ভাবধারায় কবিতা হয়ে ওঠে আরও প্রাণময়। আল-কুরআনের দ্যুতি, মহানবির জীবনাদর্শ, ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের চেতনায় কবিতা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। জাগতিক মোহ পরিহার, ধৈর্য ধারণ, বিনয় ও নশ্ততা সর্বোপরি পারলৌকিক জীবনের জবাবদিহিতার মনোভাব মানুষের জীবনকে উন্নত ও মহিমায়িত করে তোলে। অন্তরলোকে এক অনাবিল ভালোবাসা সঞ্চারিত হয়। আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব পড়ে জীবনের সকল বাঁকে। সত্যের আলোয় ভরে ওঠে পৃথিবীর নানা দিগন্ত। কবিতার আবেদনও হয়ে যায় সর্বজনীন। আর কাল থেকে পেরিয়ে কবিতা হয়ে যায় মহাকালের। কবিরা তাদের অসাধারণ শিল্পকর্মের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে কোণে স্থায়ী আসন গড়ে তোলেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ^১ ফরিদ উদ্দীন আত্তার: ফরিদ উদ্দীন আত্তার (১১৪৩-১২৩০) ইরানের অন্যতম প্রধান সুফিকবি। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *দিওয়ানে আত্তার*, *মানতেকুত তেইর*, *ইলাহি নামা*, *আসরার নামা*, *মুসিবত নামা* ও *মোখতার নামা*। আর প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থ *তায়কিরাতুল আউলিয়া*। আধ্যাত্মিক কাব্যগ্রন্থ হিসেবে সর্বাধিক সমাদৃত *মানতেকুত তেইর* বা পাখিদের ভাষ্য। এতে অধ্যাত্মজগতের সাতটি উপত্যকার অবতারণা ঘটে। ঐশীপথে বিচরণ কোনো সহজ কাজ নয়। এ পথ অনেক দুর্গম ও কষ্টসাধ্য। মহান সত্তার সান্নিধ্য লাভে যারা এগিয়ে যেতে চায় তাদেরকে এসব মনজিল অতিক্রম করতে হয়। গ্রন্থটিতে প্রতিটি ধাপ পাখিদের উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়াও তার গজল ও রুবাই কবিতাও শৈল্পিকতার পরিচয় বহন করে। শিল্প ও নান্দনিক ছোঁয়ায় তার কবিতা খুবই হৃদয়গ্রাহী। [দ্র. ড. মোহাম্মদ মুঈন, *ফারহাঙ্গে ফারসি*, ৫ম খণ্ড, তেহরান: এন্তেশারাতে আমির কবির, ১৯৯৭, পৃ. ১১৮২।]
- ^২ ফরিদ উদ্দীন আত্তার নিশাবুরি, *মানতেকুত তেইর*, ড. মোহাম্মদ রেযা শাফিঈ কাদকানি (সম্পা.) (তেহরান: এন্তেশারাতে সোখান, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৫৯।
- ^৩ সুরাহ আল ইমরান: ১১০।
- ^৪ শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার নিশাবুরি, *মুসিবত নামে*, ড. নূরানি বেসাল (সম্পা.), (তেহরান: কিতাবফুরশিয়ে যাওয়ার, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩০৯।
- ^৫ হাফিজ শিরাজি: কবির পূর্ণ নাম ‘খাজা শামস উদ্দীন মোহাম্মদ হাফিজ’। হাফিজ (১৩২৬-১৩৮৯) গজল, মসনবি, কাসিদা এবং রুবাই কবিতার সমবায়ে দিওয়ান রচনা করেন। ফারসি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গজল রচয়িতা হিসেবে খ্যাত। আল-কুরআনের মর্মকথা তার কবিতার মূলসুর। তিনি নিজেই ছিলেন কুরআনের হাফিজ। অধ্যাত্মপ্রেমের মৌলিক বিষয় কবিতার ছন্দে ছন্দে পরিদৃষ্ট হয়। তার গজলের প্রতি রয়েছে মানুষের গভীর অনুরাগ। পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে তা মনের আঙিনায় নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। যে ভাবনায় মনপ্রাণ সত্য সুন্দরের প্রতি ধাবিত হয়। [দ্র. ড. যাহরা খানলারি কেয়া, *রাহনোমায়ে আদাবিয়াতে ফারসি* (তেহরান: কিতাবখানেয়ে ইবনে সিনা, ১৯৬২), পৃ. ১৩২।]
- ^৬ শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিজ, *দিওয়ানে গাজালিয়াতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি* ড. খলিল খতিব রাহবার (সম্পা.) (তেহরান: এন্তেশারাতে সুফি আলি শাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৬০৮।
- ^৭ তদেব, পৃ. ২৬।
- ^৮ শেখ সাদি: কবির পূর্ণ নাম ‘আবু মোহাম্মদ মোশাররফ উদ্দীন মোসলেহ বিন আবদুল্লাহ বিন মোশাররফ আস্ সাদি আশ শিরাজি। অধিকাংশ গবেষকে মতে তার জন্ম ১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে আর মৃত্যু ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। বিখ্যাত গ্রন্থ *গুলিস্তান* ও *বুস্তান*। কাসিদা, গজল, রুবাই, কেতআ, তারজিবান্দ, তারকিববান্দ, মাকালাত ও আরবী কবিতা সবই কুল্লিয়াতে সাদি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সমবায়ে তার কবিতা উঁচু স্তরের। শিল্প ও নান্দনিকতার পরশে তার কবিতা বাঙময়। সাধারণ মানুষ থেকে রাজা-বাদশাহ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের তরে নিবেদিত তার কবিতা। শাসকের কর্তব্যবোধ, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, বার্ষিক্যের অসহায়ত্ব, প্রেমের সৌন্দর্য সবকিছুর মিশেলে কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণময়। কাব্য ও গদ্যের

- সমবায়ের রচিত তার গুলিস্তান শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম বিষয়। [দ্র. ড. তাওফিক হা. সুবহানি, তারিখে আদাবিয়াত ২, তেহরান: এস্তেশারাতে দানেশগাহে পায়ামে নুর, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬২-৭৬৪]
- ^৯ সাদি শিরাজি, কুল্লিয়াতে সাদি, মোহাম্মদ আলি ফোরুগি (সম্পা.) (তেহরান: এস্তেশারাতে রামিন, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৯।
- ^{১০} আবুল কাশেম ফেরদৌসি, শাহনামেয়ে ফেরদৌসি, মোহাম্মদ আলি ফোরুগি (সম্পা.) (তেহরান: এস্তেশারাতে ফেরদৌস, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩।
- ^{১১} মুহাম্মদ বিন 'ঈসা আত তিরমিযী, আস্ সুনান (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়াহ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪৭২।
- ^{১২} তদেব।
- ^{১৩} তদেব।
- ^{১৪} সাদি শিরাজি, গুলিস্তান, গোলাম হোসাইন ইউসুফি (সম্পা.) (তেহরান: এস্তেশারাতে খাওয়ারিজমি, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৯।
- ^{১৫} শাহনামেয়ে ফেরদৌসি, মোহাম্মদ আলি ফোরুগি (সম্পা.), পৃ. ১।
- ^{১৬} তদেব।
- ^{১৭} শেখ ফরিদ উদ্দীন আভার নিশাবুরি, মুসিবাত নামে, ড. নূরানি বেসাল (সম্পা.), পৃ. ১৯৫।
- ^{১৮} দিওয়ানে গাজালিয়াতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি, পৃ. ৩৮১।
- ^{১৯} কবি সানায়ি: কবি হাকিম সানায়ির পূর্ণ নাম 'হাকিম আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি। হিজরি পঞ্চম শতকের প্রথমভাগে অথবা মধ্যভাগে গজনিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দিওয়ানে সানায়ি তার বিখ্যাত রচনা। এতে কাসিদা, গজল, রুবাই ও কেতআ জাতীয় কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এতে মোট ১৩,৪৪৬ টি পংক্তি রয়েছে। তাছাড়াও তিনি রচনা করেন হাদিকাতুল হাকিকাহ ওয়া শারিআতুত তারিকাহ, তারিকুত তাহকিক, সেইরুল ইবাদ ইলাল মাআদ, আকল নামা, এশক নামা, সানায়ি আবাদ, তাহরিমাতুল কালাম ও কারনামেয়ে বালখ প্রভৃৎ কাব্যগ্রন্থ। আল-কুরআন ও হাদিসের মর্মবাণী তার কবিতার বিশেষ উপজীব্য। ইসলামি ঐতিহ্য, অধ্যাত্মচেতনা ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমবায়ের তার কবিতা খুবই মনোমুগ্ধকর। সুফিকবি হিসেবে তিনিই প্রথম এতো অধিক সংখ্যক কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। [দ্র. ড. যব্বিহ উল্লাহ সাফা, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, খোলাসে ১ম খণ্ড, তেহরান: এস্তেশারাতে বাদিহে, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৫।]
- ^{২০} ড. আকসার হোকুক, গোযিদে হাদিকাতুল হাকিকাহ ওয়া শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গজনবি (তেহরান: এস্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তা. বি.), পৃ. ২৮।
- ^{২১} মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র.), মসনবীয়ে রুমী, ১ম খণ্ড, মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.) (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩৭-৩৮।
- ^{২২} দিওয়ানে গাজালিয়াতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ শিরাজি, পৃ. ১৪।
- ^{২৩} তদেব, পৃ. ৩৭।
- ^{২৪} তদেব, পৃ. ৪৮১।
- ^{২৫} সাদি শিরাজি, গুলিস্তান, গোলাম হোসাইন ইউসুফি (সম্পা.) গুলিস্তান, পৃ. ৫৯।
- ^{২৬} দিওয়ানে গাজালিয়াতে মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিজ শিরাজি, পৃ. ১২-১৩।
- ^{২৭} কুল্লিয়াতে সাদি, পৃ. ২০৯।
- ^{২৮} হাদিকাতুল হাকিকাহ ওয়া শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গজনবি, পৃ. ২৮৮।
- ^{২৯} জালাল উদ্দীন রুমি: কবির পূর্ণ নাম 'মাওলানা জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ বিন সুলতানুল উলামা বাহাউদ্দীন মোহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আহমদ খাতাবি বাকারি বালখি।' তিনি একাধারে মাওলানায়ে রুমি, মৌলাভি ও মোল্লায়ে রুম হিসেবেও সমধিক পরিচিত। তিনি ৬ রবিউল আউয়াল ৬০৪ হিজরি/ ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে বালখে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন তিনি। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাসনবি যা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। তাছাড়া দিওয়ানে শামস তাবরিযিও তার অমর কাব্যগ্রন্থ। এতে গজল, রুবাই ও তারজিবান্দ কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। তার গদ্য গ্রন্থ ফিহ মা ফিহ। শামস তাবরিজির প্রতি ছিল তার গভীর অনুরাগ। তারই অনুপ্রেরণায় রুমির অধ্যাত্মভ্রমণে সফল পদচারণা। মহান স্রষ্টার কাছ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতার যে করুণ সুর তা বাৎকৃত হয় মসনবির ছন্দে ছন্দে। মসনবি বর্তমান বিশ্বেও সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থের তালিকায় শোভিত। [দ্র. ড. যব্বিহ উল্লাহ সাফা, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, খোলাসে ২য় খণ্ড, তেহরান: এস্তেশারাতে বাদিহে, ১৯৯৫, পৃ. ৯৪]
- ^{৩০} মসনবীয়ে রুমী, ১ম খণ্ড, মাওলানা আব্দুল মজীদ (অনু.), পৃ. ৮৬।

নজরুল কাব্যে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা [Islamic Tradition and Culture in Nazrul's Poetry: A Review]

মাহফুজ উল্লাহ*

[Abstract: Kazi Nazrul Islam (1899-1976) was an eminent Bengali poet, writer, journalist and musician. He is the national poet of Bangladesh and famous as “Bidrohi Kobi” (Rebel Poet). His writings explored themes such as freedom, humanity, love and revolution. He had learned Arabic as a young boy, as well as learned Persian. His works are highly influenced by these two languages. He translated *Ampara* from the *Holy Quran* and Persian poems such as Rubaiyat of Omar Khayyam, Ghazals of Hafiz, Hafiz's Rubaiyat into Bangla poetry. He wrote the most devout Hamds and Naats in praise of Allah and His prophet Mohammad (PBUH). Islamic tradition and culture had been introduced highly in his writings. He had showed highest priority to many Islamic aspects such as Tawheed, Resalat, Salat, Fasting, Eids, and Islamic personalities in his poetry. The spiritualism and moral values are also very important issues in his creation. The article attempts to describe the Islamic Tradition & Culture in Nazrul's Poetry along the examples.]

Keywords: Islamic Tradition, Culture, Nazrul's Poetry.

১. ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন কবি, সঙ্গীত-রচয়িতা, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, গীতি-নাট্যকার, অভিনয়-শিল্পী ও সুরকার। তাঁর সৃষ্টিকর্ম ব্রিটিশ সরকারের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তাঁর রচিত ‘চল্, চল্, চল্’, গানটি বাংলাদেশের রণ-সঙ্গীত। নজরুল ইসলাম কবিতা, গান, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে তৎকালীন পরাধীন ভারতে অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্বলন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় নজরুল রচনা করেছেন এক স্বতন্ত্ররীতি, যা নজরুলরীতি হিসেবে পরিচিত। এমনকি নজরুল অনুবাদ সাহিত্যেও দক্ষতা এবং নিপুণতার সাক্ষর রেখে গেছেন। নজরুল যখন “মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতুর্য” নিয়ে আগমন করেন তখন বাংলা সাহিত্যের একচেটিয়া সম্রাট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নজরুল এলেন ভিন্ন এক অভিনব মাত্রা ও ইসলামি চেতনা-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি নিয়ে। রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে সবার দৃষ্টি ঘোরালেন এক নতুন ধারা ও সৃজনের দিকে। যার অগ্নিবীণার সুর আকৃষ্ট করল সকল সাহিত্যপ্রেমীদের। তাঁর সমগ্র রচনা মৌলিক ও ইসলামি চেতনায় সমৃদ্ধ। যদিও নজরুল সাহিত্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমানসহ সকল ধর্মের প্রবাহ রয়েছে। তথাপি নজরুল সাহিত্যের একটি বৃহত্তম অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাঁর কবিতা ও গানে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রকাশ ঘটেছে।

২. নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবন

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন।^১ এ সময় তিনি জীবিকার প্রয়োজনে ‘লেটো’র দলে যোগ দেন কিন্তু বেশিদিন তিনি এ দলে থাকেন নি। মাত্র দশ বছর বয়সে নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি গ্রামের মজবে কিছুদিন শিক্ষকতার চাকরি করেন। তারপর তিনি চলে আসেন নতুন কর্মস্থল আসানসোল শহরে রুটির দোকানে। আসানসোল থানার দারোগা রফিজউদ্দীনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং চলে আসেন দারোগার নিজ গ্রাম ময়মনসিংহের ত্রিশাল

* এম.ফিল গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

খানার দরিরামপুরে। দারোগা সাহেব তাকে ভর্তি করে দেন ত্রিশাল দরিরামপুর হাই স্কুলে। এখানে প্রায় এক বছর পড়ালেখার পর নজরুল পুনরায় চলে যান চুরুলিয়ায়। ভর্তি হন রাণীগঞ্জের শিয়ারসোল রাজ স্কুলে। এখানে তিনি তিন বছর লেখাপড়া করেন।^২ এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। নজরুল তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হতেই তিনি যুদ্ধে যোগ দিলেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে যোগ দেন ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে।^৩ তিন বছর তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকেন। তাঁর চাকুরী জীবন ছিল মূলত করাচিতে। এ সময় তাঁকে পেশোয়ার, নওশেরা, বেলুচিস্তান পর্যন্ত যেতে হয়েছে। সৈনিক জীবনে অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি প্রথমে হাবিলদার ও পরে ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হন। করাচির সৈনিক জীবনকে বলা হয় তাঁর প্রতিভার সাজঘর। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হলে তাঁর পেশাদারী সৈনিক জীবন সমাপ্ত হয়। করাচিতে চাকুরিকালে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গল্প ‘বাউগেলের আত্মকাহিনী’ কলকাতায় ‘সংগাত’ পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যা) এবং প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ কলকাতার ‘বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।^৪ এভাবে প্রতিভাধর সাহিত্যিক হিসেবে নজরুল বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন।

যুদ্ধশেষে নজরুল চলে আসেন কলকাতায় এবং পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ‘বিজলী’ ও ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘ধুমকেতু’ পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর ইংরেজ সরকার তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি পুনরায় সাহিত্য-সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। একে একে নজরুলের কাব্য-গ্রন্থাবলী ‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বহারা’, ‘প্রলয় শিখা’ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।^৫ সে সঙ্গে তিনি রচনা করতে থাকেন বিচিত্রধর্মী অজস্র গান। তিনি সঙ্গীত-ভাণ্ডারকে বিচিত্র সমাহারে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন।

নজরুল ৪১-৪২ বছর বয়সে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মে অসুস্থ কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়।^৬ ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয়।^৭ চৌত্রিশ বছর অসুস্থ থাকার পর ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের উত্তর পাশে সমাধিস্থ করা হয়।^৮

৩. নজরুল কাব্যে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

নজরুল ইসলামের কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে এক অভিনব মাত্রা। তাঁর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তিনি সকল মানুষের প্রিয় কবি। তাঁর রচনাতে ফুটে উঠেছে দেশের স্বাধীনতা ও সংগ্রামের চিত্র, জাতীয় ও ইসলামি ভাবধারা, ইতিহাস-ঐতিহ্য-আদর্শ ইত্যাদি। তাঁর সাহিত্যে ইসলামের দিকনির্দেশনার সন্ধান মেলে। তাঁর কাব্য ও গানে ইসলামি পরিভাষা খুবই তাৎপর্যময়।^৯ “জিজ্ঞাসী” কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক কবিতা ও গানের সংকলন। অগ্নিবীণা, বিষের-বাঁশী, ভাঙার গান কাব্যে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক কবিতা ও গানে নজরুল ইসলামের সংগ্রামী ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে উজ্জীবিত করে বর্তমানকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পান। চিরঞ্জীব কাব্য গ্রন্থের খালেদ, চিরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ, উমর ফারুক ইত্যাদি কবিতায় ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে জাগ্রত করে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেন। ‘ঈদ-মোবারক’ কবিতাটিতে সাম্যের যে আহবান কবি করেছেন তা অতুলনীয়। ইসলামের মহান আদর্শাবলিকে উজ্জীবিত করে এ কাব্যেও পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণিভেদসহ নানা রকম অসামঞ্জস্যতা থেকে মুক্তির আলোর পথ দেখিয়েছেন ইসলামের বীর সেনানীদেরকে। ‘আয় বেহেশতে কে যাবি আয়, ঈদ-মোবারক, আমানুল্লাহ, অগ্র-পথিক, বার্ষিক সওগাত, অম্রাণের সওগাত, নওরোজ, ভীকু ইত্যাদি কবিতায় যৌবনের প্রতি অনুরাগ নজরুল মানসের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।^{১০} তাঁর কবিতা ও গানে যৌবনকে আলোর পথে উদ্দীপিত করার বাসনা দৃশ্যমান হয়। নজরুলের কবিতা ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যা এতটা গভীর ও প্রাণবন্তরূপে অন্য কারো কবিতায় ফুটে ওঠেনি।^{১১}

প্রায় পয়তাল্লিশটি কবিতা সরাসরি ইসলাম সম্পর্কিত ও দুই হাজারেরও বেশি ইসলামি সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর কবিতা-গান নজরুল রচনা করেছেন।^{১২} যা বাংলা সংগীতেরও বিশেষ অলংকার রূপ লাভ

করেছে। এমন অনেক সংগীত আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। যে কাব্য-সংগীত ছাড়া ধর্মীয় জীবন প্রবাহ ও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। কাজী নজরুল ইসলাম প্রাকৃতিকগতভাবে ও জন্মগতভাবে একজন বাঙালী মুসলিম কবি। তাঁর সত্তা-অস্তিত্বে ও হৃদয়ে মিশে আছে ইসলামের মর্মবাণী। তাঁর জীবনপ্রবাহ নানা পেশার মানুষের সাথে যেমন-ঠিক তেমনি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির সংস্কৃতি তাঁর অন্তর প্রণালীতে প্রবহমান। তবুও তিনি ইসলাম ধর্মের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। ইসলামের সুমহান আদর্শ, রীতি-নীতি এবং অনুশাসন তাঁর চেতনায় প্রবহমান ও বিদ্যমান। এই ইসলামি উপাদানসমূহ হলো তাঁর সাহিত্য তথা কবিতা-গান রচনার বিষয়বস্তু। নজরুল কাব্যের বড় একটি স্থান দখল করে আছে ইসলামের মৌলিক উপাদান যা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে যুগ যুগ ধরে। ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাদানসমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

৪. তাওহিদ

তাওহিদ বা একত্ববাদের মৌলিকতা নজরুলের ইসলামি কবিতা ও গানে প্রবলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর অন্তর ছিল ইসলামের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত। মহান আল্লাহর প্রশংসাবাদী উচ্চকিত হয় তাঁর কবিতায়। তাঁর রচনায় আল্লাহর একাত্ববাদের চিত্র বিদ্যমান। কবির চলার পথের একমাত্র পাথেও ও মুক্তির দিশারী হচ্ছে তাওহিদ বা একাত্ববাদ। সেই তাওহিদের চেতনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কবি রচনা করেছেন বিখ্যাত এই কবিতা,

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।

আমার নবি মোহাম্মদ যাঁহার তারিফ জগৎময়।^{১৩}

মহান আল্লাহকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করায় নজরুলের জীবনে প্রশান্তি নেমে আসে। বিশ্বের সকল সৃষ্টিই আল্লাহর মুখাপেক্ষী ও আল্লাহ সর্বশক্তিমান; কবি এ বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করতেন। তাইত কবি উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে আল্লাহর প্রশংসা করে তাওহিদের বাণী তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনে তাওহিদের সুস্পষ্ট প্রমাণ উল্লেখ আছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ বা মাবুদ নাই, তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বসত্তার নিয়ন্ত্রক।^{১৪} কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন মনের সকল আবেগ-অনুভূতি দিয়ে। যে প্রার্থনায় কোন কৃত্রিমতার আভাস নেই। যে প্রার্থনায় মহান আল্লাহর নিকট একাত্মচিন্তে আছে শুধু কবির ফরিয়াদ। নজরুলের বিখ্যাত কবিতায় সেই প্রার্থনার ফরিয়াদ ফুটে উঠেছে।

শোন শোন, ইয়া ইলাহী, আমার মুনাজাত।

তোমার নাম যপে যেন, হৃদয় দিবস-রাত।^{১৫}

নজরুল কবিতার ছন্দে ‘ইয়া ইলাহী’ বলে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা’আলাকে বুঝিয়েছেন। মহান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ তথা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নিজের প্রার্থনা বার বার ব্যক্ত করেছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা বিদ্যমান কবি নজরুল ইসলামের অন্তরে। বিশ্বজগতে প্রতিদিন অসংখ্য কর্মের মধ্যে যেন এ জগৎ-স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস, ভালো লাগা ও হাজারো হাজারো সালাম প্রদর্শন কবির গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য। ‘সালাম লই’ শিরোনামের কবিতায় তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। তিনি বলেন,

মাওলা আমার সালাম লহ এ সংসারের কাজে

দ্বীন-দুনিয়ার দুই কাজে মোর থেকো হিয়ার মাঝে।^{১৬}

উপর্যুক্ত কবিতায় তিনি মাওলা হিসেবে আমাদের প্রভু আল্লাহ তা’আলাকে বুঝিয়েছেন। কবিতার ছন্দে ব্যবহৃত মাওলা শব্দটির পরিচয় কুরআনুল কারিমে উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন, “তিনিই তোমাদের অভিভাবক বা মাওলা কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।”^{১৭}

৫. রিসালাত

আইয়্যামে জাহেলিয়া তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে মানুষের জীবন সুদ-ঘুষ, ব্যাভিচার, হত্যা-লুণ্ঠন ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তারা মনেপ্রাণে এ অবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশী ছিলেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা’আলা মহানবি মুহাম্মদ সা.কে যুগের চাহিদা পূরণের জন্য প্রেরণ করেন। রাসূল সা.এর শুভাগমন কালকে সামনে রেখে কবি নজরুল কবিতা বা গজল রচনা করেন। মহাবিশ্বের সবকিছুর ও সবার নবি হলেন মুহাম্মদ সা.। তাঁর আগমনে এ ধরনীতে নেমে আসল বরকতপূর্ণ, প্রশান্তি ও আলোকময় পরিবেশ। আকাশ-বাতাস ইত্যাদিকে কবি নজরুল আহবান করেছেন মুহাম্মদ সা. কে দেখার জন্য। আল্লাহ তা’আলা মুহাম্মদ সা.কে

পৃথিবীর সব কিছুর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, “আমি তো আপনাকে বিশ্বজাহানের একমাত্র রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।”^{১৮}

আল্লাহ তা‘আলা মহাবিশ্বের স্রষ্টা। আর মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। শেষ নবি মুহাম্মদ সা. মানবজাতির শিক্ষক স্বরূপ আবির্ভূত। তাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন মানুষকে পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। প্রিয় রাসূলের আগমন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি নজরুল আরশের বর্ণনা দিয়েছেন,

আরশ হতে পথ ভুলে এ এলো মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ- পুঁজি ‘আল্লাহ আকবার’।^{১৯}

৬. মহানবি সা. এর জীবনকথা

মুহাম্মদ সা. এর জন্মের পর কুরাইশ গোত্র যেমন ধন্য হলো তেমনি মা আমিনা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হলেন। প্রতিভাবান কবি নজরুল ইমলাম শিশু মুহাম্মদ সা. এর শুভাগমনকে আসমানে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু-পূর্ণিমার সেথা চাঁদ দোলে।
যেন উষার রাঙা-রবি দোলে।^{২০}

কবিতার পংক্তিতে ব্যবহৃত আমিনা হলেন মুহাম্মদ সা.এর মাতা। আমিনা শিশুপুত্র মুহাম্মদ সা. কে পেয়ে আনন্দিত। তাঁর উদরে যেনো শিশু পুত্র মুহাম্মদ সা. এক টুকরো চাঁদ। এই চাঁদের আলোতে মক্কা নগরী এক সময় আলোকিত হয়। সকল কুসংস্কার, অনিয়ম, পাপাচার ও অপরাধকর্ম দূরীভূত হয়ে যায় মহানবি সা.এর আগমনের কারণে। নজরুলের অন্তর ছিল মুহাম্মদ সা. এর ভালোবাসায় আত্মহারা। হৃদয়ের মাধুরী ও আত্মার অনুভূতি দিয়ে তিনি রাসূলের শানে রচনা করেন অসংখ্য গান ও কবিতা। কবি মুহাম্মদ সা. এর পায়ের ধূলি হতে চেয়েছেন,

আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ,
এই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবি।^{২১}

মহানবি সা. এর জন্মের আগমন কালকে উপলক্ষ করে লিখেছেন বিখ্যাত চমৎকার এই চরণটি। তিনি বলেন,

ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়।
আয় রে সাগর আকাশ-বাতাস, দেখবি যদি আয়।^{২২}

‘ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম’ কবিতাটি ১৩২৭ বঙ্গাব্দে মোসলেম ভারত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আবির্ভাব ও তিরোভাব নামে দু’টি অংশে সংকলিত কবিতাটি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ সা.-কে নিয়ে রচিত। মুহাম্মদ সা.-এর পৃথিবীতে আগমন উপলক্ষ্যে রচিত হয় আবির্ভাব। মহানবি সা.-এর জন্ম মুহূর্তকে দুনিয়া ও বেহেশতের শুভ ও আনন্দময় লগ্নরূপে উল্লেখ করার পাশাপাশি মুসলমানদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের ভূগোল ইত্যাদিরও উল্লেখ রয়েছে। সাথে সাথে মুসলিম জাহানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানেরও নাম উল্লেখ রয়েছে কবিতাটিতে।^{২৩} ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য কবিতায় নজরুল বলেছেন,

নাই তা-জ তাই লা-জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর শীষে তোরা সাজ!
করে তসলিম, হর কুর্ণিশে শোর্-আওয়াজ
শোন্ কোন মুরদা সে উচ্চারে ‘হেরা’ আজ ধরা মাঝ!^{২৪}

সমকালীন মুসলমানদের হীনমন্যতা দূরের প্রয়াস দেখা যায় নজরুলের কবিতায়। মহানবি সা. এর সমকালীন ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি তাঁর হেরা পর্বতের গুহায় আধ্যাত্মিকভাবে ওহি লাভের মধ্য দিয়েই ইসলামের প্রচার সূচিত হয়।^{২৫} ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (তিরোভাব) কবিতাটিতে মহানবি সা. এর তিরোধানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে-

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে একী ঘন রোল-সাল্লালাহো আলায় হিসাল্লাম।^{২৬}

মহানবির দুহিতা ফাতেমা রা. এর কান্না, হাসানও হোসেন রা.এর আহাজারির বর্ণনা, মুয়াজ্জিনের কম্পিত কণ্ঠে আযান ইত্যাদি চিত্র কবিতাটিতে রয়েছে। আবির্ভাব প্রথম প্রকাশিত হয় মোসলেম ভারত, ১৩২৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এবং তিরোভাব প্রকাশিত হয় মোসলেম ভারত ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়।

নজরুলের অপর একটি কীর্তি ‘মরুভাস্কর’ কাব্য। মুহাম্মদ সা. এর জীবনী নির্ভর করে লেখা হয়েছে এ কাব্যটি। এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে। নবজীর পঁচিশ বছরের ইতিহাস নজরুল চারটি সর্গের ভেতর আঠারটি পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছেন।^{২৭} ‘মরুভাস্কর’ মহাকাব্যের আঙ্গিকে নজরুল রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এটি অর্ধেক শেষ করার পরই নজরুলের লেখনি শক্তি হারিয়ে যায়। তারপরও বলা যায়, এখানে মুসলিম জাহানের এবং ইসলামের যে ইতিহাস পাই তা নজরুল সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক ও সমাজিক নানারকম অসঙ্গতি থেকে মুক্তি কামনায়ও নজরুলের বিদ্রোহী কবিকণ্ঠ সোচ্চার ছিল।

৭. পবিত্র কুরআন মাজিদ

কুরআন মজিদ- মহান আল্লাহর বাণী লওহে মাহফুজ হতে জিবরাইল আ.এর মাধ্যমে নবুওয়্যাতের দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে মহানবি সা. এর নিকট অবতীর্ণ হয়। যা সন্দেহাতীত প্রক্রিয়ায় অদ্যাবধি অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত হয়ে আসছে এবং যার শব্দ, অর্থ, মর্ম, উপস্থাপনা, বিন্যাস সবই আল্লাহ তা‘আলার নিজস্ব। কবিতার চরণে কাজী নজরুল ইসলাম কালাম ও কুরআন শব্দদ্বয় দিয়ে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল কারিমকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর কাছে কবির প্রার্থনা চোখ দিয়ে শুধু কুরআনের আয়াত দেখতে চান। আবার কান দিয়ে সদা আল্লাহর কালাম শুনতে চান। তেলাওয়াত ও কুরআন শেখার প্রতি তিনি গুরত্বারোপ করেছেন।

‘কাব্য আমপারা’ নজরুল ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এটি পবিত্র কুরআন শরিফের আংশিক বাংলা অনুবাদ। ‘কাব্য-আমপারা’ সম্পর্কে নজরুল বলেছেন, ‘আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র ‘কুরআন’ শরিফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। আমার বিশ্বাস, পবিত্র কুরআন শরিফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনূদিত হয়, তাহলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন-অনেক বালক বালিকাও সমস্ত কুরআন হয়ত মুখস্ত করে ফেলবে।’^{২৮} এটি পবিত্র কুরআন মজিদের ত্রিশতম পারা আমপারার কাব্যানুবাদ। যা ছন্দে ছন্দে আল্লাহর কালামের বাংলা অনুবাদ। এটি মানুষের অন্তরে সাড়া জাগায় এবং মুসলিম শিশু-কিশোরদের জন্য মুখস্ত করার উপযোগী।

৮. সালাত প্রতিষ্ঠা

মানুষ তাঁর একান্ত চাওয়া-পাওয়াগুলো মুনাজাত বা প্রার্থনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সমীপে চেয়ে থাকে। এই নিভৃত আলাপ চারিত্র্যে তাঁর জীবনের পাপরাশি মোচন করতে চান। এই বিখ্যাত চরণের মাঝে কবি নজরুল আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় বিষয়টি তুলে ধরেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষকে তিনি নামাজের দাওয়াত বা আহবান জানিয়েছিলেন। রাত দিন তাঁর তাসবিহ পড়ার আকাঙ্ক্ষাও তিনি এতে ব্যক্ত করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম শৈশবে কুরআন পাঠ শিখেছিলেন। সেই শিক্ষা ও আকুতি সকল মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কুরআনুল কারিম তেলাওয়াতের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। কেননা কুরআন তেলাওয়াত শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এ প্রসঙ্গে কবি নজরুল লিখেছেন,

যেন কানে শুনি সদা তোমারি কালাম হে খোদা
চোখে যেন দেখি শুধু, কোরআনের আয়াত।
মসজিদে ঐ শোন রে আজান, চল নামাজে চল।
দুঃখে পাবি সান্তনা তুই বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল নামাজে চল।
ওরে চল নামাজে চল।^{২৯}

৯. সিয়াম সাধনা

কবি নজরুল ইসলাম ‘রমজান’ শব্দটি দিয়ে মূলত পবিত্র রমজান মাসকে বুঝিয়েছেন। রমজান মাসে মুসলিম জনগোষ্ঠী সিয়াম পালন করে। একটি মাস দিনেরবেলা ক্ষুধা, পিপাসা, রাতের ইবাদত ইত্যাদি শেষে আল্লাহর ক্ষমার সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে রোজাদার উপভোগ করে ঈদের আনন্দ। যেমন,

যাবার বেলায় সালাম লহো হে পাক রমজান।
 তবু বিদায়-ব্যথায় কাঁদছে নিখিল মুসলিম জাহান।
 পাপীর তরে তুমি পারের তরী ছিলে দুনিয়ায়,
 তোমারি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায়;
 তোমারি ভয়ে লুকিয়ে ছিল শয়তান।
 ওগো রমজান, তোমারি তরে মুসলিম যত
 রাখিয়া রোজা ছিল জাগিয়া চাহি তব পথ;
 আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কোরআন।
 পরহেজগারের তুমি যে প্রিয় প্রাণের সাথী,
 মসজিদে প্রাণের তুমি যে জ্বালাও দ্বীনের বাতি,
 উড়িয়ে গেলে যাবার বেলায় নূতন ঈদের চাঁদের নিশান।^{৩০}

১০. পবিত্র হজ পালন

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নিয়মে কা'বা শরিফ যিয়ারত করাকে হজ বলে।^{৩১} হজ ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ। প্রিয় সম্পদ খরচ করে যিনি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করে তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাসূল সা.ও সাহাবাদের স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান দেখার মধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রবল হয়। নজরুল তাঁর কবিতায় হজ শব্দটি ব্যবহার করে ইসলামের এই মহান ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী মুসলমানদেরকে যিয়ারতে বাইতুল্লাহ অর্থাৎ হজ পালনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাদেরকে রাসূলের রওজা মুবারক, বাইতুল্লাহ, সাহাবাদের স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান দেখার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হজব্রত পালনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন,

সম্মল যার আছে হাতে
 হজ্বের তরে যা কা'বাতে,^{৩২}

১১. যাকাত প্রদান

ইসলামি শরি'আতের পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর সঞ্চিত থাকলে ঐ সম্পদ থেকে শরি'আতের নির্ধারিত অংশ নির্ধারিত খাতে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া স্বত্ব হস্তান্তর করাকে যাকাত বলে। যাকাত একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত। এর লক্ষ্য হলো মানুষের শুদ্ধতম জীবন-যাপন। এর সুফল ব্যাপক ও ভারসাম্যপূর্ণ। কবি নজরুল কবিতার চরণে 'যাকাত' শব্দটি ব্যবহার করে মূলত যাকাত আদায়ের প্রতি আহ্বান করেছেন। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবন নির্বাহ করার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহর দেয়া সম্পদে গরিব-দুঃখীদের অধিকার আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন। সম্পদ থেকে নির্ধারিত একটি অংশ যাকাত দিতে বলেছেন। ইসলামে কল্যাণকর যাবতীয় ব্যবস্থার কথা স্মরণ করেছেন কবি নজরুল। যেমন:

দে যাকাত, দে যাকাত, তোরা দে রে যাকাত।
 তোর দিল্ খুলবে পরে ওরে আগে খুলুক হাত।^{৩৩}

১২. মুসলমানের প্রধান উৎসব

মুসলমানদের জীবনের দু'টি প্রধান ধর্মীয় আনন্দময় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর নজরুলের গানের সুর ছাড়া যেন বাঙালি মুসলমানের অন্তরে ঈদের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে না। রমজানের বিদায় আর ঈদের বার্তা নিয়ে হাজির হয় নজরুলের কবিতা। যেমন-

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।
 তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।
 তোর সোনাদানা বালাখানা সব রহে লিল্লাহ দে যাকাত,
 মূর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ।
 তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
 যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।^{৩৪}

মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাকে শানিত করার লক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম প্রেরণা যুগিয়েছেন এই কবিতায়।

এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদগাহে।
 যাহার আশায় চোখে মোদের ছিল না রে নিদ চলো ঈদগাহে।^{৩৫}

নজরুলের ‘কোরবানী’ কবিতা সরাসরি ইসলাম ধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক একটি কবিতা। কবিতাটি মুসলমানদের একটি অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান কুরবানির ঈদ নিয়ে রচিত। কবিতাটিতে কবি ইসলাম ধর্মের ঈদুল আযহার তাৎপর্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন-

ওরে হত্যা নয় আজ ‘সত্য-এহ’ শক্তির উদ্‌বোধন!
এই দিনই ‘মীনা’-ময়দানে
পুত্র-শ্বেহের গর্দানে
ছুরি হেনে’ খুন স্করিয়ে নে’
রেখেছে আকা ইব্রাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!^{৩৬}

কবিতাটিতে নজরুল কুরবানির তাৎপর্যকেই স্পষ্ট করেছেন। সাথে সাথে ইসলামের একটি ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে একদিকে যেমন ইব্রাহিম আ.-এর পুত্র ইসমাইল আ. কে কুরবানি দেয়ার মহান ত্যাগের কথা উল্লেখ আছে তেমনি উল্লেখ আছে কুরবানির নামে একশ্রেণির লোকের মিথ্যা অহমিকার কথা। যেমন,

চাহি না ক’ গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দান? ও দান বুট।
চাই কোরবানী, চাই না দান।
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের
দেবে কি? কে আছ মুসলামান?^{৩৭}

কুরবানিকে নিয়ে নজরুল লিখেছেন শহীদী ঈদ, বকরীদ কবিতাসহ আরো কয়েকটি কবিতা ও গান।

১৩. খোলাফায়ে রাশেদা ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব

‘খেয়া-পারের তরণী’ কবিতায় খোলাফায়ে রাশেদিনের চার খলিফার উল্লেখের ভেতর দিয়ে মুসলমানদের শেষ বিচারের দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন নজরুল। সেই বিচারের দিনে জয়ী হতে হলে কী করতে হবে? তিনি তারও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে,

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাগুরী এ তরীর পাকা মাঝি মান্না,
দাঁড়ী মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ!^{৩৮}

ধর্মীয় বিষয়কে নজরুল তাঁর সাহিত্যে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে এগুলো পাঠের পর যে কোনো মুসলমান হৃদয় কেঁদে উঠে। জান্নাতের পথ অনুসারী হয়ে চলতে অনুপ্রাণিত হয়। কবিতাটির মৌলিকতা এবং নির্মাণ কৌশল এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ‘রণভেরী’ কবিতাটিতেও ইসলামিক অনুভূতি বিরাজমান। “ওরে আয়, ঐ ইসলাম ডুবে যায়।” কবিতাটির এই একটি মাত্র পংক্তির মধ্যে দিয়েই সমগ্র মুসলমান জাতি জেগে ওঠে। বলা যায় কাজী নজরুল ইসলাম ধ্যানে, জ্ঞানে খাঁটি মুসলমান ছিলেন। কামাল পাশা, আনোয়ার, চিরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ, জামাল উদ্দীন, রীফ সর্দার, উমর ফারুক, খালেদ ইত্যাদি কবিতায় কোথাও সরাসরি ইসলামি ইতিহাস, কোথাও খ্যাতিমান মুসলমান ব্যক্তিত্বের আদর্শ, মহত্ত্ব, শৌর্য বীর্য প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. উপসংহার

নজরুল কাব্যে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশেষ উপজীব্য বিষয়। তাঁর কবিতা ও গানে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা সমকালীন কোনো কবি এমনটি পরবর্তীকালেও কোনো কবির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি কুরআনের বাণী, মহানবি সা. এর আদর্শ, ইসলামি চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ ও মুসলিম মানসকে কবিতায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় নজরুল বিভিন্নভাবে ইসলাম এবং ধর্মীয় অনুশঙ্গ মনোমুগ্ধকরভাবে উপস্থাপন করেন। ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ভাবনায় মুসলিম জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। অন্ধকার অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত জাতিকে পথের দিশা দেখান। এই অসামান্য অবদানের জন্য নজরুল বাংলা সাহিত্যে অমর ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃষ্টি (কলকাতা: কেপি বাগবী এণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৮।
- ^২ শেখ আজিজুল হক, নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৭-২০।
- ^৩ মোবাহ্বের আলী, নজরুল প্রতিভা (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৫।
- ^৪ নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২০।
- ^৫ আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য সমীক্ষা (ঢাকা: শুভা প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬; এস. এম. হাবিবুর রহমান, শিশুদের কবি নজরুল সংকলন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৫।
- ^৬ কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃষ্টি, পৃ. ৭২১।
- ^৭ নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২০।
- ^৮ ড. বেগম জাহান আরা, দুখু মিয়া থেকে কাজী নজরুল (ঢাকা: হাবীব প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২০-২৪।
- ^৯ শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুল কাব্যে ঐতিহ্যের স্বরূপ (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৩১-১৩৫; আব্দুস সাত্তার, নজরুল ও অধ্যাত্মবাদ (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, মে, ১৯৯৯ খ্রি.),
- ^{১০} নজরুল কাব্য সমীক্ষা, পৃ. ৬০।
- ^{১১} নজরুল কাব্যে ঐতিহ্যের স্বরূপ, পৃ. ১৩৬-১৪১।
- ^{১২} মুনীর চৌধুরী, শতকথায় নজরুল সাহিত্য (কলকাতা: ১৮ বি শ্যামাচরণ স্ট্রিট, মহালয়া, ১৪০৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৯।
- ^{১৩} রশীদুন নবী, নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৪০-৩৪১।
- ^{১৪} সূরাহ আল-বাকার: ২৫৫।
- ^{১৫} নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, আব্দুল মুকীত চৌধুরী (সম্পা.) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৭।
- ^{১৬} নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, আব্দুল মুকীত চৌধুরী (সম্পা.), পৃ. ২৮।
- ^{১৭} সূরাহ আল-হজ্জ: ৭৮।
- ^{১৮} সূরাহ আল-আম্বিয়া: ১০৭।
- ^{১৯} নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা, আব্দুল মুকীত চৌধুরী (সম্পা.), পৃ. ২৮।
- ^{২০} তদেব, পৃ. ১৩০।
- ^{২১} রশীদুন নবী, নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, তদেব, পৃ. ১৭৫।
- ^{২২} ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, নজরুল কাব্যে তাসাউফ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ, ২০২১ খ্রি.) পৃ. ২০; নজরুল রচনাবলী, ১০ ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ২৪০।
- ^{২৩} কামরুল আহসান, নানা ভাবনায় নজরুল (ঢাকা: বাংলাবাজার, আফসার ব্রাদার্স, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৭২।
- ^{২৪} তদেব, পৃ. ৭৩।
- ^{২৫} মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, নজরুল কাব্যে নবী মোস্তফা সা. (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৯।
- ^{২৬} তদেব, পৃ. ৭৪।
- ^{২৭} নানা ভাবনায় নজরুল, পৃ. ৭৩।
- ^{২৮} কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুলসমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড (কাব্যানুবাদ) (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০২১), পৃ. ৪৩।
- ^{২৯} নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, আব্দুল মুকীত চৌধুরী (সম্পা.), পৃ. ১৩০।
- ^{৩০} নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, রশীদুন নবী, পৃ. ১৭৬।
- ^{৩১} মাওলানা আব্দুর রব মিয়া, ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮২; মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩০।
- ^{৩২} নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, রশীদুন নবী, পৃ. ১৭০।
- ^{৩৩} তদেব, পৃ. ১৭৮।
- ^{৩৪} নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, আব্দুল মুকীত চৌধুরী (সম্পা.), পৃ. ৭৮।
- ^{৩৫} কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুলসমগ্র, অষ্টম খণ্ড (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৮২।
- ^{৩৬} নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, আব্দুল মুকীত চৌধুরী (সম্পা.), পৃ. ৮২।
- ^{৩৭} তদেব, পৃ. ৮৪।
- ^{৩৮} তদেব, পৃ. ১০০।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনের জিজ্ঞাসা ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর: একটি পর্যালোচনা [Arjuna's Question and Krishna's Answer in the Srimad Bhagavad Gita: An Overview]

ড. জয়শ্রী দাশ*

[Abstract: Shrimadbhagavadgita belongs to the Bhishma parvan of the Mahabharata. On the eve of the battle of kurukshetra, the delusion of the pandava son, Arjuna arose. In order to remove Arjuna's doubt, Shrikrishna advises Arjuna about atmatattva, karmatattva, Gyantattva etc. Shrikrishna is not only the charioteer of Arjuna's but also the charioteer of human life. He revealed seven hundred verse to guide Arjuna. Shrikrishna did not give all the forms of the Gita. Often Arjuna asked mysterious questions and also expressed his desire to see the universe and helped in the overall formation of the Gita. The Krishna-Arjuna dialogue covers a broad range of spiritual topics, touching upon moral and ethical dilemmas and philosophical issues that go far beyond the war that Arjuna faces. By the advice of Krishna, Arjuna's body and mind are healed, ready to fight. Arjuna's education is complete.]

Keywords: Shrimadbhagavadgita, Delusion, Atmatattava, Karmatattva, Gyantattva, Universe, Spiritual, Moral and Ethical Dilemmas.

১. ভূমিকা

মহাভারত হিন্দুদের একখানি ধর্মগ্রন্থ এবং মহাকাব্য। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলাদা কোন গ্রন্থ নয়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত। সংক্ষিপ্ত নাম গীতা। সাধারণ পরিচয়ে গীতা একখানি অপূর্ব ধর্মবিজ্ঞান-গ্রন্থ। গীতার ভাষা-সরল ও সুন্দর; ভাব-গম্ভীর, ব্যাপক ও মৌলিক; বিচার-সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও নিরপেক্ষ; যুক্তি-দৃঢ় ও স্বাভাবিক। গীতার-প্রারম্ভ, উপসংহার, আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, ও পরিবেশন কৌশল অতি অপূর্ব ও হৃদয়গ্রাহী। গীতা অলসের উদ্যম, ভীরুর সাহস, নিরাশের আশা ও মৃতের সঞ্জীবনী। গীতা কি বৈপ্লবিক, কি তাত্ত্বিক, কি উদ্যমী, কি উদাসীন, কি নির্বাণবাদী, কি লীলাবাদী-সকলেরই সংগ্রহক ও পালক। অত্যন্ত স্থূলদর্শী নাস্তিক থেকে আরম্ভ করে পরম সদ্ধর্ম-পরায়ণ পর্যন্ত সর্ব শ্রেণীর দার্শনিকগণের বিচারের সারাংশ অতি বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট যুক্তির সাথে এতে উল্লিখিত হয়েছে। এটি সাতশত শ্লোকের সমষ্টি।

২. যুদ্ধে মোহগ্রস্ত অর্জুন

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। এমন সময় অর্জুন সংশয়াচ্ছন্ন। যুদ্ধের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করতে পারছেন না। একদিকে অর্জুনের ক্ষত্রিয় হিসেবে যুদ্ধ করা উচিত অন্যদিকে স্বজনবধ করে রাজ্যসুখ অর্জুন চান না। এমত অবস্থায় অর্জুনের কোনটা করা উচিত, কোনটা শ্রেয়স্কর তা বুঝতে পারছেন না। গীতায় অর্জুনের যে সমস্যা তা সর্বজনীন। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সেই একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। স্বীর প্রতি ন্যায় বিচার করতে গেলে প্রজাদের কাছে আদর্শ রাজা হওয়া যায় না আবার প্রজারঞ্জন করতে গেলে স্বীর প্রতি কর্তব্য করা যায় না। অর্জুন মোহগ্রস্ত। একদিকে রাষ্ট্রের দাবি অন্যদিকে পারিবারিক দাবি। এই দুই দাবি অর্জুনকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এর থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো একজন উত্তম উপদেষ্টার উপদেশ। সেই উপদেষ্টাই অর্জুনকে সৃষ্টি সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখাবেন এবং উপযুক্ত পরামর্শ দান করবেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কেবল অর্জুনের রথেরসারথি নন তিনি আমাদের তথা সমগ্র মানব সমাজের জীবনরথের সারথি। রথ কীভাবে ভালো করে গন্তব্যে পৌঁছাবে

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

তা সারথির ওপর নির্ভর করে। আমাদের জীবন রথও মোহ, মায়া দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই অন্ধকারময় জীবনরথের একমাত্র আলোর দিশারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই আঠারো অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মোহ থেকে উত্তরণ করেছেন। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দান করে অর্জুনের অজ্ঞতাজনিত মোহ দূর করে মোক্ষে উন্নীত করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বক্তা আর অর্জুন শ্রোতা। “ডাক্তার যেমন রোগীকে জিজ্ঞাসা করে- ওষধ ঠিকমতো খাইয়াছে কিনা? রোগ সারিয়াছে কিনা? গীতার শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি সব মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছ তো? তোমার অজ্ঞতাজনিত মোহ দূর হইয়াছে কিনা? রোগী কেমন অনুভব করিতেছে, সেইটাই বড় কথা। অর্জুন বলিলেন- আমার মোহ দূর হইয়াছে সংশয় চলিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া পাইয়াছি কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান। এখন তোমার উপদেশ মতই কাজ করিব-

‘নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তুৎপ্রসাদানুযাচ্যুত।

স্থিতোইহ্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥’

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র শুনিলেই কাজ হইবে না, তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। শিক্ষালাভ করিলেই মানুষ হয় না, আধুনিক বিজ্ঞানের নৃশংস প্রয়োগে জগৎ প্রায় ধ্বংসের কিনারায় আসিয়াছে। বুদ্ধি, জ্ঞানের অনুশীলন করিলেই হইবে না, ইচ্ছাশক্তিকে কল্যাণমুখী করিতে হবে। বুদ্ধির সাথে শুভ ইচ্ছার যোগ হওয়া চাই। বেদে এইরূপ প্রার্থনা আছে- বুদ্ধি, ইচ্ছা মঙ্গলপ্রয়াসে যেন পর্য্যবসিত হয়। গীতার আঠারোটি অধ্যায় অনুশীলন করিলে মনে হইবে-যিনি আমার বুদ্ধি চালনা করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছায় চলাই কল্যাণকর।”^{১১} গীতাকে বলা হয় বেদগাভীর দুগ্ধ। বেদের জ্ঞানতত্ত্ব বা উপনিষদ হচ্ছে গাভী। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন হচ্ছে বৎস। অমৃতময়ী গীতা হচ্ছে সুস্বাদু দুগ্ধ। “সর্বোপনিষদো গাবো দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।” শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি রথের সারথি হয়ে অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। “বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্রের কালিমা খণ্ডন করে তাঁকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, “কেবল পাণ্ডবদিগের একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন খণ্ডে খণ্ডে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত; ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে সসগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই পরস্পর বিরোধী রাজগণকে প্রথম ধ্বংস করা কর্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত শান্ত এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে নিহত হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহারই পৌরাণিক নাম ভারমোচন।”^{১২}

গীতার তত্ত্বোপদেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ঐতিহাসিক মন্তব্য রয়েছে তা আমাদের কাছে খুব মূল্যবান মনে হয়। “বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে, তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতার প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়োজাহাজ- অর্জুনের কৃপাকাতার মনকে সে এমন দূরে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মারেই বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে, তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনা বাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।”^{১৩}

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভালোবাসেন বলেই দরদ মাখানো উপদেশ দিয়েছেন। “যন্তেইহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যায়” অর্জুন তোমাকে ভালোবাসি তাই বলছি। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরম্ভপ্রায়। উভয়পক্ষের সৈন্যদল ব্যূহবদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সুসজ্জিত। যোদ্ধাগণ মহোৎসাহে সিংহনাদ করে শঙ্খধ্বনি করলেন, রণবাদ্য বেজে উঠল। তখন অর্জুনের মহানির্বেদ উপস্থিত হলো। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল, হাত হতে গাণ্ডীব খসে পড়ল, মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি তখন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়লেন। অর্জুনের এই অনার্যজনোচিত আচরণ দেখে রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন,

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।

অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥^{১৪}

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভর্তসনা করতে লাগলেন। যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ এই সময়ে অর্জুনের এরূপ অবস্থা একেবারেই অশোভন। অর্জুন ক্ষুদ্র মনের পরিচয় দিয়েছেন। এই দুর্বলতাকে ত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উত্তীর্ণ হওয়াই অর্জুনের কর্তব্য।

৩. অর্জুনের জিজ্ঞাসা

শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এরূপ বাক্য শোনার পর অর্জুন যদি নীরব থাকতেন তাহলে গীতার সাতশত শ্লোকের অবতারণা হতো না। অর্জুন মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ সময় ধরে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনেছেন আবার কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন। গীতার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাথে কথা বলেছেন। আর সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বলেছেন আর অর্জুন নির্বাক হয়ে রয়েছেন। গীতায় অর্জুন মোট ১৮ বার প্রশ্ন করেছেন। এর মধ্যে পাঁচবার প্রার্থনা নিবেদন বা স্তুতি করেছেন আর তেরো বার বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্নগুলোকে প্রধানত মুখ্য-প্রাসঙ্গিক ও গৌণ প্রাসঙ্গিক ভেদে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। গৌণ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন একটি এবং বাকি বারোটি মুখ্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। মুখ্য-প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকে জিজ্ঞাসামূলক ও সংশয়মূলক ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বারোটির মধ্যে নয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসামূলক, অবশিষ্ট তিনটি প্রশ্ন সংশয়াত্মক। জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। সংশয়মূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর ব্যাখ্যাসহকারে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গীতার আঠারোটা অধ্যায়ের মধ্যে অর্জুনের জিজ্ঞাসামূলক প্রথম প্রশ্ন হলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

৩.১ স্থিতপ্রজ্ঞ সম্পর্কে অর্জুনের প্রথম জিজ্ঞাসা:

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিষ্ম্য কেশব।

স্থিতযীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম ॥^৫

অর্থাৎ অর্জুন বললেন, হে কেশব! সমাধিষ্ম স্থিতপ্রজ্ঞ কাকে বলে? ঐ স্থিতপ্রজ্ঞের বলা বসা ও চলা কী প্রকার হয়? উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন,

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥^৬

অর্থাৎ শ্রীভগবান বললেন- হে পার্থ! যখন (কোন মানুষ নিজের) মনের সমস্ত কাম অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ করেন এবং আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

৩.২ দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা:

অথ কেন প্রযুক্তোইয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥^৭

অর্থাৎ অর্জুন বললেন, হে বার্ষেয় (শ্রীকৃষ্ণ) এখন মনুষ্য নিজের ইচ্ছা না থাকলেও কীসের প্রেরণায় পাপ করে, বল কোন প্রকার জবরদস্তিতে করে থাকে।

অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেছেন,

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্যা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥^৮

অর্থাৎ এই বিষয়ে এ বোঝা যে, রজোগুণ হতে উৎপন্ন অত্যন্ত পেটুক ও পাপী এই কাম ও এই ক্রোধই শত্রু।

৩.৩ অর্জুনের তৃতীয় জিজ্ঞাসা:

যোইয়ং যোগভূয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।

এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥^৯

অর্থাৎ হে মধুসূদন! সামা অথবা সাম্যবুদ্ধিতে প্রাপ্ত এই যে (কর্ম) যোগ তুমি বলেছ, আমি দেখছি না যে, (মনের) চঞ্চলতার কারণে তা স্থির থাকবে। উত্তরে ভগবান বলেছেন,

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোইবাণ্ডুমুপায়তঃ ॥^{১০}

অর্থাৎ আমার মতে, যার অন্তঃকরণ বশীভূত নয়, তার (এই সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন; কিন্তু অন্তঃকরণকে বশে রেখে প্রযত্ন করতে থাকলে উপায়ের দ্বারা (এই যোগ) প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

৩.৪ চতুর্থ জিজ্ঞাসা:

অযাতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
কচিন্নোভয়বিভ্রষ্টস্থিলাভ্রমিব নশ্যতি ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥^{১১}

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যত্নের শিথিলতাবশত যোগ হতে ভ্রষ্টচিত্ত হওয়ায় যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হয়, তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হন? হে মহাবাহু, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগমার্গে অকৃতকার্য হওয়াতে মোক্ষ হতে বঞ্চিত হন এবং কাম্যকর্মের ত্যাগহেতু স্বর্গাদি হতেও বঞ্চিত হন, সুতরাং ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থদ্বয় হতে ভ্রষ্ট হয়ে, ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় নষ্ট হন না কি? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

পার্থ নৈবেহ নামত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে । তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
ন হি কল্যাণকং কশ্চিদুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরনন্দন ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিত্বা শাস্ত্রীঃ সমাঃ । পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হব্যশোইপি সঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোইভিজায়তে ॥ জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ । প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকলিষঃ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥^{১২}

অর্থাৎ শ্রীভগবান বললেন, হে পার্থ! কি এই লোকে এবং কি পরলোকে, এরূপ পুরুষের কখনও বিনাশ হয়ই না। কারণ হে তাত! কল্যাণকর কর্মকর্তা কোনোও ব্যক্তির দুর্গতি হয় না। পুণ্যকর্তা পুরুষের প্রাপ্য (স্বর্গাদি) লোকসমূহ পেয়ে এবং (সেখানে) বহু বর্ষ পর্যন্ত বাস করে পুনরায় এই যোগভ্রষ্ট অর্থাৎ কর্মযোগ হতে ভ্রষ্ট পুরুষ পবিত্র শ্রীমান লোকের ঘরে জন্ম নেয়; অথবা বুদ্ধিমান (কর্ম) যোগীদিগেরই কুলে জন্ম লাভ করে। এই প্রকার জন্ম (এই) লোকে বড় দুর্লভ। তাতে অর্থাৎ এই প্রকার প্রাপ্ত জন্মে সে পূর্বজন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায়; এবং হে কুরনন্দন! সে তা হতো পুনরায় অর্থাৎ অধিক (যোগ) সিদ্ধি পাওয়ার প্রচেষ্টা করে। নিজের পূর্বজন্মের ঐ অভ্যাস দ্বারাই অবশ্য অর্থাৎ আপন ইচ্ছা না থাকলেও সে (পূর্ণসিদ্ধির দিকে) আকৃষ্ট হয়। যার (কর্ম) যোগের জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানার ইচ্ছা হয়ে গেছে সে-ও শব্দব্রহ্মের উপরে চলে যায়। (এই প্রকার) প্রযত্নপূর্বক উদ্যোগ করতে করতে পাপ হতে শুদ্ধ হইয়া কর্ম যোগী অনেক জন্মের পর সিদ্ধ পাইয়া অন্তে উত্তম গতি লাভ করে।

৩.৫ অর্জুনের পঞ্চম জিজ্ঞাসা:

কিং তদব্রহ্ম কিমধ্যাত্মাং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।
অধিযজ্ঞঃ কথং কোইত্র দেহেইগ্নিন্ মধুসূদন ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োইসি নিয়তাত্মাভিঃ ॥^{১৩}

অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম! ঐ ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্মা কী? কর্মের অর্থ কী? অধিভূত কাকে বলা যায় এবং অধিদৈবিক কাকে বলে? অধিযজ্ঞ কীরূপ হয়? হে মধুসূদন! এই দেহে (অধিদেহ) কে আছেন? এবং অন্তকালে ইন্দ্রিয়গ্রহকারী লোক তোমাকে কীরূপে চিনবে? শ্রীভগবান বললেন,

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোইধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥^{১৪}

অর্থাৎ পরম অক্ষর যে বস্তু, তাই ব্রহ্ম; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলে উক্ত হয়। আর ভূতগণের উৎপত্তিকারক যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ তাই কর্মশব্দবাচ্য।

৩.৬ অর্জুনের ষষ্ঠ জিজ্ঞাসা:

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ । ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥
 পুরুষং শাস্ততং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাবিভূতয়ঃ ।
 আল্প্ত্যমৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদন্তথা । যাভির্বিভূতিভিলোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥
 অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ব্রবীষি মে ॥ কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
 সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । কেশু কেশু চ ভাবেষু চিত্তোইসি ভগবন্মায়া ॥
 ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ।
 স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম । ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নান্তি মেইমৃতম্ ॥^{১৫}

অর্থাৎ তুমিই পরব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ স্থান ও পরম পবিত্র বস্তু। সমস্ত ঋষি, এরূপই দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসও তোমাকে এবং শাস্তত পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্ববিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলেন; এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে তাইই বলছ। হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলছ, সে সমস্ত আমি সত্য মনেছি। হে ভগবান! তোমার ব্যক্তি অর্থাৎ তোমার মূল দেবতাদের বিদিত নয় এবং দানবদের বিদিত নয়। সকল ভূতের উৎপাদক হে ভূতেশ! দেবদেব জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! তুমি স্বয়ংই আপনাকে আপনি জান। অতএব তোমার যে সকল দিব্য বিভূতি আছে, যে বিভূতি দ্বারা এই সমস্ত লোককে তুমি ব্যাপ্ত করেছ, তা নিজেই (কৃপা করে) সম্পূর্ণরূপে বলো। যে যোগিন! (আমাকে বলো যে) সর্বদা তোমার চিন্তা করতে করতে আমি তোমাকে কি প্রকারে চিনব? এবং হে ভগবান! আমি কোন্ কোন্ পদার্থে তোমার চিন্তা করব? হে জনার্দন! নিজের বিভূতি ও যোগ আমাকে আবার সবিস্তার বলো; কারণ অমৃততুল্য (তোমার বাক্য) শুনে শুনে আমার তৃপ্তি হয় না। দশম অধ্যায়ে বিভূতির বর্ণনা দেওয়ার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাবিভূতয়ঃ
 প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নান্ত্যাত্তো বিস্তরস্য মে ॥^{১৬}

অর্থাৎ হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নিজের দিব্য বিভূতিসমূহের মধ্যে তোমাকে মুখ্য মুখ্য বলছি, কারণ আমার বিস্তারের অন্ত নাই। শ্রীভগবান বলেছেন, সর্বভূতের অন্তরে স্থিত আত্মা আমি, এবং সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমি। এগারো রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বসুর মধ্যে পাবক, পর্বতের মধ্যে মেরু। পুরাহিতের মধ্যে বৃহস্পতি, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবর অর্থাৎ স্থির পদার্থের মধ্যে হিমালয়। ভক্তিমার্গে হবিষজ্ঞ অপেক্ষা নামযজ্ঞ বা জপযজ্ঞের বিশেষ মহত্ব আছে। এই কারণে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যোদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।
 কুর্য্যাদন্যন্ বা কুর্য্যান্নোত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥^{১৭}

অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি অন্য কোনো বৈদিক কার্য করুক আর নাই করুক, ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র জপবলে সিদ্ধি লাভ করবেন, এতে কোনো সংশয় নেই।

৩.৭ অর্জুনের সপ্তম জিজ্ঞাসা:

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঃ পর্য়ুপাসতে ।
 যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥^{১৮}

অর্থাৎ এই প্রকার সর্বদাযুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে যে ভক্ত তোমারই উপাসনা করে, এবং যে অব্যক্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে উত্তম (কর্ম) যোগবেত্তা কে?

শ্রী ভগবান বললেন,

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
 শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঙ্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥^{১৯}

অর্থাৎ যাঁরা আমাতে মন নিবিষ্ট করে নিত্যযুক্ত হয়ে পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁরাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সাধক।

৩.৮ এরপর অর্জুন অষ্টম জিজ্ঞাসা করলেন:

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেনানতীতো ভবতি প্রভো ।
 কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥^{২০}

অর্থাৎ হে প্রভু, কোন লক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে জীব ত্রিগুণ অতিক্রম করেছেন? তাঁর আচার কীরূপ? এবং কী প্রকারে তিনি ত্রিগুণ অতিক্রম করেন। শ্রীভগবান বললেন,

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাক্ষতি ॥^{২১}

অর্থাৎ হে পাণ্ডব, সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ বা জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম কর্ম-প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ, এই সকল গুণধর্ম প্রবৃত্ত হলেও যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দেখ করেন না এবং ঐ সকল কার্যে নিবৃত্ত থাকলেও যিনি সুখবুদ্ধিতে তা আকাক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত বলে উক্ত হন।

৩.৯ অর্জুনের নবম জিজ্ঞাসা:

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াশ্বিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজন্তমঃ ॥^{২২}

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যাঁরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে (অথচ) শ্রদ্ধায়ুক্ত হয়ে যাগযজ্ঞ পূজাদি করে থাকেন, তাঁদের নিষ্ঠা কীরূপ? সাত্ত্বিকী, না রাজসী, না তামসী? অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীভগবান ত্রিগুণের বর্ণনা দিলেন। শ্রীভগবান অর্জুনকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিভেদে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান তিন প্রকার হয় একথা বলেছেন। প্রথমে শ্রীভগবান আহারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।

আহারা রাজসস্যেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

যাতযামং গতরসং পুতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ ।

কটুমূলবণাত্যুষঃ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥^{২৩}

অর্থাৎ যা আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্ত প্রশান্ততা ও রুচি- এ সকলের বর্ধনকারী এবং সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান এবং প্রীতিকর- এরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদক আহার রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। যে খাদ্য বহু পূর্বে পক্ব, যাহার রস শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, যা দুর্গন্ধ, পর্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তা তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। এরপর সাত্ত্বিক যজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

অফলাকাক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মদ্রহীনমদক্ষিণম্ ।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥^{২৪}

অর্থাৎ ফলাকাক্ষা ত্যাগ করে ‘যজ্ঞ করিতে হয় তাই করি’ এরূপ অবশ্য-কর্তব্য বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শান্তচিত্তে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং দম্ভার্থে (নিজ ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব বা ধার্মিকতা প্রকাশার্থ) যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজস যজ্ঞ বলে। শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য, অন্নদানবিহীন, শাস্ত্রোক্ত মদ্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে তামস-যজ্ঞ বলে। এরপর তিন প্রকার তপস্যা ও দানের কথা বললেন। এবার অর্জুনের জিজ্ঞাসার আর কিছুই নেই। এরপর শুধুমাত্র প্রার্থনা। ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন।

৩.১০ অর্জুনের দশম জিজ্ঞাসা:

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজিতম্ ।

মনস্যে যদি তচ্ছক্যং ময়া দৃষ্টমিতি প্রভো ।

যৎ ত্রয়োক্তং বচন্তেন মোহোইয়ং বিগতো মম ॥

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মনমব্যয়ম্ ॥^{২৫}

অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করলে তাতে আমার এই মোহ বিদূরিত হলো। হে প্রভু, যদি তুমি মনে কর যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তা হলে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ প্রদর্শন করাও। শ্রীভগবান বললেন,

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোইথ সহস্রশঃ ।
পশ্যাদিত্যান্ বসূন রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতন্তথা ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাস্চর্যাণি ভারত৷২৬

অর্থাৎ হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট আমার এই অদ্ভুত রূপ দর্শন কর। হে ভারত, এই আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশ মরুদগণ দর্শন করো; পূর্বে যা কখনও দেখ নি, তেমন বহুবিধ আশ্চর্য বস্তু দর্শন করো। অর্জুন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীত শঙ্কিত হয়ে গেলেন। স্তব-স্তুতি করে ভগবানকে প্রসন্ন হতে বললেন।

৩.১১ একাদশ জিজ্ঞাসা:

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রহরূপো নমোইস্তু তে দেববর প্রসাদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্৷২৭

অর্থাৎ উগ্রমূর্তি আপনি কে? আমাকে বলুন। হে দেববর, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হোন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কে, কী কার্যে প্রবৃত্ত, বুঝছি না। শ্রীভগবান বললেন,

কালোইগ্নি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেইপি ত্বাং ন ভবিষ্যতি সর্বে যেইবহ্নিতাঃ প্রতানীকেষু যোধাঃ ৷২৮

অর্থাৎ আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল; এক্ষণ এই লোকগণকে সংহার করতে প্রবৃত্তি হয়েছি; তুমি যুদ্ধ না করলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করছে তারা কেউই থাকবে না।

৩.১২ অর্জুনের দ্বাদশ জিজ্ঞাসা:

দৃষ্ট্বৈদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।
ইদানীমগ্নি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ৷২৯

অর্থাৎ হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করে আমি এখন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ (সুস্থ) হলাম। মোহশূন্য ও গত-সন্দেহ হয়ে অর্জুন নিবেদন করে বললেন,

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোইগ্নি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব৷৩০

অর্থাৎ হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমার কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান লাভ হলো, আমি স্থির হয়েছি, আমার আর সংশয় নেই, আমি তোমার উপদেশ মতো কার্য (যুদ্ধ) করব।

অর্জুনের সংশয়মূলক প্রশ্নের মধ্যে প্রথমটি হলো,

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন ।
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহমাপ্নয়াম্ ৷৩১

অর্থাৎ হে জনার্দন, যদি তোমার মতে কর্ম হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব, আমাকে হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করছ? বিমিশ্রবাক্যদ্বারা কেন আমার মনকে মোহিত করছ? যা দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করতে পারি, সেই একটি (পথ) আমাকে নিশ্চিত করে বলো। অর্জুনের মন দ্বিধাগ্রস্ত। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।
যচ্ছ্যয় এতযোরেকং তন্মো ক্রুহি সুনিশ্চিতম্ ৷৩২

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়ই বলছো, এই উভয়ের মধ্যে যা শ্রেয়স্কর সেই একটি আমাকে নিশ্চিত করে বল। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োহু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে^{১০}

অর্থাৎ সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ।

অর্জুন শেষ সংশয়মূলক প্রশ্ন করলেন অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে । বস্তুত এটা কোনো প্রশ্ন নয় । এখানে কোনো সমস্যার কথাও বলা হয়নি । শুধুমাত্র সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দুয়ের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানানর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন অর্জুন । তাই তিনি বললেন,

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥^{১১}

অর্থাৎ হে মহাবাহু, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব কী, তা পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি । উত্তরে শ্রীভগবান বললেন,

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাপ্ত্যগং বিচক্ষণাঃ ॥^{১২}

অর্থাৎ কাম্য কর্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলে জানেন; এবং সমস্ত কর্মের ফল-ত্যাগকেই সুক্ষ্মদর্শিগণ ত্যাগ বলে থাকেন । যজ্ঞ, দান, তপস্যা দ্বারা চিত্ত পবিত্র হয় । সুতরাং তা কখনো ত্যাগ করা যাবে না । তবে যজ্ঞ দানাদি কর্ম ও কর্তৃত্বের অহংকার ও ফলভোগ লালসা ত্যাগ করে করতে হবে । যেগুলো যোগত্যা ও অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত কর্ম, সেই স্বকর্মের ত্যাগ কখনো করা যাবে না ।

৩.১৩ অর্জুনের গৌণ প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসাটি হলো:

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ শ্রোক্তবানিতি^{১৩}

অর্থাৎ আপনার জন্ম পরে, বিবস্বানের জন্ম পূর্বে; সুতরাং আপনি যে পূর্বে ইহা বলেছিলেন তা কিরূপে বুঝব?

অবতারবাদের প্রসঙ্গ তুলে শ্রীভগবান বলেছেন,

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

অভুতানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মায়াম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥^{১৪}

অর্থাৎ আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে আত্মায়ায় আবির্ভূত হই । হে ভারত, যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি । সাধুদের পরিভ্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

৪. উপসংহার

বলা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন । তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন । অর্জুনের প্রশ্নগুলো নিতান্তই বাস্তব, জীবনের সমস্যার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত । পরম সারগর্ভ জিজ্ঞাসা, শূন্যগর্ভ ফাঁকা আওয়াজ বা প্রতিপক্ষ-ঠকানো ফক্কিকা মাত্র নয় । অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর ভগবানও খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন । আত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের মাধ্যমে স্বধর্মের জ্ঞান দিয়েছেন । এর ফলে অর্জুন একটি সুনিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্ত বা পথের নির্দেশ পেয়েছেন ।

তথ্যনির্দেশ

^১ শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী, গীতাধ্যান (সমগ্র), শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলকাতা-৫৯, একাদশ সমগ্র সংস্করণ, পৃ. ৭ ।

^২ উমেশচন্দ্র দেব, শাস্ত্রের মার্ক্সবাদী সমীক্ষা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিকেশন্স, নয়াদিল্লী-১৯৮৮, পৃ. ৭৮ ।

^৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পারস্যে, রবীন্দ্রচরিতাবলী-একাদশ, বিশ্বভারতী (সুলভ সংস্করণ), কলকাতা-১৩৯৮, পৃ. ৭২৫ ।

- ৪ শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রী গীতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, জানুয়ারী-২০০৫, ২/২, পৃ. ১৯।
- ৫ তদেব, ২/৫৪, পৃ. ৬৬।
- ৬ তদেব, ২/৫৫, পৃ. ৬৭।
- ৭ তদেব, ৩/৩৬, পৃ. ১২৪।
- ৮ তদেব, ৩/৩৭, পৃ. ১২৪।
- ৯ তদেব, ৬/৩৩, পৃ. ২২৮।
- ১০ তদেব, ৬/৩৬, পৃ. ২২৯।
- ১১ তদেব, ৬/৩৭-৩৮, পৃ. ২৩১।
- ১২ তদেব, ৬/৪০-৪৫, পৃ. ২৩২-২৩৪।
- ১৩ তদেব, ৮/১-২, পৃ. ২৯০।
- ১৪ তদেব, ৮/৩, পৃ. ২৯০।
- ১৫ তদেব, ১০/১২-১৮, পৃ. ৩৪৫-৩৪৭।
- ১৬ তদেব, ১০/১৯, পৃ. ৩৪৮।
- ১৭ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২/৮৭, পৃ. ৬৬।
- ১৮ তদেব, ১২/১, শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রী গীতা, পৃ. ৩৯২।
- ১৯ তদেব, ১২/২, পৃ. ৩৯২।
- ২০ তদেব, ১৪/২১, পৃ. ৪৪০।
- ২১ তদেব, ১৪/২২, পৃ. ৪৪১।
- ২২ তদেব, ১৭/১, পৃ. ৪৮১।
- ২৩ তদেব, ১৭/৮-১০, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬।
- ২৪ তদেব, ১৭/১১-১৩, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮।
- ২৫ তদেব, ১১/১,৪, পৃ. ৩৬২,৩৬৩।
- ২৬ তদেব, ১১/৫-৬, পৃ. ৩৬৩,৩৬৪।
- ২৭ তদেব, ১১/৩১, পৃ. ৩৭৩।
- ২৮ তদেব, ১১/৩২, পৃ. ৩৭৪।
- ২৯ তদেব, ১১/৫১, পৃ. ৩৮৩।
- ৩০ তদেব, ১৮/৭৩, পৃ. ৫৪৪।
- ৩১ তদেব, ৩/১-২, পৃ. ৮৪।
- ৩২ তদেব, ৫/১, পৃ. ১৭৬।
- ৩৩ তদেব, ৫/২, পৃ. ১৭৬।
- ৩৪ তদেব, ১৮/১, পৃ. ৪৯৯।
- ৩৫ তদেব, ১৮/২, পৃ. ৪৯৯।
- ৩৬ তদেব, ৪/৪, পৃ. ১৩৪।
- ৩৭ তদেব, ৪/৬-৮, পৃ. ১৩৫।

শিবলী নুমানী ও উর্দু কাব্য সাহিত্য: একটি পর্যালোচনা [A Review of Shibli Numani and Urdu Poetry Literature]

মোসা: নাহিদা আক্তার*

[Abstract: Allama Shibli Numani was consider one of the first historical critic in Urdu literature. As he was a historian on one hand, a literary poet and philosopher on the otehr hand, he has also adorned himself with rare success in the world of poetry. Although he did not gain fame as a poet in the field of literature, he enganged himself in composing poetry. Shibli wrote poems on religion, politics, history etc. while poetry in the Middle Ages was a pathetic depiction of love's dismay a futile attempt to imitate the mystical forms of Hafiz, Rumi, and Sadi-Shibli emerged in the Renaissance with poetry of Islamic ideals. Through the characters that spread the aroma in human civilization during the awakeng of nation. Shibli has portrayed some of those people in his poems who were interested in the welfare of humanity.]

Keywords: Urdu literature, Philosopher, Poetry, Middle Age, Renaissance.

১. ভূমিকা

মাওলানা শিবলী ছিলেন বিভাগপূর্ব ভারতের একজন কবি, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা, প্রাবন্ধিক, জীবনীকার, সাহিত্য সমালোচক, বাগী এবং ইসলামী পন্ডিত। তিনি উর্দু ভাষায় আধুনিক ইতিহাস লিখনধারা'র জনক হিসেবে বিবেচিত। তাঁকে উর্দু সাহিত্যের পঞ্চভিত্তির একজন ধরা হয় এবং উর্দু সাহিত্যে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক সমালোচক। সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর পদচারণা রয়েছে। ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে ঠিক রেখে আধুনিক চিন্তাধারার সাথে সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি ১৯১০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত উর্দুতে যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয় অনেকাংশেই তা শিবলীর প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয় সাধনের ফল। ঐতিহাসিক গবেষণায় মাওলানা শিবলীর মনীষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবধারার উপর তার প্রভাব গৌণ নয়। তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে উর্দু সাহিত্য অধিকতর সম্পদশালী হয়ে উঠে। আলিম সমাজের পুনর্জাগরণে, ইসলামী ঐতিহ্যের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে এবং ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ সাহিত্যগোষ্ঠী সৃষ্টিতে শিবলীর অবদান অবিস্মরণীয়। মাওলানা শিবলী নুমানী ১৮৫৭ সালে আজমগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে কয়েকটি মাদ্রাসায় পড়ার পাশাপাশি তিনি মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন। ১৮৮২ সালে আলিগড় কলেজে তাঁর অধ্যাপনা জীবনের শুরু। অধ্যাপনা জীবনে সৈয়দ আহমদ খান ও টমাস ওয়াকার আর্নল্ডের সাথে সুসম্পর্কের কারণে তিনি উপকৃত হয়েছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি একটি জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে শিবলী জাতীয় কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮৮ সাল থেকে প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার মাধ্যমে শিবলীর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। ১৮৯২ সালে তিনি তুরস্ক সহ কয়েকটি মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি আলিগড়ে অধ্যাপনা করেছেন।

২. শিবলীর কাব্য সাহিত্য

শিবলী ছিলেন বহুমুখী কাব্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কাব্য রচনা সম্পর্কে বহু সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে নানাবিধ অসংগতিপূর্ণ সেসব লিখনি শিবলী অনুসন্ধিৎসু জনের তৃষ্ণা মেটাতে যথেষ্ট নয়। শিবলীর কাব্য প্রতিভার সকল দিক সামনে রেখে বিচার করলে-ই কাব্য সাহিত্যে শিবলীর অবস্থান সহজে নিরূপণ করা যাবে। শিবলী উর্দু ও ফার্সি উভয় ভাষায় কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই উভয় ভাষায় রচিত কবিতা সমান্তরালভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। কেবল এক ভাষায় রচিত কবিতার বিশ্লেষণ হলে, তাঁর কাব্য প্রতিভার অবমূল্যায়ন হতে পারে। আর এ কারণেই সমালোচকদের কাছে শিবলীর কাব্য প্রতিভা প্রশ্নবিদ্ধ। তারা এক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনায় ইতি টেনে শিবলীর কাব্য প্রতিভায় সংশয় প্রকাশ করে

* পিএইচ.ডি গবেষক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

৩. শিবলীর গজল চর্চা

* সুবুকে হিন্দি শব্দের অর্থ হিন্দি ভাষা শিক্ষা। এখানে হিন্দি দুর্বোধ্য ভাষার পরিবর্তে ফার্সি সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

"حافظ میں بعض اوصاف ایسے ہیں جو اوروں کے کلام میں اس درجہ نہیں پائے جاتے۔ مثلاً روانی، بر جستگی اور صفائی۔"^{۵۷}

"কবি হাফিজের সাহিত্যের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যদের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। যেমন সাবলীলতা, স্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতা।"

উপর্যুক্ত তত্ত্বাবলীর নিরিখে শিবলীর গজল অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, 'শেরুল আজম' গ্রন্থে বর্ণিত এসব মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি স্বীয় রচনাবলীতে প্রাণবন্ত সাহিত্য চর্চার প্রয়াস পেয়েছেন। 'দস্তায়ে গুল' এবং 'বুয়ে গুল'-এর গজল সমূহ তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গিরই উজ্জ্বল নমুনা। এ পর্যায়ে শিবলীর গজলের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

শিবলীর গজল সমূহের মধ্যে দুর্বোধ্য কাল্পনিক বর্ণনা, উৎপ্রেক্ষা, সুক্ষ ভাব-কল্পনার চিত্রায়ন, অতিরঞ্জিত ও রূপকথার আতিশয্য নেই। অপরদিকে বর্ণনার সাবলীলতা ও সরলতা, প্রাঞ্জলতা এবং শব্দ বাৎকার অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত গজলটি লক্ষ্যণীয়,

وقت سحر که عارض او بے نقاب بود * در بزمش اول آنکه رسید آفتاب بود
بزم شراب و شاد رنگین و بانگ نے * این حرفے از فسانهٔ عهد شباب بود^{۵۸}

"ভোরবেলা এটি বিশৃঙ্খল এবং উন্মুক্ত ছিল বিজম্যাশে প্রথম প্রাপ্তি ছিল আফতাব মাতাল এবং শহীদ রঙ্গিন এবং ব্যাং এই চিঠিটি ছিল যৌবনের যুগের কিংবদন্তি।"

আল্লামা শিবলী স্বীয় গজলে গাভির্য ও শব্দ গাঁথুনির গভীরে প্রবেশ না করে, নির্বাক স্পষ্ট কথনে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত গজলটি লক্ষণীয়,

چند بیهوده به بند غم دنیا باشم * زین سپس با قدح و باده و مینا باشم
جبہ ساءے حرم کعبہ چو بودم یک چند * بر در بتکده هم ناصیہ فرسا باشم^{۵۹}

"আমি যেন বৃথা সংসারে আবদ্ধ হই তাহলে আমি সুখী এবং দুঃখি হব জবা সে হারাম কাবা চো বোদোম ইয়াক চাঁদ আমাকে নাস্য ফরসা হতে দাও।"

শিবলীর গজলের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, দার্শনিকতা, চিন্তা-ভাবনা ও নিশ্চলতার পরিবর্তে ভাবলেশহীন স্বাধীন বর্ণনা। উদাহরণ স্বরূপ এ গজলটি লক্ষণীয়,

شب وصلت، حیاگر بگزاری چه شود؟ * یکدم تنگ در آغوش فشاری، چه شود
تو بدیں حسن تو نگر چه زیان برداری؟ * این دو بوسه اگر خود نشماری، چه شود؟
از تو ناید گره بند قباوا کـردن * اگر این عقده بمن باز سپاری، چه شود؟^{۶۰}

"শুভ রাত্রি, বিনয়ের সাথে কি করা উচিত? ইয়েকাদ মম চাপা আলিঙ্গনে আঁটসাঁট, ভালো করলে কি করতে হবে, খেয়াল না রাখলে? এই দুই চুম্বনের হিসাব না করলে কি হবে? নায়েদ গড় ব্যাণ্ড ক্বাদা কারদান তারা চুক্তি মানতে অস্বীকার করলে কি হবে?"

এসব বৈশিষ্ট্য সর্বত্র বজায় রাখার জন্য শিবলী কতিপয় নীতিমালার অনুসারী হন। আর তা হলঃ-

১. শিবলী তার গজলে প্রেম-সাহিত্যের গন্ডির বাইরে পা ফেলতেন না। জীবন-জগৎ ও জন্ম-মৃত্যুর বিষয়াদিতে ব্যাপ্ত হতেন না।
২. শিবলী তার গজলে বিরল ও অপরিচিত রূপক-উপমার ব্যবহার করতেন না।
৩. শিবলীর গজলে এক সাথে ব্যাপক ও নানামুখি ভাবের বহিঃপ্রকাশ নেই। তিনি আদ্যান্ত একটি ভাব ব্যাখ্যা ও পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকেন।

এসব নীতিমালায় শৃঙ্খলিত হবার ফলে তাঁর গজলে লাভ-ক্ষতি উভয়টি হয়েছে। লাভের দিক হল, তার কাব্য ও গজল সর্বত্র খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। রুচিশীল সব লোকেরাই এসব পড়ে তৃপ্ত হয়েছেন। কিন্তু ক্ষতির দিক হল, এ খ্যাতিই তাঁর মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের জন্য বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়। যে পথে খ্যাতির সমৃদ্ধ উপকরণ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ তা নুমানী সাহেবের অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল।

গজলের জগতে শিবলীকে কবি হাফিজ, সায়েব এবং নাজিরীর সাথে তুলনা করা না চললেও কবি দাগ দেহলভীর সাথে অবশ্যই তুলনা করা যায়। কবি দাগ ও শিবলী উভয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকে মিষ্ট ভাষা ও প্রবাদ-

”اپنے چھوٹے بھائی مولوی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

۵. شیبلی کی کاسیدا چرچا

کاسیدا ساہتہ رچنا شیبلی کے لئے ایک نئے نئے میدان ہے۔ اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

پھر بہار آئی ہے، شاداب ہیں پھر دشت و چمن
بن گیار شک گلستان ارم پھر گلشن
شعلہ زن پھر چمنستان میں ہوئی آتش گل
پھر صبا چلتی ہے گلشن میں بچا کر دامن
آگ پانی میں لگادی ہے کسی نے شاید
حوض میں عکس گل و لالہ ہے یا جلوہ فگن^{۲۳}
”تارپر بستم اسے گئے

سبب آئے تارپر مرنے والی آواز چمن
بین گیار شک گلستان ارم پھر گلشن
شعلہ زن پھر چمنستان میں ہوئی آتش گل
پھر صبا چلتی ہے گلشن میں بچا کر دامن
آگ پانی میں لگادی ہے کسی نے شاید
حوض میں عکس گل و لالہ ہے یا جلوہ فگن^{۲۳}
”تارپر بستم اسے گئے

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

”انورجہاں بھائی مہدی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک شعر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے۔“^{۲۲}

وہ کامیاب رہے تھے۔ اس حالت میں اگر ان پر فاتحانہ غرور و تفاخر طاری ہو جاتا تو وہ کیا تعجب تھا۔ اس نشہ آور حالت کا بیان ان کے اپنے پر کیف الفاظ میں سنئے: ۲۹

“تذکالہ (۱۹۱۲ء) (شیخ الحدید شمس لکھو) چار دیکے آبول کالام آفاد، شبللی نومانلی اہو تادیر سمرفکدیر جیگان ہڈیل۔ تادیر ٱرطیفسگن کڈو آتوآگوٱن کرےڈیل۔ آنیکے تادیر کٹای ڈٹاوسا کرت۔ جاتیڈ نیتڈیر ٱے ڈیلا شبللی آبول کالام آفاد سہ سُر کرےڈیلن، سہ ڈیلاڈ تارا جیڈی ڈیلن۔ اڈتاتوڈڈای تادیر آتوآفساد آنوڈو ہوڈا آواک کڈو نڈ۔ تینی ڈوسلملیگەر ٱرطی ڈسڈت کرے نڈلڈوڈ ڈڈڈڈڈ کڈوڈاڈی لیکھن،

ہر چنڈ لیگ کا نفرنس واپسیں ہے اب
اس ٱستی دوروزہ ٱہ جس کو غرور تھا
وہ دن گئے کہ بت کڈے کو کہتے تھے حرم
وہ دن گئے کہ خاک کو دعوے نور تھا
وہ دن گئے کہ شان غلامی کے ساتھ بھی
ہر بوآلہوس ڈمار سیاست میں چور تھا^{۲۸}
“ٱرطی کڈیکڈی لیگەر ڈڈشآٱ اڈن فیرے اسیڈے
اڈ سڈڈر وٱر ڈوڈن کار ڈیل ڈڈڈان
سہی ڈن ڈلے گےڈے ڈڈن ڈڈڈکے ہارام بڈا ہڈ
ڈولو ہالکا ڈیل ڈن ڈلے گےڈے
گورب داسڈو سڈے اسیڈیل ڈے ڈن ڈلے گےڈے
ٱرطیڈ بڈلہوس ڈور راجنیڈتے ڈور ڈیل۔”

اڈب کڈوڈا شبللی ر ڈڈڈڈڈ و ڈیڈک کڈوڈ سآڈتے ٱارڈڈڈا ٱرڈاں کرے۔ اڈب ڈیڈک کڈوڈر آوےڈن کال-ٱرڈڈڈاڈ و شمس ہڈ نا۔ اڈ ٱرڈڈے ڈ. وڈیر آگار ڈڈڈا لڈڈڈی۔ تینی بڈلن، شبللی نڈڈی کی ڈڈت سی ٱڈڈیہ نڈڈی اس ڈیل کی ڈی کہ اگر ڈہ ان کا ڈوڈو ہڈگڈی وادعات کے سوا اور کڈھ نڈی، ڈاڈ ان کے ٱس ٱڈڈٹ ڈلوڈ کا اڈک اڈسا ڈر بے کراں ڈو ج ڈن ہے کہ وڈ ڈڈر جانیے کے باوڈوڈ ان کا ڈاڈر ڈنڈہ و ڈازہ ہے۔^{۲۹}

“شبللی نومانلی ر آنیک ڈیڈک کڈوڈ ڈڈڈڈ ڈڈڈنر آوڈرڈے رڈڈٹ ہڈو، اڈب ڈیڈک کڈوڈر ٱرڈاڈ ڈوڈوڈ ڈرے بڈڈان۔”

شبللی کڈوڈر جڈتے اڈک شڈڈڈان کڈوڈ ڈیلن۔ سڈکالینی کون کون کڈوڈ ڈڈڈڈ کون ڈک ڈیکے آڈرڈاڈی ڈیلن ڈڈے؛ ڈرے سآڈڈک ڈڈارے شبللی سہڈر ڈارار ڈارے ڈاڈر نڈاڈ کڈوڈر جڈتے شڑڈڈرڈر آسڈن آسینی ڈیلن۔

۹. شبللی نومانلی کڈوڈ ڈانڈی ڈوڈاڈلی

شبللی ڈیلن بڈڈوڈی ٱرطیڈر آڈکارلی۔ تینی اڈ ڈیکے ڈڈڈ ڈیلن اڈڈڈاسک، ٱرآڈک سیراڈ رڈڈیڈا و ڈارڈنک، آنڈ ڈیکے کڈوڈر جڈتے وڈرل سآڈلڈ ڈاڈای نڈڈکے اڈلڈڈت کرےڈن۔ سآڈتیر ڈڈڈانے تینی ڈڈو کڈوڈ ڈسے ڈڈاڈ اڈرڈن کرےڈن، ڈرے کڈوڈا رڈڈای نڈڈکے نڈوڈڈڈت رےڈیڈیلن۔ شبللی ڈرڈ، راجنیڈ، اڈڈاس ٱرڈڈر ڈر کڈوڈا رڈڈا کرےڈن۔ ڈڈڈوڈے کڈوڈا ڈڈن ڈیل ٱرڈ بڈرڈر کرڈڈ روڈنر ڈڈاڈن، ہآفڈ، رڈی آر سآڈر ڈرڈی رڈرر آنوکرڈے نڈرڈک ٱرڈڈا، شبللی ڈڈن آوڈرڈڈت ہن نڈ جآرڈے اڈسلاڈی آادشیر کڈوڈا نڈے۔^{۳۰}

اڈسلاڈی ڈڈڈر ڈاڈڈر آادشیر ٱرطیڈلن ڈڈان راسول سا۔ اڈ ڈڈاڈوڈاڈکے شبللی ڈاڈ رڈڈٹ “ڈولوڈے آوڈیڈ” شیڈک کڈوڈای ڈولے ڈرڈن اڈڈاڈے:

ڈنڈہ ڈیڈ ٱر ڈہ نڈشیں حرم بوسفیاں
لڈڈ ڈنڈہ جڈر آوار سے جو ہے ڈڈر
بارگاہ نبوی میں وہ بوڈی ڈب ڈاڈر
اس ارادے سے کہ ہو ڈاڈل اربآب ڈور

عرض کی خدمت اقدس میں کہ ائے ختم رسول
دین سلام ہے مجھکو یہ دل و جان منظور ۛ

“হিন্দা ছিল আবু সুফিয়ানের পর্দাশীলা স্ত্রী।

সমাজে যে ছিলেন “কলিজা খোর” উপনামে খ্যাত।

রাসূল সা. এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে যে আরজ করল হে শেষ রাসূল।

মনে প্রাণে আমি ইসলামে দিক্ষিত হতে চাই।”

উমর রা. ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর শাসক। নবীপুত্রের প্রতিফলনে মহানবী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, “লাওকানা বা’দী নবীয়াল্লাকানা উমর”। তিনি একদিকে যেমন ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আপোষহীন ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে সর্বদা সজাগ। তিনি ছদ্ম বেশে রাস্তার অলিগলি ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুদার জ্বালায় রাস্তায় কোন ভিক্ষারী কাতর হয়ে আছে কিনা? পেটের দায়ে কোন মানুষ বিপথগামী হচ্ছে কিনা? কোথাও কোন এতিম, শিশু, কোন বৃদ্ধ অসহায় ভুকা-নাঙ্গা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে কিনা? প্রত্যহ রাতের আধারে নিরবে চলাফেরা করে তা দেখতেন। ৛ প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতেন। প্রয়োজনে তার প্রতিকার করতেন। শিবলী তাঁর বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনাকে, خلافت

واقعه شيرك كويتى كالكى و فاروقى كالكى و واقعہ

৮. কবিতার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ

মাওলানা শিবলী প্রজাদের প্রতি উমরের দয়া ও মহানুভবতাকে “খেলাফতে ফারুকী কা এক ওয়াকিয়া” শীর্ষক কবিতায় এভাবে তুলে ধরেন।

بازار جا کے لئے سب اسباب آب و نان
کاز خم قحط کا سبب اند مال تھا
چولہے کے پاس بیٹھ کے خود پھونکتے تھے آگ
چہرہ تمام آگ کی گرمی سے لال تھا ۛ
“বাজারে গিয়ে তিনি আনলেন সব পানাহার।
যা ছিল দূর্ভিক্ষ যন্ত্রণার প্রতিকার।
চুলার পাশে তিনি ফুকেছিলেন আগুন,
আগুনের তাপে সারাটি চেহারা ছিল রক্তিম।”

দিনটি ছিল জুমার দিন। জুমার নামাযের সময় হলো। সুমিষ্টি আযানের ধ্বনীতে আকাশ বাতাস মুখরিত। সাবাই আযানের ধ্বনীতে মসজিদ পানে ব্যাকুল। ধনী গরীব, শিক্ষিত মুর্থ দলে দলে মন খুলে মসজিদের দিকে আসতে শুরু করল। ঈমানী প্রেরণায় সকলেই সারিবদ্ধভাবে বসে আছে। অধির আগ্রহ জামায়াতে অপেক্ষায়। খলিফা খুতবা পাঠ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সকলের দৃষ্টি খলিফার মুখের দিকে। খলিফা উমর এবং তার প্রজাদের পোষাকের তেমন কোন তফাৎ নেই। মুসলিম জাহানের শাসক খলিফা উমরের পরনে ছিল অন্তহীন কাপড়ের তালি লাগানো পোষাক থাকে। কিন্তু আজ খলিফার পোষাকের উপর অন্য একটি চাদর পরিধান করেছেন। বিষয়টি সকলের চোখে পড়লো। সবাই অবাক। উমর খুতবা আরম্ভ করবে। এমন সময় আওয়াজ আসলো আমিরুল মু’মিনীন একটি কথার জবাব আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে। খলিফা মিষ্টি মধুর কণ্ঠে বললেন, বলুন আমার কাজের কৈফিয়ত চাওয়া সকল মুসলিমদেরই অধিকার। অভিযোগকারী বললেন, আমরা এতদিন জানতাম যে, বায়তুল মাল থেকে সকলেই সমান অংশ পেয়ে থাকেন। আজ আমরা দেখতে পারছি যে, আপনি আপনার প্রাপ্য থেকে অধিক মাল গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রত্যেকে এক খণ্ড করে কাপড় পেয়েছি। কিন্তু আপনার নিকট অতিরিক্ত কাপড় আসলো কিভাবে? সঠিক জবাব না পেলে আমরা আপনার খুতবা শুনবো না। সেই সময় খলিফার পুত্র উঠে দাড়াইলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আজ আব্বাজানকে সমবেত সকলের সামনে জুমার খুতবা দিতে হবে বলে আমি আমার প্রাপ্য কাপড়টিকে তাকে দান করেছি। নতুবা তাঁর জামার পিছনের অংশ ঢাকা পড়তো না এবং ছেঁড়া দেখা যেত। প্রশ্নকারী লজ্জায় অবনত হয়ে পড়লেন। উমর তার ইতস্তবোধ দেখে বললেন, আপনি যা বলেছেন তার জন্য লজ্জিত হবার কিছু নেই। আপনার গর্ববোধ হওয়া উচিত। প্রত্যেক মুসলমানদের উচিত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে

মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। আমি ইসলামের একজন সামান্য সেবক মাত্র। আমি সত্যিই যদি কোন অপরাধ করে থাকি আর আপনারা খলিফা বলে আমার সমালোচনা না করতেন তাহলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে বিবেচিত হত। এরই নাম সাম্যবাদ। সুষম বস্তুনিষ্ঠতা, সুবিচার, উমরের এই আদর্শের ফলে ভুক্তাতুর তার খুদার জ্বালা মেটাতে পেরেছিল। দুগুণি মুখে ফুটে উঠেছিল মিষ্টি হাসি। সুখ আর শান্তির মহা উদ্যানে রূপ নিয়েছিল মুসলিম জাহান।

উমরের এই মানবীয় গুণটি শিবলী তাঁর “আদলে ফারুকী কা এক নমুনা” শীর্ষক কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

بولے یہ ابن عمر سب سے مخاطب ہو کر
اسمین کچھ والد ماجد کا نہیں جرم وصور
ایک چادر میں جو پورا نہ ہوا انکالباس
کر سکی اسکو گوارانہ مری طبع غیور
اپنے حصہ کی بھی مین نے انہیں چادر دے دی
واقعہ کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور^{۷۸}

“সবাইকে লক্ষ্য করে উমরপুত্র বললেন, মর্যাদাবান পিতার এতে নেই কোন দোষ, তাঁর অংশের চাদরে যখন পুরো হচ্ছিল না তাঁর পোষাক, সেইতে পারছিল না তা আমার সংবেদনশীল মেজাজ, দিয়ে দিলাম তাকে আমার অংশের কাপড়টুকু। এই হল মূল ঘটনা, যা ছিল লুকায়িত।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, জাহেলীযুগে যিনি ছিলেন ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। ইসলামে এসে তিনি হলেন সম্মানিত ও আদরনীয়। বংশ ও বর্ণে বৈষম্যের স্বীকার যে বিলাল রা. ছিলেন সমাজে উপেক্ষিত। সেই বিলাল ইসলামের ছায়াতলে এসে হয়ে গেলেন মর্যাদাসম্পন্ন।

ইসলাম বিলাল এর বর্ণ ও বংশের মূল্যায়ন করেননি। করেছে তাঁর আত্মত্যাগ ও মানবতাবোধের মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন করেছে ইসলামের প্রতি তাঁর বিসর্জনের। এটি ইসলামের মানবাধিকার ও সাম্যের মহাস্বীকৃতি। “মুসাওয়াতে ইসলাম” শীর্ষক কবিতায় শিবলী ইসলামের এই মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরেন। কবিতার কয়েকটি ছন্দ নিম্নরূপ:

بارگاہ نبوی کے جو موذن تھے بلال
کر چکے تھے جو غلامی میں کئی سال بھر
جو یہ چاہا کہ کریں عقد مدینہ میں گیں
جا کے انصار و مہاجر سے کہا کہ کھل کر
میں غلام حبشی اور حبشی زادہ بھی ہوں
یہ بھی سن لو کہ میرے پاس نہیں دولت و زر
ان فضائل پہ مجھے خواہش ترویج بھی ہے
ہے کوئی جسکو نہ ہو میری قرابت سے حذر
گردنیں جھک کے یہ کہتی تھیں کہ دل سے منظور
جسطرف اس حبشی زادہ کی اٹھتی تھی نظر^{۷۹}

“ বিলাল রা. ছিলেন মসজিদে নববীর মুয়াযযিন,
করেছিলেন তিনি গোলামী কয়েক বছর,
তিনি যখন বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করলেন,
তখন আনসার-মুহাজিরদেরকে এটা খুলে বললেন,
আমি হাবশী গোলাম এবং হাবশীর সন্তানও,
এটা জেনে নাও আমার কাছে নেই কোন সম্পদ,
এই সব দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি বিয়ে করতে চাই,
আছে কেউ যে আমার আপনজন হতে তার নেই কোন ভীতি।
মাথাগুলো নত হয়ে বলত মনে প্রাণে তাতে রাজি
যে দিকেই সেই হাবশী তাকাচ্ছিলেন, আশাছিল উত্তর একই।”

মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন খোদাভীরু ন্যায় পরায়ণ বাদশা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শের রূপায়ক। তাঁর জীবনের প্রতিটি অংশে তিনি ইসলামী ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতিচ্ছবিরূপে সর্বস্তরের মানুষের কাছে সম্মানিত।

ইতিহাস খ্যাত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সেই ন্যায় পরায়ণতার আদর্শিক ঘটনাকে শিবলী “আদলে জাহাঙ্গীর” শীর্ষক কবিতায় উপস্থাপন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই ধর্মীয় মানবীয় গুণকে “আদলে জাহাঙ্গীর” শীর্ষক কবিতায় শিবলী তুলে ধরেন এইভাবে:

مفتی دین سے جہانگیر نے فتوا پوچھا
کہ شریعت میں کسی کو نہیں کچھ جائے سخن
مفتی دین نے بخوف و خاطر صاف کہا
شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن
لوگ دربار میں اس حکم سے تھر اٹھے
پر جہانگیر کے آبرو پہ نہ بل تھانہ شکن
ترکوں کو یہ دیا حکم کہ اندر جاکر
پہلے بیبیگم کو کریں بسنتہ زنجیر و روسن
پھر اسی طر حسے کھینچ کے باہر لائیں
اور جلاد کو دیں حکم کہ ہاں تیغ بزن ۵۵

“মুফতি মহোদয় নির্ভয়ে পরিস্কারভাবে বললেন,
শরিয়ত বলে হত্যাকারীর শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা,
দরবারের লোকেরা এ আদেশে হতবাক হয়ে গেলেন,
জাহাঙ্গীরের চেহায়া ছিল না চিন্তার ছাপ,
তুর্কী সিপাহীদের স্ত্রীদেরকে আদেশ দিলেন,
অন্দর মহলে গিয়ে বেগমকে বেড়ি পরিয়ে টেনে বের কর,
আর জল্লাদকে দাও হুকুম তলোয়ার মারার।”

৮. উপসংহার

শিবলী নুমানীর রচনাবলীতে আমরা দেখতে পাই জাতির অতীত গৌরবের নিখুঁত ছবি। তিনি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যের ঝড়ে বয়ে যেতে দেননি। তিনি জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৃতপ্রায় ইতিহাসকে নতুন করে তুলে ধরেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতির অবস্থা এমন একটি ফুলের ন্যায়, যা অবশ্য শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তার সুগন্ধি এখনো অটুট। তিনি বলতে চেয়েছেন, জাতি অধোপতিত হয়ে গেলেও তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে পুনরুজ্জীবন লাভের ক্ষমতা। সেই পুনরুজ্জীবন লাভের পথই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জাতীয় ইতিহাসের পাতায়।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, *মুরাতবাহ কুরিয়াতে শিবলী* (আজমগড়: মার্নেফ প্রেস, ১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ৫৩।
- ^২ জাফর আহমদ সিদ্দিকী, *শিবলী কা শায়েরানা মরতবাহ* (আজমগড়: মার্নেফ প্রেস, ১৯০৫ খ্রি.), পৃ. ২১৩।
- ^৩ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, *হায়াতে শিবলী* (আজমগড়: মার্নেফ প্রেস, ১৯৪৩ খ্রি.), পৃ. ২২৩।
- ^৪ আব্দুস সালাম নদভী, *শিবলী কি ফারসি গজলে শিবলী নম্বর* (আলীগড়: ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১৪৩।
- ^৫ জাফর আহমদ সিদ্দিকী, *শিবলী কা শায়েরানা মরতবাহ* (আলীগড়: ১৯০৫ খ্রি.), পৃ. ২১৮।
- ^৬ তদেব, পৃ. ১৯।
- ^৭ তদেব, পৃ. ২০।
- ^৮ *শিবলী কা শায়েরানা মরতবাহ*, পৃ. ২২০-২২১।
- ^৯ শিবলী নোমানী, *শেরুল আযম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৪
- ^{১০} তদেব, পৃ. ৪৪।
- ^{১১} শিবলী নোমানী, *শেরুল আযম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।
- ^{১২} তদেব, পৃ. ২৪৫।

-
- ১৩ তদেব, পৃ. ৭৯।
- ১৪ তদেব, পৃ. ১৫৪।
- ১৫ তদেব, পৃ. ১৯।
- ১৬ জাফর আহমদ সিদ্দিকী, *শিবলী কা শায়েরানা মরতবাহ*, পৃ. ২২৫।
- ১৭ তদেব, পৃ. ২২৬।
- ১৮ ড. গিয়ান চন্দ্র, *উর্দু মাসনবী শিমালে হিন্দ মে*, ১ম খণ্ড (আলীগড়: আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৫৯।
- ১৯ *হায়াতে শিবলি*, পৃ. ১৫৩-১৫৪।
- ২০ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, *মাওলানা শিবলী উর্দু শায়ের কে লেবাসমে*, *কুল্লিয়াতে শিবলী উর্দু* (আলীগড়: মা'রেফ প্রেস, ১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ২০।
- ২১ আব্দুল লতিফ আযমী, *মাওলানা শিবলী কা মরতবাহ* (দিল্লি: শিবলী একাডেমী, ১৯৪৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৮।
- ২২ আফতাব আহমদ সিদ্দিকী, *শিবলী এক দাবিজন* (লাহোর: ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২১১।
- ২৩ কালিমুদ্দিন, *উর্দু শায়েরি পর এক নজর*, ২য় খণ্ড (পাটনা: পাটনা ইওয়ানে উর্দু, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৫৬।
- ২৪ তদেব, পৃ. ৫৭।
- ২৫ শায়েখ মোঃ আকরাম, *শিবলী নামা* (লাহোর: এদারায়ে সাকাফিয়াতে ইসলামিয়া, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৩৬।
- ২৬ তদেব, পৃ. ২৩৭।
- ২৭ তদেব, পৃ. ৪০৪।
- ২৮ ড. উযিরে আগা, *উর্দু আদব মে তনযওমযাহ* (দিল্লি: এতেকাদ পাবলিকেশন হাউজ, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৪১৬।
- ২৯ তদেব, পৃ. ৪১৭।
- ৩০ শিবলী নোমানী, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ৩৬।
- ৩১ *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, ১ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৪৫।
- ৩২ নবী আহমদ সুহা, *আসহাবে রাসূল আওর উন কে কারনামে*, ১ম খণ্ড (লাহোর: তারিখবিহীন), পৃ. ১৬৭।
- ৩৩ তদেব, পৃ. ১৬৮।
- ৩৪ তদেব, পৃ. ৪২।
- ৩৫ তদেব, পৃ. ৩৯।
- ৩৬ তদেব, পৃ. ৪৭-৪৮।

সাদাত হাসান মন্টো ও তাঁর ছোটগল্প [Saadat Hasan Manto and his Short Stories]

মো. নূর মোহাম্মদ*

[Abstract: Saadat Hasan Manto (1912-1955 AD) is one of the non-communal, liberal and progressive writer of Urdu literature. He is at a time short story writer, journalist and cinema script writer. He became famous mainly as a short story writer of Urdu. His plot and characters are based on the contemporary political, social, psychological and contexts. In writing he protested the repressions and cruelties happened during the riot of 1947 partition. People of lower classes and professional dancer, prostitutes and gamblers got place in his stories. Riot, envy, barbarity and above all out burst of human instinct are portrayed in his stories. He continued writing ignoring the inhibition from religion, society and state. As a result he suffered in jail order the charge of spreading obscenity. His stories are treated as human documents. Perhaps no other writer's works before Manto addressed cruelty and the persecution of the rootless people. In the present article the themes of Manto's short stories are draft with.]

Keywords: Saadat Hasan Manto, Short Stories.

১. ভূমিকা

পৃথিবীর আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দু অন্যতম। এ ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ উভয়টি ভারতীয় উপমহাদেশে। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় উর্দু সাহিত্য দীর্ঘদিন কাব্য নির্ভর ছিল। প্রাথমিক উর্দু গদ্যসাহিত্য অনেকটা কেচ্ছা-কাহিনি, উপাখ্যান ও রূপকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জীবন নির্ভর উর্দু গদ্যসাহিত্য সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) পর আরম্ভ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাহিত্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের পরিবর্তনে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। মূলত তাঁর হাত ধরেই আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি তৈরী হয়। তাতে পূর্ণরূপ দেন মির্খা গালিব। তা আরো অগ্রসর হয়ে ডিপুটি নযীর আহমদের মাধ্যমে উর্দু উপন্যাসের জন্ম হয়। উর্দু ছোটগল্পের জন্ম হয় রাশেদুল খায়রীর হাত ধরে। ছোটগল্পে এগিয়ে আসেন মুন্সী প্রেমচান্দ এবং সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম। উর্দু সাহিত্যে প্রগতিশীলতার আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সাজ্জাদ জহির সম্পাদিত গল্পসংকলন ‘অঙ্গারে’ প্রকাশের পর। অতঃপর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সাজ্জাদ জহিরের নেতৃত্বে ‘অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন’ নামক প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের একটি সংগঠন গঠিত হয়। এ সংগঠনের লেখকদের মাধ্যমেই মূলত উর্দু সাহিত্যে বিশেষ করে উর্দু ছোটগল্পে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আরম্ভ হয়। ফলে উর্দু ছোটগল্পের ভাণ্ডার সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত হতে থাকে। উর্দু ছোটগল্পের এ যুগকে সমৃদ্ধির যুগ বলা হয়। এ সংগঠনের অন্যতম লেখক ছিলেন সাদাত হাসান মন্টো। তিনি একাধারে লেখক, সাংবাদিক এবং সিনেমার স্ক্রিপ্ট রাইটার। তিনি মূলত উর্দু ছোটগল্পকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে তাঁর গল্পের কাহিনি ও চরিত্র নির্বাচন করেছেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ঘটে যাওয়া নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিবাদ করেছেন কাগজে-কলমে। তাঁর গল্পে বাইজি, পতিতা, জুয়ারি এবং সমাজের নিম্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্থান পেয়েছে। দেশভাগ প্রসূত দাঙ্গা, হিংসা, বর্বরতা, সর্বোপরি মানুষের প্রবৃত্তির উন্মাদনা তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে। ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্রের নানাবিধ বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে লিখেছেন অনবরত। ছিন্নমূল মানুষের জীবনের নিষ্ঠুরতা ও চাপা-কান্না সম্ভবত, মন্টোর আগে আর কোনো লেখকের রচনায় রক্ত-মাংসে ফুটে ওঠেনি। তাঁর গল্পগুলোকে মানবতার দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

* এম.ফিল গবেষক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

২. সাদাত হাসান মান্টো ও তাঁর ছোটগল্প

গদ্য সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বাধুনিক শাখার নাম হলো ছোটগল্প। যার মাধ্যমে মানব-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের খণ্ডিত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ছোটগল্পে মানুষের সুক্ষ্ম জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়। আদিম যুগের গুহাবাসী থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের মানুষের কাছে আজও সাহিত্যের এ শাখা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উর্দু ভাষায় ‘আফসানা’ (افسانہ) শব্দের অর্থ গল্প, কাহিনি। ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করা কঠিন। লেখক ও সমালোচকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অনেকে বলেন, “ছোটগল্প বলতে এমন এক কাহিনিকে বুঝায়, যা কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এক অথবা একের অধিক চরিত্র নিয়ে পরিক্রম করে”।^১ কোথাও ছোটগল্পের বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য হলো উপন্যাসের ক্যানভাস বা পট থেকে ছোটগল্পের ক্যানভাস ছোট হয়ে থাকে এবং জীবনের কোন একটি খণ্ড, মুহূর্ত কিংবা ঘটনা নিয়ে ছোটগল্প রচিত হয়।^২ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ভারতীয় সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের সান্নিধ্যে এসে সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন, তখনই উর্দু গদ্য-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় উর্দু ছোটগল্পের সূচনা ঘটে।^৩ বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) পর ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তনে উর্দু সাহিত্যও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের পরিবর্তনে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.)।^৪

প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সাজ্জাদ জহির সম্পাদিত গল্পসংকলন ‘অঙ্গারে’ প্রকাশের পর। বইটি প্রকাশিত হলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও সমর্থকদের প্রতিবাদের ফলে সরকার তা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নিষিদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে ‘অঙ্গারে’ এর লেখক ও সমর্থকেরা বইটি নিষিদ্ধের প্রতিবাদ ও বিবৃতি দিয়ে ‘লিগ অফ প্রোগ্রেসিভ অথরস’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। পরে এটিই নাম পরিবর্তন করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ‘অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন’ এ রূপ নেয়। এ সংঘের প্রাণপুরুষ ছিলেন সাজ্জাদ জহির। প্রগতিশীল লেখক সংঘের সদস্যদের মধ্যে সাজ্জাদ জহির, হাসরত মোহানি, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, মাহমুদ-উজ-জাফর, ড. রশিদ জাহাঁ, ড. আলিম, মৌলবী আবদুল হক, আবেদ হোসাইন, সাদাত হাসান মান্টো, কৃষ্ণ চন্দর, ইসমত চুগতাই প্রমুখ।^৫ প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের ফলে ছোটগল্পে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আরম্ভ হয় ফলে উর্দু ছোটগল্পের ভাণ্ডার সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত হতে থাকে। উর্দু ছোটগল্পের এ যুগকে সমৃদ্ধির যুগ বলা হয়। এ যুগের অন্যতম ছোটগল্পকার হলেন সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫ খ্রি.)।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের উর্দু সাহিত্যের অসম্প্রদায়িক, উদার ও প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে সাদাত হাসান মান্টো ছিলেন অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম সাদাত হাসান মান্টো উপাধি। মান্টো ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে, তৎকালীন ব্রিটিশভারতে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সাম্বারাদা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী।^৬ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর দাদা খাজা জামাল উদ্দীন কাপড়ের ব্যবসার উদ্দেশ্যে লাহোরে চলে যান এবং কিছুদিন পর লাহোর থেকে অমৃতসরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী গোলাম হাসান। তিনি পেশায় একজন বিচারক ছিলেন। মান্টোর পড়াশুনা শুরু হয় অমৃতসরের মুসলিম স্কুলে। তিনি ছোটবেলা থেকেই উদাসীন ও ভবঘুরে স্বভাবের ছিলেন। ক্লাসের পাঠ্য বইয়ে তার মন বসতো না। এই অমনোযোগিতার কারণে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দু’বার ব্যর্থ হয়ে তৃতীয়বারের প্রচেষ্টায় এফ. এ পাশ করেন। গল্প-উপন্যাসের বই পড়ার প্রচুর ঝোঁক ছিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলেজে পড়াকালীন অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্থির পরিবেশ এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাবা মারা গেলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েন।

পিতার মৃত্যুর পর মান্টো পড়াশুনার ইতি টেনে অমৃতসরে ‘মুসাওয়াত’ পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই চলে যান এবং সেখানে সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘মুহাব্বির’ এ লেখালেখির কাজ শুরু করেন। এরপর ‘অল ইন্ডিয়া রেডিওতে দীর্ঘদিন নাটক, গল্প এবং সিনেমার সংলাপ লেখেন। এখান থেকেই তিনি আন্তে-আন্তে গল্পকার হিসেবে সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন।^৭ তাঁর শৈশব এবং কৈশর পারিবারিক অনুশাসনের মধ্যে কাটলেও তাঁর স্বভাবসুলভ জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। কেননা তাঁর

প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে মান্টো নামটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত-সমালোচিত। তাঁকে কেউ প্রগতিশীল বলতো আবার কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীলের তকমা লাগাতো। তাঁর গল্পগুলোকে কামোত্তেজক, সামাজিক অবক্ষয়মূলক ও অশ্লীল লেখা হিসেবে পরিগণিত করতো। তাঁকে নোংরা লেখক হিসেবেও সাব্যস্ত করতো। আবার অনেকেই জীবনের বিচিত্র বাস্তবতাকে সাহসিকতার সাথে তুলে ধরার জন্য তাঁকে একজন প্রকৃত গল্পকার হিসেবে সাদরে গ্রহণ করতো। মান্টোর গল্পের চরিত্রগুলোকে তাঁর সমকালীন জীবনমান থেকে আলাদা করা যাবে না। তাঁর বিখ্যাত এবং অখ্যাত গল্পেও সামান্যতম কমতি নাই। কিছু দুর্বল গল্পকে পুঁজি করে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল তকমা দেওয়া পুরোপুরি অবিচার। কেননা, তাঁর গল্পে জীবনের চরম বাস্তবতার সকল রসদ মজুদ, যা প্রগতিশীল লেখনির জন্য যথার্থ। এ সম্পর্কে খলিলুর রহমান আজমী বলেন,

"منٹو کے نظریات کو سامنے رکھ کر جو اس کے دورِ آخر کی پیداوار تھے اس کے سارے کارناموں کو رجعت پسند قرار دینا یا ادبی حیثیت سے مسترد کر دینا درست نہ ہوگا۔ اس کے صالح عناصر اور اس کی وہ بے لاگ حقیقت نگاری جو سماج کی بعض اہم حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اسے ترقی پسند افسانہ اپنی روایت بنا کر رہے گا۔"^{۵۰}

“মান্টোর শেষ জীবনের সৃষ্টিকে সামনে এনে তাঁর পুরো জীবনের কর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা দেওয়া অথবা সাহিত্যবিচারে রহিত করে দেয়া ঠিক হবেনা। তাঁর সংস্কারমণা চিন্তা-ভাবনা এবং নির্ভীক সত্যোচ্চারণ যা সমাজের কিছু বাস্তবতা উন্মোচন করেছে। তাঁকে প্রগতিশীল গল্পের মর্যাদা এনে দিয়েছে।”

লেখক হিসেবে সাদাত হাসান মান্টো গদ্যসাহিত্যের কমবেশি সব শাখায় কলম ধরেছিলেন। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা কোথাও ১৯টি, আবার কোথাও ২৬টির বর্ণনা পাওয়া যায়। রচিত মোট ছোটগল্পের সংখ্যা ২৩৩টি, প্রবন্ধ সংকলন ৩টি, নাট্যসংকলন ৫টি, উপন্যাস ১টি, জীবনী সাহিত্য ২টি এবং ৮টি ফিল্মের কাহিনি লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথিতযশা এই গল্পকার জীবনযুদ্ধে বহু চড়াই-উতরাই পার করে ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের লাহোরে পরলোক গমন করেন। তাঁকে মিয়ানী সাহেব কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।^{৫১} বেঁচে ছিলেন মাত্র ৪৩ বছর। এই অল্প সময়ে লিখেছেন অসীম সাহসিকতার সাথে প্রবল উদ্যমে। সমকালীন যুগ মানসকে ধারণ করে সুনিপুণ ও শিল্পিক উপস্থাপনে মান্টো ছিলেন উর্দু ছোটগল্পের প্রবাদ পুরুষ। নানা ভাষার গল্পের বিষয়বৈভব ও আঙ্গিক তাঁর গল্পে পরিলক্ষিত হয়। তিনি গল্প রচনা করেছেন রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে। রোমান্টিক গল্প রচনা করলেও তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। নিম্নে তাঁর ছোটগল্প সংকলনসমূহের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো:

৩. সাদাত হাসান মান্টোর ছোটগল্প সংকলনসমূহ

১. আতিশ পারে (آتش پارے) ১৯৩৬, ২. মান্টোকে আফসানে (منٹو کے افسانے) ১৯৪০, ৩. ধোয়া (دھواں) ১৯৪৩, ৪. আফসানে আওর ড্রামে (افسانے اور ڈرامے) ১৯৪৩, ৫. চুগদ (چغد) ১৯৪৮, ৬. লুঘত সংগ (لغت بونلیس خالی ڈبے) ১৯৪৮, ৭. সিয়াহ হাশিয়ে (سیاہ حاشیہ) ১৯৪৮, ৮. খালি বুতলے খালি ডাকের (خالی بوتلیں خالی ڈبے) ১৯৪৮, ৯. গাঠা গোসত (گھاٹا گوشت) ১৯৫০, ১০. নমরুদ কি খুদায় (نرد کی خدائی) ১৯৫০, ১১. বাদশাহত (بادشاہت کا خاتمہ) ১৯৫১, ১২. ইয়াযিদ (یزید) ১৯৫১, ১৩. সড়ক কে কিনারে (سڑک کے کنارے) ১৯৫৪, ১৪. সারকুণ্ডো কে পিছে (سرکونڈوں کے پیچھے) ১৯৫৪, ১৫. ফুন্দ নে (پھند نہ) ১৯৫৫, ১৬. বরক্বে (برقے) ১৯৫৫, ১৭. শিকারী আওরাতے (شکاری عورتیں) ১৯৫৫, ১৮. বেগায়র এজাযত (بغیر اجازت) ১৯৫৬, ১৯. রতি মাশা তোলা (رتی ماشہ تولہ) ১৯৫৬, ২০. গাঞ্জ ফেরেশতে (گنجے فرشتے) ১৯৫৬, ২১. গুলাব কা ফুল (گلاب کا پھول) ১৯৫৬, ২২. কালি শালওয়ার (کالی شلوار) ১৯৫৬, ২৩. তলখ তরশ শিরি (تلخ ترش شیریں) ১৯৫৬, ২৪. উপর নিচে (اوپر، نیچے) ১৯৫৬, ২৫. ককট (کوکٹ) ১৯৫৬, ২৬. আনার কলি (انار کلی) ১৯৫৬

সাদাত হাসান মান্টোর প্রথম ছোটগল্প ‘তামাশা’ (১৯৩৪ খ্রি.)। ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এই গল্পটি রচনা করেন। পরবর্তীতে আরো সাতটি গল্পসহ তাঁর প্রথম গল্পসংকলন আতিশ পারে (آتش پارے) ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।^{৫২} তিনি যেমন প্রগতিশীল লেখক দলে ভিড়তে দেরি করেননি

তমেন এই সংঘের ছাঁচে বাঁধা রীতিনীতিতেও আটকে থাকেননি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নৃশংসতা সমক্ষে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কলম ধরেছেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বেড়া জাল ভেদ করে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর অত্যাচারিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগের সময়কার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নির্মম বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন কাগজে-কলমে। মানুষের মন আর সমাজের নানা দিক তুলে আনতে তাঁর জুড়ি নাই। যা দেখেছেন তাই হুবহু তুলে ধরেছেন।^{১৭} মাস্টো ছিলেন সময়ের সাহসী কণ্ঠস্বর। তাঁর গল্পে বাইজি, পতিতা, জুয়ারি, ধোপা, মালি থেকে শুরু করে খেটে খাওয়া দিনমজুরও স্থান পেয়েছে। তিনি সমকালীন সমাজে চলমান যৌন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন ‘কালি শালুওয়ার’ এবং ‘হতক’ গল্প দুটিতে। এ গল্প দুটির মূলচরিত্র যথাক্রমে সুলতানা এবং সুগন্ধি। দুজনেই ছিল পতিতা। এই পতিতাদের চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের যে বাস্তবচিত্র এঁকেছেন তা সমালোচকগণ প্রকৃত সমাজ বাস্তবতা অবলোকন না করেই গল্প দুটিকে অশ্লীলতার শুলে চড়িয়ে দেয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ‘কালি শালুওয়ার’ প্রকাশিত হওয়ার পর যখন নিষিদ্ধ হয়, তখন এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে তার এক প্রবন্ধে (মুঝে ভি কুছ কেহ্না হে) এভাবে বলছেন:

"اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشیہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کو مٹائیے اس کا ذکر خود بخود مٹ جائے گا۔" ^{۱۷}

“যদি পতিতাদের সম্বন্ধে লেখা অশ্লীল হয় তাহলে সমাজে তাদের অস্তিত্ব থাকাও অশ্লীল। যদি তাদের নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ হয় তাহলে তাদের পেশাও নিষিদ্ধ হতে হবে। পতিতা পেশা হতে তাদের দূরে রাখেন তাহলে তাদের আলোচনাও আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।”

মান্টোর জীবন চলার পথ বেশি মসৃণ ছিল না। ভারতবিভাগের পূর্বাপর চারপাশের নিরীহ মানুষের ভয়াবহ চিংকার তাঁর জীবনকে আতঙ্কিত করেছিল। তাই তিনি আশপাশের ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনাবলী হুবহু তুলে ধরেছিলেন যা শাসকের চক্ষুশূলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ‘ঠান্ডা গোশত’, ‘ধোঁয়া’, ‘কালি শালুওয়ার’, ‘খোল দো’, ‘উপর নিচে দরমিয়ান’ এবং ‘বু’ গল্পগুলো লেখার অপরাধে তাঁর উপর কয়েকবার মামলা হয়েছিল এবং জরিমানা আরোপ করেছিল।^{১৯} তাঁর ক্ষুরধার লেখার কারণে বার বার আদালতে জবাবদিহিতার জন্য আসা-যাওয়া করতে হতো। তিনি এতো পরিমাণ হয়রানির পরেও সমকালীন সমাজবাস্তবতার সঠিক চিত্র তুলে ধরতে যথাযথ শব্দ ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। যেখানে যা দেখেছেন তা কোন প্রকার ঘষা-মাজা ছাড়াই খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। তাঁর এমন বর্ণনা সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের চোখে অশ্লীল মনে হতো। তাঁর গল্পে অশ্লীলতার অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন,

"زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر اس سے نا وقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتروں گا جو ہے ہی ننگی۔ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اسلئے کہ یہ میرا کام نہیں درذیوں کا ہے۔" ۶۰

“যে যুগের মধ্য দিয়ে আমরা অতিবাহিত করছি সে যুগ সম্পর্কে যদি আপনি অবহিত না থাকেন তাহলে আমার গল্পগুলো পড়ুন। যদি আপনি গল্পগুলোকে সহ্য করতে না পারেন তাহলে এর মানে হলো সেই জামানাই অসহনীয়। আমার লেখাতে যে দোষ প্রকৃত অর্থে তা ঐ যুগের। আমার লেখায় কোন মন্দ নাই। আমি ধর্ম এবং সমাজের মুখোশ কি আর উন্মোচন করবো যা আগে থেকেই উলঙ্গ। আমি অবশ্য তাতে পোশাক পরিধান করানোর চেষ্টাও করিনি, কেননা এটা আমার কাজ নয়, এ কাজ দর্জির।”

যৌন সম্পর্কিত বিষয় হলো জীবনের তিজ্জ বাস্তবতাগুলোর মধ্যে একটি। মান্টো একজন বাস্তববাদী লেখক। তিনি কিভাবে সে বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চলবে? খারাপ বিষয়গুলো তিনি শুধু নিজে মজা নেয়া কিংবা পাঠকের সস্তা বিনোদনের খোরাক হিসেবে উপস্থাপন করেননি, তিনি সমাজের চারপাশের সেই কলুষতাকে দূর করার জন্য উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দুটি পদ্ধতির ধারণা দিয়েছেন। প্রথমত কলুষিত বিষয়ের উপর মাটিচাপা দেয়া, তাতে করে তা দৃষ্টির অগোচরে থাকবে এবং তা থেকে আর দুর্গন্ধ নিঃসৃত হবে না, সেটা স্বস্থানেই চাপা থাকবে। দ্বিতীয়ত কলুষিত বস্তুর দিকে নজর দাও, অপরকে দেখাও, তার বিরুদ্ধে ঘণা

জন্মাও এভাবে সেটার বিনাশ হবে। মান্টো দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।^{২১} তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো সমকালীন প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি। তিনি মানুষকে পাপী মনে করত না। তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত মানবজাতি সৃষ্টি থেকেই নিষ্পাপ হয় কিন্তু তারা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে দিনাতিপাত করে তার কড়াল গ্রাস হতে বাঁচার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পাপের জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। এটাই তাদের ভাগ্য।^{২২} তাঁর এই চিন্তার প্রকাশ ঘটে ‘লাইসেন্স’ গল্পে। এ গল্পের মূল নারীচরিত্র একজন সংসারী নারী, যার নাম নীতি। মান্টো এ গল্পে সতি-সাধবী নীতি কি কারণে পতিতা পেশার মত জঘন্য পাপের পথে পা বাড়ালেন, তা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তুলে ধরেছেন। দেশভাগ প্রসূত হিংসা, বর্বরতা যে মানুষের গহীন অন্ধকার কুঠরি থেকেই উঠে আসে মান্টো তা জানেন। তাই তাঁর গল্পে কোনো আশাবাদ নেই। ‘শরিফন’ গল্পের কাসেম তার কন্যা শরিফনের উলঙ্গ মৃতদেহ দেখে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে এক হিন্দু কন্যা বিমলাকে যেভাবে হত্যা করে তার পেছনে কোনো মতাদর্শ নাই, আছে শুধু অন্ধ প্রবৃত্তি আর প্রতিশোধম্পৃহা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে মানুষের প্রবৃত্তির উন্মাদনা কেমন করে ফুটে উঠেছিল ‘শরিফন’ গল্পে তারই বর্ণনা পাওয়া যায়।

সাদাত হাসান মান্টো তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোতে কখনো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থার উপর সজোরে ধাক্কা দিতেন এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করতেন। যেমন ‘হতক’, ‘বু’, ‘ধোঁয়া’, ‘সড়ক কে কিনারে’, ‘শারদা’ এবং ‘ফুন্দ নে’ ইত্যাদি। আবার কখনো সাদাসিদেভাবে তুলে ধরতেন। যেমন ‘কালি শালুওয়ার’, ‘বাবু গোপীনাথ’, ‘মাম্মি’ এবং ‘মুহম্মদ ভায়ি’ ইত্যাদি। আবার কখনো নাটকীয়তার সাথে ছোটগল্পের ভাবধারায় ফিরেছেন। যেমন ‘ঠাণ্ডা গোসত’, ‘গোর মুখ সিং কি ওছিয়ত’, ‘১৯১৯ কি বাত’, ‘শরিফন’, ‘জানকি’ ইত্যাদি। কখনো কখনো পাঠককে চরিত্রের সেই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাতেন যেখানে পাঠকের স্বাসরুদ্ধ করা ই ছিল আসল উদ্দেশ্য। যেমন ‘খোল দো’, ‘মোয়াইল’, ‘টোবাটেক সিং’ ইত্যাদি গল্পে। কিছু গল্প আবার শুরু থেকে শেষাবদি শুধু সংলাপ নির্ভর ছিল। যেমন ‘উপর নিচে আওর দরমিয়ান’, ‘হজামত’, ‘ডো ডো’, ‘সংগিন’ ইত্যাদি।^{২৩}

‘খোল দো’ (খুলে দাও) গল্পে বৃদ্ধ সিরাজ উদ্দিন তার ১৭ বছরের কাছাকাছি সুন্দরী মেয়ে সাকিনাকে হারিয়ে খুবই চিন্তিত। মেয়েকে খুঁজে পেতে সাহায্যের জন্য মরিয়া সিরাজ উদ্দিন রাজাকার আট যুবকের কাছে মেয়ের শারীরিক বিবরণ দিলেন। তারাও খুঁজে দেয়ার ভরসা দিল। খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে তারা মেয়েটিকে পেল এবং তাদের কাছে রাখল। বৃদ্ধ সিরাজ তার মেয়ের খোঁজ নিতে ক্যাম্পে গেলে তারা অস্বীকার করে এবং দ্রুত খুঁজে বের করে দেয়ার আশ্বাস দেয়। কিছুদিন পরে রেললাইনে বেহুশ পরে থাকা অবস্থায় লোকজন একটি মেয়েকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়। সিরাজ উদ্দিনও পিছে পিছে যায় এবং তার মেয়েকে চিনতে পায়। সাকিনাকে মৃত ভেবে স্ট্রেচারে রাখা হয়। তার বাবা সাকিনার পা নড়তে দেখে চিৎকার দিয়ে বলে, সাকিনা জীবিত! অতঃপর ডাক্তার ঘরের আলো বাড়ানোর জন্য জানালা খুলে দিতে বলে, খোল দো। তখন মৃত প্রায় সাকিনা ‘খোল দো’ শব্দটি শোনার সাথে সাথে তার শালুওয়ারের ফিতা খুলে নিচে নামিয়ে দেয়। এটা দেখে ডাক্তারের সর্বশরীর ঘামে ভিজে যায়। ‘সহায়’ (সহযোগিতা) গল্পে একদল লুটেরা এক ধনী ব্যক্তির বাড়ি লুটের জন্য শোরগোল করে এগিয়ে আসছে। গেটের তালা ভাঙ্গার উপক্রম তখন পাতলা-রুগ্ন একটি লোক তাদের ভিড় থেকে এসে তালা খুলে দিলেন। তিনিই মালামাল লুটের জন্য সবরকম পরামর্শ দিচ্ছেন। শেষের দিকে যখন লুটেরাদের উপর কুকুর আক্রমণ করলো তখন সবাই পালালো। কেবল কুকুর কামড়িয়ে ধরে থাকা লোক আর সেই রুগ্ন লোকটি রয়েছে। কামড়ে আহত হওয়া লোকটি পাতলা-রুগ্ন লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, কে আপনি? লোকটি বলল: আমি এই বাড়ির মালিক। একজন মানুষ কতটা অসহায় হলে নিজের বাড়ি ডাকাতিতে সহযোগিতা করতে পারে? আরেকটি গল্প হলো ‘আপ্যায়ন’। একদল লোক মাঝপথে একটি গাড়ি থামিয়ে অন্য ধর্মের লোকদের হত্যা করল আর বাকি যাত্রীদের হালুয়া, দুধ এবং ফল দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। গাড়ি ছাড়ার আগে তাদের সরদার এসে বাকি যাত্রীদের বলল: গাড়ি আসার খবর দেয়িত পেয়েছি তাই আপনাদের সেরকম আপ্যায়ন করতে পারলাম না।

মান্টোর কিছু গল্প খুবই ছোট ছিল। কোনো গল্প এক পৃষ্ঠা, কোনোটা দেড় থেকে দুই পৃষ্ঠা আবার কোনোটা মাত্র কয়েক লাইনের। সেখানে মান্টো স্বমহিমায় হাজির হয়েছেন তাঁর গল্পের ঘটনায় আকর্ষকতা, অসহায়ত্ব, মানবিক বিপর্যয়, নাটকীয়তা, রক্ত হিম করা রসিকতা এবং চমকে দেওয়ার মত সমাপ্তি নিয়ে। সাতচল্লিশ

এর দেশভাগের পূর্বাপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সমাজে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। পদে পদে মানবতা ভুলুপ্তি হচ্ছিল সে সম্পর্কে অনেক কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কলম ধরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাদাত হাসান মন্টো। তাঁর লেখায় সামাজিক মানবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মুহাম্মদ হাসান আসকারী, তাঁর গল্পগুলোকে ‘মানবতার দলিল’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।^{২৪} সাদাত হাসান মন্টো একজন জবরদস্ত ছোটগল্পকার ছিলেন। গল্প লেখার জন্য কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করতে হতো না, লাগাতার লিখে যেতেন। এমনভাবে অনবরত লিখতেন মনে হতো তাঁর উপর ছোটগল্প নাযিল হচ্ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায়,

میں افسانہ نہیں لکھتا۔ افسانہ مجھے لکھتا ہے۔^{۲۵}

আমি গল্প লেখিনা, গল্পই আমাকে লেখে

তিনি যাপিত জীবনে প্রচণ্ড অর্থকষ্টে ভুগছিলেন। ১৯৪৭ এর দেশভাগের কারণে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মান্টোকে স্বপরিবারে পাকিস্তানে যেতে হয়। সেখানে স্বাভাবিক জীবন ধারণ করাই কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাঁর সংসারের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ছিল লেখালিখি। পাকিস্তান গমনের পর সে পথও অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অভাব-অনটনের ফলে তিনি পত্রিকা সম্পাদকের কাছে কখনো অগ্রীম টাকা ধার নিতেন। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো মান্টো শুধু তাঁর গল্পের সমাহার বাড়ানোর জন্য গল্প লেখেননি, লেখেছেন তাঁর ধার নেয়া টাকা পরিশোধের খাতিরে। সে সমন্ধে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

افسانہ میرے دماغ میں نہیں جیب میں ہوتا ہے کیونکہ میں افسانے کے پیسے پیشگی لے چکا ہوتا ہوں۔ اب لکھنا میرا اخلاقی اور پیٹہ ورائہ فرض ہو جاتا ہے اور پھر لکھنے کی انگیخت اور السابٹ خود بخود ہوتی ہے۔^{۵۷}

“গল্প আমার মগজ থেকে নয় পকেট থেকে আসে। কেননা আমি গল্পের জন্য অগ্রীম টাকা নিয়েছি। এখন আমার জন্য গল্প লেখাটা নৈতিক এবং অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়িছে। অতঃপর লেখালিখির বিষয়টি এমনভাবেই জঘত হয়েছে।”

অনেক বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক তাঁর লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনও সময় গেছে মাস্টো সম্পাদকের সামনে বসে গল্প লেখে দিতেন নিমিষেই। গল্প লেখা তাঁর জন্য দৈনন্দিন কাজের মতোই ছিল, যেমনটা জীবনের অন্যান্য কাজ ঘুমানো, গোসল করা, খাওয়া এবং সিগারেট ফুকা ইত্যাদি। তাঁর এক অনুসারী জগদীস চন্দ্র ধাওয়ান এর বর্ণনায়:

"ان کی رگوں میں گویا خون نہیں روشنائی رواں دواں تھی۔ تخیلات گھٹابن کر آتے اور ان کا قلم برس پرتا۔"^{۲۹۱}

“মনে হয় তাঁর শিরা-উপশিরায় রক্ত নয়, লেখার রসদ বহমান ছিল। সৃষ্টিশীল কল্পণাসমূহ মেঘপুঞ্জ হয়ে তাঁর মাথায় আসতো আর কলম বর্ষণ করতো।”

মান্টো ছিলেন একজন প্রথিতযশা ছোটগল্পকার। তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মত তাঁর অবস্থান সমন্ধে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নিজের লেখনি শক্তিমত্তার জন্য গর্ববোধ করতেন। তিনি মারা যাবার কিছুদিন আগে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট নিজের কবরের ইপিটাফ লিখে গেছেন এভাবে:

" یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے۔ اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منوں مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔" ^{۲۶}

“সাদাত হাসান মান্টো এখানে সমাহিত। তাঁর সিনায় গল্প লেখার সমস্ত গোপন রহস্য মাটিচাপা পড়ে আছে। সে আজও মাটির নিচে ভাবছে, সে (মান্টো) বড় গল্পকার না খোদা?”

8. উপসংহার

অবিভক্ত ভারতবর্ষে তৎকালীন সমাজ কাঠামোয় রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সমাজের যে অচল অবস্থা বিরাজ করছিল তাই সাদাত হাসান মন্টোর চোখে ধরা পড়েছিল। ভারতবিভাগের সময়কার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সমাজে নীতি-নৈতিকতার প্রকট অভাব বোধ করতেন। তিনি সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের কুশাসনের সমালোচনা করেছেন গল্পের মাধ্যমে। নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে সমাজে সংঘটিত অপরাধের বর্ণনা করেছেন এবং তা থেকে মুক্তির পথও বাতলে দিয়েছেন। সাহিত্য প্রতিভা যে কোনো বাধাধরা নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য নয় তা তাঁর ছোটগল্পের

বিষয়বস্তু এবং চরিত্রগুলোর ধরণই প্রমাণ করে। তিনি পরিবার, ধর্ম এবং রাষ্ট্রের সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে লিখে গেছেন অকুতোভয় সৈনিকের মত। আর সে কারণেই দেশ-কাল অতিক্রম করে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন প্রখ্যাত কথাশিল্পী; সার্থক উর্দু ছোটগল্পকার।

তথ্যনির্দেশ

- ১ ড. আনিস আল-মাকদিসী, *আল-ইত্তিজাহাতুল আদাবিয়াহ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪৫
- ২ মালেকা এজায়, *নকুশ-এ আদাব* (নয়া দেহলী: এস. এইচ অপসেট প্রেস, ১৯৯৭), পৃ. ২৮৯
- ৩ মমতাজ শিরীন, *উর্দু আফসানে পর মাগরিবী আফসানে কা আছর* (দিল্লি: এডুকেশনাল বুক হাউজ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৯৬
- ৪ ড. ছগীর আফরাহীম, *উর্দু আফসানা তারাক্কী পছন্দ তাহরীক সে ক্বাবল ১৯০১-১৯৩৬* (আলীগড়: এডুকেশন বুক হাউজ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২৩-২৪
- ৫ জাহিরুল হাসান, *উর্দু ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৮১-৮২
- ৬ ড. খালিদ আশরাফ, *ফাসানে মাস্টো কে* (দিল্লি: কাক অফসেট প্রিন্টার্স, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১০
- ৭ ড. সৈয়দ এজায় হুসাইন, *মুখতাছার তারীখে আদাবে উর্দু* (দিল্লি: উর্দু কিতাব ঘর, ১৯৬৪ খ্রি.) পৃ. ২৬৬-২৬৭; ড. ছগীর আফরাহীম, পৃ. ২৫৯
- ৮ ড. খালিদ আশরাফ, *ফাসানে মাস্টো কে*, পৃ. ২৮
- ৯ *তদেব*, পৃ. ১০
- ১০ ড. সগীর আফরাহীম, পৃ. ২৫৯
- ১১ প্রফেসর গোপীচন্দ্র নারাং, *উর্দু আফসানা রেওয়াজ আওর মাসায়েল* (দিল্লি: এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৮৩
- ১২ ড. খালিদ আশরাফ, পৃ. ২০
- ১৩ খলিলুর রহমান আজমী, *উর্দু মে তারাক্কী পসন্দ আদবী তাহরীক* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউজ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৯১; ড. সাদিক, *তারাক্কী পছন্দ তাহরীক আওর উর্দু আফসানে ১৯৩৬-১৯৫৬* (এডুকেশনাল বুক হাউজ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৪৬
- ১৪ ড. খালিদ আশরাফ, পৃ. ১০; ড. সগীর আফরাহীম, পৃ. ২৬০
- ১৫ ড. সগীর আফরাহীম, পৃ. ২৬০; ড. খালিদ আশরাফ, পৃ. ১০-১১
- ১৬ ড. সগীর আফরাহীম, পৃ. ২১৩
- ১৭ ড. ইবাদত বেরলবী, *তানকীদি যাওয়ায়ে* (লাহোর: আশরাফ প্রেস, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ৩৫৫
- ১৮ ড. সাদিক, পৃ. ১৪৯
- ১৯ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪
- ২০ ড. সুমুল নিগার, *উর্দু নছর কা তানকীদি মুতালেয়া* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউজ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৭৬-১৭৭
- ২১ *তদেব*, পৃ. ১৫৬
- ২২ ড. সাদিক, পৃ. ১৪৮
- ২৩ *তদেব*, পৃ. ১৫০
- ২৪ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২
- ২৫ ড. সুমুল নিগার, পৃ. ১৭৪
- ২৬ *তদেব*
- ২৭ *তদেব*
- ২৮ শাহেদ আহমদ দেহলবী, *চন্দ্র আদবী শাখসিয়াত* (নয়া দেহলী: মডার্ন পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৪; ড. সুমুল নিগার, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব [The Cosmogoni in the Bhagavadgita]

ড. জুয়েলী বিশ্বাস*

[Abstract: Most of the people of the world believe that there is a creator of this universe. Accordance with language, nation and religion He has various names. There are different opinions in the shastras and sciences of creating the universe and human beings. The Vedas were composed many years before the Bhagavadgita. The saints of the Vedas gave their opinions regarding the creation of the universe. The author of the Puranas also described many stories regarding the creation of human beings. There are different opinions of creating the universe and human beings in the Dharmashastras, History and in Philosophy. We cannot say in a word which is acceptable. The discussible subjectmatter of this article is the cosmogoni according to the Shrimadbhagavadgita.]

Keywords: Bhagavadgita, Sristitattwa Ved, Samkhyadarshan, Purusaprakriti, Mahattattwa, Para-Prakriti, Apra-prakriti, Kshetra, Kshettraina, Panchabimshatitattwa, Shrikrishne.

১. ভূমিকা

আমরা বিশ্বাস করি এই বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টা আছেন। ভাষাভেদে, জাতিভেদে, ধর্মভেদে তাঁর বিভিন্ন নাম। তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে বিশ্বজগৎ এবং জীবের সৃষ্টি কীভাবে হল সে সম্পর্কে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা একরূপ নয়। বিভিন্ন শাস্ত্রকার এবং দার্শনিকদের মধ্যেও এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ভগবদ্গীতার বহু আগে বেদ রচিত। বেদের ঋষিরাও জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। পুরাণকারেরাও মানব জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনশাস্ত্রেও মানব জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা আছে। মানব জাতির উদ্ভব সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। কোনটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভবপর নয়। কারণ সব ব্যাখ্যাই যুক্তি ও সমালোচনা দুই-ই আছে। হিন্দুদের বহুল প্রচারিত ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা আছে। বিভিন্ন দর্শনেও জীব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা আছে। গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় সাংখ্য দর্শন এবং উপনিষদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

২. বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব

হিন্দুদের মূল ও প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ। ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

“তখন যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না, বায়ু ছিল না, কেবল আত্মনির্ভরশীল এক একক সত্তা বিদ্যমান ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা তিনি সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তারপর একটা ইচ্ছা উদ্ভূত হল। সেই ইচ্ছাশক্তি থেকেই সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল।”

নাসদাসীন্নো সদাসীন্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্মঃ কিমাসীদাহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহু আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তন্মাদ্বানান্ন পরঃ কিং চনাস ॥
তম আসীন্তমসা গুড়ুমগ্ৰে' প্রকেতংসলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যনাভপিহিতংযদাসীন্তপসন্ত্যাহিনাজায়তৈকম্ ॥
কামস্তদগ্ৰে সমবর্ততাধিনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।^১

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে— “স. অকাময়তঃ একঃ অহম্ বহস্যাম্ প্রজায়েয়েতি”- অর্থাৎ তিনি কামনা করলেন, আমি এক আছি, বহু হবো, আমি সৃষ্টি করবো।^২

* প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

বেদান্তদর্শন মতে, পরমাত্মা থেকেই সমস্ত জীবাত্মার সৃষ্টি। পরমাত্মাই সর্বভূতে বহুরূপে বিরাজমান। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে- ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ এই সব কিছুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে জগতের সব কিছু সৃষ্টি। পরবর্তীকালে হিন্দুপুরাণে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। পুরাণমতে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দেহ হতে উদ্ভূত ‘স্বয়ম্ভুব’ মনু থেকে মানব জাতির সৃষ্টি (মনু+অণ্=মানব-অপত্যার্থে)। মনুর স্ত্রী শতরূপা, পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যা আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসুতি। এঁদের থেকে মনুষ্য জাতির বিস্তার”।^৭

ইসলাম ধর্মমতে আদম এবং হাওয়া থেকে মানব জাতির উদ্ভব।^৮ ডারউইনের বিবর্তনবাদ অবশ্য ভিন্ন কথা বলে। সে আলোচনা ভিন্নতর। তবে মানব জাতির উৎপত্তি যে একই উৎস থেকে হয়েছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগযোগে এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগে যথাক্রমে পরা ও অপরাপ্রকৃতি তত্ত্বে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বে, গুণতত্ত্বে এবং ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম তত্ত্বে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভগবদ্গীতার সৃষ্টিতত্ত্বে সাংখ্য দর্শনের প্রভাব বেশ প্রকট। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বকে ভিত্তি করে গীতার পরা ও অপরা প্রকৃতি তত্ত্বের উদ্ভব।

৩. সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব

ভারতীয় ষড়্ দর্শনের অন্যতম দর্শন সাংখ্যদর্শন। মহর্ষি কপিল এ দর্শনের প্রবক্তা। এ দর্শন অতি প্রাচীন। পণ্ডিতদের ধারণা গীতা প্রচারের পূর্বেই এ দর্শন প্রচারিত ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশবিশেষ। মহাভারতে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যোগবিষয়ে উপদেশ দেয়ার সময় বলেছেন, সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষলাভের উপযোগী এবং ঐ তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য যোগের অনুষ্ঠান আবশ্যিক,

উর্ধ্বং স দেহাৎ সুব্যক্তং বিমুচ্যেদিতি নান্যথা।

এতদাহর্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্।^৯

শ্রীবিভূষণ ভট্টাচার্য্য তাঁর “সাংখ্যদর্শনের বিবরণ” গ্রন্থে সাংখ্যমতের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহাভারতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন,

শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম পর্বের ২১৮ অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেন যে, মিথিলাধিপতি জনকের সভায় আসুরি মুনির শিষ্য মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। আসুরি মুনি কপিলের শিষ্য। রাজর্ষি জনকের বৃত্তান্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। জনকের সভায় সমাগত পঞ্চশিখাচার্য আসুরি মুনির শিষ্য এবং আসুরি মুনি কপিলের শিষ্য। অতএব কপিল মহাভারত যুগের অনেক পূর্ববর্তী- এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।^{১০}

ভগবদ্গীতা যেহেতু মহাভারতের অংশবিশেষ, তাই বলা যায়, সাংখ্যমতে গীতারও পূর্ববর্তী।

সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিকে ভগবদ্গীতায় যথাক্রমে পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ শব্দের অর্থ আত্মা। দেহরূপ পুরীতে যার অবস্থান তার নাম পুরুষ। পুরুষ শব্দের এখন অর্থ বিপর্যয় ঘটেছে। পুরুষ বলতে এখন মানব জাতির বিশেষ একটি ভেদকে বুঝায়। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল। প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। প্র-কৃ+জিন্ = প্রকৃতি। এই বিশ্বজগৎ প্রকৃষ্টিরূপে যার কৃতি তার নাম প্রকৃতি। সাংখ্যদর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়- ‘সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ’। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতির উপাদান কারণ। এর দ্বারাই জগতের অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলে। তবে পুরুষ বা আত্মার সাথে সংযোগ না হলে এই অভিব্যক্তি হয় না। সাংখ্যকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মাধ্যমে এই অভিব্যক্তি বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মা জীবের চৈতান্যাংশ। পুরুষ শুদ্ধ, নিত্য, শাস্ত। পুরুষের বিনাশ নেই। পুরুষ স্বপ্রকাশ। পুরুষ নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, তবে জড়-প্রকৃতির প্রকাশক। পুরুষের বুদ্ধি এবং প্রকৃতির কার্যক্ষমতা যখন একত্র হয় তখনই অভিব্যক্তি বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়। অভিব্যক্তিকালে প্রকৃতির তিন গুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। পুরুষের সংযোগেই প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি থেকে প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম অহংকার। অর্থাৎ মহৎ থেকে অহংকারের সৃষ্টি। ‘আমিত্ব’ অহংকারের বৈশিষ্ট্য। ‘আমি’

এবং ‘আমার’ এ দুটি অহংকারের বৈশিষ্ট্য। এই অহংবোধের জন্যই নির্লিপ্ত পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে এবং প্রিয় বস্তু লাভের জন্য অপ্রিয়কে ত্যাগ করে। ফলে পুরুষ (আত্মা) সুখ-দুঃখ অনুভব করে। প্রকৃতির তিনটি গুণের আধিক্য ও ন্যূনতাবশত অহংকার তিন রকমের হয়। যথা, সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস্। এই তিন প্রকার অহংকার থেকে জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, অন্তঃকরণ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক); পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু/গৃহ্যদ্বার ও উপস্থ/জননেন্দ্রিয়) এবং মন এর সৃষ্টি হয়। তামস্ অহংকার থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ)। পঞ্চ তন্মাত্র থেকে আবার যৌগ পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয় পঞ্চ মহাভূত— ক্ষিতি, অপ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)। রাজস্ অহংকারের কাজ হল সাত্ত্বিক ও তামস্ এই দুই অহংকারকে শক্তি সঞ্চয় করে তাদের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করা। প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রত্যক্ষগোচর নয়। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় প্রাকৃতিক বস্তুর কার্য থেকে। সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়।

পুরুষ ১, প্রকৃতি ১, মহৎ ১, অহংকার ১, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ৫, মন ১, পঞ্চ তন্মাত্র ৫, পঞ্চ মহাভূত ৫ = ২৫। সাংখ্য দর্শনে এই ২৫ টি তত্ত্ব ‘পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব’ নামে পরিচিত। এই ২৫টি তত্ত্বকে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করলে ছকটি এরূপ দাঁড়ায়,

পুরুষ – প্রকৃতি

মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি

অহংকার

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ)

পঞ্চ মহাভূত= [ক্ষিতি (পৃথিবী বা মৃত্তিকা), অপ (জল),

তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ)]।

মহর্ষি কপিলের এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব দর্শনজগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মহর্ষি কপিল প্রকৃতিবাদের দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের যে নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাগারেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে ৬০/৭০ টি মৌলের সংযোগে জড়-জগৎ গঠিত। তবে তাঁরা এখন বলছেন যে, এসব মৌলও এক চরম মহাভূতের বিকারমাত্র। এই চরম মহাভূতের তাঁরা নাম দিয়েছেন প্রোটাইল।

৪. ভগবদ্গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব

৪.১ পরা ও অপরা প্রকৃতি তত্ত্ব

ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেপরা ও অপরা প্রকৃতি তত্ত্ব দ্বারা এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পরা ও অপরা প্রকৃতি তত্ত্ব এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব মূলত সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে সৃষ্টি। গীতাকার সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বকে অপরা ও পরা প্রকৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবদ্গীতায় পরা ও প্রকৃতি তত্ত্ব যেন সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের কার্বন কপি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব আলোচনায় তার প্রতিফলন দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

ভূমিরাপো'নললো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥^৭

ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল,) তেজ, মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও অহংকার- এরূপে আমার আট প্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান এই আট প্রকার প্রকৃতি ভগবানের অপরা প্রকৃতি। এছাড়া জীবরূপা চেতনাত্মিকা শক্তি ভগবানের পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত—

অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥^৮

অপরা প্রকৃতি জড়াত্মক, পরা প্রকৃতি ভগবানের চেতনাত্মক।^৯ ভগবদ্গীতায় সাংখ্যের জড় প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি এবং চেতন পুরুষকে পরা প্রকৃতি বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ (জীবাত্মা) এবং প্রকৃতি (জড়)

ভিন্ন অন্য কোনো সত্তা স্বীকৃত হয়নি। এ কারণে সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলা হয়। ভগবদ্গীতা পরা প্রকৃতি (সাংখ্যের পুরুষ বা আত্মা) এবং অপরা প্রকৃতির (সাংখ্যের পুরুষ) অতিরিক্ত সত্তা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে নিয়েছে। এখানেই সাংখ্য ও ভগবদ্গীতার মধ্যে পার্থক্য। গীতাকার সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বরের আসনে বসিয়ে তাঁর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন।

উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ভগবদ্গীতার সৃষ্টি তত্ত্ব মূলত একই। উপনিষদে ব্রহ্মকে সৃষ্টির আদি কারণ বলা হয়েছে। ব্রহ্ম থেকেই এই জগতের সব কিছু সৃষ্টি— ‘যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযান্তি অভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্মেতি।’^{১০} অর্থাৎ, যা থেকে এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত ভূতবর্গ যার দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্তিমকালে যাতে বিলীন হয় তিনিই ব্রহ্ম। ভগবদ্গীতায়ও ঠিক একথা বলা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমার এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি। আমিই এই নিখিল জগতের উৎপত্তির স্থল, আবার আমাতেই উহার লয়,

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতু্যপধারয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।^{১১}

উপনিষদ মতে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। তিনি অনাদি, অনন্ত। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। তাই তিনি সচ্চিদানন্দ। জগৎ-সৃষ্টি, জগৎলীলা আনন্দময়ের আনন্দলীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই কবিগুরু বলেছেন,

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।

তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।^{১২}

উপনিষদে সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে সৃষ্টির আদি কারণ ব্রহ্ম-সংকল্প। তিনি সংকল্প করলেন এক আছি, বহু হব, আমি সৃষ্টি করব,

সুদেব সৌম্য ইদমগ্নে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদৈক্ষত একো’হং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি।^{১৩}

তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করলেন। সে কারণে তাঁকে স্বয়ংকর্তা বলা হয়— “অসদ্বা ইদমগ্ন আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরত। তস্মান্তং সুকৃতমুচ্যতে ইতি”।^{১৪} উপনিষদের ঋষি আরও বলেছেন, তিনি রসস্বরূপ, সেই রস লাভ করেই জীব আনন্দিত হয়। তিনিই আনন্দিত করে থাকেন— “যদৈতৎ সুকৃতম রসো বৈ স। রসং হি এবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতী। এষ হি এব আনন্দয়তি”।^{১৫} বেদান্তশাস্ত্র মতে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিক্রমে পরিণাম বা অব্যক্তির কারণ। বেদান্তে একে ‘ঈক্ষণ’ বলা হয়েছে (স ঈক্ষত; স ঈক্ষাঞ্চক্রে)। ভগবদ্গীতায় একেই প্রকৃতিতে ভগবানের ‘গর্ভাধান’ বলা হয়েছে—

মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।^{১৬}

উপনিষদে বলা হয়েছে,

তপসা চীয়েত ব্রহ্ম ততো’ন্নমভিজায়তে।

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্।^{১৭}

অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রথমে তপঃশক্তি (সৃজনোন্মুখী স্বীয় জ্ঞানশক্তি) দ্বারা আপনাকে স্ফীত করে অন্ন থেকে প্রাণের উদ্ভব হল, প্রাণ থেকে মনের অর্থাৎ মানবের সৃষ্টি হল। ক্রমে লোকসমূহের সৃষ্টি হল।

৪.২ ভগবদ্গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব

ভগবদ্গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বের দ্বারাও ব্যাখ্যাত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পরা ও অপরা প্রকৃতি (সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি) তত্ত্বের দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব দ্বারা তারবিষদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জড়াত্মক জীবদেহ ক্ষেত্র আর দেহস্থ আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়েছে। শ্রীভগবান বলেন,

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।^{১৮}

—হে কৌন্তেয়, এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং যিনি এই দেহকে জানেন (আত্মা) তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ এরূপ বলে থাকেন। বৃহদর্থে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ক্ষেত্র এবং যিনি বিশ্বনিয়ন্তা তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলেন,

মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরা ॥^{১৯}

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতচেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥^{২০}

হে অর্জুন, মহাভূতসমূহ (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), অহংকার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি (অব্যক্ত), দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় (পঞ্চ তন্মাত্রা), ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি—এসবকে সবিকার ক্ষেত্র বলা হয়। এ দুটি শ্লোকে সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ অর্থাৎ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

সাংখ্যমতে পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যরূপ। প্রকৃতির ন্যায় স্বপ্রকাশ, কেউ তাকে প্রকাশ করেনি। তার কোনো কারণ নেই। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, শাস্বত। পুরুষের (আত্মার) কোনো বিনাশ নেই। পুরুষ জড় নয়, তবে জড়ের প্রকাশক। জড়-প্রকৃতির বিকার আছে, কিন্তু পুরুষ নির্বিকার। তার কোন পরিবর্তন নেই। প্রকৃতি সৃষ্ট না হয়েও স্রষ্টা, কিন্তু পুরুষ সৃষ্টও নয়, স্রষ্টাও নয়। প্রকৃতি জ্ঞেয়, আর পুরুষ জ্ঞাতা। প্রকৃতি স্রষ্টা, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতি সৃষ্টি করে আর পুরুষ বা আত্মা তা ভোগ করে। পুরুষের বুদ্ধি এবং প্রকৃতির কার্যক্ষমতা যখন একত্র হয় তখনই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুরুষের সংযোগে প্রকৃতিতে প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধির উদ্ভব ঘটে। মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম অহংকার অর্থাৎ, মহঃ থেকে অহংকারের সৃষ্টি। ‘আমিত্ব’ অহংকারের বৈশিষ্ট্য। ‘আমি’ এবং ‘আমার’ এ দুটি অহংকারের লক্ষণ। এই অহংবোধের জন্যই নির্লিপ্ত পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে এবং প্রিয়বস্তুকে লাভ করার চেষ্টা করার জন্য অপ্রিয়কে ত্যাগ করে। ফলে পুরুষ (আত্মা) সুখ-দুঃখ অনুভব করে। প্রকৃতির তিনটি গুণের আধিক্য ও ন্যূনতাবশত অহংকার তিন রকমের হয়। যথা, সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস্। এই তিন প্রকার অহংকার থেকে জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, অন্তঃকরণ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক); পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু/গুহ্যদ্বার, ও উপস্থ/জনেন্দ্রিয় এবং মনের সৃষ্টি হয়। তামস্ অহংকার থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চ তন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ)। পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে আবার যৌগ-পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয় পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ/জল, তেজ, মরুৎ/বায়ু, ও ব্যোম/অকাশ)। রাজস্ অহংকারের কাজ হল সাত্ত্বিক ও তামস্ এই দুই অহংকারকে শক্তি সঞ্চর করে তাদের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করা। ভগবদ্গীতায় সৃষ্টির ক্রমাভিতির ক্ষেত্রে প্রায় এরূপ কথাই বলা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন, ক্ষিতি-আদি পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি (মহৎ তত্ত্ব) অব্যক্ত প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং রূপ-রসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় (পঞ্চ তন্মাত্রা), ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি এই সকলকে সবিকার ক্ষেত্র বলে, আর দেহস্থিত আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ।

ভগবদ্গীতার এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বলেন,

“আমি আছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমার দেহ’, ‘আমার গৃহ’—এইরূপ ‘আমি’ সকলেই করে। এই আমি কে? আর্য ঋষিগণ এই তত্ত্বের সম্যক আলোচনা করিয়া শেষে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই ‘আমি’ দেহ নহে, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নহে, মনও নহে, বুদ্ধিও নহে, ‘আমি’ এ সকলের অতীত কোন বস্তু, যাহার নাম জীব ও জীবাত্মা। কৃষক যেমন ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহা ভোগ করেন, তেমনি জীবাত্মাও জড়দেহকে অবলম্বন করিয়া পূর্বের কর্মজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন। এই জন্য এই দেহের নাম ক্ষেত্র। আবার ক্ষেত্রস্বামী যেমন জানেন যে, ইহা আমার ক্ষেত্র, সুতরাং আমি মালিক, আমিই ভোক্তা, এইরূপ অভিমান করেন, সেইরূপ জীবও এই দেহ আমারই ভোগভূমি বলিয়া জানেন এবং আমার দেহ, আমার মন ইত্যাদি রূপ অভিমান করেন। এই কারণে জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।”^{২১}

এই জগতে স্থাবর ও জঙ্গম যে সকল বস্তু বা প্রাণী উৎপন্ন হয় তা ক্ষেত্র (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (পুরুষের) সংযোগ থেকেই হয়,

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥^{২২}

হে ভরতর্ষভ, স্থাবর জঙ্গম যা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে হয়ে থাকে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। তাই বৃহদর্থে পরমাত্মা ক্ষেত্রজ আর বিশ্বেশ্বরও ক্ষেত্র বা প্রকৃতি। তাই শ্রীভগবান বলেন,

মম যোনির্মহদব্রক্ষ তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥^{২৩}

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।

তাসাং ব্রক্ষ মহদ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥^{২৪}

হে ভারত, প্রকৃতিই আমার গর্ভাধান-স্থান। আমি তাতে গর্ভাধান করি, তা থেকেই সর্বভূতের উৎপত্তি। হে কৌন্তেয়, দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে যে সব শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাদের মাতৃস্থানীয় এবং আমিই গর্ভাধানকর্তা পিতা।

১৪/৩ শ্লোকে ‘মহদব্রক্ষ’ অর্থ প্রকৃতি। ‘গর্ভাধান করি’ অর্থ সকল জীবের জন্মকারণস্বরূপ বীজ প্রকৃতিরূপে যোনিতে আধান করি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ দেহমধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন করে।^{২৫} প্রকৃতির গুণবশতই জীবের সদসদ যোনিতে জন্ম এবং সুখ-দুঃখ ভোগ অর্থাৎ, সংসারিত্ব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সাংখ্য দর্শন এবং ভগবদগীতার সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রায় একই প্রকার। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি, কিন্তু ভগবদগীতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়েছেন। ভগবদগীতার সৃষ্টিতত্ত্বকে একটি ছকের মাধ্যমে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি,

পরব্রক্ষ বা পুরুষোত্তম

অপরা প্রকৃতি (সাংখ্যের প্রকৃতি) + পরা প্রকৃতি (সাংখ্যের পুরুষ)

মহত্ত্ব বা বুদ্ধি

অহংকার

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন (সত্ত্বগুণের প্রাবাল্যে) পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ)

পঞ্চ মহাভূত বা স্থূলভূত = ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল),

তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বাতাস), ব্যোম (অকাশ)।।

সাংখ্য দর্শন কার্যকারণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কার্যকারণবাদ অনুসারে কার্য থাকলে তার কারণ থাকবে। যেমন, মাটি থেকে ঘট হয়, দুধ থেকে দধি হয়। এরূপে প্রত্যেকটি কার্যের পিছনে কারণ আছে। সাংখ্য দর্শন প্রকৃতির নিত্যত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। তা নাহলে ‘অনবস্থা দোষ’ ঘটে। প্রকৃতির নিত্যতা স্বীকার না করলে প্রশ্ন ওঠে, প্রকৃতি কে সৃষ্টি করলেন। এখানেই সাংখ্যের কার্যকারণবাদের সীমাবদ্ধতা। এ সীমাবদ্ধতা সর্বত্রই বিদ্যমান। কারণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের এক জায়গায় থামতে হবে। তখন কোনো একটি পরম সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হবে। সে কারণে ঈশ্বরবাদী দর্শনে এবং ধর্মশাস্ত্রে সেই পরম সত্তাই হলেন ঈশ্বর- ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

৫. উপসংহার

সৃষ্টিতত্ত্ব এক জটিল তত্ত্ব। এই বিশ্বজগৎ এবং প্রাণীজগৎ কীভাবে সৃষ্টি হলো, কে সৃষ্টি করল এর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্নভাবে দিয়েছে। ভগবদগীতা যেহেতু একটি ধর্মশাস্ত্র তাই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা ধর্মের আলোকেই করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস করে যে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টির পেছনে এক মহতী সত্তা রয়েছে। সেই সত্তার নাম ঈশ্বর, গড, ভগবান, আল্লাহ ইত্যাদি। ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই মহতী সত্তার আসনে বসিয়ে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গীতামতে, পরা প্রকৃতি অর্থাৎ এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর লীলাখেলা চলছে অবিরত তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

তথ্যনির্দেশ

^১ ঋগ্বেদ, রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদিত, পরমাত্মা সূক্ত- ১০/১২৯ (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬৪০

^২ অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ অনুদিত উপনিষদ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/৬/৩) (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৯৯।

^৩ সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান (কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি: ১৩৯২ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৪১১।

-
- ^৪ বাইবেলে মানব জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আদি মানব আদম ও আদি মানবী হবা। এই হবা থেকে হাওয়া হওয়া সম্ভব। বাইবেল এবং ইসলাম ধর্মে মানব জাতির উৎস সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে।
- ^৫ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩০০/৫
- ^৬ বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সাংখ্য দর্শনের বিবরণ (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬
- ^৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭/৪
- ^৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭/৫
- ^৯ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭/৫
- ^{১০} তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩/১/১
- ^{১১} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭/৬।
- ^{১২} গীতাঞ্জলি, ১৩০ নং গান।
- ^{১৩} ছন্দোগ্য উপনিষদ, ৬/২/১
- ^{১৪} তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/৭/১
- ^{১৫} তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/৭/২
- ^{১৬} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪/৩
- ^{১৭} মুণ্ডক উপনিষদ, ১/১/৮
- ^{১৮} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩/১
- ^{১৯} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩/ ৫
- ^{২০} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩/ ৬
- ^{২১} জগদীশচন্দ্র ঘোষ অনুদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪১০।
- ^{২২} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩/২৬
- ^{২৩} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪/৩
- ^{২৪} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪/৪
- ^{২৫} শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪/৫